বৈশাখ সংখ্যা ১৪২২

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

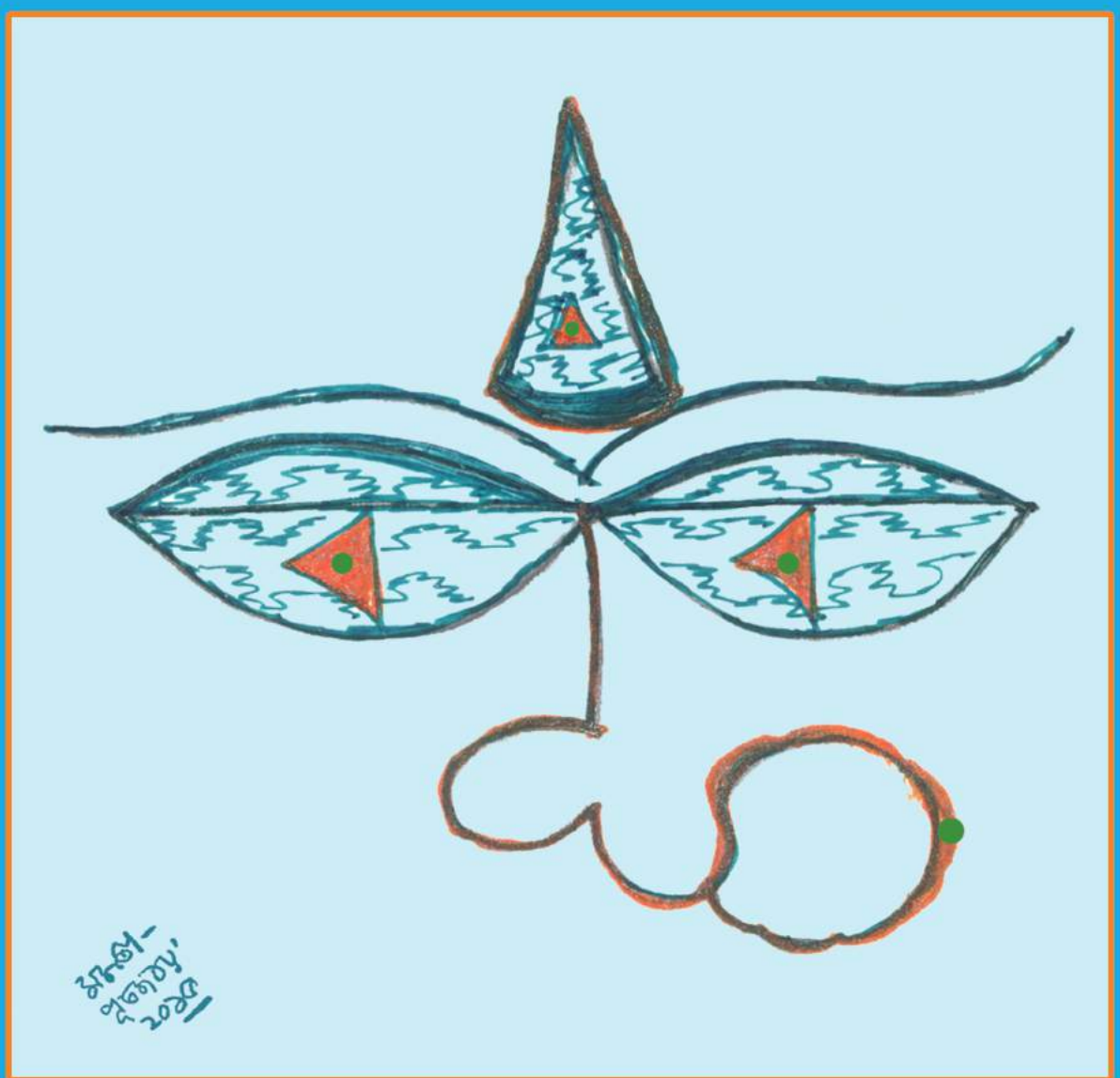





স্বাগত নতুন বছর

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব সংখ্যা ১৪২২

আমাদের অনুপ্রেরণা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

সম্পাদক **পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

অলঙ্করণ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, শরদিন্দু বসু, শান্তনু দে, সুরজিৎ সিকদার ও পূজা সরকার

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক
৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ২৬
থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট
লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭২ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ২৪৫৪ ০৮৮১

দাম : ৭৫ টাকা

সূচিপত্র

বিশেষ নিবন্ধ

পৃষ্ঠা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১

নিবন্ধ
ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৬, পূর্ণেন্দু বসু ১১, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬, ফিরহাদ হাকিম ১৯, অরূপ বিশ্বাস ২৩, সুখেন্দু শেখর রায় ২৭, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১, ডেরেক ও'ব্রায়েন ৩৩, শোভন চট্টোপাধ্যায় ৩৫, নির্বেদ রায় ৩৯, শুভেন্দু অধিকারি ৪২, সুব্রত বক্সি ৬৫, অভিরূপ সরকার ৬৯ মণ্টুরাম পাখিরা ৭৩, অমিয় চৌধুরি ৮৫, শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী ১২৭, রানাপ্রতাপ দাস ২৪৫, গৌতম সরকার ২৫৭, কৃষ্ণকুমার দাস ২৭২, তুষার শীল ২৭৬, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮১, অপরাজিতা দাশগুপ্ত ২৮৪

উপন্যাস
নলিনী বেরা ৯৭, তৃষ্ণা বসাক ১২৯, অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৩২১

বড় গল্প
শেখর বসু ১১৬, প্রদীপ আচার্য ২২০, গৌর মিত্র ৩৪৫

প্রবন্ধ
নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী ৭৬, শিখা সরকার ৮১, অসীম গণ ১৮৭, জহর মুখোপাধ্যায় ২৩২, মিহির গঙ্গোপাধ্যায় ২৬৪, অনরণ্য আচার্য ২৯৭

স্মৃতি-আলেখ্য
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫

চিত্রকর্ম
যোগেন চৌধুরি ৮০

বহুবর্ণ চিত্র
শান্তনু দে ২৫৬, পূজা সরকার ৩০৪

খেলা
সুমন মজুমদার ৩৫৮

গল্প
প্রফুল্ল রায় ৯২, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১২৪, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৬৬, রবিশংকর বল ২৪১, জয়ন্ত দে ১৪৮, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ১৫২, মিহির সরকার ১৫৭, দেবাশিস কর্মকার ১৬০, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২, গৌরী সেনগুপ্ত ১৭৬, গীতা সরকার প্রামাণিক ১৭৯, তপন কুমার দাস ১৮৩, সিদ্ধার্থ সিংহ২৮৯, জগন্নাথ প্রামাণিক ৩৬১, কোয়েল মুখোপাধ্যায় ৩৬৫

অনুবাদ গল্প
গৌতম ঘোষ দস্তিদার ২৯৩

সরস গল্প
প্রতাপ গুপ্ত ৩০১

শ্রদ্ধাঞ্জলি
অভিজিৎ সিরাজ ১৬৪

উপল খণ্ড
অশোক বসু ১৯০

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
ডাঃ শান্তনু সেন ২৭০

নাটক
ব্রাত্য বসু ২০১

স্মরণ
সোমনাথ রায় ২৭৮

শ্রদ্ধার্ঘ্য
শ্রাবণী সেন ২৩৭, ইন্দ্রনীল সেন ২৫৯, প্রবীর ঘোষাল ২৬১

কবিতা/ছড়া
জয় গোস্বামী, বুবুন চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী ৩১১/ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মৌমিতা ঘোষ ৩১২/ বীথি চট্টোপাধ্যায়, তপনদেব চট্টোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ঐশানী কর ১৯৯/ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২০০/ অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋজুরেখ চক্রবর্তী ২৩৯/ সমরেন্দ্র সরকার, দীপ মুখোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪০/ প্রণবকুমার চক্রবর্তী, অমিতাভ রায়, তুহিন সরকার, সৌরভ চন্দ্র ৩১৪/ কৌষিকী দাশগুপ্ত, সুব্রত চক্রবর্তী, সমর পাল ৩১৫/ সুস্মেলী দত্ত, দেবব্রত দত্ত, অনীল ঘোষ, নরেশচন্দ্র মজুমদার ৩১৬/ অশোককুমার রায়, সুকমল ঘোষ সমরেশ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ দেব ৩১৭/ দেবারতি ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলকুমার দাস, সায়ন, অনিমা মিত্র ৩১৮/ সৌম্যজিৎ আচার্য, সুব্রতা ঘোষ রায় ৩১৯/ সুতপা দত্ত, শুভঙ্কর ভৌমিক, দীপঙ্কর ঘোষ ৩২০

হারানো কবিতা
২৪৮

গদ্য কবিতা
কিংশুক প্রামাণিক ২৫৫

ভ্রমণ
ডোরা সাহা ২৮৬

দীর্ঘ কবিতা
সুবোধ সরকার ৩০৫, শ্যামলকান্তি দাশ ৩০৯

দীর্ঘ কবিতা
সুবোধ সরকার ৩০৫, শ্যামলকান্তি দাশ ৩০৯

গুচ্ছ কবিতা
শাওন নন্দী ৩১৩

আলোকচিত্র
অতনু ভট্টাচার্য ৩৬৮

বিশেষ উপহার নেতাজি অ্যালবাম

বিশেষ ক্রোড়পত্র **মমতাময় মুহূর্তগুলি**

সম্পাদকীয়

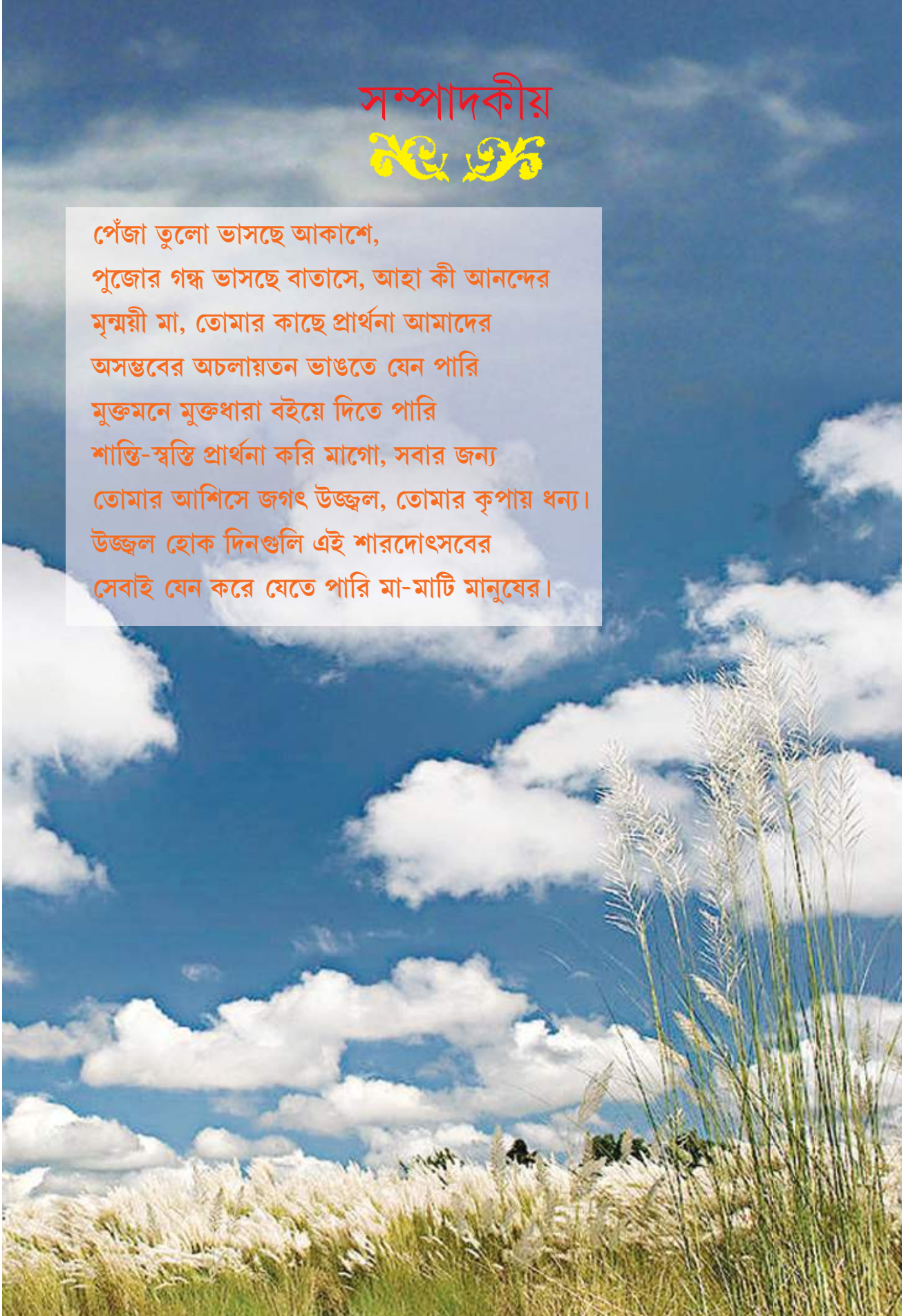

পেঁজা তুলো ভাসছে আকাশে,
পুজোর গন্ধ ভাসছে বাতাসে, আহা কী আনন্দের
মৃন্ময়ী মা, তোমার কাছে প্রার্থনা আমাদের
অসম্ভবের অচলায়তন ভাঙতে যেন পারি
মুক্তমনে মুক্তধারা বইয়ে দিতে পারি
শান্তি-স্বস্তি প্রার্থনা করি মাগো, সবার জন্য
তোমার আশিসে জগৎ উজ্জ্বল, তোমার কৃপায় ধন্য।
উজ্জ্বল হোক দিনগুলি এই শারদোৎসবের
সেবাই যেন করে যেতে পারি মা-মাটি মানুষের।



মমতাময় মুহূর্তগুলি



মমতাময় মুহূর্তগুলি







মমতাময় মুহূর্তগুলি











মমতাময় মুহূর্তগুলি









বিশেষ নিবন্ধ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাই ডেস্টিনি

এই সত্য আজ আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি



টেমস নদীর তীরে

এবারে পশ্চিমবাংলার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলকে নিয়ে আমরা ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে ইউ কে-তে বাংলার কোন ব্যবসায় কীভাবে বিনিয়োগ হতে পারে তার জন্য তিনদিনের সফরে লন্ডনে গিয়েছিলাম। আমাদের প্রতিনিধিদলে সরকারি অফিসাররাও ছিলেন। অনেক চেম্বার্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিকও।

আমরা সবাই একটাই পরিবার, মানে পশ্চিমবাংলার এক একান্নবর্তী পরিবার হিসাবে সেখানে গিয়েছিলাম। আর সেখানে গিয়েও সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ এমন একটা আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল যে নিজেরা সবাই তার জন্য গর্ববোধ করতাম।

রবিবার সকালে কলকাতা থেকে ফ্লাইট ধরে দিল্লি, ওখান থেকে লন্ডন, আমাদের ভারতীয় ঘড়ি অনুযায়ী যখন হোটেলে পৌঁছলাম তখন প্রায় রাত ১২-৩০, যার যার লাগেজ নিয়ে ঘরে। পরের দিন সকাল থেকে সব মিটিং শুরু, অনেকগুলো মিটিং ছিল আবার সরকারি আধিকারিকদের ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের।



বাকিংহাম প্যালেসে প্রিন্স অ্যান্ড্রুর সঙ্গে

সেইসব মিটিং করবার আগে সকালবেলায় পথ পরিক্রমা করতে শুরু করলাম অনেকে মিলে। প্রায় ১ ঘণ্টা পথ চলে সবাই মিলে গেলাম একটা কাফে শপ-এ। বাইরে দোকানে বসে একসঙ্গে চা-কফি, বিস্কুট বা অন্যান্য টুকিটাকি খেতে কিন্তু বেশ মজাই লাগছিল। তখন কিন্তু আর কোনটায় কত ক্যালোরি সেটা প্রায় কেউই আর ভাবছিল না। তবে একজনকে লক্ষ করেছি তিনি কফি খেলেও অত মোটা কুকিগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একজন বিজনেসম্যান। বাদবাকি আমি, সঙ্গে অমিতদা, অনির্বাণ, কিংশুক, বিশ্ব, সাহেব সেজে দেবাশিস ভট্ট ও পার্থ, উৎসব, রুদ্র অশোক, মায়াঙ্করা। মন দিয়েই আমরা রাস্তার ধারের দোকানে আড্ডা মারতে মারতে কফি খাচ্ছিলাম। আর দোকানটা ছিল একেবারে আমাদের হোটেলের উল্টোদিকে। তাই একসঙ্গে বসে রাস্তার ধারের দোকানে কখন যে সময় অত দ্রুত কেটে গেছিল, তা প্রায় বুঝে উঠতেই পারিনি। যদিও সময় আমাদের তাড়া করে যাচ্ছিল যে আমাদের মিটিং আছে।

তাই ইচ্ছে না থাকলেও তখনকার মতো আড্ডা ভেঙে চলে গেলাম স্নান করতে।

চটপট স্নান সেরেই আবার পরের মিটিংয়ে বসে পড়লাম। লাঞ্চ? না, ওটা আমার জীবন থেকে অনেকদিন আগেই বিদায় নিয়েছে। তাই দিনের ভেতর ২/৩ বার চা, বিস্কুট খেলেই লাঞ্চ-এর কাজ চলে যায়।

আর লন্ডনে যে আড়াই দিন এ যাত্রায় ছিলাম, তাতে দিন /রাত মিলিয়ে আহার বলতে স্যান্ডউইচ জুটেছে, খুব খিদে পেলে রাতে চিকেন স্যান্ডউইচ।

যাইহোক, প্রথম দিনের সভা মানে অফিসিয়াল সভা শেষ করতে করতেই আমাদের বাকিংহাম প্যালেসের যাবার জন্য আমন্ত্রণ এসে গেল। ছোটবেলা থেকেই এই রাজপ্রাসাদের কাহিনি বার বার শুনতে শুনতে আর ঐতিহাসিক একটা হেরিটেজের সাক্ষী হয়ে থাকার জন্য ভেতরে যাওয়ার ইচ্ছা তো একটা ছিলই, তার পরে আবার যুবরাজ অ্যান্ড্রুর আমন্ত্রণ। আমি আমার চিফ সেক্রেটারি, দেব মিলে আর সঙ্গে গৌতমদা ও উজ্জ্বলও ছিল। যুবরাজ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমি তো প্রথমে যুবরাজকে বুঝতেই পারিনি, কারণ এত সহজভাবে একেবারে সাধারণভাবে তিনি দরজার সামনে থেকে আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন যে প্রথমে হয়তো রাজবাড়ির কোনও অফিসার ভেবে ভুল করেই ফেলেছিলাম। পরে যখন আমাদের বসতে বলা হল, তখন বসা দেখে বুঝলাম তিনিই যুবরাজ। এর পর শুরু হল আলাপচারিতা। যুবরাজ আমাদের কাছ থেকে বাংলায় ইনভেস্টমেন্ট করার কোথায় কোথায় সুযোগ আছে তার সবটাই জেনে নিলেন। তাঁদের অনেক প্রশ্ন, প্রশ্নর মধ্যেও আবার অনেক বাস্তব প্রশ্নও, যে আপনাদের যে এত সামাজিক স্কিম চলে সাধারণ মানুষের জন্য 'কন্যাশ্রী' থেকে 'শিক্ষাশ্রী', 'যুবশ্রী' থেকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য যে কাজ, সে কাজগুলোর জন্য অর্থ আসে কোথা থেকে? এসব কাজের টাকা তো রাজকোষ থেকেই আসে। তবে তাতে তো আপনাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে টাকা আসবে কোথা থেকে, এর জন্য কি আলাদা কোন তহবিল জনগণের থেকে বর্ধিত কর নিয়ে করেন কি না? এসব নানারকম প্রশ্নের উত্তর যেমন তিনি জানতে



লন্ডনের ঐতিহাসিক লোকার্নো স্যুইটে

চেয়েছিলেন, তেমনি কী করে জনগণের স্কিম-এর টাকা আর ইনভেস্ট দুটো একসঙ্গে করা যায়।

সব প্রশ্ন শুনে আমি 'যুবরাজ'কে বললাম যে, দেখুন ৩৪ বছর একটানা বাম সরকার থাকার ফলে আর অর্থনৈতিক একটা দেনাগ্রস্ত, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া প্রায় একটা সরকারের দায়িত্ব নিয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে, কাজের গতি এনে ও বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক সংস্কার করে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন থেকে শুরু করে বাংলার একটা উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালাতে শুরু করেছি। এক রাজ্য যা অর্থ পায় সরকার চালানোর জন্য, তা যদি আমাদের সরকারের রাজকোষে থাকত, তবে তো অনেক ভাল কাজ আমরা আরও, আরও করতে পারতাম।

কিন্তু অর্থভাণ্ডার শূন্য থাকায় এবং দেনার টাকা শোধ করতে করতে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রায় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও কাজ বন্ধ তো হয়নি, উপরন্তু, এই চার বছরে অনেক পরিকাঠামো আমাদের সরকার তৈরি করেছে। যার ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান হয়েছে ও হচ্ছে। এই চার বছরে শুধু উচ্চশিক্ষায় তিন লক্ষ আসন বেড়েছে, ১৩টা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৫টা কলেজ, ৪১টা মাল্টিসুপার হসপিটাল, ৩০০টা এসএনএসইউ ইউনিট, ৫০টার ওপর এসএনসিইউ ইউনিট, শিশু চিকিৎসায় এক বহুমুখী চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিনা পয়সায় গ্রামে, জেলাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, ন্যায্যমূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার-সহ ৩০০০ জন ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিনা পয়সায় হার্ট-এর বিভিন্ন অপারেশন করা-সহ, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, বিশ্ববাংলা-সহ অনেক অনেক কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। অনেক পরিকাঠামো, হাসপাতাল থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিক্যাল কলেজ প্রায় ২০০-র মতো কিষান বাজার, পলিটেকনিক কলেজ থেকে আইটিআই সর্বস্তরে তৈরি করার প্রচেষ্টায় অনেক নতুন পরিকাঠামো যেমন বেড়েছে, তেমনি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ এসেছে।

ইন্ডাস্ট্রিও নতুন করে অনেক হচ্ছে ও হবে। আর রেলমন্ত্রী থাকাকালে প্রায় ১০/১২টা বড় রেল-এর কোম্পানি আমি বাংলায় আগেও করেছি। সুতরাং এগুলো তো হচ্ছে— পরিকল্পনা করেই। কারণ গণতান্ত্রিক সরকারের জনগণের প্রতি অনেকগুলো দায়বদ্ধতা থাকে। যে দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক নয়, তা সামাজিকও। সামাজিক কর্তব্য পালন করতে না জানলে, 'গণজন' যারা অর্থাৎ 'জনগণ' যারা, তাদের হয়ে কাজ কে করবে।

আর 'উন্নয়ন' তখনই হয় প্রকৃত অর্থে, যখন উন্নয়নটা সত্যি-সত্যিই জনগণের নিকট পৌঁছতে পারে। যারা অনেক বড় বড় রাষ্ট্র তাদের তো সোশ্যাল সিকিউরিটি আছে। তারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে নিজেদেরও তৈরি করে নিয়েছে। আর আমাদের দেশে 'সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম' না থাকার ফলে, সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাদের অনেক বেশি। আর গরিব মানুষ যতক্ষণ নিজে নিজ পায়ে দাঁড়াতে না পারবে ততদিন এ কাজ আমাদের করে যেতেই হবে। তবে এর জন্য শিল্প কেন থেমে থাকবে? আর ইনভেস্টমেন্ট কেন থেমে থাকবে?

কৃষিও চলবে, শিল্পও চলবে। শিল্প মানে তো শুধু ইট-সিমেন্ট আর লোহার কংক্রিটের জঙ্গল নয়, শিল্পে মানে বহুমুখী শিল্প জগতের চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়েই চলতে হবে। বড় শিল্প বলতে আগে শুধু বড় বড় প্ল্যান্ট বোঝাত, এখন তো ক্ষুদ্র শিল্পের বাজার বিশ্ব অর্থনীতির অনেকটা দখল করে নিয়েছে। সুতরাং আইটি থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং সবটাতেই আমাদের প্রয়োজনের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে। আর বাংলাই এর জন্য উপযুক্ত জায়গা কারণ বাংলার মেধা সারা বিশ্বের বিশ্বসেরা মেধা, বাংলার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অন্য জায়গার তুলনায় অনেকটাই সস্তা। বাংলার ট্যুরিজম শিল্প পাহাড়-নদী-সমুদ্র-জঙ্গল দিয়ে ঘেরা পৃথিবীর এক অনন্য-অনন্যা যা সারা

বিশ্বকে আকর্ষণ করে।

বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সারা বিশ্বকে পথ দেখায় এবং বাংলা হচ্ছে লুক ইস্ট পলিসির বড় গেটওয়ে। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান-সহ নর্থ-ইস্ট ও ইস্টার্ন ইন্ডিয়ারও গেটওয়ে। এ ছাড়াও অনেক এশিয়ান কান্ট্রির গেটওয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ? একেবারে প্রতিবেশী। বিমানে আধঘণ্টা, রেল-বাসেও যুক্ত।

নেপাল ঠিক তাই।

ভুটান একেবারে পাশে। কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর দু'-আড়াই ঘণ্টা বিমানে। ব্যাংকক- দু'ঘণ্টা। মায়ানমার সড়কপথে খুব শীঘ্রই যাওয়া যাবে।

বাংকক থেকে বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটান সড়কপথে যাতায়াত করবার জন্য এডিবির সাহায্যে অনেক রাস্তার কাজ আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দিয়েছি।

বাস শুরু হয়েছে বাংলাদেশে, নেপাল, ভুটানও একই পথের পথিক।

মাত্র ২ ঘণ্টায় চিন দেশের অনেকাংশে পৌঁছনো যায়।

সুতরাং বাংলাতে ইনভেস্টমেন্ট করলে এশিয়ার অনেক কান্ট্রিতে সে বিজনেস-এর সুফল ওঠানো যেতে পারে। আর এইসব প্লাস পয়েন্ট আছে বলেই ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে আমাদের লন্ডনে আসা। আমাদের আবেদন আগেও আমরা সিঙ্গাপুর-এ পৌঁছেছিলাম। আর এবারে লন্ডনে।

আপনাদের সঙ্গে তো কলকাতার একটা সম্পর্ক আগে থেকেই আছে। ব্রিটেন তো একসময় ভারতবর্ষে রাজ করতে গিয়ে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করেছিল আর বিখ্যাত কবিতার লাইন যা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে "বণিকের মানদণ্ড, দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে" তা তো সবার জানা।

যদি বিজনেস-এ পোটেনশিয়ালিটি না থাকে, তবে কেন কলকাতাকে সেদিন আপনারা অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজধানী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন? সুতরাং আপনাদের বাংলায় আসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আপনাদের হাতে তৈরি করা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অথবা হাওড়া ব্রিজ।

আপনারা আসুন গঙ্গার তীর ধরে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করুন আর এডুকেশন, রিয়্যালটি, টুরিজম হেরিটেজ ইত্যাদি ব্যাপারে আপনারা নজর দিয়ে ও আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করলে আমরা খুশিই হব। প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনার মধ্যে দিয়ে খুব ভাল কথাবার্তা হল। আলোচনায় রাজপরিবার খুব খুশি।

এরপর যুবরাজের স্ত্রী স্যারা এলেন। ১৯১২ সালে মধ্যমগ্রামের অলকাদিদের একটা এনজিও প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তাঁরা এসেছিলেন। তাই আলোচনার পর চা-তে মিলিত হলাম আরও কিছু বিশিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে। লর্ডসের স্পিকার যাকে 'স্যারা' থেকে আরও অনেক ব্রিটিশ গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুদের সঙ্গে। থ্যাঙ্কস গিভিং অনুষ্ঠানও হল।

চা খেয়ে এবার ফিরে আসার পালা।

ফিরে আসার সময়ও ব্রিটেন যুবরাজের সৌজন্য বিশেষভাবে লক্ষ করলাম। একেবারে শেষপ্রান্তে রাজবাড়ির প্রবেশদ্বার পর্যন্ত তিনি আমাদের এগিয়ে দিলেন।

আমরা যে দু'দিন ওখানে ছিলাম, তখন লক্ষ করতাম ওই 'বাকিংহাম প্যালেস'-এর বাইরেটা দেখবার জন্য বিরাট এক জনসংখ্যা অপেক্ষা করেন। সর্বদা তাঁরা ওই বাইরের প্রবেশদ্বারের থেকেও যে রাস্তার ধারে প্রধান সড়ক আছে সেই সড়ক ধরে কোলাপসিবল বৃহৎ গেটের পাশে ফুটপাত সংলগ্ন অঞ্চল দেখেই রাজকথায় কথিত একেবারে বাকিংহাম প্যালেস দেখবার আনন্দে মাতোয়ারা থাকেন। আমরা যখন রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়েছিলাম তখন লক্ষ করছিলাম জনগণের অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ভ্রমণার্থীদের কৌতূহল জাগছিল হয়তো আমাদের দেখে, কারণ তখন তাঁরা বাইরে আর আমরা ভেতরে।



শিল্পপতি লর্ড স্বরাজ পলের বাড়িতে

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা চলে এলাম ব্রিটিশ সরকারের, সরকারি দফতর, সরকারি আমন্ত্রণে লোকার্নো সুইট-এ সেখানে ইন্ডিয়ার দায়িত্বে থাকা ব্রিটিশ মন্ত্রী ম্যাডাম প্যাটেল-এর সঙ্গে দেখা হল। বাংলায় ইনভেস্ট করা নিয়ে বিস্তারিত প্রায় আধঘণ্টা আলোচনা হল। তার পর আমরা এলাম সরকারি সৌজন্যে লোকার্নো সুইটের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সভায়। সেখানে আমাদের শিল্প প্রতিনিধিদল ও ব্রিটিশ



প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা

প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তাঁদের মন্ত্রী মহোদয়া ম্যাডাম প্যাটেল ও আমাদের পক্ষ থেকে আমি দু'জনে বেশ বাংলায় ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার ও ইন্দো-ইউকে রিলেশন নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনাসভা ও বক্তৃতা দিলাম।

যাঁরা কথায় কথায় বাংলাকে পিছিয়ে দিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন, তাঁদের উদ্দেশে বলি, সেদিন কিন্তু আমন্ত্রিত দু'দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে এতটাই সাড়া ছিল যে বসার আসন উপচে পড়ে অনেককে দাঁড়িয়ে থেকে বক্তৃতা শুনতে হয়েছিল।

এ সভা আয়োজন করেছিলেন ইউকেবিসি।

সভা খুব সাফল্যের সঙ্গে হওয়ার পর আমাদের কয়েকজন এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কয়েকজনকে ডিনার-এ আমন্ত্রণ করেছিলেন ইউকেবিসির ম্যাডাম প্যাস্ট্রিসিয়া। সেটাও প্রায় আলোচনার মধ্যে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক চলল। শেষ হল তাঁদের ঘড়ির ১১টায় অর্থাৎ আমাদের ঘড়ির সময় তখন ৪/৪.৩০ বাজে।

ফিরে আসার পরে স্নান করে রেডি হতে হতে আমাদের ঘড়ির সময়ে ঘুম? না তার দেখাই মেলে না, একেবারে নৈব নৈব চ।

সকাল হতেই হুজুগ সবার, টেমস নদীর পাড় ধরে লন্ডন কেমন সেজেছে চলুন দেখে আসি। ব্যস শুরু হল হাঁটা। চলতে চলতে শুরু হয়েছিল ৪০ জনকে নিয়ে আর শেষ যখন হল তখন ওই পাঁচ-সাতজন। ১০/১২ কিমি হেঁটে হোটেল থেকে একেবারে লন্ডন ব্রিজ, ওখান থেকে আবার হেঁটে পায়ে পায়ে হোটেল। প্রায় দু'ঘণ্টা হনটনের পর হোটেলে ফেরা। তার পরেই বেরোলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধী মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। একসঙ্গে বাসে উঠে এই দুটো কাজ করে আবার পায়ে হেঁটে হোটেলে ফেরা, তার পরই ওখানে থাকাকালীন যে দুঃসংবাদ আমাদের ভীষণভাবে মর্মাহত করেছিল, যে এ পি জে আবদুল কালাম আর নেই। সেই মানুষটির স্মৃতিতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তারপর আবার রাত ৮টায় সবার একজায়গায় মিট টুগেদার ছিল, সেখানে যাওয়া।

পরের দিন যেদিন আমরা সকালে উঠেই পেলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংবাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসার ব্যবস্থা করতে ওই রাস্তাতেই হাঁটতে হাঁটতে হাইড পার্কের পাশ ধরে প্রায় ওই দেড়-দুঘণ্টা ভাবনা-চিন্তা করে কিছু প্রোগ্রাম কাটছাঁট করার ব্যবস্থা করলাম।

আগের দিন দুপুরে হোটেলে এসেছিলেন স্বরাজ পল। তিনি তাঁর বাড়িতে যেতে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

তাই হাইড পার্ক থেকে ফিরে আমরা স্বরাজ পল এর বাড়িতে গেলাম। তাঁর অসুস্থ স্ত্রী আমাকে একবার দেখতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন শুনেছিলাম তাই তাঁকে দেখতে গেলাম আর এই সুযোগে ওখানকার কয়েকজন লর্ড ও শিল্পপতিদের সঙ্গে আমাদের আর একটা ইনভেস্টমেন্ট-এর ব্যাপারে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সাংবাদিক বন্ধুরাও আমন্ত্রিত ছিলেন সেখানে। ওখানে মিটিং শেষ করেই এয়ারপোর্ট-এর পথে ফিরে আসার জন্য।

এমনিতেই বাইরে আসা-যাওয়া হয় না। তার ওপর যদি পাঁচদিনের প্রোগ্রাম দু'দিনে করতে হয়, তবে তাতে কাজের চাপ অনেক বেশি পড়ে যায় তা বলাইবাহুল্য। ঘুম আর খাওয়া? ও দুটো প্রায় চা-কফি-স্যান্ডউইচ আর নিদ্রাহীন কাজের মধ্যেই কেটে গিয়েছে বলতে পারেন।

তবে সব ভাল যার শেষ ভাল। আমাদের সবাই পশ্চিমবঙ্গ পরিবারের হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবেই সব কাজটা আমরা ওই দু'দিনেই লন্ডনে করতে পেরেছি এত আন্তরিকতার সঙ্গে যে প্রতিটা মুহূর্তই কিন্তু আশার আলো মুখে হাসি ও ভবিষ্যতের ডেস্টিনি বাংলাই এটা প্রমাণ করতে আমরা ১০০/১০০ সফল হয়েছি। থ্যাঙ্ক টু আওয়ার ফুল টিম। কৃতজ্ঞতা বাংলার মা-মাটি-মানুষকে।



বাকিংহাম প্যালেসের সামনে শিশুর সঙ্গে কথা

নিবন্ধ

শিক্ষা ও আমাদের লক্ষ্য

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়



শুধু বাম জমানায় নয়, মূলত বামপন্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ভিত তৈরি করতে গিয়ে পশ্চিমবাংলায় 'শিক্ষা সমস্যা' বহুদিনের। মূলত বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রের যে চেহারা নিয়ে আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসেছে— যার শিকড় পৌঁছেছে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত তার সমাধানে আমাদের সরকার অবিরত কাজ করে চলেছে।

দ্রুত সমাধানের চেষ্টা ভাল তবে আলোর দিশায় পৌঁছনো আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষক-অশিক্ষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র সমাজ— সকলকে সঙ্গে নিয়েই আমরা ঘটাতে চাই শিক্ষায় আরও উন্নত মানের পরিবেশ। পারস্পরিক সম্মান-স্নেহ-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে উৎকর্ষতা যাতে বৃদ্ধি পায় তার পঠন-পাঠন। আর এই পরিবেশ রূপায়ণ নিশ্চিত করতে উন্নত পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও তাকে মেধানির্ভর করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

কিন্তু মুশকিল হল হাতের কাছে 'মুশকিল আসান' চটজলদি কোনও সূত্র নেই। চাই ঐক্যবদ্ধতার আন্তরিকতার সঙ্গে বাধা-বিঘ্ন দূর করা। মনে রাখতে হবে অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যখন মা-মাটি-মানুষ গঠিত হয় তখন তার মাথায় বসে প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকার দেনা।

প্রচুর বাধা আছে। সকলের জানা- রাজ্যের মাথায় ২ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার চালাচ্ছেন। বিভিন্ন নামে শুধু শিক্ষা দফতরেই অনিয়মিত শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় লাখ ছুঁইছুঁই। পিটিটিআই, গেস্ট লেকচারার, পার্শ্বশিক্ষক, অর্গানাইজড শিক্ষকরা রয়েছেন। এইরকম বিবিধ ক্ষেত্রে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে হবে। অন্যদিকে, আনুপাতিক হারে শিক্ষকের বন্দোবস্ত করা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, ক্লাসরুমকে সময়োপযোগী করে তোলার কাজও করতে হবে সরকারকে।

আরও একটা জিনিস সরকার মাথায় রাখছে। তা হল স্বচ্ছতা। সব ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রীর সজাগ দৃষ্টি, পরামর্শ এবং সহযোগিতায় এই জটিল পরিস্থিতিতে কাজ শুরু করেছি। পতাকার রং না দেখে ছাত্র, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দু-তিনবার আলোচনা করেছি। আন্দোলনকারী নিয়মিত শিক্ষকদের দাবি সম্পর্কে জেনেছি। আবার তাঁদের দায়িত্ববোধ নিয়েও আলাপ-আলোচনা করেছি।

সরকারের এই মনোভাব যে সার্বিক একটা পরিবর্তন এনেছে, তা পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। স্বাধীনতার পর থেকে এই সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। আমাদের সেবাকালে (শাসনকালে) তা ২৬টিতে দাঁড়িয়েছে। কলেজের দিক থেকেও আমরা সরকারের এই গতি বজায় রাখতে পেরেছি। কলেজের সংখ্যা বেড়ে এখন ৪৫। ইতিমধ্যেই দু'হাজার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলছে। অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রথম দফা বাস্তবায়িত হওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় হাত দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপকদের দাবিদাওয়াও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। গরিব ও মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য নানা বৃত্তি চালু করেছি। পার্শ্বশিক্ষকরা আমায় বারবার বেতন বৃদ্ধির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তবে আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হলে এ বিষয়ে সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে অন্য নানা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছি।

অনলাইন ভর্তি

ছাত্রসমাজের দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল ভর্তি নিয়ে। রাজ্যে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অরাজকতা বন্ধে একটা পদক্ষেপ করা গিয়েছে। এ বিষয়ে অনেকের অনেক মত ছিল। সরকার কিন্তু স্বচ্ছতা রক্ষায় সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে চেয়েছে। একটা অংশে অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মানছি, এখনও সর্বত্র এই ব্যবস্থার সুবিধা দেওয়া যায়নি। কিছু জায়গায় সমস্যা আছে। কোনও সন্দেহ নেই, তা-ও দূর করব। প্রাথমিকের সিলেবাস কমিটি নবম শ্রেণি পর্যন্ত নতুন সিলেবাস পড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা চালু করা গিয়েছে ১৪০টি প্রতিষ্ঠানে। জুনিয়র থেকে হাই-প্রাইমারি, মাধ্যমিক থেকে হায়ার সেকেন্ডারি— এইরকমভাবে স্কুল স্তরে শিক্ষাপ্রসারে পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছে। প্রয়োজন খতিয়ে দেখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিছু ক্ষেত্রে কাজ করা গিয়েছে। সমস্যা বা ঘাটতি নেই, তা বলতে পারি না। তবে চেষ্টা বা আন্তরিকতার সুফল নেই, তা-ও কি কেউ বলতে পারেন? কোনও সঙ্কীর্ণতা রাখিনি। প্রয়োজনমতো সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। পরামর্শ করেছি। আমি মনে করি, প্রশাসনিক কাজে এই পথ নানাভাবে পরিকল্পনাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

উন্নয়নের কাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে সাহায্যের কাজে এগিয়ে এসেছে সরকার। নতুন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এ কাজ আরও বেশি করে করা সম্ভব হত, যদি অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত কিছু ঘটনা শিক্ষার পরিমণ্ডলকে মলিন না-করত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কটিশ চার্চ এবং এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— কাজ বিঘ্নিত হওয়ার কারণ খুঁজলে যে কেউ বুঝতে পারবেন, অদৃশ্য কোনও হাত ওই ধরনের সব ঘটনা ঘটিয়ে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টা করছে।

আমাদের মুশকিল হল, অনেক সময় স্বাধিকার নিয়ে চিন্তা করি, কিন্তু অধিকার নিয়ে ভাবি কম। যাদবপুরের তৎকালীন উপাচার্য পুলিশ ডাকলেন। আঙুল উঠল সরকারের দিকে। স্বাধিকারের প্রশ্ন কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকার পরে প্রশাসন পাশে না দাঁড়ালে মিছিল হত। প্রশ্ন উঠত, সরকার কেন নীরব? যাদবপুরের ঘটনা আমাদের সজাগ করে দেয়। প্রথম থেকেই আমাদের নীতি— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও অবস্থাতেই বহিরাগতরা ঢুকবে না। গবেষক, প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা এই তালিকার বাইরে।

স্কটিশ চার্চ কলেজের বিতর্কেও সরকার এবং শিক্ষা দফতরকে টেনে আনা হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত কলেজের অভ্যন্তর সিদ্ধান্তের আমরা কথা বলতে চাইনি। পরে কথা বলে জানলাম, কলেজে ফি-বৃদ্ধি নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছিল।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ঘটনা মিটতে না মিটতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা ঘটল। যা এখনও সংবাদমাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু কী ঘটেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে? আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের অর্থ আধিকারিককে অপসারণ

করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট। তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টিকে কলকাতা হাই কোর্টে পাঠানো হয়। এর সঙ্গেও সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। সিন্ডিকেটই তদন্ত কমিটি গড়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সাসপেন্ড করে তদন্ত শুরু করে।

আমি উপাচার্যের কাছে বিষয়টি জানতে চাই। প্রথমিকভাবে তিনি জানিয়েছিলেন, একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে অর্থ আধিকারিককে সাসপেন্ড করে তদন্ত শুরু হয়েছে। উপাচার্য সুরঞ্জন দাস সার্চ কমিটির সিদ্ধান্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। এই অবস্থায় ফের সিন্ডিকেট বৈঠকের ব্যবস্থা তিনিই করেন, যাতে তিনি যথাসময়ে যাদবপুরে যোগ দিতে পারেন। বৈঠক চলাকালীনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের যৌথমঞ্চ সিন্ডিকেট কক্ষের বাইরে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করে। তাদের দাবি ছিল, অর্থ আধিকারিককে ফিরিয়ে আনতে হবে। সব নথিপত্রের প্রতিলিপি তাদের দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুটে নতুন করে অনুমোদন দিতে হবে। সিন্ডিকেট সেই দাবি নাকচ করে আর্থিক বেনিয়মের তদন্ত কমিটি গঠন করে। এখানেও সরকার বা দফতরের কোনও ভূমিকা ছিল না। কয়েকদিন এই অবস্থান বিক্ষোভ চলার পর একইভাবে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদও।

ঘটনার দিন উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি সহ-উপাচার্য এবং এক সিন্ডিকেট সদস্য বাইরে আসেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, যৌথ মঞ্চের অবস্থানের সময় ছাত্রেরা সেখানে একই কর্মসূচি নিয়ে উপস্থিত হয়। ফোন করে জানতে চাইলে উপাচার্য বিবদমান গোষ্ঠীর ভূমিকার কথা জানিয়েছিলেন। আমি তখন তাঁকে বলি, সেনেট অফিসের সামনে থেকে অবিলম্বে যৌথ মঞ্চকে অবস্থান তুলে নিতে বলুন। অবস্থার অবনতি হলে ছাত্রদের কাছেও খবর যায় অবস্থান তুলে নেওয়ার জন্যে। যা বলার, তা আলোচনার টেবিলে বলতে বলা হয়। তারা উঠে যায়। উপাচার্যকে তাঁরই রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছি। আমি ঘটনার সময় ছিলাম না। তদন্ত চলাকালীন আর কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

সকলকেই জানাচ্ছি, অর্থনৈতিক বেনিয়ম নিয়ে কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই তা অমান্য করা যাবে না। তদন্ত সাপেক্ষে এ কথা জানিয়ে রাখা ভাল, এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫৩ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট নিয়ে ওঠা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। এ বিষয়ে তদন্তকারীরা কাউকে দোষী চিহ্নিত করলে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে সরকার পিছপা হবে না।

মূল প্রশ্ন স্বাধিকার নয়। শিক্ষা ও দুর্নীতি একসঙ্গে থাকতে পারি কি না, মূল প্রশ্ন সেটাই। আমিও প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার নিয়ে ভাবি। কিন্তু স্বাধিকারকে ঢাল করে দুর্নীতি চালানো কারও অধিকার হতে পারে না।

মা-মাটি-মানুষ সরকারের একনজরে বিদ্যালয় শিক্ষা

● নিউ সেট-আপ প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ

৩২৮৭টি নতুন নিউ সেট-আপ বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে।

● বিদ্যালয়ের উন্নীতকরণ

মোট ১,৯৪০টি বিদ্যালয়কে উন্নীত করা হয়েছে।

● ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান

প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করা হয়েছে এবং প্রায় সাড়ে ৭ কোটি সুচিত্রিত উত্তম মানের পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়েছে। বইগুলি সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

● অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট ৮২,৮৬৩টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

● বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল প্রকল্প

৯৯.৯৮% প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৯৯.৪৭% উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল প্রকল্পে দুপুরে খাবার দেওয়া হয়েছে।

● শিক্ষক নিয়োগ

প্রায় ৭০ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে।

● শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণবিহীন প্রায় পঁচাত্তর হাজার জন প্রাথমিক শিক্ষককে ডিএলএড এবং ২৭,৮৮৯৪ জন শিক্ষককে ওডিএল প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে।

● মডেল স্কুল নির্মাণ

মোট ৪৬টি ইংরেজি মাধ্যম মডেল স্কুল নির্মাণ করার কাজ চলছে এবং ১৮টি মডেল স্কুলে ক্লাস ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে।

● শৌচালয় নির্মাণ

রাজ্যের ১০০% বিদ্যালয়ে সাধারণ শৌচালয় এবং ১০০% বিদ্যালয়ে বালিকাদের জন্য পৃথক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

● বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষার জন্য ৩,০০৬টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসিটি প্রকল্পে কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে।

● অনুন্নত জেলায় শিক্ষার ব্যবস্থা

১১টি অনুন্নত জেলায় ১৫০টি ছাত্রী আবাস, ৪০টি নতুন আবাসিক বিদ্যালয় ভবন এবং ১১টি পিটিটিআই নির্মাণের কাজ চলছে।

● জঙ্গলমহল এলাকায় ৫০টি শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রী আবাস নির্মাণ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১৭টি, বাঁকুড়া জেলায় ৯টি এবং পুরুলিয়া জেলার ৮টি— মোট ৩৪টি ছাত্রী আবাস নির্মাণ করা হয়েছে।

● জঙ্গলমহল এলাকায় ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান।

জঙ্গলমহল এলাকায় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ১,০১,৩৯৮ জন ছাত্রীকে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।

● লাইব্রেরি গ্রান্ট ও ল্যাবরেটরি গ্রান্ট প্রদান

রাজ্যে মোট ২,৪৫৭টি উচ্চমাধ্যমিক উন্নীত বিদ্যালয়কে ৫০,০০০ টাকা করে লাইব্রেরি গ্রান্ট এবং ৩,৭১৭ টি বিদ্যালয়কে ২ লক্ষ টাকা করে ল্যাবরেটরি গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে।

● জঙ্গলমহল এলাকায় সাঁওতালি ভাষা শিক্ষার জন্য প্যারা টিচার নিয়োগ

পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় ১,১১০ জন সাঁওতালি ভাষার প্যারা টিচার নিয়োগ করা হয়েছে।

● শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি নীতি প্রণয়ন

রাজ্যের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি নীতি চালু হয়েছে এবং এই বদলি নীতি কার্যকর করা হয়েছে।

● ১১-৯ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রদানের সিদ্ধান্ত

মা-মাটি-মানুষ সরকারের একনজরে উচ্চশিক্ষা

২০১২ সালে উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মোট সংখ্যা ছিল ১৩। গত তিন বছরে রাজ্য সরকার স্থাপন করেছে আরও ১৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় (৬টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ৭টি বেসরকারি) যার বিবরণ নিচে দেওয়া হল ঃ-

ক্রমিক সংখ্যা	বিশ্ববিদ্যালয়	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত / বেসরকারি	পঠনপাঠন শুরুর আনুমানিক সময় শিক্ষাবর্ষ
১	কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত	২০১৩-১৪
২	কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত	২০১৩-১৪
৩	বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত	২০১৪-১৫
৪	ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত	২০১৪-১৫
৫	রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত	২০১৫-১৬
৬	W. B. University of Teacher Training, Academic Planning and Administration	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত	২০১৫-১৬
৭	টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা	বেসরকারি	২০১৩-১৪
৮	সিকম স্কিলস্ বিশ্ববিদ্যালয় (বীরভূম)	বেসরকারি	২০১৪-১৫
৯	অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা	বেসরকারি	২০১৫-১৬
১০	নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা	বেসরকারি	২০১৫-১৬
১১	ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা	বেসরকারি	২০১৫-১৬
১২	জে আই এস বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা	বেসরকারি	২০১৫-১৬
১৩	অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা	বেসরকারি	২০১৫-১৬

● সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে রাজারহাটে।

● রাজারহাটে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে।

● নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (NSOU) আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়ে তোলার পদক্ষেপ হিসাবে দুর্গাপুর এবং জলপাইগুড়িতে NSOU -কে জমি বণ্টন করা হয়েছে।

● নতুন সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ

২০১১ সাল পর্যন্ত সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা ছিল ৩৬। বর্তমান সরকার মাত্র তিন বছরে ৩০টি সরকারি কলেজ (যার মধ্যে সবগুলিতেই প্রায় পঠনপাঠন শুরু হয়ে গিয়েছে) এবং ১০টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ (যার প্রতিটিতে পঠনপাঠন শুরু হয়ে গিয়েছে) স্থাপন করেছে।

● পুরুলিয়া এবং কোচবিহারে নতুন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি কলেজ

এছাড়াও বর্তমান সরকার পুরুলিয়ার জয়পুরে (BRGF Special Project Scheme-এর অধীনে) এবং কোচবিহারের হরিণচওড়ায় (নির্মাণে-NBDD) দুটি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ স্থাপন করেছে যেগুলিতে পঠন-পাঠন শুরু হবে আনুমানিক ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে।

এছাড়াও বর্তমান সরকার সাতটি জেলায় দশটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে স্থাপন করেছে।

● রেকর্ড সংখ্যক নতুন পদের সৃষ্টি

বিগত কয়েক বছরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ শিক্ষক-অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছে বর্তমান সরকার যার বিবরণ পরের পাতায় দেওয়া হল :-

● কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির সুযোগ

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে ২২৬১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করেছে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, ১৯০৭ জনের নাম অনুমোদন করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	পদ সৃষ্টির স্থান	সৃষ্ট শিক্ষক পদের সংখ্যা	সৃষ্ট অশিক্ষক পদের সংখ্যা
১	সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ	৭৩৬	৩৩০
২	বিশ্ববিদ্যালয়	৪৪০	১৪৫ (অফিসার সহ)
৩	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ	৯৮	৩৭৫
৪	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ	১৬২	৭৪
	মোট	১৪৩৬	৯২৪

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন দ্বারা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে অধ্যক্ষের ১২৬টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে এবং আরও ১২৫ টি শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়াও চালু আছে।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন মোট ৭৩৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এযাবৎ তারা ৪৫৭ জনের নাম নিয়োগের জন্য অনুমোদন করেছে এবং তার মধ্যে ২৫৭ জন নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছেন।

এছাড়াও নতুন সরকারি সাধারণ কলেজের জন্য সৃষ্ট ৪১১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভিন্ন সরকারি কলেজে ২৮ জন অধ্যক্ষের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

ওবিসি শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণ

(১) West Bengal State Higher Education Institution (Reservation in Admission) আইন, ২০১৩ প্রবর্তন করা হয়েছে।

(২) লক্ষ্য : সাধারণ শিক্ষার্থীদের মোট আসন সংখ্যা না কমিয়ে ২০১৪-১৫ থেকে শুরু করে ছ'বছরের মধ্যে ওবিসি শিক্ষার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা।

(৩) উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময় অতিরিক্ত ৭৩১৮৭টি নতুন আসন সৃষ্টি করা হয়েছে যার বিবরণ নিয়ে দেওয়া হল :

কার্যক্রম	সৃষ্ট অতিরিক্ত আসনের সংখ্যা
স্নাতকোত্তর স্তর	৬০৫৫
স্নাতক স্তর	৬৭১৩২
মোট	৭৩১৮৭

(৪) শুরুর প্রথম বছরে ওবিসি শিক্ষার্থীদের জন্য ১০.৬ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

● ওয়েস্ট বেঙ্গল মেরিট-কাম-মিনস-স্কলারশিপ স্কিম

রাজ্য সরকার স্বামীজির ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে মাধ্যমিক-উত্তর উচ্চশিক্ষায় রত রাজ্যের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী ওয়েস্ট বেঙ্গল মেরিট-কাম-মিনস-স্কলারশিপ স্কিম-এর নাম পালটে রেখেছে 'স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েস্ট বেঙ্গল মেরিট-কাম-মিনস-স্কলারশিপ স্কিম'।

২০১৩-১৪ আর্থিক বছর থেকে স্কলারশিপ প্রকল্পের জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে ৩৯২৫৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য সরকারের খরচ হয়েছিল ৩৫.৬৪ কোটি টাকা এবং আশা করা যায় ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে ওই খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩৯.২০ কোটি টাকা।

● জাতীয় সেবা প্রকল্প (NSS)

সরকার-পোষিত NSS স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ১০১২০০ থেকে বাড়িয়ে করেছে ৯৩৭০২ এবং সেই সঙ্গে ১০৫০০ জন সেল্ফ ফিনান্সড NSS স্বেচ্ছাসেবকও প্রবর্তন করেছে রাজ্যে। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে NSS গ্রান্টের প্রথম কিস্তির জন্য রাজ্যের অংশভাগ হিসাবে আমরা ১,৮১,০৫,২৫৪ টাকা দিয়েছি যেখানে মোট বাজেট সংস্থান ছিল ৩,৩০,০০,০০০টাকার।

● ই গভন্যান্সের পদক্ষেপ

উচ্চশিক্ষা বিভাগে চালু হয়েছে ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম। এই ব্যবস্থার ফলে ত্বরান্বিত হয়েছে নথির আদান-প্রদান, ফলে কাজের যথেষ্ট গতিবেগ বেড়েছে সমগ্র ডিপার্টমেন্ট ও ডিরেক্টরেটের।

● সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে COSA চালু করা

রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া এবং কম্পিউটারাইজেশন অফ স্যালারি অ্যাকাউন্টস (COSA) চালু করার জন্য অর্থ বণ্টন করা হয়েছে।

রাজ্যের অধিকাংশ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজেই COSA চালু হয়ে গিয়েছে।

● ভর্তির জন্য হেল্পলাইন

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বার্ষিক ভর্তিকে বাধাহীন ও স্বচ্ছ করতে উচ্চশিক্ষা বিভাগ চালু করেছে একটি হেল্পলাইন। ৯জুন, ২০১৪ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে মোট ৩০৬২ টি অভিযোগ জমা পড়েছিল যার সবক'টিরই দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়।

● ১৪০টি কলেজে স্নাতকোত্তর (PG) পড়ার সুযোগ করে দেওয়া

● এনরোলমেন্ট ratio ১২.৮ থেকে ১৭.৮ বৃদ্ধি

● পরিসংখ্যান ২০১৫ মার্চ পর্যন্ত

নিবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন মডেল

পূর্ণেন্দু বসু



পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর চারবছর চার মাস সময় কেটে গিয়েছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এ রাজ্যে নজর কাড়ার মতো উন্নয়নের কাজ গতি পেয়েছে নানা ক্ষেত্রে। সরকার বিরোধী সমালোচকরা এতে একেবারেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা সর্বদা বলে চলেছেন নতুন সরকারের আমলে খারাপ ছাড়া ভাল কিছু হচ্ছে না।



রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি কাজের কাজ কিছু করছেন না, মেতে আছেন নানা অকাজে। বিরোধীরা চোখে ঠুলি পরে রয়েছেন কি-না সে প্রসঙ্গে পরে আলোচনা হবে। তবে এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, ১৯৭৭ থেকে ২০১১-র মে মাস পর্যন্ত টানা ৩৪ বছর ধরে এ-রাজ্যে বামফ্রন্টের শাসন ছিল। প্রথম কয়েকবছর কিছু ভাল কাজ করার পর তাদের অপশাসনে এই রাজ্যটাকে তারা পথে বসিয়ে গিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতটা বাদ দিয়ে এখনকার উন্নয়নের আলোচনা হতে পারে না।

বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে 'বিকল্প' উন্নয়নের কথা আমরা অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখিনি। আমরা দেখেছি-এ রাজ্যের সার্বিক অবনমন। আমরা দেখেছি খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রাস্তাঘাট-আলো-পানীয় জল থেকে শুরু করে কৃষি-শিল্প কর্মসংস্থান প্রভৃতি মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ কেমন করে একটা পশ্চাদপদ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। বড় বড় কথার আড়ালে, নানা ষড়যন্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে শাসক হিসাবে বামফ্রন্ট এই রাজ্যটাকে একেবারে ধ্বংসের কিনারায় রেখে গিয়েছিল।২০০৪ সালে তাদেরই প্রকাশিত রাজ্যের মানবোন্নয়ন রিপোর্ট দেখলে এর প্রমাণ মিলবে। পরের সাত বছরের তো আরও অধঃপতন হয়েছে। নতুন সরকারের কাছে রাজ্যটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে তোলার কাজটি ছিল প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেই কাজগুলি করতে করতেই দ্রুত এ রাজ্যে উন্নয়নের একটা বিশেষ মডেল গড়ে উঠছে।

রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়—সে বিষয়ে একটা দৃষ্টিভঙ্গি গত আলোচনা করা দরকার।

গোটা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও উন্নয়ন নিয়ে নানা মুনির নানা মত। চালু ধারায় দেশের আর্থিক বিকাশ বা 'ইকনমিক গ্রোথ'কে উন্নয়ন বলে চালানো হয়। আর্থিক বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক বিকাশ কখনও সবার বিকাশ হতে পারে না। এই বিকাশে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আয়ের বিস্তর ফারাক লক্ষ করা যায়। আমাদের দেশে বছরের পর বছর ধরে যা ঘটে চলেছে।

চালু মতে, দেশের আর্থিক বিকাশ বলতে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে বোঝায়। আমাদের দেশে ২০১৫-১৬ সালে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৭.৫ হারে বৃদ্ধি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্কের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভারত বিশ্বের 'দ্রুততম বিকাশশীল' দেশ। অথচ গ্রামের ৭৫ শতাংশ পরিবারের আয় মাসে পাঁচ হাজার টাকার কম।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন হল —এই বিকাশ বা 'গ্রোথ' কি দেশের 'গরিব থেকে গরিবতম' মানুষ সহ সকলের আর্থিক বিকাশ ঘটাতে পেরেছে? না-তা পারেনি। বরং বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে আর্থিক বিকাশের গতি ও বণ্টনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ফারাকটা ক্রমাগত বাড়ছে। দেশের উন্নতি একেবারেই হয়নি এরকম কথা কেউ বলবেন না। বললেও তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তবে একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে, সার্বিকভাবে সমাজের দরিদ্র



ও প্রান্তিক মানুষজনের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় মানোন্নয়ন হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের (ইউএনডিপি) মানবোন্নয়ন সূচকে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের স্থান ১৩৫ তম। অর্থাৎ ১৩৪টি দেশ ভারতের আগে রয়েছে। তাই একথা মানতেই হবে, আমাদের দেশ গরিব ও অতি গরিব মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ। এটা লজ্জার।

সকলের জন্য বিকাশের কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলা হয়। অথচ ১২০ কোটি ভারতবাসীর সকলের জন্য বিকাশের সুফলগুলির সুষম বণ্টন হয়নি। কঠিন বাস্তবের ছবি সেকথাই বলে। দেশের তফশিলভুক্ত জাতি (শিডিউল কাস্ট) তফসিলি জনজাতি (শিডিউল ট্রাইব) সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (ওবিসি), কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, অস্থায়ী ও অসংগঠিত শ্রমিক-সহ শহুরে গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে আর্থিক বিকাশ বা বৃদ্ধির হার যথেষ্টই কম।

চালু ধারণায়, আর্থিক বিকাশ বলতে বোঝায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনও একটি বিশেষ দেশের অর্থনীতির উৎপাদন বৃদ্ধির হার। এই বৃদ্ধি যে সকলের জন্য, সমাজের সকলস্তরে হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল বিচার্য বিষয় হল, এই বিকাশ দরিদ্র-সহায়ক কি না। দরিদ্র এবং হতদরিদ্রদের আয় বাড়ছে কি না, বাড়লে সেই বৃদ্ধির হার কত— সেটাও বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এখনকার বিকাশ কর্মসংস্থানহীন বিকাশ। তাই এই বিকাশ দেশের বৃহত্তর মানুষের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এটা সকলকেই মানতে হবে।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে দেশের বিকাশ বলে দাবি করলে হবে না। দেশের গরিব থেকে গরিবতম মানুষের অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়ায় যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নাম-'ইনক্লুসিভ গ্রোথ'। সবাইকে নিয়ে সবার বিকাশ। এই পথে দারিদ্র হ্রাস, স্বাস্থ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন, সর্বস্তরে শিশুদের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, উচ্চশিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি , নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া মজুরি বৃদ্ধি, পানীয় জল-সহ জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ, আবাসন, পরিচ্ছন্নতা (স্যানিটেশন) বজায় রাখার মতো, আবশ্যক পরিষেবাগুলির প্রসার ও উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে তফসিলভুক্ত জাতি, জনজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হবে। তবেই সকলকে নিয়ে উন্নয়নের পথে, সকলের জন্য বিকাশ-এই কথা বলা যাবে। উন্নয়ন হবে সর্বজনীন। সর্বজনীন উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে।

আমাদের দেশে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের আইন চালু হয়েছে। এটা গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা মডেল হতে পারে। খুবই পরিতাপের বিষয় হল, এই প্রকল্পটিকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। দু'বছর আগে খাদ্য সুরক্ষা আইন তৈরি হলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। অথচ ক্ষুধার দিক থেকে ২০১৪ সালের 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স,' অনুযায়ী-৭৬টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ৫৫তম স্থানে। এই তথ্য অতি লজ্জাজনক নয় কি?

বিশাল এই দেশ। রয়েছে অপরিসীম বৈচিত্র। বিপুল জনসংখ্যা এই দেশে। এদেশে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরের মধ্যে আর্থ সামাজিক দিক থেকে বিরাট অসাম্য লক্ষ করার মতো। সমাজের একটি বড় অংশ এখনও শিক্ষা স্বাস্থ্য, পুষ্টির মান ও লিঙ্গ সমতার দিক থেকে অভিপ্রেত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উন্নয়নের গণতান্ত্রিক ও মানবিক দিশা না থাকায় তা সর্বত্রগামী হয়নি।

এবার পশ্চিমবঙ্গের আলোচনায় আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য। তাই দেশের সার্বিক নীতি যখন গরিব মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে পারছে না, তখন পশ্চিমবঙ্গেও তার প্রভাব থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকলে এটাই হওয়ার কথা। হচ্ছেও তাই। তবে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের একটা অন্য ধারা বিকশিত হচ্ছে। তার রূপকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় একদিকে চলছে, প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিদিনের লড়াই। আর অন্যদিকে চলছে, রাজ্যের সামর্থ্য বাড়িয়ে সর্বস্তরের গরিব মানুষকে সার্বিক উন্নয়ন

কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তিকরণের মহৎ প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে—সর্বজনীন বিকাশ, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সমন্বয় সাধনমূলক কর্মসূচি।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা হল, দরিদ্রের সংখ্যা কম করে দেখিয়ে তথাকথিত আর্থিক বিকাশের ঢক্কানিনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত করা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য হল, বাস্তব সংস্যার সমাধান করতে করতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম মানুষকে খুঁজে বের করে তাঁদের সকলের জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সংবিধান নির্দেশিত পথে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে এই দিশা উন্নয়নের ধারাকে সর্বজনীন করে তুলছে। এটা সামাজিক ন্যায়ের দিশা।

লক্ষ করার বিষয় হল— কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত ভ্রান্ত নীতি ও ভুল পদক্ষেপের কারণে দেশের আঞ্চলিক অসাম্য বেড়েছে। বিকাশের হারের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে বেড়েছে অসাম্য। পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতি বঞ্চনা ও অবহেলার বিরুদ্ধে তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরব হয়েছেন। একদিকে সমগ্র রাজ্যের উন্নয়ন এবং তার পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া সকল শ্রেণি ও স্তরের মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের লক্ষে পশ্চিমবঙ্গে একটি পৃথক ধারা অনুসৃত হচ্ছে। এবার সেই পৃথক ধারাটি নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

২০১১ সালের মে মাসে সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহলের সমস্ত আদিবাসী মানুষের জন্য দু'টাকা কেজি দরে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর জন্য বড় কোনও সমীক্ষার প্রয়োজন হয়নি। ইচ্ছুক সকলেই এই সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এই তালিকায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লোধা-শবর-সহ উত্তরবঙ্গের টোটো সম্প্রদায়কে যুক্ত করা হয়। যুক্ত করা হয় বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের। সব মিলিয়ে ৩ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ এর ফলে উপকৃত হন।

এরই সঙ্গে জঙ্গলমহল-সহ গরিব মানুষ যাতে ১০০ দিনের কাজ বেশি করে পায় তার ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কয়েক হাজার ছেলেমেয়েকে উপার্জনক্ষম করে, উন্নয়নের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, আদিবাসী মেয়েদের হস্টেল নির্মাণ, মেয়েদের সাইকেল প্রদান, স্বনির্ভর গোষ্ঠী স্থাপন ও সেগুলিকে সক্ষম করার উদ্যোগ, আদিবাসী সমাজে খেলাধুলা ও নিজস্ব সংস্কৃতির প্রসার এবং তাদের আত্মপরিচিতির সামগ্রিক সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলের মানুষকে উন্নয়নের সামগ্রিক উদ্যোগে শামিল করা হয়। কেন্দুপাতা তোলার মজুরি বৃদ্ধি করে, কৃষিক্ষেত্রে নানা সুবিধা দিয়ে সকলের জন্য উন্নয়ন নীতিকে কার্যকর করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জঙ্গলমহলের মানুষ অস্ত্র ছেড়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানায়। শান্ত হয় জঙ্গলমহল। অন্য রাজ্যগুলি এ কাজে সফল হয়নি। এরাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘ বাম অপশাসনে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে। এই সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলের উন্নতির জন্য সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে সরকার। শিক্ষার প্রসার, কর্মসংস্থানের বিশেষ সুযোগ বৃদ্ধি ও আর্থিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দারিদ্র হ্রাস, স্বাস্থ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন-সহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শিডিউল কাস্ট ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। আর্থ সামাজিক দিক থেকে তাদের পশ্চাদপদতা দূর করতে বহু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গোটা রাজ্যে ১ কোটিরও বেশি অসংগঠিত শ্রমিক। ইতিমধ্যেই অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ৬০ লক্ষ্য শ্রমিককে নানা আর্থিক সহায়তামূলক প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং ও কাজের পরিবেশের উন্নতিসাধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গোটা দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ গর্ব করার মতো কাজ করেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই কাজ করা হয়েছে।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে উন্নত মানদণ্ডের ভিত্তিতে। এই মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খাদ্যসামগ্রীর জন্য আগে ২২০০ ক্যালোরির মাত্রা ধার্য ছিল। নতুন সরকার ২২০০ থেকে বাড়িয়ে ২৭০০ ক্যালোরির হিসাবে মজুরি নীতি কার্যকর করেছে। চা শ্রমিকদের মজুরি ছিল দৈনিক ৬৭ টাকা। ৪ বছরে সেই মজুরি বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২ টাকা। এতে উপকৃত হয়েছে ৩ লক্ষ শ্রমিক পরিবার। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি ছিল প্রতি হাজার বিড়ি বাঁধার জন্য গড়ে ৪০-৫০ টাকা। সরকারি চাপে এখন সেই মজুরি দাঁড়িয়েছে ১২৬ টাকায়। ২০ লক্ষ পরিবার এর ফলে উপকৃত হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির সংখ্যা সর্বাধিক। ৭২ লক্ষ কৃষক পরিবারের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অনেক উন্নত স্থানে পৌঁছেছে। কৃষিক্ষেত্রে সরকার নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়ায় কৃষকের সার্বিক উন্নয়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিকে কেবল উদরপূর্তির উপায় হিসাবে না দেখে, একে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে ভাবছে সরকার। তাই নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কৃষক বাজার তৈরি তার অন্যতম পদক্ষেপ। উৎপাদনে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের আয় বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। নানাভাবে কৃষকের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। কৃষিতে অবহেলা ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে, একে লাভজনক করে তোলার জন্য সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষি-শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে এ-রাজ্যে। কৃষি ঋণের ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ছোট যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উন্নতমানের বীজসহ সেচের ব্যবস্থা বাড়িয়ে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ঘটছে।

আর্থিক বিকাশের দিক থেকে ক্ষুদ্র-অতিক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্প (হস্তশিল্প) ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এতে কর্মসংস্থান ও গরিব মানুষের আয় বাড়ছে। মানুষের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের আর্থিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া আর্থিকভাবে দুর্বল নর-নারীকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখাচ্ছে। আঞ্চলিক কাঁচামালের ব্যবহার, ব্যাঙ্ক ঋণ, সরকারি ভরতুকি, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এবং তৈরি মালের বাজারিকরণ ইত্যাদি সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষকে সক্ষম-স্বাবলম্বী করে তুলছে সরকার।

'কন্যাশ্রী' প্রকল্প এ রাজ্যের একটি অভিনব অগ্রগামী প্রকল্প। গোটা বিশ্বে সমাদৃত এই প্রকল্প। মেয়েদের স্কুলছুট ও বাল্যবিবাহ রোধে এই প্রকল্প প্রশংসাজনক কাজ করছে। ইতিমধ্যে ২৪ লক্ষেরও বেশি মেয়ে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে। উন্নয়নের অন্যতম

লক্ষ্য নারীর ক্ষমতায়ন। এই প্রকল্প সেই নারী ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে মজবুত করবে। সামাজিক মূল্যবোধের উন্নতি হবে।

সুলভ ঔষধালয়, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য কর্মসূচির এক অতি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত বহু মানুষ সুলভ ঔষধালয়ে যথেষ্ট কমদামে ওষুধ পেয়ে দারুণভাবে উপকৃত। মা ও শিশুর চিকিৎসা, সদ্যোজাত রুগ্‌ণ শিশুদের বিশেষ চিকিৎসা-সহ প্রতিষ্ঠানিক সন্তান প্রসব, মাও শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসার সুযোগ বাড়বে। শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাবে। সুস্থ মা ও সুস্থ শিশু সমাজের সম্পদ। এখন এ র‍্যাজ্যে সুলভ মূল্যে নানারকম মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর কাজ শুরু হয়েছে। এতে উপকৃত হচ্ছেন সামর্থ্যহীন বহু মানুষ। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এবং জেলাস্তরে ও ব্লকস্তরে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।



নির্মল গ্রাম অভিযান পশ্চিমবঙ্গকে গৌরবান্বিত করেছে। প্রতি বাড়িতে শৌচালয় একটা প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে পড়ে। নারীর সম্মান এবং নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধির একটা অন্যতম সোপান নির্মল গ্রাম অভিযান। এক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া-সহ কয়েকটি জেলা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে।

দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যখন কল্যাণমূলক ৫৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৯টি প্রকল্প বন্ধ করে দিচ্ছে এবং বাকি প্রকল্পগুলি ছাঁটকাট করছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু ঠিক উল্টোপথে হাঁটছে। প্রতিটি প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অনেক বেশি গরিব মানুষকে উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পে সারা দেশের জন্য মাত্র ১০০ কোটি টাকা ধার্য করেছে। আর পশ্চিমবঙ্গে কন্যাশ্রী প্রকল্পে ধার্য করা হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা। উন্নয়ন ভাবনার ফারাকটা সহজেই বোঝা যায়।

আইসিডিএস প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ অর্ধেক করেছে সরকার। মিড ডে মিলে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। বরাদ্দ কমানো হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে। ১০০ দিনের কাজ কমিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পাকা ব্যবস্থা করছে কেন্দ্র। এ-সবের ফলে 'সকলের জন্য উন্নয়ন'— এই ধারণাই মার খাবে। পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি মানবোন্নয়নের দিক থেকে আরও পিছিয়ে পড়বে। খাদ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ১০০ দিনের কাজ পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি বাস্তবে কাগজে-কলমে থেকে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন নীতিতে আর্থিক বৈষম্য আরও বাড়বে। একেই গ্রামীণ পরিবারগুলির ৭৫ শতাংশের মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকারও কম, তার উপর কল্যাণমূলক কাজে বায়-বরাদ্দ হ্রাস অনুন্নয়নের মাত্রা বাড়াবে।

পশ্চিমবঙ্গে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে যাঁরা দুর্বল ও পশ্চাৎপদ, তাঁদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াকে জোরদার করা হচ্ছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও আর্থিক দিক থেকে নানা স্তরে থাকা সকলের জন্য উন্নয়ন এই নীতির ভিত্তিতে চলছে পশ্চিমবঙ্গ। দুর্বল ও পশ্চাৎপদ মানুষের উন্নয়নে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। এই পথই হল 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' বা সর্বজনীন বিকাশের পথ।

ক্ষুধার্তের মুখে খাদ্য জোগানো, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে নারীর ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের বিলোপসাধন, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর হার দ্রুত কমিয়ে আনা, মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, প্রসবের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে মায়েদের নিয়ে আসা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, পরিবেশ রক্ষা, জীব বৈচিত্রের অপচয় ও ক্ষতি রোধ করা, পরিস্রুত পানীয় জল ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ-সহ সমস্ত বস্তিবাসীর জীবনের মানোন্নয়ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা-সহ মানুষের অংশীদারিত্বের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা— ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলোই তো উন্নয়নের মূল লক্ষ্য বলে স্বীকৃত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে যে-বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়াই গণতান্ত্রিক ও মানবিক দিক থেকে তথাকথিত আর্থিক বিকাশের গালভরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকল্প। আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে গণতান্ত্রিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ হল যথাযথ উন্নয়নের পথ। যার মূল লক্ষ্য অনুন্নয়নের অভিশপ্ত জীবন থেকে, অন্ধকার দূর করে উন্নয়নের আলোয় মানুষকে নিয়ে আসা।

এই লক্ষ্যই পশ্চাৎপদ মানুষের আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। শক্তিশালী করে গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ গঠনের কাজকে। 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করায়। তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথ মসৃণ করে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়। যথাযথ বিকল্প ব্যবস্থাহীন উন্নয়ন প্রকৃত উন্নয়নের পথ হতে পারে না। উন্নয়নের নামে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করে উন্নয়ন- উদ্বাস্তুর সংখ্যাবৃদ্ধি করা কখনওই প্রকৃত উন্নয়নের পথ নয়। উন্নয়নের নামে জল-জমি জঙ্গল-খনি দখলকে উন্নয়ন বলে না। তা হল দেশ-বিক্রির শামিল। লুঠপাটের অর্থনীতি কখনওই সর্বজনীন উন্নয়নের পথ নয়। বিকাশের নামে বিনাশ কখনওই উন্নয়ন বলে বিবেচিত হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন মডেল ইতিমধ্যেই অনেকের নজর কেড়েছে। এটা আমাদের গর্ব।

নিবন্ধ

ষোড়শ লোকসভা ও তৃণমূল কংগ্রেস

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়



বর্তমান ষোড়শ লোকসভাতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছে সর্বত্র। ষোড়শ লোকসভার যখন প্রথম অধিবেশন শুরু হয়, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন তৃণমূল কংগ্রেস মুখ্য বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে লোকসভাকে উজ্জীবিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে জাতীয় কংগ্রেসের মতো দল যেখানে মাত্র ৪৪টি আসন পেয়েছে, যেখানে ভারতবর্ষের সংসদে কোনও স্বীকৃত বিরোধী দল নেই, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসকে তার ৩৪ জন সাংসদকে নিয়ে বিরোধী দলের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সমস্তরকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

লোকসভা অধিবেশনের আগে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস ভারতবর্ষে ষোড়শ লোকসভাতে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা তৃতীয় হতে পারিনি। কিন্তু আমরা চতুর্থ হয়েছি। তৃতীয় হতে পারতাম, যদি তামিলনাড়ু রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে সমস্ত আসনেই এআইএডিএমকে জয়ী না হত। ডিএমকে যদি পাঁচটি আসনও পেত, তা হলেই তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয় শক্তি হতে পারত। এআইএডিএমকে ৩৭টি আসন পেয়ে সেখানে তৃতীয় হয়েছে। এবং যে মায়াবতীর দল পঞ্চদশ লোকসভাতে তৃতীয় বৃহত্তম দল ছিল, তারা এবার লোকসভাতে শূন্য হয়ে গিয়েছে। সমাজবাদী পার্টি মুলায়ম সিংয়ের নেতৃত্বে, জনতা দল ইউনাইটেড শরদ যাদবের নেতৃত্বে যারা লোকসভাতে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করত, তাদের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। আমরা সে কারণে সারা দেশের বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করার ভূমিকা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক সাফল্যের সঙ্গে সারা দেশের প্রচারমাধ্যমের কাছে আমাদের দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলের বক্তারা যে বক্তব্য সেখানে পেশ করেন, তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায়। সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুগত বসু, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শুভেন্দু অধিকারী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না দে নাগ, সুলতান আহমেদ এবং দীনেশ ত্রিবেদী এঁরা প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু বিষয় উত্থাপন করতেন। সংসদ পরিচালনা করতে গেলে আইন সংক্রান্ত নিয়মাবলি সংক্রান্ত রুলস বুককে অনুসরণ করে সভা কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, সে ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসই লোকসভাকে দিক নির্দেশ করে। এর জন্য স্পিকার মহোদয়া সুমিত্রা মহাজন পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত বোধ করেন না।

ইউপিএ সরকারের আমলেও আমরা জমি অধিগ্রহণ বিলের বিরোধিতা করেছিলাম। তখন মন্ত্রিসভায় ছিলাম। আবার এনডিএ সরকারের আমলেও জমি বিলের বিরোধিতা করেছি। কংগ্রেস এবং বিজেপি একসঙ্গে ড. মনেমোহন সিং সরকারের আনা জমি বিলের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিল। সেখানে বিরোধিতায় ভোট পড়েছিল ১৯। আর আমাদের সংসদ সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতবর্ষে একমাত্র দল পরিপূর্ণভাবে যারা একটা ঘোষিত নীতি নিয়ে জমি বিলের বিরোধিতা থেকে একচুলও নড়ে বসেনি। এবং কৃষকের জমি বলপূর্বক অধিগ্রহণ করা যাবে না, এই নীতিতে বরাবর অবিচল থেকেছে। আবার যখন দেশের স্বার্থে জিএসটি বিল উপস্থাপিত করা হয়েছে, তখন রাজ্যের স্বার্থে অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ



উপকৃত হতে পারে সে কথা মাথায় রেখে এই বিলকে সমর্থন জানাতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করিনি। আবার আমরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিচালনায় ফেডারেল স্ট্রাকচারের পক্ষপাতী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি।

ভারতবর্ষ হচ্ছে বহু রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্র। এখানে কেন্দ্রকে রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করছি পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ভয়ানকভাবে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশের স্বাধীনতার পর থেকেই পূর্বাঞ্চল উপেক্ষিত। সেই উপেক্ষা আজও অব্যাহত আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। আমরা এটা হতে দেব না। বিহারের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হচ্ছে। কারণ বিহারে নির্বাচন আসছে। আমরা তার বিরোধী নই। বিহারও পূর্বাঞ্চলেরই একটি রাজ্য। কিন্তু এত বড় ভয়ানক বন্যা। ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি ঋণের বোঝা বাংলার সরকারের কাঁধে। তাদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা

করতে কীসের এত দ্বিধা, এত কুণ্ঠা। কেন এত বড় বন্যার পরও এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা এসে পৌঁছল না এর জবাব দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। আবার যখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন পড়ছে, তখন? বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সরকারের সীমান্তচুক্তির জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেখানে উপস্থিত না করাতে পারলে এই চুক্তি সম্ভব হবে না, এ কথা কেন্দ্র অনুভব করেছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুঝিয়ে দিয়েছেন ক্ষুদ্র রাজনীতির সীমানা এবং গণ্ডিকে অতিক্রম করে বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেখানে তিনি শুধু উপস্থিত ছিলেন তাই নয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বারবার তাঁকে স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন।

লোকসভার এই শীতকালীন অধিবেশনে আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করেছি, একটা দিনের জন্যও লোকসভার অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে হতে পারল না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কিছু দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ বিরোধীরা এনেছিলেন। সেই আলোচনা যদি লোকসভাতে প্রথম দিনই করে দেওয়া যেত, তা হলে নিশ্চয়ই এই পরিবেশের সৃষ্টি হত না। সে আলোচনা হল। কিন্তু বিলম্বে হল। এর মাধ্যমে এটাই বোঝা গেল বর্তমান শাসক দলের লোকসভা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে দক্ষতা থাকা উচিত, সেই দক্ষতার ছাপ তারা রাখতে পারেনি। এবং সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রায় একমাসব্যাপী পরিচালিত লোকসভার অধিবেশনের মধ্যে তিনদিনও উপস্থিত ছিলেন না। বিদেশ থেকে কালো টাকা আনার প্রশ্নে আমরা এ কথা বারবার বলেছিলাম, লোকসভার বাইরে প্রধান ফটকের সামনে গান্ধীমূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে বারবার করে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। স্লোগান তুলেছি— 'কালা ধন বাপস লাও।' আমরা বলেছি, কৃষককে বঞ্চনা করা যাবে না। লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদিজি ঘোষণা করেছিলেন যে, প্যান নম্বর আর ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকলে, সব অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ করে টাকা তিনি জমা করিয়ে দেবেন। পনেরো লক্ষ টাকা দূরের কথা, একটা টাকা পর্যন্তও কোনও অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত জমা পড়েনি। মানুষকে এইভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। কালো টাকার যাঁরা মালিক, কালো টাকার পাহাড়ে যাঁরা বসে আছেন, আজকে তাঁরাই ভারত সরকার পরিচালনা করছেন।

অপরদিকে কংগ্রেসের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় লোকসভাকে স্থগিত করে দেওয়ার যে প্রয়াস এবার চলেছে, তা জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসের পঁচিশজন সাংসদকে লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষা পাঁচদিনের জন্য সাসপেন্ড করেছিলেন। সেই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে থাকার ফলে আমি সেই ঘটনা তাঁকে জানানোমাত্রই তিনি বলেন, লোকসভাতে গিয়ে বিরোধী দলের ঐক্য যাতে বিনষ্ট না হয়, তার দিকে নজর রেখে এই সাসপেনশনের বিরুদ্ধে আপনি আওয়াজ তুলুন। আমি মাননীয়া স্পিকারের উদ্দেশে বলেছিলাম, একসঙ্গে পঁচিশজন সাংসদকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া সমীচীন সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। স্পিকার আমাকে তাঁর আসন থেকে বলেন, আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছি। এঁরা নির্ধারিত কর্মসূচি মেনে লোকসভা চলতে দিতে যদি রাজি থাকেন, তা হলে আমি সাসপেনশন প্রত্যাহার করব। আমি অন রেকর্ড লোকসভায় দাঁড়িয়ে স্পিকারকে বলি যে, আমি আমার দলের দায়িত্ব নিতে পারি। কংগ্রেসের দায়িত্ব নিতে পারি না। আমাদের সাংসদরা বিরোধী দলের ঐক্যকে বজায় রাখতে পাঁচদিন লোকসভার অধিবেশনে যোগদান করেননি। পাঁচদিনের বেতন পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। উপরন্তু কংগ্রেস যখন গান্ধী মূর্তির সামনে ধরনা দিয়েছে, তখন রাহুল গান্ধী এবং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আমার কাছে সমর্থন চান। আমি তৎক্ষণাৎ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি। তিনি আমাকে অনুমতি দেন যে, "হ্যাঁ, আপনার নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধি দল ওদের ধরনায় গিয়ে অংশগ্রহণ করে নৈতিক সমর্থন দিয়ে আসুন।" লোকসভা চলাকালীন প্রতিনিয়ত সোনিয়া গান্ধী আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। আবার সরকারের পক্ষ থেকেও মাঝেমধ্যে আমাদের সমর্থন চাওয়া হয় সরকারি বিলকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমরা আমাদের ভূমিকা অকপটে সব পক্ষকেই জানিয়ে দিই যে, তৃণমূল কংগ্রেস একটি এমন দল যার নিজস্ব মতাদর্শ আছে। যার নিজস্ব দর্শন আছে। যার নিজস্ব অর্থনৈতিক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে। তার পটভূমিতেই আমরা সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করি। জনস্বার্থ-বিরোধী কোনও সিদ্ধান্তকে আমরা অনুমোদন দেব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্যের তালিকার মধ্যে নিয়ে আসা। সেই পথ ধরে তিনি এগোচ্ছেন। নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া সমস্ত ঘোষণা তিনি তিন বছরের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ পূর্ণ করেছেন। বিরোধী দলগুলির প্রত্যাশিত মর্যাদা যেখানে যেভাবে দেওয়া দরকার, এ রাজ্যে তিনি তা দিয়েছেন। কিন্তু লোকসভাতে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি না। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রথম কনস্টিটিউশন ক্লাবে বিশাল হল ঘর নিয়ে আমাদের নকল লোকসভার অধিবেশন করতে হয়েছিল। একদিকে সরকার পক্ষ, একদিকে বিরোধী পক্ষ। সরকার পক্ষে আমাদের তিনজন রাজ্যসভার সাংসদ ছাড়াও দিল্লির একটি স্থানীয় স্কুলের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিম দিয়ে সদস্য করে বসানো হয়েছিল। বিরোধী দলে আমরা ছিলাম। স্পিকারের আসন, সাংবাদিকদের বসার ব্যবস্থা, সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ, মার্শালের ভূমিকা— সব কিছু সুন্দরভাবে সেদিন তুলে ধরা হয়েছিল। আমরা দু'টো বিষয় নিয়ে সেদিন আলোচনা করি। একটা জমি বিল, আর একটা কো-অপারেটিভ ফেডারালিজম— এর উপর আলোচনা হয়। জিরো আওয়ার হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। এবং সমস্ত অধিবেশনটি এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে, এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুধু তাঁর সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তাই নয়, আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, "এত ভাল কর্মসূচি আপনারা করেছেন যে, আমি আপনাদের একটা আলাদা করে রাতে সুন্দর করে খাইয়ে দেব।" আমরা এতে অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুশি হয়েছিলাম।

সবশেষে বলি তৃণমূল কংগ্রেস আজকে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত, দক্ষ, চিন্তাশীল রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দল হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করতে পেরেছে। লোকসভার অভ্যন্তরে তৃণমূল কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কি সরকার পক্ষ, কি বিরোধী পক্ষ তারা কোনও বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও যেখানে সক্ষম হয় না, সেখানে আমরা এই বিশ্বাসই রাখি যে, আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিদারুণ প্রচেষ্টায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মা-মাটি-মানুষের সরকারকে পশ্চিমবঙ্গে মানুষের সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তাঁর চিন্তাধারার প্রতিফলন লোকসভায় আমরা যেভাবে প্রতিফলিত করেছি তাতে দেশের মানুষ আগামিদিনে আমাদের প্রতি আরও আস্থা, আরও বিশ্বাস রাখবে। এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাংলার কণ্ঠস্বরকে কোনও সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়েই হোক, কোনওরকম ভুয়া প্রতিশ্রুতির কথা বলেই হোক, আমাদের পথ থেকে আমাদের কেউ হঠাতে সক্ষম হবে না। আগামিদিন তৃণমূল কংগ্রেস আঞ্চলিক দলের সীমানা অতিক্রম করে কোনও একদিন জাতীয় দলে রূপান্তরিত হবে এই বিশ্বাস আমি রাখি।

নিবন্ধ

নগরোন্নয়নে নতুন দিশা বদলে দিয়েছে বাংলাকে

ফিরহাদ হাকিম



সদিচ্ছা থাকলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যে মানুষের জন্য অজস্র উন্নয়ন করা যায়, পরিষেবা দেওয়া যায়, বদলে দেওয়া যায় নগরোন্নয়নের ভাবনা-চিন্তা। তা গত চার বছরে ক্রমাগত প্রমাণ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যে কোনও দেশ বা রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম ভরকেন্দ্র অবশ্যই সেখানকার নগর। নগরায়ণ যত বিস্তৃত হয় ততই সেই জনপদের মানুষের সমৃদ্ধি হয়। পরিবেশ তথা বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন ঘটে। বস্তুত এই কারণেই শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নের পাশাপাশি পিছিয়ে থাকা জনজাতির সার্বিক মঙ্গলের সঙ্গে নগরায়ণের বিষয়কে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, যে কোনও দেশ বা রাজ্যকে মানুষ বিচার করে তার নগর কতটা উন্নত হয়েছে, তা দেখেই। আর সেই কারণে কলকাতা বিমানবন্দরকে আধুনিকতম করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সওয়াল করা মুখ্যমন্ত্রী বদলে দিয়েছেন গোটা নিউ টাউন। তৈরি হয়েছে বিশ্বমানের ইকো পার্ক, নজরুল তীর্থ, রবীন্দ্র তীর্থ এবং অবশ্যই ওয়াক্স মিউজিয়াম। এখন ভিনরাজ্যের তো বটেই বিদেশ থেকেও হাজার হাজার পর্যটক আসছেন এই ইকো পার্কে। প্রজাপতি পার্ক, গোলাপবাগ থেকে শুরু করে অজস্র সবুজের সমারোহ ঘটেছে। একটু দূরেই গড়ে উঠছে এশিয়ার অন্যতম ফিনান্সিয়াল হাব। সেখানে ইতিমধ্যে দেশের তো বটেই বিদেশেরও বহু নামী বাণিজ্যিক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'ফ্লোর বুক' করেছে। জাতীয় স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে গবেষণাধর্মী নানা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে নিউ টাউনে নিজেদের কেন্দ্র তৈরি করছে। আরও বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থাও রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য অঙ্গীকার করেছে। সব মিলিয়ে দ্রুত গড়ে উঠছে একেবারে ঝাঁ চকচকে নতুন জনপদের পাশাপাশি কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক আধুনিক শহর। পাশের সল্টলেকও আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিকাঠামো এবং পরিষেবার দিক থেকে উন্নত হয়েছে গত চার বছরে। পানীয় জলের যে সমস্যা ছিল তা দ্রুত মিটতে চলেছে। নগরায়ণকেন্দ্রিক উন্নয়নের আকর্ষণে মানুষের বিপুল চাহিদা মেটাতে সল্টলেক ও নিউ টাউনের সঙ্গে এবার রাজারহাটকে মিশিয়ে দিয়ে কর্পোরেশন তৈরি করে উন্নয়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে রাজারহাটের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের সল্টলেককে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার।

গত চার বছরে নীতিগত স্তরে নগরোন্নয়ন বিভাগ নানাভাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) আইন, ১৯৭৯-কে কিছু সংশোধন ঘটিয়ে একটি পরিবেশ বান্ধব পর্যটন পর্ষদ তৈরি করা হয়েছে। জমি হস্তান্তরের নীতি ও পদ্ধতি স্বচ্ছ এবং সরল করা হয়েছে। জি.আর.আই.পি.এস.-এর মাধ্যমে ই-পেমেন্ট চালু করার ফলে প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব হ্রাস পেয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ জনকৃত্যক আইন, ২০১৩-এর সংস্থানগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। নগরোন্নয়ন বিভাগ একটি নতুন শহরায়ণ নীতি গঠন করেছে, যারা দ্বারা বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন শহর এবং বৃদ্ধি কেন্দ্র তৈরি হবে। সেই সমস্ত শহরগুলিতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবে। মানুষকে সুবিধা দিতে তারাপীঠ-রামপুরহাট এবং ফুরফুরা শরিফে দু'টি উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করা হয়েছে। দু'টি ক্ষেত্রেই তীর্থযাত্রীদের নানারকম পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে।

বিমানবন্দর থেকে একটু এগিয়ে এলে মানুষের চোখ পড়বে বাইপাসে পরমা আইল্যান্ড এবং অবশ্যই দু'পাশে বিস্তৃত হয়ে যাওয়া ফ্লাইওভার। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে যে পরিমাণ অর্থ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত দেয়নি। কিন্তু অন্য অনেক প্রকল্পের মতো এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আর্থিক দায়ভার বহন করে উড়ালপুলটি সম্পূর্ণ করে কলকাতার ডানায় আরও গতি এনে দিয়েছে। মহালয়ার দিন উদ্বোধন করে মানুষের কাছে এই বিশাল উড়ালপুলকে ব্যবহারের জন্য চালু করেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। রবীন্দ্রসদন থেকে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট পর্যন্ত চলা ফ্লাইওভারটি এতদিন মধ্য তথা উত্তর কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু পরিবর্তনের পর নতুন সরকার এসেই ব্রিজটির একটি নতুন পথ চালু করে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা রেড রোড থেকে আসা গাড়িগুলি শিয়ালদহ-শ্যামবাজারে একমুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারছে। গার্ডেনরিচ, বজবজ-মহেশতলা এলাকায় নতুন ফ্লাইওভারের কাজ শুরু হয়েছে। শহরকে বিস্তৃত করতে একদিকে যেমন কামালগাজিতে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তেমনি ইএম বাইপাসকে সম্প্রসারিত করে সূর্যপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। উল্টোদিকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েকে প্রশস্ত এবং আধুনিকীকরণ করায় গতি এসেছে উত্তর শহরতলিতে। বারুইপুর, বারাসত, মধ্যমগ্রাম থেকে শুরু করে হুগলির চন্দননগর পর্যন্ত আজ বিস্তৃত হয়েছে কলকাতার নগরজীবনের ছোঁয়া। মানুষ আধুনিক নাগরিক জীবনের পরিষেবা পাচ্ছেন কেএমডিএ এলাকাধীন বাঁশবেড়িয়া থেকে বারুইপুর পর্যন্ত। গঙ্গা থেকে জল তুলে পরিশোধন করে কলকাতার পাশাপাশি হুগলি জেলাতেও বাড়িবাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে রাজ্য নগরোন্নয়ন দফতর।

কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, হলদিয়াতেও দ্রুত নাগরিক জীবনের নানা পরিকাঠামো ও পরিষেবা চালু করা হয়েছে গত চার বছরে। এর পাশাপাশি জেলার মানুষের চাহিদা মেটাতে আরও ছয়টি 'থিম সিটি' গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এগুলি হল, বোলপুর, কল্যাণী, ডুমুরজলা, বারুইপুর, ডাবগ্রাম ও আসানসোল। প্রত্যেকটিতে ৫০ একর জমিতে আধুনিক মিনিশহর গড়ে উঠছে। এখানে ৫০ শতাংশ জমিতে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বাসস্থান রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আসলে এটাই আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। সমস্ত ক্ষেত্রেই গরিব ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের কাজে সবাই ব্যস্ত রয়েছে।

একইসঙ্গে, ভারসাম্যযুক্ত ও সমষ্টিগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার কলকাতার কেএমডিএ এলাকার পাশাপাশি আরও দশটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায়



নগরায়ণকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এগুলি হল, আসানাসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বর্ধমান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মেদিনীপুর-খড়্গপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জয়গাঁও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নিউ টাউন-কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও গঙ্গসাগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি, হলদিয়া, দিঘা-শঙ্করপুর এবং অবশ্যই নিউ টাউন-কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গত চারবছরে নজিরবিহীন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণ করেছে। বদলে দিয়েছে নিজেদের এলাকার জনপদ ও পরিবেশ। কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন মেনে প্রতিশ্রুতিমতো আগের সমস্ত অর্থ দিত তাহলে, এই দশটি এলাকাতেও বিপুল উন্নয়নযজ্ঞ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত। কিন্তু কেন্দ্রের ইউপিএ-২ সরকার এবং বর্তমানের এনডিএ সরকার সার্বিকভাবে রাজ্য সরকারের পাওনা টাকা না দেওয়ায় নগরায়ণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে মাঝেমাঝেই থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

একইসঙ্গে শহরের অভ্যন্তরেও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন এবং স্থানান্তরকরণের নীতিও বর্তমান সরকার কাছে অত্যন্ত অগ্রাধিকারের বিষয়। তাই জেএনইউআরএম প্রকল্পে শহরের গরিব মানুষদের মৌলিক পরিষেবা দিতে বাসস্থান নীতি গড়ে তোলার যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা কেন্দ্রের মাঝপথে সরে দাঁড়ানো সত্ত্বেও অনেকটাই কার্যকর করা হয়েছে। কেন্দ্রের বর্তমান সরকার পূর্বতন সরকারের চালু করা জেএনইউআরএম প্রকল্প বাতিল করে প্রায় এক বছর পর এখন 'আমরুত' চালু করেছে। আগে জেএনইউআরএম প্রকল্পে ফ্লাই ওভার, ব্রিজ থেকে শুরু করে গরিব মানুষের পুনর্বাসন প্রকল্পের মতো অজস্র জনমুখী কাজ করা যেত। কিন্তু বর্তমান প্রকল্পের আওতায় আগের অধিকাংশ প্রকল্প করা যাবে না। শুধুমাত্র পানীয় জলের কিছু প্রকল্প করা যাবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। তাও ফের নতুন করে নকশা এবং প্রস্তাবনা করে পাঠাতে হবে কেন্দ্রের কাছে। অর্থাৎ একবার প্রচুর সময় এবং লোকবল নিয়োগ করে প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ করে দিল্লিতে পাঠানোর পর ফের নতুনভাবে বিষয়টি নিয়ে বসতে হবে। সময়, অর্থ যেমন ব্যয় হবে। সঙ্গে মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়বে। এটাই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের 'আচ্ছে দিন'-এর নমুনা।

আমাদের সরকার শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক নগরায়ণ করে থামছে না। আমরা পরিকল্পনা করেছি, বিভিন্ন জেলার কৃষকরাও এবার থেকে নগরজীবনের আস্বাদ পাবেন। পরিকল্পনা হয়েছে, বিভিন্ন ছোট ছোট আবাসন হবে। যেখানে কার পার্কিংয়ে গাড়ির পাশাপাশি ট্রাক্টরও থাকবে। সকালে উঠে কৃষক ট্রাক্টর নিয়ে মাঠে যাবে। চাষবাস করে বিকেলে বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া-দাওয়া শেষে সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে সপরিবারে বেরিয়ে পড়বে। কাছের সিনেমা হল, শপিং মলে যেমন যাবে, তেমনি তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধাযুক্ত স্কুল থাকবে। এখানকার স্কুলে পড়াশোনার মান হবে কলকাতার নামী স্কুলের মতোই। বলতে দ্বিধা নেই, ইউরোপ আমেরিকার কৃষকরা যেমন ধাঁচে জীবন কাটান তেমন ব্যবস্থা চালুর এই প্রস্তাবনায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক সাড়া মিলেছে। আর সেই কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কৃষক মাণ্ডি চালু করেছেন সেখানে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে বাংলার কৃষকরা।

শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ পরস্পরের পরিপূরক। কারণ যে-কোনও দেশের জিডিপি'র ৭৫ শতাংশই আসে নগরকেন্দ্রিক ব্যবস্থা থেকে। এই যে ধরুন, একটি বড় আবাসন যদি তৈরি হয়, অথবা যদি একটা বড় উড়াল পুল নির্মাণ হয় তবে সেখানে প্রচুর পরিমাণে রড-সিমেন্ট-বালি-পাথর লাগে। ব্যবহার হয় প্রচুর ইট

মনে রাখতে হবে, বাম সরকারের ঋণের বোঝা টানার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক বঞ্চনা উপেক্ষা করে একক প্রচেষ্টায় গত চার বছরে রাজ্য নগরকেন্দ্রিক উন্নয়নে যে বিপুল সাফল্য পেয়েছে তা আজ মানুষের চোখের সামনে। শহরের পরিষেবাকে গ্রামে পৌঁছে দিতে পেরে মা-মাটি-মানুষের সরকার আজ সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং একই সঙ্গে গর্বিতও।

এবং কাঠের সামগ্রী। এগুলি তৈরি এবং জোগান দিতে যেমন প্রচুর কর্মসংস্থান হয় তেমনি বিপুল পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য হয়। এগুলি রং করার জন্যও প্রচুর মানুষের প্রয়োজন হয়। স্বভাবতই নগর যত সম্প্রসারিত হয় ততই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, বাড়ে কর্মসংস্থান। অর্থনীতির একটা বড় অংশ যে নগর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় তা বলাই বাহুল্য। এই ধরুন, হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যালে যে কয়েকশো ধরনের পণ্য উৎপাদন হয় তার একটা বড় অংশের ক্রেতা কলকাতায় বসবাস করে। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে যে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হয় তারও ক্রেতা নগরজীবনে বসবাস করে। স্বভাবতই নগরায়ণের শ্রীবৃদ্ধি না ঘটলে শিল্পায়নে প্রভাব পড়তে বাধ্য। রাজ্য সরকারের একজন সদস্য হিসাবে চার বছর পর এটুকু বলতে পারি, বাম জমানায় ৩০ বছরে যে কাজ হয়নি এই সময়ের তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। আসলে বাম জমানায় যে কোনও পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবনার জন্য অনেক বেশি সময় লেগে যেত রাজনৈতিক আবর্তে। এই ধরুন পরমা ফ্লাই ওভার করার জন্য পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটি ঘুরে সরকারি দফতরে আসতেই কয়েক বছর লেগে যেত। তারপর সরকারের প্রস্তাব তৈরি হয়ে শরিক দলের অনুমতি নিয়ে বাস্তবায়িত করতে আরও কয়েক বছর লাগত। স্বভাবতই সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কোনও পরিকল্পনা নেওয়ার পরই নজিরবিহীন কম সময়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

নগরায়ণ দফতরের পাশাপাশি পুর দফতরেও গত চার বছরে আমরা অনেক বেশি কাজ করেছি। সমস্ত পুরসভাকেই সমানভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আবার যেসমস্ত পুর এলাকা একটু বেশি পিছিয়ে ছিল সেখানে বাড়তি নজর দিয়ে প্রকল্পভিত্তিক বাড়তি বরাদ্দ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলার পুরসভাগুলিতে রাস্তাঘাট ও নিকাশির পাশাপাশি পানীয় জল এবং আলোর মাধ্যমে সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছে। আসলে আমরা চেয়েছি কোথাও কোনও অন্ধকার থাকবে না। মানুষের কাছে উন্নয়নের আলো পৌঁছে যাবে অতি দ্রুত। আর সেই কারণে বাম জমানায় পৌর এলাকায় যেভাবে মানুষের জীবনযাত্রার অবনমন ঘটেছিল তার উন্নয়নে অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। পানীয় জল থেকে বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা, গৃহনির্মাণ এবং যানবাহন ব্যবস্থা থেকে সৌন্দর্যায়ন ও সুবজায়ন প্রকল্প মানুষের মতামত নিয়ে কার্যকর করা হয়েছে। জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ দূরীকরণে কলকাতার সমস্ত ওয়ার্ডে কম্প্যাক্টর চালু হয়েছে। এবার বিভিন্ন জেলার পুরসভাগুলিতেও চালু হচ্ছে। এছাড়া স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা, সুসংহত স্বল্পমূল্যের শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্প, বেসিক সার্ভিসেস ফর আরবান পুওর, ইন্টিগ্রেটেড হাউজিং অ্যান্ড স্ল্যাম ডেভলপমেন্ট কর্মসূচি, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প ও জননী সুরক্ষা যোজনার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা কন্যাশ্রী প্রকল্প সমস্ত পুরসভার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি, নাগরিক কর্মসংস্থান প্রকল্প ও দরিদ্র শহরবাসীর জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়ে গোটা দেশে নজির সৃষ্টি করেছে।

মনে রাখতে হবে, বাম সরকারের ঋণের বোঝা টানার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক বঞ্চনা উপেক্ষা করে একক প্রচেষ্টায় গত চার বছরে রাজ্য নগরকেন্দ্রিক উন্নয়নে যে বিপুল সাফল্য পেয়েছে তা আজ মানুষের চোখের সামনে। শহরের পরিষেবাকে গ্রামে পৌঁছে দিতে পেরে মা-মাটি-মানুষের সরকার আজ সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং একই সঙ্গে গর্বিতও। আর এই গর্বের অংশীদার শুধুমাত্র আমরা সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নই, সঙ্গে রাজ্যের সাত কোটি মানুষ। আর মানুষকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করার এই মন্ত্র শিখিয়েছেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং নির্দেশ সবসময় মাথার উপর ছাতার মতো ছিল বলেই গত চার বছরে রাজ্যে এত বিপুল কর্মযজ্ঞ এত দ্রুত সম্পূর্ণ করতে পেরেছি।

নিবন্ধ

মমতার মমত্বের জোয়ার যাত্রা-টেলি শিল্পে

অরূপ বিশ্বাস



ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছে। কবে ঠাকুর বলেছিলেন, থ্যাটারে লোকশিক্ষে হয়। ১৮৮৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে প্রহ্লাদ চরিত্রায়ণ দেখতে গিয়েছিলেন ঠাকুর। গিরিশ ঘোষ কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "মনে হয় থিয়েটারগুলো আর করা কেন।"

ঠাকুর উত্তরে যা বললেন, তা ইতিহাস। গিরিশ ঘোষকে উদ্দেশ করেই বললেন, "না না ও থাক। ওতে লোকশিক্ষা হবে।"

যাত্রা তখন থেকেই মানুষের আরও কাছের। কবে বাংলায় যাত্রাপালা শুরু হয়েছিল, সে নিয়ে তথ্য খোঁজা হয়েছে। আরও হবে। ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের মতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় প্রথম পালাগানের সৃষ্টি। সেই সময়ে পৌরাণিক নায়কই যাত্রায় প্রধান বর্ণিত হতেন। পৌরাণিক গল্পই বলতে গেলে যাত্রার ভিত। তারপর সময়ের প্রয়োজনে যাত্রার আঙ্গিক বদলেছে। এসেছে ঐতিহাসিক পালা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে গুরুতর বিভেদ নাই। যাত্রার লোকপ্রিয় পথে নাট্যমুক্তির কথা ভেবেছিলেন শিশির ভাদুড়ী। ইংরেজের বিরোধিতায় যাত্রাই অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। সমাজ বদলেও যাত্রায় বদল হয়েছে। তেমনই সমাজের বদল হয়েছে কোনওসময় যাত্রার হাত ধরেও। পরিবর্তন তো সমাজের নিয়ম।

বাংলার নাট্যজগতেও বড় পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু খুব বড় পরিবর্তন হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক মহান নেত্রীর আবির্ভাবই পাল্টে দিয়েছে জগৎ। তাই আজ বড়াই করে বলতে পারি, হ্যাঁ এখন থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়। থিয়েটারের জায়গা নিয়েছে টেলিভিশন আর যাত্রা। এই যাত্রাই কতটা অবহেলিত ছিল। অবহেলিত ছিল দূর-দর্শন মাধ্যমের ছোট সাপোর্ট স্টাফরাও।

যাত্রা বা টেলিভিশনের মতো সাধারণ মানুষের কাছে কোনও মাধ্যম সহজে পৌঁছে যেতে পারে না। এখানেই এই দুই মাধ্যমের সার্থকতা। মানুষের কাছে সঠিক বার্তা তুলে ধরাও সরকারের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব আমরা ভুলতে পারি না।

টেলি শিল্পে নিবিড় যোগাযোগ

টেলিভিশন এমন একটা মাধ্যম, যে মাধ্যমের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া যায় সহজেই। সেই মাধ্যমকে ঘিরে মানুষ স্বপ্ন দেখে আর সেই মাধ্যমের রেশ ধরেই সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে। ছোট মাধ্যম বললে সেই গণমাধ্যমের ক্ষমতা বা 'কৃতিত্ব'কে খাটো করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার তৈরির পরই আমরা টেলি মাধ্যমকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিই। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, টেলি মাধ্যমের কোনও কলাকুশলী যেন অবহেলিত না থাকেন। আগে কী হয়েছে, তার ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। কিন্তু এটা না বললে সত্যকে অস্বীকার করা হবে যে, গত প্রায় তিন দশক ধরে টেলিভিশন ঘরে ঘরে যতটা পৌঁছেছে, ততটাই অবহেলিত হয়ে পড়েছেন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্তরা। তাঁরা নানাভাবে বঞ্চিতদের দলে পড়ে গিয়েছেন।

এই বঞ্চনা, অবহেলার প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর নাম এসে যায়। বরাবর তিনি বঞ্চিতদের পাশে থেকেছেন। এবারও সেটাই করলেন। তৈরি করা হল টেলি অ্যাকাডেমি। টেলিভিশন শিল্পের উন্নয়ন ও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যেই ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ টেলি অ্যাকাডেমি গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ টেলি অ্যাকাডেমিকে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে নথিভুক্তকরণ করা হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্কের গোখেল রোড শাখায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খোলা হয়েছে। এগুলি সবই স্বচ্ছতার নজির।

এবার যদি ওই অ্যাকাডেমিকে ঘিরে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলি, তবে বহু দিক খুলে যাবে। আমাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। সোজা কথা সোজাভাবে বলতে হয়। সেই সোজা কথা বলতে গেলেই বলা যায়, টেলিভিশন শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন চাই। প্রথমেই দেখেছি, নির্দিষ্ট কেন্দ্র দরকার। তাই টেলি অ্যাকাডেমির উদ্যোগে টেলিভিশন শিল্পের পরিকাঠামো ও উন্নয়নের জন্য প্রায় দশ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক ও সুবিধাসম্পন্ন হবে এই কেন্দ্র। পরবর্তী পর্যায়ে এখানে টেলিভিশন শিল্পের শ্যুটিং ফ্লোর ও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। অ্যাকাডেমির জন্য হয়েছে পৃথক বাজেট হেডও। টেলিভিশন শিল্পের বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে একটি করে সভা হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তই অন্তত ২৩টি সভা হয়েছে। টেলিভিশন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু শিল্পী, কলাকুশলী ও অন্যান্য কর্মীদের স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৯২৮ পরিবারকে এই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিদিন এই সংখ্যা বাড়ছে। আমাদের লক্ষ্য, কোনও পরিবার যেন স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের আওতা থেকে বাদ না যায়। প্রত্যেক পরিবারের চারজন সদস্য এই বিমার সুবিধা পেয়ে থাকেন। সুবিধা পাচ্ছেন উপকৃত, তাঁর স্বামী বা স্ত্রী এবং দু'জন নির্ভরশীল ব্যক্তি। ৬০ বছর পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারছেন তাঁরা। টেলিভিশন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সম্বলিত ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষে গত ১২ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সল্টলেক স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ টেলি অ্যাকাডেমির উদ্যোগে 'বাংলা ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ টেলি অ্যাকাডেমি গঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর টেলিভিশন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলী, প্রযোজক, পরিচালক ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে টেলিসম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বছর ৯৫ জনকে ও গত বছর ৯৩ জনকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর টেলিসম্মান প্রদানের পর পশ্চিমবঙ্গ টেলিসম্মান প্রদানের পর অ্যাকাডেমির উদ্যোগে একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত মনোগ্রাহী হওয়ায় গত দু'বছর বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।



যাত্রা শিল্পে মঙ্গল-বার্তা

এবার আসি শক্তিশালী গণমাধ্যম যাত্রা শিল্প প্রসঙ্গে। যাত্রা শিল্প এমন মাধ্যম যার সঙ্গে গ্রাম বাংলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাত্রা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন গ্রাম ও শহরের হাজার হাজার মানুষ। বাংলার সুপ্রাচীন মাধ্যম হল যাত্রা। এই মাধ্যমকে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ও আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে এর সঙ্গে যুক্ত করতেই কাজ করে চলেছে যাত্রা অ্যাকাডেমি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে যে অচলায়তন ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে, সেই কাজে বড় সঙ্গী যাত্রা অ্যাকাডেমি।

দেখেছি, বাগবাজারের ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চ দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত ছিল। এখানেই যাত্রা অ্যাকাডেমির অফিস। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে এই মঞ্চটির আমূল সংস্কার করা হয়েছে। নবরূপে সুসজ্জিত হয়েছে এই যাত্রামঞ্চ। তৈরি হয়েছে সভাকক্ষ। অ্যাকাডেমির সদস্যদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শকাসনের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

গ্রাম বাংলা যাত্রার আঁতুড়ঘর। অথচ যাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হত কলকাতায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম এই যাত্রা উৎসবকে ছড়িয়ে দিলেন। বারাসতের কাছাড়ি ময়দানে তিন বছর আগেই যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৩ সালে মোট ২৪টি পালা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছর থেকেই প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক শান্তিগোপাল পাল ও মহানায়ক তপনকুমারের নামে 'শান্তিগোপাল ও তপনকুমার পুরস্কার' প্রদানের সূচনা হয়েছে। কিংবদন্তি বেলা সরকার ও মাখনলাল নট্টকে প্রথমবার ওই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার মূল্য এক লক্ষ টাকা। যাত্রা শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য নির্মল মুখোপাধ্যায়কে 'বীণা দাশগুপ্তা পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কার মূল্য ২৫ হাজার টাকা। পাশাপাশি শান্তিগোপালের স্ত্রী চৈতালি পালকে ও যাত্রা শিল্পী ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রী রুক্মিণী ভট্টাচার্যকে মাসিক পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ১২০ জন দুঃস্থ যাত্রা শিল্পী ও কলাকুশলীদের সাত হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালে শান্তিগোপাল ও তপনকুমার পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল অসীম কুমার, ইন্দ্র লাহিড়ী, বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায়কে। আর, ২০১৫ সালে ১৬ জন প্রবীণ ও নবীন শিল্পীর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালে বীণা দাশগুপ্তা স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন তরুণ কুমার, ২০১৫ সালে মীনাক্ষী দে।

আয়োজকদের যাত্রানুষ্ঠান আয়োজন করতে অনুমোদন খরচ মাত্র ১৯৫০ টাকা ধার্য করে সরকারি আদেশনামা জারি করা হয়। এর ফলে যাত্রা সংস্থা ও আয়োজকরা ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছেন। যাত্রানুষ্ঠান করতে যাতায়াতের পথে যাত্রা সংস্থার বিভিন্ন যানবাহনকে নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হত। অ্যাকাডেমির তরফ থেকে স্টিকার প্রদানের মাধ্যমে যাত্রা সংস্থার যানবাহনগুলির যাত্রাপথ সুগম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৩ সালে ১২০ জনকে সাত হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে এই সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয়েছে আট হাজার টাকা। ওই বছর ২৫০ জন দুঃস্থ শিল্পী ও কলাকুশলীকে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। সেবার ১৮ তম যাত্রা উৎসব হয়েছিল ২৫ দিন ধরে। যাত্রার সমৃদ্ধ ইতিহাস নিয়ে 'বাংলার যাত্রা ৫০০ বছর পেরিয়ে' শীর্ষক প্রদর্শনীরও আয়োজন করি। প্রচুর মানুষ এই সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস দেখে অবাক হয়েছেন। এ বছর ১৯ তম যাত্রা উৎসবের মেয়াদ ছিল ৩০ দিন। বারাসতের কাছারি ময়দানে চলেছিল ২ থেকে ৪ জানুয়ারি। জেলার ৬টি দল অংশ নিয়েছিল। ২০১৪ সাল থেকে জেলার যাত্রাদলগুলিও অংশ নেওয়ায় প্রকৃত অর্থে সারা বাংলার উৎসবে পরিণত হয়েছে এই যাত্রা উৎসব। পাশাপাশি যাত্রা শিল্পে নতুন ও প্রতিভাধর শিল্পী



খুঁজতে গত বছরই দশ দিনের কর্মশালা হয়েছিল। বিভিন্ন জেলার ৫০ জন অংশ নেন। এবারও হয়েছে কর্মশালা। তা ১৫ দিনের। ৫০ জন শিক্ষার্থী-শিল্পী অংশ নেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন প্রথিতযশা শিল্পীরা। আর বলতেই হয় যাত্রাপালাগুলির তথ্য সম্বলিত প্রচার পুস্তিকা 'যাত্রা দর্পণ'-এর কথাও। এই পুস্তিকার মাধ্যমে যাত্রা শিল্পকে ব্যাপক প্রচারের আলোয় আনা সম্ভব হয়েছে। কয়েক বছর আগেও চিৎপুরে ৩০ থেকে ৪০টি যাত্রাপালা প্রযোজিত হত। এখন সেই সংখ্যা প্রায় ৭০। বেড়েছে যাত্রা শিল্প। বাড়ানো হয়েছে দুঃস্থ শিল্পী ও কলাকুশলীদের অনুদানও। এ বছর ৩০০ জনকে ৯ হাজার টাকা হারে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

ওই শিল্পী ও কলাকুশলীদের পরিবারের চোখে জল দেখেছি। ছয় বছর আগেও ওঁদের চোখে জল দেখেছিলাম। আবারও জল দেখলাম। কিন্তু চোখের জলেরও তুলনা হয়। চোখের জলেরও বদল হয়। আগে দেখেছি দুঃখের অশ্রু। এখন দেখি আনন্দাশ্রু। প্রত্যেকে যে কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের আশীর্বাদ করেছেন ও করেন, তা মনে পড়ে। বিশেষত যখন কোনও বিরোধী ব্যক্তি বা মাধ্যম অপপ্রচার করে, তখন ওইসব মুখগুলোর কথা ভেবে বুকে বল পাই। গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ওই লাখো মানুষের আনন্দাশ্রুই আমাদের সত্যিকারের বলভরসা। ভাবি, আরও বেশি অনুদান দিলে হয়তো আরও ভাল হত। কিন্তু আমাদের সংগতিতে সবরকম বঞ্চনা ও আগের সরকারের ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েও অনুদান চালিয়ে যাওয়া আমাদের চ্যালেঞ্জ।

প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাত্রা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। যে শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বাংলার মাটির যোগ রয়েছে, সেই শিল্পের উন্নতি ও প্রচার-প্রসারে মা-মাটি-মানুষের সরকার বদ্ধ পরিকর। হারানো দিনের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য ফিরে পেয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যাত্রা-রথ থামবে না। জানি, তারপর আরও পথ যেতে হবে। সেটাও একদিন পেরিয়ে যাব।

আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। মা-মাটি-মানুষের চোখের জল মোছানোই লক্ষ্য। মঙ্গল-যাত্রায় প্রত্যেকের শুভেচ্ছাও প্রয়োজন।

নিবন্ধ





শেষ অধ্যায়

সুখেন্দুশেখর রায়

১৮ আগস্ট, ১৯৪৫। বেসরকারি সংবাদ সংস্থাকে উদ্ধৃত করে রেডিও-তে খবর প্রচারিত হয়েছিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাইওয়ানের তাইহোকু বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। তারপর একটি তদন্ত কমিটি, তদন্ত কমিশন স্বাধীনতার প্রথম চার দশকে কোনও অকাট্য প্রমাণ দিতে পারল না।

যদিও শাহনওয়াজ কমিটি আর খোসলা কমিশন ভারতে বসেই বলে দিল, হ্যাঁ, নেতাজি ওই বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। মনোজ মুখার্জি কমিশন তা মানেনি। তিনি তাওয়ান সরকারের বিবৃতি তুলে ধরে লিখেছেন, ওই দিন তাইহোকু তো দূরের কথা, তাইওয়ানের কোথাও কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। ইউপিএ সরকার কোনও কারণ না দেখিয়ে মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট খারিজ করে দেয়। এরপর জনমানসে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। কারণ, আজ পর্যন্ত নেতাজির 'ডেথ সার্টিফিকেট' অথবা শেষকৃত্যের সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। রেনকোজি মন্দিরের তথাকথিত 'চিতাভস্ম' বা হাড়গোড়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয়নি। উপরন্তু স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৮ বছর ধরে নেতাজি সম্পর্কিত শতাধিক ফাইল প্রকাশ করেনি। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার হাজার পাতার নানা তথ্য ও ঘটনার বিবরণ। এমনকী, স্বাধীনতার পরবর্তী কুড়ি-বাইশ বছর ধরে নেতাজি পরিবারের সদস্যদের উপর ধারাবাহিক নজরদারির বৃত্তান্ত। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এমন মহান স্বাধীনতা যোদ্ধাকে নিয়ে এহেন নির্মম ও নির্লজ্জ আচরণ করা হয়নি। শুধু হয়েছে আমাদের দেশে। কেন সরকার গোপনীয়তা বজায় রেখেছে? না কেন্দ্রীয় সরকার, না পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে কিছু বলেছে। যখন প্রথম আদালতে মামলা হল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার হলফনামা দিয়ে বলে, নেতাজি সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশ করলে অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। দেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকী নেতাজির ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন সব আষাঢ়ে গল্প কারা ফাঁদলেন? গুটিকয়েক আমলা। রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশে। সুপ্রিম কোর্ট ফাইল দেখতে চাইল। সরকার পাত্তাই দিল না। সুপ্রিম কোর্টও নীরব রইল। এইভাবে যুগ যুগ ধরে রহস্যে-ভরা রইল নেতাজির অন্তর্ধানের ঘটনা। নেহরু-গান্ধী যুগের অবসানেও যার কোনও রকমফের ঘটেনি। ১২৫ কোটি জনতার আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক সম্বন্ধে তথ্য গোপন করার দুঃসাহস দেখাল জনাদশেক প্রধানমন্ত্রী, ডজন কয়েক স্বরাষ্ট্র, বিদেশমন্ত্রী, আমলা আর কিছু ষড়যন্ত্রী। গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছাই যে শেষ কথা, তা তারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল।

আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার? ছয় দশক ধরে একথা কাউকে জানতেই দেওয়া হয়নি যে এই রাজ্যেও নেতাজির ফাইল গোপন রাখা হয়েছে। অথচ, প্রথম দফায় টানা কুড়ি বছর (১৯৪৭-৬৭) আর পরে পাঁচ বছর (১৯৭২-৭৭) রাজ্য শাসন করেছে কংগ্রেস। বামপন্থীরা তিনদফায় (১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৯-৭০, ১৯৭৭-২০১১) কমবেশি সাঁইত্রিশ বছর স্টিমরোলার চালিয়েছে বাংলার বুকে। নেতাজির বিষয়ে কংগ্রেস-সিপিএম যে ভাই-ভাই তা অবশ্য দেশবাসী জানেন। কারণ, নেতাজির নেতৃত্বে যখন আজাদ হিন্দ বাহিনী 'দিল্লি চলো'-র সশস্ত্র অভিযান শুরু করেছে তখন কমিউনিস্টরা নেতাজিকে গালমন্দ করতেন 'ক্যুইসলিং', 'তোজোর কুকুর' বলে। আর জওহরলালের প্রকাশ্য উক্তি ছিল, 'সুভাষ ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে আমি তাকে খোলা তলোয়ার নিয়ে স্বাগত জানাব'। অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের এমন অকৃত্রিম সহযোগী পৃথিবীর অন্যান্য উপনিবেশে সেদিন দেখা যায়নি। সুতরাং পরিকল্পিতভাবে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট সরকার কী কেন্দ্রে কী রাজ্যে, নেতাজি ফাইল ধ্বংস করেছে, গোপন রেখেছে।

চার বছর আগে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর আমি রাজ্যসভায় প্রশ্ন, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, বিশেষ উল্লেখ ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের কাছে জানতে চাইতাম। প্রায় দু'বছর ওরা আমাকে আমল দেয়নি। আমিও নাছোড়বান্দা। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, সচিবালয়ের কাছে নিয়মিত পত্রাঘাত শুরু করলাম। সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল সাইটের শরণাপন্ন হলাম। অসমের লামডিং আর উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলিতে স্থানীয় গণসংগঠন ও বিধায়কের উদ্যোগে নেতাজি-ফাইল প্রকাশের দাবিতে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশে যোগ দিলাম। কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হল গত বছর। ভাবলাম, এবার অন্তত আশার আলো দেখা যাবে। কারণ, গত বছরই নেতাজির জন্মদিনে তখনকার বিজেপি সভাপতি (এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) রাজনাথ সিং কটকে প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন, "কেন্দ্রের উচিত নেতাজি সম্বন্ধে সমস্ত ফাইলপত্র প্রকাশ করা। আমরা (বিজেপি) সরকারে এসে সমস্ত কিছু প্রকাশ্যে আনব।" নিজের ফেসবুকেও তিনি ওই কথা লিখলেন। সমস্ত কাগজে ফলাও করে ওই খবর বের হয়। তাই আশায় বুক বেঁধে প্রতিশ্রুতি রক্ষার অনুরোধ জানাই। সংক্ষিপ্ত হাস্যকর উত্তরে তিনি জানান, "এ বিষয়ে সঠিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেব।" কার কাছ থেকে খোঁজখবর নেবেন? সোনিয়া-মনমোহন, না ব্রিটেন-রাশিয়া-আমেরিকার শাসকদের কাছে? এরপর করিডরে আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন তিনি। পাছে আমি তাঁকে বিব্রত করি। এরপরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাজকর্মের বিষয়ে আলোচনায় আমি আবারও তাঁকে নেতাজি-ফাইল প্রকাশের অনুরোধ জানাই। তিনি কর্ণপাত করেননি। শেষ পর্যন্ত গত বছর ১৭ ডিসেম্বর ওই দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আমার প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানান, প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ৬০টি ফাইল ছিল। তারমধ্যে দুটি মহাফেজখানায় পাঠানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের কাছে আছে ২৯টি ফাইল। আমার প্রশ্ন ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নেতাজি সম্পর্কে কত ফাইল আছে? আংশিক হিসাব পাওয়া গেল। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৫৮+২৯=৮৭টি ফাইল, যা গোপনীয়। লক্ষণীয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে এই বিষয়ে কত ফাইল আছে তা উত্তরে বলা হয়নি।

নাগরিক সমাজের বাঁশিওয়ালাদের (হুইসল্ ব্লোয়ারস্) প্রশ্নের উত্তরেও কেন্দ্রীয় সরকার নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার নেতাজি ফাইলের উল্লেখ করেছে। আবারও বুক ফুলিয়ে জানিয়েছে, 'নেতাজি-ফাইল প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, অন্য দেশের সঙ্গে

সম্পর্কে হানি ঘটতে পারে।' সেই পুরনো কাসুন্দি। সম্পর্কের হানি ঘটবে? কেন? সত্তর বছর ধরে ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার— নেতাজি 'বিমান দুর্ঘটনায়' মারা গিয়েছেন। তা দুর্ঘটনায় মারা গেলে অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে কেন? আমি-আপনি বা কেউ যদি ব্রিটেন-রাশিয়া-আমেরিকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা যায় তাহলে কি আমাদের আত্মীয়-পরিজন সেই দেশের উপর গোঁসা করবে? এমন হাস্যকর কথা ধারাবাহিকভাবে বলা হচ্ছে। আর ১২৫ কোটি জনগণ তা চুপ করে মেনে নেবে? তাহলে কি বলতে হবে, নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। তাঁর বিমান গুলি করে ধ্বংস করা হয়েছিল? এমন কষ্টকল্পিত কথাও তো কাউকে বলতে শোনা যায়নি। তবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্কে হানির বারবার যোগসূত্র ঘটানো হচ্ছে কেন?

আমরা যখন সোশ্যাল সাইটে নেতাজি-ফাইল প্রকাশের দাবিতে লেখালেখি, প্রচার চালাচ্ছিলাম তখন টুইটারে, ফেসবুকে একদল আমাকে ব্যঙ্গ করে লিখত— তোমাদের দিদিকে বলো না। নেতাজির ৬৪টি ফাইল প্রকাশ করতে। এমনকী, নেতাজি পরিবারের কেউ কেউ এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করতেন। একদিন দিদি আমাকে নির্দেশ পাঠালেন, 'সবুর করুন। বিষয়টি আমি জরুরি ভিত্তিতে দেখছি। শীঘ্রই জানতে পারবেন অনেক কিছু।'

১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট নেতাজি নিরুদ্দেশ হন। আর ২০১৫-এর ১৮ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সত্তর বছর একমাস পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কাছে থাকা ৬৪টি ফাইল জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন। তৈরি হল নয়া ইতিহাস। স্বচ্ছ প্রশাসনের অনন্যসাধারণ নজির রাখলেন তিনি। এক ধাক্কায় খুলে গেল অন্ধকারের ঝাঁপি। মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল 'বাজারি প্রচার'— ধুত্তোর কিছুই তো পাওয়া গেল না। তাহলে কি তারা জানত, অনেক কিছুই পাওয়া যাবে? তা আর কী কী পাওয়ার কথা ছিল? এতদিন মুখ খোলেনি কেন? কেন জানানো হয়নি রাজ্যের হাতে ৬৪টি গোপন নেতাজি ফাইল আছে? কেন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না যে কোন মহান উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পরের তিন দশক ধরে নেতাজি পরিবারের উপর নজরদারি চলত? কাদের নির্দেশে? ১৯৪৭ থেকে ২০১১— এই সুদীর্ঘ ৬৪ বছর কারা রাজ্য চালিয়েছে? বিরোধী দলনেতা বলছেন, পর্বতের মূষিক প্রসব। কমরেড, আপনি তো দীর্ঘ দিনের কমিউনিস্ট। মন্ত্রীও

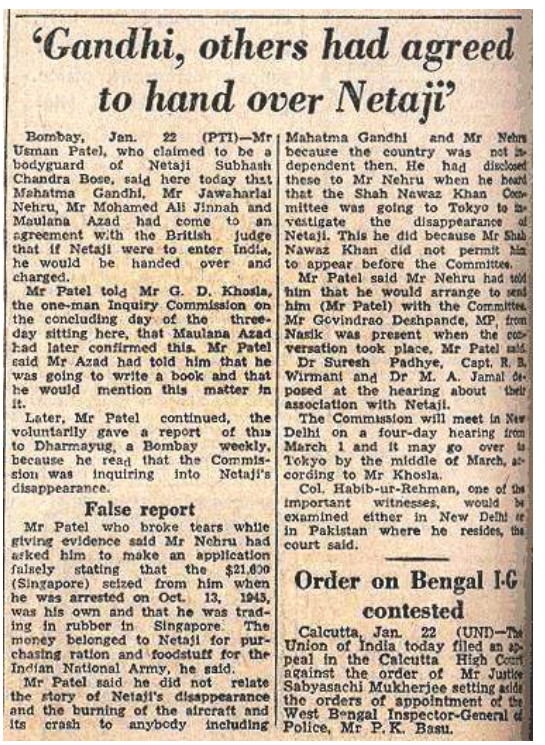

'Gandhi, others had agreed to hand over Netaji'

Bombay, Jan. 22 (PTI)—Mr Usman Patel, who claimed to be a bodyguard of Netaji Subhash Chandra Bose, said here today that Mahatma Gandhi, Mr Jawaharlal Nehru, Mr Mohamed Ali Jinnah and Maulana Azad had come to an agreement with the British judge that if Netaji were to enter India, he would be handed over and charged.

Mr Patel told Mr G. D. Khosla, the one-man Inquiry Commission on the concluding day of the three-day sitting here, that Maulana Azad had later confirmed this. Mr Patel said Mr Azad had told him that he was going to write a book and that he would mention this matter in it.

Later, Mr Patel continued, the voluntarily gave a report of this to Dharmayug, a Bombay weekly, because he read that the Commission was inquiring into Netaji's disappearance.

False report

Mr Patel who broke tears while giving evidence said Mr Nehru had asked him to make an application falsely stating that the $21,000 (Singapore) seized from him when he was arrested on Oct. 13, 1945, was his own and that he was trading in rubber in Singapore. The money belonged to Netaji for purchasing ration and foodstuff for the Indian National Army, he said.

Mr Patel said he did not relate the story of Netaji's disappearance and the burning of the aircraft and its crash to anybody including Mahatma Gandhi and Mr Nehru because the country was not independent then. He had disclosed these to Mr Nehru when he heard that the Shah Nawaz Khan Committee was going to Tokyo to investigate the disappearance of Netaji. This he did because Mr Shah Nawaz Khan did not permit him to appear before the Committee.

Mr Patel said Mr Nehru had told him that he would arrange to send him (Mr Patel) with the Committee. Mr Govindrao Deshpande, MP, from Nasik was present when the conversation took place, Mr Patel said.

Dr Suresh Padhye, Capt. R. B. Wirmani and Dr M. A. Jamal deposed at the hearing about their association with Netaji.

The Commission will meet in New Delhi on a four-day hearing from March 1 and it may go over to Tokyo by the middle of March, according to Mr Khosla.

Col. Habib-ur-Rehman, one of the important witnesses, would be examined either in New Delhi or in Pakistan where he resides, the court said.

Order on Bengal I-G contested

Calcutta, Jan. 22 (UNI)—The Union of India today filed an appeal in the Calcutta High Court against the order of Mr Justice Sabyasachi Mukherjee setting aside the orders of appointment of the West Bengal Inspector-General of Police, Mr P. K. Basu.

ছিলেন। টানা ৩৪ বছর আপনারা ছিলেন পর্বতের মতো প্রকাণ্ড, অরণ্যদেবের মতো ক্ষমতাশালী। খুলি পাহাড়ে বসে আপনারা ৬৪টি মূষিক না হোক, এক-আধখানা আরশোলা-ছারপোকা তো প্রসব করাতে পারতেন। করেননি কেন?

আসলে কিছু লোকের হৃৎকম্প শুরু হয়েছে। ইতিহাস পড়েছেন এমন সবাই জানেন, সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেস দলের শেষ নির্বাচিত সভাপতি। কোন কোন নেতার চক্রান্তে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন তাও তাঁরা জানেন। তিনিই একমাত্র সভাপতি যিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। এরপর দল থেকে বহিষ্কার। বিদেশে আজাদ হিন্দ সেনাদল গড়ে তোলা, সশস্ত্র অভিযান ও হঠাৎই নিরুদ্দেশ। এই কাহিনি সত্তর বছরে এখানেই থেমে ছিল। মমতা নতুন অধ্যায় রচনা করলেন। ইতিহাসও নতুন মোড় নিল। সরকারিভাবে তিনি দাবি তুললেন, এবার কেন্দ্রের পালা। বিধানসভার ভিতরে-বাইরে তিনি বললেন, "আমরা করেছি। এবার কেন্দ্রও করুক। কারণ, দেশের মানুষের অধিকার আছে, তাঁদের প্রিয় রাষ্ট্রনায়ক সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানবার।" বিমূঢ়, বিস্মিত কেন্দ্রীয় সরকার দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কারণ, শুধু গান্ধী-নেহরুর মুখোশ খুললে তো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিড়ম্বনা যে অন্যত্র। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে পাথর-লোহা দিয়ে তথাকথিত 'লৌহমানব'-এর মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এমন তো নয় যে নেতাজি ফাইল প্রকাশ হলে লোহায় মরচে ধরে যাবে? তাই নানাভাবে শেষ রক্ষার চেষ্টা চলছে। নেতাজি পরিবার আর কতিপয় গবেষককে বৈঠকে ডেকে একটা কমিটি-কমিশন গড়ে বিষয়টিকে আবারও 'কোল্ড স্টোর'-এ পাঠানো যায় কি না তারও নাকি চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। আবারও কিছু ফাইল নষ্ট করা হতে পারে বলে কোনও কোনও মহলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ক্ষমতায় আসার ছ'মাসের মধ্যে বিজেপি সরকার বেশ কিছু ফাইল নষ্ট করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এটি রুটিন ব্যাপার। আমার প্রশ্নের লিখিত উত্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, নেতাজি ফাইল নষ্ট করা হয়েছে কি না তা খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এরপর সাতমাস পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও খোঁজ চলছে! 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'য় ফাইল ইঁদুরের গর্তে মেলে? নাকি মাউস ক্লিক করলেই হাতের মুঠোয় চলে আসে? এবার এসব ছেলেভুলোনো গল্পের দিন শেষ হতে চলেছে।

মনে রাখতে হবে, নেতাজি শুধুমাত্র বসু পরিবারের সদস্য নন।

তিনি ১২৫ কোটি ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত অপপ্রচার আর গোপনীয়তার বেড়াজাল ডিঙিয়ে নেতাজি ফাইল প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য ও রাজধর্ম পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীরও উচিত, অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। ভারত সরকারের কাছে যত নেতাজি ফাইল আছে তা প্রকাশ করে ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকা ও জাপান থেকে নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। ইতিহাস কাউকে রেয়াত করে না। সত্যকে তাই চিরদিন গোপন রাখা যায় না। নেতাজিকেও আর ফাইলবন্দি করে রাখা যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধ্রুব সত্যকে আবারও প্রতিষ্ঠা করলেন। ইতিহাসের পথেই তিনি হাঁটলেন নতুন ইতিহাস লিখতে। এবার বাকিদের পালা। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কহানি এবং/ অথবা আইনশৃঙ্খলার অবনতির ছেঁদো ওজরে মুখ্যমন্ত্রী



‘Japanese had altered Netaji’s flight plan’

New Delhi, Oct. 19 (UNI)—Mr Deb Nath Dass, formerly general secretary of the Indian Independence League in South-East Asia, told the Khosla Commission today that Netaji Subhash Chandra Bose had mentioned to him on the night of August 16, 17, 1945, that the Japanese had changed their plan regarding his departure from Saigon at the eleventh hour.

Appearing as a witness beforet the Commission inquiring into the disappearance of Netaji Bose, Mr Dass quoted Netaji Bose as telling him and some Indian National Army officers, who were present at the time, that the Japanese wanted to take him to Tokyo instead of to Manchuria.

He and some imporant INA officers present at Saigon did not like the idea and asked high Japanese officers where Netaji Bose was being taken. The Japanese replied: "Don't worry. You will also be taken to the same place where he is going." They, however, refused to reveal the name of the place, Mr Dass added.

Mr Dass was the last witness to give evidence before Mr Justice G. D. Khosla on the Commission's sittings in Delhi.

Mr Dass replied in the negative to a question by Mr Khosla whether Netaji had expressed his dislike to the idea of going to a place where the Japanese wanted to take him but said, "it appeared to me as though Netji was not happy at the change of destination."

Mr Dass said Netaji had carried 18 metal boxes containing treasures belonging to the Provisional Government of Azad Hind, which he had brought on August 16, 1945, to Bangkok from Rangoon in a leather suit case. They included ornaments and cash donated to Netaji by Indians at various places in Southeast Asia. They were earlier kept in the National Azad Hind Bank.

কর্ণপাত করেননি। তাই বলেছেন, “বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কে হানি ঘটার আশঙ্কা অমূলক। আর পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি আমি দেখি। আমিই দেখব। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে।”

সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব মুছে গিয়েছে। পৃথিবী থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ বহুকাল পাততাড়ি গুটিয়েছে। স্তালিন-চার্চিল-এ্যাটলি মরে ভূত (অতীত অর্থে) হয়ে গিয়েছেন। যদি ওই সব দেশ বা ওদের কারও নেতাজির অন্তর্ধানে কোনও ভূমিকা থেকেও থাকে, তাহলে সত্তর বছর পরে পুতিন বা ক্যামেরুনের উপর আমাদের ক্রোধ জন্মাবে? না রাশিয়া-ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাবে? এইসব আবোল-তাবোল ওজর-আপত্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই আমল দেননি। সমস্যার উৎপত্তি, বিস্তার যা কিছু তা দেশেই। বিদেশে নয়। যাদের মূর্তিতে জন্মদিন, মৃত্যুদিনে মাল্যদান করা হয় তাদের বিশেষ কারও কারও ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। তার থেকে মুক্তির পথ খোঁজার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। তাই মুক্তিদূতের ফাইল প্রকাশ্যে আনা হবে কি না তা প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’-এ শোনা যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে আরও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী ওই দশ বছরের রাজ্য মন্ত্রিসভার সমস্ত ক্যাবিনেট মিটিংয়ের বিবরণী প্রকাশ করেছেন। এবার ঝুলি থেকে কী বেরোবে কে জানে? সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এখনও যদি রাজধর্ম পালন না করে তাহলে জল অনেক দূর গড়াতে পারে। মহান দেশব্রতী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও প্রমাণ করেছেন ‘আপনি আচরি ধর্ম, পরেরে শেখায়।’ এবার শেষের শুরু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যাই লিখবেন শেষ অধ্যায়।

নিবন্ধ

বছরটি বাঘা যতীনের আত্মবলিদানের শতবর্ষ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়



শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যায়, বয়ে চলে মানুষের অনন্ত প্রবাহ। সেখানে কত সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, শিল্পী ও দেশপ্রেমিকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে সেই অনন্ত প্রবাহের মধ্যে। কিছু নাম সর্বকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। বর্তমান বছরটি বিপ্লবী বাঘা যতীনের আত্মবলিদানের শতবর্ষ।



আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় কাপ্তিপদায় ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ে গুলিবিদ্ধ হন এবং পর দিবসে ভোরে বীরের মতো মৃত্যু হয়।

পিতা উমেশচন্দ্র এবং মাতা শরৎশশী। তাঁর জন্ম হয়েছিল মাতুলালয়ে ১৮৭৯ সালের ৮ ডিসেম্বর। পৈতৃক নিবাস ছিল যশোর জেলার ঝিলাইদহ মহকুমায় রিশখালি গ্রামে। পাঁচবছর বয়সে যতীনের পিতৃবিয়োগ ঘটে, ফলে লেখাপড়া শুরু হয় মাতুলালয়ে। কৃষ্ণনগরের এ. ভি. স্কুল থেকে ১৮৯৮ সালে এন্ট্রান্স পাস করার পর এফএ পড়তে কলকাতা এলেন, ভর্তি হলেন উত্তর কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজে, যা বর্তমানে ক্ষুদিরাম বসু কলেজ নামে পরিচিত। যৌবনে নিজের জন্মভূমি কয়া গ্রামে একটি ধারালো ছুরি দিয়ে বাঘ শিকারের জন্য বাঙালির স্মৃতিতে তিনি বাঘাযতীন নামে চিরজীবী হয়ে রইলেন। চাকরিজীবনেও খুব দ্রুত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। খাস ছোটলাটের অফিসের সরকারি কর্মচারী ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের গোপন নির্দেশে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত ১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা হাই কোর্টের ভিতরে এক গোয়েন্দা কর্তাকে খুন করেন। এই ঘটনার তিনদিন পরে কলকাতার ২৭৫ আপার চিৎপুর রোডের বাসস্থান থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে যতীন্দ্রনাথকে। তখন তিনি তিনটি নাবালক সন্তানের পিতা। যতীন্দ্রনাথ আসলে এই দেশে বিপ্লব যজ্ঞ পরিচালনার অন্যতম প্রধান পুরোহিত। কয়েকবার স্বামীজির সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ বাঘাযতীন সম্পর্কে বলেন, "অদ্ভুত লোক, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একেবারে প্রথম শ্রেণীর পুরুষ, সৌন্দর্য আর তেজের এমন সমন্বয় আমি দেখিনি...।" স্বামীজির জ্বলন্ত দেশপ্রেম 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ, আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার বাণী; দুর্গত মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান' এসবই তো স্বামীজির নতুন ভারত গঠনের জন্য যুবসমাজের প্রতি আবেদন।

আজ আমাদের যুবসমাজের প্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত শৃঙ্খলাবোধ, তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সৈন্যদল দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবল জনতার দ্বারা নহে।" এটা যুবকদের বুঝতে হবে প্রকৃতির রাজত্বে অনিয়মের অস্তিত্ব নেই, বিশ্ব সৃষ্টির সবকিছুই নিয়মে চলে, সৈন্যদলের শৃঙ্খলাই যুদ্ধ বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাই প্রবাদ আছে The battle of waterloo was won at the play ground of Eton বিশ্বত্রাস নেপোলিয়নকে ডিউক অব ওয়েলিংটন হারিয়েছিলেন তার ইটন স্কুলে ছাত্রজীবনে শেখা শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষায়।

হাল ভাঙা, পাল ছেঁড়া নৌকা তরঙ্গ ক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে যে অবস্থা হয়, আমাদের বিশৃঙ্খল জীবনের পরিণামটিও তদনুরূপ, অলস উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির জীবন যেমন দুঃখে ভরা, তেমনি যে সমাজ ও রাষ্ট্র বিশৃঙ্খল, তা নৈরাজ্যের রাহুগ্রস্থ তার উন্নতি অগ্রগতি নেই গৌরবও নেই। রণাঙ্গনে, খেলার মাঠে, সংসার জীবনে, কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলাপরায়ণ না হলে জয়ের আনন্দ, সাফল্যের হাসি, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা কিংবা খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই মেলে না, সবই মরীচিকার মায়া হয়ে জীবনকে হতাশা-নিরাশার মরু জ্বালায় জর্জরিত করে।

আজকের যুব সমাজকে বুঝতে হবে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা পরস্পর পরিপূরক। প্রচলিত বিধি-বিধান, অনুশাসন, রীতি-নীতির আনুগত্যের নাম শৃঙ্খলা আর সেগুলির অনুসরণে জীবনযাত্রা এবং কর্ম সমাপনকে বলে নিয়মানুবর্তিতা। যেমন বিশ্ববিধানের নিয়ম আছে বলেই, দিন-রাত, ঋতু বদল ইত্যাদি ঘটে। সমাজে রীতিনীতি সবাই মান্য করে, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা থাকায় কোথাও অঘটন ঘটে না, সবাই হয় কর্তব্যপরায়ণ, আর তাতেই ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রের অগ্রগতি, উন্নতি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সর্বব্যাপক শান্তি ও সুস্থিতি।

যুবসমাজকে বুঝতে হবে 'পৌরুষ' অর্থে বীরবিক্রম নয়, বাহুশক্তির আস্ফালন নয় কিংবা গলাবাজিও নয়, দৃঢ় প্রত্যয়, দৃঢ় সংকল্প, সূক্ষ্মবিচার বুদ্ধি, অনুশীলন ও সৃজনশক্তি, কর্মনিষ্ঠ চিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলির পরিচর্যা ও পরিস্ফুটন, ব্যবহারে সৌজন্য, শিষ্টতা, সামাজিক বোধ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা প্রভৃতির সম্মিলিত রূপটিই পৌরুষ ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, যুব বয়সেই এগুলি আয়ত্তের প্রকৃষ্ট সময়।

এই কথাগুলি বইয়ে পড়েছি, বাড়িতে গুরুজনদের মুখ থেকে শুনেছি কিন্তু এই গুণগুলি যাঁর মধ্যে চাক্ষুষ দেখেছি তিনি আর কেউ নন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নয়নমণি, মা-মাটি-মানুষের নেত্রী; বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ—শ্রদ্ধেয়া জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি। স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগে' দীক্ষিতা হয়ে যিনি সেই ছাত্রীজীবন থেকে মানুষের সেবায় অহোরাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে যদি আদর্শের লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে জনগণের আশীর্বাদে একদিন অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। কোনও প্রলোভন বা ভয় দেখিয়ে আদর্শের লড়াইকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

২০১১ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নয়, পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বপ্নের দিশারি হিসাবে সমস্ত, প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে নিদারুণ আর্থিক অনটনকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রাণপাত করে চলেছেন এবং তাঁর অদম্য জেদ, অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা, একদিন নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, স্বামীজি, বাঘাযতীন ও শত শত বাঙালি মনীষীর স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাজ্যে পরিণত করবে।

আসুন, আগমনির আগমনে সমস্ত বাঙালি যখন আনন্দে মাতোয়ারা তখন আমরা সমস্ত শক্তি নিয়ে বন্যাদুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াই, মহিষাসুরমর্দিনীর কাছে শপথ গ্রহণ করি, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অগ্নিকন্যার সংগ্রামে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনার মতো তাঁর আদেশ পালন করে যাব।

"অরণ্যে রণে দারুণ শত্রু মধ্যে অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগৃহে
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার হেতু নমস্তে জগত্তারানি ত্রাহি দুর্গে।"

Article

Women shakti and the big TMC bypoll win

Derek Obrien



Durga Puja has arrived. Durga, the goddess of power and strength, is perhaps the most important goddess of the Hindus. She is a multi-dimensional goodess, with many names, many personas, and many facets.

As Mahishasuramardini or Shakti, she is the destroyer of evil, the triumphant slayer of the demon Mahishasura. As Kali, she turns black as the night, terrible in rage and fury, goddess of time and empowerment. As Parvati, she is the demure and pretty consort of Lord Shiva. She is Bhawani, the symbol of life, she is Sati, the object of death, she is Basanti, the herald of springtime. She is also Amba, Jagadhatri, Tara, Ambika and Annapurna. Durga, through all her forms, encompasses the essence of salvation and sacrifice.

But my favourite interpretation of Durga Puja and Maa Durga is 'women's shakti.' There are so many examples that I could site from different fields, be it sport, medicine or even the corporate world. But the example I would like to share with you is from politics.

Though, only 11% of India's MPs are women. the Women's Reservation Bill proposes to take this number to 33.33%. We are extremely proud yet humbled that the percentage of women MPs in the Trinamool Congress is a healthy 35%.

The lady who helped us cross this threshold is my colleague Mamatabala Thakur, who was elected from Bongaon, in January this year.

For me, the story of the by-elections for the Bongaon parliamentary seat and the Krishnaganj assembly seat, earlier this year, was about women's power in politics. This is not just a reference to Mamata Banerjee, our stalwart leader, who has fought the onslaught of two successive governments at the Centre and emerged vindicated, but also of our Party's culture of empowering women down the line.

The by-election was necessitated when our MP, Kapil Krishna Thakur, passed away in October 2014. He was a leading light of the Matua community, and there were many contenders for his seat of Bongaon. His brother was a Trinamool MLA and minister in the state government, who resigned and joined the BJP, as did his brother's son. Now both father and son were contenders for the BJP nomination, with the son—nephew of the late Kapil Krishna Thakur—finally getting the ticket.

Who would the Matua community back? Would it stay true to Trinamool or would it swing with that section of the Thakur family that had defected to the BJP? The decision was taken by Mamata Banerjee and the 95-year-old matriarch of the Matua community, Binapani Devi, the “Great Mother” of the Matua people, ageing but still sharp as a needle. Rather than back her son on grandson in the BJP—or even her second surviving son (Kapil Krishna Thakur's other brother)—



a new name was proposed Mamatabala Thakur, the late Kapil Krishna Thakur's wife.

The lady, a newcomer to politics, who was very aware of the social and economic conditions and challenges among her constituents, won easily. The Matua community, with its origins in a religious reform movement in erstwhile east Bengal, taught a few lessons in women's shakti and in consistent, principled politics to city-slicker media honchos, who had all but announced a BJP victory.

নিবন্ধ

মমতাদির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে লড়ছি

শোভন চট্টোপাধ্যায়



পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠান কলকাতা পুরসভা। দেশের অন্যতম সেরা এই মহানগরে পরিষেবার কাজে আমাকে পাঠিয়েছিলেন বাংলার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের 'মমতাদি'। ১৯৮৫ সালে বেহালা কলেজের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে নিয়ে এসে পুরসভার বৃহত্তর আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি।

সেদিন থেকেই শহরের পরিষেবায় নিজেকে যুক্ত করেছি, 'মমতাদি'র চোখ দিয়েই মানুষের সমস্যাকে অনুভব করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছি। ২০১০ সালে প্রথমবার যখন আমাকে কলকাতার মেয়র হিসাবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব দেন তিনি, তখন একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, পারব তো দিদির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে? টানা পাঁচ বছর নানাভাবে মানুষের কাছে মা-মাটি-মানুষের প্রস্তাবনা, পরিকল্পনা এবং পরিষেবামূলক ভাবনাকে পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফের বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ভরসা রেখে কলকাতার মানুষ আরও বেশি আসনে জয়ী করেছে মা-মাটি-মানুষের প্রার্থীদের। বলার অপেক্ষা রাখে না, আরও বেশি দায়িত্ব এবং প্রত্যাশা দুই-ই আমাদের উপর নিশ্চিন্তে তুলে দিয়েছেন মহানগরের বাসিন্দারা। সেই কারণে দেশের সেরা শহর গড়ার যে সমস্ত প্রকল্প ও পরিষেবা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নিয়ে চালু করেছি, সেগুলি আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছি। রাজ্যে ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং পুরভবনে লাল পতাকা একইসঙ্গে উড়লেও কলকাতাবাসীর কোনও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেনি পূর্বতন পুর-প্রশাসকরা। আমার আগে আলিমুদ্দিনের অনুগত যে সমস্ত মেয়র চেয়ারে বসেছেন তাঁরা মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার পরিবর্তে পুরভবনকে রাজনীতির আখড়া হিসাবে তৈরি করেছিলেন। সহজ করে বললে বলতে হয়, জন-রায়ে পুরভবন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বাম শাসকরা কলকাতা মহানগরীকে আস্তাকুঁড়ে সদ্যোজাতকে ছুড়ে ফেলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি করেছিলেন।

৩০ বছর আগে যখন কলকাতার কাউন্সিলর হয়েছিলাম তখন থেকে নানাভাবে শহরের নানা উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলাম। বেহালার এক নতুন গ্রামকেন্দ্রিক ওয়ার্ডকে কীভাবে আধুনিকতম শহরের অংশ করা যায়, তা নিয়ে সেসময় রাতদিন চিন্তা করতাম, পরিকাঠামো গড়ে মানুষকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। একেবারে অন্ত্যজ পল্লির ও বস্তিবাসী মানুষ কী চাইছেন, গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষের প্রত্যাশা কী তা সেদিন থেকেই উপলব্ধি করেছি। আর সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল ২০০০ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রথমবারের তৃণমূল পুরবোর্ডের মেয়র পারিষদ হিসাবে জল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। খাতায়-কলমে যদিও মেয়র পারিষদ (জল) ছিলাম কিন্তু তখনও পুরসভার পরিষেবামূলক নানা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পড়ত আমার উপর। বিশেষ করে সংযোজিত এলাকা যাদবপুর ও বেহালায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে পরিকাঠামো উন্নয়নের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ সফলভাবে করতে পেরে আজ অনেকটাই তৃপ্তি বোধ করি। একইসঙ্গে পুরনো উত্তর ও মধ্য কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এলাকার নানা সমস্যার সমাধানের পথে সবসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী ভাবনা অনেকটাই কাজে লেগেছে। আর সেই কারণে দু'দফায় মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পেয়ে বলতে পারি, দেশের মধ্যে একমাত্র মহানগর কলকাতা যেখানে কোনও প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে গেলে কাউকে জোর করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। সমস্ত ক্ষেত্রেই আইনমাফিক প্রাপকদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। এমনকী, হকারদেরও রেজিস্ট্রেশন দিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাভিত্তিক পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ রাখা হচ্ছে, কোথাও যেন ফুটপাত এমনভাবে দখল না হয় যাতে করে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়। আসলে এটাই আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকারের নীতি। একদিকে পরিষেবাকে আধুনিক মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'কমপ্যাক্টর'-এর মতো প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষকে পুনর্বাসন দিয়ে নানা বরোতে জল প্রকল্প এবং নিকাশির পরিকাঠামো সম্পূর্ণ করা হয়েছে। কোনওভাবেই নাগরিকদের পরিষেবা থেকে যেমন বঞ্চিত করা হয়নি, তেমনই আবার গরিব-মধ্যবিত্ত ও বস্তিবাসীদের জন্য অজস্র নতুন নতুন পরিষেবা ও সুবিধার প্রকল্প চালু করা হয়েছে তৃণমূল পরিবোর্ডের সময়। বিশেষ করে গত চার বছরে রাজ্যে তৃণমূল সরকার দায়িত্বে আসার পর মানুষের জন্য যে অজস্র প্রকল্প পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আর এর সমস্ত কৃতিত্ব একজনেরই, তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাড়ি বাড়ি পানীয় জল, আধুনিকতম নিকাশি ব্যবস্থা এবং সবুজে মোড়া সৌন্দর্যায়িত শহরকে আরও উন্নত করার জন্য একটা নির্দিষ্ট ভিশন নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর এই ভিশনের মূল থিম হল— শুধুমাত্র আজকের জন্য নয়, আগামী ২৫ বছরেও যেন নতুন করে কোনও সমস্যা তৈরি না হয় তার রূপরেখা সম্পূর্ণ করা। এই ধরুন, পানীয় জলের সমস্যার সমাধান এমনভাবে করা হচ্ছে যে অন্তত আগামী দু' দশক শহরের কাউকে একফোঁটা জলের জন্য কখনও কোনওরকম টেনশন করতে হবে না। বেলেঘাটা-সল্টলেক স্টেডিয়াম লাগোয়া এলাকা থেকে শুরু করে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত বাইপাসের দু'পাশে যে হাজার হাজার নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে সেখানে পানীয় জলের সঙ্কট ছিল। পাইপ লাইনের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত জল ঘরে ঘরে পৌঁছনোর বিষয়টি ছিল কার্যত স্বপ্নাতীত। কিন্তু সেই প্রকল্পটিও বাস্তবায়িত হয়েছে ধাপায়। 'জয় হিন্দ' জলপ্রকল্পের মাধ্যমে এখন ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ জল পৌঁছে যাচ্ছে। একইভাবে মিউটেশনেরও নানা সমস্যা ছিল এই এলাকায়। বাম জমানায় মাদুরদহ-কালিকাপুর এলাকায় শুধুমাত্র জমি বিক্রি এবং প্রোমোটারি করে গিয়েছেন সিপিএমের কাউন্সিলররা। লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করলেও কেউই সাধারণ মানুষের এবং ওই এলাকার নতুন ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিন্দুমাত্র ভাবনাচিন্তা করেননি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী



মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান পুরবোর্ডের কাছ থেকে বিষয়টি জানার পরই জমির জটিলতা কাটানোর জন্য মন্ত্রিসভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একইসঙ্গে পুরসভাকে নির্দেশ দিয়ে বহু বছরের মিউটেশন কেন্দ্রিক সমস্যা দূর করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বহু মানুষ বিভিন্ন মোড়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলতেন। খোলা ভ্যাটের দুঃসহ দুর্গন্ধ বহু মানুষকে অসুস্থ করে দিত। কিন্তু এখন সেখানে বসেছে কমপ্যাক্টর। মানুষ ঝকঝকে-জঞ্জালহীন শহরে দিনে-রাতে ২৪ ঘণ্টাই স্বচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারছেন। বাড়ি বাড়ি ময়লা সংগ্রহের পরিষেবা আরও নিবিড় হয়েছে। বস্তুত এই কারণে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং নানা জীবাণুকেন্দ্রিক অসুস্থতা কলকাতায় একধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। সামগ্রিক পরিচর্যা করতে গিয়ে আজ আমরা দেখতে পেয়েছি, মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জন্য অভিজ্ঞতা কতটা প্রয়োজন। আসলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিখিয়েছেন, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, মানুষের দাবি মেনে কাজ করলে তা সবসময়ই জনমুখী হতে বাধ্য। আর এই কারণে যে কলকাতায় ১৫ মিনিট ভারী বৃষ্টি হলে বিভিন্ন গলিতে নৌকা বেরিয়ে পড়ত, দিনের পর দিন জমা জলে দুর্ভোগ পোহাতেন শহরবাসী। এখন সেখানে বৃষ্টি হওয়ার ১৫-২০ মিনিট পরে জমা জল সরে যায়। বৃষ্টি হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দ্রুত কর্মচঞ্চল শহরের ছবি ফিরে আসে। এখন আর সংবাদমাধ্যমের হেডিং হয় না—'কলকাতা এক মহাসমুদ্র'। বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম জমা জলের ছবি তুলে নিয়ে অফিস পৌঁছে যখন সম্প্রচার করে তখন সেই এলাকার বাসিন্দারাই পাল্টা ফোন করে প্রশ্ন করেন, কোথায় জল? আসলে এটাই বাস্তব। টিভি চ্যানেল ছবি তুলে অফিস পৌঁছনোর সময়ের মধ্যেই আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে জমা জল সরে যাচ্ছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফোন করে এই যে টিভি চ্যানেলকে ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য কৈফিয়ত তলব করছেন, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

এতদিন মূলত জল সরবরাহ হত পলতা, গার্ডেনরিচ, খিদিরপুর আর জোড়াবাগানের জলপ্রকল্পের উপর ভরসা করে। কিন্তু আমাদের পুরবোর্ড ক্ষমতায় আসার পর প্রথম জোর দেওয়া হয়েছিল এই প্রকল্পগুলির পানীয় জলের উৎপাদন ক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি নতুন জলপ্রকল্প চালু করার। কারণ, শহরের জনসংখ্যা প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে। উপরন্তু, মহানগরের মাটির নিচের বেশ কিছু এলাকায় আর্সেনিকের দুষ্ট প্রভাব মানুষের জীবনে যথেষ্ট ক্ষতি করছে।

আর এ বিষয়ে প্রথম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী-বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মায়ের ঘাটে জেটি বসিয়ে জলপ্রকল্প চালুর ব্যবস্থা করিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ ছিনিয়ে এনে শহরের জলপ্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে সাহায্য করেছেন তিনি। খুব শীঘ্রই সবমিলিয়ে গার্ডেনরিচ থেকে দৈনিক ৫ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ নিশ্চিত হতে চলেছে। বর্তমানে দৈনিক ২০ ও ১৫ মিলিয়ন গ্যালন পানীয় জল উৎপাদন হচ্ছে। শীঘ্রই আরও ৩০ মিলিয়ন গ্যালন পানীয় উৎপাদনের কাজ শুরু হবে। মাথাপিছু ৪০ গ্যালন জল তৈরির টার্গেট আমরা খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ করব। একইসঙ্গে প্রতি পরিবারে চাহিদার চেয়েও বেশি জল যাতে সাতসকালেই পৌঁছে যায় তার জন্য দ্রুত পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। একটা বিষয় বলা দরকার তা হল, আগে এলাকায় এলাকায় পাইপ লাইন ছিল। কিন্তু জল ছিল না। এখন অনেক বেশি জল উৎপাদন হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরও বেশি করে পাইপ লাইন বসাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজ্যকে গত চার বছরে সীমাহীন বঞ্চনা না করত, তাহলে এতদিনে সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যেত।

বাম জমানায় মানুষের উপর নানারকম পরিকল্পনাহীন কর চাপিয়ে দেওয়া হত। ট্রেড লাইসেন্স, বার্থ সার্টিফিকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে দিনের পর দিন ঘুরতে হত নাগরিকদের। কিন্তু আমরা দায়িত্বে আসার পর কর ব্যবস্থার সরলীকরণ করা হয়েছে। সহজে মানুষ তাঁদের কর দিতে পারছেন। বহু ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি দূরের কথা, কমানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে যদি কারও কর বেশি হয়ে থাকে তা পুনর্বিবেচনার জন্যও পুরসভায় শুনানির ব্যবস্থা দ্রুততর করা হয়েছে। বাম জমানায় অনেকের উপর নানাভাবে অকারণে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি কর চাপানো হয়েছিল। বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছিলেন কলকাতার একশ্রেণির নাগরিক। তাঁদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাড়তি কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড ক্ষমতায় এসে করের বৈষম্য দূর করেছে। চালু হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য কর জমা দেওয়ার সরল ব্যবস্থা। রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে গত বছর দু'দফায় কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বকেয়া রয়েছে এমন করদাতাদের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে, যাঁদের অনেক বেশি পরিমাণ কর বাকি ছিল তাঁদের এমন সুবিধা অনেক সহজ করে দিয়েছিল পুরসভার নানা উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে। বলতে দ্বিধা নেই কলকাতার অধিকাংশ বাসিন্দার কর জমা দেওয়ার অভ্যাস এখন অনেকটাই নিয়মিত। সামান্য টাকার বিনিময়ে এখন মিউটেশন এবং বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গরিব মানুষের কথা ভেবে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ নানা ধরনের আইনি সুবিধা দিচ্ছে।

যে বিষয়টি না বললে কলকাতা পুরসভার উল্লেখযোগ্য সাফল্য ধামাচাপা পড়ে যাবে তা হল, মহানগর থেকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া কার্যত বিদায় নিয়েছে। কলকাতাকে মডেল করে দেশের অন্যান্য শহরে 'ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ' প্রতিরোধে নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। মাসখানেক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন কলকাতায়। শহরের লাগোয়া পুরসভাগুলিতে কীভাবে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যায় তা নিয়ে পুরভবনে আলোচনার আসর বসেছিল। এক্ষেত্রেও কলকাতাকে মডেল করে দেশের অন্যান্য রাজ্যে পুর এলাকায় ব্যবস্থা নিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। নাগরিকদের কাছে আরও বেশি করে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের সাহায্যে শহরে ৩০টি ওয়ার্ডে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে। প্রথম ধাপে ২২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হবে।

শহরের সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভা শুধুমাত্র ভারত নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও মডেল হতে পারে। বাম জমানায় নজরদারির অভাবে অপরিকল্পিত শহর তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতার পর যাঁরা কলকাতার প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁরাও ভবিষ্যতের কথা ভেবে মহানগরের রাস্তাঘাট, নিকাশি এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা পুরোপুরি করেননি। সেক্ষেত্রে তৃণমূল পুরবোর্ড প্রথম থেকেই দায়িত্ব নিয়ে আগামী ৫০ বছরের পরিকল্পনা করছে। এই যেমন ক'দিন আগে পার্কিং ফি ব্যবস্থায় আধুনিক মেশিন ও ট্যাক্সি স্ট্যান্ড চালু করা হল পুরসভার তরফে। অনলাইনে শহরের যেকোনও প্রান্ত থেকে পার্কিং বুকিং করতে পারবেন গাড়ির আরোহীরা। শহরে আরও বেশ কয়েকটি পার্কিং লট চালু করার প্রস্তাব কার্যকর হতে চলেছে। পুরসভা পরিচালিত স্কুলগুলিতে প্রতিবছরই বিনামূল্যে পাঠ্যবই, স্কুলের পোশাক, স্কুল ব্যাগ, জুতো-মোজা ছাড়াও স্টেশনারি জিনিসপত্র দেওয়া হচ্ছে। গর্বের সঙ্গে এখন আমরা বলতে পারি পুরসভার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। পড়ুয়াদের সংখ্যাও বাড়ছে। একটি বালিকা বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে কলকাতার অধিকাংশ সরকারি বাড়িকে নীল-সাদায় মুড়ে দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। রংটির গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনীন হিসাবে সমাদৃত এবং দৃষ্টিনন্দন হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে এই রঙের পরিবর্তন করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা। কলকাতার প্রায় ৫০০ পার্ককে নতুন করে সাজানো হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদদের টাকায় একই ডিজাইনের রেলিংয়ে মুড়ে গিয়েছে শহর। অথচ এই পার্কগুলি একসময়ে ছিল নেশাখোর এবং সমাজবিরোধীদের দখলে। আজ পরিবর্তনের পর এই পার্কগুলি শুধুমাত্র প্রাতঃভ্রমণ বা শিশুদের খেলার আসর নয়, শহরের অক্সিজেন সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। কারণ প্রতিটি পার্কে অজস্র গাছ লাগানো হয়েছে। নিয়মিত পুরসভার তরফে সেই গাছগুলিকে পরিচর্যাও করা হয়। পার্কগুলির বেশ কয়েকটিতে ইতিমধ্যে অপ্রচলিত বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ পরীক্ষামূলকভাবে দেশপ্রিয় পার্ক দিয়ে শুরু হয়েছে। শহরের ২৮টি পার্কে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

পুরসভার ভাবনায় আরও যে সমস্ত পরিষেবামূলক ব্যবস্থা রয়েছে তার প্রতিটিই আধুনিক নগর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের মধ্যে প্রথম ফ্রি ওয়াই-ফাই সিটি হিসাবে কলকাতা গর্বের মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও একাধিক বুলেটিনে স্বীকার করেছে, পুরসভার সমস্ত কার্যক্রম অনলাইনে চালু করার পাশাপাশি সমস্ত বিষয়টি ইন্টারনেট-ইমেল-হোয়াটসঅ্যাপ প্রযুক্তি নির্ভর হয়েছে কলকাতায়। যে বা যাঁরা বিদেশের নানা শহরের কথা উল্লেখ করে মাঝেমধ্যে হা-হুতাশ করেন তাঁদের বলতে পারি, একবার অন্তত কলকাতা পুরসভার ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়ুন। জেনে নিন কী কী পরিষেবা ও প্রকল্প রয়েছে। অনুরোধ করব, ধূলিমলিনহীন শহরটাকে আরও একবার ঘুরে দেখুন। তা হলে অবশ্যই কলকাতার জন্য আমার মতো আপনাদেরও গর্ব হবে।

নিবন্ধ

ছিটমহল

ইতিকথা ও বৃত্তান্ত

নির্বেদ রায়



শেষপর্যন্ত ৬ জুন, ২০১৫ দিনটিতে ঢাকায় দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল সমস্যার সমাধান ঘটল। ছিটমহল বা পাশা-ছিট। প্রায় তিনশো বছরের পুরনো ইতিহাস। তার কিছু বেশিই হবে। কুচবিহার আর রংপুর প্রতিবেশী রাজ্য, মাঝখান দিয়ে আর দুই রাজ্যের উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছে তিস্তা নদী। আমরা খেয়াল রাখব যে কুচবিহার আর রংপুরের যে জায়গাজমির উপর আমাদের এই আলোচনা হচ্ছে সেটা প্রায় তিন বা সাড়ে তিনশো বছর আগের মানচিত্র ধরে। ফলে আজকের ভূগোলের সঙ্গে ফারাকটুকু মনে রাখা দরকার।

কুচবিহারের মহারাজা আর রংপুরের নবাব। রাজা-রাজড়া থাকবে, নবাব-বাদশা থাকবে অথচ যুদ্ধবিগ্রহ হবে না, রাজ্য বাড়ানোর জন্য অভিযান চলবে না, এ আমার হয় নাকি? এমন সৃষ্টিছাড়া মহারাজা বা নবাব যাই হোক, দেশের প্রজারা তাকে মানবেই বা কেন একটানে? অথচ মহারাজা বা নবাব দু'জনের কেউই বড় যুদ্ধবাজ নন, তাহলে?

তাহলে ওই একটাই পথ। মহাভারতের আমল থেকে যে রীতি চলে এসেছে সেভাবেই চলবে যুদ্ধ। পাশা অথবা দাবার বোর্ডে। লোকক্ষয় নেই, রক্তারক্তি নেই, হারজিতের সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজে পঞ্জা ব মোহরের ছাপে হাতবদল হয়ে যাচ্ছে গ্রাম, দিঘি, চাষের জমি আর জাঙ্গাল। এ রাজা হারছে কি ও নবাব জিতছেন। ওই কাগজ বা 'চিট্' থেকে ছিটমহল নাম এসেছে, না একটানা নবাবের রাজত্বের মাঝখানে কয়েকটা মহারাজের জেতা তালুক, বা তার ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ কুচবিহারের ঢালা রাজত্বের চৌহদ্দির মধ্যে বেশ কয়েকটা গ্রাম-পুকুর-মাঠ যে রংপুরের নবাব পাশার চালে জিতে নিয়েছেন। একরঙা কাপড়ের উপর যেন অএনকগুলি অন্যরঙের ছিটে—তাই কি ছিটমহল?

'চিট বা ছিট' যাই হোক, সমস্যা এখানে থামেনি। খেলতে খেলতে যে গ্রাম মহারাজের রাজ্যের মধ্যেই নবাব জিতেছেন, তার—চারদিক ঘিরে সবটুকু জমি জিতে নিয়েছেন রাজামশাই পাল্টা চালে—নবাব হেরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন, ফলে রাজার গ্রাম পরিসর ঘিরে বাজি জিতে নিয়েছেন নবাব। ফলে মোদ্দা কথা দাঁড়িয়েছে একদম মাঝখানে রাজার রাজত্ব, তাকে ঘিরে নবাব, আবার নবাবের চৌহদ্দি ঘিরে মহারাজার তালুক—এইরকমভাবে তৈরি হয়েছে 'এনক্লেভ', 'কাউন্টার-এনক্লেভ' এমনকী 'কাউন্টার কাউন্টার এনক্লেভ' হল ৫১ নম্বর ছিটমহল—'দহলা-খাগড়াবাড়ি'। ভারতের দখলে। ঘিরে আছে বাংলাদেশের ছিটমহল উপেনচৌকি ভজনা, আবার উপেনচৌকি বেড় দিয়ে ঘিরে আছে ভারতীয় ছিট বলাপারা-খাগড়াবাড়ি। বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার মধ্যে ঘটেছে এই বিচিত্র কাণ্ড।

পাঠক খেয়াল করেছেন যে, নবাব-বাদশার কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমরা ভারত-বাংলাদেশের আলোচনায় ঢুকে পড়েছি। কবে কুচবিহার, ভারত হয়ে উঠল—আর রংপুর বাংলাদেশ—দু'এক কথায় তার দিনক্ষণ বলে দেওয়ার আগে আর একটু লোককথার পর্ব বাকি, সেটুকু বাদ থেকে গেলে ঠিক হবে না।

দাবা না পাশা খেলায় এই হারজিত চলছিল, তা নিয়ে মতান্তর থাকতেই পারে, তবে সম্ভাবনা দু'ক্ষেত্রেই প্রবল। কিন্তু একটা ব্যাপার বিরোধ করা মুশকিল যে দুই রাজা-বাদশা অন্ততপক্ষে ১৬২ বার হারজিতের মুখোমুখি হয়েছিলেন। নেহাত ছোটখাটো খেলুড়ে নন কেউই। কারণ, ছিটমহলের সংখ্যা ওইটিই। দু'দেশ মিলিয়ে ১৬২—ভারত যার মধ্যে ৫১টা ছিটমহল পেয়েছে, বাংলাদেশ পেয়েছে ১১১টি। বাংলাদেশ পেয়েছে ১৭,১৬০ একর জমির অধিকার, ভারত পেয়েছে ৭.১১০ একর জমিতে অধিকার। রাজনীতির কারবারি বিরোধীপক্ষ বলছেন, লাভ হল বাংলাদেশের —এর চেয়ে ভ্রান্ত কথা হয় না। প্রায় ২৫০০০ একর জমিতে কোনও সরকারের কাজই চলেনি এত কাল ধরে। এই চুক্তির মধ্যে সবটাই উপরি পাওনা হল দু'দেশের। কিন্তু তার চেয়ে অনেক অনেক বড় কথা হল মানুষের কথা। ছিটমহলে এতবছর ধরে যে ত্রিশঙ্কুর অসহ্য জীবনযাবন করেছেন যাঁরা, তাঁদের কথা।

এই বৃত্তান্তকেই একমাত্র গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন এই রাজ্যের সরকার—মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেনও সেইভাবে, উপস্থিত থেকেছেন ঢাকায় চুক্তি হওয়ার ঐতিহাসিক মুহূর্তে। ছিটমহল অন্য যে সব রাজ্যকে ছুঁয়ে গিয়েছে তার মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকলে আরও ভাল হত। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে পড়বেন, এব্যাপারে দ্বিধা রেখে লাভ নেই।

ঐতিহাসিক নথি ঘেঁটে বলছেন, ১৭১৩ সালে কুচবিহার মহারাজার সঙ্গে মোগল সম্রাটের চুক্তি হয়েছিল একেবারেই অমনোযোগী মুহূর্তে। তারই অসংখ্য ছিদ্রপথে ঢুকে পড়ে ছিটমহলের সমস্যা। বোধহয় যুদ্ধশেষের শান্তিচুক্তি একটু অমনোযোগী হয়ে পড়ে—কিন্তু সব কিছুরই সীমা আছে। আর ছিটমহলের সংখ্যা আর বৈচিত্র শুধুমাত্র চুক্তির ক্ষেত্রে এই অমনোযোগী মতামতকে পূর্ণ সমর্থন করে না।

যে কথায় আসছিলাম, ১৭১৩ সালকে আশ্রয় করলেও প্রায় ২৩৪ বছর পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও আইনজীবী ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত নির্দেশ করে দেশভাগ করেন। র‍্যাডক্লিফ লাইন। র‍্যাডক্লিফ চোখে কম দেখতেন। দেশভাগের সময়ও সেই 'মাইওপিয়া কাজ করল। ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তান থেকে জন্ম নিল নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

দেশভাগে কুচবিহার করদ রাজ্য এল ভারতে, রংপুর পূর্ব-পাকিস্তানে, এখনকার বাংলাদেশে। আর ১৯৪৯ সালে 'অ্যানেক্সেসন' পর্বে কুচবিহারের মহারাজা তাঁর রাজ্যকে ভারতের অঙ্গীভূত করে দেন।



ফলে ভারত আর বাংলাদেশে ভাগ হয়ে যায় যাবতীয় ছিটমহল। খুব সংক্ষেপে এই হল ছিটমহলের বৃত্তান্ত।

নবাবি খেয়াল আর রাজসিক খেলা যে সমস্যাকে তৈরি করেছিল স্বাধীনতার পর দুই প্রধানমন্ত্রী নেহরু আর ফিরোজ খান নুন সে নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেন ঠিকই, কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্রম-অবনতির ফলে কথা বেশিদূর এগোয়নি। সুপ্রিম কোর্ট আর সংবিধানের নবম সংশোধন পর্যন্ত এগিয়ে ব্যাপারটি থেমে থাকে।

ফিরে তাকাতে অপেক্ষা করতে হয় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ইন্দিরা-মুজিব স্তরে কথা এগোয় একদিকে বেরুবাড়ি অন্যদিকে তিনবিঘা করিডর পর্যন্ত।

যদিও জমির জটিলতা তার বেশি সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারেনি।

১৯৯৭ সালে দুই দেশ মিলে ছিটমহলের সংখ্যা নির্দিষ্ট করার কাজ শেষ করে, যদিও সামান্য কয়েকটি ছিট নিয়ে সমস্যা ছিল। তবু মূল কাজ শেষ হয়। শুরু হয় জনগণনার কাজ ২০০৭ সালে দুই দেশের মিলিত চেষ্টায়।

২০১০ সালের জুলাই মাসের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় সে ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ছিটমহলে বাস করছেন ১৪,২১৫ জন মানুষ। উল্টোদিকে বাংলাদেশের মধ্যে ভারতীয় ছিটে বসবাস করেছেন ৩৭,২৬৯ জন মানুষ। ফলে এখন প্রায় ১৪০০০ মানুষ হবেন ভারতীয় নাগরিক আর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাবেন প্রায় ৩৬০০০ মানুষ। যদিও ছিটমহলের বাসিন্দারা কে কোন দেশে নাগরিকত্ব নেবেন, সেই বিষয়টি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া আছে সেই মানুষদের উপর, আর সেকারণে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশের মধ্যে চলে যাওয়া অঞ্চলের অধিবাসী চেয়েছেন ভারতের নাগরিক হতে। তাঁরা চলে আসবেন ভারতে।

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানের ১১৯ তম সংশোধনের মধ্য দিয়েই সমাধানের পথ প্রশস্থ হল ছিটমহল সমস্যার।

৩১ জুলাই, ২০১৫ মধ্যরাতে 'হাতবদল' নয়, 'দেশবদল' হল, পাল্টে গেল দু'দেশের আয়তন ও সীমান্ত। ৩০ জুন, ২০১৬ সালের মধ্যে দু'দেশের সার্ভে ডিপার্টমেন্ট কার্যকরী রূপ দেবেন এই ঘোষণার। মানুষজন তাঁদের নিশ্চিত আর নির্দিষ্ট নাগরিক অধিকার পাবেন ৩০ নভেম্বর, ২০১৫ সালের ধারে কাছে। কারণ, ওই সময়ের মধ্যে যাতায়াত শেষ করার কথা দু'দেশের মিলিত প্রায় ৫১ হাজার 'নাগরিকের'।

এতদিন ধরে গোপন পাচার, অস্ত্রের চোরাচালান আর জাল পাসপোর্টের নরকে আবদ্ধ ছিটমহলের মানুষ, স্বাধীন দুটো দেশের সমস্ত উন্নয়নের ধারা থেকে বঞ্চিত মানুষ মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। আজ অন্ধকারের যবনিকা' উঠছে। এই মুক্তির আনন্দের কোনও ব্যালান্সশিট হবে না।

ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় বিদ্রোহী স্পার্টাকাস বলেছিল, আমার নবজাতক শিশু যে তার মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে, সে শেষপর্যন্ত এই পৃথিবীর এক স্বাধীন নাগরিক।

ছিটমহলের অভিশপ্ত অধ্যায় আজ অতীত।

নিবন্ধ

ভাল আছে নন্দীগ্রাম

শুভেন্দু অধিকারী



ভয়াবহ নারকীয় অত্যাচার। রক্তাক্ত অধ্যায়। ৪২ শহিদের আত্মত্যাগ। শতশত নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রম লুণ্ঠন। মা-হারা শিশুর কান্না। অসংখ্য আক্রান্তের আর্তনাদে মুখরিত নন্দীগ্রাম। বশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান নন্দীগ্রাম ব্রিটিশ শাসক থেকে শুরু করে কুখ্যাত হার্মাদ-ক্যাডাররাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একইভাবে গোটা বিশ্বে নজর কেড়েছিল, জয়যুক্ত হয়েছিল তৃণমূলের নেতৃত্বাধীন ভূমিরক্ষা কমিটির আন্দোলন।

২০১১ সালে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই লড়াই সংগ্রামের পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত নন্দীগ্রাম, ক্ষতবিক্ষত নন্দীগ্রাম এবং তাকে কেন্দ্র করে পুনর্গঠন ও অসংখ্য সৃষ্টির কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল মানুষের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না মাননীয় জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ ও রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিয়ে গত চার বছরে আরও বেশি করে নবরূপে উন্নয়নের নানা কর্মসূচিতে সজ্জিত হয়েছে আন্দোলনের গর্ভগৃহ নন্দীগ্রাম।

মা-মাটি-মানুষের সরকার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আসার পর প্রথমত নন্দীগ্রামে গুলি-বোমার শব্দ থেমেছে। মানুষকে ঘরছাড়া করে দেওয়ার বাম শাসকের ফরমান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীকে আর নিজের জমি চলে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন নিয়ে রাতে ঘুমোতে যেতে হয় না। ঈদ-মহরম-দীপাবলি এবং নন্দীগ্রাম উৎসব ও পল্লী উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষের হারিয়ে যাওয়া আনন্দ পুনরায় পুনঃস্থাপিত হয়েছে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষের সরকার এবং এলাকার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত-বিধায়ক ও সাংসদদের সার্বিক প্রয়াসে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দেওয়া উন্নয়নের সমস্ত প্রতিশ্রুতি একে একে পূরণ করা হয়েছে গত কয়েক বছরে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিগত বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে জননী ইটভাটা সংলগ্ন তেখালি ব্রিজের পার্শ্ববর্তী মাঠে জনসভা করেছিলেন। সেখানে জননেত্রী নন্দীগ্রামের মানুষের উদ্দেশে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। আজ নন্দীগ্রাম আন্দোলনের একজন সৈনিক হিসাবে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আমাদের জননেত্রী তার সবটাই পূরণ করেছেন। আর সেই কারণে পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের মানুষ গণতন্ত্রের উৎসবে আরও বেশি করে অংশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে আগের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় সমর্থন করেছেন।

জননেত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল— এক) ২০০৭ সালের ১৬ নভেম্বর কলকাতা হাই কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরিন্দর সিং নির্ঝরের দেওয়া ১৪ মার্চের গুলি চালিয়ে গণহত্যা সম্পর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে স্থগিতাদেশ দিয়ে এসেছিল। নেত্রী জানিয়েছিলেন রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এই মামলা প্রত্যাহার করা হবে। কথা রেখেছেন, অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন জননেত্রী। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকারের পক্ষে দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে স্পেশাল লিভ পিটিশন প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু নন্দীগ্রাম তথা বাংলার মানুষকে হতাশ করেছে সিবিআই। তারা ১৬ মার্চ গণহত্যার নায়কদের বিরুদ্ধে না কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে, অথবা সেই সমস্ত কুখ্যাত ষড়যন্ত্রকারীদের শাগরেদদের বিরুদ্ধেও কোনওরকম চার্জশিট দেয়নি। এমনকী চটি পরা পুলিশের পোশাক গায়ে দিয়ে এসে নন্দীগ্রামে গণহত্যায় অংশ নেওয়া সিপিএমের কুখ্যাত গুণ্ডাদের বিরুদ্ধেও কোনওরকম ব্যবস্থার সুপারিশ করেনি সিবিআই। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাই সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন জারি রয়েছে।

দুই) জননেত্রীর দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল নন্দীগ্রাম আন্দোলনে অংশ নেওয়া হাজার হাজার কৃষক এবং যুবকদের বিরুদ্ধে তৎকালীন শাসক সিপিএমের দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এবিষয়েও জননেত্রী তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। ২০১২ সালের ১৩ মার্চ মহাকরণে দাঁড়িয়ে সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের সরকারি সিদ্ধান্তের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। রাজ্য মন্ত্রিসভা নন্দীগ্রাম কাণ্ডের ৩০৭টি মামলা প্রত্যাহারের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। যার মধ্যে ৩০৪টি মামলা ইতিমধ্যে প্রত্যাহৃত হয়েছে। তিনটি মামলা প্রত্যাহার করার জন্য হলদিয়া আদালতে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তিন) উন্নয়নে নন্দীগ্রামকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন জননেত্রী। সেকথাও পূর্ণ করেছেন তিনি। পরিবর্তনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ যখন দায়িত্বে আসে তখন নন্দীগ্রামের দু'টি ব্লকের ৬০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। কিন্তু এখন ১০০ শতাংশ বাড়িতেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। দু'টি ব্লকে ১৭টি গ্রামে ১৫টির বেশি বড় রাস্তা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক রোজগার যোজনায় সম্পূর্ণ হয়েছে। নন্দীগ্রামকে স্বাস্থ্য জেলা ঘোষণা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাসকৃত চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামো তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। ইতিমধ্যে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস চালু হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য পরিকাঠামো এবং পরিষেবা খুব শীঘ্রই চালু হবে। নন্দীগ্রামের নির্মীয়মাণ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চালু হলে দুই ব্লকের মানুষকে জটিল চিকিৎসার জন্য আর বাইরে যেতে হবে না। হরিপুরে কিষানমাণ্ডি চালু হয়েছে। নন্দীগ্রাম-দুই ব্লকের আমেদাবাদে একটি বেসরকারি কলেজ পঠন-পাঠনের স্বীকৃতি পেয়েছে। একাধিক মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা হয়েছে গত চার বছরে। শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে মা-মাটি-মানুষের সরকার নজিরবিহীনভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে। দুটি ব্লকে দুটি নতুন মাদ্রাসা অনুমোদন পেয়েছে। ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটিতেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পূর্ণ গতিতে সচল রয়েছে।

একটা সময় বাম শাসনে হলদিয়া উন্নয়নপর্ষদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল নন্দীগ্রামের ১৭টি গ্রামের বাসিন্দারা। আর গত চার বছরে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের বিপুল কর্মযজ্ঞ গ্রামের আম-জনতাকে শুধুমাত্র মুগ্ধ করেনি, গর্বিতও করেছে। নন্দীগ্রাম দুই ব্লকে ১৯ কিলোমিটার ব্যাপী দীর্ঘ রাস্তা ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ। হিজলি টাইডাল ক্যানেল সংস্কার করে কৃষক ও মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার কাজ সম্পূর্ণ করেছে এই পর্ষদ। ৩০টির বেশি বড় রাস্তা নতুন করে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে তৈরি


মমত



করা হয়েছে। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের অর্থে নন্দীগ্রামে বহু পুরনো রাস্তা সংস্কার হয়েছে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে মানুষের এখন আর কোনওরকম দুর্ভোগ পোহাতে হয় না। সীতানন্দ কলেজ-সহ ২০টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাড়ি তৈরি করার পাশাপাশি নানা ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। কেন্দামারিতে এক কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক জেটি তৈরি করে মানুষকে নদীর জলে কাদামাটি মাখা দুর্ভোগ থেকে থেকে মুক্তি দিয়েছে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ। প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নন্দীগ্রামে বাইপাস রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে মূল শহর চণ্ডীপুর থেকে নন্দীগ্রামে স্বল্প সময়ে এবং দ্রুত পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি দুই ব্লকের মানুষের যানজট থেকে অনেকটাই মুক্তি ঘটেছে। বাম জমানায় এই বাইপাসের দাবিতে বহুবার তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলন করেছিল। কিন্তু তা হয়নি। পরিবর্তনের পর হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের দায়িত্ব পেতেই এই কাজ আমরা সম্পূর্ণ করেছি। রেয়াপাড়া, দেবীপুর, হরিপুর, টেঙ্গুয়া, নন্দীগ্রাম বাজার, মহেশপুর, তেখালি, ভাঙাবেড়া, সোনাচূড়া, গড়চক্রবেড়িয়া, হাজরাকাটা, সরস্বতী বাজার, চৌরঙ্গিবাজারের মতো জনবহুল এলাকায় সুদৃশ্য এলইডি আলো লাগানো হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না সন্ধের আঁধার নামতেই এই পথবাতির মাধ্যমে নন্দীগ্রামের পাড়ায় পাড়ায় নগরায়ণের আলোকমালা পৌঁছে যাচ্ছে। এ ছাড়া সোনাচূড়ায় আইটিআই কলেজের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জমি চিহ্নিতকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কলেজ তৈরির কাজ শুরু হবে। জেলিংহামে ফের কারখানা চালুর ব্যবস্থা হয়েছে। নন্দীগ্রামকে নবরূপে সজ্জিত করার কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সদস্য, বিধায়ক, সাংসদরা অহর্নিশি করে চলেছেন। বস্তুত, এই কারণে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ আস্থা প্রকাশ করেছেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা কিন্তু নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারকে একমুহূর্তের জন্য ভুলিনি। ৪২জন শহিদের অধিকাংশের পরিবারের অন্তত একজন করে সদস্যর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত বেকারের বেকারত্ব ঘোচানোর ব্যবস্থা না করা গেলেও যেসমস্ত শহিদের রক্তের বিনিময়ে নন্দীগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছিল তাঁদের আমরা ভুলিনি। সমস্ত শহিদ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রিয় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ পরিবার যাতে অনাহারে না থাকে তার জন্য নেত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমরা সকলে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

১৪ মার্চ ভাঙাবেড়ায় কুখ্যাত হার্মাদদের গুলিতে শহিদদের কথা আগামী প্রজন্ম যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের দু'মাসের ভাতা একত্রিত করে ১৩২ ফুট উঁচু শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে অতিথি নিবাস, শহিদ স্মৃতি দাতব্য চিকিৎসালয়, সর্বধর্ম প্রার্থনা কক্ষ নির্মিত হয়েছে।

রাজ্য সরকারের তরফে ১৪ মার্চ কৃষক দিবস ঘোষিত হয়েছে। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ সীতানন্দ কলেজ মাঠে এসে প্রথম কৃষক দিবসের অনুষ্ঠান সূচনা করে গিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন থেকেই রাজ্য সরকারের কৃষি দফতরের তরফে প্রতি ব্লকে একজন করে কৃষককে 'কৃষিরত্ন' সম্মান দেওয়া হচ্ছে। এটাই মা-মাটি-মানুষের সরকারের তরফে নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলনের স্বীকৃতি।

নন্দীগ্রামের এক নম্বর ব্লকের কৃষকদের একটি বিশেষ সমস্যা রয়েছে। তা হল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে আমন ধান চাষ। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নদীর অববাহিকায় হওয়া ভূখণ্ডে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে আমন ধান নষ্ট হয়ে যায়। তাই ধান চাষ হলেও ফসল





অধিকাংশ সময়েই ঘরে তুলতে পারেন না কৃষকরা। যদিও নন্দীগ্রাম-দু'নম্বর ব্লকের বিকল্প প্রথায় বোরো ধান চাষ হওয়ায় সেখানকার কৃষকদের এমন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। আর তাই হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ এবার রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিয়ে বিকল্প প্রথায় ধান চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়াও একটি মহিলা কলেজ, খেলাধুলার জন্য স্পোর্টস অ্যাকাডেমি সহ নানা পরিষেবামূলক প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। মাননীয় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময় নন্দীগ্রাম-দেশপ্রাণ রুটে রেল প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। সংসদে ঘোষণা করেছিলেন, যাঁরা এই প্রকল্পে জমি দেবেন তাঁদের জমির মূল্য ছাড়াও পরিবারপিছু একজনের চাকরি হবে। সেই মতো গ্রুপ-ডি বিভাগে রেলে কর্মসংস্থান হচ্ছিল নন্দীগ্রামের রেল প্রকল্পের জন্য জমিদাতাদের। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে জমিদাতাদের চাকরি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। স্বভাবত এই কারণে প্রায় ৫০০ পরিবার কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। একইসঙ্গে নেত্রীর কাজ শুরু করানো রেল প্রকল্পটি ৫০ শতাংশ তৈরি হওয়ার পর আপাতত বন্ধ রয়েছে। রাজ্য সরকার গোটা বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ভাবনা চিন্তা করছে। আমি নিজে সংসদে একাধিকবার বিষয়টি উত্থাপন করেছি। রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, রেল ভবনে গিয়ে দরবার করেছি। কিন্তু স্রেফ নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে অবজ্ঞা করার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনামাফিক এই রেল প্রকল্পটি থমকে দিয়েছে। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল বাজেটে ঘোষণার পর প্রকল্পটি সংসদ যেমন অনুমোদন করেছিল তেমনি রেল বোর্ডও অনুমতি দিয়েছিল। আমাদের স্থির বিশ্বাস নেত্রী আগামিদিনে এই রেল প্রকল্পের বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। পাশাপাশি আমরাও নন্দীগ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি দিল্লিতেও ধরনা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি।

জননেত্রীর নেতৃত্বে গোটা বাংলায় পরিবর্তনের পর নন্দীগ্রামে বোমা-গুলির শব্দ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে। বারুদের গন্ধ আজ অতীত। মানুষ শান্তিতে রয়েছেন। উন্নয়নের সুবাস প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সম্মান পেয়েছেন নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের বীর সৈনিকরা। আমরা তাই একটি বিষয়ে নিশ্চিত যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের দায়িত্বে আছেন ততদিন নন্দীগ্রামে উন্নয়নের আলো ক্রমেই আরও জোরালো হবে। সব মিলিয়ে এক কথায় বলতে পারি, বশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পুণ্যভূমি নন্দীগ্রাম এখন অনেক ভাল আছে।



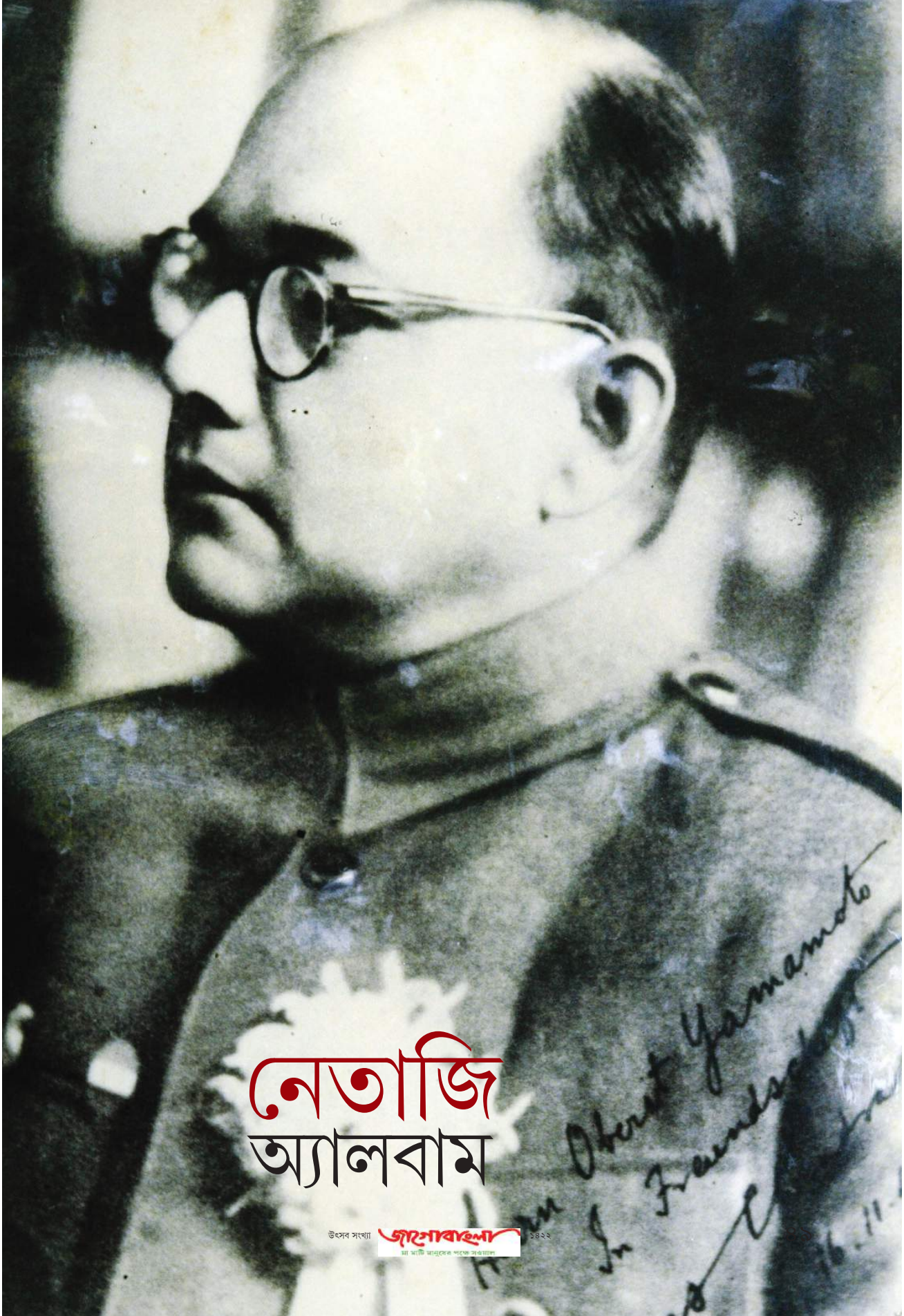

নেতাজি অ্যালবাম
























KL




















A HISTORICAL INCIDENT WHEN NETAJI
"SUBHASH CHANDRA BOSE" MET "HITLER"



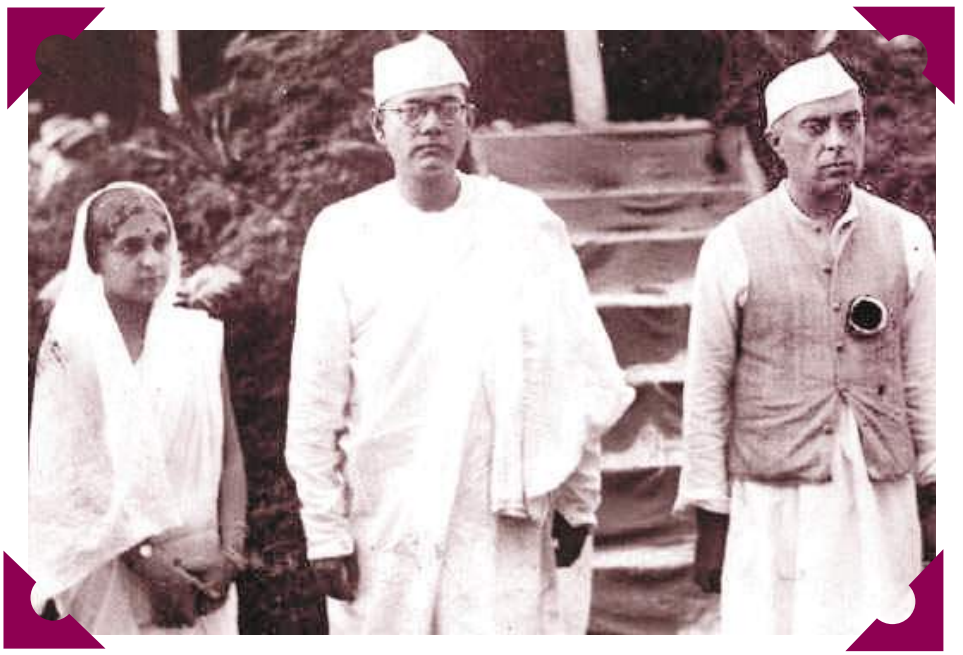









নিবন্ধ

স্থির লক্ষ্যের দিকে চোখ রেখেই এগোচ্ছে সরকার

সুব্রত বক্সি



বহু লড়াই-সংগ্রাম, চাপান-উতোরের মধ্য দিয়ে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজ্যপাটে ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন ২০১১ সালের ২০ মে। এর পর আমরা প্রায় সাড়ে চার বছর পেরিয়ে এসেছি। ইতিমধ্যেই বাংলার মানুষের মনে এই সরকার মা-মাটি-মানুষের সরকার হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে।

একটা সন্ত্রাসমুক্ত, উন্নয়নমুখী, যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের বাংলা গড়তে আমরা রাজ্যের মানুষের কাছে বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যে চোখ রেখেই এগোচ্ছে সরকার।

তবে কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে এই পরিবর্তন বাস্তবায়িত হয়েছে, তা প্রতি পদক্ষেপেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। ২০১১ সালের ঐতিহাসিক পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচন। মাত্র ২৭ দিনে ১৮৭টা জনসভার মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত বাংলার ৯ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। কখনও হেলিকপ্টার, কখনও স্কুটারে, কখনও সাইকেলে, কখনও গাড়িতে আবার কখনও পায়ে হেঁটেই। সেই নির্বাচনের সন্ধিক্ষণে তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন করেছিলেন, নতুন বাংলা গড়ার জন্য তাঁর 'পরিবর্তন'-এর ডাককে সমর্থন করতে। সেদিন নেত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে রাজ্যের সর্বস্তরের, সর্বধর্মের, সর্বজাতির মানুষ গড়ে দিয়েছিলেন নতুন পরিবর্তনের সরকার।

শুরু হল বাংলার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ চলা। একদিকে বিরাট অর্থনৈতিক ঋণের বোঝা। অন্যদিকে মানুষের অসীম চাহিদা। এই পরিস্থিতিতে সব দিক মাথায় রেখেই নিরলস পরিশ্রম করে তিনি শুরু করলেন উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। আজ সুদূর দার্জিলিং থেকে জঙ্গলমহল পর্যন্ত এক শান্তির বাতাবরণ উপলব্ধি করা যায়। কারণ, সরকার তৈরি হওয়ার মাত্র ১৮





দিনের মাথায় জঙ্গলমহলে দাঁড়িয়ে অনুন্নয়নের অন্ধকার সরিয়ে উন্নয়নের দরজা খোলার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। বন্ধ হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েতের সব দরজা ধীরে ধীরে খুললেন। মানুষের কাছে তার পাওনা পৌঁছে দিতে শুরু করলেন। স্কুল-কলেজে ফের বেজে উঠল ক্লাসের ঘণ্টা। জঙ্গলমহলের মানুষ নতুন করে জীবন শুরু করল। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে মানুষের কাছে প্রশাসনের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করলেন। সর্বস্তরের ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টজনদেরও শামিল করলেন উন্নয়নের কাজে। প্রায় না খেতে পাওয়া মানুষকে পেট ভরে অন্ন যোগাতে ধাপে ধাপে সমগ্র জঙ্গলমহলে ২ টাকা কিলো দরে চাল পৌঁছে দিলেন। এক সময় কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটে কষ্ট করে পানীয় জল আনতে যেতেন জঙ্গলমহলের মা-বোনেরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে এসে সেই প্রত্যন্ত এলাকায় টিউবওয়েল তৈরি-সহ পর্যাপ্ত পানীয় জলের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। প্রায় প্রতি পরিবার পিছু হাতে তুলে দিলেন সাইকেল। এই উদ্যোগ একদিকে যেমন ছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে অত্যন্ত সহায়ক হল, তেমন ভাবেই দূর-দূরান্ত থেকে জল আনার কষ্টও লাঘব হয়েছে।

পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠল জঙ্গলমহল। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতাই জঙ্গলমহলের সার্বিক চিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। এক সময় কাগজ খুললেই মাওবাদী হামলায় মানুষের মৃত্যুর খবরই ছিল জঙ্গলমহলের রোজনামচা। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতার কান্ডারি হওয়ার পর সেই খবর এখন ইতিহাসমাত্র। পরিসংখ্যান বলছে, গত সাড়ে চার বছরে মাওবাদী হামলায় একটাও খুনের ঘটনা নেই।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ তাদের নিজেদের পঞ্চায়েত গঠন করেছে। ফিরে পেয়েছে নিজের অধিকার। আজ মানুষ তার নিজের পাওনা সরকারের কাছে বুঝে নিচ্ছে। তাই জঙ্গলমহলবাসী আজ সুখে, আনন্দে দিন যাপন করছে। এটাই মা-মাটি-মানুষের সরকারের দায়িত্ব।

অন্যদিকে তাকান। সুদূর পাহাড়ে দার্জিলিংয়ের অবস্থা এক সময়ে কী ছিল? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে পাহাড়ের মানুষকে উত্যক্ত করতে নানা উসকানিমূলক বক্তব্য আমরা দেখেছি। সেই সময় খবরের শিরোনামে রোজই জায়গা করে নিত দার্জিলিংয়ের দু'দিন, চার দিন, সাত দিন, এমনকী অনির্দিষ্ট কালের বন্ধ, অবরোধ। লক্ষ্য ছিল দার্জিলিংকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এই প্রতিকূলতার চ্যালেঞ্জ নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে ছুটে গিয়েছেন বারবার। পাহাড়ের মানুষকে জয় করেছেন এবং বুঝিয়েছেন, দার্জিলিং বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্ষমতায় আসার পরই তিনি আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে বাংলার পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সকে পুনরায় জায়গা করে দিয়েছেন। আজ বাংলা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে মানুষ সপরিবারে, শান্তিতে ছুটি কাটাতে আসেন দার্জিলিংয়ে। তাই আজ জঙ্গলমহল থেকে পাহাড়ের অবস্থা উপলব্ধি করলেই বাংলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কত উন্নত তা বোঝা যায়।

উন্নয়নমুখী বাংলার ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড আজও চলছে। সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে পুঁজি করে গ্রামীণ শহর, আধা শহরে নানা প্রকল্প নিয়ে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছেছেন। গীতাঞ্জলী, নিজ ভূমি নিজ গৃহ, জল ধরো জল ভরো, আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, কিষাণ মান্ডি, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, মাতৃযান, শিশুসাথী-সহ বিভিন্ন প্রকল্প, ব্লকে ব্লকে স্কুল তৈরি, পুরনো স্কুলের পরিকাঠামো ও মানোন্নয়ন, আইটিআই-সহ নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত



করেছেন। শুধু প্রকল্প তৈরি করে ঘরে বসে থাকেননি। মানুষ যাতে সুফল পায় তা নিশ্চিত করতে গত সাড়ে চার বছরে বারবার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ছুটে গিয়েছেন জেলায় জেলায়। একশোর উপর প্রশাসনিক বৈঠক সেরে ফেলেছেন। পৌঁছে গিয়েছেন মহকুমা পর্যন্ত। মানুষের পাওনা সময়মতো মিলছে কি না তা দেখতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে চলেছেন। আর এই কর্মকান্ডের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছেছে বলেই মানুষ যখনই সুযোগ পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। তাই তাঁর শাসনকালে ছোট-বড় যত নির্বাচন হয়েছে সমর্থনের জোয়ারে ভেসে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এর মধ্যেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি-সহ কিছু সংবাদমাধ্যম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার করে বাংলার এই অগ্রগতিকে রুখে দিতে চাইছে। এই লড়াই প্রতিদিনই চলছে। মানুষ সুযোগ পেলেই এই বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশির্বাদ করছেন। তবু চলছে চক্রান্তের প্রচেষ্টা।

তাই আমার সহকর্মীদের কাছে আবেদন, কঠিন না হলেও এই তাৎপর্যপূর্ণ লড়াইয়ে আমাদের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে। সব সময় সজাগ থাকতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রম, মানুষের সমর্থন, আর কর্মীদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। দীর্ঘ ৪০ বছরের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের কাছে তাঁদের আস্থা, বিশ্বাস অর্জন করেছেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ঐতিহাসিক নজির। তিনি প্রতিমুহূর্তে মানুষের কথা ভেবে কাজ করছেন। আর সেই কাজের সার্বিক সুফল গ্রাম-বাংলার প্রত্যন্ত মানুষের দোরে দোরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বই আমাদের। সরকার এবং মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে প্রতি মুহূর্তে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে আমাদেরই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ আজ শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আলোচিত হয়। কন্যাশ্রী প্রকল্প আজ বাংলা তথা ভারতের আঙিনা ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে সমাদৃত। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাজের আঙ্গিক আজ সমগ্র দেশের কাছে উন্নয়নের মডেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। কুৎসা, অপপ্রচারকে প্রতিহত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যপাটের মেয়াদে তার রিপোর্ট কার্ড নিয়েই আমরা মানুষের কাছে পৌঁছব। প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখতে হবে সমাজের সব অংশের মানুষের সঙ্গে। সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা মানুষ পাচ্ছে কি না তা নজর রাখতে হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডই রাজ্যের পাহাড়চূড়া থেকে সাগর কিনারের তরঙ্গ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারের মূল উপজীব্য।

নিবন্ধ

তৃণমূল সরকারের সাড়ে চার বছর

অভিরূপ সরকার



দেখতে দেখতে আরেকটা বিধানসভা নির্বাচন এসে পড়ল। বিরোধীরা যতই অপ্রচার করুক না কেন, যতই খুঁটে-খুঁটে নোংরা বার করার চেষ্টা করুক না কেন এক শ্রেণির মিডিয়া, সামান্যতম রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই জানে ২০১৬ সালের নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস বিপুলভাবে ক্ষমতায় ফিরে আসবে। কিন্তু একদল মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত এখনও আছেন, যাঁরা তাঁদের বৈঠকখানার আরাম-কেদারায় বসে কিছু-কিছু গণমাধ্যমের চোখ দিয়ে রাজ্যকে বোঝার চেষ্টা করেন।

তৃণমূলের নিন্দা করা তাঁদের দৈনন্দিন অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা মনে করেন, পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সাম্প্রতিক সাফল্যগুলি আসলে বলপ্রয়োগ এবং অনৈতিকভাবে পুলিশকে কাজে লাগানোর ফলে সম্ভব হয়েছে। এই লেখা তাঁদের অবগতির জন্য লিখছি।

আসল সত্যটা খুবই সহজ। যতই অপপ্রচার হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল ভাল কাজ করছে তাই একটার পর একটা নির্বাচনে তার জিত হয়ে চলেছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর কাজ করেছে তৃণমূল সরকার। এবং সেই কাজ দেখে খুশি হয়ে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিচ্ছে—এটাই সত্য। কী করে এটা সম্ভব হল?

ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা গভীর প্রশাসনিক সংস্কার এই রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন যেটা খুব বেশি প্রচার পায়নি। আগে, বামফ্রন্টের আমলে, স্থানীয় নেতারা স্থানীয় স্তরে কী কাজ করছেন সেটার উপর তেমন কোনও নজরদারি ছিল না। স্থানীয় ব্যাপারে স্থানীয় নেতারাই ছিলেন শেষ কথা। ফলে অনেক সময়েই দেখা যেত স্থানীয় নেতারা মানুষের জন্য কাজ না করে শুধুমাত্র নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল স্তরে কাজের জন্য স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা তাঁদের থেকেও আরও বেশি করে, প্রশাসনকে জড়িয়ে ফেলা হল। বিডিও, এসডিও, ডিএম-রা তৃণমূল স্তরের উন্নয়নের জন্য সরাসরি দায়বদ্ধ হয়ে পড়লেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। একদিকে যেমন এই প্রশাসনিক ব্যক্তিদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হল, তেমনই অন্যদিকে, বাড়ল এঁদের দায়বদ্ধতাও। এখন, শুধু যে নবান্ন-এ বসে মুখ্যমন্ত্রী এঁদের কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখছেন তাই নয়, নিয়মিত জেলা সফরে গিয়ে সরাসরি এঁরা কী কী কাজ করেছেন আর কী কী কাজ করা বাকি আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ান তিনি নিজের চোখে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছেন। ফলে রাজ্যের উন্নয়নের বিশদ মানচিত্রটা মুখ্যমন্ত্রীর নখদর্পণে রয়ে যায়। আর একই সঙ্গে প্রশাসনের উপরেও একটা প্রচণ্ড চাপ জারি থাকছে।

এত পরিশ্রম পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী করেননি। সিপিএম-এর জ্যোতি বসু কিংবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো কলকাতায় বসেই প্রশাসন চালাতেন। ফলে জেলার খুঁটিনাটি অন্যের মুখ থেকে তাঁদের জানতে হত। সেই জানার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অনেক জল মিশে থাকত। যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তার কণামাত্র সিপিএম-এর মুখ্যমন্ত্রীদের ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রীর এই নিরলস পরিশ্রমের ফল নানাভাবে দেখা যাচ্ছে। এখানে তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, রাস্তাঘাটের দৃশ্যতই উন্নতি হয়েছে। বিশেষত জেলার রাস্তাঘাট। গ্রামের রাস্তাঘাট। বাম আমলে যে সব রাস্তা দিয়ে যাওয়া যেত না, এখন অনায়াসে সেখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া যায়। উদাহরণ, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে। উদাহরণ, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির রাস্তা। কেবল বড় বড় রাস্তাগুলোই নয়। বর্তমান লেখককে রাজ্যের চতুর্থ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গ্রামান্তরে প্রচুর ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়েছে রাস্তাঘাটের উন্নতি। ব্যতিক্রম কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন কয়েকটি রাস্তা। এনএইচ ৩৪-এর মতো কয়েকটা রাস্তা, যেগুলো জাতীয় হাইওয়ে কমিশনের অধীনে, সেগুলোর অবস্থা অতি শোচনীয়। রাস্তা সারানোর জন্য এবং চওড়া করার জন্য যতটা নতুন জমি দরকার তার পুরোটা অধিগ্রহণ করা না হলে নাকি কাজই শুরু করা যাবে না, এই অজুহাত দিয়ে মেরামতের কাজ ক্রমশ পিছানো হচ্ছে। যে সব বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ হয়ে গিয়েছে সেখানে কাজটা শুরু করে দিতে, কেন্দ্রীয় সরকরের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছাড়া, আর কী অসুবিধা ছিল, বোঝা কঠিন।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যে কল্যাণমূলক কাজকর্মে অসম্ভব উন্নতি হয়েছে। নরেগা কিংবা পানীয় জল সরবরাহের মতো পুরনো প্রকল্পগুলোর টাকা আগে ঠিকমতো কাজে লাগত না। রাজ্য যতটা খরচ করতে পারে তার সামান্য ভগ্নাংশও খরচ হত না। এখন হচ্ছে। তা ছাড়া গবেষকরা বলছেন, আগে টাকা গরিবদের কাজে না লেগে অনেক ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের কাজে লাগত যেহেতু তারা ছিল স্থানীয়ভাবে শক্তিশালী। সে সব দিন এখন আর নেই। এখন গরিবদের টাকা গরিবদের জন্যই খরচ হচ্ছে।

পুরনো প্রকল্পগুলির রূপায়ণে যেমন উন্নতি হয়েছে তেমনি নতুন-নতুন অনেক প্রকল্পও শুরু হয়েছে। সবার আগে কন্যাশ্রী প্রকল্পটির কথা বলা যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ গরিব ঘরের মেয়ে এর থেকে উপকার পাচ্ছে। এই প্রকল্পটির ফলে যেমন একদিকে মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহ বেড়েছে তেমনি বেড়েছে তাদের গড় বিয়ের বয়স। একইভাবে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে অসংখ্য মানুষ ওষুধ কিনছেন, উপকার পাচ্ছেন। তৃতীয়ত, কৃষকদের কাছ থেকে পূর্ব-ঘোষিত সহায়ক মূল্যে আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ধান সংগ্রহ করছে রাজ্য সরকার। বলা প্রয়োজন, কৃষকদরদি সরকার হিসাবে বামফ্রন্ট বিরাট ঢক্কানিনাদসহ নিজেদের জাহির করা সত্ত্বেও আগের জমানায় সরকারের ধান সংগ্রহ ছিল সমস্ত ধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে সব থেকে কম। তৃণমূল সরকার ধান সংগ্রহের দায়িত্বটা



বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। নতুন-নতুন সংগ্রহ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে, ধান রাখার গুদাম তৈরি হচ্ছে। এর ফল মূলত দু'টি। এক, আরও বেশি কৃষক তাঁদের পণ্যের জন্য ন্যূনতম মূল্যের নিরাপত্তা ভোগ করতে পারছেন। দুই, রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও বেশি গরিব মানুষ তাঁদের দৈনন্দিনের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছেন।

তৃণমূল সরকারের সফলতার খতিয়ান আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন যুগের অবসান, রাজ্য থেকে বন্‌ধ-এর অবসান, রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নতুন-নতুন স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা, সরকারের কাজে লালফিতের ফাঁস কমে আসা, কলকাতা শহরকে একটা ঝকঝকে চেহারা দেওয়া ইত্যাদি আরও বহু কাজ এই কয়েক বছরেই করে ফেলেছে তৃণমূল সরকার। এর সঙ্গে এ-কথাও বলতে হবে যে, মুখ্যমন্ত্রীর নিয়মিত সফরের ফলে জঙ্গলমহল এবং পাহাড়ে শান্তি ফিরে এসেছে।

পরিশেষে বলি, এই বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্ভব হচ্ছে কারণ গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী কিছু আর্থিক সংস্কারের ফলে সরকারের রাজস্ব বেড়েছে। বাম জমানার তুলনায় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির হার গত চার বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। তবু যতটা প্রয়োজন ততটা অর্থ রাজ্যের নেই। এর মূল কারণ, পুরনো ঋণের এক বিপুল বোঝা শুরু থেকেই বর্তমান সরকারের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। এর জন্য আগের সরকারের দায়িত্বহীন আর্থিক ব্যবস্থাপনাই দায়ী। পুরনো ঋণ শোধ করতে গিয়ে নতুন করে ঋণ করতে হচ্ছে। তবু তার মধ্যেই যাবতীয় উন্নয়নের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল সরকার। একটু একটু করে ঋণ ও আয়ের অনুপাতটা কমিয়ে আনছে। হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও মোট খরচে উন্নয়নমুখী খরচের অনুপাতটা বাড়াচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলো অনেক বেশি জটিল। সমস্যার শুরু দেশভাগ থেকে। দেশভাগের সময় যত মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি মানুষ ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিলেন এই দিকে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি, মোটের উপর তিনগুণ। বাম আমলে রাজ্যের কলকারখানাগুলো ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বেকারত্বের চাপ আরও বেড়েছে। মানুষের কাছে জমি আরও মহার্ঘ হয়েছে। এই অবস্থায়, বোঝা দরকার, অন্যান্য রাজ্যে যেমন সহজে মানুষ নিজের জমি বিক্রি করে দিতে রাজি থাকেন, এখানে তেমন নয়। পশ্চিমবঙ্গকে বুঝতে গেলে, মানুষের এই অনুভবটুকুকেও গুরুত্ব দিতে হবে। এই সহজ সামাজিক সত্যটা গণমাধ্যমের একটা অংশ কিছুতেই বুঝতেই চায় না, কিংবা বুঝলেও ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বোঝেন। তাই মানুষের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর খাটিয়ে জমি নেওয়ার তিনি ঘোর বিরোধী। মানুষের ইচ্ছার প্রতি এইরকম সম্মান খুব বেশি রাজনীতিবিদের মধ্যে দেখা যায় না। তাই সহজ সত্য এটাই যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছের মানুষ, ভালবাসার মানুষ। আগামী বছরের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গবাসী আবার ভালবেসেই তাঁকে ফিরিয়ে আনবে।



নিবন্ধ

আরও সুন্দরী সুন্দরবন

মণ্টুরাম পাখিরা



ঘন জঙ্গলে নিঃশব্দে হানা হতে পারে তাদের। গোলপাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মুহূর্তে নৌকার গলুই থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে যে কোনও মৎস্যজীবীকে। আবার তাদের টানেই হাজার হাজার পর্যটক প্রতিদিনই পা রাখছেন ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ঘেরা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপে।

সুন্দরবন। চাঁদ সদাগরের কাহিনিতে উল্লেখ থাকা এই জঙ্গলের প্রায় ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এর ব্যাপ্তি। এর মধ্যে ষাট শতাংশ বাংলাদেশে। বাকিটা দুই ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। রাজ্যের মোট ১৭টি বিধানসভার ১৯টি ব্লকের ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ছড়িয়ে আছে সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া ও গোলপাতার জঙ্গল। দক্ষিণরায়ের বাহন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও হরিণ, বাঁদর-সহ নানা প্রজাতির প্রাণীর বাসস্থান এই লবণাক্ত জলে সিক্ত ম্যানগ্রোভ-ফরেস্ট। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বহু গবেষক এবং বিজ্ঞানী নানা সময়ে এসেছেন সৃষ্টির রহস্যে ঘেরা এই জঙ্গলের নানা অজানা দিক জানতে। শ্বাসমূল কীভাবে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে রক্ষা করে তা প্রকৃতির সৃষ্টির অপার রহস্য নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। আবার বিশ্বের একমাত্র এই জঙ্গলেই যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় রাজত্ব

চালিয়ে আসছে যে রয়্যাল বেঙ্গল তাদের ঘিরেও নানা লোক-কাহিনি এবং রহস্য রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের মোহানায় গড়ে ওঠা পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয় এই নদী-জঙ্গল ঘিরে যে দেশের বৃহত্তম পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে তা বোধকরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে বাংলার কোনও প্রশাসকই উপলব্ধি করেননি। উল্টে এই সুন্দরবনের গভীর অরণ্য দ্রুত যাতে ধ্বংস হয়ে যায় তার জন্য যতটা পারা যায় তার চেয়েও বেশি উদাসীন ছিলেন পূর্বতন বাম শাসকরা। একইসঙ্গে সুন্দরবনকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য নানা ধরনের পরিবেশ বিরোধী প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। সবুজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে বাস্তুতন্ত্রের প্রচুর ক্ষতি করেছিলেন পূর্বতন প্রশাসকরা। কিন্তু বাংলার জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দায়িত্ব নিয়েই সুন্দরবনকে আরও সুন্দরী করে তোলার পাশাপাশি এখানকার মানুষের জন্য কোটি কোটি টাকার প্রকল্প ও পরিকাঠামো বাস্তবায়িত করেছেন। বস্তুত, এই কারণে গত চার বছরে শুধুমাত্র সুন্দরবন আরও বেশি সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠেনি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে এখানকার গরিব-মধ্যবিত্ত এবং পিছিয়ে পড়া জনজাতির।

সুন্দরবনের ঢুলিভাসানি, আজমলমারি, সুন্দরকাঠি জঙ্গলে এখনও বাঘের ডেরা বলেই বন দফতরের তথ্য। আগে এই সব জঙ্গলে দিনের বেলাতেও চট করে কেউ যেতে চাইতেন না। সশস্ত্র প্রহরা নিয়ে বন ও পরিবেশ দফতর মাঝেমধ্যে বাস্তু সংরক্ষণের জন্য প্রয়াসী হত। অথচ এখন সরকারের অনুমতি নিয়ে শতাধিক মৌলে মধুর চাকের খোঁজে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও এই ঘন জঙ্গলেও পা রাখছেন। কারণ, মৌলেরা আগে মারা গেলে কোনও বিমার টাকা পেতেন না। বর্তমান সরকার দায়িত্বে আসার পরে মৌলেদের জন্যও বিমা চালু করে দিয়েছে। বস্তুত, এই কারণে বেশ কিছু মৌলে দুঃসাহসী হয়ে ঘন জঙ্গলে পা রাখছেন। তবে বনে যাওয়ার আগে বহু বছরের রীতি মেনে বনবিবির পুজো করে, দক্ষিণরায়কে স্মরণ করে রওনা হন মৌলেরা। বনের মাটিতে পা দেওয়ার আগে গাছকেও পুজো করে চলেছেন মধু সংগ্রহকারীরা। একইভাবে মৎস্যজীবীরাও একই রীতি-আচরণ পালন করে চলেছেন বছরের পর বছর ধরে। নৌকা ভাসানোর আগে দক্ষিণরায়ের নামে সবাই জয়ধ্বনি দেন। এরই মধ্যে একটি বিষয় অবশ্যই বলা দরকার। তা হল, কীভাবে ঘন জঙ্গলে মানুষ বসতি গড়ে তুলল। তা নিয়ে নানা প্রশ্ন, বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, যারা পর্তুগিজ জলদস্যু এবং তাদের অনুচর ছিল তারাই বঙ্গোপসাগর থেকে এসে এই জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছে। আবার কেউ বলেন, শহর ও নগর থেকে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়ে সুন্দরবনে বসতি গড়ে তুলেছে। কিন্তু যা-ই বিতর্ক থাকুক একটা বিষয় স্পষ্ট, সুন্দরবনে যাঁরা বংশপরম্পরায় বসবাস করছেন, তাঁরা অতীব কষ্টের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছেন। আর তাই কখনও আয়লা, কখনও সাইক্লোন এসে এখানকার মানুষদের ঘরবাড়ি তছনছ করে দিয়ে যায়। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, সুন্দরবনের গাছপালা ব্যাপক হারে কাটার জন্যই এইসব এলাকায় আয়লার মতো ঝড়ের দাপটে জনপদের বেশি ক্ষতি হয়েছে। ঘন সুন্দরবন বঙ্গোপসাগরের প্রবল রাহুগ্রাস থেকে বছরের পর বছর বাংলা তথা দেশকে রক্ষা করেছে। পরিবেশবিদদের এই পরামর্শকে মাথায় রেখে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনকে নানাভাবে রক্ষা করার জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী নানা প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়ে বিরল প্রজাতির সুন্দরী-গরান গাছ থেকে শুরু করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে রক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু অন্য দফতরের মতো এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার সুন্দরবনের উন্নয়নকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি। উপেক্ষা ও অবহেলার নাগপাশে কেন্দ্র সবসময় বন্দি করে রেখেছে তেভাগা আন্দোলনের পীঠস্থান সুন্দরবনকে।

রেলমন্ত্রী হিসাবে দ্বিতীয় দফায় দায়িত্ব নিয়ে বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে চেপে নামখানা পৌঁছন। সেখান থেকে লঞ্চে করে চন্দনপিঁড়ি থেকে শুরু করে পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ-সহ আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ঘোষণা করেন ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পও। যার প্রত্যেকটিতে দ্বীপভূমি সুন্দরবনের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহায়তার নানা পরিষেবা রয়েছে। সেই শুরু। এরপর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নানা সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা নিয়ে সুন্দরবনে এসেছেন জননেত্রী। রাত কাটিয়েছেন গভীর সুন্দরবনের মানুষের সঙ্গে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে জেনে নিয়েছেন সেখানকার মানুষের মর্মবেদনা এবং সুখ-দুঃখের সালতামামি। বস্তুত, এই কারণে মা-মাটি-মানুষের সরকারের চালু করা নানা প্রকল্প আজ সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং জনমুখী। স্বাধীনতার পর রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এভাবে সুন্দরবনে এসে দিনরাত ঘুরে সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাস্তব সমস্যা সরেজমিনে দেখে প্রকল্প-প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এটা আমাদের কাছে অবশ্যই গর্বের।

মাত্র সাড়ে চার বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং বাম জমানার ঋণের টাকা কেটে নেওয়া সত্ত্বেও সুন্দরবনের মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর মারফত প্রায় ৩৭০০০ কোটি টাকা খরচ করেছেন এই দ্বীপভূমির সার্বিক উন্নয়নে। এছাড়াও নেত্রীর নির্দেশে সেচ, জলসম্পদ, পঞ্চায়েত, পূর্ত, নগরায়ণ-সহ বিভিন্ন দফতরের তরফে আলাদা আলাদা বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সবমিলিয়ে সার্বিকভাবে উপকৃত হয়েছেন সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকের বাসিন্দারা। এছাড়াও তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ পিছিয়েপড়া জনজাতি, তফসিলি জাতি ও উপজাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নানা প্রকল্প, সহায়তা ও সরঞ্জাম পৌঁছে দিয়েছে। স্কুলে স্কুলে ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া থেকে শুরু করে কৃষকদের হাতে ট্রাক্টর পৌঁছে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সুন্দরবনের খেলাধুলার জন্য ১৯টি ব্লকের ক্লাবগুলিকে নিয়ে তিন বছর ধরে 'সুন্দরবন কাপ' চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যাপক জনপ্রিয় এই টুর্নামেন্টে জলাজঙ্গলের তরুণ সম্প্রদায় যেভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অংশ নিচ্ছে তা অবশ্যই নজির গড়েছে।

সুন্দরবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপ বা পাথরপ্রতিমা পৌঁছতে প্রায় ৮-১০ ঘণ্টা লেগে যাচ্ছিল। কারণ, সুন্দরবনের একটি দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে মূলত নৌকা বা লঞ্চই ছিল প্রধান যানবাহন। সন্ধ্যার পর এই সমস্ত পরিবহন চলাচল কার্যত অসম্ভব। আর সেই কারণে সন্ধ্যার পর কেউ অসুস্থ হলে তাকে ডায়মন্ডহারবার বা কলকাতার হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনের মানুষের এই সমস্যা উপলব্ধি করে সবার আগে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নত করার উপর জোর দিয়েছেন। ইতিমধ্যে গত সাড়ে চার বছরে ছ'টি বড়-দীর্ঘ সেতু সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও সাতটি সেতুর কাজ চলছে। পাঁচটির কাজ এবছর ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরও দু'টি সেতুর জন্য প্রয়োজনীয় টেন্ডার করা হচ্ছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১৫টি মাঝারি এবং দীর্ঘ সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে আগামী বছর। নতুন সেতুগুলি তৈরি হওয়ায় মোটরগাড়িতে চেপে সুন্দরবনের গভীরে থাকা গ্রাম থেকেও সহজে কলকাতার চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারছেন বাসিন্দারা। আবার উল্টোদিক থেকে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পর্যটক গাড়িতে চেপেই মাত্র ঘণ্টা তিন-চারেকের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছেন সুন্দরবনের



সজনেখালি-সুধন্যখালির পর্যটক আবাসে। গঙ্গাসাগরে পর্যটকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা যেমন হয়েছে, তেমনই রাস্তাঘাট ও জেটির ব্যাপক পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। এখন ছুটির দিনে বহু মানুষ বোটে করে থাকতে আসছেন, যাচ্ছেন সাগরদ্বীপের গেস্টহাউসে। এটাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিপুল সাফল্য। মাস কয়েক আগে দেশের বিভিন্ন বণিক সভার প্রতিনিধিরা এসেছিলেন সুন্দরবনে। সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রিয় নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই ঠিক হয়েছে, আগামী দিনে সুন্দরবনে রিভারক্রুজ যেমন চলছে তেমনই পরিবেশবান্ধব নানা কটেজ-রিসর্ট গড়ে উঠবে। এগুলির জন্য ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পর্যটন, বন দফতরের সঙ্গে আমাদের দফতর সমন্বয় করে দ্রুত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করছে। বছর কয়েকের মধ্যে এই প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে পুরোপুরি বদলে যাবে সুন্দরবনের পর্যটন পরিষেবা। আর সে সময় পর্যটকরা কেরলের ব্যাকওয়াটার না গিয়ে দলে দলে যে আমাদের প্রিয় সুন্দরবনে পা রাখবেন তা এখনই বলে দেওয়া যায়। আর এসব কিছুই সম্ভব হচ্ছে আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী ভাবনা ও চটজলদি সিদ্ধান্ত কার্যকর এবং বাস্তবায়নে।

আমাদের দফতরের তথ্য বলছে, ইতিমধ্যে গত সাড়ে চার বছরেই প্রায় ৯৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী বছর মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৩৩০ কিলোমিটার ইটের রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। একইসঙ্গে সিমেন্টের কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা হয়েছে আরও ১৬০ কিলোমিটার। বিটুমিন-পিচের রাস্তা তৈরি হয়েছে গত সাড়ে চার বছরে ১৬৭.২৯ কিলোমিটার। মাটির রাস্তা পাকা হওয়ায় শুধুমাত্র গতি বেড়েছে বললে ভুল হবে, একইসঙ্গে গোটা সুন্দরবনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে। কারণ, রাস্তা পাকা হওয়ায় আগে যেখানে ভ্যান রিকশা চলত এখন সেখানে অটো-টোটো-মোটরগাড়ি চলছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্লকে নদীপথে চলাচলের সুবিধার জন্য ভাসমান জেটি তৈরি হয়েছে ৯৭টি। আরও ১৬টি জেটি খুব শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে। এই জেটিগুলি চালু হওয়ায় নৌকা-ভুটভুটির পাশাপাশি ছোট লঞ্চও বিভিন্ন ব্লকের গ্রামে গ্রামে চটজলদি পৌঁছে যেতে পারছে।

রাস্তাঘাট-সেতু পরিকাঠামোর পাশাপাশি স্পোর্টস কমপ্লেক্সও তৈরি করা হয়েছে রায়দিঘি এবং ক্যানিংয়ে। বিশুদ্ধ পানীয় জল গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৬৮১ ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে সুন্দরবনের ১৯০টি গ্রামে। রায়দিঘিতে কলেজ বিল্ডিংও নতুন করে তৈরি করা হয়েছে আমাদের দফতরের তরফে। এছাড়াও কুলতলিতে বি আর আম্বেদকর কলেজের বাড়িও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনে সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৪৪,০৮৭টি সাইকেল বিলি হয়েছে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রীদের মধ্যে। গ্রামের গরিব ৭৫০০ জন কৃষককে বিনামূল্যে বোরো ধানের বীজ যেমন বিলি করা হয়েছে তেমনই সূর্যমুখী এবং তিলের বীজও বিনামূল্যে ৩৯,৭৯৫ জনকে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ৩১৬৭৭ জনকে মুগডালের বীজ দিয়েছে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর। সুন্দরবনে যাঁরা মাছ ধরতে যান এমন গরিব ৭৮০ জন মৎস্যজীবীকে নৌকা এবং মাছ ধরার জাল দেওয়া হয়েছে। আবার যাঁরা বাড়িতে পুকুরে মাছ চাষ করে সংসার চালান, তাঁদের পাশেও দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এজন্য আমাদের দফতর মারফত ৪২২২ জন গরিব মানুষকে ৫০ কেজি হিসাবে মাথাপিছু মাছের খাবার বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়টি না বললে অত্যুক্তি থেকে যাবে তা হল, চিকিৎসা পরিকাঠামোর বিপুল উন্নয়ন। এই সাড়ে চার বছরে মা-মাটি-মানুষের সরকার সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির পাশাপাশি পুরনোগুলিতে আরও বেড বাড়ানোর পাশাপাশি পরিকাঠামো-সরঞ্জাম বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আর সেই কারণে এখন পর্যটকরা নিশ্চিন্তে সুন্দরবনে বেড়াতে আসছেন। কারণ, যদি কেউ কোনও কারণে বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে হেতাল-গরান-সুন্দরী গাছের গন্ধে ঘেরা সুন্দরবনেই।

প্রবন্ধ



সাংস্কৃতিক তৈলদান

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

সেকালে আমার ছোটবেলায় আমার বাড়ির কাছেই একজন সরকারি অফিসার থাকতেন। ছোটখাটো চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা থেকে 'অ্যাটেস্ট' করার ক্ষমতা ছিল বলে অনেকেই তাঁকে অন্য চোখে দেখত এবং সেই ব্যাপারটা তিনিও বেশ উপভোগ করতেন। আমার মনে আছে, সেই অফিসারের কাছে এক ভদ্রলোক আসতেন, হাতে কলাডা-মূলাডাও থাকত। তিনি নানা কথার মধ্যে অফিসার ভদ্রলোককে আর্ত-পীড়িত জনের উদ্ধারকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। এই শরীরী প্রশংসার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় ছিল তাঁর সুঠাম দন্তশ্রেণি। তিনি বলতেন, ভূ-ভারতে অনেক দেখেছি, কিন্তু এইরকম দাঁতের 'সেটিং' আমি কখনও দেখিনি।

এর পরে দৈববশে সেই অফিসারের দুটি দাঁত পড়ে গেল। এই ঘটনা দৈবকৃত নাকি লৌকিক ভাবে ঘটেছিল, সেটা নিয়ে প্রতিবেশীদের বয়ানে মতানৈক্য আছে। কিন্তু এ-ঘটনায় মৌলিক চমৎকার সৃষ্টি করলেন সেই ভদ্রলোক, যিনি তাঁর অম্লান দন্তরাজির অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন সবসময়। এখন তিনি বললেন— এই যে দুটি দাঁত আপনার চলে গিয়েছে, স্যার! এতে আপনাকে আরও ভাল দেখাচ্ছে। একটা বয়সোচিত মর্যাদা যেন আপনার মুখখানিকে অন্যতর মাত্রা দিয়েছে। এই বয়সে এখনও এত শক্ত দাঁত একটু অস্বাভাবিক লাগত বলেই ভগবান তার দুটি মাত্র হরণ করে আপনাকে কালোচিত করে তুলেছেন। এটা নিয়ে আপনি একেবারেই ভাববেন না, স্যার!

সম-বিষম যে-কোনও অবস্থাতেই এই যে বহুমানন করার প্রবৃত্তি, এটাকেই স্তুতি বলে। এটা ভাল না মন্দ—এটা নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে এবং সে-তর্কে আমরা প্রবেশ করব না তাও নয়, কিন্তু স্তুতির ব্যাপারে তার প্রথম এবং শেষ বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝে নেওয়াই ভাল। সে-বৈশিষ্ট্য এটাই যে, স্তুতির মধ্যে বহুল অতিশয়োক্তি থাকে এবং অতিশয়োক্তি মানেই সেটা কাব্য এবং কবিতার পরিসর। স্তুতির বিষয়ে আরও একটি কথা এখানেই বলতে হবে এবং সেটা হল স্তুতি রচনা করার মনস্তত্ত্ব। এটা অবশ্যই ঠিক যে, স্তুতি করার একটা কার্যকরী দিক আছে— অতিরিক্ত প্রশংসা করে স্তাবক যখন আপন স্বার্থ সম্পন্ন করতে চায়, তখন ঐশ্বর্যশালী বা প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রসন্নতা জরুরি হয়ে ওঠে একান্ত ভাবে। সেই প্রসন্নতা লাভের অন্য আরও অনেক উপায়ের মধ্যে বশংবদ ভাব থেকে অনুগত ভৃত্যবৎ আচরণ সবই আছে হয়তো— কিন্তু প্রসন্নতা লাভের ক্ষেত্রে স্তুতি-প্রশংসার মতো এত প্রশস্ত পথ বোধহয় দ্বিতীয় নেই।

কিন্তু এই স্বার্থ-সাধনের জায়গা ছাড়াও স্তুতি-প্রশংসার আরও একটা নৈসর্গিক ক্ষেত্র আছে, সেখানে স্তুতির পরিসর তৈরি হয় আপন আপ্লুতিতে। এই আপ্লুতি স্তুত্য পুরুষ বা নারীর রূপ-গুণ-ব্যক্তিত্বের কারণানুসারী হয়তো, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, সেটা 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমাকে করেছি রচনা।' অর্থাৎ কিনা মানুষটি এতটাই গুণশালী হতে পারেন, এতটাই রূপবান বা রূপবতী হতে পারেন, এতটাই উদারসত্ত্ব কিংবা এতটাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে পারেন, অথবা ভগবদ্‌গীতার ভাষায় 'যদ্ যদ্ বিভূতিমং সত্ত্বম্/শ্রীমদূর্জিতমেব বা— যাঁর যাঁর মধ্যেই ঈশ্বরের সেই বিভূতি আছে— হয় তিনি ভীষণই রূপবান অথবা তিনি প্রভূত বলশালী—এই রকম কোনও এক প্রকার গুণের আধিক্য থাকলে আমরা নিজেরাও বেশ আপ্লুত হতে পারি। কিন্তু এমনও অবস্থা-বিশেষ আছে যেখানে অন্য লোকে রূপ-গুণের সন্ধান পাচ্ছে না, কিন্তু আমি তার মধ্যে রূপ আবিষ্কার করছি, অথবা গুণ যেখানে নেই সেখানেও আমি গুণ দেখতে পাচ্ছি— মনের মাধুরী হয়তো এখানেই মেশে, হয়তো-বা এখানেই সেই প্রবাদের সার্থকতা— 'যার যেথা মজে মন' গোছের।

ঠিক এইখানেই সেই খারাপ কথাটাও তোলা দরকার— সেটা চলতি ভাষায় হল 'তেল দেওয়া'। তেল দেওয়ার সঙ্গে স্তুতি-নতির অনেক মিল আছে বটে, তবে স্তুতির বিরাট পরিসরের মধ্যে তৈল-মর্দনের ব্যাপারটুকু সামান্য একটা অংশ জুড়ে আছে। আমরা যারা তেল দেওয়ার প্রক্রিয়াটাকে খুব ঘৃণ্য মনে করি এবং এই শব্দের অভিধেয় না বুঝে যত্র-তত্র প্রয়োগ করি, তাদের মনে রাখতে হবে যে, তেল দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা তত্ত্বগত দর্শন আছে এবং তার একটা সমাজতাত্ত্বিক 'মেটেরিয়াল বেজ্'-ও আছে বস্তুতঃতেল একটি স্নেহপদার্থ এবং সংস্কৃতে এটার সোজাসুজি অর্থ হতে পারে 'অয়েলি', 'গ্রিজি'। 'তেল' কিংবা 'গ্রিজ'-এর প্রধান কাজ হল মরচে ধরা জিনিস অথবা অমসৃণ অপ্রবেশ্য বস্তুর চলার পথ মসৃণ করে তোলা। এই শব্দটাই যখন 'মেটাফরিক্যালি' মনুষ্য-ব্যবহারের মধ্যে প্রয়োগ হচ্ছে— তখনও কিন্তু একটা আধার-আধেয়র দ্বৈতবাদ আছে। অর্থাৎ তেল যেখানে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আধেয় তেল কিন্তু আধারকে বৃহত্তর কিছুর প্রবেশপথ বা নির্গমন-পথ প্রস্তুত করছে। এখানে লাভবান হবেন তিনি, যিনি প্রবেশ-নির্গমনের জন্য তৈল প্রয়োগ করেছেন।

এক সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত আমাকে এটাও বলেছেন যে, তৈল প্রদানের ক্ষেত্রে একটা 'রিলেশনাল সাইকি' কাজ করে এবং The is one of superordination and the other of subordination. সত্যি বলতে কী, তেল দেওয়ার যে-আক্ষরিক 'মেটেরিয়াল বেজ্' আমি ছোটবেলায় চোখের সামনে দেখেছি এবং এখনও একান্নবর্তী পরিবারের অসত্য ভারে আক্রান্ত সিরিয়ালগুলিতে বয়স্কা শাশুড়ি যখন বউমাকে বলেন— পায়ের ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে, বউমা! একটু তেল মালিশ করে দেবে— সেই মুহূর্তেই কিন্তু এই 'সুপার-অরিডিনেশন!' এবং 'সাবর্ডিনেশন'-এর সম্বন্ধটা টের পাইয়ে দেওয়া হয়। এই 'অধরোত্তর সম্বন্ধের' (সুপার-অর্ডিনেশন অ্যান্ড সাবর্ডিনেশন) ব্যাপারটা কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের মধ্যেও আমরা লক্ষ করেছি—সেখানে অর্থের একটা বিনিময়-মাধ্যম আছে, হয়তো-

বা সেখানে এই তৈল-সেবার বৃত্তিটুকু খানিক ব্যক্তিগত বলেই প্রভুর কাছে অতিরিক্ত কিছু তোষণ হিসাবেও দেখা দিতে পারে। তাতে মসৃণ হতে পারে ভৃত্যের ভবিষ্যৎ। আমাদের বক্তব্য— এটাই কিন্তু চলতি ভাষায় তেল দেওয়ার প্রত্যক্ষ 'মেটেরিয়াল বেজ্' যেখানে অধরোত্তর সম্বন্ধটা 'ফ্রেম অব রেফারেন্স' হিসাবে গণ্য হতে পারে।

ঠিক এই ভিত্তি থেকেই কিন্তু তেল দেবার রূঢ়ার্থের পরিধি বাড়তে থাকে, অর্থাৎ কিনা শাশুড়ি-বউমার সম্বন্ধটা নিতান্তই যদি আদেশ এবং মান্যতার প্রতি সেবা এবং কর্তব্যের জায়গা ছেড়ে দেয় এবং বউমা যদি স্বকার্য সাধনের বুদ্ধিতে কারণে এবং অনেক সময়েই অকারণে শাশুড়ির পায়ে তেল-মালিশ দিতে চায়, তবে সেটাই হল তেল দেওয়ার আসল জাগতিক অর্থ। স্বপ্রয়োজন হাসিল করার জন্য অকারণ তোষণ করাটাই তেল দেওয়ার যোগরূঢ় অর্থ। তেল দেওয়ার এই স্বার্থসাধনী বৃত্তিটাই আমাদের মানস সংস্কারের মধ্যে এমনভাবেই অন্তঃশায়িত হয়ে গেল যে, যেখানে যেখানেই আমরা তোষণ করার সামান্যতম প্রয়াস দেখতে পেলাম, সেখানে সেখানেই আমরা এই অপশব্দ ব্যবহার করে ফেলেছি এবং তার একটা দার্শনিক কারণও আছে। সমস্ত মানুষের মধ্যেই স্বকার্য সাধনের প্রবৃত্তিটা যেহেতু জন্মান্তরীণ সংস্কারের মতো এক স্থয়ীভাব হিসাবে কাজ করে, তাই সে নিজেও জানে যে, জাগতিক প্রয়োজনে কোনও না কোনও ভাবে অন্য, অপর শুধু নয়, নিজের জনকেও তোষণ করতে হয়। কিন্তু নিজে সেই কাজটা করলে তাকে তেল দেওয়া বলতে চায় না কেউ, বরঞ্চ সেটাকে 'নরম করা', 'নিচু হয়ে বোঝানো', 'বশ করা', 'অনেক বলেকয়ে বাগে আনা', 'ভেজানোর চেষ্টা করা' এবং উত্তরাধুনিকতায় এটাকে 'পটানো বলতে অসুবিধে হয় না তবু। কিন্তু একই জিনিস অন্যে করলে সেটাতে আমরা স্বার্থ সাধিত হচ্ছে না বলেই এই প্রক্রিয়াকে 'তেল দেওয়া' ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না।

'তেল দেদওয়া'র সাধু শব্দ হিসাবে 'তোষণ'-শব্দদুটোকেই আমাদের গ্রাহ্য, অভিধান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং একই সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, 'তেল দেওয়া' অথবা 'তোষণ' করার অন্যতম প্রধান উপাদান হল অনেক তুষ্টিসূচক কথা বলা এবং তাও বেশি বেশি করে কথা বলা। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অন্যের মনস্তোষণী এই বৃত্তিটার মধ্যে স্বার্থ সাধনের কোনও ভাবনা নাও থাকতে পারে। এমনকী সেখানে অধিকারও থাকতে পারে। ধরা যাক সেইঘটনাটা, সুনীলের কবিতার সেই লাইনটা—'ভ্রূপল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে'— এটা পড়ার পর বাইশ বছরের সেই সুন্দরী সত্তর বছরের সুনীলকে বলল—এই লাইনের জন্য I can die for it. সুনীলদা। সুনীল এসব অনেক শুনেছেন, কিন্তু অনেক শোনা সত্ত্বেও অনেক ভিড়ের মধ্যেও মেয়েটিকে উপেক্ষাও করলেন না তিনি, সজোরে হেঁটেও গেলেন না প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গিমায়। বরঞ্চ মৃদু হেসে মিটিমিটি চোখে জবাব দিলেন— অনেক কাল আগে লেখা। মেয়েটি বলল— তাতে কী? আগে শুনলে হয়তো আগেই মরে যেতে চাইতাম। সুনীল এই উচ্ছ্বাসিতার উদ্দেশে অপার শান্তি বিতরণ করে মজ করে বললেন— না, না, মরতে-টরতে চেয়ো না, তাহলে আমার কবিতা কে পড়বে?

আমার এটা জানা আছে এই বাইশী রমণীর সঙ্গে সুনীলের আর কোনও দিন দেখা হয়নি, কিন্তু সেদিনের সেই ক্ষণে রমণীয়া যুবতীর সেই সুনীল-তোষণা কি মিথ্যা ছিল? নাকি এটাকে আপনি অনর্থক চাটুকারিতা বলবেন কিংবা তেল দেওয়া বলবেন? নাকি মহাকবির ভাষায় বলবেন— শুধু অকারণ পুলকে? তাছাড়া বহু জায়গায় কবিতার বিষয়ে বহুমানন-পুষ্ট সুনীলও তো কই সেই মেয়েকে হেলায় উড়িয়ে দিলেন না শতজনের সমক্ষে, বরঞ্চ সেই উদ্ভিন্ন সময়ে সেই যুবতীর উদ্দেশে আকাশেতে উড়িয়ে দেওয়া যে-গানটি ছিল— তাহলে আমার কবিতা পড়বে কে—সেই মুহূর্তে সে-কালের সমস্ত যুবতী পাঠিকারা যেন একটা ব্যক্তিকেন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করে— এই পারস্পরিক আপ্লুতিকে আপনি কোন শব্দের বাখানিতে প্রকট করে তুলবেন? নিশ্চয়ই চাটুকারিতা নয়। তেল দেওয়াও নয়।

সত্যি কথা বলতে কী, এই মর্মর পৃথিবীতে তেল দেওয়ার জন্য যে-সব শব্দ ব্যবহার হয়, চাটুকারিতা কিংবা তোষণ করার জন্যও সেই শব্দই ব্যবহার্য হয়ে পড়ে, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রেম কিংবা শ্রেষ্ঠতম কবিতাও তৈরি হয় সেই সব-শব্দরাশিতেই। কিন্তু তেলের সঙ্গে কবিতার তফাৎ হবে শুধু উদ্দেশ্য-বিধেয়ের নিম্নস্তরে। অর্থাৎ আপনি কী উদ্দেশ্যে, কাকে, কী ধরনের আত্মলাভের জন্য কী প্রকারের শব্দ ব্যবহার করছেন। আর এ-কথা আপনাকে মানতেই হবে যে, তোষণ করার জন্য যত চাটুক্তি আছে পৃথিবীতে, তার মৌলিক উপাদান অবশ্যই অতিশয়োক্তি বা বেশি কথা বলা। আমার আশ্চর্য লাগে এইখানে যে, পৃথিবীতে অতি সক্ষম-সফল ব্যক্তিরাও যেখানে 'আরও' এবং 'এবং 'আরও কিছুর জন্য' অতিমধুর চাটুশব্দ ব্যবহার করছেন, সেখানে অক্ষম মানুষেরা যথা-কথঞ্চিৎ অআত্মলাভের জন্য চাটুকারিতা করলে, আপনি তার উপাদান-উপচারগুলিকে অপশব্দিত করে 'তেল' বলে ব্যাখ্যা করবেন কেন?

আমার তো মনে হয়, চাটুকারিতা এবং তোষণের চরম অভিসন্ধিটুকু শাস্ত্রীয় যুক্তিতে তৈরি হয়ে গেছে যেদিন এক আদেশ-শব্দ উচ্চরণের পরপরই আমরা একখানি পরামর্শ-বক্যও সৃষ্টি করেছি। যে-মনু-মহারাজকে আপনারা আজকের দিনে এত গালাগালি দেন, তাঁকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 'পাইয়োনিয়ার' বলে মনে করি আমরা। তাঁকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গালাগালি দেবার অজস্র কারণ আছে নিশ্চয়, কিন্তু সে-গালাগালিও তিনি খান 'পাইওনিয়ারিং' কথাবার্তা বলার জন্যই। আজকের এই বিষয়টাতেও আমরা তাঁকে প্রথম স্পষ্ট প্রবক্তা বলে মনে করি। দেখুন, আমাদের দেশে বেদ থেকে আরম্ভ করে উপনিষদ সর্বত্র সত্যের বড়ো জয়-জয়কার। সত্য কথা বলা, সত্য থেকে চ্যুত না হওয়াটা, আমাদের প্রধান ধর্ম বলে চিহ্নিত। হয়েছে— 'সত্যং বদ, ধর্মং চর' থেকে 'সত্যান্ন প্রসদিতব্যম্'—এই ঔপনিষদিক উপদেশের সঙ্গে জাবাল সত্যকামের সেই সত্য উচ্চারণের শক্তি-বিজড়িত কাহিনি আমাদের ধর্মপথ এমন ভাবেই নির্ধারিত করেছে, যাতে সত্য আমাদের সমস্ত সাধন-সাধ্য ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মক হয়ে গিয়েছে— সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।

কিন্তু সত্য যখন ব্যবহারিক সমাজের মধ্যে নেমে এল, তখন বোঝা গেল যে, সত্যের মধ্যে একটা আপেক্ষিকতাও আছে। অর্থাৎ কিনা এমন যদি হয় যে, সত্য এক বৃহত্তর ক্ষতিসাধন করে দিল, তখন কিন্তু সত্যের মিথ্যাই বড় ধর্ম হয়ে উঠবে। মহাভারতে স্বয়ং সত্যধর্মা কৃষ্ণের মুখে সেই বিখ্যাত কাহিনিটা প্রসঙ্গত আসবেই এখানে। কৌশিক নামে এক মুনি আমরণ সত্য কথাই বলবেন বলে ব্রত ধারণ করেছিলেন। কিন্তু একদিন হল কী, কৌশিক মুনি তখন গ্রাম থেকে দূরে এক বনের মধ্যে তপস্যায় রত আছেন। সেই সময়েই কতগুলি পথিক সেই বনের পথ পার হচ্ছিল। নির্জন বনপথে পথিকদের যেতে দেখে দস্যু-ডাকাতেরা তাদের পিছু নিল। তারা ঠিক করল—পথিকদের হত্যা করে তাদের অর্থধন কেড়ে নেবে। দস্যুদের পিছু নিতে দেখে পথিকজনেরা সেই কৌশিক মুনির আরণ্যক আশ্রমের মধ্যে মুনিকে জানাল যে, তারা দস্যুভয়ে ভীত হয়ে এই আশ্রমে ঢুকেছে, তারা একদিকে লতাঝোপের ধারে লুকিয়ে থাকবে এবং দস্যুরা এলে তিনি যেন তাদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করেন। মুনি তখন মৌনী থাকলেন।

দস্যুরা সত্যিই এল এবং এসেই মুনিকে বলল—এই খানিকক্ষণ



আগে কতগুলি লোক এখানে ঢুকেছে। আপনি যদি জানেন যে, লোকগুলি কোন দিকে গিয়েছে তাহলে সত্য করে বলুন— লোকগুলো কোন দিকে গিয়েছে— কতমেন পথা যাতা ভগবন বহবো জনাঃ। সত্যেন পৃষ্ঠঃপ্রব্রূহি...। সত্যবাদী হিসাবে খ্যাত কৌশিক মুনি এবার মৌন ভঙ্গ করে বললেন— বহু-বৃক্ষ-লতা-গুল্মের অন্তরালে তারা এই বনেই আছে। দস্যুরা তৎক্ষণাৎ পথিকদের নির্দিষ্ট জায়গায় খুঁজে পেল এবং তাদের হত্যা করে তাদের কাছে থাকা ধনসম্পদ হরণ করে নিল।

এই কাহিনিটি বলার পর কৃষ্ণ জানালেন—একটা অদ্ভুত ব্যাপার একানে ঘটেছিল। এই কৌশিক মুনি মারা যাবার পর দেখা গেল—তিনি নরকে গিয়েছে এবং তা গিয়েছে তাঁর এই খারাপ কথাটির জন্য, যা সত্য বলে বহুমানিত ছিল তাঁর কাছে— তেনাধর্মেণ মহতা বাগ্‌দুরুক্তেন কৌশিকঃ। গতঃ স কষ্টং নরকম্...। কৃষ্ণ এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সত্য এবং ধর্মকে ন্যায়যুক্তির প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর মঙ্গলের আধার হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। সত্যের দ্বারা সেই মঙ্গল সাধিত না হলে এবং মিথ্যার দ্বারা তা হলে সত্যের বদলে সেই প্রিয়ঙ্করী মিথ্যাও অনেক ভাল— ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। এই যে কৌশিক মুনির সত্য বলার অত্যুৎসাহে কতগুলি নিরীহ লোকের প্রাণ গেল,এই সত্যকে 'বাগ্‌দুরুক্ত' বলে চিহ্নিত করেছেন কৃষ্ণ। 'বাগ্‌দুরুক্ত' বলে চিহ্নিত করেছেন কৃষ্ণ। 'বাগ্‌দুরুক্ত' মানে কথা যেখানে খারাপ ভাবে বলা হচ্ছে— কথা যেখানে অন্যের কষ্ট তৈরি করছে। ঠিক এই শব্দটিই কৃষ্ণ মহাভারতের শান্তিপর্বে গিয়ে ব্যবহার করেছেন তাঁর আপন আত্মীয় জ্ঞাতি-গুষ্টির গঞ্জনা শোনার প্রসঙ্গে। কৃষ্ণ বলেছেন— আমি ওঁদের কথা-বার্তার অপমান-গঞ্জনা সব সময়েই ক্ষমা করে দিই— বাগ্‌দুরুক্তানি চ ক্ষমে।

আমাদের পূর্বকথিত মনু-মহারাজের কথাটা ঠিক এইখানেই এসে পড়ে। আমরা বলব— বেদ-উপনিষদে অত বিরাট সেই তাত্ত্বিকসংস্কার 'সত্য'-কে তিনিই বুঝি প্রথম পুনসংস্কার করে বললেন— সত্য কথা বলো, প্রিয় বাক্য উচ্চারণ কর কিন্তু সত্য হলেও অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ কর না— সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। সত্যের উচ্চারণ যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক এক মাহাত্ম্যের রূপ ধারণ করেছিল সেখানে মনু-মহারাজের এই সাংস্কারিক আয়োজন— সত্যকে প্রিয়বচনের সঙ্গে যুক্ত করাটা নতুন কিছু তর্ক তৈরি করে দিয়েছিল সেকালেই। মনুস্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি সত্যের রূপ ব্যাখ্যা করে বললেন— যে-বস্তুকে যেমন দেখা যায়, যেমন শোনা যায়, তা যদি ঠিক সেইভাবেই বলা যায়, তাকে সত্যভাষণ বলে। আর প্রিয় কথা হল লোকের উদারতা এবং অন্যান্য গুণের কথা বলা, কিংবা অন্যের কাছে সেই মঙ্গল-সুসমাচার সময়মতো জানানো, যেটা তার জানা ছিলনা।

আমরা তো এবার বলতেই পারি যে, সত্যের চেয়েও প্রিয়ত্বের এই আবেদন যেহেতু 'বহুজনহিতায়', তাই তোষণ কিংবা চাটুকারিতার প্রথম আসনটুকু পাতা আছে এইখানেই। ধরা যাক, সেই রাজা এবং জ্যোতিষীর কথা। রাজা এক উচ্চমানের জ্যোতিষীকে ডেকে নিজের ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিচার করতে বললেন ভাল করে। জ্যোতিষী ঠিকুজি-কুষ্ঠি খুব ভাল করে বিচার করে বেশ গম্ভীর হয়ে উটলেন। তিনি কিছুই ভাল দেখলেন না। রাজা বললেন— কী হে জ্যোতিষী, কেমন দেখলে? আসলে রাজাবস্থায় বসে থাকলে তিনি আর কখনও খারাপ আশঙ্কা করেন না। কিন্তু জ্যোতিষী ঠিক করল, যা সে সত্য বলে বুঝতে পেরেছে, সেটাই সে বলবে। জ্যোতিষী বলল— আমি যা দেখলাম, তাতে খুবই খারাপ ঘটনা ঘটবে। আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজন সবারই মরণ দেখে তবে আপনি মরবেন। সব স্বজনের শ্রাদ্ধ করে মরতে হবে আপনাকে।

রাজা তো জ্যোতিষীর কথা শুনে খুবই রেগে গেলেন। তাঁর পরম প্রিয় আত্মীয়-স্বজন সকলের মৃত্যুর পর তাঁদের সবার শ্রাদ্ধ করে যেতে হবে এই কথা শুনে রাজা জ্যোতিষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে জেলে পুরলেন। কিন্তু এখানেই রাজার মহদুৎসাহ শেষ হয়ে গেল না। তিনি নতুন আর-একজন উপযুক্ত জ্যোতিষীকে ডেকে তাঁকেও তাঁর ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিচার করতে বললেন। নতুন জ্যোতিষীও অনেক বিচার করে দেখলেন— আগের জ্যোতিষী সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছেন। রাজার আত্মীয়-স্বজন সব মারা যাবে তাঁর আগে।

অলঙ্করণ : শান্তনু দে

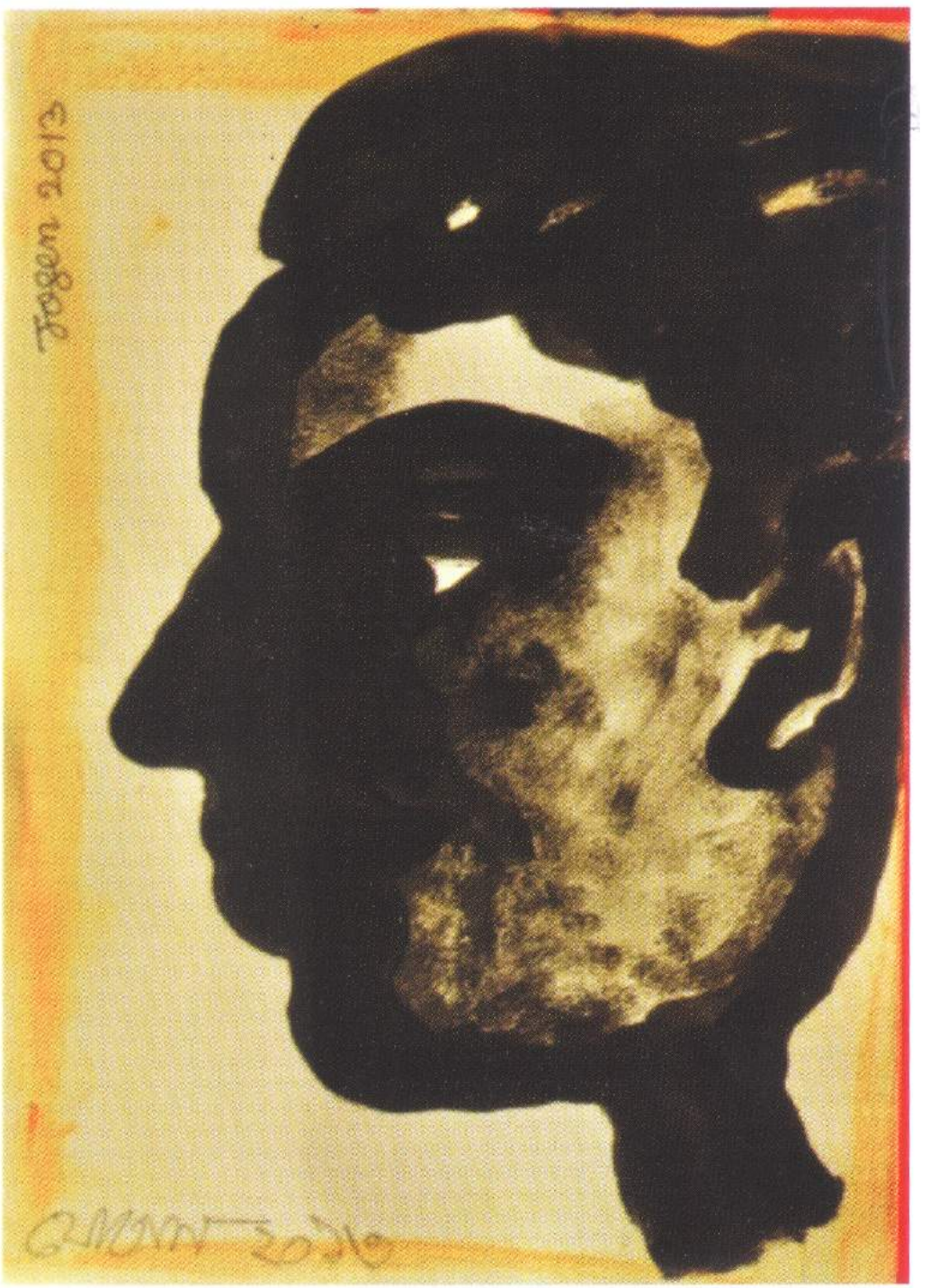

শিল্পী যোগেন চৌধুরি

জেমস অফ বেঙ্গল-এর সৌজন্যে

প্রবন্ধ

কবি ও নিঃসঙ্গতা

শিখা সরকার



রবি ঠাকুরের জীবনের নিঃসঙ্গতা বড় বেদনাদায়ক। তাঁর ভিতরে ছিল এক অসহনীয় একাকীত্ব। সবার মধ্যে থেকেও তিনি নিঃসঙ্গ। তাঁর মনে হাহাকার তবু সুদূরকে জানার তীব্র টানে পথ হেঁটেছেন কবি। এই পথে হাঁটতে হাঁটতে কবি এক সময় সব হারিয়ে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে যান। প্রিয়জন হারিয়ে যন্ত্রণায় ডুবে থেকেও তাঁর সৃষ্টি থামেনি।

বাবার মৃত্যুর পর অকূল পাথারে পড়লেন সাধক রামপ্রসাদ। গোটা পরিবারের হা মুখ তাঁর দিকে তাকিয়ে। তাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে রামপ্রসাদের একটা চাকরি চাই। অবশেষে একটা চাকরি জোগাড় হল। উত্তর কলকাতার গরানহাটার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্তায়। কাজ শুধু হিসাবপত্র লেখার। বেতন মাসে তিরিশ টাকা। তৎকালের হিসাবে বেতন মন্দ নয়। সংসার চলে যাওয়ার পক্ষে মানানসই। রামপ্রসাদ কোনওদিন সংসারের হিসাব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। সর্বদা ডুবে থাকতেন মায়ের নামগানে। মায়ের ভজনা নিয়ে। সেই রামপ্রসাদ কী করে রাখবেন সেরেস্তার হিসাব। ফলে যা হওয়ার তাই হল। এক বছর পর দেখা গেল মোটা মোটা হিসাব খাতায় মাকে নিয়ে গান, কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছেন। ফলে মালিকের কাছে নালিশ গেল। একদিন মালিক রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন, মালিক দুর্গাচরণ মিত্র খাতা খুলে অবাক। নালিশ তো সঠিক। এ তো পাতার পর পাতা মা'কে নিয়ে কবিতা গান লিখে ভরিয়ে ফেলেছে। একটি কবিতায় চোখ আটকে গেল। আমায় দাও মা তবিলদারি/আমি নিমকহারাম নই শংকরী/ রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহার আমি সইতে নারি।'

এই কবিতা আজও রামপ্রসাদী সংগীত হিসেবে প্রচলিত। কিন্তু আদতে একটি সময় সম্পৃক্ত কবিতা। কোন সে সময়? সে কথা বলার আগে আর একটি কবিতা শোনাই। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার কবিতা। তিনি লিখলেন-

'কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারও পেটে ভাত, সেঁটে সোনা কেহ যায় মা পালকি চড়ে, কেহ তাকে কাঁধে করে। কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা।' এসব পড়ে দুর্গাচরণ মিত্রর বুকে মোচড় দিতে লাগল। চোখে অশ্রু। এখানেই কবিতা বা গানের জয়। জমিদারবাবু একান্তে ডেকে রামপ্রসাদকে বললেন-তুমি বাড়ি ফিরে যাও। মায়ের সাধনা করো। কবিতা লেখো। গান বাঁধো। আমি মাসে মাসে তোমাকে তিরিশ টাকা পাঠিয়ে দেব।

রামপ্রসাদ ফিরে এলেন হালিশহরে। সংসারে টানাটানি লেগেই আছে। কারণ, তখন গোটা বাংলায় বড় দুর্দিন। শাসনে, শোষণে, লুণ্ঠনে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। নবাব থেকে জমিদার সবাই ডুবে থাকতেন চরম বিলাসিতায়। খাজনা আদায়ের জন্য সাধারণ, চাষি প্রজাদের উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। এর সঙ্গে ছিল নিত্য চুরি-ডাকাতি। পর্তুগিজ আর মগ জলদস্যুদের উৎপাত। এই দস্যুরা যখন তখন হামলা চালিয়ে, গৃহস্থের ঘর-বাড়ি, সম্পত্তি, সোনা-দানা লুঠ করে নিয়ে যেত। লুঠ করে নিয়ে যেত ঘরের যুবতী মেয়েদের। মানুষ খুন তখন জলভাত। এমন এক ছন্নছাড়া দিনে, রামপ্রসাদ লিখছেন-

'সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই 'জয় কালী' বলে। আমার মন মাতাল মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে...'

এ সব কবিতায় সুর দিয়ে গান বাঁধছেন। রামপ্রসাদকে আমরা সবাই মা-কালীর সাধক হিসাবেই চিনি। কিন্তু তিনি একজন সময় সচেতন, যুগ সচেতন কবি। তাঁর কবিতা সহজ কথার সাধন-ভজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন, তিনি সহজ কথার কবি। সহজ ভাবের কবি।

'আসবে বলে কথা দিয়েছিলে/কেমন রীত? কথাটাতো রাখো। তোমার দ্বারে আমায় দারোয়ান/বানিয়ে তুমি লুকিয়ে কেন থাক?'

গালিবের কবিতা। অনেকে প্রতিবাদ করবেন-এ কবিতা কেন হবে, এ তো শায়েরি। মানছি, শায়েরি। কবি মির্জা গালিবকে মনে পড়ে গেল কবি তথা সাধক রামপ্রসাদের কথা লিখতে লিখতে। জাগতিক লোভ, স্বার্থপরতা ঈর্ষা থেকে দূরে থাকা এক নির্জনের বাসিন্দা মির্জা গালিব। রাজকীয় মেজাজের এই মানুষটি কোথাও কোনওদিন মাথা নত করেননি। মাত্র পনেরো বছর বয়সে মাতৃভাষা উর্দুতে শায়েরি রচনা করতে শুরু করেন। এক সময়ে বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের নজরে পড়লেন। রাজদরবারে নিয়মিত শায়েরি শোনাতে যেতেন। তখন তাঁর নাম ছিল আসাদুল্লা খাঁ গালিব। বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর নাম বদলে দিলেন, মির্জা গালিব। দিন বেশ চলছিল, রাজদরবারে শায়েরি শুনিয়ে। আয় মোটামুটি। গালিবের শায়েরির প্রশংসা তখন চারদিকে। জীবনের যন্ত্রণা শায়েরি হয়ে মানুষের যন্ত্রণায় প্রলেপ দেয় নিত্য। ঘনিয়ে এল বিপদ গালিবের জীবনে। ১৮৩৭ সালে বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর মারা গেলেন। সেদিন মনের দুঃখে নিজের ঘরে শুয়ে গালিব বিবি উমর বেগমকে বলেছিলেন—বিবিজান শরাব নিয়ে এস। এমন দুঃখের দিনে শরাব হবে আমার সঙ্গী।

এল আরও বড় ধাক্কা। কাকা নসরুল্লার মৃত্যু। গালিব পরিবারে উপার্জনক্ষম কেউ আর রইল না। ওদিকে বাদশাহ দরবার থেকে আসা সামান্য মাসোহারা বন্ধ, বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের মৃত্যুতে। মির্জা গালিব তখন বেকার। কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নানা জায়গায়। ঘুরতে ঘুরতে একদিন দিল্লির চাঁদনি বাজারে দেখা বাল্যবন্ধু মুন্না হরগোপাল তাপটার সঙ্গে। গালিবের সব কথা শুনে বন্ধু হরগোপাল বললেন-বন্ধু কোনও কোনও চিন্তা নেই, আমার দফতরে তুমি কাজ করো।

কিন্তু কাজটা কী? মির্জা গালিব বুঝতে চাইলেন। হরগোপাল বুঝিয়ে বললেন, তুই তো জানিস, এদেশের বেশিরভাগ লোক আনপড়। তাদের চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ লেখার লোক দরকার। আমার দফতরে বসে তোর কাজ হবে, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ লেখা। এতে তোর আর ভালই হবে।

গালিব চিঠি লেখার কাজ নিলেন। কিন্তু গালিবের মতো অসামান্য প্রতিভাবান মানুষ নেহাতই কেরানিগিরির কাজ করে তৃপ্ত থাকবেন কেন? চিঠি আর দলিলের কাগজ একপাশে সরিয়ে রেখে গালিব চিঠির কাগজে শায়েরি লিখতেন। ঠিক কবি তথা সাধক রামপ্রসাদের মতো—হিসাবের খাতায় কবিতা

বন্ধু হরগোপাল ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। একদিন গালিবকে ডেকে বললেন-বন্ধু তোর আর দলিল-দস্তাবেজ-চিঠি লিখে কাজ নেই। তুই শায়েরি লেখ। দেখছি তোর শায়েরি কোথাও ছেপে দু'টো পয়সা আনা যায় কি না?

একথাও বন্ধু হরগোপাল জানালেন, শুনেছিস তো ইংরেজরা দখল করেছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। কলের গাড়ি বসিয়েছে কলকাতায়। ঘোড়া আর বয়েলের গাড়ি উঠে যাচ্ছে। লোহার পাটার উপর দিয়ে ধুঁয়ার গাড়ি চলা শুরু হয়েছে। এদিকে দিল্লিতে কেতাব ছাপার কল বসিয়েছে। আমার এক বন্ধু মন্ত্রী নওলকিশোর কলকাতা থেকে ছাপাখানা এনেছে। নওলকিশোরের কাছে তোকে নিয়ে যাব। তোর কেতাব ছাপলে তোর প্রচার বাড়বে। বই বিক্রি বাড়বে। দুটো পয়সা আসবে।

বন্ধু হরগোপালের কথা গালিব শুনতেন বিস্ময়াবিষ্ট শিশুর কৌতূহল নিয়ে।

১৮৪১ সালে নওলকিশোরের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হল গালিবের প্রথম বই। 'দিওয়ান'। পাঠক সমাজে শোরগোল পড়ে গেল। দিল্লির নতুন বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর দরবারে ডেকে পাঠালেন মির্জা গালিবকে।

বাহাদুর শাহ বললেন—শুনেছি তুমি বড় দরের আলেম। তোমার কেতাব পড়েছি। কাল থেকে তুমি আমার ছেলেদের ফারসি পড়াবে। মালিয়ানা (বছরে) পাঁচশো টাকা তোমার মেহনতি। খুশিতে মির্জা গালিব বলে ফেললেন—আলমপনার ইচ্ছে মাথায় পেতে নিলাম।

মির্জা গালিব মালিয়ানা যা পেতেন তাতে সংসার চলত না। তাই আরও উপার্জনের জন্য মুশায়ারা যেতেন যখন যেমন সুযোগ আসত।

গালিব সাহেবের নিজস্ব কোনও বাসস্থান ছিল না। ভাড়া বাড়িতে বাস। পুরনো দিল্লির অতি ঘিঞ্জি মহল্লা কাশিমজানে থাকতেন ভাড়া বাড়িতে। ভাড়া বাড়ির দশা খুব একটা ভাল ছিল না। সে কথা এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন—যদি এক ঘণ্টা একটানা বৃষ্টি হয় তাতে আমার যা ক্ষতি না করে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ছাদের জমা জল আসার ঘরের ফুটো ছাদ দিয়ে এমনভাবে পড়তে যাকে যে আমি বুঝতে পারি না বাইরে বৃষ্টি কখনও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সুখ-দুঃখ দিন কেটে যায়। আহার্যের অভাব নিত্য। প্রায় বিনাচিকিৎসায় সন্তানের মৃত্যু হয়। কোনও কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি শায়েরি রচনা থেকে।

বাদশাহি ভাতা আর মুশায়ার থেকে যা আয় হত তার বেশিরভাগটাই খরচ হত বাড়ি ভাড়া আর মদের দাম মেটাতে। মদ কোনওদিন তাঁকে গিলে খায়নি। কিন্তু তাঁর দুঃখের দিনে মদ ছিল সেবকের ভূমিকায়। দুঃখনাশের ভূমিকায়। গালিব সাহেবের মদ্যপান নিয়ে একটি মজার ঘটনা তা হলে বলি—সেই সময় দিল্লি কলেজে উর্দু অধ্যাপকের পদ খালি আছে শুনে, গালিব সাহেব পালকি চড়ে দরখাস্ত নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কলেজে। ভেবেছিলেন তাঁর মতো প্রতিভাসম্পন্ন কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন অধ্যক্ষ। কিন্তু তা ঘটল না। অধ্যক্ষ দারুণ ব্যস্ত থাকায় গালিব সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন না। ক্ষোভে- দুঃখে গালিব সাহেব ফিরে এলেন। চাকরি হল না। এই অপমান সহ্য না করতে পেরে বাড়ি ফিরেই বেরিয়ে পড়লেন। কোনও নির্জন নিভৃতে বসে মদ্যপান করবেন। হাঁটতে হাঁটতে দেখলেন জনহীন এক পরাগে মসজিদ। মসজিদের বারান্দায় বসে বোতল খুললেন। মদ্যপান শুরু করার খানিক বাদে সেখানে হাজির মসজিদের মোয়াজিম তথা মসজিদ দেখভাল করার লোক। সে গালিব সাহেবকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে মসজিদ এলাকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। লোকজন ডাকা শুরু করে। কিন্তু গালিব সাহেব নির্বিকার। বোতল থেকে সুরা গলায় ঢেলেই চলেছেন। লোকজন জড়ো হওয়ার পর গালিব সাহেব তাদের শোনালেন—জাহিদ শরাব পিনে দে, মসজিদ মে বইঠকর। ইয়া ও জায়গা বাতা দে যাহা খুদা না হো। (জাহিদ আমাকে মসজিদে বসেই মদ খেতে দে। অথবা আমাকে এমন জায়গার সন্ধান দে যেখানে খোদা নেই। সেখানে বসেই মদ খাব)।

সমকালে আর এক প্রতিভার সন্ধান পাই। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আর্থিক কষ্টে থেকেও কাব্য, মগকাব্য লেখা থেকে বিরত হননি।

যশোহর জেলার সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলে মধুসূদন ছেলেবেলা থেকেই কলকাতায় মানুষ। বাবা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতায় নামী উকিল। জ্যাঠামশাই রাধামোহন ছিলেন যশোরের সেরেস্তাদার। সেজ জ্যাঠামশাই ছিলেন যশোহরের উকিল। এমন পরিবারের ছেলে উকিল হবে এটাই স্বাভাবিক। উকিল হয়েছিলেন, কিছুদিন আইন ব্যবসা করেছেন। প্রচুর রোজগার করেছেন। আবার দু'হাতে উড়িয়েও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মনোবাসনা ছিল, উকিল নয়, হাকিম নয়, কবি হতে হবে।

বয়স সতেরো হওয়ার আগেই কবিতা লেখা শুরু। ১৯৪১ সালে তাঁর সাতখানা কবিতা পাওয়া যায়। গোড়ার দিকে তাঁর কবিতায় দেখি এক অচেনা কুমারীর উদ্দেশে প্রেম নিবেদন। একটু কাঁচা লেখা।

কিন্তু কবি হতেই হবে। আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। আরও যদি কিছু ত্যাগ করতে হয় মধুসূদন মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তাই বন্ধুরা মধুসূদনকে 'পোপ' বলে ডাকতেন। কারণ, আলেকজান্ডার পোপ এক লেখায় বলেছিলেন—কবিতার জন্য দরকার হলে, আপনজনদের এমনকী মা-বাবাকেও ত্যাগ করতে হবে। মধুসূদন এই উক্তিতে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। বড় কবি হওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া উচিত, একথা মধুসূদনের মাথায় কে ঢুকিয়েছিল জানা যায় না।

তবে একথা সবার জানা, মধুসূদন প্রথম জীবনে ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। যৌবনে ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতেন। আর চেষ্টা করতেন বাংলা ভাষাকে কীভাবে ভোলা যায়। শুধু ভাষা নয়, ধর্মকেও ত্যাগ করলেন। ১৮৪২-এ ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলায় ওল্ড চার্চে মধুসূদন মাইকেলে পরিণত হলেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। বন্ধ হয়ে গেল মাইকেলের বিশপস কলেজের লেখাপড়া। কারণ পিতার টাকা আসা বন্ধ। মাইকেলের জীবনযুদ্ধ শুরু। প্রথমে মিশনারি হওয়ার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি চাকরির চেষ্টাও করেন। নিদারুণ অর্থাভাবে মাইকেল তাঁর প্রিয় বই-পত্তর অনেক দামি জিনিসপত্তর বিক্রি শুরু করলেন। জীবনযুদ্ধে টিকে থেকে তাঁকে যে কবি হতে হবে। ইংল্যান্ডে যেতে হবে।

ভাগ্যের সন্ধানে বন্ধু এগাবার্ট বেনেটের পরামর্শে চলে গেলেন জাহাজে চড়ে সুদূর মাদ্রাজে। জুটল সামান্য বেতনের সহকারী শিক্ষকের চাকরি। স্কুলের নাম—মাদ্রাজ মেল অ্যান্ড ফিমেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম অ্যান্ড বয়েজ ফ্রি ডে স্কুল। মাথা গোঁজার তেমন ভাল ঠাঁই নেই। এমন সময় পেলেন ছাত্রী রেবেকাকে। রেবেকা থাকতেন অ্যাসাইলামে। রেবেকার সঙ্গে প্রেম। বিয়ে হয় ৩১ জুলাই ১৮৪৮ সালে। বিয়ের চার-পাঁচ মাস পরে Madrus circulator-এ মাইকেল মধুসূদনের চারখানা কবিতা প্রকাশিত হল। সবই হাল্কা প্রেমের কবিতা। এদিকে আর্থিক অনটন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সামান্য বেতনে সংসার চালানো দায়। এরই ভিতর 'ক্যাপটিভ লেডি' নামে এক কাব্য লিখে ফেললেন। এই হচ্ছে কবির ধর্ম। আর্থিক অনটন দিয়ে তার কলম থামানো যায় না। বই আকারে ক্যাপটিভ লেডি প্রকাশ পেল। উৎসর্গ করেছিলেন স্ত্রী রেবেকাকে নয়, উৎসর্গ করেছিলেন অ্যাডভোকেট জর্জ নর্টনকে। এই বই মাইকেলকে দিয়েছিল পায়ের তলার মাটি। বন্ধু গৌর দাসকে একটি পত্রে জানান—'মাদ্রাজে কলকে পাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার। এখন আমার জুতো পরে দাঁড়াতে পারলে বর্তে যাবে এখানকার অনেক বদমাশ।

'ক্যাপটিভ লেডি' মাইকেল মধুসূদনকে তেমন খ্যাতি বা স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। এদিকে প্রথম সন্তান জন্মলাভ করেছে। সংসারে আর্থিক অনটন দিন দিন বাড়ছে। কাব্যচর্চা চলছে। এরই মধ্যে অঘটন ঘটল। নীলনয়না রেবেকা সংসার ছেড়ে চলে গেলেন বাপের বাড়ি নাগপুরে। আর ফিরলেন না। এই পর্বে এল কিশোরী হেনরিয়েটা। নাগপুরে বসে রেবেকা সব খবরই পেতেন। রেবেকার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল পাকাপাকি ভাবে। কলকাতায় ফিরে এলেন মাইকেল। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে মাইকেল মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন বিলেতে ১৮৬২ সালে ৯জুন। সেখানে গিয়ে ধারদেনায় ডুবে গেলেন। বিদ্যাসাগরের দয়ায় তাঁর দিন চলে। তার মধ্যে তাঁর সৃষ্টি থামেনি।

কবি জীবনানন্দের জীবনে এক বিপর্যয়কর ঘটনা। ১৯২৮-এ সিটি কলেজে অধ্যাপনার চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন। পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'ক্যাম্পে' কবিতাটি দুর্বোধ্য এবং অশ্লীল, এমন অভিযোগে কবি জীবনানন্দের চাকরি চলে গেল।

অধ্যাপনার চাকরি হারিয়ে বাঁধাধরা কোনও কাজ নেই। প্রাইভেট টিউশন আর কবিতা লেখা নিয়েই সময় কাটে কবি জীবনানন্দের। প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ একঘেয়ে মেসজীবন। মাঝে মাঝে পালিয়ে চলে যেতেন বরিশালের বাড়িতে। সেই চেনা দেশভূমি প্রকৃতি। শরীরমন আবার ঠান্ডা হয়ে যেত। এখানে দেখা গেল সুকুমার দত্তের সঙ্গে। কর্মহীন জীবনানন্দের কথা শুনে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। মন না বইলেও গেলেন। ১৯২৯-এর

ডিসেম্বর মাসে যোগ দিলেন ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনার কাজে। ছুটি নিয়ে ফিরে এলেন ১৯৩০-এ মে মাসে। ফিরলেন বরিশালের বাড়িতে। ফিরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হল। পাত্রী লাবণ্য গুপ্ত। বিয়ের পর আর দিল্লি ফিরে যাননি। আবার কর্মহীন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত জীবনানন্দের একটানা বেকারজীবন। বেকার অবস্থায় কখনও বিমা কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। আবার কখনও ছোটভাই অশোকানন্দের কাছ থেকে টাকা ধার করে বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করার চেষ্টা করেছেন। কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে গেল সেই ব্যবসা। অগত্যা ভরসা সেই প্রাইভেট টিউশনি। তা থেকে কোনও মতে চলে যায় হাতখরচ। চাকরির খোঁজে মাঝে মাঝেই চলে আসতেন কলকাতায়। বিফল মন নিয়ে ফিরে যেতেন বরিশালে।

কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও কবিতা লেখায় ভাটা নেই। কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে কবিতা।

পাঁচ বছরের বেকার জীবনে লেখা কবিতা নিয়ে ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল—কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।

১৯৪৩ -এ গ্রীষ্মাবকাশে কলকাতায় ছোট ভাই অশোকানন্দের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। যোগাযোগ করলেন কবি মহলে এবং পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। বরিশালে ফিরে ভাইয়ের বউ নলিনী দেবীকে চিঠিতে জানান—'কলকাতায় গিয়ে এবার নানারকম অভিজ্ঞতা হল। সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানারূপ নতুন সম্ভাবনার ইশারা পাওয়া গেল। বরাবরই আমার আত্মবৃত্তি ও জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকার ইচ্ছে। এবার সেই ইচ্ছে আরও জোর পাচ্ছে।'

কিন্তু ভদ্রস্থ একটা চাকরি না থাকলে কলকাতায় বসবাস অসম্ভব। কিছুদিন আগে বাবা মারা গিয়েছেন। মা, স্ত্রী কন্যা আর পুত্র নিয়ে বেশ বড় সংসার। সুতরাং কবির কলকাতায় থেকে সাহিত্যচর্চার প্রবল ইচ্ছা মাঠে মারা গেল। বরিশালেই থাকতে হল।

১৯৪৬ এল। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বরিশাল ছেড়ে চলে এলেন জীবনানন্দ সপরিবার কলকাতায়। ছোট ভাই অশোকানন্দের ল্যান্সডাউনের বাসা জীবনানন্দের নতুন ঠিকানা। মনের আনন্দে কবিতা লিখবেন তার উপায় নেই। তবু রাতে কবিতা লিখছেন আর দিনের বেলায় খুঁজে বেড়ান চাকরি। বন্ধুবান্ধব, পরিচিত লোকজনের কাছে চাকরির খোঁজ নিতে লাগলেন। সংবাদপত্রে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠাতে লাগলেন এদিক-সেদিক। কিন্তু কোনওদিক থেকেই কোনও আশার আলো দেখতে পেলেন না।

এই সময় ক্রিক রো থেকে হুমায়ুন কবীর ও আরও কয়েকজনের উদ্যোগে 'স্বরাজ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। সম্পাদক—সতেন্দ্রনাথ মজুমদার। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সত্যপ্রসন্ন দত্তর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এখানে একটা কাজের ব্যবস্থা হল জীবনানন্দের। 'স্বরাজ' পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হলেন জীবনানন্দ। অল্প বেতনের চাকরি হলেও জীবনানন্দ পত্রিকার উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করতেন। কিন্তু কপাল মন্দ, আর্থিক সঙ্কট দেখা দেওয়ায় পত্রিকা প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে এল। মাস কয়েক বাদেই স্বরাজের কাজ ছেড়ে দিলেন জীবনানন্দ।

আবার চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ঝাঁপ। দরখাস্ত পাঠানো। টিউশনি শুরু করলেন আবার। সামান্য আয়। প্রথমদিকে কলকাতা এবং কলকাতার আশপাশে চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠাতেন। কিছুদিন পরে দূরে কোথাও চাকরির জন্যে।

দুঃসহ ভাসমান জীবন। যেন ক্লান্ত ডানায় এক ধূসর পাখির উড়ান। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হল তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির'। লেখক স্বত্ব হিসাবে জীবনানন্দকে দেওয়া হল মাত্র একশো টাকা। বই লিখে এটিই তাঁর প্রথম অর্থপ্রাপ্তি। আর্থিক দুশ্চিন্তা কুরে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। দু'বছরের উপর বেকার। ১৯৪৮-এর ২৫ ডিসেম্বর মা কুসুমকুমারী প্রয়াত হলেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি কবিতা লেখা চলছে। এইভাবে চলতে চলতে ১৯৫০-এ খড়গপুর কলেজে ইংরেজি অধ্যাপকের চাকরি পেলেন। থাকেন খড়গপুরেই। মাঝে মধ্যে ছুটি পেলেই চলে আসেন কলকাতায়। ছেলেমেয়ে-বউদের দেখে আবার চলে যান। এরকমই এক ছুটিতে এসে কবি দেখলেন স্ত্রী লাবণ্য খুব অসুস্থ। হার্টের অসুখ। চলাফেরা একদম বন্ধ। একটানা বিশ্রাম। জীবনানন্দ পড়লেন সঙ্কটে। কাছাকাছি কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই। ছোটভাই অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছেন দিল্লিতে। কলকাতায় থাকতে হল কবিকে। স্ত্রীর সেবাযত্নের দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের হাতে। এদিকে ছুটি ফুরিয়ে এল। কলেজ কর্তৃপক্ষ আর মঞ্জুর করল না। ফলে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হলেন। আজ চাকরি আছে কাল নেই। অনিশ্চিত জীবন। এভাবেই কেটেছে জীবনানন্দের কবিজীবন। বারে বারে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য এবং নির্মম, রূঢ় ব্যঙ্গবিদ্রূপ নিয়ে মানসিক অশান্তি তাঁকে পীড়া দিয়েছে। পারিবারিক অশান্তিও কম ছিল না। এসবরেই প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর ডায়েরির পাতায়। মাত্র দুটি দিনের পাতা উল্লেখ করব।

২৪ জুলাই ১৯৩১— An Unsuccessful man, a failure, an unemployed kicked Show at best success & you will be fawned. ২৮ জুলাই ১৯৩১— Moneylessness, like a dirty wallowing pig. bespattering me.

এরপরও কবি লিখতে পারেন 'কমলালেবু' কবিতাটি। কারও প্রতি নালিশ নেই সেই আবার ফিরতে চায় এই কঠোর পৃথিবীতে। কিন্তু কোন রূপে? পরিচিত কোনও মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন দিতে—একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব/আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?/আবার যেন ফিরে আসি/কোন এক শীতের রাতে/একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে /কোন এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

কবি জীবনানন্দ ছিলেন কম কথার মানুষ। আপনভোলা মানুষ। আপনমনে হাসতেন। রাস্তায় বুদ্ধদেব বসু পিছন থেকে ডেকে ডেকেও সাড়া পাননি—এমন ঘটনাও আছে। কবি নিজের কথাই কি এইভাবে বলেছেন—'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।' জাগতিক লোভ, লিপ্সা, ঈর্ষার ওপারের বাসিন্দা যেন কবিই হতে পারেন।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই কবিতামগ্ন, জীবনমগ্ন আর এক কবিকে—কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তারপর থেকে আমৃত্যু তাঁর কলম থামেনি। বারে বারে বদলেছে কবিতার ভাষা, শরীর এবং মানুষ দেখার চোখ। কিন্তু শত প্রতিকূলতায়ও বদলায়নি তাঁর স্পর্ধা-ঋজু কণ্ঠস্বর। আর্থিক দৈন্য থামাতে পারেনি তাঁর কলম এবং মনের দৃঢ়তা। কখনও কর্মস্থল ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন তো কখনও বাঘাযতীন স্কুলের মাস্টার। নিজের কবিতার বই বিক্রি করতেন বইমেলায়। ক্রেতাকে বোঝাতেন—আমি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমার একটি কবিতার বই কিনুন। এমনও শোনা যায়—ক্রেতার পিছন পিছন ছুটেছেন বইমেলায়। জানতে চেয়েছেন, কেন আমার বই কিনবেন না?

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সারা পশ্চিমবঙ্গ গণআন্দোলনে অস্থির। খাদ্যের লাইনে গুলি খেয়ে মরছে তাজা কিশোর। পুলিশ দিয়ে সন্ত্রাস। চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ। এই সময়কে ধরে রাখতে লিখলেন—

মুখে যদি রক্ত ওঠে/সে কথা এখন বলা পাপ/এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই/এ সময় রক্তবমি করা পাপ...

জীবনানন্দের পর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সচেতন ভঙ্গিমায় ঋজু বিষয়ে বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করে দিয়েছেন।

আঁধার রাতে একলা পথিকের মতো হেঁটে গিয়েছেন।

নিবন্ধ

প্রসঙ্গ প্রশাসন
উন্নয়নী এবং পশ্চিমবঙ্গ



অমিয় চৌধুরি

উত্তর উপনিবেশিক সময়ের প্রথম দিকে অনুন্নত দেশগুলোর অবস্থা সব দিক থেকেই রাজনৈতিকভাবে অস্থির আর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতির পর্যায়ে ছিল। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির, একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া, স্থিতাবস্থার অভাবে ঠিকমতো গণতান্ত্রিক আবহ তৈরি হতে পারেনি।

বেশি দূর না গিয়ে ভারতের নিকট প্রতিবেশী পাকিস্তানের অবস্থা বিচার করলেই আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ প্রমাণিত হবে। পাকিস্তান বর্তমানে আরও খারাপের দিকে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সর্বক্ষেত্রেই আজ পাকিস্তানকে তার সামরিক কর্তা এবং ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা নিয়ন্ত্রণহীন অভ্যন্তরীণ সামরিক গোয়েন্দা চক্রের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। এখানে সিভিল প্রশাসন ক্ষমতাহীন।

ভারতের অবস্থা এমনটা ছিল না। একদল জাতীয় সংগ্রামী নেতার হাতে, তার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। দু'বছর ধরে গড়ে তোলা একটা সুন্দর গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হয়। যার বাইরে গিয়ে কাজ করবার বা শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা কারও ছিল না। সামরিক বাহিনীকে এমনভাবে স্তরবিন্যাস করা হয়েছিল যে, কোনও একটা কেন্দ্র থেকেই সামরিক প্রধানরা পাকিস্তানের মতো, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ করে নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতায় ছিলেন নয় কোনওদিন আসতেও পারবেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আর প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্মণরেখা থাকে। ভারতবর্ষ সেটা মেনে নিয়েই প্রশাসনিক সংস্কার এবং তার উন্নয়নের চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকেছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং তার নিজস্ব সীমার মধ্যে কার্যকারিতার বাহ্যিক রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছিল। তার ফল ভালই হয়েছে। আর বিশেষত ম্যাক্স ওয়েবাবীয় সংজ্ঞায় ক্যারিসম্যাটিক ক্ষমতাধারী রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীদের অগ্রাহ্য করে রাজনীতির নিম্নস্তরের আমলাদের প্রাধান্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। কিন্তু তবু এই আমলাকুলের ব্রিটিশ শাসনের ইথোসকে একেবারে ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মন্ত্রীরা রাজ্যে জনগণের স্বার্থে এবং এক অর্থে নিজেদের ভোটের স্বার্থে সরকারের কার্যাবলি এবং শাসক দলের দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে উন্নয়নের নীতি এবং রূপরেখা এঁকে দিতেন। সেই নীতি কার্যকরী করবার দায়িত্ব থাকতো আমলাকুলের হাতে। সচিব পর্যায় থেকে শুরু করে জেলাশাসক মহকুমা শাসক এবং নিম্নস্তরে সরকারি কর্মচারীদের হাতে। সব গণতান্ত্রিক দেশের মতো ওই আমলারা কখনওই জনগণের কাছে গিয়ে তাদের প্রয়োজন বা দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনেননি। এখনও শোনেন না। সাধারণ গ্রামবাসী এদের থেকে ভয়ে ভয়ে থাকতেন। তাদের কোনও কাজ পেতে গেলে এই সব বড় বা ছোট আমলাকে খোসামোদ করতে হত। এদেরকে দেখা হত '.....' সম্বন্ধে।

ব্রিটিশ আমল থেকে এটা চলে আসছিল। স্বাধীন দেশে তাই কিছুটা আমলাতন্ত্রকে সংস্কার করে, তাদের স্বাধীন ভারতমুখী করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে তাঁদের অর্থাৎ আমলাকুলের কর্মসংস্কৃতিই ছিল প্রভুত্বের। নেহরু, প্যাটেলদের ওপরে অবশ্য তারা খুব একটা মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু রাষ্ট্র কি উন্নতি করার চেষ্টা চলছিল উপর থেকে নিম্নস্তরে—যা নাকি উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের এই ব্যবস্থায় কিছু ফল মেলেনি। বিশ শতকের পাঁচের দশকের শেষের দিক থেকে এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধন করে সেই সময়কার ভাবনা অনুযায়ী পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন নেহরু। কিন্তু করলে হবে কী! সরকারি আমলাতন্ত্র সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেনি। অতএব এই ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষে গৃহীত হলেও আমলাতান্ত্রিক এই নিয়ন্ত্রণ মানুষকে উন্নয়নের শরিক করে তুলতে পারেনি। নেহরু এটা বুঝতেন না তা নয়। আমলাতন্ত্রকে মানুষমুখী করে তুলতে বেশ কিছু সংস্থা তৈরি করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। কাজের কাজ কিন্তু কিছু হয়নি।

[দুই]

উন্নয়নমূলক বা উন্নয়নী প্রশাসন : ফলে ভারতের নাগরিকরাও এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেনি। ভঙ্গুর সামাজিক অস্তিত্ব যে তিমিরে ছিল ৭০ বছর আগে, এখনও তাই। শিক্ষার হার নিশ্চয়ই বেড়েছে কিন্তু সাক্ষরতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে খাদ্য উৎপাদন পিছিয়ে আছে। গ্রামীণ জীবনের উন্নতি কমই হয়েছে। সাতের দশকের শেষ দিকে পঞ্চায়েত-এর পুরপ্রতিষ্ঠানগুলির নতুন সাংবিধানিক অবয়ব দিলেও ভারতের বহু রাজ্যে তা আকাঙ্ক্ষিত কার্যকারিতায় পৌঁছয়নি। হয়েছে তত্ত্বগত বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা। দেশের প্রান্তিক মানুষ এবং গ্রামীণ, আধা গ্রামীণ মানুষকে এখনও উন্নয়নের শরিক করে নেওয়া যায়নি। মহিলা সমাজ যা নাকি সমস্ত জনগণের অর্ধেক, তাদের ক্ষমতায়নকে বাধা দেওয়া হয়েছে। বাধা দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। একমাত্র নীতীশ কুমার-এর নেতৃত্বে বিহারের পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন জাতপাত, শ্রেণি-সহ ৫০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ ব্যবস্থা হয়েছিল ২০০৬ সালে। নীতীশের রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল অবশ্যই। তবে মহিলাদের উন্নয়নের মূল স্রোতে শরিক করে নেওয়া সত্যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা যায়। এই উদাহরণ উদ্বুদ্ধ করে কেরল, মহারাষ্ট্র এবং একেবারে বামফ্রন্টের শেষবেলায় পশ্চিমবঙ্গকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আনা হয়। যার পূর্ণতা দেয় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে। ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএম-এর মূল তত্ত্ব তো গণতান্ত্রিক এককেন্দ্রীকরণ। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী গ্রহণ করতে হয়েছিল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু বুদ্ধিমান তথাকথিত মার্কসবাদীরা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে দলীয় মানুষজন, সদস্যদের সর্বস্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই কেন্দ্রীকরণ তত্ত্বেই স্থিত ছিলেন। ফলে সর্বস্তরের মানুষ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেনি। এই ব্যবস্থায় প্রথম পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে ২০০৮ সালে সেই ১৯৭৮ সালের পর থেকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিনে শুধুমাত্র তাঁর অটল উদ্দেশ্য এবং আপসহীন, নিঃস্বার্থ লড়াইয়ের মাধ্যমে সাধারণ দরিদ্র মধ্যবিত্ত গ্রামীণ জনগণের মধ্যে মিশে যেতে পারছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যায়, মমতা কোনও তত্ত্বের

সন্ধান বা তার প্রয়োগ নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি যা করেছেন, তা তাঁর সমাজবীক্ষণ এবং নিজের উপলব্ধির নির্যাস।

প্রশাসন উন্নয়নীর একটা তত্ত্বগত দিক আছে যার ক্ষেত্রসমীক্ষা হয়েছিল মালয়েশিয়ায়। যিনি এই তত্ত্বের আধুনিক উদ্‌গাতা তিনি ফ্রেড রিগ্‌স। উদ্ভব মাত্র ৬০-৭০ বছরের। এই তত্ত্বটি হল : উন্নয়নমূলক প্রশাসন যাকে প্রশাসন উন্নয়নী বলা যায়। মালয়েশিয়া গ্রহমুক্ত অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হলেও, উপনিবেশকরা তাদের প্রশাসনিক কাঠামো ক্ষুদ্রত্বে পরিণত করে গিয়েছিল। একটা দেশ মুসলমান প্রধান অথচ খানিকটা হলেও ধর্ম নিরপেক্ষ। কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত আর এক একটি প্রদেশে নবাবের রাজত্ব। অথচ এত তাড়াতাড়ি কেমন করে দেশটি উন্নয়নের শামিল হয়ে উঠল! রিগ্‌স দেখেছেন, উন্নত প্রশাসন না থাকলেও প্রশাসনের বিস্তার ঘটেছিল। প্রশাসকরা জনগণের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক তৈরি না করে মানুষের উন্নয়ন যজ্ঞের শামিল হয়েছিলেন।

উন্নয়নমূলক প্রশাসনের মূল কথা এটাই। প্রশাসনের দুটো ভাগ— রাজনৈতিক আর সরকারি কর্মচারীকুল যাঁরা নাকি রাজনৈতিক অংশের উদ্দেশ্য এবং আদর্শকে বাস্তব ক্ষেত্রে কাল-পাত্র বুঝে ফলপ্রদভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। কর্মচারীকুলের মনোকাঠামোটা লৌহকাঠামো সদৃশ। যাকে নড়ানো বড় শক্ত। এইখানেই রাজনৈতিক প্রশাসনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে—কীভাবে তাঁরা কর্মচারীকুলকে মোটিভেট করবে এবং আইনের মধ্যে থেকে জনস্বার্থে কাজ করিয়ে নেবে। আগে বলা হয়েছে, একদলীয় ব্যবস্থায় উন্নয়নের হার অবশ্যই বেশি তবে তা সামগ্রিক এবং উন্নত জীবনযাপনের অর্থে নয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় দেখা মানুষের চোখে-মুখে তাই ফুটে উঠেছিল। মনে হত ওরা মূক-বধির। বাইরের মানুষকে চিন তার গ্রামাঞ্চলের প্রবেশের অনুমতি দেয় না। এমনকী চিনের শহুরে মানুষও যেখানে খুশি যেতে পারে না। এ সবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, উন্নয়ন যত শ্লথই হোক না কেন, সেটা হয় পদ্ধতিগত দোষের অথবা রাজনৈতিক





সদিচ্ছার স্বল্পতার কারণে। আর এইখানেই উন্নয়নী প্রশাসনের শ্রেষ্ঠত্ব। যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ বা রাজ্য এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করেনি বা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের কারণে এই প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ, অথব বহুদলীয় গণতন্ত্রের টানাপোড়েনে রাজনীতিকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অগ্রসর হয়েছেন— এমনকী ভারতবর্ষ-সহ সে সব দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই আছে। অর্থনীতির ওঠাপড়ায় সামাজিক সুস্থিতি আসেনি।

[তিন]

প্রশাসন উন্নয়নী এবং পশ্চিমবঙ্গ : এই প্রসঙ্গেই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কথা উল্লেখ করতে হয়। সেই ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১-র মে মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে একটা সুস্থিত বামফ্রন্ট নামক জোট সরকার ছিল। জোট সরকার হলেও জোটের মধ্যে দলীয় অস্থিরতা আসে। কিন্তু একানে তা হয়নি। কেননা, সিপিএম দলটি একাই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বার বার। অথচ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আনতে পারেনি। প্রথম দিকে পঞ্চায়েত এবং ভূমি সংস্কারের পথে হাঁটলেও সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রিকতা তারা চায়নি। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে তারা মানুষের সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছতে দেয়নি। পার্টি সর্বস্ব বিভিন্ন স্তরের দলীয় নেতৃত্ব মাতব্বরি করেছে। ভোট সর্বস্ব রাজনীতিকরণের জন্য গ্রামীণ অতি নিম্নস্তরের মানুষজনকে উন্নয়নের রাস্তায় হাঁটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। গণতান্ত্রিক দলীয় কাটামোর মধ্যে তারা একটা 'পার্ট্রেক্রেসি' সৃষ্টি করে গিয়েছে। মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেনি। আর পরবর্তী সরকারের ঘাড়ে রেখে গিয়েছে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা। এখানেই এখন ওদের সার্বিক ব্যর্থতা।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখানেই আপাত সার্থকতা। দলীয়ভাবে নেতাদের উপর সর্বদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে জ্যোতিবাবু, বুদ্ধদেববাবুর মতো মমতা তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকে চেয়ার সর্বস্ব করে রাখেননি। ক্ষমতায় এসেই পশ্চিমবঙ্গে আবিলতায় জর্জরিত দু'টি কঠিন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর অবিরত ছোটাছুটি আর আন্তরিকতা দিয়ে সমস্যা দু'টি সমাধানও করেন। প্রথমটি মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গলমহল। কট্টর মাওবাদীদের জঙ্গলমহল ছাড়তে বাধ্য করেন আর অন্যদের পশ্চিমবঙ্গের মূল রাজনীতির স্রোতে নিয়ে আসেন। এই ক্ষেত্রে তিনি সরকারি আমলা কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বাস্তবমুখী উদ্দেশ্যসাধনে শামিল করে নেন। এখানে রাজনৈতিক প্রশাসন আর আমলা ভিত্তিক প্রশাসনের মধ্যে সার্বিক যোগসাধনে উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং সার্থকতা লাভ করেন। অন্যদিকে, বামফ্রন্টের আমলে কী দেখা গিয়েছিল! মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু তাঁর চেয়ারে সেঁটে বসে থেকে কয়েকজন বড় মাপের আমলাকে হেলিকপ্টারে লালগড়ে পাঠালেন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম ঠিক করতে। তাঁরা ভীতসন্ত্রস্ত কিছু গ্রামবাসীর সঙ্গে বাতচিত করে ফিরে এলেন। তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী 'জ্ঞানীগুণী সাংস্কৃতিক বুদ্ধদেববাবুর কাছে। তারপর সব কাজ শেষ হয়ে গেল। জঙ্গলমহল রইল যে তিমিরে সেই



তিমিরেই। দ্বিতীয়ত, সেই ৮০-র দশক থেকে উদ্ভূত দার্জিলিংয়ের গোর্খা লিগ আন্দোলন এবং তার সম্মানজনক সমাধান মমতা করতে পেরেছেন। বর্তমানে যে সমস্যা সেটা হল দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপি থেকে নির্বাচিত। বিজেপির সাংসদের উপর অনেকটা নির্ভর করছে বিমল গুরুংরা আগামীতে কী ধরনের সংখ্যা সৃষ্টি করেন। কিন্তু মমতার সঙ্গে খুব একটা পেরে উঠবেন বলে মনে হয় না। কেননা



মমতার অস্ত্র তাঁর মানুষকে নিয়ে চলার মন্ত্র আর প্রশাসনকে দার্জিলিঙের উন্নয়নে পুরোভাবে শামিল করে দেওয়া। কতবার যে তিনি দার্জিলিংয়ে, আর তার অপর দুই মহকুমা এবং উত্তরবঙ্গে ছুটেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি উত্তরবঙ্গের জন্য নতুন সচিবালয় তৈরি করেছেন। সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন সরকারি আমলাকুলকে। বামফ্রন্টের ফেলে যাওয়া উত্তরবঙ্গকে উন্নয়নের শপথ নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন। সব সময় তিনি মানুষের মধ্যে আছেন। এটাই গণতান্ত্রিক রাজনীতিকের ধর্ম। সেই মাও জে দং-এর কথা—জলের মধ্যে জলের সঙ্গে মাছের যে সংযোগ, একজন প্রকৃত সার্থক রাজনীতিকের জনসাধারণের সঙ্গে সেই সম্পর্ক থাকা উচিত। মমতা এই আপ্তবাক্য একজন কমিউনিস্ট না হয়েও মাথায় রেখেছেন। তো একেই তো বলে প্রশাসন উন্নয়নী। আন্দোলনকারী মমতা যখন কোনও এবং কোথাও অন্যায় লক্ষ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঝাঁপিয়েছেন। তখন ওঁর সঙ্গে কেউ ছিল না, নিজের দলের কিছু বিশ্বস্ত নেতা ছাড়া। এবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ওঁর সঙ্গে রয়েছেন কিছু সৎ কর্মচারী, পুলিশ অফিসার এবং ব্যুরোক্র্যাসি বা আমলাকুল। মমতা যেমন নিজে সব সময় তৃণমূল স্তর থেকে উন্নয়নের বার্তা দিতে ছুটেছেন, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন সরকারি স্তরের প্রশাসনকে। প্রশাসনের ভূমিকা এখানে কোথাও 'অ্যাডভাইসার' এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রে 'ফেসিলিটেটর'। মূল উপদেশ, উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমলাবৃন্দ। জেলায় জেলায়, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং সর্বনিম্নস্তরে বিডিও। পরিকল্পনার স্তরে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নী যাত্রায় কর্মচারীরা সবসময় তাঁর সঙ্গী। এঁদের দায়িত্ব স্থানীয় স্তরে অথবা স্তরে স্তরে, তৃণমূল স্তরের মানুষ, স্থানীয় স্তরের মানুষের লক্ষ্য সাধনে নেতৃবৃন্দ। এঁরা উন্নয়নের মানচিত্রটি' এঁকে দিচ্ছেন। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা করে দেন। আর সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের মূল দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে জাতপাত ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা চলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিস্তর প্রশাসন গভীরভাবে সাধারণ মানুষ—সে গ্রামীণ বা আধা শহুরে হোক না কেন—উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এর সুফল ফলতে দেরি হলেও, মমতা কিছু সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত মানুষ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এবং বেশ কিছু সরকারি কর্মচারীর নিন্দা-আত্তি আত্মস্থ করেও তাঁর লক্ষ্যে অবিচল। বহু কাজ আছে যার জন্য বিনিয়োগ জরুরি। যদিও তার ফলের জন্য বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয় যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে ভারী শিল্পের বিনিয়োগের বেলায়। চটজলদি ফল পেতেও মমতার প্রশাসন স্থানীয় মানুষের সুবিধার জন্য গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট, পুকুর, বনসৃজন করিয়েছেন। অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গত বহু বছরের তুলনায় সম্প্রতিকালের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করছেন। শুখা মরশুমে চাষের জমিকে ফসলমুখী করতে গ্রামে-গঞ্জে হাজার হাজার ছোট-বড় পুকুর খনন করিয়েছেন। 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে। সমাজের অর্ধেক জনসংখ্যা মহিলাদের। অথচ এ তাবৎকাল তারা উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তারা একদিকে যেমন বাড়িতে পুরুষের সেবা করেছে, অপরদিকে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ক্ষেতিও করে গিয়েছে। অথচ তাদের 'এনটাইটেলমেন্ট' স্বীকৃত হয়নি। তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে। পঞ্চায়েত এবং পুরপ্রশাসনের আওতায় ৫০ শতাংশ মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব মেনে নিয়ে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। এইখানে শতবাধা অতিক্রমকারী বিহারের নীতীশ কুমারের পথে প্রশাসনকে পরিচালিত করেছেন তাঁর মতো করে। কন্যাশ্রী প্রকল্প করে প্রাথমিক এবং মাধ্যম স্তরে যাতে দরিদ্রবাড়ির মেয়ে স্কুলছুট না হয়ে পড়ে সেদিকেও লক্ষ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে অনেক উদাহরণ টেনে আনা যায়, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তো মমমতার কাজে রাজনৈতিক, নির্বাচনভিত্তিক স্বার্থ খুঁজতে ব্যস্ত। কিন্তু অবাক হতে হয়, উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ মমতার কিছু সুশীল সমাজের সঙ্গী সেই ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত, যারা মমতার প্রশাসন বা সংস্থায় বিভিন্নভাবে সদস্যপদ নিয়ে সুখে জীবনযাপন করেছেন, তাঁদের কিছু মানুষের কথা অবাক করে। লোকের কাছে পদের মহত্ব সুখী হয়েছেন, তাঁরা কিন্তু মমতার সমালোচনা করতে ছাড়ছেন না। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এত পয়েন্ট ডিএ বকেয়া কেন! কেন সরকার আজেবাজে রাজনৈতিক কারণে জেলায় জেলায় প্রশাসকদের নিয়ে সভা করে, গ্রামের মেয়েদের লক্ষ লক্ষ সাইকেল বিতরণ করেছেন।! অথচ শিক্ষকরা ডিএ পাচ্ছেন না, পুরনো বেতনবৃদ্ধির কারণে বকেয়া বেতনও পাচ্ছেন না। এঁরা বহুবিধ

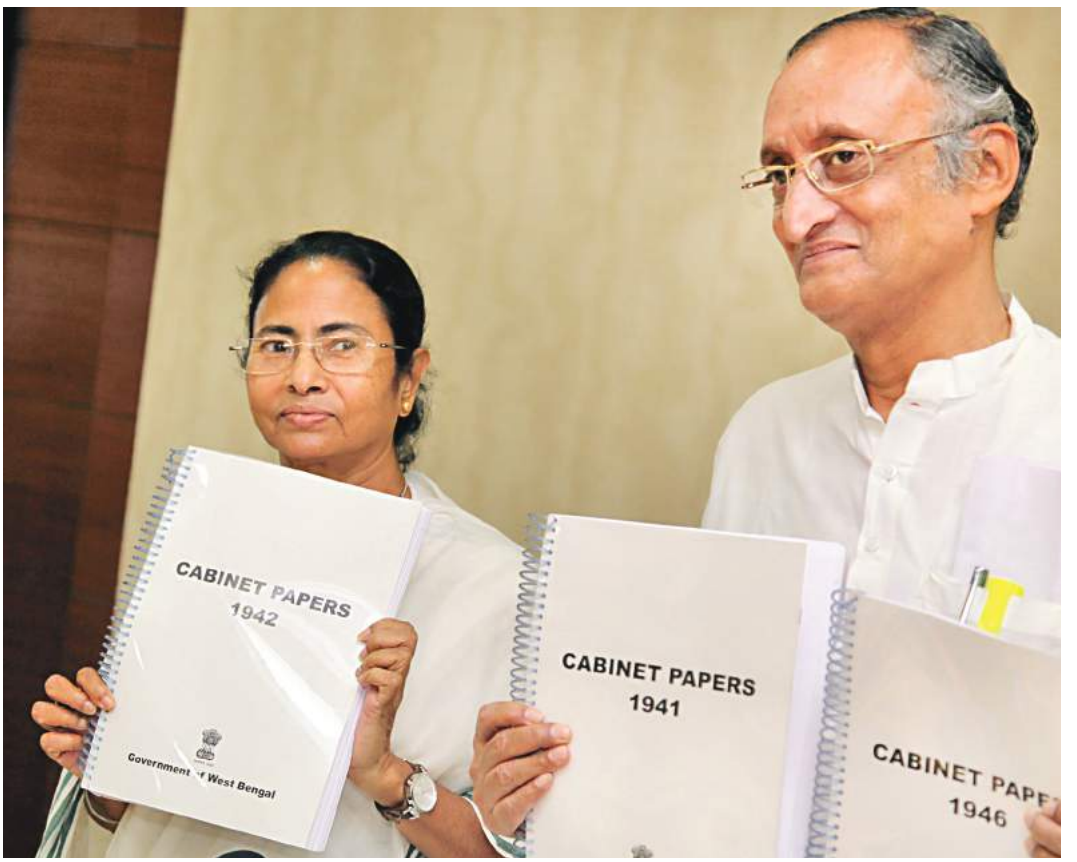

সুযোগ-সুবিধা পেলেও রাজ্যের অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলি বুঝতে চেয়ে কিছুদিনের জন্য হলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায়গুলো মেনে নিতে পারেন না। তাঁদের কাছে 'Development Administration' বা 'উন্নয়নী প্রশাসনের' তত্ত্ব এখনও হাসি ঠাট্টা বা উষ্মার কারণ। দক্ষ প্রশাসক এগুলো অগ্রাহ্য করেই থাকেন, মুখে কিছু উচ্চারণ না করে। গ্রামে গ্রামে মেয়েদের স্কুলে-কলেজে যাতায়াতের জন্য সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। কেননা, পশ্চিমবঙ্গের ৩৮ হাজার গ্রামের সর্বত্র স্কুল-কলেজ নেই। আছে যানবাহনের অপ্রতুলতা। তাই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে স্কুলে পৌঁছতে মেয়েদের একমাত্র সাইকেলই ভরসা। সরকারি কর্মচারী উঁচুস্তরের আমলা এবং রাজনীতিক নিয়ে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছেন রাজ্যের প্রধান প্রশাসক। এতে গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। আস্তে আস্তে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। অবশেষে শিক্ষা অন্তে কেউ উচ্চশিক্ষায় যাবে সরকারের অর্থসাহায্যে। স্কুলস্তর যারা শেষ করবে, তারা স্বয়নং প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কার্যে চলে আসে। এইভাবে এবং তারা নিজের চেষ্টাতেই ক্ষমতায়িত হয়ে উঠবে। পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা আঞ্চলিক স্তরে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে স্থায়ী সম্পদ গড়ে তুলবে। এই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকরা দলবদ্ধভাবে বার বার ভিন্ন জেলা এবং অঞ্চলে সভা করছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনকে এবং মহিলাদের উন্নয়ন পক্রিয়ায় শামিল করে, স্বনির্ভর প্রকল্পের আওতায় এনে উৎপাদন ক্ষেত্রে এক বিপ্লবী পরিবর্তনের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করা হবে। আমলা শ্রেণির প্রশাসক এখন আর শুধুমাত্র সচিবালয়ে বসে থেকে কোথায় কী করা হবে তার নির্দেশ দেবেন না। তাঁরা আজ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করে তাঁরা তাঁদের সেই থেকে রপ্ত করা মানসিক ধ্যানধারণা ত্যাগ করতে পারছেন। সরকারি প্রশাসকরা এখন প্রধান প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১০০ বারেরও বেশি, জেলায় জেলায় ঘুরে সবরকম মানুষের কাছে এসে যাচ্ছেন। একেই তো উন্নয়নী প্রক্রিয়া বলে। এই উন্নয়নের রূপরেখা উপর স্তর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। উন্নয়নের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, আদর্শ, কর্মযজ্ঞের উপাদান সাধারণ মানুষের ভিতর থেকে উপরিভাগে চলে যাচ্ছে। কেমন সার্বিকভাবে তা হচ্ছে— অনেকভাবে তার বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব। এই সবই থেকে যাবে ভবিষ্যতের কেস স্টাডি হিসাবে গবেষকদের অনুসন্ধান এবং বীক্ষণের স্তরে। আপাতত শুধু কাজ চাই। বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে রাজ্যের প্রধান প্রশাসক সেই ব্যাপারে কতটা আন্তরিক এবং কর্মনিষ্ঠ। এখানেই তো উন্নয়নমূলক প্রশাসন বা প্রশাসন উন্নয়নীর সার্থকতা। কোনও তাত্ত্বিকতা মাথায় না রেখেই কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ দেখাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দিনে এর ভুল এবং সার্থকতা অবশ্যই দেখা যাবে। আর এখানেই রাজনীতি এবং প্রশাসক মমতার সার্থকতা। যিনি থেমে থাকার মানুষ নন।

গল্প

সত্যবতীর কথা



প্রফুল্ল রায়

সত্যবতীকে প্রথম দেখি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। তাকে কী বলা যায়? ফেমিনিস্ট? অথবা প্রগতিবাদী? নাকি একজন ঘোরতর আইকোনোক্লাস্ট? স্বামী-সংসার- বিয়ে ইত্যাদি সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে যে একটা চালু অটল ধ্যানধারণা বা মিথ তৈরি হয়ে আছে সেটা কি ভেঙে ফেলতে চায় সে? কোনও অভিধাই তার পক্ষে খুব সম্ভব যথেষ্ট নয়।

সত্যবতী অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ডে পড়া আলোকপ্রাপ্ত কোনও নারীবাদী নয়। সে তৃতীয় বিশ্বের এক অতি নগণ্য রমণী। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত তার লেখাপড়ার দৌড়। নামটা গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে সই করতে পারে। হতদরিদ্র এক পরিবারে তার জন্ম। তার উপর উদবাস্তু। দেশভাগের কয়েক বছর পর বরিশাল জেলার এক অজ গাঁ থেকে ভাসতে ভাসতে কলকাতায় এসে ঠেকেছিল। তারপর পঁয়তাল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে। এই বিশাল মেট্রোপলিসের চৌহদ্দির বাইরে কোনও দিন সে পা ফেলেনি।

আমি প্রথম তাকে দেখেছিলাম আমার এক বন্ধুর টালিগঞ্জের বাড়িতে। রান্নার কাজের জন্য তাকে রেখেছিল বন্ধুরা।

সত্যবতী তার বাবা-মা এবং ভাইবোনেদের সঙ্গে কাছাকাছি একটা জবরদখল কলোনিতে থাকত। সারাদিন আমার বন্ধুদের বাড়িতে কাটিয়ে রাত্তিরে চলে যেত।

তখন সত্যবতীর বয়স সতেরো কি আঠারো। গায়ের রং কালো। বড় বড় টানা চোখ, নাকটা তেমন চোখা নয়। মাথা ভরতি ঘন চুল। গোলগাল, অনেকটা আহ্লাদি পুতুলের মতো চেহারা। ভীষণ হাসিখুশি। চেহারায় বা স্বভাবে কোনওরকম উগ্রতা নেই। বরিশালের ডায়ালেক্টে কথা বলত। শুনতে খুব মিষ্টি লাগত। এখনও মাঝে মাঝে সত্যবতীর সঙ্গে দেখা হয়। পঁয়তাল্লিশ বছর কলকাতাবাসের পরও বরিশাল তার পিছু ছাড়েনি। সেখানকার আঞ্চলিক টান তার জিভে এখনও অনড় হয়ে আছে।

বন্ধুদের বাড়িতে সেই যে সত্যবতী কাজে লেগেছি তার দু'বছর বাদে ওর বিয়ে হল। পাত্রও তাদের মতোই রিফিউজি। নাম শিবু। রোগাটে চেহারা। টালিগঞ্জ অঞ্চলে সাইকেল রিকশা চালাত। থাকত

অন্য একটা জবরদখল কলোনিতে। বিয়ের পর সত্যবতী শিবুর ঘর করতে চলে গেল। কিন্তু আমার বন্ধুর বাড়ির চাকরিটা ছাড়েনি। বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক ঘোরটা কাটাতে লেগেছিল দিন দশেক, তারপর ফের কাজ শুরু করেছিল। কেন না শিবুর একার রোজগারে সংসার ভালভাবে চালানো সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া বন্ধুদের বাড়িতে থেকে থেকে খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড় ইত্যাদি সম্পর্কে একটা রুচি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার নিচে নামা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

শিবু মানুষ খারাপ নয়। তবে নেশাভাংটা একটু বেশি মাত্রাতেই করত। সেটা আবার ভীষণ অপছন্দ সত্যবতীর। বন্ধুর কাছে শুনেছি, এ ব্যাপারে সে শিবুকে বহুবার বারণ করেছে। শিবু কর্ণপাত করেনি। টাকাপয়সা যা রোজগার করত তার প্রায় সবটাই নেশার পিছনে উড়িতে দিত। সংসার একা টানতে হত সত্যবতীকে।

সত্যবতী মানুষটা এমনিতে শান্তশিষ্ট। ঝগড়াঝাটি করাটা তার ধাতে নেই। দাম্পত্য জীবনে মানিয়ে নিতেই সে চেষ্টা করেছিল কয়েক বছরে। তার মধ্যে তিনটে ছেলে হয়ে গিয়েছে।

মনে পড়ে, একদিন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে শুনলাম, দু'দিন সত্যবতী আসছে না। ও-বাড়িতে গিয়ে ক'বছর ওকে দেখাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওর স্বভাবে এমন একটা আপন-করা মাধুর্য ছিল যা ও-বাড়িতে যারা যেত তাদেরই মুগ্ধ করত। সবাইকে যত্ন করে চা-মিষ্টি খাওয়াত, নানা খবরাখবর নিত।

সত্যবতীর কথা বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে যাব, হঠাৎ নিজেই এসে সে হাজির। আগেকার সেই প্রাণোচ্ছল ভাবটা নেই। বেশ গম্ভীর। তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা হয়েছে অন্য জায়গায়। তার কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হাতে নেই শাঁখা। আমরা চমকে উঠি।

বন্ধুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার, দু'দিন আসোনি কেন?'

সত্যবতী তার বরিশালিয়া অ্যাকসেন্টে জানায়, 'এই দু'দিন চুপচাপ ভেবেছি। ঘর থেকে বেরুইনি।'

'কী ভাবলে?'

'শিবুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। এই দেকুন না, সিঁদুর মুছেছি, শাঁখাও খুলে ফেলেছি।'

'হঠাৎ কী হল?'

'নেশা করে শরীরটা পুরো নষ্ট করে ফেলেছে শিবু। ওকে আমার দরকার নেই।'

'আমরা চকিত হয়ে উঠি। সত্যবতী কি দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপারে কোনও গূঢ় ইঙ্গিত দিচ্ছে? কিন্তু এই বিপজ্জনক বিষয়ে প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। তার মতো একটা অশিক্ষিত রমণী ভগ্নস্বাস্থ্য রুগ্ণ স্বামীকে ত্যাগ করা শুধু নয়, শাঁখা-সিঁদুর পর্যন্ত বর্জন করেছে, এমন ঘটনা আগে আর চোখে পড়েনি।

শাঁখা-সিঁদুর সম্পর্কে বাঙালি মেয়েদের, তা সে বনেদি শিক্ষিত পরিবারেরই হোক বা একেবারে নিচের স্তরের অক্ষর পরিচয়হীন



গরিব ঘরেরই হোক, একটা সংস্কার থেকেই যায়। স্বামী বেঁচে থাকতে ওগুলো ত্যাগ করা সহজ নয়।

বন্ধুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, 'শিবুর সঙ্গে তোমার কাটান ছাড়ান হয়ে গেল?'

'সত্যবতী বলে, 'সে তো হলই।'

'আদালতে গিয়েছিলে?'

"না। সেখানে যাওয়ার দরকারটা কী? ওর সঙ্গে পোষাল না, তাই চলে এসেছি।"

সত্যবতী তার তিন সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে থেকে গেল। বিবাহিত জীবনটা যে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, তাকে দেখে বোঝা যায় না। মুখে বিষাদের চিহ্ন নেই। আগের মতোই প্রাণবন্ত। বন্ধুর বাড়িতে তার কাজ হাসিমুখে নিপুণভাবে করে যায়। দীর্ঘকাল শহরবাসের ফলে তার চেহারায় এবং আচরণে কিছু পালিশ পড়েছে। এ ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন নেই।

মাস ছয়েকও কাটে না, একদিন চমক দিয়ে সত্যবতী বন্ধুর বাড়ি এল। সাজের ঘটাটা অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশি। তবে যেটা



সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ল তা হল, তার সিঁথিতে ফের সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা ফিরে এসেছে।

আমরা খুশিই হই। বন্ধুর বাড়ির সবাই জিজ্ঞেস করে, "শিবুর সঙ্গে মিটমাট হয়ে গিয়েছে তা হলে?'

সত্যবতী মধুর হেসে বলে, 'কী যে বলেন আপনারা তার ঠিক নেই। ওর সঙ্গে কখনও মিটমাট হতে পারে।'

'তবে?'

'শাঁখাসিঁদুর তো?'

'হ্যাঁ।'

আরক্ত মুখে লাজুক একটু হেসে সত্যবতী চোখ নামিয়ে বলে, "আমি এখন রাজেনের ঘর করছি।"

বন্ধুপত্নী বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করে, 'রাজেন কে?'

সত্যবতী জানায় বাজারে যে একমাত্র চায়ের দোকানটা আছে, রাজেন তার মালিক। সেও পূর্ব বাংলার রিফিউজি। তিন কুলে কেউ নেই।

বন্ধুপত্নী বলে, 'তোমাদের বিয়েটা কবে হল? কিছুই জানতে পারলাম না। সব গোপনে সেরে ফেললে?'

'গোপনের তো কিছু নেই বউদিদি। পুরুত ডেকে, বাদ্যি বাজিয়ে, লোকজন খাইয়ে আমাদের বিয়ে তো হয়নি।'

'তা হলে?'

'রাজেনের কথা শুনে মনে হল, মনের মিল হবে। তাই ছেলে তিনটেকে নিয়ে ওর ঘরে গিয়ে উঠলাম। একসঙ্গে থাকব। ওকে সোয়ামি বলে মেনে নিয়েছি। শাঁখাসিঁদুরটা তাই পরেই ফেললাম গা বউদিদি। পুরুতের দরকার কী? মনের মিলটাই তো আসল।'

কোনওরকম ঢাক গুড় গুড় নেই। পষ্টাপষ্টি সত্যবতী বুঝিয়ে দিল পুরুত ডেকে বিয়ে করার আবহমানকালের প্রথায় তার আস্থা নেই। একটি নারী এবং পুরুষের মধ্যে যা প্রয়োজন তা হল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা পারস্পরিক বোঝাপড়া। একজনের প্রতি অন্যজনের আনুগত্য। সেটা থাকলে দাম্পত্যজীবন শুধু স্থায়ীই হয় না, মাধুর্যে ভরে যায়। তার বেশি আর কী চাই?

কিন্তু আমাদের রক্ষণশীল সোসাইটিতে বিয়েটা এমন এক আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা পুরুত, মন্ত্র এবং নানা আচারের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এও এক ধরনের প্রবল পরাক্রান্ত এস্টাব্লিশমেন্ট, একে ভাঙার সাহস বা স্পর্ধার কথা ভাবাই যায় না, বিশেষ করে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এক প্রায় নিরক্ষর রমণীর পক্ষে।

যাই হোক, সত্যবতী যে বিস্ফোরণটি ঘটাল তার ধাক্কা সামলাতে বেশ সময় লাগে। একসময় বন্ধুর স্ত্রী জানতে চায় 'তোমার আগের স্বামী শিবু কি এসব জানে?' সত্যবতী বলে, 'জানবে না কেন? আমি কি চুরি করেছি না ডাকাতি?'

'ছেলে তিনটেকে যে নিয়ে গেলে, রাজেন আপত্তি করেনি?'

'আপত্তি করলে কি আমি ওর ঘরে গিয়ে উঠতাম?'

সুতরাং সত্যবতী ফের তার পুরনো কক্ষপথে ফিরে গেল। দু'নম্বর সংসার তাকে এতটুকু বদলাতে পারেনি। আগের মতোই সে হাস্যোজ্জ্বল। যেমনটি বরাবর দেখে এসেছি ঠিক সেইভাবেই মাধুর্য বিকিরণ করে যাচ্ছিল।

সত্যবতী রাজেনকে নিয়ে সংসার পাতার কিছু পরেই আমি কলকাতার বাইরে চলে যাই। কয়েক বছর বাদে ফিরে এসে দেখি সে বন্ধুর বাড়িতেই কাজ করছে। বয়স বাড়লেও স্বভাবটি পুরনো দিনের মতো অমলিন। সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর দেখে যখন মনে হচ্ছিল, রাজেনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা স্থায়ী এবং রমণীয় হয়েছে, সেই সময় চাঞ্চল্যকর খবরটি পাওয়া গেল। বন্ধু জানাল, দ্বিতীয় সংসারটিও তার টেকেনি। কারণ রাজেন লোকটা অতীব ধুরন্ধর। ভীষণ অলস। মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেও অকর্মার ধাড়ি। সত্যবতী তার কাছে আসার বছর দেড়েক বাদে চায়ের দোকান বেচে পুরোপুরি সত্যবতীর কাঁধে ভর করে বসে। অর্থাৎ পুরো সংসার চালাবার দায়িত্ব সত্যবতীর। রাজেনের লজিক, আগের তিন বাচ্চাসমেত সে তাকে ঘরে এনে তুলেছে এবং স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে। সত্যবতীর কর্তব্য তাকে রাজার হালে রাখা। রাজেন কেন কাজ করবে? এই দেড় বছরে সত্যবতীর গর্ভে রাজেনের একটি মেয়ে হয়েছে। রাজেনের নৈষ্কর্ম্য নিয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে তিক্ততা হয়েছিল কি না বন্ধুরা জানে না। হঠাৎ একদিন নাকি রাজেনকে ছেড়ে সত্যবতী প্রথম পক্ষের তিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের এক, মোট চার সন্তান নিয়ে ফটিকের ঘর করতে চলে যায়। ফটিক তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। ঘরবাড়ির দালালি করে। রাজেনের মতো তার সঙ্গেও পুরুত ডেকে বিয়ে হয়নি। বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর ধারণা, সত্যবতীর তিন নম্বর সংসারটা শেষ পর্যন্ত টিকে যাবে।

তারপর অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে সত্যবতীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে। একে-ওকে ধরে ছেলে তিনটের চাকরি-বাকরিরও ব্যবস্থা করেছে সে। এই হল তার জীবনের রেখাচিত্র।

গত বছর সত্যবতীর জীবনে দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। শিবু এবং রাজেন দু'মাস আগে-পরে মারা যায়। দু'বারই বিধবা সেজে নিরামিষ খেয়ে তাদের জন্য—না, আনুষ্ঠানিক শ্রাদ্ধ নয়, শুধু শোকপালন করেছে সে। তারপর শাঁখাসিঁদুর পরে ফের সে ফটিকের ঘরণি

সত্যবতীর মতো মেয়ে খুবই বিরল। যদি দু-চারজন থাকেও তারা আমাদের সামাজিক ধ্যানধারণাকে আমূল নাড়া দিয়ে যায়।

অলঙ্করণ : শান্তনু দে

পরম মুহূর্ত

প্রিয় বান্ধবী, বিদায়

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

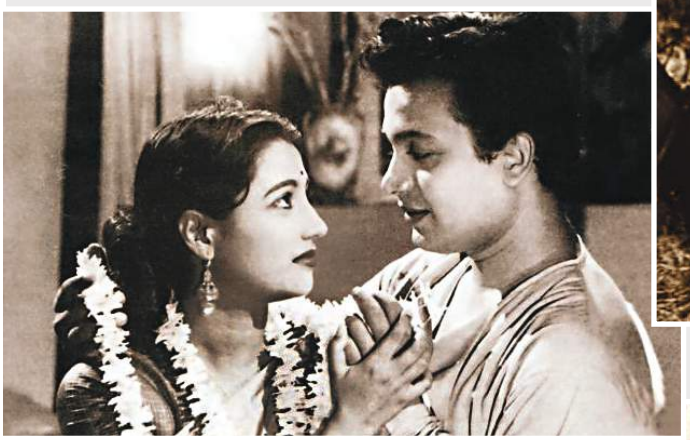











পুজো এল বলে।
শরতের দুপুর।
আকাশ উপচে নেমেছে সোনালি রোদ্দুর।
এমন এক দুপুরে তারা একসঙ্গে!
এমন রোম্যান্টিক জুটি আর তো হয়নি কখনও।
এ এক অনন্য অন্বয়।
উত্তম-সুচিত্রা।

স্টুডিওতে লাঞ্চ ব্রেক।
শ্যুটিং কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ।
সবাই খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত।
সুচিত্রা সেন এগিয়ে এলেন উত্তমকুমারে কাছে।
উত্তমকুমার কিছুটা বিস্মিত।
অন্যদিন লাঞ্চব্রেকে উত্তম-সুচিত্রা স্টুডিওর মধ্যে হয়তো একইসঙ্গে সামান্য কিছু খেয়ে নেন গল্প করতে-করতে।
আজ অন্যরকম মনে হচ্ছে সুচিত্রাকে। সুচিত্রা কিছু একটা বলতে চান উত্তমকে, যা আগে কখনও কোথাও বলেননি।
সুচিত্রা বললেন, উতু, তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে। চ' বসি স্টুডিওর ওই পুকুরপাড়ে।
উত্তমকুমারকে ভালোবেসে 'উতু' বলে ডাকেন সুচিত্রা।
—বেশ তো। অনেকদিন বসিনি ওখানে, ঘন কণ্ঠে বললেন উত্তম।
কী বলতে চান সুচিত্রা উত্তমকুমারকে পুকুরপাড়ের নির্জনতায়?

উত্তর-সুচিত্রা, পুকুরপাড়ে পাশাপাশি বসলেন ওঁরা।
হু-হু বাতাস।
বাতাসে পাতা-ঝরার শব্দ।
উত্তমের হাতে আলতো হাতটি রাখলেন সুচিত্রা।
—উতু, তোদের এই জগতে আমি আর খুব বেশিদিন থাকবো না রে। আমার অন্য ডাক এসেছে।
—মানে! বিস্মিত উত্তমকুমার।
—উতু, আমি অন্য জগতের স্বাদ পেয়েছি, আলো পেয়েছি, ডাক পেয়েছি। সে বড় আনন্দের জগৎ।
—তুই কীসব বলছিল রমা (সুচিত্রার ডাক নাম)? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
—পারবি, কিছুদিন যাক।
—তুই কি অভিনয় ছেড়ে দিচ্ছিস?
—ঠিক তাই।
—বাজে বকিস নি তো।
—বাজে কথা নয়, তুই ঠিক ধরেছিস।
—তুই অভিনয় না করে, ক্যামেরার সামনে না দাঁড়িয়ে, থাকতে পারবি?
—উতু, তুই বিশ্বাস কর্, আমার পক্ষে অভিনয় করা আর সম্ভব নয়।
—কেন, কী এমন হল যে তোর পক্ষে অভিনয় করা আর সম্ভব নয়।
তোর-আমার কয়েকটা ছবি হয়তো তেমন ভালো চলেনি, এই কারণে তুই অভিনয় ছেড়ে দিবি? তুই তো জানিস, তোর মতো সুন্দরী নায়িকা এই মুহূর্তে সারা দেশ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।
—আমি সুন্দরী না অসুন্দরী তাতে আর কিচ্ছু যায় আসে না আমার। আমি এমন এক আলোর সন্ধান পেয়েছি যার কাছে অন্য সব কিছু মিথ্যে বোধ হচ্ছে। জগতে আর কোনও কিছু, কাউকে প্রয়োজন নেই আমার। উতু, আমি এবার সব কিছু ছেড়ে চললাম।
উত্তম কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।
তিনি সুচিত্রা সেনের হাতটি নিজের দুটি হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, পাগলামি করিসনি।

সুচিত্রা অনেকক্ষণ নীরব।
তার চোখ দুটি ক্রমে জলে ভরে এল।
তিনি ধীরে ধীরে বললেন, উতু, 'প্রিয় বান্ধবী'-ই তোর সঙ্গে আমার শেষ ছবি। আমাদের দীর্ঘ যাত্রার এখানেই শেষ। মনে রাখিস উতু, এখনই শেষ হওয়া উচিত। আমি হয়ে থাকলাম তোর চিরকালের প্রিয় বান্ধবী। তোর জীবনে আমার এই জায়গাটা আর কেউ নিতে পারবে না। একটা কথা দিবি উতু?
—কী কথা?
—তুমি আমাকে আর কোনও দিন ফোন করবি না।
উত্তমকুমার অবাক হয়ে তাকান।
সুচিত্রা বলেন, তুই আমাকে কোনও প্রয়োজনে ডাকবি না। কোনও খোঁজ রাখবি না আমার।
সুচিত্রার গাল বেয়ে নামে চোখের জল।
সুচিত্রা কান্না চেপে বলেন, তুই ফোন করলে হয়তো আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। তোকে কথা দিতে হবে, আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখবি না।
উত্তম নিরুত্তর।
কিছুক্ষণ পরে বললেন সুচিত্রা, একটা গান শোনাবি উতু? কী ভালো তোর গলা।
জীবনে তোর গান কাছে বসে আর হয়তো শোনা হবে না।
উত্তম কোনও কথা না বলে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন :

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই—
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
চাহিতে গেলে মরি লাজে।।
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

উত্তমের কণ্ঠ কান্নায় ক্রমশ গাঢ়।
বাকি গান তিনি আর গাইতে পারলেন না।
সুচিত্রার হাত ধরে শুধু বললেন, তোকে ছেড়ে কী করে থাকবো বল তো?
—পারবি উতু, ঠিক পারবি। প্রিয় বান্ধবীর জন্যে তোকে পারতেই হবে উতু। এইটুকু না পারলে জানবো তুই আমকে ভালোবাসিস না। কোনওদিন ভালোবাসিসনি।
উত্তম চোখ রাখলেন সুচিত্রার চোখে। দীর্ঘক্ষণ।
সুচিত্রা চোখ নামিয়ে নিলেন না।
তাঁদের মনে হল, আগে কখনও তাঁরা পরস্পরের দিকে এইভাবে তাকাননি। কোনও সিনেমার রোম্যান্টিক দৃশ্যেও নয়।
দীর্ঘায়িত তাঁদের এই আঁখিপাতের কোনও শেষ নেই যেন।



উপন্যাস

কাঁটা দুয়ারী

নলিনী বেরা

আচমকা আমাদের বাবা ধুলো পায়ে কোত্থেকে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বলে বসলেন, 'এখানে আর একদণ্ডও থাকাটা নিরাপদ নয়, আঁকাড়া বিপদ চারধার থেকে ধেয়ে আসছে ধাঁই ধাঁই করে, সবকিছু ছেড়েছুড়ে এক্ষুনি পালাতে হবে কই, ডাক তোর মাকে!' জানি বাবার মা-অন্ত প্রাণ, তাই বলে আমি ও আমার বোন নাকফুঁড়িও তাঁর কাছে কম নই। কখনও পিঁপড়ের ডিম বা 'কুরকুট পটম', ডিমওয়ালা 'ডিমাল-কাঁকড়া' কী খঙ্গা-বঙ্গা ধরে আনলে ঘরের কাছে এসে প্রায় রাস্তা থেকেই বাবা হাঁক পাড়তেন, 'কই রে নাকফুঁড়ি! কই রে নীলুয়া!'

ডাক শুনে আমরাও ঘর থেকে দৌড়ে বেরতাম। কখনও কখনও খলুই ভরতি করে নিয়ে আসেন লাল লাল চোখ না ফোটা কাঁড়াল কোঁড়ল 'চুটিয়া' বা ইঁদুরের বাচ্চা। অবশ্য আমাদের থেকেও চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল-কোঁড়ল চুটিয়ার বাচ্চা আমাদের মায়ের খুব প্রিয়। কাঁচায় কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেতে তিনি যে কী ভালই না বাসেন! তাঁর মুখের কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে আর আমরা হি-হি করে হাসছি, মাও হাসছেন, আহা! সে কী তাঁর মা কালীর মতো হাসি! সেই মাকে এখন খুঁজতে বেরিয়েছি। মা কোথায় আর যাবেন যা দিনকাল—এই বড়জোর বাঁধগোড়ার জলে গেঁড়ি-গুগলি, শুশনি কী ঘোড়াকানা শাক তুলছেন! আঁকাড়া বিপদের আঁচ আমরা ছোটরাও একটু একটু করে টের পাচ্ছিলাম। কেন না দিনে-দুপুরে অযথা জমির আলে-আবডালে হঠাৎ হঠাৎ ঢিস্ ঢিস্ করে ধুলো উড়ছিল, রাতে-বিরাতে জঙ্গলে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছিল মট মট করে। অকালে ভুস ভুস করে 'খত্-খানা' থেকে বেরিয়ে আসছিল ফিনফিনে ডানাওয়ালা শালুইপোকা। বর্ষার শালুইপোকা 'বালি-খলা'য় মুচমুচে ভেজে খেতেও ভারি সুস্বাদু! কিন্তু অসময়ের পোকামাকড় তিত্‌কুটে লাগছে, আমরা মুখে পুরেই ছিঃ থুঃ করে ফেলে দিচ্ছি। দূরের পিচ রাস্তায় জঙ্গল ভেদ করে ছোটদের যাওয়াও এখন মানা, অচেনা কারা যেন সেখানে অষ্টপ্রহর হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই টিপিক টিপিক 'বাঘ যুগনী' পোকার সঙ্গে জ্বলে উঠছে ঘন ঘন সত্যিকারের টিপা-লাইট, দু'ব্যাটারি তিন-ব্যাটারি এমনকী পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। বেড়ে গেছে 'রি-রি-আঁ' পোকার ডাকও। রাত যত বাড়ে, বাড়তে থাকে রি-রি-আঁ পোকার একটানা ভয়ঙ্কর রিঁরিঁ আওয়াজ। থেকে থেকে ভদ্‌ভদিয়ে গাছ থেকে, টাঁড়-টিকর থেকে উড়ে উঠছে কয়ের-কপ্‌তি টিয়া-হরিয়ালের ঝাঁক। ঘরে-টিকর থেকে উড়ে উঠছে কয়েক কপ্‌তি টিয়া-হরিয়ালের ঝাঁক। ঘরে-দোরে রাস্তায়-ঘাটে টাটকা-টাটকি মরে পড়ে থাকছে 'বাগাডুলু' 'পত্‌নি' কেঁচো-কেন্নো-ক্যাঁকলাশ 'ঘরঘুন্নি'!

অথচ বেশ তো, ভালই তো চলছিল সম্বৎসর। বৈশাখ-জৈষ্ঠের রুখা-শুখা দিনগুলোয় ঝাঁটি কুড়োতে পাতা ছিড়তে জঙ্গলে যাওয়া, এর-তার গায়ে চলতে চলতে হল্লা করে যাওয়া। এক নয়, দঙ্গলে যাওয়া। জষ্টিমাস খরার মাস, জাম-জামরুলের কাল। ঢুঁড়লে আলু তুঙা নানাবিধ ফলমূলও পাওয়া যায়। তাছাড়া শিকার, ধামসা-মাদল-চেরপেটি বাজিয়ে 'টিলিং-ডুবুল-ডুবুল'—কাঁড়াল কোঁড়ল পাখির ছানা, ঝিঁকর, খেড়িয়া, বরহা, ঢ্যামনা-গোই-গোধি শিকার করতে যাওয়া। এ সময় কতরকম ফলপাকুড়-পিয়াল ভুড়রু, আম জাম বেল, কচ্‌ড়া-কুসুম-খাওরে! ছড়াও রে! আষাঢ়ে ঝম্ ঝমিয়ে বৃষ্টি নামলেই অজস্র 'ছাতু'—ঝরু-বালি বড়-বালি কুড়্‌কুড়িয়া কাড়্‌হান ঝালুয়া হলদে-ভণ্ডা সাদা-ভণ্ডা শলপোঙড়া পোয়াল। পরাং-তমাং-কুরাই নদীতে আষাঢ়-শ্রাবণে 'ঝোপ' এলে শোল-বোয়াল পুঁটি-দাঁড়িকিনি ঢ্যাঙ-গোড়ুই খঙ্গা-বঙ্গা-কাঁকড়ার অভাব হয় না। ধানপাকা ধান কাটার মরশুমে খেত ভরতি তো ধানের 'টুঙ'! আর আছে ধানখেতের আলের গাঢ়হায় ইঁদুর ও ইঁদুরধান। আমি আর আমার বোন 'খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি" করে খুঁজতে থাকি ধানের টুঙ আর আমার বাবা আমার মা খন্তা দিয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজে গর্তের মুখে ধোঁয়া দেন, ধোঁয়ায় 'থকো বকো' হয়ে বেরিয়ে আসে জোড়া ইঁদুর। জোড়া ইঁদুর ধরা পড়লে অতঃপর খন্তা দিয়েই খান খান করা হয় জমর আল। উদ্ধার করা হয় ইঁদুরধান, আর মায়ের অতিপ্রিয় সেই লাল লাল চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল-কোঁড়ল 'চুটিয়া' বা ইঁদুর ছানা! ফাগুন-চোত্ তো মধুর মাস, মহুল গাছে গাছে মধু, লাটাপাটার খাঁজে খাঁজে মধুর চাক! 'মহুল' অর্থাৎ মহুয়া কুড়োনোর ধুম লেগে যায় তল্লাট-কে-তল্লাট। পোহাতারা উঠল কী উঠল না তাই দেখতে ঘর-বাহির করতে না ঘুমিয়ে রাত ভোর করে দেন আমাদের মা-কাকি-ঝিউড়ি-বউড়িরা। রাত থাকতে আগেভাগে না গেলে যে 'মহুল' কুড়িয়ে সাফা করে দেবে চোর-চুরনিরা। আখের খেত আর আমাদের কোথায়! মহুলের রস জ্বাল দিয়েই তো আমাদের গুড় করা, গুড় খাওয়া। বনকাল্লা বন-কুঁদরী বন-কাঁকড়ো চেঁকা-ঘলঘসি-নাহাঙা-সরন্তি-শুশনি-জঙ্গলে শাকপাতা আনাজপাতি তো আছেই, আর আছে চোত্-বোশেখের 'কেঁদপাকা', কেঁদুগাছের ফল। যত খুশি খাওরে দাওরে, বাকিটা ঝুড়িতে করে 'খালা' 'খালা' বেচতে যাওয়া কামহার-কুমহার-হাটুয়াদের পাড়ায়। মা-কাকিরা যান ঝুড়িতে আঁচল চাপা দিয়ে, খদ্দের দেখতে চাইলেই একটুখানি আঁচল সরিয়ে দেখান—শালপাতার খালায় গণ্ডা গণ্ডা করে সাজানো হলদে রঙের গোল গোল পাকা কেঁদ ফল! ফল তো নয়, যেন অমৃত! বিনিময়ে চাল তো নয়, খুদ। নচেৎ দু'চার গণ্ডা পয়সা। ওই ঢের। তবু তো মন্দের ভাল এসব ছিল। ছিল, ছিল। এখন সব ছেড়েছুড়ে কে জানে কোথায় পালাতে হবে!

সত্যি সত্যি বাঁধগোড়ার জলে ঘোড়াকানা শাক তুলছিলেন মা। ঘোড়ার কনের মতো লম্বা লম্বা শাক, নীল রঙের ফুল। তার উপর হেথা-হোথা বক বসে আছে দু-চাট্টা, যেন বা ফুটে আছে সাদা রঙের ফুল, বকফুল। কাছে গিয়ে মাকে বললাম, 'মা! বাবা বলল আর একদণ্ডও এখানে থাকাটা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়, সব ছেড়ে ছুড়ে এক্ষুনি পালাতে হবে।' মায়ের যেন সব কিছুই জানা ছিল, একটাও কথা না বলে এতক্ষণের তোল কোঁচড়ের সব শাক জলেই ফেলে দিয়ে ঘরের দিকে দৌড়ুলেন। আর এসময়ই ঝিটকার জঙ্গলে অজানা অচেনা ভয়ঙ্কর আওয়াজে ডানা ভদভদিয়ে

একসঙ্গে উড়ে উঠল অজস্র টিয়া-হরিয়াল-চড়ৈ-চটি। আমরা দৌড়নোর গতি বাড়িয়ে দিলাম।

॥ দুই ॥

হাতে আর এক মুহূর্তও সময় নেই, বাবা তাড়া দিচ্ছেন, আমরা যা হোক তা হোক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কীই বা ছিল আমাদের! ওই তো একটা পাতার 'কুঁড়িয়া' মাটির 'মাটির 'তুঁবাঘর'। মায়ের মাথায় একটা গাঁটরি, হাতে একটা মাটির কলসি। কী জানি কী আছে কলসিতে। শীতের মরশুমে ইঁদুর ধরার প্রাক্কালে দেখেছি ওই কলসিটারই মুখে খড় গুঁজে ভিতরে ঘুঁটের আগুন জ্বেলে ইঁদুরের গর্তের মুখে ধোঁয়া দিতে। খড়ের ডাঁটি বেয়ে গাবানো উসুম উসুম ধোঁয়া দিকভ্রান্ত, না হয়ে সোজা চলে যায় গর্ত বরাবর ইঁদুরের বাসায়। হয়তো ভবিষ্যৎ ইঁদুর শিকারের লক্ষ্যেই ধোঁয়া দিতে মা ওটা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। বাবার কাঁধে বস্তা, হাতে খন্তা-চোয়ালের হাড় উঁচিয়ে আগে আগে হেঁটে চলেছেন। তারপরে মা, মায়ের পিছনে বোন, বোনের পিছনে আমি। বোনের মাথায় 'রোল' করে বাঁধা ছেঁড়াফাটা একটা খেজুর পাতার চাটাই। এ যাত্রায় চাটাইটা নিতে বারণ করেছিলাম, বোন শোনেনি। সে নাকি খোলা 'মেঘপাতাল'-এর নিচে রাতের বেলা ওই চাটাই পেতে শুলেই কত নতুন নতুন তারা দেখতে পায়—'সাতভায়া' 'দধি-ভারিয়া' 'কালপুরুষা'। আমার হাতেও 'টুইলা' ও 'সাতনলা'। 'টুইলা' হল বাজাবার আর 'সাতনলা' হল পাখি ধরবার যন্তর। এক এক করে সাতটা নল, সবার শেষে সরু তিরের ফলাগোঁজা 'নল'। মগডালে বসে থাকে কপতি কী গোবরা চড়ৈ, কী ক্যারকেটা, হয়তো বসে থেকে ঝিমোয়। তখনই লতাপাতা ডাল-আবডালের ফাঁকফোকর দিয়ে সন্তর্পণে চালিয়ে দিতে হয় 'সাতনলা'। পাখি টেরও পায় না আচম্বিতে সে কখন সাতনলার ফলায় বেঁধা হয়ে যায়! পাকা ফলের মতো থুপ করে মাটিতে পড়ে যায় নচেৎ ফলায় গাঁথা হয়ে ডানা ঝাপটায়। এমন এমন যে অস্ত্র, তাকেই বা ফেলে যাই কী করে? হ্যাঁ, প্রিয় 'টুইলা'র সঙ্গে 'সাতনলা'টাও নিলাম। ঘর ছাড়ার আগে আমাদের ঘরে 'কাঁটা-দুয়ারী' করতে এত বিপদের মধ্যেও বাবা কিন্তু ভুললেন না। কোত্থেকে 'ভাবুর' কাঁটাজাল এনে দুয়ারের মুখ কাঁটা দিয়ে আটকে দিলেন। যাতে করে 'ঝাঁটিয়া কুঁদ্‌রা' 'গিয়ান' 'গোমুহা' 'কালপুরুষা' অপদেবতার ছায়া না পড়ে ঘরে! ঘরছাড়ার আগে আমার ও বোনের কান কামড়ে কী একটা ছাল কোমরে গুঁজে দিয়ে বাবা বললেন, 'এবার নির্ভয়ে চল!' আমরা চলতে শুরু করলাম। শুধু কী আমরা? আমাদের গ্রামের ঘর-ঘর। ওই তো হাঁসুদের পরিবার, বড় ভদ্র-ছোট ভদ্রদের লোকজন, বস্তা-কাঁধে কালীপদ-বধিরাম, গাঁটরি মাথায় হারানির মা কালমণি, বেজু-কাঁদরুর বাপ শরাবন। কারওর মুখে কোনও রা নেই, কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাও করছে না, 'কোথায় যাচ্ছ গো?' জিজ্ঞাসা করলেও সঠিক উত্তর দিচ্ছে না, যাচ্ছে উত্তরে তো বলছে দক্ষিণে। কে জানে কী আছে কার মনে! দু'পা যাওয়ার পরেই অস্থির হয়ে উঠল বোন নাকফুঁড়ি। উসখুস করছে—সে তার দামি জিনিস ফেলে এসেছে। 'কী জিনিস রে? কী জিনিস?' 'আরশি-কাঁকই'। মা বললেন, 'কোথায় রেখেছিলি?' 'ভুগড়ার খাঁজে।' বাবা বললেন, 'আগে বাঁচ তারপর আরশি-কাঁকই!' বাবার কথা শুনে ভারি কষ্ট হল। বেশ বুঝতে পারছি বোন নাকফুঁড়ি ফনফনিয়ে বাড়ছে, তার এখন আয়নায় মুখ দেখা দরকার। বাবাকে বললামও, 'যাই একছুটে নিয়ে আসি?' বাবা কড়া নিষেধ করলেন, 'না, ঘরে কাঁটাদুয়ারী হয়ে গেছে, আর এখন যেতে নেই!'

গ্রামের মানুষজন নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেক দূরের নিরাপদ গ্রামের আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি চলে যাচ্ছে। যাদের আছে তারা তো একটা দিশা নিয়ে আশায় বুক বেঁধেই যাচ্ছে, যাদের কেউ কোথাও নেই, দিশাহারা, তারাও পালাচ্ছে। যেমন আমরা। এর তার মুখে কত গ্রামের নামই তো শুনি—গিধিঘাটা, দলদলি, কেন্দাপাড়া, ভুলাভেদা, চিল্কিগড়, কেঁদুয়াসোল, শুগনিবাসা, সাতবাঁকুড়া, ধানসোল, বাবুইবাসা, গাড়রা, বেলাসোল, কাদাসোল, কলাইমুড়ি, কিয়াবনি, পিংবনি, অমুক-তসুক। যতদূর জানি ওসব গ্রামে আমাদের তিন-কুলের কেউ জানাচেনা আত্মীয় কুটুম্ব একজনও নেই। আশপাশের গ্রামের মায়ের বাপের বাড়ির, বাপের বাড়িরও সব মরে হেজে সাফা! বড় রাস্তার দিকে কিছুদূর এসে বোন নাকফুঁড়ি আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?' বাবা কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ বাদে আমিও জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি বাবা?' বাবা এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "যেদিকে দু'চোখ যায়।'

ঝাঁটি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সুঁড়িপথ, দু'ধারে লহ লহ করছে আঁটারি গাছের ডগ্‌। আমি আর বোন ডগ্‌ ছিঁড়ে মুখে পুরছি, চিবোচ্ছি। ঢোঁক গিলছি। কষা কষা অম্লমধুর স্বাদ। মুখের ভিতরটা জলে ভরে যাচ্ছে। এতক্ষণে মা যেন বুকের ভিতর থেকে কথা বলে উঠলেন, 'যেখানে মেঘপাতালে দেখবি গোল হয়ে চিল ঘুরছে, ঘুরছে তো ঘুরছে, সেখানে জানবি জলের জন্য ঢিল কুঁয়া খুঁড়ছে। আমরা সেই দিশামেই যাচ্ছি রে ধন!' মায়ের কথামতো তারপর থেকেই আমরা দু'ভাই-বোন মাঝে মাঝেই আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। আকাশও যেন শুনশান, চিল তো চিল একটা ঢেপচু পাখিরও দেখা নেই—যে কিনা অনবরত 'ভু-উ-চু-ঙ্‌' 'ভু-উ-চু-ঙ' করে মাকুর ফিতার মতো এ-মাথা সে -মাথা উড়ে ঘুরে বেড়ায়।

বড় রাস্তা এসে গেল। খাকি পোশাকের পুলিশ সব হাতে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। দেখামাত্রই আমরা খানিকটা পিছু হটে লাটা-পাটায় লুকিয়ে পড়লাম। আমাদের মা কিন্তু অকুতোভয়, বাবার হাত টেনে ধরে বললেন, 'ডরপেলকার মতো এখন লুকালে চলবে? মাথা সোজা রেখেই হাঁটো!' বাবার ভয় যদি আনসাটকা সন্দেহ করে জিহলখানায় পুরে দেয় পুলিশ? পুলিশ আমাদের সত্যি সত্যিই থামিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?' উত্তর না দিয়ে খালি চোখ পিটপিট করছেন বাবা, কথা আটকে গেছে! মা এগিয়ে এসে বললেন, 'কোথায় আর যাব? ঘরে যাচ্ছি।' 'কোথায় গিয়েছিলে?' মায়ের চটজলদি উত্তর, 'কুটুমবাড়ি'। 'কী আছে পুঁটলিতে কলসিতে।' তর সইছিল না পুলিশদের, পোঁটলা-পুঁটলি নিজেরাই খুলে ফেলল। কলসিটা কিছুতেই হাতছাড়া করছেন না মা, ভিতরের জিনিস মুঠোয় এনে দেখাচ্ছেন, আমরাও উঁকি মেরে দেখছি, কী জিনিস দেখি! শুকনো মহুল আর ছাল ছাড়া তেঁতুলবীচি। এতক্ষণে বুঝলাম কেন যক্ষের ধনের মতো কলসিটা আগলে রেখেছেন মা—ওই তো আমাদের পেটের ভাত। মহুল আর তেঁতুলবীচি সেদ্ধ! গরম জলে ফুটে ফেঁপে একাকার হয়ে যায় শুকনো মহুল আর ছালছাড়া পোড়া তেঁতুলবীচি। তখন কোনটা মহুল কোনটা তেঁতুলবীচি চেনাই দায়। আমার মা জানেন বেছে বেছে সেদ্ধ তেঁতুলবীচি খেতে আমি কতটা ভালবাসি। পুলিশ কিন্তু ওই একমুঠোতে সন্তুষ্ট হল না, "উসিসে নেহি হোগা, বিলকুল লোটা দো", পুরোটাই ঢালতে হল। পেটের অন্ন অতটা হেলাফেলার নাকি! রাস্তার বালি-কাঁকরে মা কিছুতেই ঢালতে রাজি হলেন না। বোনের ছেঁড়া চাটাই পেতে তবে ঢাললেন। সব দেখেশুনে পুলিশ আমাদের ছেড়ে ছিল। আর আমরাও মায়ের কথামতো 'কুটুমবাড়ি' ছেড়ে 'ঘরের দিকে' যেতে থাকলাম।

॥ তিন ॥

বাবার মুখে কোনও কথা নেই, মাও চুপ। আমরা অনবরত হেঁটে চলেছি। হেঁটে চলেছি, হেঁটে চলেছি। খালি যা আমি আর নাকফুঁড়ি মাঝে মধ্যেই পথের দু'ধারের লতাপাতা ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছি, কখনও ঢোঁক গিলছি, কখনও ছিঃ থুঃ করে ফেলে দিচ্ছি। আমরাও চুপচাপ, কথা তেমন বলছি না। আসলে কথা বলার ইচ্ছাটাই যেন নিইয়ে আসছে ধীরে ধীরে। এভাবে আরও কতদূর যেতে হবে—সে হয়তো বাবা জানেন, কিন্তু বাবার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল সেটুকুও বাবার জানা নেই। এ সময় 'কচ্‌ড়া' 'কুসুম'-এর দিন—অথচ ধারে কাছে কোথাও একটা কচড়া কী কুসুমগাছ দেখা যাচ্ছে না, জিভে জল এসে যাচ্ছিল। অগত্যা মাকে বললাম, 'চাট্টি তেঁতুল 'মুজি' দাও না মা, খাই!' মা দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'চ কোথাও একটু বসি!' একটা চল্লাগাছের তলায় আমরা রবসে পড়লাম, বাবা বিরক্ত হলেন, তবু আমাদের দেখাদেখি বেজার মুখ করে বসেও পড়লেন। চল্লাগাছ ওই তো আরেকটা—এত যখন চল্লাগাছ কাছে পিঠে নির্ঘাত গাঁ-গঞ্জ আছে। বেছে বেছে ভাজা ছাল ছাড়ানো তেঁতুলবীচি চিবোতে চিবোতে বাবাকে বললাম। বাবা যেন খুশি হয়ে বললেন, "ঠিকই ধরেছিস, এদিকটায় কাদাসোল বাঁদরিসোল কলাইমুড়ি বাবুইবাসা চাঁপাসোল' বলে বাবাও তেঁতুলের বীচিসহ একমুঠো কাঁচা মহুল চিবিয়ে খেলেন। আমরা ফের টঙস টঙস করে হাঁটতে লাগলাম।

গাঁ গেরাম তো আছে কিন্তু লোকজন কোথায়? একটা লোকও তো নেই। ঘরের দরজা-জানলা হাট করে খোলা চৌকাঠের পাল্লা যেন এখনও ঠির্ ঠির্ করে পড়ছে, যেন এই মাত্রই 'গিরিহা' ঘর ছেড়ে হুটহাট বেরিয়েছে, এক্ষুনি ফিরে আসবে। চোখে পড়ল দু'চাট্টা মুরগি টি-টি করে চরে বেড়াচ্ছে, কয়েকটা কুকুর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েছিল, আমাদের দেখে আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল, তবে আমাদের কাছে দৌড়ে এল না, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই ল্যাজ নাড়ছে। কোথাও গরু ডাকল—হাম্বা! একটা নয় আরও কয়েকটা। বাবা বললেন, 'সব ছেড়েছুড়ে পালিয়েছে। গেরামটা মাহাত মহাজনদের। কত দিতে এসেছি গাড়ির 'আরা' 'ধুরিকাঠ' লাঙলের বোঁটা, 'ইশ'—।' গ্রামের মাথায় একটা পাতকুয়া, ঘড়রিতে এখনও লাগানো দড়ি বালতি। বোন নাকফুঁড়ি আর আমি দৌড়ে গেলাম-যদি একটু জল পাওয়া যায়। বাবা হাঁকড়ে উঠলেন, 'খবরদার।' আমরা হাত গুটিয়ে ফিরে এলাম। বাবা কেন নিষেধ করলেন বুঝতে পারছি না। অথচ তেঁতুলের বীচি চিবিয়ে টাকরা শুকিয়ে যাচ্ছিল। মা বললেন, 'হাঁটতে থাক, সামনে কত নদীনালা সায়র বাঁধগোড়া পাবি।' সত্যি সত্যি আমরা একটা নদী পেলাম। মরা হাজা হাড় জিরজিরে নদী, এখানে জলতো সেখানে চাপড়া চাপড়া ঘাস-পাথর। আঁজলা ভরে জল খেলাম। 'কী নাম?' বাবা বললেন, 'জঙ্গলের ভিতর বাস অত নদীনালার নাম কী আর জানি? শুনেছি 'টাঙ্গাই' কী 'তমাল-টমাল' হবে।' বোন আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, আরও কদ্দূর যেতে হবে?' উত্তর দিতে না দিতেই কাছেপিঠে কোথাও ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল, জঙ্গলের ভিতরে কী ওধারে আগুনের হলকা উঠল। আমরার দৌড়াতে থাকলাম-রিটপিটে দৌড়-দৌড় দৌড়-

দৌড়ুতে দৌড়ুতে মা এক জায়গায় থুপ করে আচমকা বসে পড়ে বললেন, 'কার খাই না ধারি যে অমন পড়ি-কি-মরি দৌড়াব?' বোন আর আমি বুঝতে পারলাম—মা আর পারছেন না। বাবাও ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে ফেললেন, 'আর তো সামান্যই।' আমরাও জেনে উল্লসিত হলাম, যাক আর ক'পা হাঁটলেই আমরা তাহলে ভয়ের মুলুক পেরিয়ে যাব। ফের টঙস্ টঙস্ করে হাঁটা। একই তো আবহাওয়া গাছপালা রাস্তাঘাট বাবুই ঘাসের চাষ। বেলা প্রায় হেলে পড়েছে। তফাতের মধ্যে এই যা—এখানে ডুব্‌কা-ডুঙরিতে গরু চরছে, গরুর গলায় 'ঠরকা' বাজছে, ঠ-র-ক্! ঠ-র-ক্!! লোকজনের এখনও দেখা নেই। গরু-ছাগলরাই বা কোথায়! দেখতে দেখতে একটা লোক সাঁক্ করে সাইকেল চালিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল, তার সাইকেল ক্যারিয়ারে গাদা-গুচ্ছের ডুমুর গাছের পাতা, বোধ হয় ছাগলের জন্য। লোকটা ঘন্টি বাজাতে বাজাতে গেল কিন্তু একটাও কথা বলল না। তাহলে অবশেষে একটা গ্রামে আসা গেল যে গ্রামে অন্তত একটা মানুষ আছে, তার কতক ছাগল আছে! একটা নয়, অনেক মানুষেরই দেখা মিলল, আমাদের বাবাও তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়বাড়ি খুঁজে পেলেন। আমি আর বোন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে যেন বললামও, যাক তাহলে আমাদেরও আত্মীয়কুটুম্ব আছে! বাবার সম্পর্কে মাসতুতো ভাই মোটামুটি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাওয়া মানুষ, সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে কেঁদুপাতা ও বাবুইদড়ির কারবার করেন, সাইকেলের ক্যারিয়ারে এখনও বাঁধা বাবুইদড়ির বান্ডিলই তার প্রমাণ। গলায় জোর আছে তবু যেন কথা বলছেন বাবার সঙ্গে ফিস ফিস করে। মা আর বোন ততক্ষণে ঝিউড়ি-বউড়িদের সঙ্গে গরের ভিতর, একলা আমি দু'পা এদিক সেদিক হেঁটে গ্রামটা ঘুরে দেখছি। তেঁতুলতলায় এক ন্যাড়ামুণ্ডি আমারও বয়সি ছেলে এসে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আমার নাম দামু, তোর?' আমিও নাম বললাম। 'আমাদের গেরামের নাম চিচুড়গেড়িয়া, তোদের?' গ্রামেরও নাম বললাম। 'তোরা কোন পার্টি? আমরা-।'

দৌড়ে ফিরে এলাম কোনও উত্তর না দিয়ে। বাবাকে বললাম, বাবার মাসতুতো ভাইকেও। তিনি তেঁতুলতলায় দ্রুত ঘুরে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'ও দামু, হাবাগোবা, আধপাগলা—কিন্তুক ভাল 'আলি' খেলে—যা না দু'দান খেলে আয়'! 'আলি' তার মানে কাচের নানা রঙের গুলি, গুলি দিয়ে আঙুলের টিপ পরীক্ষা। কত খেলেছি! তাবলে কাচের গুলি নয়, ভেলা ফলের কালো কালো বীচি। এখন এই চারধার আঁধার করে আসা ঝুঁজকো বেলায় আর 'আলি' খেলতে মন গেল না। এতদিন মাঝে মধ্যে 'কুরথি-সিজা' খেয়েছি, কিন্তু কুরথির ডাল! আজ আমাদের কুটুমবাড়িতে কুরথির ডাল দিয়ে শুকনা ভাত খাচ্ছি। দু'-এক গ্রাস খেয়েছি কী খাইনি, দরজায় দমাদ্দম লাথি পড়ল, কে বা কারা বাবার মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িটাই ভেঙে দিচ্ছিল, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল চালে—দাউ দাউ! খাওয়া ফেলে কোনওমতে গাঁটরি গুঁটরি নিয়ে আমরা ফের উদ্বাস্তু হলাম, দৌড়ুলাম। শুধু কি আমরা? বাবার দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ির লোকজনরাও! দৌড়ুতে দৌড়ুতে দলছুট হয় গেলাম আমরা। তাঁরা তো যাবেন তাঁদের আত্মীয়বাড়ি, দূর-দূরান্তের কোনও এক নির্দিষ্ট গ্রামে কিংবা টাউনে। আমাদের আর কোনও আত্মীয়কুটুম্ব নেই, যাওয়ার জায়গাও নেই, বাবা ফের মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বললেন, "অভাগা যেদিকে চায় সাগরের জলও শুকায়। যেদিকে দু'চোখ যায় দৌড়া!' আমরা ঝাঁ ঝাঁ রাতে সাপখোপ পোকামাকড় মাড়িয়ে দৌড়াতে লাগলাম। আমাদের পদে পদে আশঙ্কা হচ্ছিল মা না থুপ করে বসে পড়ে বলে বসেন, 'কার খাই না ধারি যে এমন পড়ি-কি-মরি দৌড়াব! আসলে আমরা কুরসির ডাল-ভাত এক-দু'গ্রাস মুখে পুরলেও মা যে এক খাবলও মুখে দেননি! পুরুষদের খাওয়া শেষ হলে তবেই না মেয়েদের খাওয়া শুরু হয়।

পিছনে দাউ দাউ আগুন, মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ, আমরা ঠিক করতে পারছি না যে পথে গিয়েছিলাম সে পথেই ফিরে আসছি কী! আমার কেবলই মনে হচ্ছিল হাবোগোবা আধপাগলা দামু কি



আঙুল উঁচিয়ে সেই তাদেরও জিজ্ঞাসা করছে-'তোমরা কোন পার্টি?' যাওয়ার রাস্তায় ফিরে আসা আর তো নিরাপদ নয়, বাবা বললেন, 'নাহ্' আমরা কাঁটাপাহাড়ি-সিজুয়ার দিকেই যাচ্ছি।' কোথায় সিজুয়া, কোথায় কাঁটাপাহাড়ি আমার ঠিক জানা নেই। বোন নাকফুঁড়িও অস্থির হয়ে বলে উঠল, আর পারছি না বাবা, কাঁটাপাহাড়ি ঝেঁটাপাহাড়ি থাক, ওই জঙ্গলে চল-অ! আমার গাদা ঘুম পাচ্ছে!' অগত্যা আমরা বাকি রাতটুকু কাটাতে জঙ্গলে ঢুকলাম। জঙ্গল, জঙ্গল। গাছপালার আড়ালে একটা 'টিকরোল' ভুঁই দেখে আমরা আস্তানা গাড়লাম। মাথার উপর গাছপাল্হার ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা ভরা 'মেঘপাতাল', এক-দু'টুকরো ভাসমান ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ! রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা ডাকছে, ডাকছে মানে! যেন তার বুক-পেট ফাটিয়ে ডাকছে। কোত্থেকে দু-চাট্টা ধরে এনে মাটিতে গুঁজে দিল নাকফুঁড়ি। আদ্ধেক মাটিতে, আদ্ধেক উপরে, তার মধ্যেও শুঁড় নেড়ে নেড়ে বিরামহীন ডেকে চলেছে 'রিঁ-রিঁ-আঁ'—রিঁ-ই-ই-ই! রিঁ-ই-ই-ই!! নাকফুঁড়ি ঘোষণা করল, আজ থাক, কাল তোদের বিয়ে দেব।' তারপর সে তার ছেঁড়া চাটাই পেতে শুয়ে আকাশের তারা আবিষ্কারে মেতে উঠল-"একটা তারা দুটা তারা কোন তারাটা আরা ঝারা। আন্ দেখি গ কাঁড়বাঁশটা বিঁধে দিব ভুরভুরাটা।।" বাবা খন্তা-হাতে চারপাশটা ভাল করে দেখে এলেন। সর্ সর্ করে শুকনো মড়মড়ে পাতার উপর বুকে ভর দিয়ে চলে যাচ্ছে রাতের 'লতা', হুপ্ হুপ্ করে মাঝেমধ্যেই ডেকে উঠছে বন্য নিশাচরের দল, বনমোরগ 'বাঙ্' দিচ্ছে দূরে কোথাও, 'ট্র্যাঁ' 'ট্র্যাঁ' করে পাখি ভদকালো গাছের মগডালে, মা কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন! এবার নাকফুঁড়িও ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা আর আমি জেগে, থেকে থেকে খন্তার খুপ্ খুপ্ আওয়াজ পাচ্ছি। এক সময় সে আওয়াজও থেমে গেল, বাবা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমিও। ভোরের দিকে মায়ের আর্তচিৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে দেখি খন্তা-হাতে বাবা লাটাপাটা ভেঙে দৌড়ুতে দৌড়ুতে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছেন। এক মুহূর্তও দেরি না করে আমিও বাবার পিছু পিছু দৌড়ুতে শুরু করলাম।

॥ চার ॥

আমাদের পরিবারের আমরা চারজন একসঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম, এখন আমরা তিনজন। গতকাল রাতে কে বা কারা এসে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেছে বোন নাকফুঁড়িকে। তন্ন তন্ন করে সারা জঙ্গল চুঁড়েও আমরা তাকে খুঁজে পেলাম না। তার ফেলে যাওয়া খেজুরপাতার ছেঁড়া চাটাইটা জঙ্গলেই পড়ে থাকল, কেউ আর তার উপর শুয়ে তারা ভরা রাতে মেঘ-পাতালে 'কালপুরুষা' 'দধিভারিয়া' 'সাতভায়া'র মতো নতুন নতুন তাঁরা খুঁজবে না। 'রিঁ-রিঁ-আঁ' পোকাগুলো আদ্ধেক মাটিতেই পোঁতা থাকল, পোঁতাই থাকল, তাদের ঘটা করে বিয়ে দিতে নাকফুঁড়ি নামের কেউ আর থাকল না। দুপুর গড়িয়ে 'আড়বেলা' পর্যন্ত আমরা সেখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম—যদি সে ফিরে আসে, যদি আসে। বাবার চোখদুটো খোসা ছাড়া পাকা কুসুম ফলের মতো লাল, একটাও কথা বলছেন না। মা থেকে থেকে কঁকিয়ে কেঁদে উঠছেন। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল বোন যেন এসেই বলবে, 'আরও কদ্দূর যেতে হবে বাবা?' সব মায়া কাটিয়ে আমরা ফের রওনা দিলাম পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে। কোথায় এসেছিলাম, এখন কোন দিকে যেতে হবে—তা জানা নেই, আর তার যেন দরকারও নেই। বাবা এগিয়ে চলেছেন, মা হাঁটতে পারছেন না, মাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটছি।

হাঁটছি, হাঁটছি। টাড়-টিকর বন-বাদাড় পেরিয়ে। দুয়েকটা গ্রাম যে চোখে পড়ছে না তা নয়, পড়ছে, তবে জনমানুষশূন্য, খাঁ খাঁ।

মাটির 'ভুগড়া', কোনটায় বা 'পলিথিন-শিট' চাপা দেওয়া। দরজা হাট করে খোলা, নচেৎ 'ঝিঁজরি' দেওয়া। যে কেউ দরজা না ভেঙে ঢুকতে পারে ভিতরে। ভিতরে ঢুকে চুরিচামারি করার লোকও যেন আর অবশিষ্ট নেই। বাড়ির মাচানে 'ভুয়াঙ' লাউ ফলেছে, কুঁদরি-মাচায় কুঁদরি পেকে লাল হয়ে ঝরে পড়ছে, কাঁচা কুঁদরি তুলে 'ভাতে সেদ্ধ' বা তরকারি করে কে আর খাবে! পাতকুয়ার ঘড়রিতে লটকানো দড়ি- বালতি পড়ে আছে যেমনকার তেমন। দেখেই মনে পড়ে গেল বোন নাকফুঁড়ির কথা, ছুটে জল খেতে যাওয়া আর বাবার নিষেধের কথা। সেবার নিষেধ মেনে ফিরে এলেও এবার যেন জেদি মোরগের মতো ঝুঁটি ফুলিয়ে দৌড়ে গেলাম, বোনও যেন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে। কুয়ায় বালতি ধাসিয়ে জল তুলে জলও খেলাম। বাবাও নিষেধ করলেন না, তাঁর যেন আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

একটা খাল পড়ল। খাল পাড়ে ডুব্‌কা-ডুংরিতে গরু-মোষ চরছে, কিন্তু ভাঙা ছাতা-লাঠিধারী সচরাচর দেখা যায় এমন কোনও গরুবাগাল কাড়াবাগালকে দেখা গেল না। আমরা খাল পেরিয়ে মোরাম রাস্তায় উঠে এলাম। ডাইনে যাবেন না বাঁয়ে যাবেন ঠিক করতে না পেরে বাবা খানিক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে 'আড়বেলা'র অবস্থান দেখে ডানদিকেই হাঁটতে লাগলেন। হাঁটছি, হাঁটছি। কখনও মনে হচ্ছে সামনের দিক থেকে কেউ আসছে, কখনও মনে হচ্ছে কেউ পিছন পিছন আসছে! দু'ধারে জঙ্গল, তবে জঙ্গল খুব গাঢ় নয়, রাস্তার ধারে ধারে দু'দশটা বড় বড় গাছ, তার তলায় তলায় আঁটারি-চুরচু পড়াশের ঝাঁটিজঙ্গল। কিছুদূর এগিয়ে দেখা গেল রাস্তা কাটা। বাবা ফের মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বলে উঠলেন, 'এই যা!' আসলে ধন্দে পড়ে গেছেন তিনি—কোন দিকে কারা? এগোলে ভাল, না পিছোলে ভাল? আমাদের জড়িয়ে ধরে বাবা সামনের দিকেই হাঁটতে লাগলেন। হাঁটছি, হাঁটছি। রাস্তার উপর একটা আস্ত গাছের গুঁড়ি ফেলা। রাস্তার তে-মাথা কি চৌ-মাথার মোড়ে মাঝে মাঝেই দেখা যায় ধানের তুষসহ হাঁড়িভাঙা, ডিমের খোসা, সিঁদুর-টিপ। তার মানে কেউ 'তুক্-গুণ' 'ছাড়ান' 'নিমছা' করেছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে আমরা মোড়টা না ডিঙিয়ে খানিকটা ঘুরপথে হেঁটে যাই। বাবাও তাই করলেন। গাছের গুঁড়িটা না ডিঙিয়ে আমরা ঘুরপথে হেঁটে ফের রাস্তায় উঠলাম। এখন নাক বরাবর হাঁটা। হাঁটছি, হাঁটছি। কখনও মনে হচ্ছে আশপাশে কেউ নেই, শুনশান শুনশান। পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল কে বা কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে, হাঁটছে-চলছে, লাটা-পাটা তো নড়ছে সড় সড় করে। কে জানে 'খেড়িয়া' না 'বরহা'। বাবা এই সময়টায় ফের মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে যেন সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বললেন, 'চোখ-কান খোলা রেখে হাঁটো!' আমি চারধারটা চন্‌মন্ করে দেখতে দেখতে হাঁটছি, মায়ের অত দেখাদেখি নেই, বললেন, 'ছাড় ত! ধর্মের রাস্তায় হাঁটছি-ডর কি! মায়ের ডরভয় নেই, সদ্য সন্তানহারা জননীর কাছে ডর-ভয়ের চেয়ে শোকই তো বড়। মা এখনও মাঝে মাঝেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠছেন।

বেলা আড় হয়ে ঢলে পড়লেও হঠাৎ যেন নিভু নিভু চারধারটা জ্বলে উঠল দপ্ করে। তার মানে জঙ্গল শেষ হল। জঙ্গল শেষ হতেই দেখা গেল বেশ কিছু লোকজন রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় এক-দু'মাইল তফাতে! হাতে তাঁদের কাঁড়-কাঁড় বাঁশ টাঙ্গি-বল্লম তাবলা-বুঢিয়া। মুখে চিৎকার করে হাত-পা নেড়ে কী সব বলে চলেছেন? বাবা থমকে দাঁড়ালেন, ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'পিছনটা একবার দ্যাক রে নীলুয়া!' দেখলাম হাতে বন্দুক তাক্ করে খাকি আর তার উপর ছাপ্‌কা ছাপ্‌কা রঙের পোশাক পরা কাতারে কাতারে পুলিশ! এর মধ্যেই কোথাও একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হল, একসঙ্গে কত যে গোলাপায়রা ডানা ফটফটিয়ে উড়ে উঠল! একটা, তারপর আরও একটা আওয়াজ, কানফাটা! আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি থমকে। বাবা বোধহয় তড়পে উঠলেন রাগে, তাঁর চোখদুটো লাল, আরও লাল হয়ে উঠল। তারপর খন্তা-হাতে কেন যে হঠাৎ দৌড়ে গেলেন সামনের দিকে এখনও বুঝতে পারছি না। এক মুহূর্তও গেল না, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বাবা। মা আর আমি দৌড়ে গেলাম বাবার কাছে, তাঁর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছাড়ি-পাছাড়ি কাঁদছি। আমাদের প্রায় গায়ের উপর দিয়েই ডাইনে-বাঁয়ে গুলি চালাতে চালাতে দৌড়ে গেল খাকি আর ছাপ্‌কা ছাপ্‌কা পোশাক পরা লোকগুলো। মাটির কলসি ভেঙে রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল শুকনো মহুল আর ছাল-ছাড়ানো তেঁতুলবীচি। তার উপর ভারি বুটের ছাপ্পা লাগল।

এখন ওই তো বাবার দেহ, একটা ইস্কুল ঘরের সামনে বেঞ্চিতে শোয়ানো। তাঁর কাছে যাবার আর আমাদের অধিকার নেই। মাঝে মাঝেই মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করার আর আমাদের কেউ থাকল না। বাবা এখন পুরোপুরি ওদের সম্পত্তি। 'ফটো-খিঁচা' মেশিনে কত ছবি উঠছে বাবার। আমরা বড় গরিব ছিলাম, গরিব হয়ে গেলাম আরও। এর মধ্যেই পুলিশ এসে আমার হাফ-পেন্টুলের পকেট হাঁতড়েছে দু'দুবার। তল্লাশি করে দু'-দুটো শুঁড় জড়ানো লোহার মতো শক্ত 'রি-রি-আঁ' পোকা পেয়েছে। কে জানে কাল রাতে কখন পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে নাকফুঁড়ি। 'টুইলা' আর 'সাতনলা' তো ছুড়ে ফেলে এসেছি সেই 'বহিন খাকী'-র জঙ্গলে! একসঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম আমরা চারজন। বাবাও চলে গেলেন, বোনও। মুখে গাঁজলা তুলে জ্ঞান হারিয়েছেন মাও। এতক্ষণে মরে গেছেন কী বেঁচে আছেন-জানি না।

॥ পাঁচ ॥

মা পড়ে আছেন রাস্তায়, ঠিক রাস্তায় নয়, রাস্তার একধারে। আমিই টেনে এনেছি এদিকে, পাছে রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ আসা গাড়িঘোড়া! কাঠের 'ধুরি'-অলা লোহার 'মুখপাত' বসানো দু-চাকার গরুর গাড়ি তো নয়, বনের ভিতর পিচ-রাস্তার উপর দিয়ে গিড় গিড় করে আসতে আসতে গাড়োয়ান ঘুমিয়ে থাকলেও অবলা জীব দুটি রাস্তায় কাউকে পড়ে থাকতে দেখলে তক্ষুনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে! আর এখন যা অবস্থা এসব অঞ্চলে গরুর গাড়ি আসাটাই ঝঁকমারি, কখন কোথায় ফেঁসে যাবে কীভাবে! যা আসছে সব মিলিটারি গাড়ি বুম্ বুম্ করে। এই তো একটু আগে গেল একটা, এখন আরেকটা। এমনভাবে হুঁকরে আসছিল যেন তালজ্ঞান ভুলে চড়ে বসবে মায়ের উপর! আমি উপুড় হয়ে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলাম মাকে। এই আমার মা, মুখে এখন বুজকুড়ির মতো গাঁজলা উঠছে ফেন ফেনা। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি আমি, মাঝে মাঝে হাতের আঙুল বুলিয়ে গাঁজলা মুছে দিচ্ছি আর বুকের উপর কান চেপে শুনছি-ধুকপুকানিটা আছে কি না। আছে, আছে। কেঁদ্ কি কুরকুট নিয়ে হাটে গিয়েছেন, জিনিস বেচে কিনে এনেছেন চাল-নুন, সেই সঙ্গে মিষ্টি পান একটা। পান চিবোতে চিবোতে ঠোঁট লাল করে ফেলেছেন, কোত্থেকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে মায়ের দু'হাঁটু জড়িয়ে ধরে আমরা দু-ভাইবোন আব্দার ধরেছি, 'দাও না গো মা পান, ঠোঁট লাল করি।' মা মুখ থেকে চিবনো পান জিভের ডগায় নিয়ে একবার আমার মুখের সামনে, একবার বোনের মুখের সামনে ধরে লোভ দেখাতেন, ধরতে যেই আমরা হাত বাড়াতাম, অমনি মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিতেন সুড়ুৎ করে। আসলে প্রথম প্রথম কৌতুক করতেন নমা, অবশেষে চর্বিত পান ভাগ করে

দিতেন আমাদের মধ্যে। তবে ওই যখন লাল লাল চোখ-না ফোটা কাঁড়াল-কোঁড়ল ইঁদুরের বাচ্চা কচমচিয়ে চিবিয়ে খেতেন, ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ত রক্ত, তখন চর্বিত ভগ্নাংশ চাওয়া তো দূর অস্ত, আমরা দূরে দূরেই থাকতাম আর বলতাম, 'তুমি কিগো মা!' তাতেও মায়ের হিন্দোল নেই, ওই শুধু হি-হি মা কালীর হাসি! আমাদের জঙ্গলে আলু-তুঙার অভাব নেই, অবিকল পানপাতার মতো পাতাওলা এক ধরনের আলু আছে, যার নাম 'পানআলু'। হয়তো আলুগাছের পাতা দেখতে পানের মতোই, তাই পানআলু। সেই পানআলুর পাতা চুন-খয়ের সহকারে আমি আর বোন কতদিন চিবিয়ে দেখেছি-কোথায় পান আর কোথায় পান-আলুর পাতা! ছিঃ থুঃ! লাল তো হলই না, উল্টে গোটা মুখ বিস্বাদে ভরে গিয়েছিল। আমাদের কিত্তি দেখে মায়ের সেদিন সে কী মুচকি মুচকি হাসি আর গান-

"আলুপতর কি পান হেইব।
পরদেশরে কি মন রহিব।"

ঠোঁটের কষ বেয়ে চর্বিত পানের লাল রস নয়, লাল লাল চোখ-না-ফোটা 'চুটিয়া'র রক্তও না, মায়ের মুখ দিয়ে এখন সাদা সাদা বুজকুড়ির মতো গাঁজলা উঠছে। চুঁড়লে এই জঙ্গলেও কী আর পানআলুর দেখা মিলবে না? মিললেও চুন-খয়ের মিশিয়ে তার পাতা চিবোনোর আর দোসরা পাওয়া যাবে না। একা একা চিবোলেও কে আর তাই দেখে মুচকি হেসে গেয়ে উঠবে—"আলুপতর কি পান হেইব"! না, না! আলুর পাতা কখনও পানপাতা হবে না, বিদেশও কখনও স্বদেশ হবে না, মন 'রহা রহি' তো পরের কথা! রাস্তায় একটা লোক নেই, শুনশান। অথচ একটু আগে—ওই তো, ওই যেখানে শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করে আছে আঁটারি-লতা, রাস্তার দু'ধারে নেমে গিয়েছে মোরাম রাস্তা, হেলা-বটগাছের তলায় একটা জনশূন্য ভাঙা গুমটি-সেখানেই টাঙ্গি-বল্লম কাঁড়-কাঁড় বাঁশ তাবলা-বুড়িয়া নিয়ে কাতারে কাতারে লোক রাস্তা ঘিরে ধরে দাঁড়িয়েছিল! ফুট ফাট ফুটুস ফাটাস কী সব শব্দ হল, যাঁতাকলে পড়ে বেঘোরে একটা লোক মরল, আর মুহূর্তে সব ভোঁ-ভাঁ, নিমেষে হাওয়া!

লোক অবশ্য আছে অদূরে ইস্কুল ঘরের আনাচে-কোনাচে, ওই যেখানে কাঠের বেঞ্চিতে শোয়ানো রয়েছে বাবার দেহ। তবে ঝলকে ঝলকে ফটো তোলা মেশিন তাক করে ফটো খিঁচা মানুষগুলো আর নেই, বেলা থাকতে থাকতে যে যার সরে পড়েছে। বেলাও পড়ে আসছে, বেলা এখন ঝিরিঝিরি। কখন খসে যাবে টুঙ করে! নিঃসাড় হয়ে আসছে বন-জঙ্গল, বড় বড় গাছ, গাছতলার ঝোপঝাড়, লাটাপাটা। থেকে থেকে ওই যা দুটো-একটা 'পাখ' ডাক দিয়ে যাচ্ছে ঘরে ফেরানি। ডাক শুনলেই বুঝা যায়—সন্ধে হয়ে আসছে। আমাদের গ্রামের বাঁধগোড়ার জলে হিলহিলে হাওয়া যখন বিলি কাটে, জলের কিনারে দুয়েকটা কুচো বক কী কাদাখোঁচা জলপিপি কী কয়ের-কপতি যখন এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক পা তুলে গলা ফুলিয়ে গলার সাদা অংশ কাঁপিয়ে 'ক-এ-ক-ক' 'ক-এ-ক-ক' করে ডাক দেয়, তখন বুঝি বৈকি সন্ধ্যার আর বিশেষ দেরি নেই।

আজ আবার সন্ধ্যা নামবে, রিঁ-রিঁ করে বিরামহীন 'রিঁ-রিঁ-আঁ' পোকা ডাকবে, রাত গাঢ় হবে, গেল রাতের মতো বোন নাকফুঁড়ি আজ তো আর ঘুমের জন্য বায়না ধরবে না, 'রিঁ-রিঁ-আঁ' পোকা ধরে এনে মাটিতে গুঁথে রেখে পরের দিন প্রত্যুষে কেউ আর বিবাহের উদ্যোগ করবে না, বাবা ঘুমন্ত, মাও তো ঘুমিয়েই আছেন। আজ আবার খাবার জুটবে না। এতদিনের সঞ্চয় যা মা আঁকড়ে রেখেছিলেন ওই মাটির কলসিতে, ভাজা ও খোসা-ছাড়ানো তেঁতুল 'মুজি' আর শুকনো মহুলদানা, অও তো ভেঙে ছত্রখান, এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তায়! তার উপর কত যে গামবুট, মোটরগাড়ি—গেল এল! আরও কত আসবে যাবে! কত যে সরকারি সিলমোহরের ছাপ্পা পড়বে! সে যা হয় হোক, এখন কোথাও একটু জল পেলে হয়। মাথায় চোখে মুখে জলের ছিটা দিলে তবে যদি মায়ের জ্ঞান ফিরে। জলের আশায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছি-ধারে কাছে কোথাও কী একটা বাঁধগেড়া নেই? জল ছিল্ ছিল্ পুকুর? গহম বাঁধ, রিলিফ বাঁধ? কিংবা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে, কেঁদ-কুসুমের গাছতলা দিয়ে, জইড়তলা-বঢ়তলা পেরিয়ে বহন্তি কোনও খাল? মরা হাজা কোনও নালা? জঙ্গলে পাতা ছিঁড়তে ঝাঁটি কুড়োতে গিয়ে ঠা-ঠা রৌদ্রে গলা 'শাঁসালে' জল না পাই, আমরা আঁটারির 'ডগ' শালের 'ডগাল' চিবোই। এখন আমি না হয়—কিন্তু মা! অথচ এই মানুষটাই আমাদের তেষ্টা পেলে অথবা জলের কথা উঠলে বলতেন, 'যেখানে মেঘপাতালে দেখবি গোল হয়ে চিল ঘুরছে, ঘুরছে তো ঘুরছে, সেখানে জানবি জলের জন্য চিল কুঁয়া খুঁড়ছে, সেখানে গেলে জল পাবিই পাবি!' মায়ের কথামতো বড় বড় গাছের মাথার ফাঁকফোকর দিয়ে মেঘপাতালের দিকে চোখ তুলে দেখছি যদি ঘুর্ ঘুর্ ঘুরন্তি চিলের ঘুরে ঘুরে কুঁয়া খোঁড়ার খুঁজে পাই হাল-হদিশ। কিন্তু হায়! বেলা আড় হয়ে যে অস্তাচলে ঢলে পড়ছে মায়ের কোলে, এখন আর চিল কোথায়! সব তো কুয়া খুঁড়তে খুঁড়তে থমকে গিয়ে নেমে পড়েছে খাল-বিল-নদীধারের বট-পাকুড়ে!

ইস্কুল বাড়ি যখন, ধারে-কাছে কোথাও একটা-দুটো গ্রাম আছেই আছে। গ্রামে মানুষজন না থাকে না-ই থাক, কুঁয়ো তো আছে, আছে কুঁয়োয় ধাসাবার দড়ি -বালতিন—। বাবার আর বাধা কোথায়! আয় নাকফুঁড়ি আয়! মাকে ফেলে রেখেই যাব ভাবছি জল আনতে, জল আনার পাত্র না পাই গলায় জড়ানো গামছাটাই ভিজিয়ে চব্চবে করে আনব। উঠে দাঁড়ালাম—তাহলে যাই? যাচ্ছি! পরক্ষণেই মনে হল, না, ন্না! আমার অনুপস্থিতিতে কেউ বা কারা যদি এসে ফের তুলে নিয়ে যায় মাকে? তখন? তারবেলা? ছেড়ে যেতেও ভয়, ছেড়ে যেতেও মায়া! অথচ একটু জল না হলে যে-

একটা 'গ্যাজর', তার মানে লাল তেলতেলে বিছা, ওই তো রাস্তার ওপার থেকে ছুটে আসছে এপারে, ঠিক মায়ের দিকেই! অঙ্গভঙ্গি সাপের মতোই, মাঝে মাঝেই ফণা তোলার ন্যায় সামনের শুঁড় দুটি তুলছে। হাতে অস্ত্রও নেই যে গ্যাজরটাকে মেরে ফেলব, বাপের হাতের 'খন্তা'ও তো বাজেয়াপ্ত! আগত্যা গ্যাজরের যাত্রাপথ থেকে মাকে বগলদাবা করে কিছুটা সরিয়ে আনলাম। গ্যাজর সর সর করে চলে যাচ্ছে তার মতো। গ্যাজরের জায়গায় এবার একটা সাপও তো আসতে পারে? হ্যাঁ, আসতে পারে বইকি। আংকুড়া-বাংকুড়া-'লতা'—সবাই তো জঙ্গলের জীব। যদিও জঙ্গল ছাড়িয়ে আমরা এখন জঙ্গলের শেষমাথায়, তবু তাদের বিচরণে বাধা কোথায়! সাপ-নিধনের লাঠি বানাতে ডকাগাছের একটা আস্ত ডালকে ভেঙে ফেললাম মড় মড় করে। আর এসময়ই দূরে-অদূরে কতকগুলো কুকুর ডেকে উঠল একসঙ্গে।

ইস্কুলঘরের সামনে টহলদারি মিলিটারি পুলিশ শূন্যে গুলি ছুড়ল। একজন তো দৌড়ে এল আমাদের কাছে! আবার কী হাফ-পেন্টুনের পকেটে, অস্থানে-কুস্থানে তারা হাঁতড়াতে শুরু করবে? তার আগেই আমি আমার হাফ-পেন্টুলের 'পাকিট'-এ হাত রাখলাম। বোন নাকফুঁড়ির গুঁজে দেওয়া 'রিঁ-রিঁ-আঁ' পোকা দুটি আছে তো ঠিক! ফেলেই দিয়েছিল পুলিশটা পকেট হাঁতড়ে, আমি আবার কুড়িয়ে জড়ো করে গামছার সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছি। কী শক্ত পোকাদুটির শিংজোড়া! একদম যেন লোহার তার! 'কৌন হো তুম?' লম্বা বন্দুক-হাতে পুলিশ লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

ভাবলাম বলি, 'ওই যে ইস্কুল ঘরের সামনে বেঞ্চিতে শুয়ে, যাঁর এতক্ষণ ছবি তোলা হচ্ছিল ফটাফট, যাঁকে তোমরা হয়তো বুদ্ধি করেই বলে বেড়াচ্ছ বেওয়ারিশ 'লাশ'—ওই আমার বাবাষ আর গুলি খেয়ে লোকটা মারা গেলে তাঁর মৃত্যুতে সেই থেকে অজ্ঞান হয়ে মুখে গাঁজলা তুলে পড়ে আছেন যে—তিনিই আমার মা।' কিন্তু মুখে কিছু বললাম না কারণ মায়ের মুখেই শুনেছি—"সবু পরব ত আসে ভালা ঘুরি-ন-ঘুরি যে বাবু হো, মানুষ ম- রলে নাহি আওয়ে।" কিংবা-"আঁংটি-ভাঙা পিতল-ভাঙা স-বই জুড়া যায়, মানুষ মরিলে দিদি নাই গ' জুড়া যায়।" এ বছরের পূজা-পরব পরের বছর ঠিকই ঘুরে আসে, কিন্তু মানুষ একবার মরে গেলে সে আর ফিরে আসে না। ভাঙা আংটি ভাঙা পিতল-কাঁসা সবই মেরামতি করা যায়। তাবলে মরা-মানুষকে মেরামতি করে ফের বাঁচিয়ে তোলা যায় না। ইস্কুলের সামনে বেঞ্চিতে বরাবরের জন্য যে শুয়ে আছে, তাকে তো আর জাগানো যাবে না, সে আর 'বাবা' নয়, সে এখন মড়া, মুর্দা। কাঁহাতক তাকে 'বাবা' পরিচয় দিয়ে হুট্‌মুট্ উটকো বিপদে পড়া! তাই চুপ থাকলাম। 'হিঁয়া ক্যায়া করতা?' দেখতেই তো পাচ্ছ, ফের চুপ। মিলিটারি লোকটা নিচু হয়ে মাকে ঘাঁটাঘাঁটি করে বলল, 'বিমারি হ্যায় ক্যায়া?' তাও চুপ। তার ভাষা হয়তো বুঝতে পারছি না বলে অন্য কাউকে ডেকে আনতে চলে যাচ্ছিল সে। আর থাকতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে তার পায়ে হুমড়ি খেয়ে কঁকিয়ে কেঁদে উঠে বললাম, 'মায়ের একটু জল দাও না গো!' এবারে আমার ভাষা ওই হয়তো বুঝল না, পা ছাড়িয়ে চলে গেল সদম্ভে। একটু বাদে এল আরেকজন।

একটু বাদেই কী আর, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গেছে। রিঁ-রি-আ পোকাও ডাকতে শুরু করেছে। পাশের জঙ্গলে মাঝে মাঝেই পাখ-পাখালি 'ভদ্‌কাচ্ছে'। তাহলে, গত রাতের মতো আরেকটা রাত আসছে! মায়ের অবস্থা যে-কে- সেই। অদূরে ইস্কুল ঘরের সামনে কাঠের বেঞ্চিতে শোয়া বাবার অবস্থানও যেমনকার তেমন। 'আছা ভালা' কী করবে ওরা বাবার রোগা-প্যাট্‌কা দেহটা নিয়ে? পয়সা খরচা করে পোড়াবে? না, 'গাড়্‌হা' করে পুঁতে দেবে মাটিতে? ধুর্। অত কী আর করবে! হয়তো রাতের অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দেবে জঙ্গলে, শিয়াল-শকুনে টানাটানি করে খাবে, কে আর দেখছে! কে কার বাবা, কে কার স্বামী-বেওয়ারিশ মড়া ছাড়া বা কী! একসঙ্গে অনেকগুলো 'হ্যাজাক' ধরানো হল ইস্কুল ঘরে। মিলিটারি পুলিশদের একজনা তো এ-লাইট সে-লাইটের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে খালি 'বাসাত' দিচ্ছে! এখান থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাাচ্ছি। ইস্কুলঘরের ভিতর টেবিলের চারধারে বসে ওরা কীসব খাচ্ছে! দেখাদেখি খিদে পেল আমারও। সে তো পাবেই, সেই কবে কুরথিডালের তরকারি দিয়ে এক মুঠ্ ভাত-খাওয়া! তাও তো আধ-খাওয়া! মা এখন ক্ষুধা-তেষ্টার বাইরে, আমি তার বুকের উপর ফের কান পেতে শুনছি-ধুক্ পুকানিটা আছে কি না। "ধুক্ পুক্ ধুক্ পুক্"—আছে! "ধুক্ পুক্ ধুক্ পুক্"—আছে, আছে!! আমি পরম নিশ্চিন্তে মায়ের পাশটিতে শুয়ে এখন ভাবছি—সেই আমাদের গ্রামের উত্তরে মাঝুডুব্‌কার জঙ্গলের ভিতরে ঝাঁটি-বুদা কেটে তৈরি করা জহি জমিনে সেবার কুর্‌থির বীজ বুনেছিল যুধিষ্ঠির কুম্‌হার, সবুজ শুঁড়তোলা কুরথি-লতিতে খেত ভরে গিয়েছিল কানায় কানায়, এমন কী খেতের চারধারে আলের উপর দিয়ে হাঁটতে চলতে কুরথি-লতির শুঁড় এসে দু'পায়ে জড়িয়ে যায়। অগত্যা পায়ে মাড়িয়ে দুম্‌ড়াতে-মুচড়াতেই যেতে হয়, কারণ ওই তো আমাদের গ্রামে যাবার একমাত্র রাস্তা! ক্ষয়ক্ষতির বহর দেখে আমাকে ডেকে ঝানু চাষি যুধিষ্ঠিরই বলেছিল, 'বাবু রে, পাহারা দে! তোকে দু'মাণ' কুরথির জল খাওয়াব'! রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে কড়া পাহারাও দিয়েছিলাম আমি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে ওস্তাদ যুধিষ্ঠিরও দু-'মাণ' কুরথির ডাল দিয়েছিল মাকে। দু-'মাণ' অর্থাৎ দু-কুন্‌কে বা দু-টোপা। খেতের কাঁচা ফলও খেয়েছিলাম খুব-দুধ—ভরে-আসা কাঁচা কুর্‌থিরও যে কী স্বাদ! ক্ষুধা-তেষ্টা দুই-ই একসঙ্গে মিটে যায়।

কুর্‌থিডালের দুধ-ভরে-আসা কাঁচা দানা শস্যে এখন ক্ষুধা ও তেষ্টা মেটানোর স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বন্দুকের বাঁটের গুঁতো খেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল চট করে। মায়ের বুকের কাছে উবু হয়ে বসে দু-হাঁটুতে থুত্‌নি গুঁজে জুলু জুলু চোখে চেয়ে থাকলাম পুলিশটির দিকে। আমার ও মায়ের শরীরে টর্চের আলো ফেলে হিন্দিতে নয় আমাদের ভাবাতেই বলল, 'ওঠ!' আমি বলা মাত্রই উঠে দাঁড়ালাম। লোকটাও তৎক্ষণাৎ আমার হাফ-পেন্টুলের পকেট হাঁতড়ে বের করে আনল সেই গামছার সুতোয় বাঁধা 'রিঁ-রিঁ-আঁ' পোকার বান্ডিলটা, জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কী?' বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, 'রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা।' পুলিশটা গর্জন করে উঠল, 'হোয়াট? রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা—তার মানে?' শহর-বাজারের মানুষ, হয়তো রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা চেনে না—এখন কী করে তাকে 'রিঁ-রিঁ-আঁ' পোকার মানে বুঝাব ভাবছি। কোনও কিছু বিষাক্ত পোকা ভেবে তার আগেই জিনিসটা মাটিতে ফেলে দিয়েছিল লোকটা। অবশ্য খুব দূরেও নয়, আমার পায়ের কাছেই। জ্বলন্ত টিপা-লাইটের আলোয় চট্‌জলদি কুড়িয়ে এনে ফের পকেটে পুরলাম। আর কী আশ্চর্য, এ সময়ই কী না গাব্‌গুবি গাছের ঝোপঝাড়ে একসঙ্গে হাজারটা রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা পোঁদ ফেড়ে ডেকে উঠল 'রিঁ-ই-ই-ইঁ রিঁ-ই-ই' করে! উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'বাবু গ- ওই-ওই ডাকছে পোঁদ ফেড়ে রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা! আনব ধরে, মিলিয়ে দেখবেন?' ফের গর্জন করে উঠল লোকটা, 'চো-ও-প! ও তো ঝিঁঝিঁ পোকা।' মাথা নামিয়ে দু'হাতের আঙুল মটকাতে মটকাতে বললাম, 'তাহলে তাই, আমরা ত বলি—।' পুলিশটা বলল, 'ফের পকেটে পুরলি যে? এ দিয়ে কী করবি? বললাম, 'অষুধ।' 'কার?' মাকে দেখিয়ে বললাম, 'আমার মায়ের।' মায়ের কথায় একটু যেন নরম হল লোকটা। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে তোর মায়ের? কই, ডাক তোর মাকে!' 'কই, ডাক তোর মাকে' 'কই, ডাক তোর মাকে'-মুহূর্তে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মাথাটা! ঠিক একদিন আগে এই রকমই একটা কথায় আমরা ঘর ছেড়েছিলাম। আমাদের বাবা ধুলো পায়ে কোত্থেকে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বলে বসেছিলেন, 'এখানে আর একদণ্ডও থাকাটা নিরাপদ নয়, আঁকাড়া বিপদ চারধার থেকে ধেয়ে আসছে ধাঁই ধাঁই করে। সবকিছু ছেড়েছুড়ে এক্ষুনি পালাতে হবে। কই, ডাক তোর মাকে!' বললাম, 'মায়ের হুঁশ নেই! ডাকলেও আর উঠছে না!' শশব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ে মায়ের নাড়ি দেখল লোকটা। আঁতকে উঠে বলল, 'আরে তাইতো!' ততক্ষণে আরও চার-পাঁচজন মিলিটারি পুলিশ পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ-চারদিকেই বন্দুক তাক করে মহড়া দিতে দিতে আমাদের কাছে এসে গেল। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'মতলব্, উঁহা পেঁ যো মুর্দা আদমি, ইহলোগ উসীকা লেড়কা অউর জেনানা আছে।' কে জানে কী বলল! আমি তো ফেঁসে যাবার আশঙ্কায় ও মায়ের সেই—"সবু পরব ভালা ঘুরি ঘুরি আওয়ে মানুষ মরলে নাহি আওয়ে"-গানের ধুয়ো ধরে মাথা নাড়লাম, না না। বাঙালি পুলিশটা জিজ্ঞাসা করল, 'তবে আসছিস কোত্থেকে? যাচ্ছিসই বা কোথায়?' এখানেও সেই মায়রে বুলি, গিয়েছিলাম কুটুমবাড়ি যাচ্ছি নিজেদের বাড়ি। কিন্তু নিজেদের বাড়ি বলে কোন গ্রামের নাম করব? ত্যামন নিরাপদ গ্রাম-নামও তো আমার জানা নেই! চটজলদি মুখে এসে গেল বাবার মাসতুতো ভাইয়ের গ্রাম-নামটা।



বললাম, যাচ্ছি চিচুড়গেড়িয়া।' সঙ্গে সঙ্গে একাধিক গলায় আওয়াজ উঠল, 'উরি ব্বাস! খতরনাক জায়গা! উধর আভি আভি মৎ যা না!' তখনও আমাদের ফেলে রেখেই চলে গেল পুলিশগুলো।

ফের ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মা তো ঘুমোচ্ছেই। আসলে না ঘুমিয়ে আমাদেরই বা আর উপায় কী! অবশেষে, রাত তখন কত হবে কে জানে, বেদম আওয়াজ করে একটা গাড়ি এসে থামল। মাকে ওরা ধরাধরি করে গাড়িতে তুললও। মায়ের পিছু পিছু গিয়ে গাড়ির ভিতরে উঁকি মেরে দেখছি—বাবাও সাদা কাপড়ে দড়িতে বাঁধাছাঁদা হয়ে শুয়ে রয়েছেন, মাকেও রাখা হল পাশাপাশি। বাইরে মাটিতে পা রেখে তখনও আমি দাঁড়িয়ে, গাড়ি ছেড়ে দিল হুট্ বলতে! চলন্ত গাড়ির পিছনে কাঁদতে কাঁদতে পড়ি-কি-মরি দৌড়ুচ্ছি, আর পুলিশবাবারা হাসছে হো হো করে! ভুখা-পেটে প্রায় আধ-ক্রোশটাক' দৌড়েছি, গাড়িটা থামল। ডালা খুলে আমাকেও তুলল। ও, তাহলে এতক্ষণ-! ধাতস্ত হয়ে দেখলাম—না, সব কাঠ-কাঠ মুখ, কেউ একটা কথাও বলছে না! বাবার ঢাকা মায়ের আ-ঢাকা মুখ দেখে যাচ্ছি, দেখতে দেখতে ভাবছি—এরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? 'জিহলখানা'য়? 'জিহলখানা' বা জেলখানাকে বাবার বড্ড ভয় ছিল, মা কিন্তু অকুতোভয়। এক সময় তেড়িয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, 'আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জিহলখানায়?' কাঠ-কাঠ গরু-গম্ভীর মুখগুলি হেসে ফেলে উত্তর দিল, 'না, হাসপাতালখানায়।'

॥ ছয় ॥

বুঝতে পারছি, রাতের অন্ধকারে মিলিটারি পুলিশের গাড়িটা ঘনজঙ্গল ও ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে, কে জানে কোথাকার জঙ্গল! মাঝে মাঝে গাড়ির আওয়াজকে ছাপিয়েও জঙ্গলের ভিতর থেকে আচমকা একটা-দুটো অচেনা আওয়াজ উঠে আসছে, অনেকটা হনুমানের ডাকের মতো, "হু-উ-প! হু-উ-প!" হনুমানও হতে পারে, আর নয়তো জঙ্গলের ভিতরে কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকছে। গাড়ির ছুটন্ত গতিতে সে-ডাক কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে, ঠিক বুঝে ওঠা কঠিন। এক ঝটকায় মনে পড়ে গেল বোন নাকফুঁড়ির মুখটা! এতক্ষণে সে-ই হয়তো ছাড়া পেয়ে ঠোঁট 'বিদুর' করে কাঁদছে, আর কখন "মা" কখনও "বাপু" বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে। "নী-ই-লু-উ" "নীলুয়া রে-এ-এ-এ" বলে কী আর ডাকছে না! বন্দুকধারী মিলিটারি পুলিশগুলোর নিরেট মুখের উপর চোখ বুলিয়ে হাঁটুতে রাখা আড়াআড়ি হাতের ভাঁজে মাথাটা এলিয়ে চাপা-গোঙানির মতো ডুক্‌রে কেঁদে উঠলাম, চোখের লোর কী আর হাতের 'আড়' মানে! কাঁদছি অঝোরঝর্, তারা কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না। আমরা একসঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম চারজন। বাবা গেলেন, বোনও। মুখে গাঁজলা তুলে জ্ঞান হারিয়েছেন মা। —এখন ওই তো, একজন মরা একজন না-মরা মানুষ, পাশাপাশি শুয়ে!

মাঝে মাঝেই গাড়িটা ঘোঁচ করে আটকে যাচ্ছিল, যতবারই আটকাচ্ছে ততবারই খালি মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তারা পিঠে সপাটে বুটের লাথি মেরে আমাকে না ঠেলে ফেলে! কিন্তু না, গাড়ি থামছিল অন্য কারণে। কখনও বিষধর 'লতা' ব্যাঙ কী পাখির 'কাঁড়াল-কোঁড়ল' বাচ্চা খেয়ে নধর গতরে লদোপদো করে রাস্তা পার হচ্ছিল ধীরে সুস্থে, কখনও বা ভুঁড়া-শিয়াল অতি দ্রুত গতিতে। গাড়ির জানলার ফাঁক-ফোকার দিয়ে একটা-দুটো গাছের ডাল হঠাৎ হঠাৎ ঢুকে আসছিল গাড়ির ভিতর। কুড়চি কি আঁটারি, পড়াশঝাঁটির ডাল-যেন কতকালের চেনা, চেনা মানুষ। হাতে ধরে গালের উপর

চেপে রাখছি। চেপে রাখা কি যায়! সে তো হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সর সর করে। শির্‌শিরানি হাওয়া ঠোঁটে লেগে ঠোঁট কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। বুঝতে পারছি—শীত আসছে। বুঝতে পারছি—আর কিছুদিন বাদেই শীতের 'জাড়ে' আমার ঠোঁট ফাঁটবে, ঠোঁট ফেটে 'মামড়ি' উঠবে। মামড়ি-ওঠা ফাটা ঠোঁটে ঝাল তরকারি কী মাংসের জুস খেতে গেলে—আহা কী কষ্ট! কী কষ্ট! খালে, বুড়্‌বুড়ি-ঝরনায়, নদীতে নাইতে গিয়ে বালিতে, আর নয়তো 'হাঁসা-পাথরে' ঘষে ঘষে ফাটা ঠোঁটের 'মামড়ি' ছাড়াব। মাম্‌ড়ি-ছাড়ানো ফাটা ঠোঁটের ফাটায় ফাটায় রক্ত। রক্ত মুছে তার উপর মা কাঠি দিয়ে বড়ো আদরে লাগিয়ে দেবেন কুড়চি গাছের 'ক্ষীর', গাঢ় দুধের মতো। ঠোঁট-ফাটা ক'দিনেই ঠোঁট ছেড়ে পালাবে! আর, মা তো বেঁচেই আছেন। এই তো একটু আগে ইস্কুলের কাছে জঙ্গলের ধারে রাস্তায় পড়ে থাকা মায়ের বুকে কান চেপে ধরে তাঁর ধুক্‌পুকানি টের পেয়েছি! এখনও কী উঠে গিয়ে আরেকবার কান চেপে ধরে দেখব? না, তার আর দরকার কী! ওরা তো বলেইছে, নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে। সেখানে বড় বড় 'ডাগ্‌তর' আছে, বিনা 'পৈশা'র ওষুধ আছে, চোখ-না-ফোটা লাল লাল কাঁড়াল-কোঁড়ল 'চুটিয়া'র বাচ্চা না থাক, ভাতটারে, দুধটা—সব নামীদামি খাবার আছে। মা দু'দিনেই 'টেনকে' উঠবেন। মা না হয় বেঁচে আছেন, তাই হাসপাতালে 'ডাগতরের' কাছে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু বাবা? তবে কী বাবাও বেঁচে আছেন—ধুলো পায়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করা সেই লোকটা?

ওরা ঘুমোচ্ছে, হাতে-ধরা বন্দুকের উপর ঠেস দিয়ে। কেউ কেউ গাড়ির গদিতে ঝাঁকুনিতে আরামসে। ঘুম নেই একফোঁটা আমার চোখে। রিঁ-রিঁ-আ পোকা ডাকছে-রিঁ-ই-ই-ই রি-ই-ই-ই! রিঁ-ই-ই-ই রিঁ-ই-ই-ই। যেন 'নাই কুন্তলের' মূলও নাড়িয়ে দিচ্ছে, কী 'পোঁদ ফাটা' ডাক! আমার বিরক্ত লাগছে। একে গাড়ির ডাক, একটা তো নয় সামনে আরও দুটো, তার উপর রিঁ-রিঁআ পোকার ডাক। সর্‌ সর্‌ রিঁ-ই-রিঁ! একটু ফাঁকা, জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। এইমাত্র চলে গেল একটা 'বাবোই' ঘাসের খেত। বাবোই ঘাসের খেত যখন গেল, ধারে কাছে তখন মাহাতোদের গ্রাম আছে, আছেই। মাহাতোরাই তো বেশি বাবোই ঘাসের চাষ করে, আর হাত-মসকে মসকে রাস্তার ধারে বাবোইয়ের দড়ি পাকায় তাদের বুড়ো-বুড়িরা, তাদের 'বেটা-বিটি'রা।

গাড়ি আরেকটু গড়াতেই ঝোপঝাড়-লাটাপাটার ভিতর দিয়ে দেখা গেল রাস্তার ধারে ধারে পোঁতা খুঁটির মাথায় বিজলি বাতি জ্বলছে। বিজলির আলোয় এক ঝটকায় একটা গাঁ-গেরস্তি, একটা-দুটো টালির বাড়ি, টিনের বাড়ি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। কে জানে এখন কত রাত, আজ ক ঘড়ির 'জন', এখনও তো বিজলির আলোটুকু বাদ দিলে জঙ্গলের গায়ে মাথায় কালো হাঁড়ির পারা অন্ধকার। 'জন' না থাকলেও একটা 'মরা' আলো থাকে, আজ যেন সেটুকুরও অভাব! গাঁ যখন, নিশ্চয় মানুষজনও আছে, ঘুমোচ্ছে, নাকি আমাদের গ্রামের মতোই 'গাঁ উজাড়' করেই সব ভাগল-বা! আমাদের সঙ্গেই তো ঘর ছেড়েছিলেন হাঁসুয়া, বড় ভদ্র ছোট ভদ্ররা, হারনির মা কালামণি, কালীপদ-বধিরামরা, কাঁদরুর বাপ শরাবণরা। কে যে কোথায় 'কুটুমবাড়ি যাবার' নাম করে 'গাপ্‌' হয়ে গেল রাস্তায়! কী করছে এখন মন্মথর বেটা পাড়রু, গুরুভার বেটা চৈতন, আর চিনিবাসের বেটা বিনন্দ? পাড়রু, চৈতন, বিনন্দ আর আমি—মাঠেঘাটে ডুব্‌কা-ডুংরিতে সাপকাঠি-চিহড়বান্দীর জঙ্গলে 'কাঁড়-কাঁড়বাঁশ' 'টুইলা' 'সাতননা নিয়ে কোথায় কোথায় না 'ঢুন্ডে' বেড়াতাম। খঙ্গা-বঙ্গা ক্যাঁকলাস- গোঈ-গোগিধদ খেড়িয়া-ঝিঁকর শিকার করতাম। পালাতে গিয়ে তারাও কি আমাদের মতো হাতে-নাতে ধরা পড়েছে? তাদেরও বাপ কি আমার বাপের মতোই আন্‌সাট্‌কা গুলি খেয়ে মারা পড়েছে? কাঠ-বেঞ্চিতে শুইয়ে রেখে তাদের বাপেরও কী অমনিধারা ফটাফট্‌ ফটো খিঁচা হয়েছে? তাদের মায়েরাও কি আমার মায়ের মতোই জ্ঞান হারিয়ে মুখ থেকে বুজ্‌ বুজ্‌ করে গ্যাঁজলা তুলেছে? এখনও মরে নাই, যে কোনও সময় টাট্‌কা-টাট্‌কি মারা পড়বে?

সেবার তিনবন্ধুতে 'বল' খেলতে গিয়েছিলাম এমনি একটা মাহাতোদের গ্রামে, 'শুগনি বাসা'য়। আমি ছিলাম 'গোল-কিপার'। গোলে ও পক্ষ এত বেশি বেশি করে বল ঠেলছিল যে, বল ধরতে ধরতে আমার দু'হাঁটুর ছাল গেল 'ছড়ে'। রক্ত বইছিল দর্‌ দর্‌ করে! চারধারে রুগড়ি-ভরা টাঁড়-টিকর, মাঝের ডুংরিতে বল খেলা, বলখেলার মাঠেও রুগড়ি রগ্‌ রগ্‌ করছে, তবে মাঝে মাঝে' জুরগুঁড়া'— ওই যাকে 'বাবু-ঘর'-এর ছা-ছানারা বলে 'চোরকাঁটা'। কিন্তু 'পেনাল্টি-এলাকা'র ভিতর 'জুরগুঁড়া'র একটা ঝাড়ও ছিল না যে, হাঁটু মুড়ে বল ধরতে 'সুসার' হবে। আচমকা আমার রক্ত-ঝরা হাঁটু দেখে দর্শকদের মধ্য থেকে দু'দুটো 'উরুমাল'-হাতে দৌড়ে এল এক 'মাহাতো-বিটি', মাহাতোদের এক সুন্দরী কন্যা। আমার দু'হাঁটুতে পটাপট দুটো 'উরুমাল' বেঁধে দিয়ে চটাস্‌ করে একটা 'কিস' খেয়ে আনন্দে উত্তেজনায় পাগলা হয়ে বলতে বলতে গিয়েছিল-"হিপ্‌ হিপ হুর্‌ রে!"সেবার সাতটা 'সিওর' গোল বাঁচিয়ে আমরা তিন গোলে জিতেছিলাম কি না! পাড়রু হাফ ব্যাক থেকে ছুটে এসে আমার কানে কানে বলে গেল, "তোর কী ভাগ্য রে নীলু।" আজও তুই এসে দেখে যা পাঁড়রু, আমার কী ভাগ্য! আমি গাড়ি চড়েছি। যে-সে গাড়ি তো নয়, মিলিটারিদের গাড়ি। ভোট কালে গাঁয়ে আসা ভোট-বাবুদের সে গাড়ি নয় যে, গাড়ির ধুলা-গায়ে হাত দিলেও ডেরাইভার খেঁকিয়ে বলে উঠবেন, 'খোকা, হাত দিস না, 'হরেন' খারাপ হয়ে যাবে!' কিংবা, 'টায়ার পামচার হবে।' শুধু, মাঝে মাঝে এঁরা আমাকে গাড়ি থামিয়ে ঠেলে ফেলে দেন রাস্তায়, রাস্তায় আমাকে ফেলে তাঁরা তাঁদের গাড়ি অল্পবিস্তর ছুটিয়ে দেন জোরে, ছুটতে ছুটতে পড়ি কি মরি আমিও গাড়ির পিছনে ধাওয়া করি, হায়! হায়! আমার মা-বাবা গাড়িতে রয়ে গেলেন যে! রঙ্গ তামাশাই, রঙ্গ-তামাশা সেরে তাঁরা ফের আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দেন। তবু আশঙ্কা একটাই, খেলা খেলতে খেলতে, খেলার মহড়া দিতে দিতে, কখন মিলিটারি পুলিশের গাড়ি আমাকে বাড়তি 'আবর্জনা' ভেবে খেলাচ্ছলে ফেলে রেখেই ছুট দেবে, আর থামবে না। অথবা, দুই গাড়ির মাঝখানে ফেলে লোকগুলো উপর্য্যুপরি গুলি ছুড়ে আমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে, যেমন করে দিয়েছে আমার বাবাকে!

কিছু কিছু কুকুর আছে ছুটন্ত গাড়ি দেখলেই "ভুক্‌ ভুক্‌" করে, শুধু 'ভুক্‌ ভুক্‌' করা নয়, কোনও কোনও কুকুর ছুটন্ত গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতেও থাকে, শুধু ছোটা তো নয়, কখনও কখনও গাড়িকে ছাপিয়েও তার গতিবেগ বেশি হয়ে যায়, সে তখন টাল সামলাতে সামান্য এগিয়ে যায়। পরক্ষণেই পিছিয়ে আসে, এসেই ড্রাইভারের দরজা বরাবর, যাত্রীর দরজা বরাবর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বিকট চিৎকার করে তাকে কামড়াতে চায়, আঁচড়াতে চায়। রাস্তার নেড়ি-কুকুর যেমন-তেমন, জঙ্গলের জংলি 'আদড়া' হলে তো কথাই নেই, আঁচড়ে কামড়ে একশা করবে, টুঁটি কামড়ে ধরবে। হয়তো মাহাতো গ্রামের কোনও একটা কুকুর, আর নয়তো জঙ্গলের জীব—আচমকা দৌড়ে এসে "ভুক্‌ ভুক্‌ ভু-উ-উ-উ" করে, মনে হল, গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে লাগল। চিৎকার বাড়ল বই কমল না। হঠাৎই একটা গুলির আওয়াজ! কুকুরটা যেন শূন্যে লাফ দিয়ে 'ভু-উ-উ-ঙ-এঃ-ঙ-এঃ-চ্‌" চিৎকার করে উঠে আছড়ে

পড়ল মাটিতে, আওয়াজটাও থেমে গেল। আমাদের গাড়ির ঘুমন্ত মিলিটারি লোকগুলো ঘুমে প্রায় এর-তার গায়ে ঢলে পড়ছিল, গুলির আওয়াজে আচমকা জেগে উঠে হাই তুলল। 'ডেরাইভার'কে জিজ্ঞাসা করল, "হোতা ক্যায়া?" তারপর জেনে নিয়ে হাসল, "অঃ ইস্‌লিয়ে-"। বলেই ফের চোখ বোজার আগে কট্‌মট্ করে তাকাল আমার দিকে, যেন এটা আবার কোত্থেকে এল! কেউ কেউ বিড়ি সিগারেট মুখে দিয়ে দাঁতে চেপে প্যান্টের পকেটে ধুলো ঝাড়ার মতো থাপ্পড় মেরে 'মাচিস' বের করে বিড়ি সিগারেট ধরাল। তারপর হুস্ হাস্ টেনে ধোঁয়ার 'রিং' বানিয়ে আমারই মুখের দিকে পাঠিয়ে মুচকি হাসল। তার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল, "ক্যায়া-নিঁদ্ আতা নেহী? লেট যাও বস্! আভি ভি আসপিটাল করীব্ দূর বা!"

আমি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমোবার ভান করে চোখ বুজলাম।

॥ সাত ॥

ওরা ফের ঘুমিয়ে পড়ল আমি ধীরে ধীরে চোখ খুলে পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছি—ওই তো মা, ওই তো বাবা! দু'জনেই সাদা থান-কাপড়ে মোড়া, অবশ্য মায়েরটা গলা অবধি। তার মানে মা এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু বাবারটা মুখ-কান ঢাকা, বাঁধাছাঁদা। এমনটা দেখেছিলাম—ওই যখন আমাদের গ্রামের তিলোচাঁদকে 'সাপ-কাটি'র জঙ্গলে বাঘ না বাঘারুলে কামড়ে গলার টুঁটি প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছিল! গ্রামের লোকেরা তাঁকে ধরাধরি করে দড়ির খাটিয়ায় শুইয়ে গলায় তিলোচাঁদের বউয়ের পুরাতন শাড়ি পেঁচিয়ে কাঁধে তুলে দোলাতে দোলাতে নিয়ে গিয়েছিলেন 'সাপ-ধরা হেলথ সেন্টার'-এ। দু'দিন না তিনদিন ছিলেন, তাও বাঁচানো গেল না। তাঁকে যখন গ্রামের লোকেরা ফের খাটিয়া করে নিয়ে এলেন, তখন তাঁর সারা অঙ্গ, এমনকী কান-মাথা, মাথার চুলও নতুন থান-কাপড়ে মোড়া ছিল, গলার কাছেও কাপড়ের একটা প্যাঁচ ছিল। বাবার সঙ্গে তাঁর সাদা থান-কাপড়ের একটু উনিশ-বিশ আছে। কেন না, বাবার গলায় কাপড়ের কোনও 'গেরো' নেই। এমনি এমনিই কপাল অবধি বিছানো, এমনকী মাথার চুলগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে! তবে কী বাবা আমার এখনও বেঁচে আছেন? "হেই বড়াম-থান, হেই বাবা কালুয়া ষাঁড়! বাঁচিয়ে দে তুই রোগাভোগা বাপটাকে, মা-টারও হুঁশ ফিরিয়ে দে, দে বাবা, দে!

ওরা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে হ্যাঙলার মতো হাঁ করে, যেন কতকাল ঘুমোতে পায়নি। বনে-বাদাড়ে লাটায়-পাটায় কখনও বন্দুক ঘাড়ে, কখনও বন্দুক তাক করে হাঁটা। হাঁটা, হাঁটা। কখনও পায়ে এসে জড়ায় 'চিহড়্' 'চুরচু' 'হাতি-বাঁধি'র 'লত্', কখনও 'খসির্' 'চন্দ্রবোড়া' 'শিয়র-চাঁদা' রাত ভিতের 'লতা'। জড়াতে জড়াতে ছাড়াতে ছাড়াতে হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে ঘুম কী আর আসে! এলেও ঘুমের 'ডগ'-টা মুচড়ে ভেঙে দিতে হয়। এখন গাড়িতে চড়ে বেশ দুলতে দুলতে যাওয়া, হাঁটা তো নয়, না-ঘুমের 'ক্ষতি' ঘুমিয়ে যতটা পারা যায় পূরণ করা। ওরা ঘুমোচ্ছে, হাতে-ধরা বন্দুকের উপর ঠেস দিয়ে, কেউ কেউ নাক ডাকাচ্ছে "ঘড়্-র-র-র-র এঃশ্চু" করে। মাঝে মাঝেই বন্দুকে রাখা হাতের মুঠিটা কারওর কারওর আলগা হয়ে যাচ্ছে, বন্দুকটা পড়ে যাচ্ছে দেখে ঘুমের ঘোরেই ফের যেন আঁকড়ে ধরছে, আরও জোরসে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! হাতের মুঠো থেকে একটা বন্দুক খসে পড়ল ঠিক আমার নাকের ডগায়, বন্দুকের মাথার 'ছুরি'টা ঠক্ করে লাগল কপালের মাঝখানে। আমি জাপটে বন্দুকটা হাত মুঠোয় ধরে অবিকল তাদের মতোই বসে থাকলাম।

খালি গা, কোমরে বাঁধা গামছা, মরা 'রিঁ-রিঁ-আ' পোকা পকেটে, হাফ-পেন্টুলের বন্দুকধারী 'পল্টন'! কিন্তু সে-ও আর কতক্ষণ। যার বন্দুক সে তড়াক্ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত থেকে কেড়ে নিল বন্দুকটা। 'পজিসন' নিয়ে আমার বুকের কাছে যন্ত্রটা ঠেকিয়ে তার সে কী কায়দা! কী আস্ফালন! অন্যেরা জেগে উঠে রগড় দেখে বলল, "চল্ রহা ক্যায়া?" আস্ফালনকারী বন্দুকবাজ হেসে উত্তর দিল, "এ লেড়কা মেরা রাইফেল হাইজাক্ কিয়া।" কেউ যেন বলল, "নকশাল বা? কিতনা উমর?" তারাই দেখেশুনে সাব্যস্ত করল, "করীব্ আঠারো-উনিশ সাল তো হো গাই।" তাদের কথা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছিলাম না, বুঝার কথাও নয় আমার। যদিও আমার ঠিক বয়স এখন ষোলো। অবশেষে তারা গাড়ি থামাল, মিলে-জুলে সবাই বলল, "উও লেড়কা লোগ্‌কো ফিন্ উতার দেও।"

আবার আমাকে নামিয়ে দিল ওরা। অবশ্য তারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে নামল। রাস্তার ধারে একজন বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াল, আরেকজন তার বন্দুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে 'পিসাব' করল ছর্ ছর্ করে। একজনের পালা শেষ হলে আরেকজন। আমার ক্ষুধা-তেষ্টা নেই, মরে গিয়েছে কখন! তবু তো 'পিসাব' পায়। রাস্তার এধার-ওধার নয়, মাঝখানে দাঁড়িয়েই আমি হুড্ হুড্ করে 'পিসাব' করলাম, করছি। আর ওরা হো হো করে হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে! সেই বলে না—"কার ঘরে ডিঁগা ডিঁগা, কার ঘরে ভাল মুরগা। কেরকেটা পড়েছে ফাঁদে, মাছরাঙা ডাঙায় কাঁদে?" আমার মা মর-মর, বাপ মরেছে, আমি মরছি শোকে। আর ওরা মজা মারছে। পেচ্ছাপ করতে করতেই গাড়ির পিছু পিছু দৌড়ুচ্ছি। এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে, কে জানে আজ ক ঘড়ির 'জন', ক ঘণ্টা পরে চাঁদ উঠেছে? বনে-জঙ্গলে চাঁদ বা 'জন'-এর ওঠাওঠি দেখেই তো রাতের বেলা সময়ের হিসাব হয়। পূর্ণিমার পরের দিন উদয়ের একঘণ্টা পরে চাঁদ ওঠে, তাই 'একী ঘড়ির জন'। এই ক'দিন তো সব হিসাব তালগোল পাকিয়ে গেছে। নচেৎ মা আমার আঙুলের 'কড়' গুনে গুনে 'ভান'-এর হিসাব রাখেন। ঘরের দেওয়ালে রেখ্ কেটে কেটে অমাবস্যা-পূর্ণিমা দিন-ক্ষণ-মাস-বছরের অঙ্ক কষেন। আহ্ মা, মাগো!

জঙ্গল এখানে পাতলা, আঁটারি লতার শুঁড়গুলি ডগ্‌গুলি নড়ছে, চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে পষ্ট। পেচ্ছাপের জলে রাস্তায় আঁকি-বুঁকি কাটতে কাটতে দৌড়ছি, গাড়ির গতিবেগও ততটা প্রবল নয়, বরঞ্চ কমে আসছে ক্রমশ। আমার ধারণা, আগের বারের মতোই ওরা আমাকে ফের গাড়িতে তুলবে, কিছুতেই ফেলে যাবে না, আমাকে নিয়ে তারা 'টুকচার' রগড় করছে, এই যা। জঙ্গলের ওদিকে কোথাও অসময়ে একটা মোরগ ডাকল। তার মানে ধারে-কাছে একটা লোকালয় আছে, পরক্ষণেই মনে হল 'বন-খুকড়া'ও হতে পারে। আর ঠিক এসময়ই আমার ভয় ধরল—যে কোনও মুহূর্তে ওরা আমাকে গুলি করবে, গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে আমার 'ধুক্‌পুকি'টা! একবার আমাদের গ্রামের ধারে ঝিট্‌কার জঙ্গলে বাবার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে 'খেড়িয়া' শিকারে এসেছিলেন পুলিশে কাজ-করা ডাইনটিকরির খাঁদু কর্তা। সঙ্গে একটা দো-নলা বন্দুক আর দু-দুটো পাঁচ-ব্যাটারির 'টিপা-লাইট'। 'টিপা-লাইট'-সে এক মজার 'গ্যাড়াকল'। নাকি আঙুল ছোঁয়ালেই ধোঁয়াধার আলো, আর সে -আলো খরগোশের চোখে পড়লে তারও নড়ন-চড়ন 'নট্'। একটা টিপা-লাইট আমার হাতে, আরেকটা বাবার—ডাইনটিকরির জঙ্গলে আমরা 'ফোকাস' ফেলছি আড়াআড়ি। অকস্মাৎ একটা 'খেড়িয়া'র বাঁ-চোখে পড়ল আমার আলো, ডান-চোখে বাবার। খরগোশটা সামান্য লাফিয়ে উঠে 'চিঁড়রা' অর্থাৎ কাঠবিড়ালির মতো সামনের দু'পা জড়ো করে

বোধহয় প্রাণভিক্ষাই চেয়েছিল। এমন সময় খাঁদুকর্তার বন্দুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল তার ধুক্‌পুকিটা। হৎপিণ্ডটা ছিট্‌কে বাইরে এসে মাটিতে পড়ে লাফাচ্ছিল ব্যাঙ-টুনির মতো। সেই পাপেই কি আজ গুলিতে এফোঁড়া-ওফোঁড় হয়ে গেল বাবারও ধুকপুকিটা? এখন আবার আমার! অথচ খাঁদুকর্তা তো দিব্যি বেঁচে আছেন বহাল তবিয়তেই!

পালাব কি? ডাইনে-বাঁয়ে-পিছনে—যে কোনও দিকেই যদি দৌড়ায় লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে, ভালুকঝোড়-ঝিঁকরঝোড়, বরা বা শিয়ালঝোড়ের অলি-গলির ভিতর দিয়ে, মিলিটারি পুলিশগুলোর সাধ্য কী পিছু পিছু দৌড়ে আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে! তবে ওই একটাই ভয়—পিছন থেকে যে কোনও মুহূর্তে বন্দুকের 'ঘড়া' টিপে দেখামাত্রই 'ফ্যাত" করে গুলি মেরে দেবে পিঠে! আমাকে তাদের আর দরকার কী! আমি তো অতিরিক্ত ফালতু!

কিন্তু আমার বাবা-মা? তাঁরা যে এখনও পাশাপাশি শুয়ে পড়ে আছেন গাড়িতে! কথার কথা, একজন না হয় 'মরা', আরেকজন তো 'অ-মরা'। তাঁর বেলা?

আর না-দৌড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপচাপ, দেখি-ই না ওরা কী করে! এখন তিন-তিনটে গাড়িই আমার সামনে। আমাদের গাড়িটা মনে হল গতি কমিয়ে সামনে না গিয়ে ক্রমশ পিছিয়ে আসছে। ওরা ভেবেছে কী-জঙ্গলের মাঝখানে আমাকে গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে হেনস্তা করবে? কী রকম হেনস্তা—বনে-বিভুঁইয়ে একলা পড়ে থাকলে আমাকে বাঘে-হুঁড়ারে ভালুকে-ল্যাকড়ায় খেয়ে ফেলবে? দিনের পর দিন অনাহারে থেকে খেতে না পেয়ে কাঠ হয়ে শুকিয়ে মরব? আর তাছাড়া, 'বনপার্টি'রা এসে আমাকে কুড়িয়ে পেয়ে তাদের দলে ভিড়িয়ে 'গাপ্' করে দেবে?

আহা, ওরা তো আর জানে না, ভাদুতলা-শালবনি-আসনবনি পিংবনি-কাঁটাবনি-জামবনি বেলপাহাড়ি-কাঁকরাঝোড়-কাঁটাপাহাড়ি তপোবন-কমলাসোল-পাঁচকাহিনার জঙ্গলে আর বাঘ তো বাঘ, একটা বাঘারোল-হুঁড়ার-ল্যাকড়াও পাওয়া যাবে না, ওই বড়োজোর একটা-দুটা-বর্‌হা-ঝিঁকর-খেড়িয়া-খেঁকশিয়াল, ভালুকেরও আজকাল আকাল! ভালুকওয়ালা—অবশ্য একটা-দুটা নাকে দড়ি বেঁধে খেলাতে নিয়ে আসে, তাও তো কালেভদ্রে! তবে—"হুপ্ হুপ্"—বস্তর হনুমান আছে বইকি এ দিগরে। কখনও বটগাছের ঝুরি ধরে দোল খাচ্ছে, কখনও ডুমুর গাছে-পাকা ডুমুর যত না পেড়ে খাচ্ছে, তার থেকে ছড়াচ্ছে বেশি গাছতলে। ওই, ওই—যেখানে জঙ্গলের মাথায় চাঁদোয়ার মতো চাঁদের আলো ফুটেছে, আলো-কেও মনে হচ্ছে ধোঁয়া, ধোঁয়া ধোঁয়া—সেখানে "হুপ্" করে একটা আওয়াজ উঠল! ওই আরও দুটো-"হুপ্! হুপ!!"

বাবুরা, জঙ্গলে খাবার-দাবারের অভাবের খোঁটা দিচ্ছ, বলি, তা হলে শোনো—

বৈশাখ-জ্যষ্ঠি-আষাঢ়, ফল-পাকুড় কুড়াবার পাতা ছিঁড়বার মাস। কেঁদ-কুসুম-কচ্‌ড়া-বেল-কোঁৎবেল বেলা-ভুড়রু-জাম-জামরুল আম-পঁড়স-খেজুর-বৈঁচি—গাছ থেকে পাড়ো আর খাও! শালপাতা ছিঁড়ে থাকা বানাও দোনা বানাও। আর কেঁদ্‌পাতা তো 'বিড়ি-পাতা'—তোলো, বান্ডিল করো, শহর-বাজারে চালান দাও। 'সাত-নলা' 'লাটাচুলি' 'কাঁড়-কাঁড়বাঁশ' নিয়ে শিকারে যাও, 'দিশম্ সেঁদ্‌রা'য়। কয়ের-কপ্‌তি-গুরুর পাখ ট্যাসা-কেরকেটা- চড়ে-চটি বনি-গুয়ে বনি শিকার করো! খঙ্গা-বঙ্গা ঢ্যামনা-গোই-গোধি-সাপ গেঁড়ি-গুগলি খেড়িয়া-বর্‌হা-যত পারো ধরো। রিম্ ঝিম্ করে জঙ্গলে ঝড়িয়া-বর্ষা হলে জলে ভিজে মাটি 'বতর' হয়। বতর-মাটিতে পুঙ্ পুঙ্ করে 'ছাতু' ফুটে। শাল-পোঙড়া, সরুবালি, বড়বালি, কুড়্‌কুড়িয়া, কাড়্‌হান, পরব ছাতু, সাদা ভণ্ডা, লাল ভণ্ডা। আলু-তুঙা হয়—পানআলু খামআলু চুরচু আলো, আঁউলা-বাঁউলা। চিরোল-চিরোল পাতা গজায়, চ্যাঁকা-শুশ্‌নি-সরন্তি-ঘোড়াকানা-ঘল্‌ঘসি শাক লহ্ লহ্ করে। লই-লতিতে থোঁকা থোঁকা ফুল হয়, ফল হয়—বনপুঁই-বনকাল্লা-কুঁদ্‌রি-কাঁকড়ো। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে 'জনার' গাদর হয়, মকাইয়ে পাক ধরে। জঙ্গলের ভিতরে খাল-নদী-ঢড্‌হা —কংসাবতী-সুবর্ণরেখা-ডুলুং-কুবাই-তমাল-পারাং-শিলাবতী-সব জলে ভরে টই-টুম্বুর হয়। খল্‌বল্ করে ওঠে শোল-মাগুর-চ্যাঙ্ গোড়ুই, অল্প জলে ছির্ ছির্ করে পুঁটি দাঁড়িকিনী-চাঁদা-ধানাহুলু। বিলে-বাতানে বাঁধগোড়ায় কাঁদরে জলের ধারে নরম মাটিতে কাঁকড়া তার অতগুলো দাঁড়ায় আঁকিবুঁকি কাটে, গর্তে ঢুকে জলে 'বুজবুজি' তোলে। বুজবুজি দেখে গর্তের পাশে 'গজাল' গুঁজে দিলেই কাঁকড়া বেরিয়ে আসবে চাপে পড়ে। তখন মারো রে, ধরো রে! কার্তিক-অঘ্রান-পৌষ, ধান কাটা ধান তোলার কাল, শুখা মরশুম। ঠোঁট ফাটে, গায়ে খড়ি ফুটে। যার ধান সে কাটে, সে তোলে। আমাদের আর কী! ধানে-কাটা-ন্যাড়া মাঠে পড়ে থাকা যা ধানের শিষ, ধানের 'টুঙ' কুড়াই আমরা—"খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি।" ধানবিলের 'হিড়' কেটে ইঁদুরের 'গাড়্‌হা' থেকে ইঁদুর-ধান যেটুকু পাই, সে তো পাই, তার সঙ্গে পেয়ে যাই ছোটো ছোটো লাল লাল চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল-কোঁড়ল ইঁদুর ছা। মা তো আমার সে সব গোটা গোটা মুখে পুরে কাঁচাই কচমচিয়ে চিবিয়ে খান! তাঁর দু'ঠোঁটের কষ বেয়ে তখন কাঁচা 'লোহু' ঝরে। আর, মাঘ-ফাগুন-চোত তো মধুর মাস। মহুলগাছে মহুল ফুলের মধু, চাক-ভাঙা মধু-খাওরে বেচোরে মদ 'চুয়াও'রে! তবে হাঁ, আজকাল জঙ্গলে 'বনপার্টি' এক সমস্যা বটে! বহিন নাঁকফুড়িকে কী 'বনপার্টি'-রাই 'গাপ' করেছে?

পিছোতে পিছোতে গাড়িটা আমার সামনে এসে 'ব্রেক' কষল। হুড়মুড় করে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল বন্দুকধারী মিলিটারিরা। আমাকে পাকড়াও করে বলল, "ক্যা, ভাগনে কো লিয়ে মতলব্ কিয়া?" আমি 'হাঁ' 'না'—কিছুই বললাম না। তবে হাত চাপাচাপিতে টানা-হিঁচড়ানে বুঝলাম—এ পর্যন্ত তাদের কাছে 'ফাল্‌তু' 'আবর্জনা' ছিলাম, এতক্ষণে ভারি 'দরকারি' হলাম। তারা টেনে-হিঁচড়ে আমাকে গাড়িতে তুলল, "চুপচাপ বৈঠ্ রহো! নেহি ত আঁখি বন্ধ কর লেট যাও!" আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে বসলাম—এখন ভারি তো দরকারি হয়ে পড়লাম। তবে কী এরা বাবা-মাকে 'হাসপাতালখানা'য় পৌঁছে দিয়ে আমাকে হাতে হাত করা পরিয়ে 'বনপার্টি'র লোক মনে করে জমা রেখে আসবে 'জিহলখানা'য়?

'জিহলখানা'কে বাবার বড় ভয় ছিল। আমিও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। এত জোরে কাঁপছি যে, দু'হাঁটুতে ঠক্কর লেগে খট্ খট্ আওয়াজ উঠছিল। এক বন্দুকধারী তার বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার হাঁটুতে সামান্য আঘাত করে বলল, "হিলতি কিঁউ র‍্যা? জাড়া লাগতি হ্যায় ক্যা?"

॥ আট ॥

তাহলে বনের রাস্তা 'ফুরাইল', এতক্ষণে শেষ হল। ওই তো বনধার! ঝোপঝাড় লাটাপাটা আর নেই, ছাড়া ছাড়া একটা-দুটা গাছ। বড় বড় গাছ, শাল-আসনগাছই হবে। রাস্তার দু'ধারে বড় বড় খুঁটির উপরে বিজ্‌লি-বাতি জ্বলছে। "গিড্ গিড্ দাগিন্ গেঁদা"—যেন মরা খুঁটির মাথায় আলোর ফুল ফুটেছে! পলাশ, সুরগুঁজা, ধাত্‌কি, কুড়চি-আঁটারি ফুল তো নয়, এ হল 'বিলাইত' ফুল, আলোফুল। কবে যে এ জাতের ফুল আমাদের ঝিটকার জঙ্গলেও 'ধব্‌ধবাবে'!



রাস্তার চলমান বিজ্‌লি-আলো গাড়ির ভিতরে এর-তার মুখে পড়ে ঝিলিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুখগুলো কিন্তু যেমনকার তেমন, নির্বিকার। এখনও ঢুলছে। এত আলো, 'বোধহয়' শহর বাজার এসে গেল! তার মানে হাসপাতাল 'আইল'। হাসপাতাল যখন, 'জিহলখানা' আর 'ধূর নাই বঠে'। আমার হাঁটু-ঠক্‌ঠকানি কমল তো না, বরঞ্চ বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল। কে জানে কোন শহর! রাস্তায় বিপরীতে ছুটে-যাওয়া গাড়ি ভট্‌ভটি দেখা যাচ্ছে। তবে সংখ্যায় কম। ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পাতার ঝুপড়ি, বাঁশ বা শাল 'রলা'র ভুগ্‌ড়া তো নয়, সব 'পাকাঘর'। চুনের মতো সাদা। কোথাও বা ঠাকুর-থান, 'মন্দিল'। একটা-দুটো লোকও দেখা যাচ্ছে-ওই তো একজন, সাইকেলের 'রড়'-এ প্রায় শুয়ে পড়ে 'পেডেল' করছে! ঝাড় গাঁ না মেদিন্‌পুর? আমাদের কাছেপিঠে ওই দুটোই তো নামজাদা শহর-বাজার! তা বাদে আছে বটে 'সাপধরা' আর 'চাঁদাবিলা হেল্‌থ সেন্টার।' কিন্তু কোথায় চাঁদে আর মেনি বান্দরের—

একটা ঘণ্টা বাজল। একটা নয়, এক সঙ্গে অনেকগুলো। ঢং ঢং...!! 'হাঁটুয়া' ছা-ছানাদের ইস্কুলে এমনি করে ঘণ্টা বাজে—সে তো দিনমানে! তবে কী এখন 'রাত-ইস্কুল' চলছে? আমাদের গ্রামেও একটা 'রাত-ইস্কুল' ছিল—সেখানে যতসব বুড়োবুড়িরা পড়ত। হারানি-বেজু-কাঁদরুরা। পাড়রু চৈতন বিনন্দ আর আমিও ক'মাস ঢুকেছিলাম। আন্দাজে আন্দাজে, কখন বা বাইরে বেরিয়ে 'জন'-এর উদয় দেখে একঘণ্টা অন্তর অন্তর ঘণ্টা বাজানো হত—ঢং ঢং!! পড়াশুনা না হোক, ছাত্রসংখ্যা যত নগণ্যই হোক, ঘণ্টাটা বাজত 'ঘড়ি' ধরে। আসল কথা কি, পড়তে নয়, ঘণ্টা বাজাতেই যেত কেউ কেউ রাত-ইস্কুলে। -ঢং ঢং!! সে 'রাত-ইস্কুল' আর নেই, তবে ঘণ্টাটা আছে। গোলাকার পিতলের চাকতি, দড়ি-বাঁধা। আরেকটা কাঠের মুগুর। 'ঘড়ি' ধরে কাঁদরুর বাপ শরাবণ এখনও কী 'ঝড়িয়া' কী বর্ষায়। ঘণ্টা বাজান—ঢং ঢং!! আর বাজবে না—কেন না তিনিও তো 'কাটা-দুয়ারী' করে বেরিয়ে এসেছেন ঘর ঝেড়ে। তাঁর ঝুপড়িতেই তো বসত 'রাত-ইস্কুল'।

রাত-ইস্কুলে আরেকটা কাণ্ড হত। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে 'শীতলামঙ্গল' যাত্রাপালার 'মহড়া'। সে যাত্রাপালা গাওনা হত পৌষসংক্রান্তি অর্থাৎ মকরের দিন রাত্রে। সকালে স্নান, শীতলা-থানে ঘট-আনয়ন, দেহুরির পূজাপাঠ, তারপর বলিদান। 'খুকড়া বলি' 'পাঁঠা বলি'। তারপর বলির মাংস, পিঠাপুলি আর মদ খেয়ে খলা-আঙনায় গড়াগড়ি। রাতে-শীতলামঙ্গল যাত্রা। সারা বৎসর ধরে তার 'মহড়া' চলত ওই 'রাত—ইস্কুল'-এ। আমি পাড়রু চৈতন আর বিনন্দ—'নাচুনী' সেজে প্রথমে 'গরাম দ্যাব্‌তা'র বন্দনা করতাম। সেই বন্দনাগীত এখনও মনে আছে—

"এহি বাটে আসুছন্তি গাঁয়ের গরমে
উত্তর-দক্ষিণ পূরব পশ্চিম
তার নামে সঞ্জিয়া যোগাই মুইরে।
এহি বাটে আসুছন্তি মা যে শীতলা
রোগুনী-যোগুনী—ওলাওঠা বুড়ি
বসন্ত কুমারী—চামডলিয়া বুড়ি
তার নামে সঞ্জিয়া যোগাই মুইরে।।"

ঘণ্টা-বাজা থেমে গিয়েছে। লোকজন বাড়ছে, বাড়ছে আলোও। কথাবার্তাও। মাহাতো-কথা শোনা যাচ্ছিল। দু'জন সাইকেল আরোহী পাশাপাশি যেতে যেতে যেন এ ওকে বলছে, "ধুর্ ব! কালে ল্লে হামি বইল্যে আস্‌ছিন্ ওই এ্যাকেই কথা ন, বাল্ তর্ কে শুনছে!" সাইকেলবালা কাল থেকে কাকে যে কী কথা বলে আসছে, আর তাকে বলা সে কেন যে শুনছে না! তার জন্য সে

এখন 'মুখ-খারাপ' করছে। জানা গেল না, জানা গেল না। আচ্ছা 'ভালা', কাছাকাছি কী হাসপাতালখানা আর 'জিহল্‌খানা'? আমার চোখ-কান গোগ্রাসে গিলে চলেছে, শুনে চলেছে। আর, হাঁটুজোড়ার ঠক্‌ঠকানি বাড়ছে। এর আগে কোনওদিন তো শহর-বাজারে আসিনি! হাত দিয়ে দু'হাঁটুর মাঝখানে 'ইয়ের' জায়গাটা দেখলাম কেমন যেন 'ভিজা' 'ভিজা' লাগছে! তবে কী আমি 'মুত্যে' ফেলেছি ভয়ে! এতটা ডরপুক্! একটা ডরপেল্‌কা! অনর্গল ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে একটা লাল রঙের গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে হুঁকরে ছুটে গেল। মা-বাবার ভাবনা এখন মাথা থেকে উধাও।

উধাও। উধাও।

ওই তো একটা দোকান, পান-বিড়ির দোকান কী! ওই তো আরেকটা! সাঁক্ সাঁক্ করে পিছনে সরে যাচ্ছে দোকানপাট। রাস্তার আলো এসে বিঁধছে চোখে। জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে লাটায় পাটায় গাঁদার-গুঁদুর অন্ধকারে এমনিতেই আমাদের চোখে পাতার পিট্ পিট্ করে, আর এ তো আলোর বান-বন্যা! ভাল করে তাকাতেও পারছি না, সে না হয় চোখ বুজেই থাকলাম। কিন্তু, কিন্তু, এরপরেও 'কিন্তু' আছে—চোখ বুজে কান ঝুলিয়ে বালুতে মুখ লুকালেই কী আর 'খেড়িয়া'র ধুকপুকিটা রক্ষা পায়? ওদিকে খাঁদুকর্তার 'ছড়্‌রা' যে পিঠে এসে লাগল বলে! "রোজ রোজ ঘুঘু তুই খেয়ে যাস ধান। আজ ঘুঘু তোর বধিব পরান।"

অবশেষে গাড়ি এসে থামল। এই তাহলে হাসপাতাল! বড় বড় বাড়ি, কত ঘর! কত গাড়ি! হেথাহোথা খুঁটিতে বড় বড় আলো। আলোর চারধারে ধোঁয়া ধোঁয়া, তার চারধারে কত 'নির্‌ঘুইন্না পোকা'! কী পোকা? 'সালোই' কী? 'বাদৈল্যা'—ওই যারা বড়্ বড়্ করে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পরে পরেই খত্‌খানা থেকে, নোংরা-জবরার গাদা থেকে ভুস্ ভুস্ করে বেরিয়ে আসে। সারা আঙনায় ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। ফিনফিনে ডানা, সামান্য ওড়া-ঘুরা করলেই খসে যায়। তখন থুপ্ করে মাটিতে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। মাটিতে পড়লে গিনা তাটিয়ায় কুড়াওরে, বালির 'খলায়' ভাজোরে, কুড়্‌মুড়্ করে খাওরে! চাল-ভাজার মতো খেতেও তো মন্দ না। তা, ঝড়িয়া বর্ষার দিন তো গত হয়েছে কবেই! এমন অসময়ে বাদুলে পোকা আসবে কোত্থেকে! ওসব নির্‌ঘুইন্না 'পাদুরা' পোকা-টোকা হবে।

আগের গাড়ি দুটো একটু আগেই হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে পড়েছিল। তাদের ব্যস্ততা ভারি। গাড়ি থেকে নেমেই ছট্‌ফট্ করছে। গামবুট পায়ে খট্ খট্ আওয়াজ তুলে একবার এদিকে আসছে, একবার সেদিকে যাচ্ছে। আমাদের গাড়িটা ঢুকে পড়তেই তারা চারধার থেকে ছেঁকে ধরল। ততক্ষণে আমার বুঝি হয়ে গেছে! 'ঝরণ' তো শুরু হয়েছিল একটু আগেই, এবার তবে অঝোরঝরে নেমে পড়বে! আমাকে টানা-হিচড়ান করে নামিয়ে চালান করে দেবে 'জিহলখানা'য়! কিন্তু না, গাড়ির পিছনের 'ডালা' খুলেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমার মাকে নিয়ে। বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গাড়িতেই পড়ে থাকলেন বাবা, মাকে ওরা নামিয়ে রাখল মাটিতে। দু'জন পুলিশ হাসপাতালের অন্দরে ঢুকে পড়ল শশব্যস্ত হয়ে, হয়তো ডাক্তারের খোঁজে। এবার তারা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়েও এল, তাদের পিছন পিছন এল হাসপাতালেরই দু'জন লোক। হাতে খাটিয়ার মতো সাদা কাপড়ের দোলনা। মা-কে এবার তোলা হবে দোলনাতে।

গাড়ির ডালা খুলে ওরা যখন মা-কে নিয়ে নামানামিতে ব্যস্ত, তার আগেই 'চৈখের' নিমেষে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলাম আমি। যত আলো তত অন্ধকার। যেখানে যেখানে আলো পড়ছে, সেখানে সেখানে 'ফিন্ -ফুটা' জ্যোৎস্নার মতো আলোয় আলোময়। কিন্তু যেখানে আলো পৌঁছতে পারছে না, সেখানে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তার উপর ঝাঁকড়া শালগাছের ছায়া পড়েছে, পড়েছে 'পাকা ঘরের' ছায়া। হাসপাতালখানার চৌহদ্দিতে তো অভাব নেই শালগাছের, অভাব নেই পাকাঘরের। কত গাছ! কত পাকাঘর! বন-জঙ্গলের মতো মাঝে মাঝে রাতের পাখ, রাত-চরা গাছে গাছে 'কঁহরাচ্ছে,' 'ভদ্‌কাচ্ছে'। উপরের ঘরে 'ঝুরকা'য় 'ঝুরকা'য় আলো জ্বলছে, আলো জ্বলছে নিচের ঘরেও। কিন্তু যে-ঘরে আলো নেই সে-ঘরে একঘর কালাহাঁড়ি অন্ধকার। তার মধ্যে কোথাও এক জায়গায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছি, ধরা পড়লেই দৌড়ুব—রিট্‌পিটে দৌড়-দৌড় দৌড়-

ওদের জনাকয়েক মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালখানার বড়বাড়ির ভিতরে ঢুকল। হুটোপাটি করে ঢুকছে, যেন তাদের হাতে ফাল্‌তু ফাল্‌তু নষ্ট করার সময় নেই। যে ক'জন মিলিটারি পুলিশ বাইরে খামোকা দাঁড়িয়েছিল, তিনজন ড্রাইভার বাদে, তারাও ভিতরে ঢুকে পড়ল। তিন-ড্রাইভার একজোট হয়ে এখন 'সিগ্রেট' খাচ্ছে, মাঝে মাঝে কাশছে 'গয়ের' তুলে। কথা বলছে—কত কী কথা! "কৈ, বাবুরা হামাকে লিয়ে এ্যাকটা কথাও বলছে নাই!" বিস্মরণ হয়ে গেছি বাবুদের। অতিরিক্ত, ফালতু। ফালতু একটা লোককে কার-ই বা অত মনে রাখার দরকার। সেই বলে না—"কুথাকারের কে দুটো আমড়া ভাতে দে?" হাসপাতালের গেটের ওধারে বাজারের রাস্তায় এখনও লোক চলাচলের বিরাম নেই। আর হাসপাতাল যখন—সময় অসময় নেই—রুগি নিয়ে রুগির লোকজন তো আসবেই, আসছেও। হাসপাতালে যাঁরা ডিউটি করেন, তাঁদের কেউ কেউ ডিউটি সেরে এখন হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ওই তো একজন—সাইকেলে চড়ে গেট পার হচ্ছেন—পরনে কুঁচি দেওয়া সাদা শাড়ি, ফুলহাতা সাদা সেমিজ, মাথায়ও কী একটা সাদা ফেট্টি বাঁধা! দিঙ্ দিঙ্ করে আমার মনে পড়ে গেল 'বহিন' নাকফুঁড়িকে। হাত চলে গেল সুড়্ সুড়্ করে হাফ পেন্টুলের 'পাকিটে'। সুতোয় বাঁধা সেই দুটো 'রিঁ-রিঁ-আঁ' পোকা! 'বর-কইন্যা'। 'পাকিটে'র বাইরে এনে অন্ধকারেও টিপে টিপে দেখছি, আর অমনি একটা সাদা বিল্লি ঝুপ্ করে নামল আমার মাথার উপর দিয়ে। আচমকা আমাকে দেখতে পেয়ে মিঞে মিঞে গলায় ডেকে উঠল, 'মিঁ-এগ-ও।" আমিও ফিস্ ফিস করে উত্তর দিলাম, "হঁ-হঁ ডাক! ডাকরে নাকফুঁড়রি! 'ভাই' বলে ডাক বহিন! তোর ভাই এখন ভুখেল ফাঁদে পড়েছে।"

মিলিটারি পুলিশগুলো বন্দুক হাতে গট্‌মট্ করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে। নেমেই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। টর্চ জ্বেলে আমাকে খুঁজছে। তাহলে এতক্ষণে মনে পড়েছে তাদের—অতিরিক্ত, ফালতু লোকটাকে! তাদের ভাষায় কী যেন বলাবলি করছে। একবার তো বলল—"ঢেঁড়রি, কাঁহা গৈল বা!" কে 'ঢেঁড়রি' কী 'ঢেঁড়রি'—কিছুই তো বুঝছি না। 'ঢেঁড়রি' বলল, না তার অন্যকিছু—কে জানে! তারা টর্চের ফোকাস ফেলে সামনের সারামাঠটা টুঁড়ছে, শালগাছগুলোর উপরও তল্লাশি চালাচ্ছে। কিন্তু আমি তো দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছি একটা অন্ধকার ঘরে, পেট তাবুড় দিয়ে শুয়ে আছি একটা খোঁড়লে। 'টিপা লাইটের' ফোকাস এলেও পিছলে যাবে উপর দিয়ে। জানি, একবার হদিশ পেলে হয়! বুটের লাথিতে পিঠের চামড়া ফাটিয়ে ছাড়বে। তারপর হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিয়ে যাবে 'জিহলখানা'য়।

আমাদের গাড়িটা বাবাকে নিয়েই বেরিয়ে গেল সাঁৎ করে। হয়তো তারা যাবে আরও কোনও বড় হাসপাতালে। সঙ্গে গেল ক'জন বন্দুকধারী মিলিটারি। বাকি বন্দুকধারী আপাতত খোঁজাখুঁজি ছেড়ে একজায়গায় জড়ো হয়ে 'বোধায়' যুক্তি করছে, ফন্দি আঁটছে

তল্লাশি আরও কী করে জোরদার করা যায়। নাকি, একটা অতিরিক্ত, ফাল্‌তু লোককে খোঁজাখুঁজির আর কী দরকার বলে হাল ছেড়েই দিচ্ছে—ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবু ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। খোঁড়লের ভিতর থেকে মাথাটা সামান্য উঁচু করে দেখছি—জোড়া জোড়া পা, জোড়া জোড়া গামবুট, পায়ের ফাঁকে ফাঁকে আলো, পায়ের ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার। আমার হাফ-পেন্টুলের তলায় দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে প্রায় গড়িয়ে পড়া জলের ধারাকে দাঁতে দাঁত কামড়ে কোনওমতে আটকে রেখেছি, কিন্তু সেই বলে না, 'হাগা মানে না বাঘা', যেই জোড়া পায়ের হাঁটাচলা শুরু হল, মনে হল গামবুট-পরা-পাগুলো এগিয়ে আসছে এদিকেই, তখন আমার 'দমে' হয়ে গেল!

না, মিলিটারি পুলিশগুলো এদিকে এলই না, ওরা ওদিকে গিয়ে ধুপধাপ করে গাড়িতে উঠল। আরেকটা গাড়িও ছেড়ে দিল। এখনও উঠে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছি না, আরেকটা গাড়ি তো আছে! তবে তার লোকগুলো আর মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই, যে যেমন গাড়িতে উঠে আলো না জ্বেলে বসে আছে গাড়িতেই। কেন না তাদেরও তো ভয়ডর আছে—অন্ধকারে কে কোথায় আড়ালে-আবডালে,—বলা তো যায় না! খানিকটা মরিয়া হয়েই উঠে দাঁড়িয়েছি, গামছা দিয়ে পা মুছছি, আচমকা হেডলাইট জ্বেলে গাড়িটা ফিরে এল। বাবাকে নিয়ে যে গাড়িটা বেরিয়ে গিয়েছিল, সেটা না, একটু আগে যেটা রওনা দিয়েছিল, সেইটা। বিদ্যুদ্বেগে ফের খোঁড়লে শুয়ে পড়লাম, "নিচে হল্ হল্ উপরে তুলসীর জল।" কাছিম-তুল্য ঘাড়টা উঁচু করে দেখছি—-দু'জন মিলিটারি-পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে এল গট্ গট্। একজনের কাঁধে বন্দুক, হাতে ধরা কী একটা প্যাকেট। আরেকজন এদিক-সেদিক বন্দুক তাক করে তার পিছনে, বলা তো যায় না—!

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই প্যাকেট-অলা কাকে যেন হাঁক দিল! বাপরে! সে কী বাজ্‌খাঁই গলা! তার উপর পাকা ঘরের ভিতর সে ডাক 'ঠোকর' খেতে খেতে আরও আরও বড় হল, যেমনটা হয় আমাদের 'তিলকমাটিয়া হুড়ি'-তে। 'তিলক মাটিয়া হুড়ি'—সেও তো এমন চার-পাঁচটা 'পাকা-ঘরের' সমান উঁচু। সাইকেলে যাও, আর হেঁটেই যাও—ধার দিয়ে যেতে যেতে যদি কখনও হাঁক দাও, 'স্যা-ঙা-ৎ-হে-এ-এ-এ", তবে সে-হাঁক হুড়ির গায়ে 'ঠোকর' খেয়ে তোমার কাছেই 'ঘুরি আসবেক'—"স্যা-ঙা-ৎ-হে-এ-এ-এ", আর তুমি শুনবে, "আ-ছি-হে-এ-এ-এ!" কী মজার 'গ্যাড়াকল'!

'হুঁকরাতে' 'হুঁকরাতে গাড়ি দুটোই চলে গেল। বুকের উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া 'দেড়মনি' পাথরটা কে যেন সরিয়ে নিল! বা, তাও নয়, ঘরোয়ালি আজ রাতে 'ঢেকা-চাপা' দিয়ে রেখেছিল 'খুক্‌ড়া'টাকে, কাল সকাল হলেই কেটেকুটে খাবে বলে! তো সকালে কী মনে করে 'ঢেকা'-টা উল্টে দিল ঘরোয়ালি, বলল, "যা চরেঁ খা!" অমনি মুরগি ডানা ফট্‌ফটিয়ে 'আড়িশ' ভেঙে উড়ে উঠেই 'পগার পার'। আমার হল সেই অবস্থা। ধড়্‌ফড়িয়ে উঠে হাত-পায়ের 'আড়' ভেঙে গলায় গামছা জড়িয়ে রগড়াতে রগড়াতে অন্ধকার থেকে আলোয় এলাম। হাসপাতালে লোকজন এখনও ঢুকছে বেরোচ্ছে, কেউ সাইকেল টেনে নিয়ে ছুট্ লাগাচ্ছে, কেউ পায়ে হেঁটে 'সামাচ্ছে' ধীরে ধীরে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সাদা শাড়ি সাদা হাত-জামা, মাথায়ও সাদা রঙের কুঁচি-দেয়া টুপি, 'এড়ি'-তেভর দিয়ে সামান্য উঁচু হয়ে কাকে যেন খুঁজছেন। কাকে? হাতে প্যাকেট। যাকেই খুঁজুন, যাই ত! গলায় গামছা রগড়াতে রগড়াতে কাছে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, "জিআরপি'র গাড়িতে কী তুই ছিলি?" 'হাঁ' বললে কী হবে, 'না' বললেই বা কী হবে-'টুক্‌চার' ভাবলাম। মাথা নাড়লাম। ফের 'জিজ্ঞাস' করলেন, 'গাড়িতে যে রুগি ছিল—সে তোর কে হয়?" স্বীকার করব কী করব না? মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, "মা। হঁ-হঁ হামার মা বঠেন! তার কী হয়েছে?" সুন্দরী মহিলা, মনে তো হয় ভাগতর আর না হলে নার্স, বললেন, "কচি' তোর মা'র স্ট্রোক হয়েছে। বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাচ্ছে না।"

'স্ট্রোক'? কে জানে ওটা কী রোগ! আর বাহাত্তর ঘণ্টা, তাই বা হয় ক'দিনে। কে জানে! আমি আর কী বলব, মাথা নিচু করেই আছি। সহসা 'দিদিমণি' আমার হাতে একটা প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বললেন, "এই নে ধর, সি.আর.পি.এফ খাবার দিয়ে গেছে তোকে?" আমি হামলে পড়ে প্যাকেটটা নিলাম। খাবার? আহা, খাওয়া হয়নি কতকাল! সেই তো কুর্‌থির ডাল-! হ্যাঙ্‌লার মতো প্যাকেট খুলে গবাগব্ খেয়ে চলেছি, ডিম পাউরুটি।' রুটি-তরকারিও আছে। তখনও 'দিদিমণি' দাঁড়িয়ে। খাবার মুখে পুরে 'চাঙ্‌লাতে' 'চাঙ্‌লাতে' বললাম, "আর আমার বাবা?" হঠাৎ উথলে উঠল বুকটা!—"কে তোর বাবা?" বললাম, "মায়ের 'সঙে' এক গাড়িতেই তো ছিলেন!" কলরব করে উঠলেন দিদিমণি, "তবে যে ওরা বলল—বেওয়ারিশ লাশ!" বেওয়ারিশ লাশ! তার মানে? বুঝলাম না কিছুই? জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা এখন কোথায়?"

"মর্গে?"

'স্বর্গে' না 'মর্গে'—কী বলল? ঠিক বুঝতেও পারলাম না। দিদিমণি তো খটাখট্ আওয়াজ তুলে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলন উপরে।

॥ নয় ॥

হাসপাতাল ঘরের সিঁড়িতে বসে হা-ঘরের মতো খেয়ে চলেছি, ডিম-পাউরুটি শেষ, এবার রুটি-তরকারি। আমার আর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—সেই বলে কতকাল আগে চিচুড়গেড়িয়ায় বাপের আত্মীয় বাড়িতে কুরথির ডাল 'হাঁপরে' দু'মুঠো ভাত খেয়েছি! 'ভাগ্‌তর' না 'নার্স' দিদিমণিটা আমার হ্যাঙলার মতো মুখে-নাকে খাওয়া দেখে হয়তো লজ্জায় সরে পড়েছেন! খাওয়া সেরে 'পিঁড়হা' থেকে উঠে পড়লাম, হাত-মুখটা ধোওয়া দরকার, হাসপাতালখানায় তো জলের কোনও অভাব নেই! যেদিকেই শুনছি—কল থেকে জল পড়ার ছর্ ছর্ আওয়াজ। তিলক মাটিয়া 'হুড়ি'র সে-পাশে তপোবন জঙ্গল মহালে ঝড়িয়া-বরষায় যখন এ-লাটা সে-লাটা থেকে 'ঝোপ' আসে, উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়ে খাদে—তখনও এইরকম আওয়াজ হয় ঝর্‌ঝর্ অঝোরঝর। এঁটো-হাতেই কিছুক্ষণ সিঁড়িতে বসেছিলাম, তাহলে লোকগুলো তো খারাপ নয়? আমাকে মাঝে মাঝেই গাড়ি থেকে নামিয়ে একলা জঙ্গলে ফেলে রেখে 'টুকচার' রগড় করছিল বটে, তাবলে লোকগুলো 'ঠকবাক্' নয়। এই তো কেমন খাবারের ঠোঙাও দিয়ে গেছে মনে করে!

একটা কুকুর এসে সামনে বসল, সমানে লেজ নাড়ছে! খাবার তো নেই, হাতে-ধরা খালি প্যাকেটটাই তাকে দিলাম। সে তার সামনের দুটো পা আর দাঁত দিয়ে লোফালুফি খেলল, খেল না। আমি হাত-মুখ ধুতে টিপ্ কলের দিকে যাচ্ছি, কুকুরটাও চলল মুখে ঠোঙা নিয়ে। হঠাৎ কোত্থেকে যে এত রাগ চড়ে গেল মাথায়! "শ্লা, হামার বাপটা সরগে না মরগে, বহিনটা গাপ্-ঘরে, মা হাসপাতালে, আর তুঁই 'কালিয়া কুঁদরা' হামার পিছা ধরলি, ধের্ বাবা" বলেই 'ক্যাঁৎ' করে কুকুরটার লেজের দিকে একটা 'লাথ' কষালাম, কুকুরটা এত জোরে "কাঁই কাঁই" শব্দে 'হুরি' করে উঠল যে, কী বলব! কালো কুকুরটার চিৎকারে আরও অনেকগুলো কুকুর, হাসপাতালের আনাচে-কানাচে যে যেখানে ছিল, একসঙ্গে চিৎকার



করে ডেকে উঠল। 'তিলকমাটিয়া হুড়ি'র "স্যা-ঙা-ৎ হে-এ-এ-এ" ডাকের মতো সে চিৎকার হাসপাতালবাড়ির প্রতিটা ঘরে গমগমিয়ে বাজল, আর তারপর কুকুরগুলোও দৌড়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরে 'ভুঁকতে' লাগল। বাবারে বাবা! এত মিল-মিশ্। এতটা 'একসঙ্গে থাকা'! আসলে কুকুরগুলোই 'চিহ্নত' করে দিল আমাকে। হাত-মুখ-ধুয়ে যখন ভাবছি-গামছাটা পরে 'অদা' পেন্টুলটা জলে ভিজিয়ে কোথাও 'ঘেঁটে' শুকোতে দেব, ভাবছি—আমার তো আরেকটা পেন্টুল ছিল মায়ের গাঁটরিতে, গাঁটরিটা কোথায় কখন হাত-ছাড়া হয়ে গেল, নাকি তাড়াহুড়োয় মাকে গাড়িতে তোলার সময় গাঁটরিটা মনে করে তুলতেই ভুলেই গিয়েছি আমি—তখনই কী না হাসপাতালের রাতের পাহারাদার কুকুরের দঙ্গলের মাঝখানে আমাকে আবিষ্কার করে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'কৌন হো তুম? হিঁয়া ক্যা করতা?' আমি তাঁকে হাসপাতালে মায়ের ভরতির কথা, 'ডাগ্তর দিদিমণি'র প্যাকেট করে খাবার দেয়ার কথা, খাবার খেয়ে টিপ-কলে হাত ধোয়ার কথা যথাসম্ভব গুছিয়েই বললাম। কিন্তু সব কথা শুনেও তিনি যেন কোনও কিছুই শুনলেন না। বললেন, ভিজিটিং 'আবার' খতম্ হো চুকা বা। আভি আভি তুমলোগকে বাহার যানা-ই পড়ে গা।' তিনি আরও জানালেন, 'গরমেন্ট ডিপটি'তে তিনি নাকি বরাবরই খুব কড়া আছেন।

'ভিজিটিং আবার' 'গরমেন্ট ডিপটি' কী জিনিস—জানা নেই আমার, জানার কথাও নয়। ঝিটকা, মাব্বু-ডুব্কা কী কাদাসোলের জঙ্গলে কখন কোথায়—ছিপ্ছিপে ঝিপির ঝিটা 'ছাগল-ভিড়কালো' বৃষ্টি হলে 'সাদা বালি' না 'বড়বালি', হড়্বড়িয়ে বড়-ফোঁটার ধারা নামলে 'কাড়্হান' না 'কুড়্কুড়িয়া' ছাতু ফোটে, 'ঝরণ' ধরলে কোন খালে কোন কাঁদরে না বাঁধগোড়ায় ডিমাল-কাঁকড়া বুজ্বু করে জল তোলে, 'লাটাচুলি'-'সাতনলা' কাঁধে নিয়ে ঘুর্ ঘুর্ করলে কোন 'লাটায়' কোন গাছের মগ-ডালে কপ্তি ক্যাকরেটা বসে বসে ঝিমোয়, শিস্ দিলেই খাঁচার 'কয়ের' খাঁচার 'গুঁড়ুর' ডাকতে শুরু করলে কোথায় কোন ডুংরিতে কোন বনধারে গলা কাঁপাতে কাঁপাতে "ক-এ-ক-ক" কী "গু-ড়্-ড়্-ড়্-ড়্" ডাক ছেড়ে দৌড়ে আসবে বনের 'পাখ'—সে সব মুখস্ত ধরো বলে যাব গড়্ গড়্ করে! কিংবা 'টুইলা'য় তার টেনে গাইতে বলো গেয়ে যাব 'উধাস' হয়ে-

'এ হাটর পাঁচ পাইক দেউয়ছি হাঁক-ডাক
হাট সরি গনে ভেট পাউ নাই
কী রে মন জানু নাহি কি—
আ গো মোহে পড়ি ভুলা মন ভুলু কাঁহি কি।
জাগিছি কাল চঞ্চলা-
জানু নাহি কি সোনার পিঞ্জরে শুয়া
দিন কাটে নুয়া নুয়া—
শুয়া উড়ি গনে ভেট পাউ নাহি কি
শূন্যরে ভাসুছি ভেলা—মন শুনু নাহি কি।"
[ভবের হাটে পাঁচ পাইক ডাক দিয়েছে
হাট-শেষে তারা ভেট নেবে
মন তুমি কী জানো না—
ওগো, ভোলা মন, তুমি ভুলছ কেন মোহে পড়ে।
জেগে আছে কাল-চঞ্চলা
জানো নাকি সোনার খাঁচায় হিয়া
নব নব দিন গত হলে—
হিয়া-পাখি উড়ে গেলে—কে ভেট দেবে-
শূন্যে ভাসছে জীবন-ভেলা-মন, শুনতে পাচ্ছ না"']



রাতের পাহারাদার লোকটাকে 'বাপ' পর্যন্ত বললাম, দেখুন বাবা, এখন ত আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নাই। জঙ্গলে আমাদের ঘর—সে ঘরে 'কাঁটা দুয়ারী' করে এসেছি আজ প্রায় তিনদিন হতে চলল! তার পিছকে বাপটাও গেল, মায়ের নাকি 'স্টোক' হয়েছে, বাঁচবে কী তার ঠিক নাই। এর'ম অবস্থায় রাতটুকুন যদি থাকতে দেন বাবা—তবে ভারি 'উবগার' হয়!' গেটের কাছে টুলে বসে হাতের চেটোয় খৈনি ডলতে ডলতে পাহারাদার লোকটা জানতে চাইল, 'কান্টাদুয়ারী? উহ্ ক্যায়সা চিডজ হ্যায়?' বুঝলাম ত্যাঁদোড় লোকটা একটুন নরম হয়েছে, এদিকে খেয়েদেয়ে আমার মনটাও ভাল ভাল, টুলের কাছে থ্যাব্ড়ে মাটিতে বসে পড়ে দু'হাঁটুতে দু'হাত রেখে তার সঙ্গে জুড়ে দিলাম 'কাঁটা-দুয়ারী'র গল্প। সবটা বাবা-মা জানে, তবু আমি যেটুকু জানি।

গ্রামে-ঘরে ভূত-প্রেত ডাইনি-যুগনী তো আছেই। বাটে-ঘাটে টাঁড়ে-টিকরে গাছে পাল্হায় বিলে-বাতানে কোথায় না 'তেনারা' থাকেন! "সবু পরব ভালা ঘুরি ঘুরি আও তো মানুষ ম-র-লে নাহি আওয়ে"—মায়ের সেই কথা! সব 'পরব' উৎসব অনুষ্ঠান ঘুরেফিরেই বছরের কোনও-না-কোনওদিন আসেই, কিন্তু মানুষ একবার মরে গেলে আর আসে না। আসে না বটে, তবে ঘরে ফেরার, ঘরের লোকেদের কাছে আসার 'আহিঙ্কা' টুকুত থাকেই। তাই তারা ঘরের আশপাশেই ঘুর্ ঘুর্ করে, এ-গাছ সে-গাছে মাঝে-মাঝেই ঝাঁপ দেয় ঝুপ্ করে, গাছের ডাল ভেঙে দেয় মট্ করে হঠাৎ হঠাৎ। এসবই ফাঁকতালে ফেলে যাওয়া নিজেদের ঘরে ঢুকবার ছল। তার উপুর আমাদের গ্রামটা তো বাঁধ্গোড়ায় অঝোরঝর জঙ্গলের ভিতরে। কতরকম ঝাঁপুড়-ঝুপুড়—নিম-বাঁশ-চল্লা-তেঁতুল-জইড়-বড়-মহুল-কুচ্লা কেঁদ-কুসুম-শাঁস্ড়া-পাকৌড়-ভাদু-ভেদা-বাদ্ভেলা-গাছপাল্হায় ঢাকা। যেমন আমাদের ঘরের 'ছামু'তেই তো আছে বেল-ডুমৌর, একটা

কাঁটা-ভরতি 'ভাবুর' আর কুচলাগাছ!—এ সমস্ত গাছে নানারকম ভূত-প্রেতের বাস। বর্‌হমভূত, গোমুহাভূত, ঝাঁপড়ি, ধন-কুদ্‌রা, কাইলা-কুদ্‌রা, কাল্‌-মুহী, চিরিকিনী—

'চিড়িকিনী'—ওই যারা নদীর বালুচরে, শ্মশানে খাল-মোহানায়, ঢড়্‌হা-ধারে, উদমাডাঙায় ভরসন্ধ্যায় রাতের অন্ধকারে কখনও একটা, কখনও দুটো হয়ে 'চিড়িক্‌' 'চিড়িক্‌' করে জ্বলে, জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশ এগিয়ে আসে গাঁ-গঞ্জের দিকে, মকাই-বিলের টোঙে লোভে লোভে, বিশেষ করে অবিবাহিত একলা যুবকের কাছে—তারা কেউই রক্তমাংসের মানুষ নয়, সব অশরীরী, ভূতপ্রেত! সব মেয়েমানুষ মরলেই তো আর ভূত হয় না, ভূত হয় তারাই—যাদের 'আহিঙ্কা' থাকে, যারা আত্মহত্যা করে, আর যারা গর্ভবতী অবস্থায় পেটে সন্তান নিয়ে মরে, যাদের পোড়ানো হয় না, মরলে যাদের মাটিতে 'তুপে' দেওয়া হয়। গলায় দড়ি দিয়ে মরলে-সে একটা 'চিড়িকিনী' হয়, দপ্‌ করে একটা আলোই জ্বলে, গর্ভাবস্থায় সন্তানসহ মরলে দুটো। দপ্‌ দপ্‌ করে আগে-পিছে আলো জ্বলে দুটো। 'বর্‌হম' ভূত তো মহাঘোড়েল ভূত! কখন যে চুপিসাড়ে ছল্‌ করে ঢুকে আসে 'একদমে' মাঝু-ঘরে! একবার হয়েছিল কী, আমাদের গ্রামের বধিরাম মাঝরাতে টোকা মাথায় মাছ ধরা 'ঘুনি' হাতে বেরিয়ে পড়েছিল বাঁধগোড়ার দিকে, বিলে-বাতানে। সঞ্ঝা থেকেই দমে 'ঝড়িয়া' হচ্ছিল, মাঝরাতের দিকে একটু যা ধরেছিল। বধিরাম জানে, এ সময় আল-কাটানে জুত্‌ করে 'ঘুনি' পেতে দিলেই চ্যাঙ-গোড়ুই-পুঁটি-সরপুঁটি ছল্‌ছলিয়ে ছাঁকা হয়ে উঠে আসবে! বধিরাম বেরিয়ে গেল আর ঝুপ্‌ করে 'বর্‌হম ভূত' বেলগাছ থেকে নেমে সোজা ঘুমে-কাদা বধিরামের বউয়ের পাশটিতে শুয়ে পড়ল রুম্‌ রুম্‌। মাছটাছ ধরে ঘরে ফিরে গলা-খাঁকারি দিয়ে বধিরাম বউকে ডাকছে, 'এ মড়ি, খুল্‌। আগুড়টা খুল্‌ ন-দেক্‌ ন মার কত মাছ এনেছি!' স্বামীর ডাকে ধড়্‌-ফড়িয়ে উঠল বধিরামের বউ। 'এ্যাঁ? ডাকছে বধিরাম? বিছানায় পোঁদ উল্টে শুয়ে আছে এ বেধুয়ামড়া কে তবে? কে-এ-এ-এ?' বুদ্ধি করে বধির বউ 'মাচিস্‌-কাঠি' জ্বেলে যেই 'আগুড়'টা খুলেছে অমনি বধিরাম ঢুকে পড়ল, আর সে বেরিয়ে গেল! জাপটে ধরেছিল বইকি —কেমন সারা গা রোঁয়া রোঁয়া, কাল্‌হা, হিমঠান্ডা! এতটাই ত্যাঁদড় বেলগাছের 'বর্‌হম ভূত'! আর "কালিয়া কুদ্‌রা বাড়ির ভূত। খুকড়া দিলেই চাপচুপ।" সে তো যেন ঘরেরই ভূত, নিয়মিত তার উদ্দেশ্যে মুরগা বলি দিলে তবে সে চুপ থাকে। নচেৎ সারারাত ধরে যা-তা কাণ্ড করে। হনুমানের মতো গাছে গাছে লাফায়। ধুপ্‌ ধাপ্‌ করে লাফ দিয়ে গৃহস্থের ঘরের চালে গিয়ে পড়ে। চালের খড়-পাতা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতে চায়। কালো ছাগল খায়, শূওর খায়।

আমাদের কেউ মারা গেলে তাকে কাপড়ে মুড়ে 'বাবোই-দড়ি'র খাটিয়ায় শুইয়ে চারজন লোক কাঁধে তুলে দাহ করতে শ্মশানে নিয়ে যায়। শ্মশান যাত্রার সময়কালে তার মাথার কাছে অবশ্য অবশ্য রাখতে হয় লোহার 'জাল-কাঁঠি' অথবা লোহাধাতুরই অন্য কিছু জিনিস। অন্যথায় কোনও অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা তার দেহের ভিতর ঢুকে পড়ে। শ্মাশানযাত্রীদেরও ছুঁয়ে থাকতে হয় লোহার 'দব্ব'। দাহ-টাহ হয়ে গেলে ফেরার সময় খাটিয়ার দড়ি দিয়েই মড়ার খাটটাকে কোনও গাছের সঙ্গে বেঁধে সে-খাট বা দড়ি ডিঙিয়ে পার হতে হয় শ্মশানযাত্রীদের। পেরিয়ে এসে যাকে পোড়ানো হল তাকে মনে করেই জনে জনে বলতে হয়, "ঘরে আর তুই আসতে পারবি না। তোর আসার পথে এই আমরা কাঁটা বিছিয়ে দিলাম।" আমরাও যখন ঘর ছেড়ে চারজনে—মা, বাবা, নাকফুঁড়ি আর আমি—বেরিয়ে এলাম তখন আমাদের বাবাই আমাদের ছেড়ে আসা ঘরে 'বর্‌হম' 'কুঁদরা' বা আর কোনও দুষ্ট প্রেতাত্মাই যাতে না সেঁধোতে পারে, তার জন্য বিড়্‌ বিড়্‌ করে মন্ত্র পড়ে ঘরের দুয়ারের মুখটায় আচ্ছা করে 'ভাবুর-কাঁটা' বিছিয়ে রেখে এসেছেন—দারোয়ান বাবা একেই বলে 'কান্টাদুয়ারী'! 'হাঁ, হাঁ'—বলে হাতের তালুর দলা-খৈনি মুখে পুরে 'গরমেন্টের ডিপটিবালে' দারোয়ানটি খানিক চোখ বুজে থাকল। তারপর চোখ খুলে তার বাঁদিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে পু-চু-র করে একদলা 'ছেপ্‌' ফেলে বলল, 'কান্টাদুয়ারী বারে মেঁ যো কুছ বোলা-মুঝে সমুচা সমঝ্‌ লিয়া। কাহে ন সমঝে? লেও বেটা, পহেলে হম্‌ ভি তো গাঁওকালে আদমি থে! লেকিন আজকা হম্‌ দেহাত সে আকর শহরবালে 'বাবু' বনগয়ী—।' হাজারিবাগ জেলার গিরিডির আশপাশ শাল-মহুল-হর্তুকীর জঙ্গলের নজদিগ্‌ তারও নাকি গ্রাম ছিল। নিজস্ব খেতি-বাড়ি ছিল। 'গেঁহু-মকাই-অড়হর-মুসুরি-মুঙ্‌—ক্যায়া ক্যায়া চিজে আবাদ হৈন!' চোখ বুঝে দারোয়ানজি যেন মনে করে করে বলতে লাগল—'গাঁওকে আশপাশ পেড়্‌কা ডালমেঁ কেতনা ভূত-পিচাস দৈত্‌ দানা বর্‌হম দৈত্‌-কারিয়া পিরেত বা ইধর-উধর আগলবগলমেঁ ঠারতা হৈ, ঘুমতা-ফিরতা হৈ। 'কান্টাদুয়ারী' আভি হম্‌ সমঝ্‌ গয়ে বেটে, লেও।' বলে সে টুল থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

হাসপাতালেরই স্যুট-বুট পরা একজন লোক, হয়তো 'ডাগতর-টাগ্‌তর'ই হবেন, 'ভটভটি-বাইক' ঠেলতে ঠেলতে গেটের কাছে এসে গেলেন, অমনি পাহারাদার লোকটা তাঁকে লম্বা সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল। বুঝলাম—লোকটা পাহারাদারের বাপেরও বাপ 'বঠে'। এঁকে ধরতে পারলে রাতটা এখানেই নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেওয়া যায়! যেমনি ভাবা অমনি কাজ—কিন্তু ওই বলে না, "অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।" গেট 'খোলমাত্রই 'ডাগতর-ডাগতর' লোকটা বাইকে চড়েই 'কাঁড়-বাঁশ'য়ের ছেড়ে দেওয়া 'পাটন'য়ের মতো "ভুস্‌" করে কোনদিকে যে উড়ে গেল—টের পাওয়ার আগেই ততোধিক করিৎকর্মা পাহারাদার লোকটা গেট বন্ধ করে দিল "ঘড়াঙ" করে! 'মেঘ-পাতাল'-য়ে মেঘের ঝলকানির মতোই চকিতে মনে হয়েছিল বইকি—আমি কী গেটের বাইরে না ভিতরে? চোখ সয়ে যেতেই বুঝতে পারলাম—না, যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। রাতের পাহারাদার লোকটাও ফের টুলে বসে নিজের কথাই শুরু করল—এখন সে আর 'গাঁওবালে জংলি আদমি' নেই, রীতিমতো 'লিখহাই-পড়হাই' করা 'শউরে-পণ্ডিত আদমি'। হাসপাতালের 'কোয়াটারেই' থাকে। গুন গুন করে দু'হাতে তালি মেরে একটা গীতের দুয়েক কলিও শুনিয় দিল সে—"বুঝ বুঝ পণ্ডিত পদ নিরবাণ। সাঁজ পর কহবাঁ বসে ভন।। উঁচু নিচ পর্বত ঢেলা না ইঁট। বিনু গায়ন তহবাঁ উঠে গীত।।" কে জানে কী মানে! কিন্তু গান থামিয়ে সে যখন বলল —"জঙ্গল কী অনন্দরমেঁ যো লোগ রহতি, উহ্‌ তো জংলি আদমি, মতলব্‌ জানবর কী মাফিক, উহ্‌ লোগোনে তো 'জোঁদা', নালসে পিঁপড়া কা আন্ডা, চুহা-চুটিয়া খাতেই, ভূত-পিরেত, পিচাশ-উচাস বিশওয়াস করতেই, লেকিন—গাঁও ছোড়্‌কর শহর-বাজার আনেসে উহী ফিকির-উকির নাহী চলেগা"—তখন আমার রাগ চড়ে গেল মাথায়। আরে বান্‌চোৎ! কোথাকার শিয়াল পণ্ডিতরে তুই? তুই কী 'বি-ড়িও'-'এস-ডি-ও'-'ইস্কুল-নিসপেটর', আমাদের নদী সেপারের ভাঙ্গুসোল বড় ইস্কুলের 'হেড় মাস্টুর' দিবাকর বড়-পন্ডার থেকেও বড়? 'পঞ্চাৎ পরধান' মেনকারানী

সিং-ও কী তোর থেকে কম পণ্ডিত? সে তখনও বলে চলেছে—'শহর বাজার আনে সে ওহি প্রকার গাঁওকে রহনে বালা ভূত-বরহম্-দৈত্, কারিয়া পিরেত বা-সব লেজ গুটা কর দৌড়তে হৈ, ভাগতে হৈ। আরে বেটে, য়াঁহা শহর বাজার মেঁ ক্যাতনা নয়ী নয়ী চিজোঁ সে জান পহেচান হোতেঁ রহতেঁ হৈ—কি তুমলোগ ওহি সকল রুন্ডু-উরুন্ডু ভূতবালে কো ভুল যাবেই যাবে গা। মুঝে দেখ্—ওহি শালপেড়কে নিচে এহি গেটসে অন্দর হম্ টুলমেঁ বৈঠকর হররাত ডিপটি করছা। লেকিন—কোঈ ভূত—পিরেত পিচাস-উচাস আভিতক্ তো নাহি দেখা!' মাথা তুলে সত্যি সত্যিই গেটের কাছেই অবস্থিত সুবিশাল শালগাছটাকে দেখলাম। শহর-বাজারেও এমন অঝোর ঝর্ শালগাছ আছে তাহলে? তাও একটা-আধটা নয়, একসঙ্গে দু'-দশটা। বিজলিবাতির আলো পড়ে শালগাছের চক্‌চকে 'পাল্‌হা-পতর'গুলো আরই ঝকমকাচ্ছে। বিজলিবাতির 'পষ্ট' আলোয় দেখা যাচ্ছে-শালগাছের ঝোড়ে একটা জোড়-ছাড়া 'ক্যারকেটা' চোখের 'মাশড়ি' ঢেকে ঘুমোচ্ছে। কথায় আছে না-"জারকেটা পড়েছে ফাঁদে, মাছরাঙা ডাঙায় কাঁদে?" কসরকেটা আর ফাঁদে পড়ল কই? ওই তো সে এখন চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে শালগাছের মগডালে! বরঞ্চ 'মাছরাঁকা' হয়ে ডাঙায় ফাঁদে পড়ে আমিই তো 'কঁহরাচ্ছি' তার মানে কাঁদছি! শুনেছি 'বর্‌হম ভূত' নানান ভেক ধরে—কখনও 'ছুঁচিয়া' হয়ে "চুঁ-চুঁ" করে মানুষের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে চায়, আর গললেই তো মরণ! তে—রাত্তিরও পোহায় না। কখনও ভেক ধরে 'গো মুহা' অর্থাৎ গরুর মুখের। জুবুথুবু হয়ে বসে থাকে রাস্তার ধারে, 'মচর মচর' করে জাবরও কাটে। গায়ে মানুষের ছায়া পড়লেই ধারণ করবে স্বমূর্তি! আচমকা মনে হল—'ক্যারকেটা' কেন হবে, 'বর্‌হম' ভূতই ক্যারকেটা সেজে শালগাছের মগডালে মট্‌কা মেরে পড়ে আছে। শুনছে এই ভূতে-অবিশ্বাসী খৈনিখোর 'ডিপটিবালে' লোকটার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। জানে না তো, রাত নিশুতি হলেই "চা রা রা রা রা রা" করে লাফ দিয়ে পড়বে তার ঘাড়ের উপর—টেনে 'শাঁক-নলা' ছিঁড়ে ফেলবে না তার? সে-ভূত আবার আমার যেন কোনও ক্ষতি না করে বসে! তাই বিড় বিড় করে কড়ে আঙুল দাঁতে খুঁটে বুকে 'ছেপ' ফেলে বাপের কাছ থেকে শোনা 'মন্তর' আউড়ালাম—"চিৎপটাং দিঞে আছে দাঁত গিজৌড়ে। মরেঞছে না বেঁচেঞছে দেখ্ শালা চোখ তেড়ে।। মার শালাকে ধর শালাকে ফেল শালাকে কুল ঝাড়ে। চিৎপটাং দিঞে আছে দাঁত গিজৌড়ে।।"

হ্যান্-ত্যান্—কত কী ভাবছি, ভাবছি এই জন্য যে কী করে কড়া 'ডিপ্‌টিবালে' লোকটাকে পটিয়ে-সটিয়ে আজকের রাতটুকু হাসপাতাল চত্বরেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। এখনও তো গেটের বাইরে বের করে দেয়নি ঘাড় ধরে! মনে তো হয়—'কেরমে কেরমে' ধাতস্থ হচ্ছে লোকটা। ফের খৈনির 'গুটুল' বের করে দোক্তায় চুন মিশিয়ে 'ডলতে' শুরু করল সে। ডলতে ডলতে ভূত-পেরেত পিচাশ-উচাশ ছেড়ে এবার জিজ্ঞাসা করল—'জঙ্গলের অন্তরমেঁ আভি যা চল্‌রহা তা কী বিলকুল গরিব লোগোঁকো ভালাইকে লিয়ে? কা ফায়দা? কুছ্ বেনিফিট্ মিলতেই কী? মালুম হ্যায় ক্যায়া বেটা?' মালুম নেই মানে? হাড়ে হাড়েই তো টের পাচ্ছি। তবু কী বললে লোকটা খুশি হবে—ভেবে পাচ্ছি না। তাই চুপ করে আছি। "মালুম নাহী বা?" ফের জিজ্ঞাসা করায় জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। কথা বলার দরকার কী—'জ্ঞেয়ান' দিচ্ছে লোকটা, দিক। পাহারাদার 'ডিপটিবালে' মানুষটা এবার তরিবত্ করে খৈনি ডলতে থাকল চুপচাপ। থাপ্পড় মেরে ফুঁ দিয়ে খৈনির ধুলো উড়াল। তারপর ডানহাতের দু'আঙুলের চিমটে করে খৈনি তুলে মুখে পুরল। সবকিছুই লোকটা এত ধীরেসুস্থে ঠান্ডা মাথায় করে যাচ্ছে যে, দেখে-শুনে মনে হচ্ছে—তার চাইতে সুখী মানুষ ভূ-ভারতে আর বুঝি দুটি নেই। জানি এবার সে পুচুর করে থুতু ফেলবে, ফেললও। থুতু-টুডু ফেলে বলল, 'লেকিন-মালুম ক্যায়সে হোগা, বেটে! তু তো কাল-কা-যুগী, না-বালক আছে। সমঝ্ লে, ইয়াদ রাখ্-ইস্‌মে আচ্ছিতরোসে 'পলিটিক্‌স্ কা খেল্' 'নওটংকি' ছুপা রহতা হৈ। ব্যাস, খেল্ খতম! অব্ তু বাহার যা!' বলেই দরওয়াজা আটকে দিল দড়াম করে।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত





বড় গল্প

এক সফরেই

শেখর বসু

শতরূপা দেব যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান, তখন চেনা-অচেনা সবারই চোখ আটকে যায় ওঁর ওপর। এমন রূপসী কদাচিৎ দেখা যায়। লম্বা, ছিপছিপে, মাথায় একরাশ কালো, কোঁকড়ানো চুল। নাক, মুখ, কপাল, ভুরু কোনও শিল্পী বুঝি অসীম মমতা দিয়ে বানিয়েছে। আর গায়ের রং ফেটে পড়ছে যেন। সোনালি রোদ আর পাকা গম একসঙ্গে মিশে গেলে যেমন রং হয়, ঠিক সেই রকম গায়ের রং। কণ্ঠস্বর মধুমাখানো। লোকে বলে, অসুস্থ বাচ্চাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কিছুক্ষণ উনি কথা বললে নাকি বাচ্চাদের অসুখ ভাল হয়ে যায়।

প্রতিদিনই বেশ কয়েকজনের বাড়িতে যান শতরূপা। লোকে বলে, যেদিন যাদের বাড়িতে যান সেদিন তাদের দিল ভাল কাটে। কারও কোনও বিপদ-আপদ হলে সবার আগে সেখানে পৌঁছে যান শতরূপা।

স্থানীয় স্কুলের এক মাস্টারমশাই সেদিন বলছিলেন— শতরূপার দুটো মানে আমরা জানি। দেবী সরস্বতীকে শতরূপা বলা হয়। আবার বহুরূপ যেখানে একসঙ্গে মিশে কাউকে তুলনাহীনা করেছে— সেও শতরূপা। শতরূপা দেব সম্পর্কে ওই দুটো কথাই সমান সত্যি।

শতরূপা ওঁর রূপগুণের প্রশংসা প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার করে শোনেন, এবং পাঁচবারই ওই প্রশংসাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দেন।

কাজ বলতে পাঁচজনের কাজ। শতরূপা সমাজসেবিকা। গত পাঁচ বছর ধরে স্বার্থশূন্য হয়ে সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন। উনি কখনও কোনও সংস্থা গড়তে যাননি। কিন্তু ওঁকে ঘিরে রীতিমতো একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। ওই সংস্থার কাজের পরিধি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে রোজই।

শতরূপার দিন শুরু হয় ভোরের প্রথম আলো ফুটলে, সেইদিন শেষ হয় একটু বেশি রাতে। এত পরিশ্রম, কিন্তু ওর রূপ-লাবণ্যে তার কোনও ছাপ পড়ে না। শতরূপা মধ্যবয়সি, বয়েস বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় তিরিশের বেশি কোনও মতেই নয়। শতরূপাকে সবাই খুব ভালবাসে। এত ভালবাসে বলেই ওর জন্যে অনেকের একটু চাপা দুঃখ আছে। শতরূপা ডিভোর্সি। বছর-পাঁচেক হল ওর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। স্বামী পাশের পাড়াতেই থাকে। বিয়ের পরে অন্য একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে। তারপর শতরূপাকে ডিভোর্স করে সেই মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। বাচ্চাও রয়েছে দুটো। তারপরেই বেয়াড়া একটা অসুখে বিছানা নিয়েছে স্ত্রী। বাজে অসুখ, পুরোপুরি সুস্থ হওয়া ওর পক্ষে নাকি অসম্ভব।

লোকে বলে, এই হল পাপের শাস্তি। শতরূপার মতো মেয়েকে যে দুঃখ দিয়েছে তাকে তো কষ্ট পেতেই হবে।

শতরূপার প্রাক্তন স্বামী শিবব্রত কিন্তু ভালমানুষ, কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। পারলে লোকের উপকার করেন। কিন্তু হলে কী হবে? শতরূপার মতো মেয়েকে যিনি দুঃখ দেন, তাকে তো একটু কষ্ট পেইে হবে।

শতরূপা থাকেন ছোটখাটো মাপের বাগানওয়ালা পৈতৃক বাড়িতে। বাবা অনেককাল আগেই মারা গিয়েছেন। মা বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তিনিও বছর-দুয়েক হল গত হয়েছেন। শতরূপা ওঁর এক সম্পর্কিত ভাগ্নেকে এনে বাড়িতে রেখেছেন। ছেলেটি কলেজে পড়ে। গত পাঁচ বছর ধরে শতরূপার কাছে বিয়ের প্রস্তাব এনেছিল বেশ কয়েকটা, কিন্তু সব ক'টা প্রস্তাবকে উনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর বিয়ে নয়, যে ক'টা বছর বাঁচবেন সমাজসেবা ছাড়া আর কিছুই করবেন না।

শতরূপার জনপ্রিয়তা দেখে দুটি বড় রাজনৈতিক দল ওঁর কাছে এসেছিল সামনের পুরসভা নির্বাচনে ওদের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। দুটি দলই জানিয়েছিল— ওরা ওঁকে পুরসভার চেয়ারপার্সন করবে। দুটি দল পরস্পরের প্রতিপক্ষ, কিন্তু সবার জন্যেই তো শতরূপার দরজা খোলা। উনি দু'-দলকেই সবিনয়ে জানিয়েছেন—কোনও রাজনীতির মধ্যে থাকতে চান না উনি। কিন্তু জনকল্যাণমূলক কোনও কাজ করার ডাক পড়লে ছুটে যাবেন এবং সাধ্যমতো যা করার তাই করবেন।

কিন্তু রাজনৈতিক দলদুটো হাল ছাড়েনি। প্রায় নিয়মিত ভাবেই তদ্বির চালাচ্ছে শতরূপার মত পাল্টাবার জন্যে। উদ্দেশ্য একটাই— শতরূপা তুরুপের তাস, যে দলে যাবে সে দলের জিত হবেই।

শতরূপাকে ঘিরে জনকল্যাণমূলক যে সংস্থাটি গড়ে উঠেছে সেটির সব সদস্যই জানে— দিদি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন না। পুরসভার চেয়ারপার্সন তো মস্ত পদ, কিন্তু পদমর্যাদা বা ক্ষমতার প্রতি দিদি একেবারেই উদাসীন। মন্ত্রী হওয়ার জন্যে ডাক পড়লেও উনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন। ভোর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত আর্তের সেবা করা— এই হচ্ছে শতরূপার জীবনের ধ্যানজ্ঞান।

শান্তশিষ্ট এলাকা শ্রীপুর। দুশো বছরের প্রাচীন এলাকা। এককালে ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল এখানে। সেদিনের সেই চেহারাটাই অনেকখানি ধরে রেখেছে শ্রীপুর। বেশিরভাগ একতলা বাড়ি। বাড়ি ছোট হোক আর বড় হোক, প্রায় প্রতিটি বাড়ির সঙ্গেই ছোট-বড় বাগান আছে। এলাকার প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নামে চেনে।

এমন একটা শান্ত, সুন্দর এলাকায় এমন একটা নৃশংস কাণ্ড ঘটবে, কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ভোরবেলায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল খবরটা। নির্জন, গাছপালা ঘেরা ছোট মাঠের একটা জায়গা ঘিরে রেখেছিল পুলিশ, কিন্তু তাদের কর্ডন বারবার ভেঙে যাচ্ছিল ভিড়ের চাপে। বুকফাটা কান্নার আওয়াজও উঠছিল চারদিক থেকে। গাছের নিচে খুন হয়ে পড়ে আছে শতরূপা দেব। মাথায় ভারী কিছু-একটা দিয়ে আঘাত করে মারা হয়েছে। পোশাক-আশাক ছিন্নভিন্ন। থানার ওসির প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট : ইট'স এ ক্রাইম অফ প্যাশান। শি ইজ রেপড অ্যান্ড মার্ডার্ড।

কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল সব জায়গায়। ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে শতরূপাকে। পৃথিবীতে এমন পশুও আছে!

শতরূপার জনকল্যাণমূলক সংস্থার লোকেরা জানাল— দিদি কাল দূরের একটা গ্রামে সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ার পরামর্শ দিতে গিয়েছিলেন। কীভাবে কী করতে হবে— সব জানাতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। ওই গ্রামের লোকরা দিদিকে শ্রীপুর পর্যন্ত পৌঁছে

দিয়েছিল। বাড়ি পর্যন্ত আসতে চেয়েছিল, কিন্তু দিদি রাজি হননি। বলেছিলেন— এ তো আমার পাড়া, এখানে কোনও ভয় নেই, তোমরা ফিরে যাও। ফেরার পথ তো অনেকটা। রাস্তা ছেড়ে শর্টকাট করার জন্য নির্জন পার্কের পথ ধরেছিলেন দিদি। ওখানেই ভয়ঙ্কর এক খুনি জঘন্যতম এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।

বেলা যত বাড়ছিল, ভিড় তত বাড়ছিল। আগে কান্নাকাটি ছিল চারদিকে। এখন কান্নাকাটির বদলে উত্তেজনা। খুনিকে ধরার দাবিতে ক্ষেপে উঠেছিল জনতা।

শ্রীপুর থানার ওসি অবনী ঘোষরায়। বিশাল চেহারার জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। মাসকয়েক হল এখানে এসেছেন, কিন্তু এলাকা আশ্চর্য রকমের শান্ত বলে ওঁর তেমন কাজকর্মও ছিল না। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটনাটা ঘটে গেল। শতরূপা দেবের বদলে অন্য কেউ খুন হলে অবস্থা বোধহয় এ ভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার দশা হত না।

উত্তেজিত হয়ে থানার বড়বাবু সহকর্মীদের ধমকাতে শুরু করলেন : তাড়াতাড়ি কাজ সারো। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি উনি কাজ সারতে চেয়েছিলেন তত তাড়াতাড়ি সারা গেল না। কিন্তু শেষ হল এক সময়। পুলিশের ফোটোগ্রাফার এসে নানা দিক থেকে একগাদা ছবি তুলল মৃতদেহের। মৃতদেহের কাছাকাছি হাত-তিনেকের ভারী একটা লাঠির মতো দেখতে কাঠের টুকরো পাওয়া গিয়েছে, সেটাকে খুব সাবধানে কাপড়ে মুড়ে তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপর বডি পাঠানো হল পোস্ট-মর্টেমের জন্য।

খুনের জায়গাটা ছোট খুঁটি পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে দু'জন কনস্টেবলকে পাহারাদারির কাজে রেখে থানায় ফিরে এসেছিলেন ওসি ঘোষরায়।

ছ'মাস হল এই থানায় বদলি হয়ে এসেছেন অবনী ঘোষরায়। এমন শান্তিপূর্ণ থানা-এলাকা ঘোষরায় ওঁর গোটা কর্মজীবনের আর কখনও পাননি। পুলিশি ভাষায় যাকে বলে 'ইনসিডেন্ট ফ্রি' এরিয়া— এই এলাকাটা গত পাঁচ মাসে ঠিক তাই ছিল।

পাঁচ মাসে গোটা-তিনেক ছিঁচকে চুরি, গোটা-দুয়েক ছোটখাটো মারামারির ঘটনা ছাড়া আর কিছুই ঘটেনি।

থানার সবাই বেশ আরামে ছিল, কারও-কারও দিবানিদ্রার অভ্যাসও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনই দেখা দেয়নি।

এই এলাকায় সংস্কৃতির চর্চা একটু বেশি পরিমাণে হয়। ঘোষরায়ের কাছে নেমন্তন্ন আসত প্রায় প্রতিটি সংস্থার পক্ষ থেকেই। তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সভায় যেতেন। বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর হাততালিও পেতেন। চা-মিষ্টি খেয়ে ফিরে আসতেন আবার থানায়।

ঘোষরায় লক্ষ করেছিলেন, ওঁর বক্তৃতা উত্তরোত্তর ভাল হচ্ছে। একবার-দুবার ছোটখাটো মাপের কবিতাও আবৃত্তি করেছেন। বাহবা পেয়েছেন বেশ বড় রকমের। শেষের দিকে ভাবতে শুরু করেছিলেন— উনি আসলে সংস্কৃতি জগতের মানুষ কিন্তু এতকাল ধরে অপরাধী ঠেঙাচ্ছেন স্রেফ পেশার চাপে পড়ে।

থানায় তিনটে লক-আপ আছে, কিন্তু সেগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকত। এক মাস আগে খুব ধুমধাম করে শীতলা পুজো হয়েছিল শ্রীপুরে। ওই সময় কনস্টেবলদের শ্বশুরবাড়ির কয়েকজন আত্মীয়স্বজন এসে থানার লক-আপগুলো হোটেলের ঘরের মতো ব্যবহার করেছিল।

বড়বাবু খুব কড়া ধাঁচের অফিসার, কিন্তু তিনি আর আপত্তি তোলেননি। কেন না এলাকাটা তো অসম্ভব শান্তিপূর্ণ। অনেকটা রামরাজত্বের মতো। কোথাও কোনও গোলমাল নেই, অশান্তি নেই। মাঝেমধ্যে অলস কল্পনায় ভাবতেন— গোটা দেশের চেহারা এইরকম হয়ে গেলে পুলিশবাহিনী লাঠি এবং রাইফেল নামিয়ে রেখে বাঁশি বাজাত নির্ঘাত। কিন্তু পৃথিবীটা বড় গোলমেলে জায়গা। মানুষ যা ভাবে, এখানে তার উল্টো ঘটনাই ঘটে প্রায়ই।

শতরূপা দেব খুন হওয়ার পরদিন সকালে থানা প্রায় ঘিরে রেখে দুটো বড় মাপের রাজনৈতিক সভা হয়ে গেল।

রাজনৈতিক দলদুটির সম্পর্ক পরস্পরের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়। ঠারেঠোরে নয়, প্রায় স্পষ্ট ভাষাতেই এক পক্ষ আর এক পক্ষের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে জানাল— শতরূপাকে কারা খুন করেছে তারা জানে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কথাও দু'-পক্ষের বক্তারা গলা ফাটিয়ে জানাল। এও জানাল— সাত দিনের মধ্যে অপরাধী ধরা না পড়লে তারা আন্দোলনে নামবে দফায় দফায়।

থানার বড়বাবু নিজের ঘরে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলেন। একটিমাত্র খুনের ঘটনা গোটা এলাকার চেহারাই পালটে দিয়েছে। এখন থেকে চার মাস বাদে পুরসভার নির্বাচন। পরস্পরের প্রবল প্রতিপক্ষ দুটো রাজনৈতিক দলই সমাজসেবিকা শতরূপা দেবের খুনের ঘটনাটাকে নির্বাচনের প্রধান ইস্যু বানিয়ে ফেলেছিল।

দু'-পক্ষের অভিযোগের ধরনও প্রায় এক। শতরূপা দেব নাকি তাঁদের দলকে কথা দিয়েছিলেন তিনি ওই দলের হয়ে নির্বাচনে লড়বেন। ওঁকেই দল পুরসভার চেয়ারপার্সন করত। কিন্তু প্রতিপক্ষ দল এই মহান উদ্যোগকে বানচাল করতেই খুন করেছে শতরূপাকে। পুলিশি-নিষ্ক্রিয়তা প্রকারান্তরে মদত দিয়েছে এই ঘটনায়।

একটু উনিশ-বিশ করে দুটি দলই সামান্য আগে-পরে দুটি সমাবেশেই উগরে দিল এই কথাগুলো। পরের দিনই এলাকার বিভিন্ন বাড়ির দেওয়ালে, গাছের গায়ে উত্তেজক স্লোগান-লেখা পোস্টার পড়েছিল।

ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত। দু'দিন বাদেই বড় সাহেবের ফোন পেলেন ওসি ঘোষরায়। ধমক-লাগানো ফোন— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুনের কিনারা করতে হবে।

অবনী ঘোষরায় পরিশ্রমী এবং দক্ষ অফিসার। সাহসও ধরেন অনেকখানি, কিন্তু আচমকা বড় সাহেবের ধমক খেয়ে মিইয়ে গিয়েছিলেন একদম। এখনও পর্যন্ত খুনের কোনও রকম সূত্র ওঁর হাতে আসেনি। এদিকে অবস্থা বিস্ফোরক হয়ে উঠেছে। খুনিকে ধরতে না পারলে ভয়ঙ্কর গোলমাল বেধে যেতে পারে এখানে। আর তেমন গোলমাল বাধলে কয়েকটা লাশ পড়ে যাওয়া কোনও ব্যাপারই নয়।

এই বিপদ থেকে ওঁকে বাঁচাতে পারে একমাত্র কৌশিক মিত্র— বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। কিন্তু কিছুতেই ওকে টেলিফোনে ধরতে পারছেন না। যতবারই ফোন করেন ততবারই শোনেন— একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছে।

বড় সাহেবের কাছ থেকে ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসেছিলেন বড়বাবু। তারপর বড়-বড় কয়েকজন ঠাকুর-দেবতার নাম স্মরণ করে আর একবার কৌশিকের নাম্বার ডায়াল করলেন, আর ঈশ্বরের কৃপাতেই বুঝি এবার পেয়ে গেলেন শখের গোয়েন্দাকে। ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার। 'কৌশিক, এবারের মতো বাঁচিয়ে দাও আমাকে।'

মজা করার গলায় উত্তর দিয়েছিল কৌশিক, 'এ কী বলছেন অবনীদা! আপনার জন্যেই তো আমরা বেঁচে আছি।'

'ওসব কথা রাখো ভাই, শ্রীপুর তো কলকাতার কাছেই—একবার চলে এসো না। পারলে এ বেলাতেই।'

'আমি তো শ্রীপুরের খুব প্রশংসা শুনেছি। দারুণ জায়গা! ভেবেছিলাম, দুটো দিন আপনার কাছ থেকে ঘুরে আসব। নতুন

একটা জায়গা দেখাও হবে, আবার আপনার সঙ্গে গল্পও হবে। আচ্ছা, আপনাদের ওখানে একটা নদী আছে না?'

'সব আছে। তুমি কখনও আসছ বলো? ইলেকট্রিক ট্রেনে চাপলে মাত্র ঘণ্টা-দেড়েক লাগবে। তার পরের ব্যাপারটা আমার। কখন রওনা দেবে বলো, আমি স্টেশনে তোমার জন্যে গাড়ি রেখে দেব। কোন ট্রেনে কীভাবে আসবে— নোট করে নাও, আমি বলে দিচ্ছি।'

'বলার কিচ্ছু নেই। ট্রেনে চেপে শ্রীপুরের ওপর দিয়ে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছি আমি, নামা হয়নি এই যা—।'

'তুমি কি এখনই রওনা দিচ্ছ?'

'এখন! আমার হাতে যা কাজ জমে আছে, সাত দিনের আগে নড়তে পারব বলে মনে হয় না।'

উঁচু থেকে নিচুতে আড়ছে পড়ার গলায় ঘোষরায় বললেন, 'সাতদিন আমি তো টিকে থাকব না। তুমি বুঝতে পারছ না অবস্থাটা কী সাঙঘাতিক হয়ে উঠেছে! ওই যে অগ্নিগর্ভ বলতে যা বোঝায় অবস্থাটা এখন ঠিক সেইরকম। প্লিজ কৌশিক চলে এসো একবার। দু'-একটা দিন সময় আমাকে তোমার দিতেই হবে।'

হেসে ফেলল কৌশিক। 'শুনেছি শ্রীপুরে খুব গান-বাজনা, যাত্রা-থিয়েটার হয়—আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে— ওই সবের জোর হাওয়া লেগে গেছে আপনার গায়ে।'

'কীসের হাওয়া, এখানে পা দিলেই তুমি বুঝতে পারবে। প্লিজ, একবার চলে এসো ভাই, আজই এসো।' টেলিফোনে থমকে থাকা যায় না বেশিক্ষণ, তবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বলুন তো অবনীদা।'

'মার্ডার।'

'ক'টা?'

'একটা, তবে এই একটার ইমপ্যাক্ট এক হাজারের মতো।'

'আপনি তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন তো?'

'রুটিন ইনভেস্টিগেশন বলতে যা-যা বোঝায়, সব হয়ে গেছে। পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংস পেয়ে গিয়েছি, কিন্তু আমার কাজের কোনও সুবিধে হয়নি তাতে। আমি আগের মতোই অথৈ জলে। তুমি এসো একবার, প্লিজ।'

বিব্রত মানুষের গলায় কৌশিক বলল, 'আপনি আমাকে শুধু-শুধু এত গুরুত্ব দিচ্ছেন অবনীদা। আমার ক্ষমতা যে কত, সে তো আমার চাইতে ভাল করে কেউ জানে না। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, আমি আসছি।'

'স্টেশনে গাড়ি রাখছি তাহলে।'

'স্টেশনে গাড়ি রাখছি তাহলে।'

'না-না, গাড়ি রাখবেন না। শ্রীপুর পৌঁছে গেলে থানায় পৌঁছতে আমার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। ছাড়ছি এখন।'

॥ দুই ॥

টেলিফোন ছাড়ার ঘণ্টা-তিনেক বাদেই শ্রীপুর পৌঁছে গিয়েছিল প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র। কৌশিকের বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। লম্বা, ছিপছিপে, কিন্তু ভীষণ মজবুত গড়ন। এমনিতে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে অ্যাকশনে নামলে একাই দশজনের মহড়া নিতে পারে। কৌশিক অবশ্য গায়ের জোরের ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিতে চায় না। ও বলে, আসল জিনিস হচ্ছে মগজ। যার বুদ্ধি আছে, তার সব আছে। এই বুদ্ধিও গোয়েন্দার প্রখর। কিন্তু নিজেকেও শক্তিমান বা বুদ্ধিমান— কোনওটাই বলতে ও রাজি নয়।

রেল স্টেশনের নাম শ্রীপুর নয়, তবে শ্রীপুরের এমন খ্যাতি যে রেল স্টেশনের নামটাই চাপা পড়ে গিয়েছে। সবাই বলে শ্রীপুর স্টেশন।

স্টেশন থেকে কিছুটা হাঁটার পরে কৌশিক একটা রিকশা নিয়েছিল। রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

উত্তরটা আগেই ভেবে রেখেছিল কৌশিক। গম্ভীর মুখে বলল, 'শ্রীপুর থানার কাছে।' থানা একটা ল্যান্ডমার্ক। থানার কাছাকাছি কোনও বাড়িতে যাওয়ার হলে কেউ-কেউ নিশ্চয়ই বলে থাকে— থানার কাছে যাবে।

রিকশাওয়ালা দ্বিতীয় কোনও প্রশ্ন না করে নতুন যাত্রী নিয়ে থানার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে যাচ্ছিল কৌশিক। চমৎকার চেহারা শ্রীপুরের। এককালে ফরাসি উপনিবেশ ছিল। ফরাসি স্থাপত্য নিয়ে সেই সব বাড়িই দাঁড়িয়ে আছে আজও। শুধু বাসিন্দারাই পালটে গিয়েছে। ওই আমলেরই তিনটে বড় বাড়ির একটা এখন হাসপাতাল, একটা কোর্ট, আর একটা পুরসভা।

বেলা সাড়ে-তিনটে। পথে লোকজন বিশেষ নেই। আর কিছুক্ষণ পর থেকেই হয়তো একটু-একটু করে ভিড় হবে রাস্তায়। তবে খুব বেশি ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ বেশির ভাগই বাগানওয়ালা একতলা বাড়ি।

এলাকায় নতুন কোনও লোক এলে আর তার মুখে এলাকা সম্পর্কে যদি কিছু প্রশ্ন থাকে— রিকশাওয়ালা গাইডের ভূমিকা নিয়ে থাকে। এটা কী? ওটা কী? এইরকম প্রশ্ন করেই যাচ্ছিল কৌশিক। আর রিকশাওয়ালা-সে-সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল একটার পর একটা। রিকশায় ওঠার সময় দরদাম করা তো দূরের কথা, ভাড়া পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেনি নতুন এই যাত্রীটি। সুতরাং খুশি মনেই ছিল রিকশাওয়ালা। ধরেই নিয়েছিল— দ্বিগুণ ভাড়া চাইলেও যাত্রীটি আপত্তি তুলবে না।

থানার পঞ্চাশ গজ আগে রিকশা ছেড়ে দেয় কৌশিক এবং ভাড়া নিয়ে কোনও প্রশ্ন না তুলে দ্বিগুণ ভাড়াই দিয়েছিল।

রিকশাওয়ালাকে একটু দূরে সরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার পরে উল্টোমুখো হাঁটতে শুরু করেছিল। রিকশা বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে যেতেই দিক পরিবর্তন করল গোয়েন্দা, তারপর লম্বা পায়ে হেঁটে এসে ঢুকে পড়ল থানায়।

থানার এই বাড়িটাও পুরনো আমলের বাংলো ধাঁচের। প্রথম ঘরটাই বড়বাবুর ঘর। নিজের ঘরেই বসেছিলেন ঘোষরায়। ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠে বললেন, 'এসো, এসো কৌশিক।'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রীতিমতো তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'শ্রীপুরের খুব প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু যা শুনেছিলাম, জায়গাটা তার চাইতেও ঢের বেশি সুন্দর।'

উত্তরে ম্লানমুখে ওর অবনীদা বললেন, 'তিন-চার দিন আগে এলে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতাম, কিন্তু এখন পরিস্থিতি একদম পালটে গিয়েছে। বাইরে পোস্টার-টোস্টার দেখনি।'

মাথা একদিকে কাত করে উত্তর দিল গোয়েন্দা, 'হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা চোখে পড়েছে। বাড়ির দেয়ালে, গাছের ডালে।'

জবাব শুনে মুখ আর একটু কালো হয়ে গেল বড়বাবুর। একটু বুঝি অভিমান-জড়ানো গলায় বললেন, 'এর পরেও তুমি প্রশংসা করছ জায়গাটার!'

হেসে ফেলল কৌশিক। 'কেন করব না! এসব পোস্টার আর ক'টা দিনই বা থাকবে?'

পরিস্থিতি যা হয়ে উঠেছে, কাল-পরশুর মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা দাঙ্গাও বেধে যেতে পারে। তুমি শান্ত হয়ে বোসো, আমি পুরো ব্যাপারটা তোমাকে গোড়া থেকে বলছি। চা খাবে তো?'

'তা একটু খেতে পারি।'

টেবিলের বেল বাজালেন বড়বাবু। একজন কনস্টেবল আসতেই

বললেন, 'আমার টেবিলে দু'-কাপ চা পাঠিয়ে দিতে বলো। সঙ্গে কয়েকটা বিস্কুটও দিতে বলবে।'

॥ তিন ॥

চারটের সময় শতরূপা খুনের কাহিনি ও তদন্তের কথা বলতে শুরু করেছিলেন ঘোষরায়। ওঁর কথা শেষ হল সাড়ে-পাঁচটায়। আবহাওয়া ঠান্ডা। বেশ ফুরফুরে হাওয়া বইছে, কিন্তু কৌশিকের অবনীদার পালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল।

তরুণ গোয়েন্দার কপালে তিন-চারটে ভাঁজ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। টেবিলের একটা পেপারওয়েট হাতে তুলে নিয়েছিল ও, তারপর আগের জায়গায় ওটা নামিয়ে রেখে বলল, 'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট বলছে, শতরূপা দেব রেপ্‌ড হয়নি?"

'না। তবে ভদ্রমহিলার পোশাক-আসাকের দশা দেখে মনে হয়, খুনি ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি বোধহয় শতরূপা বাধা দেওয়ার জন্যে। তারপরেই বুঝি খুনি হাতের ভারী লাঠিটা মহিলার মাথায় মারে। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। মাথাটা থেঁতলে গিয়েছিল। ওই লাঠি দিয়ে মেরেই ওকে খুন করা হয়েছে—।'

'কী করে বুঝলেন?'

'লাঠির মাথায় রক্তের ছাপ আর ভদ্রমহিলার কয়েকটা চুল লেগে ছিল।'

'ফরেনসিক এক্সপার্ট লাঠিতে খুনির হাতের ছাপ পায়নি?'

'পেলে তো আমার তদন্তের কাজ এক ধাক্কায় এগিয়ে যেত অনেকখানি। পায়নি আমার কপালের দোষে।'

'আপনার কপালের দোষে! মানে?'

'সেদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছিল। খুনের ঘটনাটা ঘটার ঠিক পরেই। সেই বৃষ্টিতে ফিঙ্গার প্রিন্ট সব ধুয়েমুছে গেছে। বৃষ্টি একটু আগে নামলে আমার কাজের কত সুবিধে হত! পায়ের ছাপটাপ পাওয়া যেত। কিন্তু আমার ভাগ্য তো— বৃষ্টি নেমেছিল শতরূপা খুন হওয়ার ঠিক পরেই। আকাশভাঙা বৃষ্টি।'

'আপনার সন্দেহের তালিকায় কে বা কারা আছে?'

'তালিকার প্রথমেই যে আছে, আমার মনে হয় সেই-ই খুনি।'

'এই এলাকার একটা বদ লোক। জালিয়াতি করার জন্যে বারদুয়েক ধরা পড়েছে। মারদাঙ্গা করার জন্যে বার-পাঁচেক। এই এলাকায় অপরাধী তো বিশেষ নেই, সেই জন্যে এখানে আসার অল্পদিনের মধ্যেই আমার নজরে পড়ে গিয়েছিল লোকটা। নেশাভাঙ করে, খারাপ পাড়ায় যায়, নদীর ধারে ছোটখাটো একটা জুয়ার ঠেক চালায়। ওই জায়গাটা আমার থানার মধ্যে পড়ে না বলে আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাইনি।'

'কী নাম লোকটার?'

'সত্যেন চৌধুরি, সতু বলে এক ডাকে সবাই ওকে চেনে। বনেদি বাড়ির উচ্ছন্নে যাওয়া লোক।'

'ওকে সন্দেহ করছেন কেন?'

'এই কারণেই যে, শতরূপার ডিভোর্সের পরে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ও শতরূপার কাছে বেশ কয়েকবার ঘুরঘুর করেছে। শতরূপা প্রতিবারই পত্রপাঠ বিদেয় করেছে, কিন্তু সতু হাল ছাড়েনি। কান্নাকাটি করে নাকি বলেছিল : ওকে বিয়ে করলে ও ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু শতরূপার মতো একটা ভাল মেয়ে ওকে বিয়ে করতে যাবে কেন? বেশ কয়েকবার ফেরাবার পরে সতু ওকে শাসিয়েছিল। বলেছিল : ওর প্রস্তাবে রাজি না হলে ওকে খুন করে ফেলবে।'

'কবে শাসিয়েছিল?'

'শেষ শাসিয়েছিল মাসদুয়েক আগে।'

'তারপর?'

'শতরূপা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না কখনও। আগের কথা কাউকে জানায়নি। কিন্তু এবার এত বিরক্ত হয়েছিল যে, ওর জনকল্যাণমূলক সংস্থার প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করতে বাধ্য হয়। শতরূপা এই এলাকায় অসম্ভব জনপ্রিয়। সতুর শাসানির কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায় শ্রীপুরের লোকজন খেপে উঠেছিল। ওই সময় ধরা পড়লে ও পিটুনি খেয়েই মরত। কিন্তু বিপদ আঁচ করে ও এখান থেকে পালিয়েছিল। হালে মাঝেমধ্যে আসত রাতের বেলায়, কিন্তু রাত ফুরোবার আগেই পালাত। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সেই রাতে ও শতরূপাকে ফলো করে শ্রীপুরে ঢুকেছিল নির্ঘাত। তারপর খুন করে পালায়।'

'ওকে ধরার চেষ্টাও করেননি।'

'করব না আবার। পরের রাতেই ওর নদীর ধারে জুয়ার ঠেকে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম, দিনদুয়েক ওখানে আসছে না। আমি লোক ফিট করে রেখেছি। এলেই ওকে ধরবে। ও গা-ঢাকা দেওয়ায় আমি এখন নিশ্চিত— সতুই খুন করেছে। তোমার কী মনে হয়?'

গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা বলল, 'আপনার সন্দেহভাজনদের তালিকায় সতুই এক নম্বর। দু-নম্বরে কাকে রেখেছেন?'

'দু নম্বরে রেখেছি পুরসভা নির্বাচনে লড়াকু দুটো দলকেই। এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হতে পারে। শতরূপা খুনের জন্যে এদল ওদলকে দুষছে। যে দলকে দোষী বানানো যাবে, সে দলই হারবে। শ্রীপুরের বেশিরভাগ মানুষই সমাজ-সেবিকা শতরূপার গুণগ্রাহী।'

গোয়েন্দার মুখে আগের চাইতেও গম্ভীর। গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনার এই অনুমানটাও সত্যি হতে পারে অবনীদা। নির্বাচনে জেতার এটা একটা ভয়ঙ্কর চাল হতে পারে। আপনার তালিকায় তিন নম্বরে কে আছে?'

'শতরূপা খুন হওয়ার জন্যে সরাসরি যে লাভবান হবে, তার কথা ভেবেছি।'

'কে?'

'ওর ভাগ্নে। আঠারো-উনিশ বছর বয়েস। শতরূপার তিন কুলে ওই ভাগ্নে ছাড়া আর কেউ নেই। শতরূপার বাড়িঘর, টাকাপয়সার ওই হচ্ছে একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

'ছেলেটা কেমন?'

'খোঁজ নিয়ে জেনেছি ভালই। তবে এই বয়েসের ছেলেদের অনেকের মাথায় তো নানান মতলব ঘোরে। বাজে বন্ধুদের উস্কানিতে ভাগনেও খুনের পথ ধরতে পারে। সাধারণ ভাবে এটা ভাবা যায় না। তবে তুমি তো জানো— অপরাধ জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

গম্ভীর মুখে গোয়েন্দা বলল, 'উদ্দেশ্যর দিকে তাকালে ভাগ্নেকে সন্দেহ করার কারণ আছে।'

কৌশিকের কথা শুনে ওর অবনীদার মুখে একটু অন্ধকার নেমে এসেছিল। 'তুমি তো দেখছি আমার সব কথাতেই সায় দিচ্ছ কৌশিক?'

'দিচ্ছি এই কারণে , প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনার অনুমান আর বিশ্লেষণ নিখুঁত।'

উত্তর শুনে আর একবার হতাশ হলেন বড়বাবু। 'তাহলে আমার করণীয় কী এখন?'

'আমার তো মনে হয় আপনি ঠিক পথেই তদন্ত চালাচ্ছেন। আচ্ছা, যে লাঠিটা দিয়ে ভদ্রমহিলাকে খুন করা হয়েছে— সেটা কি এখন একবার দেখা যাবে?'

উত্তর না দিয়ে অবনী ঘোষরায় উঠে গিয়ে স্টিলের আলমারি



খুলে কাপড়ে-জড়ানো হাত-তিনেক একটা লাঠি নিয়ে এসে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর রাখলেন।

আস্তে আস্তে জড়ানো কাপড় সরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে লাঠিটা দেখার পরে তরুণ গোয়েন্দা বলল, 'ঠিক আছে, এটা রেখে দিন এবার। ফরেনসিক রিপোর্টটা দেখি একবার।'

আগের ভঙ্গিতেই লাঠিতে কাপড় জড়িয়ে আলমারিতে রেখে দিলেন বড়বাবু। তারপর ওই আলমারির ড্রয়ার থেকেই বার করে ফরেনসিক রিপোর্টটা দেখালেন গোয়েন্দাকে।

রিপোর্ট খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার পরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল তরুণ গোয়েন্দা। তারপর ওর অবনীদাকে প্রশ্ন করল, 'থানার সামনে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর দেখলাম, ওটা কার?'

'তোমার জন্যে জোগাড় করেছিলাম, কিন্তু তুমি তো ওটা স্টেশনে পাঠাতেই দিলে না—।'

হঠাৎই ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে কৌশিক বলল, 'চলুন তাহলে এলাকাটায় একটা চক্কর মেরে আসি। দারুণ দেখতে কিন্তু শ্রীপুর।'

প্রস্তাব শুনে একটু বিরক্তই হলেন ঘোষরায়, কিন্তু অতি কষ্টে বিরক্তি গোপন করে বললেন, 'চলো।'

ড্রাইভার গাড়িতেই বসে ছিল, ওরা দু'জন ওঠার পরে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব স্যর?'

উত্তর দিল কৌশিক, 'গোটা শ্রীপুর দেখব। সব ক'টা রাস্তায় ঘুরব। আপনি কি এখানকার লোক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে তো ভালই হল। চলুন। কোনও রাস্তা কিন্তু বাদ দেবেন না।'

গাড়ি ছুটতেই দু'দিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল কৌশিক। 'কী সুন্দর স্থাপত্য! বাড়িরই আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে। ফরাসিদের পুরনো উপনিবেশ। ওরা রুচিসম্মত বাড়ি বানাবার কায়দাটা জানত। ছোট-ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে বাগান। আর রাস্তাটাস্তাগুলো কী চওড়া-চওড়া।'

অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল কৌশিক, কিন্তু ওর অবনীদা কোনও উত্তর দিচ্ছিলেন না।

গাড়িতে চেপে শ্রীপুর দেখতে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগে না। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে এসে কৌশিক বলল, 'একটু দাঁড়াবেন তো এখানে।'

গাড়ি থামতেই একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে হায়-হায় করে উঠল কৌশিক। 'ইশ! এত সুন্দর বাড়িটা নষ্ট করল কে? বাংলো ধাঁচের বাড়ির ছাত উড়িয়ে দিয়ে এইরকম বিচ্ছিরিভাবে ঢালাই করে কেউ! ছাতের ওপরে আবার বদখত দেখতে একখানা ঘরও বানানো হয়েছে। এই একটা বাড়িই গোটা শ্রীপুরের শ্রী নষ্ট করেছে। বাড়িটা কার?'

বিরক্তির শেষ সীমায় বুঝি পৌঁছে গিয়েছিলেন বড়বাবু। 'বাড়িটা শিবব্রতবাবুর —শতরূপার প্রাক্তন স্বামী।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল কৌশিক। 'ভদ্রলোক বাড়িটার আর কোনও ক্ষতি যাতে না করেন— বলে আসতে হবে।' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে কৌশিক হনহন করে হেঁটে গিয়ে বাড়ির ডোরবেল টিপল।

যিনি খুললেন, তিনিই শিবব্রত। সবে অফিস থেকে ফিরেছেন।

কৌশিক অচেনা, কিন্তু গাড়িতে চেনা মানুষ। একটু থতমত খেয়ে যাওয়ার পরে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আপ্লুত হয়ে শিবব্রত বললেন, 'আসুন স্যর, আপনি ডাকলে তো আমিও যেতাম আপনার কাছে।'

এইরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ার জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলেন না বড়বাবু, বিব্রত মুখে গাড়ি থেকে নামলেন। তারপর আপ্যায়নের ঠেলায় কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে শিবব্রতর বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।

কৌশিক শিবব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর্টিটেকচারে আমার খুব ঝোঁক। আপনি বাংলো ধাঁচের এই বাড়িতে ঢালাই করলেন কীভাবে?'

সমঝদার পেয়ে খুশি হলেন শিবব্রত। বললেন, 'প্ল্যানটা আমারই। চারদিকের দেয়াল রেখে দিয়েছি। ঘরের মধ্যিখানে মস্ত একটা পিলার বসিয়েছি শুধু। এটা না বসালে এত বড় ছাত মজবুত হত না। পিলারটা আবার ঢেকেও দিয়েছি গ্রানাইট দিয়ে, যাতে চোখে না লাগে। আসুন না, ঘরে এসে দেখুন।'

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বেশ তারিফ করল কৌশিক। 'পুরনো আমলের বাড়ির চওড়া দেওয়ালটা আপনি কাজে লাগিয়েছেন সুন্দরভাবে। এক-দেড়শো বছরের পুরনো দেয়াল, ত্রিশ ইঞ্চি গাঁথনি। ঢালাই ধরে রাখতে পারত, কিন্তু আপনি ঝুঁকি না নিয়ে ভালই করেছেন।' প্রশংসায় খুব খুশি হলেন শৌখিন স্থপতি। 'প্ল্যানটা আমারই। মধ্যিখানে বড় একটা পিলার বসানোয় ছাদটা মজবুত হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। আসলে ছাদের ওপরে ঘর তুলব বলেই পিলারটা বসিয়ে দিলাম।'

'বাহ্! ছাদে ঘরও তুলেছেন!'

'চলুন না দেখবেন।'

'কিন্তু ঘরের এক-দেড়শো বছরের পুরনো কড়ি-বরগার কাঠগুলো নিয়ে কী করবেন? ওসব কাঠ তো সোনার চেয়েও দামি।'

বাহাদুরি নেওয়ার গলায় শিবব্রত জানালেন, 'কড়ি-বরগা কেটে দোতলার দুটো ঘরের সব জানলা-দরজার ফ্রেম হয়ে গিয়েছে। ঠিকই বলেছেন, সোনার চেয়ে দামি কাঠ। ওসব কাঠ এখন টাকা দিলেও পাওয়া যাবে না। চলুন না ওপরে গিয়ে দেখবেন, ঘরদুটোর কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফ্লোর আর জানলা-দরজার তক্তা বসানো বাকি। চলুন, ওপরে চলুন, এদিকে সিঁড়ি।'

বিরক্তি ফেটে পড়ছিল বড়বাবুর চোখে, কিন্তু কৌশিক কেমন যেন নিজের খেয়ালে ছিল। শিবব্রত আপ্যায়নের গলায় বলল, 'আসুন বড়বাবু, দেখে যান একবার। ছুটি পেলে কাজটা আমি তুলে দিতাম। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করি তো, জানেন তো আমাদের কেমন কাজের চাপ। তার ওপর পরেশ সাহা ছুটি নিয়েছিল— পাক্কা এক মাস। আমার অসুবিধেয় ফেলার জন্যে। কিন্তু আমি কাজকে ভয় পাই না। মাথা গুঁজে সন্ধে সাড়ে-সাতটা পর্যন্ত কাজ করি। ইলেকশনের আগে পার্টির ভিড় তো লেগেই থাকে। আজ পরেশ জয়েন করেছে। আমি ইচ্ছে করেই সাড়ে-পাঁচটায় বেরিয়ে পড়েছি। মজাটা টের পাক। আপনাকে বলতে কোনও বাধা নেই, ভাবছি ওকে শায়েস্তা করার জন্যেই দু-সপ্তাহ ছুটি নিয়ে নেব।'

বড়বাবুর মুখ থমথমে, দৃষ্টি নীচের দিকে। শিবব্রতর কথাগুলো বোধহয় কানেই নিলেন না। তিনজন সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল। নীচের মাপেই ওপরে মস্ত একটা ঘর, তবে মধ্যিখানে পার্টিশন-ওয়াল। বড়-বড় জানলা-দরজা। কিন্তু পাল্লা নেই, ফ্রেম আছে। ফ্রেমের কাঠে হাত দিয়ে কৌশিক বলল, 'এ তো দুর্দান্ত কাঠ! এগুলো সব কড়ি-বরগা থেকে বেরিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সবই কড়ি-বরগার।'

'কাঠের ওপর হাত ঘসতে ঘসতে কৌশিক বলল, 'এই কাঠ দিয়ে তো আপনি ফার্নিচার বানাতে পারতেন—।'

হাসতে হাসতে জবাব দিলেন শিবব্রত, 'তা পারতাম, কিন্তু বানাবে কে? ছুতোর মিস্ত্রিরা এখানে বসেই কাজ করেছে। কাঠে করাত ঢুকতে চায় না। একটা করাত তো ভেঙেই গেল। ফ্রেম বানাতে গিয়েই মিস্ত্রিদের ঘাম ছুটে গিয়েছে। অসম্ভব মজবুত কাঠ। এ কাঠে কখনও উই-ঘুন ধরবে না। জানলাগুলো খুব বড়-বড় দেখছি, কেমন হয়েছে বলুন তো?'

'খুব ভাল।' তারিফ করার পরে ঘুরে ঘুরে ঘরদোর দেখতে লাগল কৌশিক। বড়বাবু কিন্তু ওঁর ভেতরে জমে-ওঠা রাগ-বিরক্তি আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। কৌশিকের এই বদখেয়ালের কোনও মানে হয়! সম্পূর্ণ অকারণে এতটা সময় নষ্ট করার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

বিশাল চেহারা বড়বাবুর। টের পাচ্ছিলেন রক্তচাপ চড়-চড় করে বেড়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি চালাতে ইচ্ছে করছিল দেওয়ালের ওপর। রাগ কমাবার জন্যে সেটা হয়তো করেও ফেলতেন, কিন্তু ঠিক তক্ষুনি কৌশিক বলে উঠল, 'অবনীদা, শিবব্রতকে অ্যারেস্ট করুন। এই হচ্ছে শতরূপা দেবের খুনি।'

শরীরের রাগ-বিরক্তি বেশ কিছুটা বার করে দিয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক করার সুযোগটা ছাড়লেন না বড়বাবু। এমন জোরে শিবব্রতকে চেপে ধরেছিলেন যে, মানুষটার গলা থেকে অবিকল মুরগির মতো কঁ-কঁ শব্দ বেরিয়ে এল। প্রচণ্ড জোরে একটা রদ্দা মেরে লোকটার হাত মুচড়ে দিতেই ওই শব্দটুকুও থেমে যাওয়ার উপক্রম হল। শিবব্রতকে টানতে টানতে গাড়িতে তুলে নিলেন বড়বাবু।

কৌশিক বসল সামনের সিটে। গাড়িতে স্পিড তুলেছিল ড্রাইভার। মিনিট-দশেকের মধ্যে ওরা পৌঁছে গিয়েছিল থানায়। এক ধাক্কায় শরীরের বেশ কিছুটা উত্তেজনা বেরিয়ে যেতেই শান্ত হলেন বড়বাবু। তারপরেই মনে হল— শিবব্রতকে গ্রেফতার করে ছেলেমানুষের মতো একটা কাণ্ড করে ফেলেছেন। কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই।

কৌশিকের হাতে হাত-দেড়েকের একটা কাঠ। কাঠটা বড়বাবুর ঘরের কোনায় দাঁড় করিয়ে রেখে কৌশিক বলল, 'আপনার আলমারির চাবিটা দিন তো অবনীদা।'

যন্ত্রের মতো পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে গোয়েন্দার হাতে তুলে দিয়েছিলেন বড়বাবু।

শতরূপাকে খুন করার ওই আড়াই-হাতি লাঠির মতো কাঠটা বার করল কৌশিক। তারপর শিবব্রতর বাড়ি থেকে আনা ওই কাঠটা তুলে নিয়ে লম্বালম্বি জুড়ে মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল।

চমকে উঠে বড়বাবু বললেন, 'আরে! এ দুটো তো দেখছি একটা কাঠেরই দুটো টুকরো!'

রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ, এক। করাতের দাগ, কাঠের টেক্সচার পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে।'

টেবিলের সামনে কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল শিবব্রত। বড়বাবুর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বার হচ্ছিল। রুলার হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন উনি। কৌশিক পরিষ্কার বুঝতে পারল, গড়-গড় করে অপরাধীর স্বীকারোক্তি আদায়ের পথে এগোচ্ছেন অবনীদা।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে কৌশিক বলল, 'আমি আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আসছি অবনীদা।' বলার পরেই ও ছুটে গিয়ে অ্যাম্বাসাডরে উঠে পড়েছিল। ড্রাইভার নিজের সিটেই ছিল, মুখ ঘোরাতেই গোয়েন্দা বলল, 'তাড়াতাড়ি চলুন, সোজা।'

॥ চার ॥

আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট নয়, কৌশিক থানায় ফিরে এল পাক্কা এক ঘণ্টা বাদে। থানার বড়বাবু অবনী ঘোষরায়ের চেহারায় আগের জেল্লা ফিরে এসেছে এর মধ্যেই। কৌশিক আসতেই হাসি মুখে বললেন, 'খুনি ধরে দিয়ে আবার পালিয়েছিলে কোথায়?'

উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসে পড়ে গোয়েন্দা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'অপরাধ স্বীকার করেছে শিবব্রত?'

'করবে না আবার? আমার লাঠি বোবাকেও কথা বলায়। এলোপাথাড়ি কিছুক্ষণ ঠ্যাঙাতেই হুড়-হুড় করে সব বলে দিল।'

'অপরাধ স্বীকার করেছে?'

'হ্যাঁ। পিটুনির যন্ত্রণা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবুর বিবেক-যন্ত্রণাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরিষ্কার স্বীকার করেছে— ওই লাঠি দিয়ে মাথায় মেরে ও খুন করেছে শতরূপাকে।'

'কিন্তু কেন?'

'সেই কারণটা জানতে পারিনি এখনও। একপ্রস্থ ধোলাই দিয়ে লক-আপে ঢুকিয়েছি। মাঝরাত্তিরে আর এক দফা পেটাব। দেখি, কারণ বার করা যায় কি না—।'

'কারণটা আমি জেনে ফেলেছি।'

অবাক হয়ে ওর অবনীদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কারণ?'

'শিবব্রত পুরসভার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের একটা ঘুঘু। নানারকম দু-নম্বরি করে। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে ও ভয়ে কুঁকড়ে ছিল।'

'কেন?'

'ওর প্রাক্তন বউ পুরসভার চেয়ারপার্সন হলে ওর পক্ষে আর দু-নম্বরি কারবার চালানো সম্ভব হবে না ভেবেই। শতরূপা সৎ, শুধু সৎ নয়— অতিমাত্রায় দক্ষ এবং পরিশ্রমী। চাকরি খোয়াবার ভয় ইদানীং শিবব্রতকে চেপে ধরেছিল ভীষণভাবে। সেই সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক একটা ইগোও কাজ করছিল। পাঁচটা কাজে 'ম্যাডাম ম্যাডাম' বলে এক্স-ওয়াইফের কাছে যেতে হবে—! সুতরাং এই বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়— শতরূপাকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়া।'

'এটা কি তোমার অনুমান?'

'শেষেরটা অনুমান। কিন্তু আগেকার কথাগুলো সত্যি। এইমাত্র জেনে এলাম।'

অবাক হয়ে গোয়েন্দার অবনীদা জিজ্ঞেসা করলেন, 'কার থেকে জেনে এলে?'

'পুরসভার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের পরেশ সাহার কাছ থেকে। ওই লোকটার সঙ্গে শিবব্রতর একেবারেই বনে না। শত্রু বললেও বোধহয় কম বলা হয়।'

'ওর খবর তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'শিবব্রতই জানিয়েছে। ওর বাড়িতে তখন বলছিল না—'

'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ। তা তুমি পরেশ সাহাকে পেলে কোথায়?'

'পুরসভায়। ওখানেই তো গিয়েছিলাম। পরেশকে বললাম— শিবব্রতবাবুর সঙ্গে আপনারা কী হয়েছে বলুন তো? ভীষণ গালমন্দ করছিল আপনাকে। ব্যাস, অমনি মুখ খুলে গিয়েছিল পরেশের। শিবব্রতর বিরুদ্ধে একনাগাড়ে অনেক-কিছু বলে গিয়েছিল। সেই সব কথা থেকে এই তথ্যগুলো পেয়ে গিয়েছি আমি।'

কৌশিকের হাত চেপে ধরেছিলেন অবনীদা। 'তুমি আমার বিপদে মধুসূদন। সাধে কি তোমাকে এত ডাকছিলাম। ডাকলাম, তুমি এলে, আর হাতে হাতে ফল পেলাম। এবার বলো, তুমি কী করে এত জটিল খুনের আসামিকে এত অল্প সময়ের মধ্যে ধরে ফেললে?'

মুচকি হেসে জবাব দিল কৌশিক। 'স্রেফ আন্দাজে, আর কিছুটা ঘটনাচক্রে।'

অবনীদা কৌশিকের হাত আর ছাড়েননি। গলায় বেশ কিছুটা আবেগ ঢেলে বললেন, "প্লিজ বলো, না হলে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

রহস্যময় হাসি হেসে কৌশিক বলল, 'আমরা তো শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা। ওখানে কড়িকাঠ গোনার সুযোগ নেই, কিন্তু এখানে এলে আমাদের চোখ সিলিংয়ের দিকে যাবেই। আপনার এই থানার ঘরেই একগাদা কড়ি-বরগা। না গুনলেও আপনার ঘরে ঢুকে সিলিংয়ের দিকে চোখ গিয়েছিল বেশ কয়েকবার। খুনের অস্ত্র বলতে লাঠি। ঠিক লাঠি নয়, লাঠির মতো একটা কাঠ। কাঠের এক দিকে কালো রং। কাঠটা আবার অসম্ভব ভারী। ওটা দেখেই মনে হয়েছিল কড়ি-বরগার কাঠ। শ্রীপুর ছোট্ট জায়গা। আপনাকে নিয়ে বেরুলাম। ঠিক করলাম ভাঙা ছাদওয়ালা বাড়ি দেখলেই হানা দেব। এখানে সব বাড়িই এক-দেড়শো বছরের পুরনো বাংলো বাড়ি। ঢালাই ছাদ, ওপরে ঘর— এই এলাকায় একটাই আছে। কপাল ঠুকে ঢুকলাম। আর কপালজোরেই কাঠের অন্য টুকরোটা পেয়ে গেলাম। আর একটা কথা। এই শিবব্রত লোকটা অত্যন্ত ধুরন্ধর। পরেশ কথায় কথায় বলল, ইদানীং গুন্ডাদের সঙ্গেও মেলামেশা শুরু করেছিল শিবব্রত। আমি জিজ্ঞেস করলাম— কোন গুন্ডা? ও বলল— সতু, সতু চৌধুরি। কয়েকদিন আগেই নাকি শিবব্রত ওকে মোটা টাকা দিয়েছে। পরেশের ধারণা, জুয়ার বাজি ধরার জন্যে। কিন্তু আমি মনে হয় আসল কারণটা ধরতে পেরেছি। শতরূপার ওপর ঝোঁক ছিল সতুর সাঙঘাতিক। খুন করবে বলে শাসিয়েছেও। খুনের রাতে কোনও অছিলায় ওকে যদি বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, পুলিশের নজর ওর ওপরেই পড়বে। শিবব্রত মৃত শতরূপার জামা-কাপড় এমনভাবে ছিঁড়েছে, যাতে পুলিশের মনে হতে পারে—খুনের কারণ ধর্ষণ। প্রৌঢ় শিবব্রতর গায়ে সন্দেহের আঁচ পর্যন্ত লাগবে না। তবে এ সবই আমার অনুমান। কপালজোরে আর ঘটনাচক্রে খুনি ধরেছি— আমার কোনও কৃতিত্বই নেই।'

একটু লাজুক স্বাভাবের তরুণ এই গোয়েন্দার কথা শুনে রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন শ্রীপুর থানার বড়বাবু অবনী ঘোষরায়। ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'মাথার ওপরেই ছিল সমাধানের রাস্তা, অথচ কিছুই বুঝতে পারিনি—। তুমি তো ম্যাজিক দেখালে কৌশিক।'

দের্দাণ্ডপ্রতাপ পুলিশ ইন্সপেক্টর মোটা রুলটা হাতে নিয়ে মাঝরাতে লক-আপে ঢুকেছিলেন। মানুষটিকে ওই অবস্থায় দেখে শিবব্রতর প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছিল পুরোপুরি। সব অপরাধই ও মেনে নিয়েছিল এক-এক করে।

গোয়েন্দা কৌশিকের শেষের অনুমানটিও ঠিক। সতুকে মোটা একটা টাকা দিয়ে শ্রীপুরের বাইরে পাঠিয়েছিল শিবব্রত। পাঠাবার একটাই কারণ যাতে খুনি হিসাবে পুলিশের নজর পড়ে ওর দিকে। খুনের পরে জামাকাপড়ও ছিঁড়েছে এমনভাবে যাতে পুলিশ ধরে নেয় খুনের কারণ ধর্ষণ। ঘাটের কাছাকাছি শিবব্রত, এই ব্যাপারে তাহলে ওর পক্ষে সন্দেহর বাইরে থাকা সহজ হবে।

পরদিন সকালেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছে কৌশিক। শ্রীপুরে আবার আগের সেই শান্তি ফিরে এসেছে। শুধু স্থানীয় লোকজনই নয়, দিব্যি আছেন থানার বড়বাবুও।

কোথাও কোনও মারদাঙ্গা নেই, অপরাধ নেই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংখ্যা আগের তুলনায় একটু বেড়ে গিয়েছে। বেশির ভাগ অনুষ্ঠানেই বক্তাদের তালিকায় থাকেন ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। নিয়মিত চর্চার ফলে ওঁর বক্তৃতাও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে হালে।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

গল্প

উকিলের চিঠি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে খেতের মধ্যে নেমে গেল। গোসাবা থেকে দুই নৌকা বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভিতর বাগে কোন বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড় কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবন বয়স।

মনটা সব সময়ে অন্যধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আজকাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে যে উনুন ফেলে দৌড়োবে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড় অতিথিপরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তাছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভিতর বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে পুকুরে। বাঁকে করে দু-বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছতলায় দাঁড়াল।

কালও বড্ড ঝড়জল গেছে। ওই দক্ষিণধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়সওয়ার ঝড় আসা মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়োয়, ডিমের মতো বড় বড় ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটি দশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে খেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে সব। আমতলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝাঁক উড়িয়ে দিল। ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয়, মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমন ধারা লোক যেন! রোগা-ভোগা ভীতু-ভীতু চেহারা, পেটে সব খোঁদল-খোঁদল উপোসী ভাব। জুল-জুল করে চারধারে চায় আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল, ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ময়লা ঘেমো তেলচিটে গেঞ্জিটা খুলছে না, বুকের পাঁজর দেখা যাবে বলে হয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁট এসে বলল— আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

খেত ভর্তি আনাজ। অভাব কিসের? মিছরি বলল—এক্ষুনি এসে পড়বে। খেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

—একটু হলুদ লাগবে, আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয় তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কী! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই সে কি আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল—সব দেওয়া হচ্ছে। ডাল চালটা ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সঙ্কোচের গলায় বলল—বেলা হয়েছে।

সে কথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জিতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোত্থেকে এল, কোথাই বা যাচ্ছে? ছোট বোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয় তবু বোনে বোনে ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রক পরা চিনি তিনটে ব্যাঙ লাফ দিয়ে মশলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে উঠোনে রেখে ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই যে মশলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দেখ সব, নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নিচু হয়ে দেখল।

বলল—উরে ব্বাস, গরমমশলা ইস্তক। বাঃ বাঃ এ নাহলে গেরস্ত!

চিনি দুটো নাচুনি পাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল—যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড্ড মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোওয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নিচু ডালের একটা পাকা আম দু'বার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই খ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনও পড়েনি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনও লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়িতে হেসে খেলে সময় যায়। কিন্তু ওই চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোট কাকা প্রায় সমানবয়সি। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ'মাসের ছোট। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে ছোট কাকা বলে ডাকে।

ছোট কাকা মিছরির নাকের ডগায় দু'বার নীলচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল— রোজ যে আমার কাপড় কাচতে খিটখিট করিস, আর করবি?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত—করব, যাও যা খুশি করোগে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল—কাপড় কাচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবু ও কাচতে বড় ঘেন্না হয়।

—ইঃ ঘেন্না! যা তাহলে, চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাব।

আচ্ছা, আচ্ছা, কাচব।

—আর কী কী করবি সব বল এই বেলা। বউদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম?

—না।

—দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি?

মাইরি না।

—মনে থাকে যেন। বলে ছোটকাকা চিঠিটা শুঁকে বলল—এঃ, আবার সুগন্ধী মাখিয়েছে! বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকায় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটাপথ। কত দূর যে! কত যে ভীষণ দূর!

খামের উপর একধারে বেগনে কালিয়ে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়—ফ্রম বসন্ত মিদ্দার, বি.এ.এল.এ-বি. অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম-ঠিকানা লেখা অন্যধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায় বুঝি এক ফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলেছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড় যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময় নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে— ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কি আবার গ্যাঁজা টানতে বসে গেছে নাকি দ্যাখ।

বড় বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হাভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর তারা বাবুর সঙ্গে এক চ্যাটাইতে বসে কথাবার্তা

বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধসেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি খেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল—বিপিনদা, তোমার হল? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে—বিশটা মদ্দ খাবে, কম তো লাগবে না। হুট বলতে হয়ে যায় নাকি! যাচ্ছি, বলো গে হয়ে গেল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজ। কাগজের উপরে আবার বসন্ত মিদ্দার এবং তার ওকালতির কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড় ভালবাসে।

হুট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখ, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে।

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে একটা ছোট্ট ডোবায় কে একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিলবিলিয়ে একশো জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের জোঁক ছাড়াচ্ছে। খেতের উঁচু মাটির দেওয়ালের উপর কোন কায়দায় একটা গরু উঠে পড়েছে কে জানে। এইবার বাগানের মধ্যে হড়াস করে নেমে আসবে।

নামুকগে। কত খাবে। বাগান ভর্তি সবজি আর সবজি। অঢেল, অফুরন্ত। বিশ বিঘের খেত।

থাক।

উকিল লিখেছে—হৃদয়াভ্যন্তরস্থিহেতু প্রাণপ্রতিমা আমার...। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে। লিখবে না! কত লেখাপড়া করেছে।

হু হু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের।

উকিল লিখেছে—ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি! একটু থমকে যায় মিছরি। কথাটা কী! ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধ হয় তাড়াহুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত হয় ভুল মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাঁক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বললে— এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল—হবে হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি!

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারও মুখে কথা নেই! মিছরি নড়ল না। চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝাঁক আসছে গাঙ পেরিয়ে। আসুক।

ছোটকাকার এক বন্ধু ছিল, ত্র্যম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ বাড়িতে। বিয়ের পর আর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনওদিন মনের কথা কিছু বলেনি তাকে ত্র্যম্বক। কিন্তু খুব ঘন ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দশবার আগুন চাইত।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে—ত্রিশ টাকার মধ্যে কলকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবি, বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর এক বছর চার মাস হল ঠিক ঠিক। আর কি পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়, তার উপর পুরুষমানুষ, লাফঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ, লঙ্কাগাছে জল ঢেলে কি বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনা জলে নোনাগাঙে জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি—

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আমগাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলার ময়লা মোটা পৈতেটা বেরিয়ে গেঞ্জির উপর ঝুলে আছে। বড্ড রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জি খোলেনি পাঁজর দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোটকাকাকে বলল—বউ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব ক'দিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি বাদার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেব। মশাই, কোনওখানে একটু ঠাঁই পেলাম না আমরা। বাঁচতে তো হবে নাকি!

ছোটকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে আসতে এতদূর এসে পড়েছি আর একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দু'জনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

উকিলবাবু আর কী লেখে? লেখে —সোনামণি, আমার তিনকুলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধর। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু হইবেই। ওকালতিতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব তো বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোনও না কোনও পেত্নী এসে আমার জায়গায় ডেঁড়েমুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভর্তি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কি বাঁচব উকিলবাবু?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁ হাতে সকলের পাঁচ ছ'টা করে কাঁচা লঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি এখনও নামেনি। সবাই কাঁচা লঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কী লেখে আর? লেখে—বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায়? ভাল দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জায় মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো...

গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে—আস্তে খা। ফুঁইয়ে ফুঁইয়ে ঠান্ডা করে নে।

—উঃ, যা রেঁধেছ না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে।

মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছতলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড় তেজ।

দলের মাতব্বর জিজ্ঞেস করে মিছরির বাবাকে—ওদিকে কি কোনও আশা নেই মশাই? অ্যাঁ! এত কষ্ট করে এতদূর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড় কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে—আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে...।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু



উষ্ণায়ন ও ওমিয়াকন

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী

পৃথিবীব্যাপী উষ্ণায়ন। আতঙ্ক। বিতর্ক। অভিযোগ। পাল্টা অভিযোগ।

এত কিছুর পরও অন্তত একটা জায়গায় কিছুটা স্বস্তি এনেছে উষ্ণায়ন।

২০১৫ সালের ২৮ জুলাই। পারদ ছুঁয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায়। ৩২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস!

একশো বছর আগের কথা। তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

উত্তর-পূর্ব রাশিয়া। ইয়াকুটিয়া প্রদেশ বা 'রিপাবলিক অফ সাখা'-র ছোট্ট গ্রাম ওমিয়াকন।

৬৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট উত্তর। ১৪২ ডিগ্রি ২৩ মিনিট পূর্ব। ইনডিগিরকা নদীর তীর।

পৃথিবীর শীতলতম জনপদ।

সাল ১৯২৪। রাশিয়ান বিজ্ঞানী সারগেই অবরিচেভ এ-যাবৎ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, -৭১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস নথিভুক্ত করেছেন। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও স্থায়ী জনপদে লক্ষ করা যায়নি। ১৯৩৩ সালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -৬৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস' ওমিয়াকন-কে পৃথিবীর শীতলতম জনপদের শিরোপা দিয়েছে। 'ওয়ার্ল্ড মিটিওরলজিক্যাল অর্গানাইজেশন'-এর সাম্প্রতিকতম তথ্যেও ওমিয়াকনের 'বিশ্বরেকর্ড' অক্ষুন্ন!

কাছাকাছি একমাত্র অ্যান্টার্কটিকার ভস্টক। ওমিয়াকনের থেকেও কম তাপমাত্রা। মাইনাস ৮৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ভস্টক কিন্তু স্থায়ী জনপদ নয়। অ্যান্টার্কটিকাতে রাশিয়ার গবেষণা কেন্দ্র।

ওমিয়াকনের শীতকাল। জীবনযাত্রা একেবারেই থমকে যায়।

বাড়ে তুষারক্ষত। নিউমোনিয়ার আতঙ্ক। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু, অনেক দূরে। কম করে ৮০০ কিলোমিটার। ইয়াকুটস্ক শহরে। চটজলদি পৌঁছনো অসম্ভব।

জ্বালানির অভাব। জ্বালানি জমে যায় দ্রুত। পরিবহণ ব্যবস্থা চালু রাখা যায় না। ঠান্ডায় পেনের কালি জমে যায়। ব্যাটারির শক্তি ফুরিয়ে যায় অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে।

ছোট-বড় বিবিধ সমস্যা সামলাতে হয় বাসিন্দাদের।

দুর্দশার ছবি টাটকা-নতুন ক্যামেরায় বন্দি করা যায় না। প্রবল ঠান্ডা, যান্ত্রিক গোলযোগে ক্যামেরায় বিকৃত ছবি ওঠে। একসময় ক্যামেরাটিই নষ্ট হয়ে যায়! সফরকারীদের এমন অভিজ্ঞতা বিরল নয়।

পাইপের মধ্য দিয়ে গরম জল দিতে হয়। না হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জল ভর্তি পাইপ বরফে জমে যাবে। তৈরি হবে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

নিরন্তর চালু রাখতে হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র। শীতের রাতে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন হতে পারে। তাহলে জনপদটি জীবনধারণের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

জীবনকালেই নয়। ঝক্কি চলে মৃত্যুর পরও। বছরভর শীতকাল। জমে যাওয়া গভীর বরফের স্তর খুঁড়ে মৃতদেহ সমাহিত করা কঠিন কাজ। কয়লার আগুনে বরফ কিছুটা গলানো হয়। তার পর দেহ পুঁতে দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

এখানেই শেষ নয়।

গ্রীষ্মে বরফ গলতে শুরু করে। তখন মাঝে মাঝে মর্মান্তিক, অভাবনীয় দৃশ্যদূষণের সাক্ষী থাকে ওমিয়াকন।

বরফ গলে। বরফের পাঁকের মধ্যে থাকা কফিন এদিক-ওদিক ভেসে ওঠে। ১০-১৫ বছর আগে মারা গিয়েছেন— এমন মানুষের কফিনও ভেসে ওঠে।

এত কষ্ট জেনেও এখানে বসতি হল কেন ? মানুষ স্থায়ীভাবে থাকছেই বা কেন?

পিছনে আছে ইতিহাস।

১৯২০ সালের আগে ওমিয়াকনে বলগা হরিণ চারণকারীদের অস্থায়ী ঘাঁটি ছিল। রাজনৈতিক বন্দিদের নির্বাসনে পাঠানো হত।

পরবর্তীতে সোভিয়েত সরকার পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চলের যাযাবর জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ নেয়। ওমিয়াকনে একটি স্থায়ী বসতি গড়ার কাজ শুরু হয়। সেই থেকে এই জনগোষ্ঠী, ওমিয়াকনের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একপ্রকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করছে।

রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে। দুর্গম স্থানটির সেতুবন্ধন ঘটে বহির্জগতের সঙ্গে। দেশ-বিদেশের পর্যটকরা আসছেন। নিকটবর্তী অঞ্চলে, অপেক্ষাকৃত কম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে গড়ে উঠেছে পর্যটন কেন্দ্র। নতুন জনপদ।

শীতে প্রচন্ড ঠান্ডা। গরম নেই বললেই চলে।

সারা বছর ওমিয়াকনে তাপমাত্রার বাড়া-কমা বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। জানুয়ারির শীত। গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জুলাইয়ে স্বল্পকালীন গ্রীষ্ম। গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার ব্যাপক পার্থক্য। সারা বছরের নিরিখে গড় তাপমাত্রা মাইনাস ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। ঠান্ডার তীব্রতা যথেষ্টই কষ্টদায়ক। বছরের বিভিন্ন সময়ে দিনের সময়কাল বাড়া-কমা করে। সূর্যালোক পাওয়ার পরিমাণের তারতম্য ঘটে।

দিনের সময়কাল গ্রীষ্মে ২১ ঘণ্টা। শীতে মাত্র ৩ ঘণ্টা।

বছরে শীতার্ত ওমিয়াকন গড়ে প্রত্যেকদিন ৫.২ ঘন্টা করে সূর্যের আলো পায়!

শীতকালে ওমিয়াকনে ঠান্ডার তীব্রতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শরীরকে উপযুক্তভাবে না ঢেকেঢুকে বাইরে বেরনো মাত্রই ত্বকের উন্মুক্ত অংশে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। হাত-পা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে আসবে। নাকের ভেতরে জলীয় অংশ জমে বরফ হয়ে যাবে। চোখের জলীয় অংশ জমে তুষার-শলাকায় পরিণত হবে। চোখের কম্পমান পাতাকে বিদ্ধ করে!

সানগ্লাস থাকলে আরও বিপদ। ফেটে মুখের উপরেই শক্ত হয়ে জমে যেতে পারে।

মোদ্দা কথা, ঠিকঠাক সুরক্ষা না নিলে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে একরকম ঝলসে যাবে। এক ঘন্টার মধ্যে জমে গিয়ে মারা যাবে।

ওমিয়াকনে এত ঠান্ডা পড়ে কেন?

উত্তর মেরু প্রদেশের কাছাকাছি। প্রাকৃতিকভাবেই খুব ঠান্ডা হওয়ার কথা। প্রায় হাজারখানেক ফুট উঁচু মালভূমির উপর অবস্থিত। উচ্চতার কারণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় তাপমাত্রা কিছুটা কম। ওমিয়াকনের ঠিক দু-পাশে দু'টি উঁচু পর্বতশ্রেণি। যেখান থেকে ঠান্ডা ভারী বায়ু ক্রমাগত নেমে আসে। জনপদটির তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। দু'পাশে পর্বতের বাধার কারণে ওমিয়াকনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বায়ু বা মেঘ আসতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়তে পারে না। আকাশও থাকে মেঘমুক্ত।

ভূ-পৃষ্ঠ বরফে ঢাকা। দিনের বেলা সূর্যরশ্মি অধিকাংশই বরফে প্রতিফলিত হয়। মহাশূন্যে ফিরে যায়। ভূ-পৃষ্ঠ বা সংলগ্ন বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয় না। রাতে আকাশ মেঘমুক্ত। দিনের সঞ্চিত-সীমিত তাপশক্তি বিনা বাধায় বিকিরিত হয়। ঠান্ডার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলে। এক সময়ে ছুঁয়ে ফেলে বিশ্বরেকর্ড!

এত ঠান্ডায় কীভাবে থাকেন মানুষজন? কেমনভাবে চলে তাদের জীবনযাত্রা?

খুব বেশি মানুষ এখানে বাস করে না। মেরেকেটে হাজারের মতো। বলগা হরিণ পালন-শিকার এবং জমা জলভাগের বরফ ভেঙে মাছ ধরা— প্রধান জীবিকা।

কাছেই পর্যটনকেন্দ্র। আছে খনিও। কিছু মানুষ কাজ করেন। গোটা জনপদটিতে একটি মাত্র খাবার-দাবারের দোকান। রুটি, দুধ, ঘোড়া, বলগা হরিণের মাংস আর কিছু আনুসঙ্গিক দ্রব্য বিক্রি হয়। রয়েছে একটি স্কুল। সম্প্রতি স্কুলের ভিতর শৌচাগার তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে, খুনে ঠান্ডার মধ্যে বাইরে বেরোতে হচ্ছে না। কচি-কাঁচারা আগের থেকে অনেকটাই নিরাপদে-আরামে পড়াশোনা করতে পারছে।

পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশে স্কুলগুলিতে ছুটির একটা নিয়ম আছে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কে (শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস) পৌঁছয় বা সামান্য নিচে নেমে প্রচুর তুষারপাত হয়— তখন ছুটি দেওয়া হয়। ওমিয়াকনের একমাত্র স্কুলটিতে ছুটি দেওয়া হয়, তাপমাত্রা অন্তত মাইনাস ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গেলে!

ওমিয়াকনে বড় ব্যবসাকেন্দ্র বা মল নেই। নেই সিনেমা হল। নেই তথাকথিত বিনোদন কেন্দ্র। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় গড়ে ওঠেনি মোবাইল পরিষেবা। আছে একটিমাত্র হোটেল। সেখানে গরম জলের ব্যবস্থা নেই। শৌচাগারে যেতে হলে ঠান্ডায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হোটেলের বাইরে বেরোতে হয়।

বেশিরভাগ বাড়ি লার্চ গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। লার্চের কাঠ শীতকালে ঘর গরম রাখে। গ্রীষ্মকালে ঘর গুমোটহীন-তাজা রাখতে সাহায্য করে। পাথরের তৈরি বাড়ি দেখা যায়। হিমশীতল ঘরগুলির মধ্যে কয়লা জ্বালিয়ে বাসযোগ্য করা হয়।

বেশিরভাগ মানুষ খাদ্য হিসাবে ঘোড়া, বলগা হরিণের মাংস এবং দুধ পছন্দ করেন। গ্রীষ্মে ফল ও শাক-সবজি খাওয়ার সুযোগ আছে। বেশিরভাগই তা খায় না। মাংস ও দুধ খেয়ে কাটায়।

ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে চামড়া ও ফার (মেরু শৃগাল, বলগা হরিণ ইত্যাদির লোম)-এর তৈরি পোশাক ব্যবহার করা হয়। বলা ভালো— আপাদমস্তক মুড়ে রাখে। মাথায় ফারের টুপি। গায়ে লম্বা ফার-কোট। হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বলগা হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি বুট জুতো। পশমের তৈরি একাধিক অন্তর্বাস ব্যবহার করতে এরা বাধ্য। শরীরটাকে একটু গরম রাখার জন্য এ-সব করা। পশুজাত দ্রব্য ছাড়া অন্য কোনও অজৈব বা কৃত্রিম দ্রব্য দিয়ে তৈরি গরম পোষাক বিশেষ কাজ দেয় না। কারণ, ঘরের বাইরে যাওয়া মাত্র এগুলি অনেকাংশে জমে যায়। ঘরের উষ্ণতায় ঢোকা মাত্র স্তরে স্তরে ফেটে যায়। ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। প্রাণঘাতী ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রস্তুতির পরও খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে আসে না। সাধারণভাবে প্রতি দু'দিনে একবার করে এখানকার বাসিন্দারা কাছের উষ্ণ প্রস্রবণে যায়। গরম পানীয় জল সংগ্রহ করে। প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণটি থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছে ওমিয়াকন।

স্থানীয় 'সাখা' ভাষায় ওমিয়াকন শব্দের অর্থ 'না জমে যাওয়া জল'।

রাশিয়ার এই অংশে পাওয়া গিয়েছে প্রচুর সোনা ও হিরে। বসবাসের ক্ষেত্রে ওমিয়াকনের আকর্ষণ বাড়ছে! আগামিদিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বসবাসের উপযোগী করবে।

এত ঠান্ডা। প্রতিকূলতা। তাও বাসিন্দাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা খুব উষ্ণ। খুবই সঙ্ঘবদ্ধ। বিপদে-আপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়। ভাগ করে নেয় সুখ-দুঃখ। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে কঠোরতম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। জীবনের জন্য। হারিয়ে দিতে পারছে সব বাধাকে... মৃত্যুকে!

এটাই এখানকার মানুষের সাফল্য। আনন্দ। হিমশীতল ঠান্ডায় ডুবে থাকা দুর্গম ওমিয়াকনে বেঁচে থাকার মূল রহস্য!

উপন্যাস

অবন্তীনগরের বাস

তৃষ্ণা বসাক

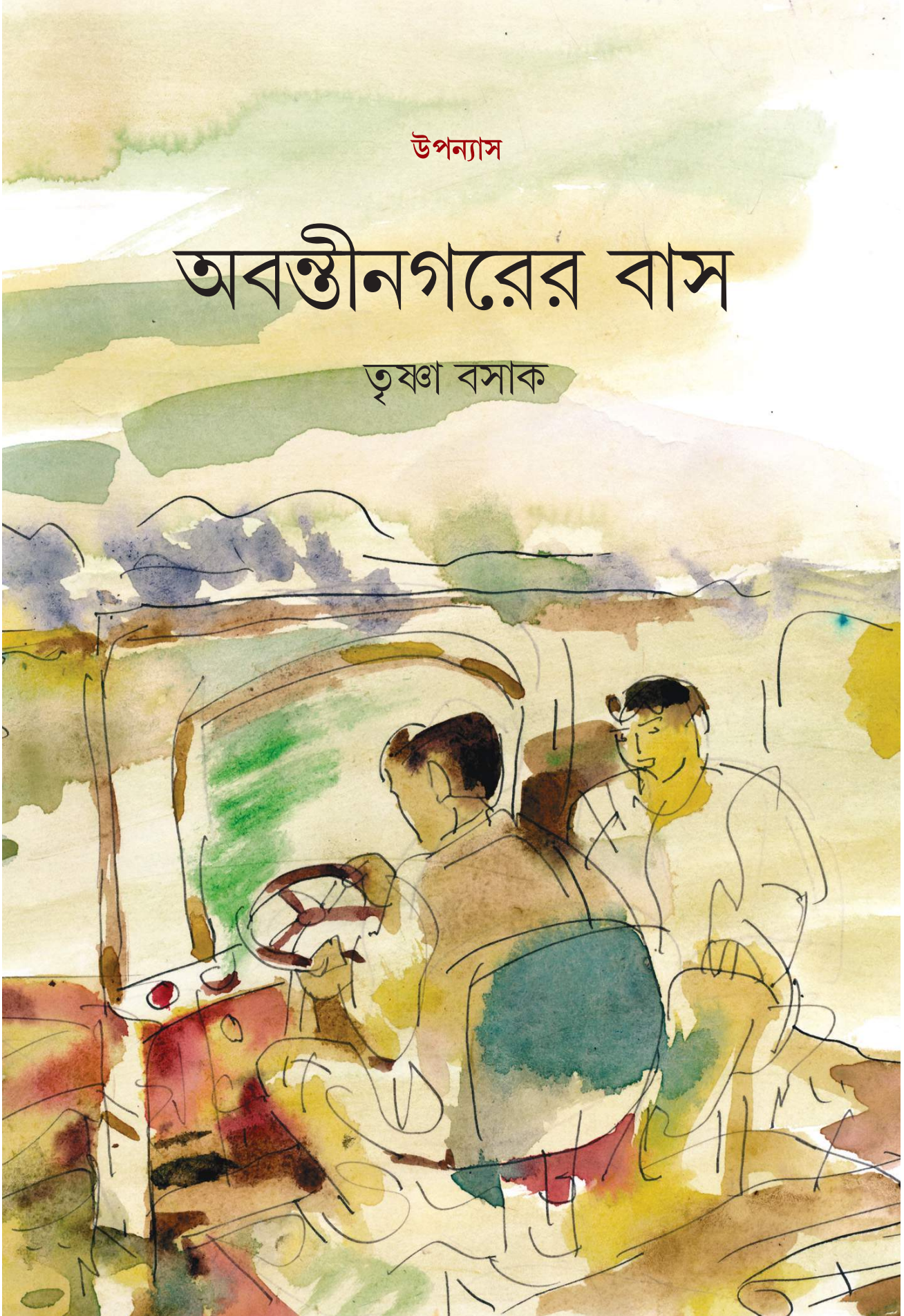

আগে খুব অসুবিধে ছিল যাতায়াতের। এখন এখান থেকে গদখালি টানা বাস যায়। খুব কপাল খারাপ না থাকলে একটা সিট পেয়েই যায় মিথিলেশ। ইঞ্জিনের উপর বাসেও চলে যায় মাঝে মাঝে। ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করে। ৮টা ২৪-র বাসে ড্রাইভার প্রায়ই স্বপন কিংবা পটা। স্বপন চুপচাপ, তাকে দেখলে মনে হয় এই দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা তার মাথায় চাপানো। পটা ততটাই মুখর, সে মাঝে মাঝেই মিথিলেশকে শাসানির ভঙ্গিতে বলে—

"এই পড়ালেখার লাইনটা ছাড়া, দুনিয়ার সব লাইনই চষা হয়ে গিয়েছে, বুঝলেন স্যার।"

মিথিলেশ জানে 'স্যার' শব্দটা ঠিক মাস্টার মানুষকে সমীহ থেকে বলে না পটা, 'স্যার' বলার সময় ওর চোখে কেমন আক্রোশ আর খুন খেলা করে। তবু, পটাকে ঠিক ভয় করে না মিথিলেশ, পটাকে কেন, কাউকে বা কিছুকেই ওর ভয় নেই আজকাল। গত ভাদ্রে ও ৪১ ছুঁয়েছে। আর ভয় মানায় ওকে?

মিথিলেশের চেহারায় অবশ্য সেই অকুতোভয় ব্যাপারটা নেই। বাবা, কাকা, ভাইয়ের তুলনায় খানিকটা বেঁটেই সে, রংটাও ওদের মতো টকটকে ফরসা নয়, সিমেন্টের কাছাকাছি। পদবিটা না বললে আর পাঁচটা বাঙালির থেকে ওকে আলাদা করা যাবে না। কিন্তু মিথিলেশ প্রসাদ ঝা শুনলে বেশির ভাগ লোকই কৌতূহলী চোখে তাকায়। এটা ঠিক, কয়েক পুরুষ আগে মিথিলেশরা দ্বারভাঙায় থাকত। পণ্ডিত বংশ। ওর এক পূর্বপুরুষ, পার্বতীপ্রসাদ ঝা হরিনাভি টোলে পড়াতে চলে আসেন পণ্ডিত রামশরণ তর্করত্নের ডাকে। সেই হরিনাভি থেকে আরও দক্ষিণে সরতে সরতে দু'পুরুষ আগে ওরা থিতু হয়েছে রত্নেশ্বরপুরে। এখন রত্নেশ্বরপুর থেকে গদখালি ডাইরেক্ট বাস সার্ভিস। আর গদখালিতে নেমে খেয়া পার হলেই তো অবন্তীনগর।

ঝিল্লিকে বলেছিল মিথিলেশ চাকরি পাওয়ার কথা। চল্লিশ পেরিয়ে চাকরি পেলে খুশির সঙ্গে যতটা নির্লিপ্ত থাকা উচিত, সেইরকম কেঠো গলায় খবরটা দিয়েছিল তাকে। কিন্তু ঝিল্লি, সেই শুনে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠল, এতটা উল্লাস বেজে উঠল তার গলায়, সামনাসামনি তক্ষুনি তাকে দেখতে ইচ্ছে করল মিথিলেশের। স্বামী-পুত্র নিয়ে জম্পেশ গৃহিণী ঝিল্লি মিথিলেশের জন্যে এখনও এতটা আবেগ জমিয়ে রেখেছে? মিথিলেশ তো ভেবেছিল, যা ছিল, তা শুধু তারই ছিল, তার দিক থেকে। ঝিল্লির দিক থেকে কিচ্ছু না। ঝিল্লির আনন্দ শুনে ওর এই প্রথম চাকরি পাওয়ার জন্যে দারুণ আনন্দ হচ্ছিল। এতক্ষণ চাকরি পাওয়াটা ওর কাছে অকূল সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে তীর পেয়ে যাওয়ার মতো একটা মরণ-বাঁচন সমস্যা ছিল। শুধু তীর ছাড়া ও আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ঝিল্লির সঙ্গে কথা বলবার পরই ও প্রথম তীরে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে চতুর্দিকে দেখার অবকাশ পেল। দেখল কী আশ্চর্য সুন্দর আকাশ, বেলাভূমি, জীবন, চাকরি পাওয়া।

তারপর থেকে ও যতবারই ঝিল্লিকে ফোন করত, ও কেবলই নতুন চাকরি, স্কুল নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করত। ওর উদ্দেশ্য ছিল ঝিল্লির গলা থেকে আনন্দের তাপ নেওয়া। এরকম একদিন ঝিল্লি মিথিলেশকে জিজ্ঞেস করল, "তোর স্কুল তো অনেক দূর। তুই কীসে করে যাস?"

মিথিলেশ সেই মুহূর্তে তার দ্বিতীয় আনন্দের খনি খুঁজে পেল। সে তার বাড়ি থেকে স্কুল যাওয়ার রাস্তাটুকু যৎসামান্য তথ্যের ভিত্তিতে এমন রঙিন করে তুলল যে, মনে হতে পারে সেটা কোঙ্কন রেলযাত্রা কিংবা খাণ্ডালা যাবার মতো কোনও প্রসিদ্ধ পর্যটনপথ। যারা সে পথে যায়নি, তারা জানে না, তারা কী হারাচ্ছে। রত্নেশ্বরপুর থেকে গদখালি—ঘণ্টা দু'য়েকের রাস্তা তো বটেই। আগে এই রুটে কোনও বাস ছিল না। অটোতে, ট্রেকারে ঝুলে ঝুলে যেতে হত। রত্নেশ্বরপুর থেকে জায়গা পাওয়া ছিল অসম্ভব। এখন ডাইরেক্ট বাস। মিথিলেশের চাকরি আর এই নতুন বাসরুট দু'য়ের বয়স প্রায় একই। সেই বাসও সীতাকুণ্ডু পেরিয়ে বুড়োবকুলতলা থেকে ছেড়ে আসে। রত্নেশ্বরপুর থেকে উঠে বসার জায়গা তবু একটা পেয়েই যায় মিথিলেশ। বেশির ভাগই স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভিড়, এঁড়িগেঁড়ি কোলে মা, মিস্ত্রি-মজুর, চ্যাঁ-ভ্যাঁ—তারই মধ্যে কিছু না পেলে ড্রাইভারের পাশে ইঞ্জিনের উপর সে যায় নিখিলেশ। বসে পড়তে পারলেই নিশ্চিন্ত। তখন পথের দু'পাশটা ওর। ও মনে মনে টুকে নিতে থাকে দু'পাশের গাছপালা, দোকানঘর, মাঠ, পুকুর, খেতে কাজ করতে করতে থমকে দাঁড়ানো বউ-ঝি, নেংটা ছেলের পাল, সিপিএম, তৃণমূলের অফিস, গুপ্ত রোগ, যৌন রোগের পোস্টার, সব, সব কিছু।

স্কুলে টিফিনের ঘণ্টা পড়লে ওর মনের মধ্যেও ঘণ্টা বাজে ঢং, ঢং, ঢং। ও ছাড়া পাওয়া পাখির মতো উড়তে উড়তে নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে ঝিল্লিকে ফোনে ধরে।

"জানিস কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?"

"জানি তো। একটা নদী।"

"বল তো কী নাম?"

"কী?"

"বিদ্যেধরী।"

"বিশ্রী নাম। ওর নাম দে ঝিল্লি।"

মিথিলেশ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। ঝিল্লি! ঝিল্লি! ঝিল্লি নদী! ও আজই গণপতি স্যারকে জিজ্ঞেস করবে পশ্চিমবঙ্গে ঝিল্লি নামে কোনও নদী আছে কি না। গণপতির ভূগোলে অনার্স ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলোও দেখে নিতে হবে। তখন কি ঝিল্লি নামে কোনও নদী ছিল?

"উঃ দারুণ বলেছিস ঝিল্লি নদী, অবন্তীনগরের ঝিল্লি নদী।" ঝিল্লি তখন নখে পালিশ লাগাতে লাগাতে ফিসফিসিয়ে বলে, "আমি একদিন যাব।"

মিথিলেশ বাঁ হাতে ফোন ধরে আছে, ডান হাত মুঠো করে আকাশের দিকে ছুড়ে চিৎকার করে বলল, "ইয়েস!"

তার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলে এইভাবে উল্লাস প্রকাশ করে। মিথিলেশ আজ ওর জীবনের তৃতীয় আনন্দের উৎস আবিষ্কার করেছে। ঝিল্লি আসবে! ঝিল্লি একদিন অবন্তীনগরে আসবে!

২

যত দিন যায়, তত নিখিলেশের কাছে বড় হয়ে ওঠে এক সমস্যা—ঝিল্লি কীভাবে ৮টা ২৪-র বাসটা ধরবে? তার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে ঝিল্লিকে অবন্তীনগরে যেতে হলে তার সঙ্গেই যেতে হবে। রবিবার বা অন্য ছুটির দিন গেলে তো চলবে না। মিথিলেশের বউ অবাক হয়ে যাবে। গ্রামের লোকেরা, এমনকী বাসের ড্রাইভার, খেয়ার মাঝি সবাই ভাববে, ছুটির দিন নিখিলেশ স্যার কী করতে একটা ঝিংচ্যাক মেয়েছেলে নিয়ে হাজির হয়েছে! কিন্তু মিথিলেশের সঙ্গে স্কুলের দিনে গিয়ে অতখানি সময় ঝিল্লি কী করবে, কোথায় বসবে, বাথরুম-টাথরুম পেলেই বা কী হবে? মিথিলেশের তো লাস্ট পিরিয়ড অবধি ক্লাস। অবন্তীনগরে স্কুলবাড়ি ছাড়া আর একটিমাত্র পাকা বাড়ি আছে, সে বাড়ি কাঁড়ারদের। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কাঁড়ারবাড়ির ছেলে এবারে ভোটে দাঁড়িয়েছে, ফলে সে বাড়ি একেবারে হট্টমেলা। সারাদিনই বাইক আর গাড়ির লাইন বাড়ির সামনে। হুমদো হুমদো চেহারার লোকজন অনবরত ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। ওর মধ্যে ঝিল্লি থাকবে—এ কথা ভাবলেও মিথিলেশের আতঙ্ক হয়।

এক দুপুরে টিফিনের ঘণ্টা পড়লে মিথিলেশ সমস্যাটা নিয়ে ঝিল্লির সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করল। ওর ধারণা ছিল, এ ব্যাপারে ও চিন্তাভাবনায় যতটা অগ্রসর হয়েছে, ঝিল্লিও বুঝি ততটাই। মিথিলেশ তাই শুরুই করল এই বলে, "আমি ভাবছি তুই থাকবি কোথায়?"

শুনেই ঝিল্লির বুক ধড়াস করে ওঠে। ব্যাপারটা সে শুনেই ঝিল্লির বুক ধড়াস করে ওঠে। ব্যাপারটা সে যতদূর সম্ভব গোপন রেখেছে। মিথিলেশ কীভাবে জানল? রেগে উঠতে গিয়েও তার মন পরক্ষণেই কোমল হয়ে যায়। মিথিলেশের সরল মুখ, ওর এলোমেলো চুল, মালিন্যহীন হাসি—চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এমন হাসি জগতের কোনও পুরুষকে হাসতে দেখেনি ঝিল্লি। সে সিদ্ধান্ত নেয়, মিথিলেশকে ও কনফিডেন্সে নেবে। এই কঠিন সময়ে, যখন নিজের মাও ওর পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করছে, তখন ওর তো একজন বন্ধু দরকার। আর ঝিল্লি নিশ্চিত, মিথিলেশ ওকে এখনও ভালবাসে।

"আমিও তো তাই ভাবছি, কোথায় থাকব।"

"তুইও ভাবছিস, না? আমি জানতাম, আমি জানতাম।" ঝিল্লি ভেবে পায় না, মিথিলেশের এত উল্লসিত হবার কারণ কী। ওর ঘর ভাঙছে বলে এত আনন্দ! যতই ভালবাসুক, ওর তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ঝিল্লি এবার বেশ নিস্পৃহ গলায় বলে, "ভাবব না? সারা জীবনের ব্যাপার। তাছাড়া জিদানকে এত দামি স্কুলে ভর্তি করিয়েছি, ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে তো থাকতে পারি না।" এই প্রথম মিথিলেশের আত্মবিশ্বাস টাল খায়। সারাজীবনের ব্যাপার মানে? ঝিল্লি কি অবন্তীনগরে সারাজীবন থাকার কথা ভাবছে না কি? তাছাড়া ওর ছেলের স্কুলের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক মাথায় ঢোকে না মিথিলেশের। হতে পারে, ঝিল্লির বর একজন নেচার লাভার। তার হয়তো মাথায় ঢুকেছে কলকাতা ছেড়ে এদিকে চলে আসবে ফ্রেশ এয়ারের মধ্যে থাকবে বলে।

সে উত্তেজিত ভাবে বলে, "না, না, এদিকে তোরা থাকতে পারবি না। সে তোর বর একটা ফার্ম হাউস বানাল, মাঝে মধ্যে উইকএন্ডে এলি, তাছাড়া সত্যি তো, ছেলের স্কুলের কথাটাও ভাবতে হবে। এখানে এসে থাকলে তোর ছেলেকে তো আমার স্কুলেই ভর্তি করাতে হবে রে। অবন্তীনগর শৈলেন্দ্র-মালতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।"

যেন একটা খুব মজার কথা বলেছে, গলা ফাটিয়ে হাসে মিথিলেশ। তারপর সে ঝিল্লিকে নিরুত্তর দেখে ফোনটা কানের কাছে নিয়ে বলতে থাকে "হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।"

তার কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কাছেই ফিরে আসে। ঝিল্লি ফোন ছেড়ে দিয়েছে। সেদিনের পর থেকে মিথিলেশ ঝিল্লিকে আর ফোনে পাচ্ছে না। ফোন ধরছেই না ঝিল্লি। কী হল কে জানে। ওই তো যেচে আসতে চেয়েছিল। এখন ফোন তো করেই না, ফোন করলেও ধরেও না। আরও একটা বড় সমস্যা নিয়ে আলোচনার ছিল। সেটা হচ্ছে, রত্নেশ্বরপুর থেকে ৮টা ২৪-র বাসটা ও ধরবে কী করে? শক্ত, খুবই শক্ত। প্রায় অসম্ভব কাজ। মিথিলেশ হিসাব করে দেখেছে, তার জন্যে ঝিল্লিকে প্রায় ভোর চারটেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরে বারুইপুর নামতে হবে। সেটা কি ও পারবে? ইচ্ছের জোর থাকলে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু, হ্যাঁ একটা বড় কিন্তু আছে। ঝিল্লি সেটা কেন করবে? যে কোনও মানুষই এই অভিযানের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। অবন্তীনগর কাশ্মীর কিংবা আরাকু ভ্যালি নয়, যে যার জন্যে ঝিল্লি এতটা কষ্ট স্বীকার করবে। এই জায়গাটায় এসে মিথিলেশ একটু দমে যায়। সত্যি বলতে কী, চাকরি পাওয়ার পর থেকেই সে একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। সেই কলেজ ছাড়ার পর থেকে প্রায় ১৫ বছরের অনিশ্চিত উপার্জনের জীবনে সে তো কত কিছু করেছে। টিউশনি, বন্ধুর সঙ্গে সার্জিক্যাল গুডসের ব্যবসা, দু'-চারটে জমির দালালি, এমনকী ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। যদিও শেষ পেশাটি একটিমাত্র ইভেন্টকে ঘিরে এবং সেটি তাদের রত্নেশ্বরপুরে হাইস্কুলের প্লাটিনাম জুবিলি। এর জন্যে তিনদিনব্যাপী সে কলকাতা থেকে কিছু আর্টিস্ট সাপ্লাই দিয়ে দালালি বাবদ কিছু কামিয়েছে। আর সেটা হেডমাস্টার নিরুপম মাইতির জ্ঞাতসারেই। এখনও ব্যাপারটা ভাবলে মিথিলেশ কেমন চুপসে যায়। যাই হোক, এইসব বহুবিধ ধান্দার খাতিরে গত পনেরো বছর সে কলকাতা ও তার সন্নিহিত কত মফস্বল শহরেই না গেছে। তবু, সে কোনওদিন ঝিল্লির বাড়ি যাবার কথা ভাবেনি, ফোনও করেনি। তবে, তার মানে এই নয় যে, ঝিল্লির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কলকাতা যেতে আসতে মাঝে মাঝেই স্টেশনে তার সঙ্গে ঝিল্লির দেখা হয়ে গিয়েছে। লালচে চুল, জিন্স-কুর্তি আর ব্র্যান্ডেড রোদচশমায় প্রথমে চিনতে না পারলেও ঝিল্লির কলস্বর তাকে আবার নিশ্চয়তা দিয়েছে। হ্যাঁ, এই তো সেই মেয়েটা, স্কুলে যাবার পথে সাইকেল থেকে যাকে অনেক চোরা চাহনি দিয়েছে সে। ইউনিভার্সিটিতে ওর বাংলা আর ঝিল্লির ফিলোজফি খানিকটা কাছাকাছি এনে দিয়েছিল তাদের। খানিকটাই। কারণ, ফিলোজফি মেয়েদের হৃদয় শুধুই এঞ্জিনিয়ারিং-এর ছেলেদের জন্যে। সেখানে বাংলা পড়া মুখচোরা মিথিলেশের কোনও চান্সই ছিল না। তবু দেশের ছেলে হিসাবে ঝিল্লির মিথিলেশের উপর খানিকটা ভরসা ছিল। ট্রেন বন্ধ থাকলে বাসে বা অটোতে কীভাবে ফেরা যায়, সে ব্যাপারে ঝিল্লির সহায় ছিল মিথিলেশ। মনে আছে, সেদিন ট্রেন বন্ধ। তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। কোনওরকমে ২১৮ নম্বর বাসে উঠেছে তারা। প্রচণ্ড ভিড়। লেডিসের সামনে দাঁড়িয়েছিল ওরা। তার জন্যে মিথিলেশকে নানান কটূক্তি শুনতে হচ্ছিল। তবু ঝিল্লি তার হাত ছাড়তে চায়নি। কামালগাজিতে দৈবাৎ একটা বসার জায়গা পেয়ে যাওয়ার পরেও, ঝিল্লি তার হাত ছুঁয়ে ছিল। হরিনাভির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় সে সোৎসাহে ঝিল্লিকে জানালা দিয়ে দেখাতে গেল "এইখানে আমার দাদুরা থাকত একসময়।" ঝিল্লি জানালা দিয়ে তাকিয়ে বৃষ্টিস্নাত দোকানপাট ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পায়নি, তবু সে বাইরের দিকেই তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে, আর মিথিলেশ শরীরে বিদ্যুৎস্পর্শ নিয়ে স্থানুর মতো। তার আঙুল অনিচ্ছাকৃত ভুলে ঝিল্লির শরীর

স্পর্শ করেছিল। বহুদিন সে স্পর্শ হারিয়ে ফেলেছিল তার হাত। কিন্তু স্মৃতি? আজ ঝিল্লি ফোন কেটে দেওয়ার পর স্মৃতির সেই সঞ্চয় তার শরীর ফিরে পেল সহসা। মিথিলেশ, নদীতীরে দাঁড়ানো মিথিলেশ, নিজের আঙুল চুম্বন করল। নদীতীরে কেউ কি ছিল না? ছিল। নদী কত পরিষেবা দেয় মানুষকে। স্নান, গরু চরানো, নৌকো সারাই ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত মানুষজন হয়তা দেখল অবন্তীনগর শৈলেন্দ্র-মালতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন মাস্টার মিথিলেশপ্রসাদ ঝা নিজের আঙুলে চুমু দিচ্ছে। তারা এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারল না। এই দৃশ্যের সৌন্দর্য ও বেদনা তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। তারা বুঝতে পারল নতুন মাস্টারটি ছিটেল, হয়তো বা বদ্ধ পাগল, তারা নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল স্বাভাবিকভাবেই। তাদের চিন্তাভাবনা বিষয়ে সম্পূর্ণ অসচেতন মিথিলেশ তখন ভাবছিল, সত্যিই তো আমি ঝিল্লির কে-ই বা? ঝিল্লি খামোখা অবন্তীনগরে আসবে?

৩

ঝিল্লি, দিস ইজ রায়া।

রায়া, দিস ইজ ঝিল্লি।

নার্সারির বাচ্চাদের যেভাবে বল কিংবা আপেল কিংবা বেড়ালের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়, প্রায় সেইভাবে অরুণাভ ঝিল্লির সঙ্গে রায়ার পরিচয় করাল এবং রায়ার সঙ্গে ঝিল্লির।

আজকে একটা চমৎকার দিন। ১৫ জুন পেরিয়ে গিয়েছে। যে কোনওদিন বর্ষা এসে পড়বে। আজ তার পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে কোথা থেকে বৃষ্টিমাখা হাওয়া ছুটে ছুটে আসছে। রোদ কিছুতেই জমিয়ে বসতে পারছে না। এমন দিনে খুব কেজো লোকের কাজের হিসাবও ঘেঁটে যায়।

আজ দিনটা খুব ভাল থাকতে পারত ঝিল্লি। তাকে দেখে মনেও হচ্ছে সে খুব ভাল আছে। মভ কুর্তি আর জংলা ছাপ লং স্কার্ট, সর্পিল টিপ, কানেও সর্পিল অক্সিডাইজড দুল, মভ লিপস্টিক, ব্র্যান্ডেড সানগ্লাস আর বার্গেন্ডি রঙের চুলে তাকে অলৌকিক দেখাচ্ছে। কফিশপের সামনে সে যখন ট্যাক্সি থেকে নামল, অরুণাভ, অল্পক্ষণের জন্যে হলেও, বিমূঢ় হয়ে গেল। রায়া অরুণাভর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণ তাকে ঠিকঠাকই লাগছিল। ক্রু-কাট চুল, জিনস্-পাঞ্জাবিতে ভারী চেহারাও বেশ ক্যারি করে রায়া। তার গায়ের রংটা খুব ফরসা, এছাড়া তার চেহারায় বলবার মতো জিনিসটা তার ব্যক্তিত্ব। যে কোনও লোক তার সামনে এসে কুঁকড়ে যায়। কিন্তু আজ ঝিল্লিকে দেখে রায়াই একটু কুঁকড়ে গেল, পরক্ষণেই তার গম্ভীর মুখের নিচে হালকা হলেও ফুটে উঠল জয়ের তৃপ্তি। এই মেয়েটাকে সে ফেডআউট করে দিল! অরুণাভ কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে দু'জনের পরিচয়পর্ব সারল, তারপর বলল, "চলো ভিতরে যাই।"

এখানে ঝিল্লি আগে কখনও আসেনি। সত্যি বলতে কী, কলকাতায় সে খুবই কম রেস্তোরাঁয় খেয়েছে। অরুণাভ পছন্দ করে না বাইরে বসে খাওয়া। সে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে ঘরে বসে শান্তিতে খাবার পক্ষপাতী। অন্তত ঝিল্লি তো তাই জানত এতদিন। আজ রায়া আর অরুণাভর সঙ্গে বসে সে জানতে পারল, ওরা প্রায়ই এখানে খেতে আসে। শুধু এখানেই নয়, কলকাতায় নতুন কোনও ফুড জয়েন্ট খুললেই সেটা ট্রাই করা না কি অরুণাভর হবি।

রায়া হঠাৎ অরুণাভকে জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই, মার্কো পোলোতে ইলিশ উৎসব কবে শুরু হচ্ছে গো?"

ঝিল্লির চোখ জ্বালা জ্বালা করে উঠল। অরুণাভর সঙ্গে তার আসন্ন বিচ্ছেদ তাকে তত কষ্ট দিচ্ছিল না, যতটা এই রায়া মেয়েটার নির্বাচন। ওর ধারণা, যাদের বাড়িতে রুই-কাতলা ছাড়া অন্য মাছ আসে না, তারাই এই সব ইলিশ উৎসবে গিয়ে হামলে পড়ে, তারাই বাংলা নববর্ষে হোটেলে পোস্ত, মোচাঘণ্ট খেতে যায়। বাড়িতে রাঁধা ইলিশ মাছের স্বাদ তো শুধু জিভে নয়, সে এক একাত্মতার সুখ। ছোটবেলায় বাবা সন্ধেয় ইলিশ নিয়ে ফিরলে তারা ভাইবোনেরা কেমন বাবার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত, মনে পড়ে গেল তার। ঝিল্লি যে সব মাছ খায়, সব মাছ রাঁধতেও পারে—এই পটুতায় এত বছর ধরে মুগ্ধ ছিল অরুণাভ। সে কি না রায়াকে! সে নিচু গলায় বলল, "আমি শুধু কফি নেব।" ওর এই উচ্চারণে ওদের সম্বিত ফিরল। রায়া কফি উইথ ক্রিম ছাড়াও প্রচুর স্ন্যাক্স অর্ডার দিতে যাচ্ছিল। সে খানিকটা ক্ষুণ্ণ ভাবেই বলল, "ওকে, আমি, ঠিক আছে। চিকেন স্যান্ডউইচ, বেশ খিদে পেয়েছে আসলে।"

অরুণাভ, সেও হয়তো অনেক কিছু খেত, খানিকটা স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, আমিও স্যান্ডউইচ, তবে চিকেনটা আজ আর খাব না, চিজ স্যান্ডউইচ নিই?" ঝিল্লি আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, "অযথা ব্যাপারটাকে আনুষ্ঠানিক শোক পালনের চেহারা দেবার দরকার নেই। তোমরা যা খুশি খেতে পারো। অরুণাভ তো জানে আমি বাড়ি থেকে সবসময় সাপটে ভাত খেয়ে বেরোই। আমার সত্যি খিদে নেই।"

কথাটা বলার সময় আবার বেয়াক্কেলের মতো তার চোখে জল চলে এল। অরুণাভ জানে, না জানত? বহুদিন চাকরি ছেড়ে নিজস্ব আর্কিটেকচারাল ফার্ম খুলেছে অরুণাভ। তবু রোজ সকালে বাজার করাটা তার কাছে একটা পবিত্র রিচ্যুয়াল ছিল। ঝিল্লির রাঁধা প্রতিটা পদ খেয়ে যাবার জন্য সে একটু বেলা করেই বেরোত। অনেক রাতে ফিরলেও বাড়ির খাওয়া প্রায় কোনওদিনও বাদ দিত না।

বছর দু'য়েক আগে ওর ফার্মের তৎপরতা এত বেড়ে গেল যে অরুণাভ প্রায়ই বাজার স্কিপ করতে লাগল, ডিনার এমনকী লাঞ্চও স্কিপ করতে লাগল। ঠিক এক বছর ন'মাস সতেরো দিন আগে এক মধ্যাহ্নে অরুণাভর ভাত বাড়বে কি না জানতে বেডরুমে ঢুকেছিল ঝিল্লি। অরুণাভ তখন স্নানে গিয়েছে। ওর শার্ট, প্যান্ট, ওয়ালেট, মোবাইল বিছানায় ছড়ানো। হঠাৎ টুং করে একটা শব্দ হল। মেসেজ এসেছে। বসে বসে বোর হচ্ছিল বলেই আলগোছে ফোনটা তুলে নিয়ে মেসেজটা পড়ল। 'U' নামের কোনও সেন্ডার পাঠিয়েছে।

"আজ ওসালিজে লাঞ্চ, মনে আছে তো? ব্লু শার্টটা পরে এসো।" ঝিল্লি দেখেছিল বিছানায় নীল শার্টটাই রাখা। ওর সারা শরীর অজানা বিষে মুহূর্তে নীল হয়ে গিয়েছি। বিষ ওর চলচ্ছক্তিও কেড়ে নিয়েছিল। তবু, স্নান করে, কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে অরুণাভ যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, বরাবরের অভ্যেসে ও লাফিয়ে উঠে পড়ে বলল, "ভাত বাড়ি?"

অরুণাভ ওর জলকণাখচিত শরীর দিয়ে ঝিল্লিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "না সোনা, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আজ ক্লায়েন্ট খাওয়াবে, খুব বড় ডিনার ব্যাপার আছে।"

"ক্লায়েন্ট কি জামার রং-ও বেছে দেয়?" প্রশ্নটা উঠে এসেছিল ঠোঁটে, তবু কিছু বলেনি ঝিল্লি। ১ বছর ৯ মাস ১৭ দিন আগে। কিংবা তার পরেও এতদিন ধরে। ও যেন জানতই, এটাই হবে, এটাই হয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে হঠাৎ করে ওর বাবা মারা গিয়েছিলেন। একদম সুস্থ, সাতচল্লিশ বছরের এক পূর্ণযৌবন



মানুষ। অসামান্য রূপবান পুরুষ। তাঁকে হারাবার পর থেকে ঝিল্লি বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে যে কোনও ঘটনাই ঘটতে পারে। মৃত্যু, বিচ্ছেদ, দুর্ঘটনা—এগুলো ওর জীবনে অনিবার্য। ও প্রতি মুহূর্তে নিজেকে তার জন্যে তৈরি রাখে। কিন্তু এই ঘটনাটা ওকে একটু এলোমেলো করে দিল। ছেলেকে আনা-নেওয়া, তাকে পড়ানো, তার জন্যে নিত্যনতুন টিফিন বানানো—যে কাজগুলো ও খুব ভালবেসে করত, সেগুলো তার কাছে বোঝা মনে হল। মনে হল, অন্য কারও সংসারে সে বেগার খাটছে। তার প্রতিদিনের অভ্যস্ত কাজে ভুল হতে লাগল। তার সে ভুলগুলো অরুণাভর চোখে ধরাও পড়ছিল না, এটা আরও বেদনার ছিল। অরুণাভ নতুন সম্পর্কে নেশাগ্রস্তের মতো ডুবে যাচ্ছিল। কখনও কখনও বাড়িতে খেলেও সে বুঝতে পারত না, ঝিল্লির হাতের রান্নায় আর সে স্বাদ নেই, আর শরীরের স্বাদ! আগের থেকেও আগ্রহে, একটু সাজিয়ে তোলা আগ্রহেই ঝিল্লির উপর ঝাঁপাচ্ছিল অরুণাভ, কিন্তু ঝিল্লি যে আগের মতো ওকে গ্রহণ করতে পারছিল না, সে অনুভব করার ইচ্ছে, ক্ষমতা বা সুযোগ কিছুই তার কাছে ছিল না।

ঝিল্লি বলার পর রায়া আর অরুণাভ প্রাণ খুলে নিজেদের পছন্দের খাবর অর্ডার দিল। খাবারগুলো টেবিলে আসা পর্যন্ত অস্বস্তিকর নৈশব্দ্য। তারপর দু'জনের আকণ্ঠ খাওয়ার মাঝখানে গভীর নিঃসঙ্গতায়, উপবাসে ডুবে যেতে যেতে ঝিল্লি ভাবল, আজকে একটা নষ্ট দিন। তার চেয়ে, মিথিলেশ এত করে বলে, ওর সঙ্গে অবন্তীনগরে গেলে হত। অবন্তীনগরে এখন ডাইরেক্ট বাস যায়। বাস থেকে নেমে ছোট্ট একটা নদী, ওরা সেই নদীটার নাম দিয়েছে ঝিল্লি। সে কথা মনে করে, রায়া আর অরুণাভর অমিত আহারের মাঝখানে বসে ঝিল্লি কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছিল।

৪

গরমের ছুটি এবার একটু আগেই পড়েছিল। প্রায় দু'সপ্তা আগে। সেই ছুটি শেষ হয়ে স্কুল খুলে গেল। তবু বর্ষা নামার নেই। পারদ ৪০-এর নিচে নামছেই না, আবহাওয়ায় একটুও জলীয় বাষ্প নেই। বঙ্গোপসাগরের বুকে যদি বা একটু জমবার সম্ভাবনা হয়েছিল...

টিচার্স রুমে যেন আলিপুর হওয়া অফিসের একটা শাখা খোলা হয়েছে, এই ভঙ্গিতে আলোচনাটা হচ্ছিল। জ্ঞানবাবু সারাদিনে প্রচুর কলা খান। ওঁর নাকি পটাশিয়ামের ঘাটতি আছে। একটা কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে উনি বললেন, "আরও পনেরো দিন।"

"পনেরো দিন, আরও! মরে যাব তো।"

"আমার কাছে পাকা খবর আছে, পনেরো দিনের আগে গাঙ্গেয় পশ্চিম উপকূলে মৌসুমী বায়ু ঢুকছে না।"

"ও দাদা, এ তো আপনি বর্ষার নিদেন দিচ্ছেন। আমরাএকটু ঝড়-টড় চাইছি, দু'-এক পশলা বৃষ্টি অন্ত।"

জ্ঞানবাবু বিরক্ত হয়ে পরের কলাটায় মন দিলেন। রাজরূপ আর

অশ্বিনীবাবু নিচুগলায় আলোচনা শুরু করলেন হাওয়া অফিসের অভাবনীয় উন্নতি বিষয়ে।

"সত্যি, আজকাল ওদের ফোরকাস্ট হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর গোলদার যদি বলত আজ বৃষ্টি হবে, লোকে বাড়িতে ছাতা রেখে যেত।"

"আরে, ইনস্যাট ওয়ান, টু সব খবর পাঠাচ্ছে না? সেখানে ভেজাল চালাবে কী করে?"

মিথিলেশ কোণের চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে চোখ বাড়াল। এসব কথাবার্তা তাকে টানে না। কি গরম, কি শীত কিছুতেই তার যায় আসে না। চল্লিশের পর যারা চাকরি পায়, গরম তাদের কী কাবু করবে? জ্ঞানবাবু, রাজরূপ, অশ্বিনীবাবু—এদের প্রায় সবার বাড়িতে গত বছরের গরমেই এসি লাগানো হয়ে গিয়েছে। ওরা স্কুলে এসে সারাক্ষণ গরমের গল্প বলে আর বাড়ি ফিরে ঠান্ডা ঘরে ঢুকে যায়।

মিথিলেশের নতুন চাকরি, ও ওদের কীভাবে বলবে, "এসি না লাগিয়ে যদি গরমটাকে একটু মানিয়ে নিতেন তবে পারদ এত চড়ত না। তোমরা সবাই এসি লাগাবে, সবাই গাড়ি কিনবে, তাহলে তো গরম বাড়বেই।"

এসব বলতে পারবে না বলেই মিথিলেশ জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। এখান থেকে নদীটা খানিকটা দেখা যায়। ভাল হত বাইরে চলে গেলে। কিন্তু বড্ড চড়া রোদ। এই রোদে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে লোকে পাগল ভাববে। হঠাৎ ওর মোবাইল বাজল। নিউ কল। অচেনা একটা নাম্বার।

টিচার্স রুমে বসে ফোনে কথা বলতে কেমন অস্বস্তি হয় মিথিলেশের। শুধু টিচার্স রুমে নয়, কোনও পাবলিক প্লেসেই ও ফোনে কথা বলতে পারে না। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে, বাসে ফোন বাজল। বউ বলল, মাসিরা এসেছে, বাসস্ট্যান্ড থেকে সিঙাড়া নিয়ে যেতে। বাসের মধ্যে বসে মিথিলেশ কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারল না, ক'টা সিঙাড়া নেবে। স্ট্যান্ডে নেমে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, সন্তর্পণে চারদিক দেখে নিয়ে, যে ফিসফিস করে বউকে ফোনে জিজ্ঞেস করল, "ক'জন এসেছে? ক'টা সিঙাড়া নেব?"

তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে যে বিবাহ বহির্ভূত কোনও বালিকা বন্ধুর সঙ্গে প্রেমালাপ করছে কিংবা সংসদ ভবন উড়িয়ে দেওয়ার ছক কষছে সহ-জঙ্গির সঙ্গে।

স্কুলে তার বড় একটা ফোন আসে না। সে-ই মাঝে মাঝে ফোন করে ঝিল্লিকে। যখন নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তখনই তার ঝিল্লির সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হয়।

আজও সে ফোনটা নিয়ে টিচার্স রুমের বাইরে চলে এল। ততক্ষণে বাজতে বাজতে থেমে গেল ফোন। অচেনা নাম্বারটা দেখতে দেখতে মিথিলেশ স্কুলবাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। ভ্যানে করে অনেক চেয়ার এসেছে। একজন খিটখিটে চেহারার লোক সেগুলো নামাবার তদারকিতে ব্যস্ত। ভোট এসে গেল। মিথিলেশ লোকটাকে পেরিয়ে যাবার সময় আবার ওর ফোন বাজল। যেন তার মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটছে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মিথিলেশের দিকে তাকাল লোকটা। ফোন বাজার জন্যে অপরাধবোধ পেড়ে ফেলল মিথিলেশকে, এবারেও সে ফোনটা ধরতে পারল না। হাঁটতে হাঁটতে সে সত্যি নদীর ধারে চলে এসেছে। কাঠফাটা রোদ। তার সঙ্গে ছাতা নেই। রোদ, নদী, ঘাটে বাঁধা নিঃসঙ্গ নৌকো—এদের কাছে মিথিলেশের কোনও সঙ্কোচ নেই। এখন ফোনটা বাজুক, সে প্রার্থনা করছিল। সেটা বাজল। বাজতেই চট করে ধরল মিথিলেশ।

"কী ব্যাপার? ক্লাসে ছিলে না কি? এতবার ফোন করছি।"

ঝিল্লি। মিথিলেশ আশ্চর্য হয়ে বলল, "নতুন ফোন নিলি? আগেরটা?

"আছে। সবাইয়ের জন্যে। এই সিমটা শুধু তোর সঙ্গে কথা বলার জন্যে। সেভ করে নে।"

মিথিলেশের মনে হল ও উড়ে চলে যাবে। শুধু তার জন্যে একটা সিম এই ত্রিভুবনে! এ বড় বিস্ময়ের কথা। এই সেদিন পর্যন্ত যার জন্যে পৃথিবীতে কোনও চাকরি ছিল না, তার জন্যে আস্ত একটা নাম্বার!

সে স্বপ্নচালিতের মতো বলল, "আমার জন্যে!"

"উঃ, হল কী তোর! শোন, আজ দিনটা খুব সুন্দর শুরু হয়েছিল বুঝলি। রোদ ওঠেনি। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া আসছিল কোথা থেকে। আমি খুব সেজেছিলাম। এরকম একটা দিনে, তোর সঙ্গে অবন্তীনগরে যেতে পারতাম বল। কিন্তু দিনটা নষ্ট হয়ে গেল।"

"নষ্ট হয়ে গেল!" প্রতিধ্বনির মতো ঝিল্লির কথাগুলোই আবৃত্তি করে মিথিলেশ।

"হ্যাঁ, একদম নষ্ট হয়ে গেল। তুই ভাবতে পারিস, এরকম একটা দিনে আমাকে একটা ঝিংচ্যাক রেস্তোরাঁয় বসে দেখতে হল দু'জন লোক গবগব করে খাচ্ছে।"

মিথিলেশ ভেবে পেল না, এর মধ্যে নষ্ট হবার ব্যাপারটা কোথা থেকে আসছে। রেস্তোরাঁয় তো মানুষজন খেতেই যায় আর গবগব করেই খায় তারা। তারপরই তার খেয়াল হল, ঝিল্লি সবার নয়, দু'টো মানুষের খাওয়ার কথা বলছে। তারা কারা? বিশেষ কেউ? তাদের সঙ্গেই ঝিল্লি রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল? কেন? সে কিছু খায়নি? না খেলে কেন খায়নি? মিথিলেশ রীতিমতো একটা রহস্য কাহিনির গন্ধ পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ওর মনে হল এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে ওর জন্যে উৎসর্গীকৃত সিমের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। ও উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করতে গেল, কাদের সঙ্গে ঝিল্লি রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ঝিল্লি তাকে প্রশ্ন করল, "তোর টিফিন হয়ে গেছে?"

"এই তো, তোর ফোন আসার একটু আগে।"

"কী খেলি?"

মিথিলেশ যেন খুব চেষ্টা করে মনে করল, "রুটি, ভিন্ডিভাজা আর রসমুণ্ডি। ও হ্যাঁ, একটা আপেলও ছিল।"

সীমা আজকাল তার স্বাস্থ্যের খুব খেয়াল রাখছে। প্রায়ই টিফিনে আপেল দিয়ে দেয়। টিফিনবক্স খুলে আপেল দেখলে মিথিলেশ কেমন যেন কুঁকড়ে যায়। ছেলের খাবারে ভাগ বসাচ্ছে—এমনটাই মনে হয় তার। আপেল, কেক, পেস্ট্রি—আরও কত মহার্ঘ্য খাবারে যত্ন করে সীমা রোজ ছেলের টিফিনবক্স সাজায়। মিথিলেশ বেরনোর একটু পরেই সে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দু'বার অটো বদলে কাজী নজরুল মেট্রো স্টেশন। সেখান থেকে কালীঘাটে নেমে আবার অটো। প্রতিদিনের মা-ছেলের এই যাত্রাপথটুকু নতুন নতুন আবিষ্কারে ভরে থাকে। সেদিন সীমা দেখেছে ইস্কুলের সামনে মোচা কেটে বিক্রি হচ্ছে। অতএব যে মোচা বারো থেকে পনেরো টাকায় মিথিলেশ কেনে, তাই সে গর্বিত মুখে ৩৫ টাকা দিয়ে নিয়ে এল। মিথিলেশ কিছু বলে না। মিথিলেশ যখন চাকরি পায়নি, টিউশনি আর নানা উঞ্ছবৃত্তি করে সংসার চালাত, তখন সীমা কীসের ভরসায় ছেলেকে কলকাতায় দামি স্কুলে ভর্তি করাল, সেটা সীমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি মিথিলেশ। ছেলেকে স্কুলে ঢুকিয়ে সীমার হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় থাকে। সেই সময়টা সীমা কত কী করতে পারে। কত অর্থকরী বৃত্তি আছে দুনিয়ায়। মিথিলেশ কোনওদিন

জানতে চায়নি। চল্লিশের পর যারা চাকরি পায়, তাদের এত কিছু জানার অধিকার থাকে না। ছেলের জ্ঞানের জগৎও তার থেকে কত আলাদা হয়ে যাচ্ছে, দেখে তার বেদনা হয়, তাও সে চুপ করে থাকে। শুধু টিফিনে এই আপেলটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সীমার লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের মতো টুকটুকে লাল আপেল দেখলে তার কেমন বিবমিষা হয়।

"রসমুণ্ডি!" ঝিল্লি যেন লাফিয়ে ওঠে। "খাওয়াবি একদিন? দাদু নিয়ে আসত। আমি বলতাম চিকচিকে মিষ্টি।"

মিথিলেশ জানে সব মানুষের ছোটবেলার একটা নিজস্ব অভিধান থাকে, সেখানে সব প্রিয় জিনিসের একটা নিজস্ব নাম দেয় তারা। মিথিলেশেরও ছিল হয়তো। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা তাকে তেমন আকর্ষণ করে না। তার এই বড়বেলাটাই বা খারাপ কী? এটা বরং অনেক ভাল, সে নিজের মতো থাকতে পারছে। যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন। এখানে তো অবন্তীনগর আছে, ঝিল্লি সেখানে আসতে পারে যে কোনও দিন।

সে গাঢ় স্বরে বলল, "খাওয়াব। তুই যেমন আমার জন্যে একটা আলাদা সিম নিয়েছিস, আমি তোর জন্যে একটা নতুন রাস্তা খুঁজে বার করেছি, একটা নতুন বাসরুট। তুই কবে আসবি ঝিল্লি?"

৫

ঝিল্লি দ্রুত হাতে চোখে কাজল লাগায়। এই কাজলটা নতুন বেরিয়েছে। বেশ একটা নাটকীয়তা আছে এর মধ্যে। রহস্যময়তাও। পরে এলে মনে হবে এই কাজলটানা চোখদুটোর পিছনে অনেক কথা লুকিয়ে আছে।

পৃথিবীর সব মানুষের আড়ালেই আর একটা মানুষ লুকিয়ে থাকে বলে ঝিল্লির মনে হয়। খুব সাদামাটা চেহারার ড্যাবড্যাবে অভিব্যক্তিহীন চোখের তলায় অনেক কথা থাকতে পারে, থাকেও। কিন্তু রায়া—তার ব্যক্তিত্বময়ী চেহারার আড়ালে যেন কিছুই লুকনো নেই। ওর জীবন যেন খুব গোছানো সংসারের মতো। চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়, নিজের কৌটোটা কোথায়, কিংবা নরেন্দ্রনাথ মিত্রর গল্পমালার চতুর্থ খণ্ডটা কোন তাকের কোন জায়গায় রাখা আছে। সেখানে কিছুই হারিয়ে যায় না। সব কিছু ঠিক ঠিক জায়গায় হাতের কাছে রাখা। এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে কাজ করা যায়, সিনেমা দেখা যায়, রেস্তোরাঁয় খাওয়া যায়, কিন্তু প্রেমে পড়া? ঝিল্লির কাছে এ বড় আশ্চর্য ঘটনা।

যাক গে মরুক গে। এসব অরুণাভর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঝিল্লির সেখানে নাক গলানোর দরকার নেই। ও তো চলেই যাচ্ছে। ওর হাত আরও দ্রুত চলতে লাগল। এখন বারোটা বাজে। সোয়া একটায় সময় দেওয়া আছে। সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে নিউ গড়িয়া একঘণ্টায় পৌঁছে যেতে পারবে না? মেট্রো ধরবে তো। আর দেরি হলেই বা কী। অরুণাভ একটু দাঁড়াবে, এই তো। ও ঝিল্লির যতখানি ক্ষতি করেছে, তার তুলনায় এইটুকু অপেক্ষা কিছুই নয়।

ভাবল বটে, কিন্তু সাজতে আর বেশি সময় নিল না ঝিল্লি। এ বাড়িতে স্নান, খাওয়া, সাজগোজ সবই যেন হাওয়ার উপর ভেসে ভেসে চলেছে, ভিতরে কিছুই ঢুকছে না। ঝিল্লি যেন একটা ভরহীন, ভারহীন পাখির পালক। এমনকী তার যন্ত্রণারও কোনও ভর, ভার নেই। সে আর তার যন্ত্রণা—দু'জনে নিরালম্ব শূন্যে দু'জনের সমান্তরালে ফ্লেমিঙ্গো নেচে যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে নেচেই যাচ্ছে, কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না। মাঝে মাঝে কান্না পায়, সেই কান্নাটাও মাটি ছোঁয়ার আগে উড়ে উড়ে কোথায় চলে যায়। ঝিল্লি যেন হঠাৎ একটা অতি-হাওয়ার দেশে চলে এসেছে।

কাচ বসানো রাজস্থানি ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে এসে সে খেয়াল করল, আজও সে সেই ম্যাজেন্টা কুর্তি আর লং স্কার্টটা পরে এসেছে, যেটা পরে ওদের সঙ্গে খেতে গিয়েছিল, বলা ভাল ওদের খাওয়া দেখতে গিয়েছিল। আসলে ও এখন যেখানেই বেরোচ্ছে, এটাই পরে যাচ্ছে। সমস্ত জামাকাপড় প্যাক করে ফেলেছে তো, তার, ছেলের। দু'-চারটেই যা বাইরে আছে।

বেশ লাগছে, মনে হচ্ছে কোনও হোটেলে আছে। এক-একদিন ইচ্ছে করে, দরজা-জানলা খোলা রেখে বেরিয়ে যেতে। এ বাড়ির কিছু চুরি হলে তার কিছু এসে যায় না। যে জানলার কাচগুলো সে নিয়মিত মুছেছে, দরজার কোণ, ফ্রিজের পিছন, খাটের তলা—কাজের লোক মুছে যাবার পরও আবার নিজে মুছেছে, দামি কাচের বাসন নিজে মেজে, মুছে তুলে রেখেছে অতিথি চলে যাবার পর, —সেই বাড়ির কোনও ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কা তার মনে রেখাপাত করে না। তবু, বাইরে বেরোবার সময়, সে জানলা বন্ধ করতে, দরজায় তালা লাগাতে ভোলে না। এ কি নিছকই বছরের পর বছর ধরে একভাবে বাঁচার অভ্যেস? না কি অন্য কোনও অজানা অনুভব?

অরুণাভ বলেছিল, সে আর ছেলে এই পুরনো ফ্ল্যাটেই থাকুক। অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে ওদের সরাতে চায় না সে। এখান থেকে ছেলের স্কুল খুব কাছে, বাজার-দোকান চেনা, পার্লার বাড়ির নিচেই, সামনে দিয়ে হাজারটা বাস।

কিন্তু তাদের বারো বছরের দাম্পত্যের প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী এই বাড়িতে ঝিল্লি মেয়াদের একদিন বেশি থাকতে রাজি নয়। রায়াকে নিয়ে সে একটি কথাও বলেনি, কিন্তু নতুন ফ্ল্যাট পাবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। যে অরুণাভর সামনে দাঁড়াতে তার গা ঘিনঘিন করে। তার সঙ্গে সে তর্ক করেছে, শির খিঁচিয়ে ঝগড়া করেছে। অশান্তির কোনও সুযোগই সে নষ্ট করেনি। যখনই সে শুনেছে নতুন ফ্ল্যাটটি বাইপাসের ধারে, নতুন মেট্রো স্টেশনের লাগোয়া, সেখান দিয়ে সে বারুইপুরে সহজে যাতায়াত করতে পারবে, ফ্ল্যাটটি পাবার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। এই ফ্ল্যাট থেকে অবন্তীনগরে যাওয়াও কি সহজ হবে না? অবন্তীনগর, মিথিলেশ। একটা জায়গা, একটা মানুষ। জায়গাটা সে কখনও যায়নি আর মানুষটাকে দেখেছে কত বছর আগে। মাঝেমধ্যে এক-আধবার দু'-তিন মিনিটের দেখা হয়েছে। সেটাও তো বছর তিনেক হয়ে গেল। তাছাড়া সেই মিথিলেশ আর এই মিথিলেশ তো এক নয়। ঝিল্লির আজকাল মনে হচ্ছে মিথিলেশ অনেক বদলে গেছে, এখন সে নিজের জীবনে অনেক স্বচ্ছন্দ। আগে মনে হত, অন্যের জুতো পরে ঘোরার মতো, সে অন্য কারও জীবনে ঢুকে পড়েছে।

ঝিল্লিও কি এতদিন অন্য কারও জীবন পায়ে গলিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল? সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এটা তার মাপের চেয়ে অনেক ছোট, লাগছে, ফোস্কা পড়ছে, তবু সে জুতোটার সঙ্গে ক্রমাগত মানাবার চেষ্টা করে গেছে। এবার নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে, সে ঠিকঠাক মাপটা খুঁজে পাবে না কি? ট্যাক্সি থেকে কালীঘাট মেট্রোর সামনের ফুটপাতে অনেকগুলো খেলনার দোকান। খেলনা আর জাঙ্ক জুয়েলারি দেখলে সে এখনও নিজেকে সামলাতে পারে না। একটা ছোট্ট টেডি বিয়ারে তার চোখ আটকে গেছে। নীল রঙের টেডি নেই তার ছেলের, এই সাইজটা তো নয়ই। টেডিটা থেকে চোখ সরাতে পারছিল না ঝিল্লি। দামও খুব কম। কিন্তু নিতে গিয়েও নিল না সে। তার এখন কার্যত কোনও বাড়ি নেই। একটা অস্থায়ী আস্তানা। যাই কিনবে সেগুলো প্যাক করে গুছিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া সব অভ্যেসের মতো, খরচের অভ্যেসেরও বদল দরকার তার। সে শুধু তো নতুন ঠিকানায় যাচ্ছে না, উপার্জনহীন মানুষ হিসাবে

সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার এক বিপজ্জনক ও অদ্ভুত ভূমিকায় নিতে চলেছে। ফ্ল্যাটটা নিশ্চয় অনেক দাম দিয়ে অরুণাভ তাদের কিনে দিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ছেলের পড়াশোনার খরচও সে এখন দেবে। কিন্তু সংসার চালানোর কোনও টাকা তার কাছ থেকে ঝিল্লি নেবে না। তার নামে কিছু টাকা আছে, বাবা রেখে গেছিল, সেটা বেড়ে যা দাঁড়িয়েছে, তার সুদে প্রথম ছ'মাস চালাবার কথা ভেবেছে। কিন্তু তারপর? নতুন করে সংসার পাতার একটা বিরাট খরচ আছে। এখান থেকে মা'র দেওয়া খাট ও অন্যান্য আসবাব এবং নিজেদের জামাকাপড় ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছু নেবে না সে। ফলে হাঁড়ি, কড়া, ছাঁকনি, মগ, বালতি সবই তাকে কিনতে হবে। হয়তো এটার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু এই সংসারের প্রাত্যহিকতার স্পর্শ লাগা কোনও কিছুই সে নতুন সংসারে নিয়ে যেতে পারবে না।

মেট্রোর টোকেন কেটে এন্ট্রি করে ঢুকছে, হঠাৎ কে ডাকল, "অ্যাই ঝিল্লি।" বিদিতা! বিদিতার পাশে একজন পুরুষ, বিদিতা আলাপ করিয়ে দিল "অর্ণব মুখার্জি, আমার কলিগ, আর এ হচ্ছে ঝিল্লি, যাদবপুরে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।"

অর্ণব মুখার্জি বললেন, "আমরা তাহলে সবই যদুবংশ? আমিও যাদবপুর, কমপ্যারেটিভ লিটারেচার।"

বিদিতার কলিগ? তার মানে বিদিতা চাকরি করে?

ঝিল্লি চট করে মোবাইল বার করে বলল, "অ্যাই 9432574692 এই নম্বরে একাট মিসড কল দে তো।"

বিদিতা চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল টাওয়ার নেই।

"বিএসএনএল নিশ্চয়ই। তুই আর পাল্টাবি না।"

ঝিল্লি বলল, "পাল্টেছি তো। যাদবপুরে যখন পড়তাম তখন তো মোবাইল ছিল না।"

অর্ণব মুখার্জি পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে পিছনে বিদিতার নম্বর লিখে দিয়ে বললেন, "এতে দু'জনের নম্বরই রইল।"

ঝিল্লি কার্ডটা নিয়ে বলল, "আসি রে, আমার ট্রেন এসে গেছে।"

মেট্রোয় উঠে ঝিল্লি দেখল ওরা দু'জন স্মিতমুখে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

৬

বর্ষা এল। যে বর্ষার জন্যে এতদিন অপেক্ষায় ছিল মিথিলেশ। যে বর্ষা টিচার্স রুমের গজল্লার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এতদিন। সেদিন প্রবল গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে ক্লাস সিক্সে বাংলা পড়াচ্ছিল মিথিলেশ। মানকুমারী বসুর 'বর্ষারানি' শুরু করেছে আজ।

'রাত-দিন ঝমঝম রাত-দিন টুপটুপ' বলতে বলতে সে মাঝে মাঝেই জানালা দিয়ে চোখ ঝলসানো রোদের দিকে হতাশভাবে দেখছিল। কবিতা যত এগোতে লাগল, তার হতাশাও তত বাড়ছিল।

"শিখী নাচে ভেক গায়, মেঘে গুরু গরজন'

হায় কোথায় সে সব?

'শরৎ বসন্ত শীত জানে শুধু হাসাহাসি।'

তাই কি? এইসব ঋতুর মধ্যে কি সত্যিই কোনও গভীরতা নেই? মিথিলেশ পড়াতে পড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বসন্ত! বসন্ত! তাহলে বসন্তে মানুষ প্রেমে পড়ে কী করে?

'বরিষা তোমারি বুকে অনন্ত প্রেমের রাশি!'

পড়াতে পড়াতে শেষ পংক্তিতে চলে এল মিথিলেশ।

'সাধে কি বেসেছি ভালো মাঠে কি আপনা ভুলে'

ভুলে শব্দটির গায়ে সহসা ভিজে হাওয়া এসে লাগল। মিথিলেশ চমকে তাকিয়ে দেখল তাদের সামনের মাঠে একটা শিরিশ গাছের মাথায় কার অভিমানী চোখের মতো একখণ্ড স্লেট কালো মেঘ এসে দাঁড়িয়েছে। এ চোখ তো পৃথিবীতে একজনেরই হতে পারে। তার বাড়ির মাথায়ও কি এই মুহূর্তে এইরকম ঘন মেঘ এসে দাঁড়িয়েছে? ছেলেকে স্কুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে কিংবা কাজের ফাঁকে জানালায় দাঁড়িয়ে সেও কি এই মেঘ দেখছে না? ওগো মেঘ, তুমি কি কলকাতা হয়ে এলে? কেমন দেখে এলে তাকে?

সে প্রায় নিরুচ্চারে বলল,

'দিয়েছি হৃদয়খানি তোমারি চরণমূলে।'

সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল। এই ক্লাসে কত কবিতার ব্যাখ্যা, শব্দার্থ, মূলভাব পড়িয়েও কারও চোখে যে আলো জ্বলতে দেখেনি, বৃষ্টির কয়েক ফোঁটায় সেই আলো জ্বলে উঠল। সারা ঘরে ছড়িয়ে গেল 'বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি' উল্লসিত ফিসফাস। মিথিলেশ বই বন্ধ করে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যেতে যেতে সে ভাবছিল, বৃষ্টির মধ্যে মাঠে গিয়ে ভেজা যায়, কিন্তু ফোন করা যায় না। ফোন ভিজে যাবে। ভিজে তো যাচ্ছিলই বুকপকেটে রাখা মোবাইল, বৃষ্টির ছাঁটে। সে জানলা থেকে সরে এল। গম্ভীর মুখে বলল, "শব্দার্থ লেখ, শিখী মানে ময়ূর। ময়ূর দেখেছ তোমরা? কে দেখেছ হাত তোলো।" একটা হাতও উঠল না।

"ময়ূর দ্যাখোনি! চিড়িয়াখানায় যাওনি কেউ?"

কেউ যায়নি। একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাদের বাড়িতে একটা ক্যালেন্ডারে ময়ূর আছে। কৃষ্ণ আর রাধা ময়ূর নিয়ে খেলছে। বিন্দু খাটুয়ার খাটুয়া অয়েল মিলের ক্যালেন্ডার।

আরও দু'-তিনজন বলল টিভিতে ময়ূর দেখেছে। মিথিলেশের মনে হচ্ছিল একটা ময়ূরের পালকও যদি এদের দেখাতে পারত। সে ভার মনে আবার পড়ায় ঢুকল, "ভেক মানে লেখ, ব্যাঙ।"

বৃষ্টি প্রথম যেদিন নামে, সেদিন যে খুশির হিল্লোল ছড়িয়ে যায়, পরে তা স্বাভাবিকভাবে থাকে না। তারপর বৃষ্টি যখন প্রবলভাবে নামল, শোচনীয় অবস্থা করে ছাড়ল মিথিলেশের। খেয়াঘাটে প্রচণ্ড কাদা, স্কুলে আসতে গেলে ওই কাদা মাড়িয়েই আসতে হবে। স্কুলের কলে কাদা মাখা পা ধুতে গেলে লাইনে দাঁড়াতে হয়। একটিই কল, ছেলেরাও কাদা মাড়িয়ে এসেছে। কয়েকদিন এরকম চলার পর কলটা লাগাতার পাম্প করার চোটে গেল খারাপ হয়ে। সেক্রেটারি মেয়ের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত, হেডমাস্টার মশাই তাঁকে ছাড়া এক বাক্স পিনও কাউকে দিতে চান না, তো কল সারানো।

কাদা শুকিয়ে যাওয়া পায়ে ফেরার পথে আবার নতুন কাদার প্রলেপ মেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে কবি মানকুমারী বসুর উপর ভয়ঙ্কর চটে যাচ্ছিল মিথিলেশ। মহিলা আবার শেষে লিখেছেন, 'সাধে কি বেসেছি ভাল, সাধে কি সকলি ভুলে/দিয়েছি হৃদয়খানি তোমার চরণমূলে।' বর্ষাকে কিছুতেই হৃদয় দেওয়া যায় না। অন্তত গ্রামের ইস্কুলের মাস্টাররা তা দিতে অপারগ।

মনের এইরকম অবস্থায় মিথিলেশ খেয়ালই করেনি প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়া থেকে এই ঘোর বর্ষা নামা পর্যন্ত ঝিল্লি তাকে একটাও ফোন করেনি। সে দু'-একবার চেষ্টা করে পায়নি, ঘড়ঘড়ে গলায় এক পুরুষ প্রতিবারই বলেছে, "আপকো কিতনা নাম্বার চাহিয়ে? নাম্বার মিলাইয়ে তো।"

ঝিল্লির কি সিম বদলে গেছে? এরকম একটা ভয় নিয়ে একদিন মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠল মিথিলেশ। আর একবার ফোন করবে ওই নম্বরে? মেসেজ করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সে তো



এখনও মেসেজ পাঠাতে শেখেনি। ঠিক করল, পরের দিন স্কুলে গিয়ে ভূগোলের পুলক জানার কাছ থেকে এসএমএস পাঠানো শিখবে। অবশ্য যদি সিম পাল্টে গিয়ে থাকে, তবে সেটা গিয়ে পড়বে সেই ঘড়ঘড়ে গলার খিটকেল লোকটার হাতে। তাহলে? ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে মিথিলেশ আবার ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন বউয়ের হাতের খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খেয়ে, আবার ওই খিচুড়িই খানিকটা টিফিনবাক্সে ভরে বাসস্ট্যান্ডে যখন সে এসে দাঁড়ায়, তখন তার মনে ঝিল্লির নম্বর বদলের সমস্যা ও গত রাতের শুভ সংকল্পের কথা কিছুই থাকে না। খিচুড়ির স্বাদ তার হৃদয়ে খেলা করে রাজহংসের মতো। এই স্বাদে ডুবে থেকে সে খেয়ালই করে না বাস আসতে দেরি করছে। সকালে বৃষ্টিটা একটু ধরেছিল। আবার হুড়মুড়িয়ে নামতেই মিথিলেশ তাড়াতাড়ি শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি কানাইলাল মিদ্দা তার বাবা-মায়ের স্মৃতিতে এই শেডটা করে দিয়েছেন। শেডের নিচে একটা সিমেন্টের বেঞ্চও আছে। বেশিরভাগ সময়ে সেখানে একটা পাগল শুয়ে থাকে বলে কেউই সেখানে খুব একটা যায় না। আজ মিথিলেশ দেখল, পাগলটা বেঞ্চের এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে কেমন ফ্যালফ্যালে চোখে বৃষ্টি দেখছে। সে তার দূরতম প্রান্তে গিয়ে বসে পড়ল। বসার পরই তার খেয়াল হল সে প্রায় ২৫ মিনিট বাসস্ট্যান্ডে এসেছে। বাস তে আসেইনি, এমনকী যে কয়েকটি নিত্যযাত্রী তার সঙ্গে এই সময়ে যায়, সেই পরিচিত মুখগুলো একটাও আজ নেই। বাস কি তার আসার আগেই বেরিয়ে গেল? সে কি আজ আসতে দেরি করেছে? মোবাইল কেনার পর থেকে মিথিলেশ ঘড়ি ব্যবহার করে না। ঘড়িটা এমনিতে বহুদিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে, সারাতে দেওয়া হয়নি। প্রথমেই মিথিলেশ ভাবল, তার মোবাইলের টাইমার নিশ্চয় গন্ডগোল করছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারপাশ মুছে গেছে। এই পাগলটা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি নেই যাকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করবে "ক'টা বাজে?" পায়ের কাছে ছড়িয়ে থাকা অজস্র ছাগলের নাদির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে ভাবল বউকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে ক'টা বাজে। ফোন বেজে গেল, বেজে গেল।

আজ ছেলেকে নিয়ে ইস্কুলে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। হয়তো গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে মা-ছেলে আরামে ঘুমোচ্ছে। কলটা নো-আনসার হয়ে ওর কাছে ফিরে এল। এবার সত্যি সত্যি মিথিলেশের নিজেকে বিপন্ন মনে হল। ও যেন একটা জনমানবশূন্য দ্বীপে আটকা পড়েছে। একটা জাহাজের ভগ্নাংশ দেখলেই ও গায়ের জামা খুলে প্রাণপণে নাড়াবে। কিচ্ কিচ্ কিচ্। পাখির ডাকে চমকে উঠল মিথিলেশ একটা পাখি কি তবে অলিভের ডাল নিয়ে উড়ে আসছে? সামনেই সবুজ তীর? একটা মেসেজ ঢুকছে। অচেনা একটা নম্বর। খুলতে যাবার আগেই ওর ফোনে বেজে উঠল, 'হও ধরমেতে ধীর' রিংটোন বউ ফোন করছে। ঘুম জড়ানো গলায় বউ বলে, "ফোন করেছিলে কেন?"

"এখন ক'টা বাজে বলো তো।"

"আটটা চুয়াল্লিশ।" বিস্ময়ে ঘুম কেটে যায় সীমার।

"মাথা খারাপ হল নাকি তোমার?"

"আরে বলো না, আমি ক'টায় বেরিয়েছি?"

এটা স্পষ্ট মনে ছিল, যেহেতু মিথিলেশ বেরনোর সময়ই জল ফুরিয়ে গেছে দেখে সে পাম্প চালিয়েছিল, তাই সময়টা দেখতে হয়েছিল। ঘড়ি ধরে কুড়ি মিনিট পাম্প চালানো হয়।

সীমা তাই বলতে পারল, "আটটা বাজতে পাঁচ, কিন্তু তুমি এখন কোথায়? এখনও বাস পাওনি?"

মিথিলেশ মোবাইলে সময় দেখে। নাঃ, ঠিকই তো আছে; তাহলে...

"না, বাস আসেনি এখনও, আমি ভাবছিলাম বেরিয়ে গেল না কি।"

"ওঃ বাস" কী যেন ভাবে সীমা, তারপর বলে—

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাসরুট তো বন্ধ থাকবে কিছুদিন, কাল রাতে ঝরনার বর ফোন করেছিল, তুমি তখন ছিলে না।"

"মানে! তুমি সেটা আমাকে বলবে না!"

"আমি তো জানি, তুমি জানো। তোমার রুট অবন্তীনগর, সেই রুটের বাস বন্ধ থাকবে, তুমি জানো না?"

সীমার গলা চড়ছে। চল্লিশ পার করে চাকরি পেয়েছে যে স্বামী, যার জন্যে এত বছর শাড়ির ফলস্ লাগানো থেকে নেটওয়ার্কিং ব্যবসা—নানান উঞ্ছবৃত্তি করে যেতে হয়েছে বউকে, সে এবার

বলে বসতে পারে "কেমন অপদার্থ তুমি, নিজের রুটের খবরটাও ঠিকমতো রাখো না?"

খিচুড়ির স্বাদ ফিকে হয়ে যায়। মিথিলেশ ফোন কেটে দেয়। বৃষ্টি কি ধরেছে একটু? এখন ট্রেকার বা অটো পেলেও তার লেট হবে। কিন্তু যেতে তাকে হবেই। সীমার রুক্ষ গলা তাকে একটি পুরনো গল্প মনে করায়। দস্যু রত্নাকরের গল্প। সে তো জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছিল , পাপের ভাগ কেউ নিতে রাজি কি না। কেউ রাজি হয়নি। না স্ত্রী-পুত্র, না বাবা-মা। মিথিলেশ তো অত চায়নি। সে ভেবেছিল, যে সংসারের মুখ চেয়ে এত জল-কাদা ভেঙে সে স্কুলে যাচ্ছে, সেই সংসার তার উপার্জনের যাত্রাপথের একমাত্র বাসটির খবর জানলে, তাকে দেবে। বাস বন্ধ থাকবে, অনির্দিষ্টকাল হয়তো, এত বড় খবরটা পেয়েও সীমা জানাতে ভুলে গেল!

সীমার এই ক্যালাসনেস, (অসাড়তা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যায় না) মিথিলেশকে স্তব্ধ করে দিতে পারত অন্য সময়। কিন্তু আজ তাকে স্কুলে যেতেই হবে। এই একটা বছর খুব সাবধানে থাকতে হবে তাকে। সে মুহূর্তের মধ্যে গা ঝেড়ে উঠে পড়ল। প্যান্ট গুটিয়ে, ছাতা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ছপাৎ-ছপাৎ করে। বৃষ্টির জোশ একটু কমে এসেছে। দৃশ্যপট থেকে যা-যা মুছে গিয়েছিল, কাগজের জলছাপের মতো একটু একটু করে ফুটে উঠছে মেঘের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসা আলোয়। পুনরুদ্ধার হওয়া দৃশ্যপটে সে দেখল একটা অটো তিন যাত্রী নিয়ে, আরও জনা তিন যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অটো অবশ্য গদখালি পর্যন্ত যাবে না। জমিরপুরে নেমে তাকে আবার অটো ধরতে হবে। তবু যতখানি এগিয়ে থাকা যায়। মিথিলেশ অটোওলার বাঁ পাশের সিটে বসে ছাতা বন্ধ করল। ছাতা থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল অমনি। আকাশ থেকেও ওই রকমই বৃষ্টি পড়ছে। মিথিলেশ বড় করে একটা শ্বাস ফেলল। তারপর তার মনে হল খুচরোটা গুছিয়ে রাখে। খুচরোর সঙ্গে মোবাইলও উঠে এল হাতে। স্ক্রিনে মেসেজের চিহ্ন। ভুলেই গিয়েছিল মেসেজ এসেছে। অটোওয়ালা আরও দু'জনের জন্যে কতক্ষণ বসে থাকবে কে জানে। এই ফাঁকে সে মেসেজটা পড়ে ফেলে।

"এখন আমি নিউ গড়িয়া স্টেশনের ধারে একটা খুব উঁচু ফ্ল্যাটে থাকি। কোনও রাতে ট্রেন মিস করলে বা ট্রেনে গন্ডগোল থাকলে, রাতটা আমার সঙ্গে থেকে যাস।"

গায়ে কাঁটা দিল মিথিলেশের। নম্বরটা অচেনা, কিন্তু তবু সে নিশ্চিত এটা ঝিল্লিই পাঠিয়েছে। কিন্তু কাকে? এই ট্রেনের রুট তো তার নয়। সে তো যায় অবন্তীনগর বাস রুটে, সে বাস আবার আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাকে তাহলে ঝিল্লি তার সঙ্গে রাত্রিবাসের ডাক পাঠাচ্ছে? ঈর্ষায় নীল হয়ে গেল মিথিলেশ।

৭

ছেলেটা বড্ড, বড্ডই ছোট। তাকে কীভাবে বলা যায় অমুক দিন থেকে তার বাবা-মা আলাদা থাকবে। আলাদা মানে শুধু দুটো আলাদা বাড়ি নয়, আলাদা জীবনও। খাওয়ার মেনু থেকে টিভির চ্যানেল, বেড়ানোর জায়গা থেকে বন্ধুবৃত্ত, ছোট ছোট বহু অকিঞ্চিৎকর অভ্যেস—সেই দুটো জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন। যতই ঝিল্লি ছেলেকে আগলে রাখার চেষ্টা করুক, ওরও তো জীবনের অনেকখানি পাল্টে যাবে। সকালে, বিশেষত শীতের সকালে ছেলেটা কিছুতেই ঘুম থেকে উঠতে চায় না। অরুণাভ অনেক 'বাবা বাছা সোনা' বলে তুলে খানিকটা কোলে নিয়ে ঘোরালে তবে তার ঘুম কাটে। ঝিল্লি তো সে সময় ভীষণ ব্যস্ত। অতখানি সময় ধরে ছেলেকে ঘুম থেকে তোলা তার পক্ষে অসম্ভব। রান্নার ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে বলে সবজি কাটা, প্রয়োজনে মশলা বেটে নেওয়া—সবটাই ও নিজের হাতে রাখতে চায়। তার উপর ছেলের জন্য একেকদিন একেকরকম টিফিন। টিভিন বানাতে বানাতে ঝিল্লি দেখে অরুণাভ ছেলেকে টয়লেট করিয়ে ব্রাশ হাতে তাকে টিভির সামনে বসিয়ে দিয়েছে। ব্যস অমনি ওর মাথায় চড়াক করে রাগ চড়ে যায়। একটা বাচ্চার সকাল শুরু হবে কার্টুন নেটওয়ার্ক দিয়ে! একটা স্কুলে পড়া বাচ্চার! ঝিল্লিরা ছোটবেলায় ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুয়ে বিস্কিট খেয়ে বই নিয়ে বসেছে। বই না ছুঁয়ে সকাল শুরু হবে! অরুণাভ বলে, "তুমি সেই মফস্বলেই পড়ে রইলে। বাচ্চাদের দিনটা লটস অফ ফান আর হ্যাপিনেস দিয়ে শুরু করতে হয়। বই ওদের স্মাইলি দেয় না, বই হচ্ছে আ ফাইন্ড এনিমি।"

তা সেই লটস অফ ফানের দরজা পর্যন্ত তো বাবার কোলে চড়েই আসত ছেলেটা।

"সে সব ও এখন থেকে কোথায় পাবে অরুণাভ?" সংসার চালানোর জন্য ঝিল্লিকে তো চাকরি করতে হবে, ও তো ছেলেকে আর সময় দিতে পারবে না। দু'জন মানুষের ছায়া থেকে ওকে আধখানা, তাও খিটখিটে, অসুখী এক মানুষের তর্জনে-গর্জনে বড় হতে হবে। সেটা কি একবারও ভাবল অরুণাভ?

কথাগুলো অরুণাভকে বলবে না ভেবেছিল ঝিল্লি। বললে অরুণাভ হয়তো ভাববে, ঝিল্লি তার কাছে ভিক্ষে চাইছে, এইভাবে ছেলেকে ঢাল করে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করছে, এইভাবেই ও অরুণাভকে ধরে রাখতে চায়।

কিন্তু যতই ও অরুণাভহীন জীবনের কথা ভাবল, ভাবল অরুণাভকে জড়িয়ে ছেলের ছোট ছোট অভ্যেস, আবদার, হ্যাপিনেসের কথা—তত কথাগুলো বলার জন্য হাঁফিয়ে উঠল সে। একদিন সে কথার ভার আর বইতে পারল না।

অরুণাভ বেরোবে, সে ভাত বেড়ে তার সামনে দিতে দিতে নিজের কথাগুলো একটু গুছিয়ে দিল। ভাত থেকে ধোঁয়া উঠছিল, সামনে বড়ি দিয়ে উচ্ছে-বেগুন, চিংড়ি দিয়ে থোড়, পোস্তর বড়া এবং পাবদার ঝাল—এই সমাহারের সামনে জগতের অতি বড় তালেবরও টলে যাবে, অরুণাভরও মনে হল, ব্যাপারটা কোথাও যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মধ্যরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো রক্তপাতহীন বিচ্ছেদ এবং বাই-প্রোডাক্ট স্বাধীনতা। বরং প্রত্যাশিত ছিল। অন্তর্বর্তী এই সময়ে প্রতিদিন তুমুল কলহ, অকথ্য গালিগালাজ, কাপ ভাঙা, চুল্লি না জ্বলা। তার বদলে ঝিল্লি এত শান্ত-সমাহিতভাবে জটিল ও সূক্ষ্ম সব রান্না করছে এবং সাজিয়ে দিচ্ছে তার সামনে, এ রীতিমতো অত্যাচার। ওভ্ন থেকে ঝিল্লি যদি প্রাকৃত ভাষায় বলত, "দু'দিন পরে যে ভাতার ভাত দেবে না, তার ভাত আমি রাঁধতে পারব না" তাহলে ঠিকঠাক লাগত। ভাত ভাঙতে ভাঙতে অরুণাভ ঝিল্লির দিকে তাকাল সোজাসুজি, বহু মাস পরে। উপর থেকে একইরকম চেহারা, শুধু চোখ দুটো লালচে, ফোলা ফোলা। ঝিল্লি কি রান্না করতে করতে কাঁদছিল। অরুণাভকে তাকাতে দেখে ঝিল্লি বলে, "কী হল, কিছু লাগবে?" এটাই কি সে বলতে চেয়েছিল আদৌ?

অরুণাভ রাগে ছুড়ে ফেলতে চাইছে থালা, বলতে চাইছে "ঝিল্লি তোমার এই ন্যাকামি বন্ধ করো।" অথচ সে বলল, "উচ্ছেটা না খেলে হয় না?"

"না হয় না, তুমি যদি তেতো না খাও, ছেলে তোমাকে দেখে কী শিখবে? আচ্ছা গিমে শাক দ্যাখো না বাজারে?"

গিমে শাক! হায়, এই কি ঝিল্লি বলতে চেয়েছিল? "তুমি তেতো খুব ভালবাসো, না ঝিল্লি?"

ঝিল্লির লালচে নিষ্প্রভ চোখদুটোতে নিমেষে হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে ওঠে। সে চলে যায় তার ছোটবেলায়। ভাত পাতে তেতো খাওয়া তাদের বাড়িতে বাধ্যতামূলক ছিল। মার কড়া নির্দেশ ছিল, "তেতো না খেলে মাছও তুমি পাবে না।" ফলে মেছো ঝিল্লি মাছ না পাবার ভয়ে তেতো খেয়ে নিত নিরুপায় হয়ে। পরে সেটাই ভালবাসায় দাঁড়িয়ে যায়। তেতো মানে শুধু উচ্ছে বা করলা নয়। (অনেকে তো উচ্ছে আর করলারও তফাত জানে না)। কতরকম তেতো হত তাদের বাড়িতে। নিম-বেগুন, গিমা-বেগুন, পলতা বা শিউলি পাতার বড়া, শুক্তো তো আছেই। ছোট মাছ দিয়েও শুক্তো করত মা। তবে জগতে যত তেতো আছে, যুক্তিফুলের মতো তেতো আর কিছুই নয়। সবুজ যৌগিক ফুলের মতো দেখতে এই সবজিটি বড়ি-বেগুন দিয়ে মা চচ্চড়ি করত। তার তিক্ত স্বাদ পরের মহার্ঘ্য সব মাছ, মাংস, চাটনি, দই খেলেও যেত না জিভ থেকে। জিভ? না কি স্বাদ লেগে থাকে স্মৃতিতে? তার ছেলের কী থাকবে তাহলে? বাবা হইচই করে কিছু একটা এনে ডাকছে "দেখে যাও কী অসাধারণ মাছ।" মা রাগ করে বলছে, "এত রাতে আবার"... তারপর কিন্তু কাটতে বসে যাচ্ছে। কিংবা বাবার সেই ইলিশ মাছ কাটা দেখতে ভিড় করে তারা দুই ভাই-বোন, এমনকী মাও! এই যূথচারী জীবন না থাকলে স্বাদ থাকে খাবারের? স্মৃতি কী বয়ে নিয়ে যাবে তবে?

সে শূন্য চোখে তাকিয়ে বলল, "তেতো শরীরের খুব দরকার। ছেলেটা তো তেতো খায়ই না, শুধু খুব কড়া করে উচ্ছে ভেজে দিলে..."

অরুণাভ মোচা-চিংড়ি মেখে এক গ্রাস ভাত তুলে বলল, "ওর পরীক্ষা যেন কবে?"

"ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইকে।"

"মানে আর পাঁচ মাস, পাঁচ মাস কি তোমার যথেষ্ট মনে হয় ঝিল্লি?"

ঝিল্লি তীব্র চোখে তাকায় অরুণাভর দিকে। মোচার নরম শরীর জিভে অনুভব করতে করতে চোখ নামিয়ে নেয় অরুণাভ। জল দিয়ে ভাতটা কোনওরকমে গিলে সে আবার বলে, "আমি জানি, যথেষ্ট নয়, পরীক্ষাটা নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু পরীক্ষা? আর জীবনটা?"

ঝিল্লি বলে, "একটু ভাত দিই?"

ভাত দেওয়া, ভাতের বাটি সরিয়ে নেওয়া, এমনকী অরুণাভর এঁটো থালা ও বেরোবার আগেই মেজে ফেলা (মা বলত, এঁটোচণ্ডী রাগী দেবতা, কাজকর্ম সব উল্টোপাল্টা করে দেন) —এইসব থেকে বেরোতেই পারছে না ঝিল্লি। ও কী করে তাহলে ছেলেকে একা হাতে মানুষ করবে? ও তো নিজেই মানুষ নয় পুরোপুরি। রান্নাঘরে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে ঝিল্লি। আর সেই কান্নার আওয়াজ ভারি আরাম দেয় অরুণাভকে। তার চোখ থেকেও টুপ করে দু'ফোঁটা জল পড়ে ভাতের উপর। একটু বেশি নোনতা হয় খাবারের স্বাদ। সে বলে, "ঝিল্লি, আমি বলি কি, এই পাঁচটা মাস আমরা সবাই এখানেই থাকি। একসঙ্গে, ছেলেটার পরীক্ষা হয়ে যাক, তারপর ধরো এপ্রিলে, এপ্রিলেই তো পয়লা বৈশাখ পড়বে।" বলতে বলতে সে খাওয়া ফেলে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। এখানে, সারা বাড়িতে মাত্র এখানেই রান্নাঘরের দরজার পিছনে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার ঝিল্লি সেলোটেপ দিয়ে এঁটে রেখেছে। বিশেষ বিশেষ তিথিতে নিরামিষ খাওয়ার কথা মনে রাখার জন্য। সেইটা দেখতে এসে অরুণাভ দেখতে পায় রান্নাঘরের মেঝেতে ঝিল্লি পড়ে আছে রক্তের নদীর মধ্যে!

৮

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে মিথিলেশ দেখল সীমার ধুম জ্বর। সকালের রান্না সব আছে। রাতে শুধু ভাত হয়। ভাত চাপিয়ে মিথিলেশ বারবার সীমার কপালে হাত দিয়ে জ্বর বোঝার চেষ্টা করছিল। সীমা নিজেই প্যারাসিটামল খেয়ে নিয়েছে। এতক্ষণে কি জ্বর একটু কমা উচিত ছিল না? মিথিলেশকে বারবার আসতে দেখে সীমা ক্ষীণ গলায় বলল, "ভাতটা গলে পাঁক হয়ে যাবে। বারবার কী দেখছ? এ জ্বর তিনদিনের আগে সারবে না। ঘরে ঘরে হচ্ছে।"

মিথিলেশের মুখ শুকিয়ে গেল। কাল বৃহস্পতিবার। তার মানে বৃহস্পতি, শুক্র—দুটো দিন তাকে ছুটি নিয়ে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যেতে হবে। ছেলে এ দু'দিন স্কুলে না গেলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়! কালকে হেডমাস্টার অজিত পাল কী একটা বিষয়ে কথা বলবেন বলে মিটিং ডেকেছেন। কালই মিথিলেশ যেতে পারবে না!

আগে আগে সীমা অসুস্থ হলে অনেকবারই ছেলেকে স্কুলে দিতে যেতে হয়েছে মিথিলেশকে। কিন্তু তখন তো ও চাকরি পায়নি। এই একটা বছর এরকম উল্টোপাল্টা কামাই করা যায়! সীমার বেয়াক্কেলে জ্বর আর আসার সময় পেল না।

রাগ হয় বটে, কিন্তু মিথিলেশ পরিপাটি করে কাজ করে সব। ছেলেকে ভাত মেখে, মাছ বেছে খাওয়ায়। সীমাকেও দুধ-পাউরুটি খাওয়াবার চেষ্টা করে। সীমা একটু খেয়ে বমি করে দেয় সব। তারপর একটু সুস্থ হয়ে নিজেই টলতে টলতে রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ চা করে খায়, বিস্কিট দিয়ে। সীমাকে দেখে একটু আশা হয় মিথিলেশের। উঠে নিজে চা করে খাচ্ছে যখন, কাল সকালের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে নিশ্চয়। ছেলেকে আস্তে আস্তে নিয়েও যেতে পারবে ঠিক। খুব শরীর খারাপ নিয়েও এ কাজটা করে যায় সীমা, ওখানে ওর একটা সার্কেল তৈরি হয়েছে।

রাতটা ছটফটিয়ে কাটল। ছেলের আফটারনুন স্কুল। তাও এখান থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। ছ'টার মধ্যেই উঠে পড়ল মিথিলেশ। রান্না-টান্না করে তৈরি করে দিলে যদি সীমা আস্তে আস্তে ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে, এরকম একটা আশা তখনও পর্যন্ত ছিল তার। নিজের উপর রাগও হচ্ছিল খুব। কেন যে তার গাড়ি নেই! নিজেদের গাড়ি থাকলে তাতে করে সীমা জ্বর গায়েও যেতে পারত, সারাদিন গাড়িতেই রেস্ট নিত, অসুবিধে কী? পরমেশ বেঙ্গালুরুতে সেটল করার ফলে বাড়িটা আপাতত পুরো তার। মা দিদির কাছে সারাবছর, চন্দননগরে। খুব কম আসে। সীমার সঙ্গে মার একটুও বনে না। বাড়িভাড়া দিতে হয় না বলে চাকরিহীন, টিউশন-নির্ভর জীবনও চলে গিয়েছে একসময়। আবার গাড়ি!

তার অমনি মনে হল, ঝিল্লির নিশ্চয় গাড়ি আছে। থাকবেই। তাহলে তো ও যেদিন অবন্তীনগর আসবে, গাড়ি করেই আসতে পারে। ওকে আর ভিড় বাসের ঠেলা খেতে হবে না। ফেরার পথে ওর গাড়িতেই ফিরতে পারে মিথিলেশ।

মিথিলেশকে ঝিল্লির গাড়িতে উঠতে দেখলে হেডমাস্টারের মুখে কী কী রং খেলবে, তার ছাত্ররা কী চোখে তাকাবে তার দিকে, সেটা মিথিলেশ ভাবলই না। ঝিল্লির গাড়িতে ওঠার চিন্তা তাকে এমন উজ্জীবিত করে তুলল যে, আজকের স্কুল কামাই হবার ব্যাপারটা তাকে ছুঁতে পারল না। সে তরতর করে দুটো আভেনে

ভাত ডাল ও ডিমভাজা করে ফেলল। ভাতের মধ্যে উচ্ছে ও আলু সেদ্ধ দিল। সীমা যদি খেতে পারে একটু গরম ভাত সেদ্ধ মেখে। উচ্ছে ওর জিভে রুচি ফেরাবে। একটু টাটকা মাছ এনে দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কে ধোবে, কে-ই বা রাঁধবে? মিথিলেশের ক্ষমতার শেষ সীমা ওই ভাত, ডাল ও ডিম। মা থাকলে... নাঃ, মা থাকলে বাড়িতে এত চাপা অশান্তি, তার চেয়ে এই ভাল। ছেলের টিফিন রাস্তায় কিনে নিলেই চলবে। মিথিলেশ ওয়াটার বোতলে জল ভরতে ভরতে ছেলেকে বলল, "দ্যাখ, পটি করিস তো করে নে, রাস্তায় বলবি না কিন্তু।"

"করেছি তো কাল।"

মিথিলেশ আর ঘাঁটাল না। সীমার গায়ে জ্বর আছে, আন্দাজে ১০০ বলেই মনে হচ্ছে। থার্মোমিটার ভেঙে যাওয়ার পর আর কেনা হয়নি। সে চা খাচ্ছে বিছানায় বসে। মিথিলেশকে ডেকে বলল, "কালকে আমি যেতে পারব।"

মিথিলেশ আর ওসব নিয়ে ভাবছেই না। সে ব্যস্তভাবে বলল, "না, না, তুমি সোমবার থেকে যেও। এই দু'-তিনটে দিন রেস্ট নিয়ে নাও। আমি শনিবার টুক করে স্কুল ঘুরে আসব।"

বেরোবার মুহূর্তে ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "এ বাবা!" কী ভীষণ জরুরি কথা মনে পড়ে গিয়েছে তার। মিথিলেশ বিরক্ত গলায় বলে, "কী হল আবার? তাড়াতাড়ি চলো।"

"ও মা, কাল তো স্কুল থেকে নোটিস দিয়েছে, ফ্রাইডে ছুটি, স্কুল ফেস্ট আছে না?"

সীমার মুখে হাসি ফুটল।

"যাক, আজ দিনটা ছুটি নিলেই চলবে তোমার।"

মিথিলেশ কিন্তু তেমন খুশি হতে পারল না শুনে। ঝিল্লির বাড়ি দক্ষিণ কলকাতায়, মিথিলেশের ছেলের স্কুলও ওদিকে। মিথিলেশ কি ভাবছিল এই দু'দিন ছেলেকে স্কুলে ঢুকিয়ে ঝিল্লির বাড়ি চলে যাবে সে? দক্ষিণ কলকাতা কত বড়, সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই তার। হয়তো দুটো জায়গা যথেষ্ট দূর। ঝিল্লির বাড়ি গিয়ে সে হয়তো সময়মতো স্কুল ছুটির সময় পৌঁছতেই পারল না। বিশাল স্কুল চত্বরে একদম একলা একটি বাচ্চা স্কুলব্যাগ আর জলের বোতল নিয়ে বসে আছে, ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, এক্ষুনি যে কেঁদে ফেলবে। ছবিটা ভাবলেই ঝিল্লির বাড়ি যাবার ইচ্ছেটা মরে যাচ্ছে মিথিলেশের। তবু, সে অন্তত কয়েকঘণ্টার জন্য ঝিল্লির বাড়ির কাছাকাছি থাকবে—এই নিশ্চয়তা তাকে উষ্ণ করে তুলছে। আর সেই মেসেজ—"রাতটা আমার সঙ্গে থেকে যাস"—মনে পড়তেই শিরশির করে ওঠে ভিতরটা। বহুবছর আগে ভিড় বাসে তার হাত কোনও অভিপ্রায় ছাড়াই ঝিল্লির বাম স্তন ছুঁয়েছিল। সেই স্পর্শ তার স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে আছে। কিন্তু ঝিল্লির শরীর পাবার কথা সে কোনওদিন ভাবেই নি। রাতের বা দিনের কোনও স্বপ্নেই না। ওরকম অসম্ভব কথা ভাবার সাহসই হয়নি তার। চাকরি পাবার পর মনে হয়েছিল পুরনো বন্ধুদের জানালে বেশ হত। কিন্তু পুরনো বন্ধুরা, মানে ইউনিভার্সিটির পুরনো বন্ধুরা কেউই তো আর কলকাতায় থাকে না। একজন ইমামবাড়া কলেজে পড়ায়, চুঁচুড়ায় ফ্ল্যাট কিনেছে। তার নম্বরও নেই মিথিলেশের কাছে। বাকিরা কেউ রাজ্যের বাইরে, অনেকে দেশেরও বাইরে। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। মিথিলেশ যেহেতু একসময় প্রচুর টিউশনি করেছে, এখনও দু'-চারটি নাছোড় ছাত্রীকে তাকে পড়াতে হয়, তাই তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ থেকেই গিয়েছে। তারা প্রত্যেকেই মোবাইল, ইন্টারনেটে তুখোড়। তারা মিথিলেশকে বলল, ফেসবুক এবং আরও অনেক সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে পুরনো বন্ধুদের খুঁজে বের করা খুবই সহজ। মিথিলেশ সবে বছর দেড়েক মোবাইল নিয়েছে, তার বাড়িতে কম্পিউটার পর্যন্ত নেই, ইন্টারনেটে লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কী যে মজা পায়—এসব তার মাথায় ঢোকে না। বহু কষ্টে সে ছাত্রীদের বোঝাল, সে এভাবে নিজে উদ্যোগ করে হারানো বন্ধুদের খুঁজে পেতে চায় না, সে সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায় বিশ্বাসী। এ কথা শুনে, মেয়েগুলো যেন আশ্চর্য এক জন্তু দেখছে, এভাবে তার দিকে তাকায়। ওদের মধ্যে তীর্ণা বলে একটি মেয়ে, একেবারেই অদম্য। সে মিথিলেশের মুখের উপর বলে দিল, "আপনি স্যার বড্ড ব্যাকডেটেড। কত বুড়ো-বুড়ো লোক সারাক্ষণ চ্যাট করছে, আপনি তো কোয়ায়েট ইয়াং। দাঁড়ান এক্ষুনি আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি।" বলেই সে পটাপট মিথিলেশের ছবি তুলতে শুরু করে ফেসবুকে পোস্ট করবে বলে।

মিথিলেশ কোনওরকমে তাকে নিরস্ত করে সে যাত্রা। সে তীর্ণাকে বলতে পারে না কোনওরকম চেষ্টা না করেই একটি পুরনো বন্ধুকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে পথ থেকে। বারুইপুর স্টেশনে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গিয়েছে তার সঙ্গে, সে মিথিলেশকে তার নম্বরও দিয়েছে। ঝিল্লির লালচে রং-করা চুল, পরনে জিনস আর লাল টপ, চুলের উপর উঁচু করে তুলে রাখা সানগ্লাস—পুরনো মফস্বলি মেয়েটার সঙ্গে কোথাও মিল নেই। শুধু হাসিটা একইরকম। নাঃ, ঝিল্লি আগের মতোই আছে। বরং আরও বেশি সুন্দর। এত বছরের দূরত্ব যেন সেই সৌন্দর্যকে রহস্যময়তা দিয়েছে। মিথিলেশ ঠিক করল ঝিল্লিকেই সে চাকরি পাবার খবরটা দেবে। শেষবার দেখা হতে ঝিল্লি তার টিউশনি সর্বস্ব জীবন নিয়ে উদ্বেগ দেখিয়েছিল। মেকি নয়, খাঁটি উদ্বেগ। মিথিলেশের ছেলে কলকাতার দামি স্কুলে পড়ে শুনে সে উদ্বেগ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

"তাই তো, তোর একটা চাকরি ইমিডিয়েট দরকার।"

"চাকরি পাবার আর বয়স আছে আমার?"

এর কোনও উত্তর ঝিল্লির মুখে জোগায়নি। তার চোখে ফুটে উঠেছিল নিখাদ ভয়। ঝিল্লিকে খবরটা জানিয়ে মিথিলেশ বলতে চেয়েছিল, "আর ভয় নেই রে। আমি একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছি।"

তারপর অসংখ্যবার ফোনে কথা হয়েছে তাদের। ঝিল্লি অবন্তীনগরে আসতে চেয়েছে। প্রতিবারই কোনও না কোনও কারণে ভেস্তে গিয়েছে সে প্ল্যান। মিথিলেশ কতকিছু ভেবেছে ঝিল্লির আসা নিয়ে। কিন্তু কখনও ঝিল্লির শরীর আসেনি তার ভাবনায়। কিন্তু ওই মেসেজটা পাবার পর থেকে, ঘুমে, জাগরণে, ক্লাস নিতে নিতে, ভিড় বাসে দাঁড়িয়ে জিনস-টপের নিচে ঝিল্লির লালচে রঙের শরীরটা একটা লাইন ড্রয়িং-এর মতো ভেসে উঠছে তার মনে।

গড়িয়া শীতলা মন্দিরে অটো থেকে নেমে ছেলের হাত ধরে কবি নজরুল মেট্রোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে মিথিলেশ হঠাৎ দেখতে পেল বাথরুমে স্নান করছে ঝিল্লি। স্বচ্ছ কাচের দরজার মধ্যে দিয়ে ঝিল্লির জলকণা খচিত শরীর বিকেলের রোদের আভা মাখা মেঘপুঞ্জের মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। শরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল নিমেষে। সেই অভিঘাতে সে দাঁড়িয়ে পড়ল মুহূর্তের জন্যে। ছেলে তার হাতে টান দিয়ে বলল, "কী হল বাবা, তাড়াতাড়ি চলো, মেট্রো পাব না।"

৯

অনেক, অনেকদিন পর ঝিল্লি আজ রান্নাঘরে এল। নিজের হাতে একটা জম্পেশ ব্রেকফাস্ট বানাবার ইচ্ছে ছিল। কড়াইশুঁটির কচুরি



আর ঝাল-ঝাল ছোট আলুর দম। বাজারে এখন প্রচুর কড়াইশুঁটি আর ছোট আলু উঠেছে। পারল না। কড়াইশুঁটি বেটে পুর ভরার পুরো প্রক্রিয়াটা ভাবতেই তার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। শরীর এখনও খুব দুর্বল। তবু হাল ছাড়ল না ঝিল্লি। পেঁয়াজ, লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, ধনেপাতা কুচিয়ে ডিম গুলে একগাদা ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানিয়ে ফেলল। তারপর তার মনে হল এগুলো আদৌ করল কেন? কে খাবে?

অরুণাভ কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি। আজকাল এরকম প্রায়ই করছে। প্রথম প্রথম বলত, 'বিজনেস ট্রিপ', এখন খোলাখুলিই বলে যায় রায়ার সঙ্গে বাইরে থাকতে যাচ্ছে। ঝিল্লি অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিচ্ছেদ ও স্থানান্তরের ব্যাপারটা পিছোতে পিছোতে অনির্দিষ্ট হয়ে পড়েছে। রায়া তাতে প্রচণ্ড বিরক্ত। সে অরুণাভর উপর ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে অরুণাভর হতাশ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। সে যেহেতু ঘাড় ধরে ঝিল্লিদের বের করে দিতে পারছে না, তাই নিজেই বাইরে থাকতে শুরু করেছে।

কিন্তু এটা তো সবে ডিসেম্বর মাস। এমনিতেই ছেলের পরীক্ষা পর্যন্ত তার থেকে যাওয়ার কথা ছিল। মানে ফেব্রুয়ারি। ওহোঃ, অরুণাভ তো বলেছিল পয়লা বৈশাখ নতুন ফ্ল্যাটে যাবার কথা। সামনে একরাশ ফ্রেঞ্চ টোস্ট, গরম গরম। একটু পরে ঠান্ডা হয়ে এদের স্বাদ চলে যাবে। চায়ের সঙ্গে বিস্কিট না খেয়ে ঝিল্লি সেগুলো খেতে শুরু করল একটার পর একটা। আজকাল তার খুব খিদে পায়। এক নিশ্বাসে সে গোটা আষ্টেক স্রেফ টোস্ট খেয়ে ফেলল। তারপর অতিভোগের পর অনুতাপের মতো তা বুক জ্বলতে লাগল। অ্যাসিড হয়ে গিয়েছে। সকালে উঠে বিস্কিট না খেয়ে সোজা ডিম-পাউরুটি খেলে এরকমই হয়ে যায়, ভুলে গেছিল সে কথা। এরকম অনেক কথাই, নিজের শরীর মনের ছোট ছোট সীমাবদ্ধতা, চাহিদার কথা, ভুলে ছিল সে এতগুলো বছর। ছোট ছোট সতর্কীকরণ, সাবধানতা কেন ভুলে গিয়েছিল সে? কিংবা ভোলেনি। ভেবেছিল এগুলো আর মানার দরকার নেই তার। এগুলোকে পাশ কাটিয়েই তার জীবন দিব্যি এগিয়ে চলবে। চলল না তো। ঘুম থেকে উঠে ডিম খাওয়ার মতো সামান্য ঘটনাই মেনে নিতে পারে না তার শরীর। সেই শরীর কেন অরুণাভকে মেনে নেবে? এমনকী রায়ার সঙ্গে সম্পর্কিত জেনেও সেই শরীরকে অন্ধ আবেগে কেন সে গ্রহণ করল কয়েক মাস আগে, যার চিহ্নধারণ করে ফেলেছিল তার শরীর, বইতে পারল না, মিসক্যারেজ হয়ে গেল। তার জের কতদিন বইতে হবে কে জানে। এভাবে অবাঞ্ছিত হয়ে কাটাতে হবে আরও কত দিন। যতদিন না তার শরীর একা চলার সামর্থ্য খুঁজে পায়। অ্যান্টাসিডের পাতা খুঁজতে খুঁজতে ঝিল্লি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। এই কয়েকমাস সে মার কাছে গিয়ে থাকবে। ট্রেন আর মেট্রো করে স্কুল যাতায়াতে একটু কষ্ট হবে ঠিকই, তবু সে পারবে। মার কাছে থাকলে রেঁধে খাওয়ার ঝামেলা থাকবে না। সময়টা সে পুরোপুরি নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় দিতে পারবে। কিছু একটা উপার্জনের পথ তাকে এই দু'মাসের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে।

এই কথা কেন ভাবেনি ঝিল্লি? আসলে বহু বছর সে মার কাছে গিয়ে এক রাতও কাটায়নি। শুধু যে দাদা-বউদির সংসারে অবাঞ্ছিত হয়ে গিয়েছে বলে নয়। সে ক্রমশ শহরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। মার কাছে গিয়ে দু'-তিন ঘণ্টার বেশি থাকতে পারেনি। মফস্বলের পরিবেশের মধ্যে যে অতি-ঘনিষ্ঠতা থাকে, সেটা তার আর সহ্য হতে চায় না। সেই কারণেই সে ওখানে গিয়ে থাকার কথা ভাবেনি। তবে, তার থেকেও যেটা বড় কারণ, তা তো, তার জীবনের এই বড় বদল নিয়ে মায়ের তীব্র আপত্তি ও অসহযোগ। সে যেন ইচ্ছে করে অরুণাভর থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। অরুণাভ নয়, সেই যেন পরীক্ষায় জড়িয়ে সংসার শেষ করছে। ব্যাপারটা জানতে পারার পর থেকে মার একটাই বুলি, "এরকম করিস না ঝিল্লি, আমি কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না।" দাদা-বউদি মুখে কিছু না বললেও তীব্র বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে ব্যবহারে। এমন অবস্থায় মার কাছে ফিরে গিয়ে তাদের লজ্জা ও অস্বস্তি বাড়াতে চায়নি ঝিল্লি।

কিন্তু আজকের ভাবনায়, সেটা ছাড়া তার আর উপায় নেই। এখানে তারা আর কতদিন রায়া আর অরুণাভর চক্ষুশূল হয়ে

থাকবে। পরীক্ষার আগে এই নাড়াচাড়ায় ছেলের রেজাল্ট খারাপ হবে। হোক। আনলাকি বাচ্চা। আনলাকি না হলে এমন ঘরে জন্মাবেই বা কেন? ওকে এখন থেকে কষ্ট সহ্য করা শিখতে হবে। আর আতু-পুতু করা চলবে না। ভাবল বটে, কিন্তু ঝিল্লির চোখ দুটো জলে ভরে এল। মা'র কাছে গিয়ে থাকবার সমস্ত অশান্তি ও অসুবিধার কথা ভেবে তার মন আরও ভার হয়ে উঠল। পৃথিবীতে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে সে একটুও ছোট না হয়ে, না গুটিয়ে থাকতে পারে?

অবন্তীনগর! নামটা মাথায় আসতেই সে চায়ের কাপ নিয়ে জানালায় দাঁড়াল। বড় রাস্তা ছেড়ে লেক রোডের গলির এই ফ্ল্যাট থেকে আকাশ আদৌ দেখা যায় না। নিচে তাকিয়ে দেখল পাড়াটা এখনও মোটামুটি নিঝুম। কোণের ইস্ত্রিওয়ালা তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। কাজের লোকেরা চলাচল করছে। নাইট শিফটের আয়া বেরিয়ে যাচ্ছে, ডে-শিফটের আয়া ঢুকছে। এ ছাড়া আর জনমানুষের চিহ্ন নেই বললেই হয়। পিছনে তাকিয়ে দেখল ছেলে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই বিশ্বচরাচরে সেই কি একা জেগে আছে? এখন কি মিথিলেশকে ফোন করবে একটা? সেও তো নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। এই শীতে রবিবারের ঘুমের সুখ কে-ই বা ছাড়তে চায়? মিথিলেশের পাশে বউ-ছেলে। সে কল্পনাও করতে পারবে না, ঝিল্লি কীভাবে, কত নিঃসঙ্গতায় ও অপমানে বেঁচে আছে।

করবে না, করবে না করেও মিথিলেশের ফোনে রিং করল ঝিল্লি। ফোন বাজতে বাজতে থেমে গেল। স্বাভাবিকভাবেই মিথিলেশ এখনও ঘুমোচ্ছে। মিথিলেশকে সে একবার একটা মিথ্যে মেসেজ পাঠিয়েছিল, লিখেছিল সে এখন নতুন ফ্ল্যাটে থাকে, মিথিলেশ যেন রাতে থেকে যায়। সেই নিয়ে ঝিল্লির অপরাধবোধ আছে। ঝিল্লি ফোনটা জানালায় রেখে ছেলের পাশে শুল। ছেলে বাটার বা ডাল দিয়ে ভাত খায়, সঙ্গে মাছ, মাংস বা ডিম। খাওয়ার আগে গরম-গরম ডাল-ভাত করে নিলেই হবে। কারও জন্যে পাঁচ পদ রাঁধার, রেঁধে চমকে দেবার কোনও দায় নেই আর।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঝিল্লি। ঘুম ভাঙল একই সঙ্গে ডোরবেল ও ফোনের শব্দে। ফোন হয়তো মিথিলেশ করেছে, দেখে নিয়ে পরে রিংব্যাক করলেই চলবে। সে দরজা খুলতে গেল।

অরুণাভ! দরজা খুলতেই সে তাড়াতাড়ি ঝিল্লির হাতে দুটো ঠোঙা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "গরম কচুরি, জিলিপি আছে। ছেলেকে ওঠাও। সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।"

বলেই সে আর একটা ব্যাগ রান্নাঘরে রাখতে চলে গেল! বোঝাই যাচ্ছে বাজার করে এনেছে। মাছ, মাংস, সবজি। ঝিল্লির দেখেই ক্লান্ত লাগল। একটু আগেই কারও জন্য রাঁধার নেই বলে তার কষ্ট হচ্ছিল, এই মুহূর্তে রান্নাবান্না ব্যাপারটাই তার কাছে অসহ্য মনে হল।

সে অরুণাভর পিছন পিছন রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

"এত সব এনেছ কেন? তুমি কি এখানে খাবে?"

"হ্যাঁ। ভাল কথা। রায়াও দুপুরে খাবে। তোমার অসুবিধা হবে না তো?"

অসুবিধা! রান্নাঘরটা দুলে উঠল চোখের সামনে। দরজাটা প্রাণপণে চেপে সে বড় করে শ্বাস নিল। অরুণাভ মাছ-মাংস ঢালছিল। সে দেখতে পেল না ঝিল্লির অবস্থা। সে আবার বলল, "চিতল মাছের মুইঠ্যা করো। আমি ঘাড়ার চর্বি কুরে দিচ্ছি চামচ দিয়ে। আর খাসির মাংস। ব্যস।"

ঝিল্লি অবাক হয়ে দেখছিল। এ এক আশ্চর্য সময় যখন আকাশ থেকে বোমা আর চকোলেট একসঙ্গে পড়ে। যে আরও কিছুক্ষণ সময় নিল। গলা পরিষ্কার করে বলল, "অরুণাভ, আমরা যে আজই চলে যাচ্ছি।"

"আজ!" অরুণাভর হাত মাছ-মাংসের রক্তের উপর স্থির হয়ে গেল।

"আগে বলোনি তো।"

"সকালেই ঠিক করেছি।"

"আজ দিনটা থেকে যাও ঝিল্লি।"

এইটুকুই বলে আর বলতে পারল না অরুণাভ। ও বলতে পারল না এত বাজার কে ধোবে, কে রাঁধবে, রায়াই বা এসে কী খাবে—এই অনুচ্চার্য কথাগুলো ভেবে ঝিল্লির খুব হাসি পেল। সে ছেলেকে ডাকতে চলে গেল।

ঠিক সেই সময় ফোন বাজল আবার, ঝিল্লির মনে পড়ল জানালাতে ফোনটা রেখেছিল সে। মিথিলেশ।

"ফোন করেছিলি, না?"

"হ্যাঁ, অনেকদিন কথা হয় না।"

"শোন না, ছেলেটা বায়না করছে চিড়িয়াখানা যাবে। ওর মা পারবে না। শরীরটা ভাল নেই। তুই আসবি তোর ছেলেকে নিয়ে? সারাদিন একসঙ্গে ঘুরব।"

ঝিল্লি একটু আগে যখন বলেছিল ও চলে যাবে, তা আদৌ সত্যি কথা নয়, রায়াকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ানোর হাত থেকে মুক্তি চাইছিল ও। ও ঠিক করেছে, মার কাছেও যাবে না। এই ফ্ল্যাটেই দাঁতে দাঁত চেপে থেকে বৈশাখে নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাবে। এই মুহূর্তে মিথিলেশের প্রস্তাব ওর কাছে পাখির ডানায় চেপে এল। ও সম্মতি জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল। দেখল রান্নাঘরের দরজায় একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে অরুণাভ ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

"শোনো, একটু পরে আমি ছেলেকে নিয়ে বেরোব। তোমার কচুরি-জিলিপি খেয়ে। একগাদা ফ্রেঞ্চ টোস্ট করেছি, হটপটে নিয়ে নিচ্ছি। তোমরা রেঁধে বেড়ে খেয়ে, সন্ধের আগে চলে যেও। রান্নাঘর ধুয়ে-মুছে যেও কিন্তু। বেরোবার সময় একটা মিসড কল দিও। আমরা তার পর ফিরে আসব। আর ভবিষ্যতে এইভাবে বাজার করে লোক নেমন্তন্ন করার আগে আমার শিডিউলটা জেনে নিও।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ঝিল্লি একটা জিলিপিতে কামড় দিল। আঃ, এখনও গরম আছে।

১০

স্কুল থেকে বাঁদিকে গেলে অনেক দূর পর্যন্ত নদীর সঙ্গে হাঁটা যায়। তারপর শ্মশান, জঙ্গল। আর যাওয়া যায় না। শ্মশানের একটু আগে শিবমন্দির। তবে ও মন্দিরে বহুকাল কেউ পুজো দেয় না। সেই মন্দিরের সামনে আজ সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছে। সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে পুরোদমে। ইতিমধ্যেই কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। খুব পুরনো কিছু না। ইয়ং হেড অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ার তরুণ মুখচ্ছবিওয়ালা মুদ্রা। এখনও হয়তো অনেকের সংগ্রহেই পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, অবন্তীনগরের মানুষজন খুবই উত্তেজিত। তার নিচে এমন গুপ্ত কথা লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটাই তাদের বিস্ময়রে কারণ।

মিথিলেশ ক্লাসে আজ একজন ছাত্রকেও না পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারে, শুধু তার ছাত্ররা নয়, গোটা গ্রামটাকেই পাওয়া যাবে শিবমন্দিরের মাঠে। সে খানিকটা কৌতূহলে, খানিকটা ছাত্রদের ধরে আনবার তাগিদে মাঠে এসে হাজির হল।

জায়গাটা ইতিমধ্যেই একটা মেলার চেহারা নিয়েছে। প্রতিটি

গ্রামে কিছু নিষ্কর্মা লোক থাকেই, যে কোনও উপলক্ষে ভিড় বাড়াতে তাদের জুড়ি নেই। কিন্তু মিথিলেশ লক্ষ্য করল অত্যন্ত ব্যস্ত, কর্মঠ লোকেরাও হাজির। খেতে কাজ করতে করতে, বাড়িতে রান্না করতে করতে, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে সবাই ছুটে এসেছে। প্রায় সবার হাতেই ফোন। মাটির নিচ থেকে কী উঠে আসে, তার ছবি তুলে রাখার জন্য সবাই প্রস্তুত।

মিথিলেশ শুনেছে কয়েক বছর আগে এ গ্রামে কারও হাতেই মুঠোফোন ছিল না। গ্রামে দু'টি মাত্র ফোন ছিল বিন্দু খাটুয়ার খাটুয়া অয়েল মিলে আর নাড়ু মণ্ডলের ভূসিমালের দোকানে। দু'টি দোকানেই পয়সা দিয়ে ফোন তো করা যেতই, এমনকী সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে কারও ফোন এলে ডেকেও দেওয়া হত, এবং বলাই বাহুল্য, ডেকে দেওয়ার জন্যও টাকা নেওয়া হত। তাতে গ্রামের কোনও লোকেরই কোনও আপত্তি ছিল না। এই গ্রামের বাইরেও যে তাদের ডাকখোঁজ করার লোক আছে, সেটা এই ফোন আসার মাধ্যমে সবাইকে জানান দেওয়া যেত। এমনকী মাসে কার ক'টা ফোন এল, সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত প্রতিযোগিতাও ছিল। দুই দোকানেই সবার কমবেশি ফোন আসত। কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধিতে বিন্দু খাটুয়া নাড়ু মণ্ডলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। কারও ফোন এলে, নাড়ু মণ্ডল তাকে খানিক পরে আবার ফোন করতে বলে দোকানের ছেলেটিকে যার ফোন এসেছে, তাকে ডেকে আনতে পাঠাত। ছেলেটি এই সুযোগে প্রায়ই ডাণ্ডাগুলি খেলে, পঞ্চার দোকানে তেলেভাজা খেয়ে ডেকে আনতে আধঘণ্টা সময় লাগাত। অনেক সময় ফিরে এসে বলত, লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিন্দু খাটুয়ার কৌশলটা ছিল অনেক বেশি কার্যকর। সে তার খাটুয়া অয়েল মিলের মাথায় একটা মাইক খাটাল। ফোন এলেই তারস্বরে ডাক বাজে, "হ্যালো, হ্যালো টোকাই মান্না, তোমার দিদি রূপালি মান্না, তার সল্টলেকের কাজের বাড়ি থেকে ফোন করেছে, শিগগির এসো।"

অমনি পুকুরঘাটে আধমাজা বাসন ফেলে পড়িমড়ি দৌড়ে আসে নন্দরানি মিদ্দা, ঘুড়ি ফেলে দৌড়ে হাজির হয় টোকাই। সারা গ্রামে, যে যেখানে থাক, কেষ্টর বাঁশির মতো তাকে ডেকে আনে মাইকের হাঁক।

বিন্দু খাটুয়ার এই কৌশলের কাছে প্রথম রাউন্ডে হেরে ভূত নাড়ু মণ্ডল এরপর 'ফোন করলে লজেন্স ফ্রি' অফারে চলে গেল। তবে দু'জনের টক্কর বেশিদিন চলার আগেই গ্রামের প্রায় বেশির ভাগ লোকের হাতে চলে এল মোবাইল। ফোন নিয়ে দুই ব্যবসায়ী মাইন্ড বিজনেস ফেঁদে, গ্রামসমাজে যে যশ-প্রতিপত্তি লাভ করেছিল, তার ওখানেই শেষ।

মিথিলেশ দেখল বিন্দু খাটুয়া ও নাড়ু মণ্ডল দু'জনেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। টিফিন টাইমে স্কুলের মাঠে আলুকাবলি, ঘুগনি ও আচার বেচা ফেরিওয়ালারাও এসে হাজির। তাদের ভাল বিক্রিও হচ্ছে। আসেনি তবে কে? একেবারে অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও নাতি-নাতনির হাত ধরে এসেছে। তবে সত্যিই আসেনি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আর তাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাই। হেডমাস্টার মশাইয়ের অবশ্য উপায় ছিল না। সেক্রেটারির ডাকে তাঁর বাড়িতে ছুটতে হয়েছে। সেই হিসাবে সেক্রেটারিও আসেননি।

মিথিলেশ বাংলার মাস্টার। তবু তার আনমনা স্বভাবের জন্য সে ছাত্রমহলে বেশ সম্ভ্রম কুড়িয়েছে। তার মাঝে মাঝে পড়ানো থামিয়ে জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখা, ফি দুপুরে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ানো, এসব দেখে ছেলেদের ধারণা হয়েছে, মিথিলেশ স্যার একজন কবি এবং তাঁর মাথায় কিঞ্চিৎ ছিটও আছে। ছিট না থাকলে, তাদের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যেতে পারছেন না বলে নিজের ছেলের চিড়িয়াখানা যাওয়া বাতিল করেন? এহেন দুর্বোধ্য লোককে ছাত্ররা রাস্তা করে দিল সামনে দাঁড়ানোর জন্যে। বলতে গেলে জমায়েতের পুরোভাগে এখন মিথিলেশ। তার সামনে বিনোদনের লাইভ ব্যবস্থা। কলকাতায় কাছেপিঠে হলে এতক্ষণে দু'-চারটে চ্যানেলের ওবি ভ্যান চলে আসত এবং তারা নির্ঘাৎ স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক মিথিলেশের মুখ থেকে দু'-একটা বাইট নিতে ছাড়ত না। মিথিলেশকে টিভিতে দেখানো হলে ঝিল্লিরও কি চোখে পড়ত না?

ঝিল্লির কথা ভাবলে মিথিলেশের মনের মধ্যে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে যায়। বিশেষত চিড়িয়াখানা নিয়ে মিথিলেশ যে ডিগবাজি খেল, তাতে ঝিল্লির কাছে তার অনেক অপরাধ জমা হয়েছে। তার কথামতো ঝিল্লি সময়মতো চিড়িয়াখানার সামনে ছেলেকে নিয়ে টিকিট কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধের কাপড়ের ঝোলায় নিয়েছিল সতরঞ্চি, আর প্রচুর চিপস, ঝুরিভাজা, আরও নানাবিধ স্ন্যাক্স. ফ্লাস্কে কফি ছিল আর হটপটে ছিল তার বানানো একরাশ ফ্রেঞ্চ টোস্ট। কিন্তু নরাধম মিথিলেশ, বেরনোর আগের মুহূর্তে তার মনে ভেসে ওঠে ক্লাস সিক্সের ছেলেগুলোর মুখ। তারা কেউ ময়ূর দেখেনি। তাদের বাদ দিয়ে নিজের ছেলেকে সে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে পারবে না। সে বলল, তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, জ্বরজ্বর লাগছে। ছেলে কেঁদেকেটে একসা। বউ একরাশ কথা শোনাল। আর ঝিল্লি তো ময়ূর পর্যন্ত শুনেই রেগে ফোন কেটে দিয়েছিল। তারপর থেকে ফোনের পর ফোন করেছে, ঝিল্লি ধরেনি। শুধু একটাই মেসেজ পাঠিয়েছে, 'Get Lost'.

সেই থেকে মিথিলেশ লস্ট হয়েই আছে। তার অন্যমনস্কতা আরও বেড়েছে, নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ানোও অব্যাহত আছে। কিন্তু কেউ কি জানে, মিথিলেশ ফোন করে, সে ফোন কেউ ধরে না?

'ইস্‌স্‌স্' একটা সমবেত আক্ষেপ, বিস্ময়, ভয় মেশানো ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। মিথিলেশ চমক ভেঙে দেখে মাটির নিচ থেকে একটা কঙ্কাল তুলে আনছে লোকগুলো। কঙ্কালের দু'হাতে চুড়ি দেখে অনুমান করা যায় ওটা একসময় নারী শরীর ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সবার মোবাইল ঝলসে ওঠে। মিথিলেশকে তার এক ছাত্র ঠেলা দেয়— "তুলুন না স্যার, তুলে ফেলুন।"

মিথিলেশের কী যে হয়, সে কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনের ক্যামেরা অপশনে ক্লিক করে। চুড়ি পরা এক প্রেতিনীর হাত তার পিকচার গ্যালারিতে জায়গা করে নেয়।

তারপর তার সম্বিত ফেরে। সে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। "চলো চলো, ক্লাসে চলো।" মজা যখন সবে জমে উঠেছে, তখন এমন ডাকে কেউই কর্ণপাত করে না। এরপরে আরও কী বেরোবে তার জন্য রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করে সবাই। মিথিলেশ নিজেকে জোর করে সেই নেশাতুর জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নদীর তীর বরাবর স্কুলের দিকে হাঁটে। ভিড় পিছনে ফেলে অনেকটা চলে আসার পর সে একটা খাঁ খাঁ জায়গায় এসে দাঁড়ায়। ঝিল্লির নম্বর ধরে। ফোন বেজে যায় যথারীতি। বাজতে বাজতে 'নো আনসার' হয়ে তার কাছেই ফিরে আসে। মিথিলেশের অস্থির লাগে, কোনও উপায়ে যদি ঝিল্লির কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত তার জীবনযাপনের একটু টুকরো। সীমার সঙ্গে তার কেজো সম্পর্ক, এই নদী তির, অনিয়মিত বাস, যে কোনও দিন রুট বন্ধ হওয়ার ভয়, সেক্রেটারির প্যাঁচ, ময়ূর না



দেখা ছেলেগুলো, কিংবা আজকের এই কঙ্কাল। কিছু না ভেবে ধাঁ করে মিথিলেশ ঝিল্লিকে পাঠিয়ে দেয় তার সদ্য তোলা ছবিটি, চুড়ি পরা নারী কঙ্কাল!

১১

আজকের দিনটা খুব চমৎকার। ছেলের স্কুল নেই। ওরও বেরোবার নেই কোথাও। রাতে ঘুমের মধ্যেই বৃষ্টির শব্দ পেয়েছিল। বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ নিম্নচাপ, রাতের খবরে বলেছিল না? সকালে উঠে দেখল, চারদিকে জল থইথই করছে। ওর দশতলার ফ্ল্যাট থেকে মনে হচ্ছে ওরা একটা নদীর উপর ভেসে চলেছে। নদী! হ্যাঁ, একটা নদীর কাছে ওর যাওয়ার কথা অনেকদিন থেকে। সরকারি রেকর্ড বইয়ে নদীটার অন্য নাম থাকতে পারে; কিন্তু পৃথিবীতে দু'জন মানুষের কাছে তার নাম ঝিল্লি নদী। সেই ঝিল্লি নদীর কাছে পৌঁছতে গেলে, তাকে অবন্তীনগর যেতে হবে। অবন্তীনগরে বাস যায় সরাসরি। নাঃ, এবার একদিন তাকে যেতেই হবে অবন্তীনগরে।

মাঝের ক'টা মাস যা গেল। মিসক্যারেজ হয়ে যাওয়ার পর শরীর খুব ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছিল। কিন্তু চিড়িয়াখানার ঘটনাটার পর সে আবার টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এক সপ্তা শুয়ে শুয়ে শুধু কেঁদেছে ঝিল্লি। তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। একদিন ব্যাগ গুছোতে গিয়ে একটা কার্ড উঠে এল হাতে। অর্ণব মুখার্জি, রেনবো ক্রিয়েশনস। ঝিল্লি প্রথমে কিছু বুঝতে পারছিল না। কে অর্ণব মুখার্জি? কিসের রেনবো ক্রিয়েশনস? কার্ডটা উল্টোতে পরে দেখল উল্টোপিঠে বিদিতার নাম লেখা। তখন কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে সেই অল্প দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। ফোন করে দেখবে না কি একবার। এর আগেও হয়তো দু'-একবার ফোন করার কথা ভেবেছে ঝিল্লি, তা কার্যকর হয়নি। তখনও ও মনে মনে বড়লোকের আদুরে বউ হয়েই ছিল। নিজেকে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন সিঙ্গল মাদার হিসাবে কল্পনা করতে পারছিল না। কিন্তু মিথিলেশ যখন সামান্য চিড়িয়াখানার অ্যাপয়েন্টমেন্টটাই রাখতে পারল না, ওর পৃথিবীটা যেন চুরমার হয়ে গেল। ঝিল্লি বুঝতে পারল, ও সত্যিই কতটা একা। ফোনে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা আর মেসেজ পাঠানোর বাইরে মিথিলেশের বন্ধু হয়ে ওঠার ক্ষমতাই নেই। ঝিল্লি অবশ্য নিজেও জানে না বন্ধু না প্রেমিক, ঠিক কীভাবে ও মিথিলেশকে চেয়েছিল। ওর শেষ আশা যখন চলে গেল, তখন ও অর্ণব মুখার্জিকে ফোন করল।

সেদিনটা ছিল ২৬ জানুয়ারি। অরুণাভ রায়াকে নিয়ে মন্দারমণি গেছে। অরুণাভর সঙ্গে ওর একটা অলিখিত চুক্তি হয়েছে, ওরা থাকতে কখনওই সে রায়াকে নিয়ে এ বাড়ি আসতে পারবে না। ছেলের নেমন্তন্ন এক বন্ধুর বার্থ ডে পার্টিতে। ছেলেকে সেখানে ছেড়ে ঝিল্লি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। সামনেই একটা মাঠে কোনও একটা স্কুলের স্পোর্টস হচ্ছে। সাদা স্পোর্টস শার্ট আর শর্টস পরা বাচ্চারা, লাল-নীল ছোট ছোট পতাকা, ব্যান্ডের বাজনায় মনটা খুব ভাল হয়ে গেল ঝিল্লির। এত বড় একটা আকাশ, রোদে ভাসছে। এসবের মধ্যে তার একটু জায়গা হবে না? নিশ্চয় হবে। ধাঁ করে ও ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে অর্ণব মুখার্জিকে ধরল।

সেই দিনটা যত সুন্দর ছিল, অর্ণব মুখার্জির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ঠিক তেমন ছিল না। ঝিল্লি ভেবেছিল পৃথিবীর প্রতিটি লোক তাকে মনে রাখবে মিথিলেশের মতো। ফোন পেলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠবে, "আরে ঝিল্লি, কী খবর? কেমন আছিস?"

অর্ণব তাকে প্রথমে চিনতেই পারল না। ঝিল্লির অমনি চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল ফোনটা কেটে দেয়। কিন্তু সামনের এপ্রিল থেকে তাকে এক অনিশ্চিত জীবন শুরু করতে হবে যে। যার জীবন এই বাঁকে এসে দাঁড়ায়, তাকে অভিমান মানায় না। সে চোখ মুছে গলা ঝেড়ে বলল, "মনে পড়ছে না, আমি ঝিল্লি, বিদিতার বন্ধু। আপনাদের সঙ্গে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে দেখা হয়েছিল।"

"ও, আচ্ছা! ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি আপনাকে কাল ফোন করি। আমি আসলে একটা পার্টিতে আছি।"

সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসছিল তারস্বরে বাজা ভাংরা পপ, চিৎকার, হাসি। অর্ণবের জড়ানো স্বর বলছিল সে খুব ভুল সময়ে ফোন করেছে।



"সরি। আমি ছেড়ে দিচ্ছি।" বলেই ফোন কেটে দিয়েছিল ঝিল্লি। সেই মুহূর্তে ফোনটা ওইভাবে কাটতে পেরে খুব ভাল লাগলেও, তারপর সারাটা দিন একটা ভুলের স্বাদ তার অন্নব্যাঞ্জনে ফিরে ফিরে আসছিল। সেইদিন, শুধু নিজের জন্য ঝিল্লি অনেকরকম রান্না করেছিল। আর তার বাজারও করেছিল নিজের হাতে। বাজার করার সময় যদিও প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল সবাই তাকে ঠকাচ্ছে, কিন্তু এর বেশি, অনেক বেশি কি জীবন তাকে ঠকায়নি? নিজের হাতে বাজার করা ও রাঁধা সেইসব তুচ্ছ কিন্তু প্রিয় পদগুলি—বড়ি দিয়ে যুক্তি ফুলের চচ্চড়ি, পাপড়ের ঝাল, ঝুরো পোস্ত, ফুল চিংড়ির বড়া আর ডিমের অমলেট কেটে পিস করে পেঁয়াজ, লঙ্কা, ধনেপাতা দিয়ে মাখা মাখা ঝাল, টিফিনে ছিল মুলোর পরোটা। সেই সব প্রতিটা রান্নার মধ্যে তার কেটে দেওয়া ফোন চুলের মতো মিশে রইল।

রাতে অরুণাভ মন্দারমণি থেকে ফোন করল। সেই ফোন আসতেই মেজাজ হারাল ঝিল্লি। তার মুখে উঠে এল বস্তির ভাষা। সে অবাক হয়ে দেখল জীবন তাকে দিয়ে কত কী করিয়ে নিচ্ছে। আরও কত কী করিয়ে নেবে কে জানে। ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে চেপে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখল সে একটা নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নীলচে রঙের দুপুর। কালো মেঘের ভারে আকাশ নদীর বুকের উপর ঝুঁকে এসেছে। ঝিল্লির সমস্যা হল, সে ওপারে যেতে চায়, কিন্তু একটাও নৌকো নেই। এদিকে, সে সাঁতারও জানে না। হঠাৎ দেখল, ওপারে একটা লোক, ফোনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। মানুষটাকে খুব চেনা লাগল তার। সে চেঁচিয়ে ডাকল, "এই যে শুনছেন, একটা নৌকো পাঠিয়ে দেবেন?" লোকটা ফোন থেকে এ কথায় মুখ ফেরাল, তারপর আবার মগ্ন হয়ে গেল ফোনে। আর সেই এখ ঝলক দেখেই ঝিল্লি তাকে চিনতে পারল। সে চেঁচাল, "মিথিলেশ, তুই কি আমায় ফোন করছিস? এই তো আমি, এসে গেছি। তুই একটা নৌকো পাঠিয়ে দে প্লিজ।"

মিথিলেশ ফিরেও তাকাল না। বৃষ্টি নেমে গেল। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য ঝিল্লি ছুটছিল। কোথাও একটা চালাঘর পর্যন্ত নেই। ছুটতে ছুটতে সে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল। অমনি ঘুমটা ভেঙে গেল ঝিল্লির।

ঘুম ভাঙার পর সে বহুক্ষণ সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। গরমকাল নয় যে, ঘুরন্ত পাখায় ব্লেডের দিকে তাকাবে। সব জানলাও বন্ধ, বাইরে দেখার উপায় নেই। কালকের দিনটা যতই অসফল হোক না কেন, লেপের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ার সাহস সংগ্রহ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শীতের লেপের উষ্ণতা জীবনের চরম সঙ্কটকেও কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে রাখতে পারে। ঝিল্লি অনেকক্ষণ সেই ওম নিল শুয়ে শুয়ে। তাছাড়া আজ ওঠার তাড়া নেই। স্কুল ছুটি। কালকের রান্না অনেক রয়ে গিয়েছে। গরম করে নিলেই চলবে। প্রেশারে একটু ভাত করবে ছেলের জন্য আর মাছ ভাজা।

শুয়ে শুয়ে সে অনেকক্ষণ স্বপ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল। ওটা তো নিশ্চয় ঝিল্লি নদী। অবন্তীনগরের ঝিল্লি নদী। কিন্তু মিথিলেশ ওকে চিনতে পারল না কেন? ও কি অন্য কাউকে ফোন করছিল। মিথিলেশ বলেছিল তার এক ছাত্রী তীর্ণা জোর করে তাকে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে চেয়েছিল। কই, ঝিল্লি তো কোনওদিন ফেসবুকে মিথিলেশকে পায়নি। সেই মেয়েটিকেই কি ফোনে পেতে চাইছে মিথিলেশ? আরও কত কী ভাবছিল ঝিল্লি, কিন্তু হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠতে তার ভাবনা ছিঁড়ে গেল। এত সকালে কে ফোন করবে তাকে? অরুণাভ, এমনকী মিথিলেশ হলেও অসহ্য। ফোন ধরার আগে সময় দেখে অবাক সে। ন'টা দশ। এত বেলা পর্যন্ত সে শুয়ে আছে! অচেনা একটা নাম্বার।

"হ্যালো।"

"গুড মর্নিং, আমি অর্ণব, অর্ণব মুখার্জি। সরি, কাল কথা বলতে পারিনি।"

সেই একটা ফোন সত্যি গুড মর্নিং নিয়ে এল তার জীবনে। জেইউ থেকে এমএ করার পর চাকরির কথা ভাবেইনি ঝিল্লি, বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে গিয়েছিল আষ্টেপৃষ্ঠে। নিজের কী স্কিল আছে, আদৌ আছে কি না, সেটা সে জানতই না। অর্ণব আর বিদিতা ওর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করল। প্রথম প্রথম ইংরেজি বিজ্ঞাপনের বাংলা অনুবাদ, আস্তে আস্তে ও নিজেই কপি লিখতে শুরু করল। এমনকী দেখা গেল বিজ্ঞাপনের লে-আউট নিয়ে ওর সৃজনাত্মক চিন্তা-ভাবনা আছে। আপাতত ও ফ্লেক্সি-ওয়ার্কিং করে। অফিসে একটা ক্রেশ খোলার কথা চলছে। মহিলা কর্মী বেশি তো। তখন ও ফুলটাইম কাজ করবে। তবে সেটা হতে এখনও বছর খানেক। তার মধ্যে মনে হয় ডিভোর্সটা পেয়ে যাবে।

ব্যালকনি থেকে বৃষ্টি দেখল কিছুক্ষণ। গাছপালাগুলো ভিজে আরও সবুজ লাগছে। এদিকটা খুব সুন্দর। সবই ভাল, কিন্তু বড্ড নিচু বলে খুব জল জমে যায়। তবে মেট্রোটা ভীষণ কাছে। পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটা পথ। ঝিল্লি নিজেই স্কুলে দিয়ে আসে ছেলেকে, মাঝখানের সময়টুকু কাজ করে, তারপর ছেলেকে নিয়ে ফেরে। ফেরার পথে, রাস্তার দু'পাশে সবজি, মাছ পরপর। আলাদা করে বাজার করতে হয় না। কখনও ফুচকা বা ভুট্টা নিয়ে ফেরে মা-ছেলেতে। বাজার করার একটা আলাদা মজাও আছে। অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়, আর একা লাগে না অতটা। কাল সবজিউলির মাসির কাছ থেকে কচুর মুখি আর কুলেখাড়া শাক নিতে নিতে জানতে পারল তার বাড়ি অবন্তীনগর। বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল অমনি।

আজ সকালের অঝোর বৃষ্টিতে ঝমঝম করে অবন্তীনগর শব্দটাই বেজে উঠছে বারবার। কতদিন কথা হয়নি মিথিলেশের সঙ্গে। বেচারা ফোন করে করে না পেয়ে আর ফোন করে না। শেষবার একটা অদ্ভুত এসএমএস পাঠিয়েছিল। চুড়ি পরা কঙ্কালের হাত। মাথাটা গেছে না কি? তিন-চার মাস ঝিল্লি অন্য কোনও কিছু নিয়ে ভাবার সময় পায়নি। শুধু নতুন সংসারে গুছিয়ে বসা, স্বাধীন উপার্জনের চেষ্টা আর ছেলের দেখাশোনা। আজ এমন একটা কর্মনাশা দিন বলেই বোধহয় মনে হচ্ছে, তার সব গুছোনো হয়ে গিয়েছে। এবার সে একটু আরাম করতেই পারে, এবার সে অবন্তীনগরের বাস ধরে...

ফোন বাজল কি ঘরে? বৃষ্টি এত জোরে পড়ছে, এখান থেকে কিছু শোনা যায় না। অরুণাভ মাঝে মাঝে ন্যাকামি করে ফোন করে, "ভাল মাছ পেয়েছি, দিয়ে আসব? মেটে খাবে না কি?"

অরুণাভর ফোনের কথা ভাবতেই ওর মনে হল "দূর হোক গে, ধরব না" ফোনটা বেজে বেজে থেমে গেল। ঝিল্লির অস্থির লাগল একটু। ঘরে চলে এসে দেখল মিথিলেশের মিসড কল। কত দিন পর!

রিং ব্যাক করবে ভাবছে, এমন সময় আবার বাজল ফোন। ঝিল্লি একটা চেয়ার টেনে ব্যালকনিতে নিয়ে যায়, জমিয়ে বসে ফোন ধরে। "হ্যাঁ বল, বহু যুগের ওপর থেকে উদয় হলি যে।"

উত্তরে একটা মেয়েলি গলা শোনে। "আপনি কি ঝিল্লি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো মিথিলেশের ফোন।"

"হ্যাঁ এতে আপনার নাম সেভ করা ছিল। দেখলাম, সবচেয়ে বেশি ফোন করা হয়েছে আপনাকে।"

বৃষ্টিতে চরাচর ভেসে যাচ্ছে, ঝিল্লিকেও বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সে খসখস গলায় বলে, "আপনি কে? মিথিলেশ কোথায়?"

"আমাকে চিনবেন না। আমার নাম সীমা। মিথিলেশ আমার স্বামী ছিল।"

ছিল মানে! এখন নেই? ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে! ছেলের কথা মাঝে-মাঝে বললেও বউয়ের কথা প্রায় কিছুই বলেনি মিথিলেশ। সদ্য পাওয়া চাকরি, নতুন খোলা বাস রুট, যাতায়াতের সুবিধে অসুবিধে, নদী আর ঝিল্লির সেখানে যাওয়া নিয়ে আকাশকুসুম স্বপ্ন বোনা—এই নিয়েই তো ওদের কথা চলত। কিন্তু সারা জীবনের হিসাবে সে আর ক'দিন? মিথিলেশ আর কাউকে ফোন করেনি!

"আমি বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলবেন? মিথিলেশের সঙ্গে কি আপনার সেপারেশন হয়ে গেছে?"

সে কথায় উত্তর না দিয়ে হাড়-হিম করা একটা প্রশ্ন করে সীমা নামের মেয়েটি।

"আমি জানি না, আপনি ওর কীরকম বান্ধবী, ওর সঙ্গে আপনার কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল তবু আপনি ছাড়া, আর কাকেই বা এ কথা বলব? প্লিজ বলুন না, ওকে দেখে আপনার কি কখনও মনে হয়েছে ও কাউকে রেপ করতে পারে?"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ঝিল্লি; চিৎকার করে বলে, "কী বলছেন, মিথিলেশ, রেপ! কী বলছেন আবোল তাবোল?"

তার উত্তরে সীমা অবিশ্রান্ত বর্ষণের মতোই কেঁদে চলে। সেই কান্নার ফাঁকে ফাঁকে শব্দগুলো বোঝার চেষ্টা করে ঝিল্লি।

"তাহলে ওরা কেন মারল ওকে, পিটিয়ে মেরে ফেলল আস্ত মানুষটাকে? ও না কি ছাত্রর মাকে রেপ করতে গিয়েছিল। আপনি বলুন, মিথিলেশ এ কাজ করতে পারে?"

ঝিল্লি ধপ করে বসে পড়ে চেয়ারে। তার শুনতে ইচ্ছে করে না অচেনা একটা মেয়ের কাছ থেকে মিথিলেশের হত্যার খবর। তবু প্রেতিনীর হাতের মতো দুর্নিবার এক কৌতূহল কাজ করে তার। সীমার কান্নার নিচ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসে ভয়ঙ্কর এক



কঙ্কাল, তার সামনে দাঁড়াতে হয় তাকে, দাঁড়াতেই হয়।

অবন্তীনগরের বাস আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খুব অসুবিধা হচ্ছিল যাতায়াতের। ট্রেকারে, অটোয় ভেঙে ভেঙে যেতে অনেক বেশি খরচও হচ্ছিল। হেডমাস্টারমশাই শুনে বলেন, স্কুলের যে ছাত্রাবাস অর্ধেক উঠে থেমে গিয়েছে, যেখানে থাকার কথা। সীমা দেখেনি যে বাড়ি, বস্তুত সে কোনওদিন স্বামীর কর্মস্থলে যায়নি, ক'জনই বা যায়? কিন্তু সে শুনে আপত্তি করেছিল। নদীর ধারে ওরকম একটা আধা-ওঠা শুনশান হস্টেল, কেউ থাকে না, সেখানে কীভাবে থাকবে একটা মানুষ? তাছাড়া খাওয়া-দাওয়া, ছেলেটাও সারা সপ্তা বাবাকে পাবে না। মিথিলেশ ওকে বুঝিয়েছিল এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা। অবন্তীনগরের বাস চালু হলেই সে বাড়ি ফিরে আসবে। তাছাড়া খাওয়াদাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। দুপুরে বাজারের একটা ঝুপড়ি হোটেলে খায়, রাতে ছাত্রের বাড়ি থেকে রুটি-তরকারি আসে। ছাত্রটিই দিয়ে যায়।

সেদিন ছাত্রটির জ্বর হয়েছিল, আসতে পারেনি। তার মা এসেছিল খাবার নিয়ে। তাকে না কি মিথিলেশ...

কান্নার তোড়ে সীমার কথা ভেসে যায়। ঝিল্লি তাকে কোনও সান্ত্বনা দেয় না। পাথরের মতো স্থির হয়ে অপেক্ষা করে, কখন সীমা খানিকটা সামলে নিয়ে আবার কথায় ফিরে যাবে।

সেই মহিলাটি চিৎকার করে ওঠে। স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে খাতা-পেনের দোকান চালায় গ্রামের একটি বেকার ছেলে। রাত্রিবেলা সেটা হয়ে যায় চুল্লুর ঠেক। এরা না কি সেক্রেটারির পোষা। নদীপথে বাংলাদেশে অনেক কারবার চলে তার, সে সব রাখতে এদের পুষতে হয়। বেশ কয়েক মাস এরা রক্তের স্বাদ পায়নি। চিৎকার শুনে এরা দৌড়ে এসে কিছু না শুনতে চেয়েই মিথিলেশকে বেধড়ক পিটতে শুরু করে। তারপর একসময় আশ মিটে গেলে ফেলে চলে যায়। ওইভাবেই সে পড়ে থাকে সারা রাত। পরের দিন কে যেন দেখতে পেয়ে সবাইকে খবর দেয়, সীমাকে ফোন করা হয়। মিথিলেশকে নিয়ে আসা হয় বারুইপুর হসপিটালে। তখনও প্রাণটা ধুকপুক করছিল। ঘণ্টাখানেক বেঁচেছিল তারপর।

সীমা একটু থামে দম নিতে। ঝিল্লি জানতে চায় "কিছু বলেছিল তোমাকে?"

"বলার চেষ্টা করছিল কী একটা। আমি শুধু মোবাইলে ময়ূরের ছবি দেখাতে... আমি বুঝতে পারিনি ঠিক। আরও অনেক কিছু বলার চেষ্টা করছিল। আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। আরও ক'টা দিন যদি বাঁচত! চাকরির একটা বছরও পার হল না।"

মিথিলেশের শেষ কথা, না সীমার এই কথাগুলো—ফোনটা বেশি দুর্বোধ্য কে জানে। ঝিল্লি বুঝতে পারে না কিছু। তার কান বৃষ্টির আওয়াজে বধির। অসময়ের এই বৃষ্টি, আকাশ থেকে যেন রক্তের ধারা নেমে আসছে। সমস্ত পৃথিবী স্নান করছে রক্তে। রক্তের গন্ধে তার গা গুলিয়ে ওঠে।

সে শুধু কোনওরকমে বলতে পারে, "অবন্তীনগরের বাস চলে না আর? তাহলে আমি কীভাবে যাব, বলতে পারেন? কীভাবে আমি পৌঁছব অবন্তীনগরে, ঝিল্লি নদী পেরিয়ে?"

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

গল্প

মধ্যবিত্ত

জয়ন্ত দে



মাঝ রাতে ফোন মানে মণীশ। রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে ফোন বাজলে, আমাদের বাড়ির সবাই পাশ ফিরে শোয়। কারণ সবাই জানে ওই ফোন আমার। আমাকে ফোন করেছে মণীশ। অন্য বাড়িতে মাঝরাতে ফোন বাজলে সবাই টেনশন করে। আমাদের বাড়ির রাতের ফোন নিয়ে সবাই নির্লিপ্ত। তবু কারও ঘুম ভেঙে গেলেও সে উঠে এসে ফোন ধরে না...

মাঝ রাতে ফোন মানে মণীশ।

রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে ফোন বাজলে, আমাদের বাড়ির সবাই পাশ ফিরে শোয়। কারণ সবাই জানে ওই ফোন আমার। আমাকে ফোন করেছে মণীশ। অন্য বাড়িতে মাঝরাতে ফোন বাজলে সবাই টেনশন করে। আমাদের বাড়ির রাতের ফোন নিয়ে সবাই নির্লিপ্ত। তবু কারও ঘুম ভেঙে গেলেও সে উঠে এসে ফোন ধরে না। এই ফোন নিয়ে কারও ঘুমের মধ্যে চাপা উৎকণ্ঠায় ভোগা নেই। ব্যাপারটা সবারই খুব গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। মণীশকে আমি বার কয়েক বোঝানোর চেষ্টা করেছি, 'তুই জানিস এখন রাত দুটো'।

আমার কথায় মণীশ অবলীলায় বলে, 'কেন জানব না।' ও তখন আমার আমাকে নতুন করে বোঝায় কলকাতার সঙ্গে চিকাগোর কত ঘণ্টা কত ঘণ্টার তফাত।

মাঝে কতবার ভেবেছি, মণীশের ফোন ধরব না। ফোনের ভল্যুম কম করে রাখব। কম করেও রেহাই পায়নি। তারপর রোজ রোজ সেটা মাথায়ও থাকে না। রাতে কমালাম, দিনে বাড়াতে ভুলে গেলাম। সেটা নিয়ে এক অন্য ঝামেলা। তার পর মণীশ দু-একবার রিং করে যে কেটে দেবে এমন নয়। রিং করেই যাবে। তখন উলটো বিপত্তি এক বাড়ি লোকের ঘুম ভাঙানো।

মণীশ আমার স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বন্ধু। থাকে চিকাগোতে। ওখানের একটা ফুড প্রসেসিং কোম্পানির খুব উঁচু পোস্টে আছে।

আমার স্ত্রী ইন্দ্রাণী বলেছিল, 'উনি মাঝ রাতে ফোন করেন কেন বলো তো?'

'কী করে বলব? তবে ওদের তো দুপুর।'

'আমার মনে হয় উনি অফিস থেকে ফোন করেন। খরচ বাঁচান।'

আমি চুপ করে থাকি। বন্ধুকে ছোট দেখতে বা দেখাতে আমার ভাল লাগে না। তবে মণীশকে আমি বেশ কয়েকবার বলেছিলাম, তুই রাত দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে ফোন করার চেষ্টা কর। তা হলে ভাল করে দুটো কথা বলতে পারি।

মণীশ বলেছিল, 'তুই তো ভাল করেই কথা বলিস। আমার সব বুঝতে পারি।'

'ধুস এত রাতে। কথা বলা যায় না কি?'

মণীশ মণীশের মতো। বলে, 'আরে আমার অফিসে আমার নিজস্ব একটা চেম্বার আছে। সেখানে দরজা বন্ধ করে তোদের সঙ্গে যখন কথা বলি মনে হয় দেশেই আছি। অন্য সময় কথা বলে আমি সে সুখ পাই না। চারদিকে এত বিজাতীয় ভাষা আর মুখ, যে সব কেমন গুলিয়ে যায়।

মণীশের এই ব্যাপারটা আমার হিপোক্রেসি মনে হয়। ব্যাপারটা নিয়ে আমি তোল্লাই দিই না। যেমন, রাতে মণীশ যখনই ফোন করে একটা-দুটো কথার পরে, জিগ্যেস করে আজ কী রান্না হল?

তখন মধ্যরাতে আমাকে মনে করে বলতে হয় দুপুরে ভাতের সঙ্গে, বা রাতে কী মাছ? কী সবজি। মধ্য রাতে ব্যাপারটা মোটেই সুখকর নয়। তবু বলি।

মণীশ বলে, 'তোরা ভাগ্যবান রে, আমার বউ একটা জিনিসই খাওয়াতে পারে সেটা হল চুমু। উঠতে বসতে চুমু খাওয়ায়। না হলে ওকে কত করে রান্নাগুলো শেখানোর চেষ্টা করলাম, ও-ও কত কষ্ট করে শিখল কিন্তু—হল না।'

আমার স্ত্রী বলল, 'অত যদি খাওয়ার ইচ্ছে তবে বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করলেন না কেন?'

মণীশের বউ স্পেনের মেয়ে। ভাল মেয়ে। দু-একবার কথাও হয়েছে। ওই পর্যন্ত। আন্তরিকতা বা বন্ধুত্ব গড়ায়নি। কারণ মণীশ সব সময় অফিস থেকে ফোন করে।

ফোনে ফোনে মণীশ কলকাতার সব খবরাখবর রাখে। আমাদের থেকে সব বন্ধুর হাঁড়ির খবর ওর কাছে। একবার কুশলের সঙ্গে আমার এসপ্লানেডে দেখা হয়েছিল। কুশল আমার কলেজের বন্ধু। দু-একটা কথা বলার পর কুশল বলল, 'কী মাছের কাঁটা ছিল?'

আমি কুশলের কথা ঠিক বুঝতে পারিনি। কুশল আমাকে বলল, 'তোর গলায় যে কাঁটা ফুটেছিল—সেটা কী মাছের কাঁটা?

আমি বললাম, 'এ খবর তুই কোথা থেকে পেলি?'

'আমাকে মণীশ বলেছে।'

আমি খুব বিরক্তির সুরে বললাম, 'খুবই সামান্য ঘটনা। ডাক্তার হাসপাতালও করতে হয়নি। শুকনো ভাত খেতেই নেমে গিয়েছে। সেটাও তোকে বলেছে?'

এই হল মণীশ। এত সামান্য খবরও ও জনে জনে দেয়।

এর মধ্যে মণীশ একদিন আমাকে ফোন করল, বলল, 'শোন মৌসুমী বাপের বাড়ি চলে এসেছে। একবার যা তো। দেখতো ওর কী সমস্যা।'

আমি একটু চুপ করে থাকলাম, 'কোন মৌসুমী?'

'আরে মৌসুমী বসু। বিয়ের পর ঘোষ হয়েছিল। ওর কথা বলছি। আরে মড মৌসুমী।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক অনেক কথা মনে পড়ে গেল। মৌসুমী বসু, অর্ণবদের ঘোষপাড়ায় থাকত। খুব সুন্দরী, আর আধুনিক। আমাদের সঙ্গে এতটা বন্ধুত্ব ছিল না। ও রমেশ, প্রদীপ, সুদীপা এদের সঙ্গে মিশত। একটু অন্যরকম, সিগারেট খেত পাল্লা দিয়ে। বিয়ার খেয়ে একবার খুব হইহল্লা করেছিল। এই জন্যে আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম মড মৌসুমী। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তেই এক বড়লোক ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়।

আমি অবাক হয়ে করলাম, 'তুই ওর খবর পেলি কোথা থেকে?'

'আমাকে অর্ণব দিয়েছে। অর্ণবদের পাড়াতেই ও থাকে। অর্ণব কানাঘুষো শুনেছে। কিন্তু সঠিক খবর আনতে পারেনি। ওর সঙ্গে কথা নেই। ফোন নম্বর জানে না। তুই একটু নিয়ে আসবি তো?'

আমি মণীশের কথায় হ্যাঁ না কিছু বলিনি। বলার কথাও না। আমি এখন অর্ণবদের পাড়ায় যাব? গিয়ে মৌসুমীকে জিগ্যেস করব, তোর কী হয়েছে? কেন বাপের বাড়ি এলি? বরের সঙ্গে গোলমাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

দু-দিন পরে আবার মণীশ ফোন করল। বলল, 'খবর নিয়েছিস?'

'না রে, ওদিকে যাওয়া হয়নি।'

'তুই অর্ণবকে ফোন কর—সব জানতে পারবি।'

'আমার কাছে অর্ণবের নম্বর নেই।'

'দাঁড়া আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি। তোর মোবাইলে এসএমএস করে দেব।'

'দিস।'

আমার কাছে তার একটু পরে অর্ণবের মোবাইল নম্বর এল। কিন্তু পরের দিকে আমি ফোন করতে পারলাম না। তালেগোলে ভুলেই গেলাম। আসলে মৌসুমীর ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না। ঠিক কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু দিন দুয়েক পরে অর্ণবই আমায় ফোন করল। বলল, 'আমি নাকি ওকে খুঁজছি।'

আমি ঢোঁক গিললাম। বললাম, 'হ্যাঁ মণীশ বলছিল—মৌসুমী



নাকি চলে এসেছে বাপের বাড়িতে—কী হয়েছে রে?'

অর্ণব বলল, 'আমি আর কিছু জানি না রে। আসলে আমার ভাইঝি মৌসুমীর মেয়ের সঙ্গে এক কলেজে পড়ে। ও জানত মৌসুমী আমার সঙ্গে পড়েছে। ও-ই একদিন আমাকে বলল, আমি সেটা মণীশকে বলেছিলাম। তারপর মণীশ সেটা এত জায়গায়, এত বন্ধুদের বলেছে— কিন্তু আমি কী করব বলতো ? তুই একদিন অফিস ফেরত আয় আমার বাড়িতে, দু'জনে বসে আলোচন করি।' সত্যি সত্যি আমি তার পরের দিন অর্ণবদের বাড়ি গেলাম। অর্ণব থাকে ঠিক আমাদের পাশের পাড়ায়। হেঁটে যেতে মিনিট সাতেক লাগে। যাই হোক দু-বন্ধু মিলে অনেক গল্প হল। কিন্তু মৌসুমী নিয়ে কোনও সমাধান সূত্র বের হল না।

হওয়ার কথাও নয়।

সেদিন রাতেই আমার ফোন বাজল। মণীশ বলল, 'তোরা পারলি না, আমি চেষ্টা করছি। অন্য একটা বুদ্ধি বের করেছি। দেখি কী হয়? কাল-পরশু জানাব।'

আমি পরের দিন অর্ণবকে ফোন করলাম। বললাম, 'মণীশ চিকাগোয় বসে কী বুদ্ধি বের করেছে, তাতেই ও জানতে পারবে— মৌসুমীর ব্যাপারটা কী?'

সে রাতেই মণীশ আবার ফোন করল। বলল, 'এক ধাপ এগিয়েছি। জাস্ট ফার্স্ট স্টেপ। কাল জানাব।'

এদিকে আমার স্ত্রী ইন্দ্রাণী বিষয়টা নিয়ে মারাত্মক বিরক্ত। আমাকে সকালে বলল, 'তুমি ওঁকে বলো তোমার মোবাইলে ফোন করতে—কেন উনি ল্যান্ডলাইনে করেন! সারা বাড়িতে ঝমঝম করে ফোন বাজে। সবাই বিরক্ত। যত প্রেম-পিরিতের কথা বলবে বলো, কিন্তু তা মোবাইলে করো।'

আমি মণীশকে বললাম, 'শোন মোবাইলে ফোন করিস, ল্যান্ডলাইনে একটু সমস্যা আছে।'

মণীশ আশ্চর্য গলায় বলল, 'তুই বাড়িতে থেকে মোবাইলে কথা বলতে চাইছিস—এটা মনে হয় ঠিক নয়। যতটা পারিস ল্যান্ডলাইনটাই ব্যবহার কর। ঠিক আছে, আমি তোকে মোবাইলেই করব।'

এরপর থেকে আমার মোবাইলেই ফোন আসে। দু'দিন পরে ফোন করে মণীশ বলল, "আমার সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যে মৌসুমীর কথা হবে। ওর মেয়ে জানাবে।'

'ওর মেয়ে মানে? তার সঙ্গে তোর চেনাজানা হল কীভাবে?'

'কেন ফেসবুকে। আমি ওকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। অ্যাকসেপ্ট করেছে। তারপর জানিয়েছি, ওর মা আমার বন্ধু, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম।

হঠাৎ আমার কী হল, আমি ওকে বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ রে তোর কি মৌসুমীর ব্যাপারে কোনও স্পেশাল ইন্টারেস্ট ছিল—?' মণীশ হাসল, বলল, 'তোরা খুব মধ্যবিত্ত রে। তোদের সবার এক প্রশ্ন। নারী-পুরুষের সম্পর্ক মানেই কি অন্য ইন্টারেস্ট! আমার তোদের সবার ব্যাপারেই খুব আগ্রহ, আর যদি স্পেশাল কোনও ব্যাপার থাকত তা হলে কি আমি তোদের এভাবে বলতাম না, পাগল করে মারতাম। না হলে ইন্ডিয়ার দৌড়তাম।'

এরপরের ঘটনা খুবই সাধারণ, মণীশের সঙ্গে মৌসুমীর ফোনে কথা হয়েছে। মণীশের মারফত বেশ কিছুদিন পরে আমি জেনেছি, মৌসুমীর স্বামীর সঙ্গে গোলমাল চলছে। ওর স্বামীর খুব সন্দেহবাতিক, মৌসুমী অনেক সহ্য করেছে কিন্তু আর পারছে না। ওর মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। এটা ফাইনাল ইয়ার। ওরা ও বাড়ি ছেড়ে ওখানে চলে এসেছে। তবে ডিভোর্স কেসের মধ্যে যাবে না। ও এভাবেই থাকতে চায়।'

আমি কোনও কথা বললাম না।

মণীশ বলল, 'ও পৈতৃক কিছু টাকাপয়সা পেয়েছে তাতেই

চলে যাচ্ছে। চলে যাবে। আপাতভাবে কোনও অসুবিধে নেই। আমি ওকে সাহস দিয়েছি, বলেছি—ভালই করেছিস। ও তোর কথা বলছিল। ওর নম্বরটা তোকে মেসেজ করে দিচ্ছি।'

এর মধ্যে মণীশ যেমন ফোন করে মাঝে মাঝে, যেমন করত তেমনই করে। আমার মোবাইলে। টুকটাক কথা হয়। বিভিন্ন বন্ধুর খোঁজখবর পাই। মণীশ বলে, 'তুই মৌসুমীকে ফোন করিসনি, গেলিও না, অথচ দেখ সৌরভ গিয়েছিল, কুশল গিয়েছিল, অভিজিৎ ঘুরে এসেছে। ওর একটা ভাল ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি হয়েছে। তুইও যা, সবাই মিলে বাঁচ।'

এমন চলছিল।

একদিন দুপুরে অর্ণব ফোন করল আমায়, বলল, 'কাল সন্ধেবেলা মৌসুমীদের বাড়িতে আমাদের বন্ধুদের একটা জমায়েত আছে, তুই আয়।'

আমি বললাম, 'আমি? আমি তো আগে কোনওদিন মৌসুমীদের বাড়িতে যাইনি। না, আমি যাব না।'

অর্ণব বলল, 'তোকে আসতেই হবে। মৌসুমী আমাকে খুব করে বলেছে। প্রয়োজনে ও তোকে ফোন করে নেবে।'

আমি অর্ণবের কথায় চুপ করে থাকলাম।

কিন্তু সত্যি সত্যি মৌসুমী আমাকে ফোন করল—বলল, চলে আয় আমাদের বাড়ি। আমরা সবাই মিলে আড্ডা মারব। আমিও গেলাম পরের দিন। ওর বাপের বাড়িটা আর আগের বাড়ি নেই। মাল্টিস্টোরিড হয়েছে। মৌসুমী একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে। টাকা-পয়সাও ভাল পেয়েছে যা বুঝলাম। সান্ধ্য আড্ডা। সবাই-ই হাতে করে কিছু না কিছু খাবার নিয়ে এসেছে। সব মিলিয়ে প্রচুর খাবার। মাঝখান থেকে আমি একটু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছি, অফিস ফেরত গিয়েছি। কিছুই নিইনি।

হঠাৎ অভিজিৎ ওর ব্যাগ থেকে মদের বোতল বের করল। বলল, 'কে কে খাবি?'

মৌসুমী মৃদু আপত্তি জানাল। বলল, 'আজ এটা রেখে দে। অন্য একদিন এ সব হবে।'

অভিজিৎ বলল, 'তুই রেখে দে বলছিস, দেখ সবার লাল পড়ছে, সব শালা খাবে।'

আমি বললাম, 'না, আমি খাব না। আমাকে একটু তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে। কাল ভোরের ফ্লাইটে আমি মুম্বই যাব।'

আমার পাশাপাশি গৌতমও খেল না, ওর সুগার হাই। স্ট্রিক্টলি মানা। আমরা দু'জন বাদ গেলেও ওরা চারজন বসে গেল। মৌসুমী তখনও মৃদু আপত্তি করল। বলল, 'আজ ছেড়ে দে না, আজ সবাই মিলে আড্ডা মারি।'

কিন্তু অভিজিৎ পাত্তা দিল না, নিজেই গ্লাস নিয়ে এল, টেবল সাজিয়ে বসল। মৌসুমীর জন্যেও একটা গ্লাস বানাল। মৌসুমী বলল, 'না, আমি খাব না। আমি খাই না রে অভি।'

পান ও গল্প চলছিল। আমি আটটা নাগাদ উঠে এসেছিলাম। কেন জানি না, আমার ভাল লাগছিল না।

অফিসের কাজে একটু বেশিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অর্ণবের কাছে সেদিনের খোঁজখবর নিতে পারিনি। কিন্তু ক'দিন পরেই একদিন মধ্যরাতে ফোন করল, মণীশ। বলল, 'তুই গিয়েছিলি সেদিন ভাল হয়েছে, ওর সঙ্গে তোর যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু একটা কথা কি জানিস, আমার মনে হয়, তোদের আর ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। আমি সবাইকেই বলেছি। তোরা আর যাস না।'

আমি খুব আস্তে গলা চেপে বললাম, 'কেন সেদিন কিছু হয়েছে—ওরা মদ টদ খেয়ে কোনও উল্টোপাল্টা কথা বলেছে, বা মিসবিহেভ করেছে?'

'না, বিষয়টা ঠিক তেমন নয়। মৌসুমী আমাকে যেটা বলল—সেটা অদ্ভুত। তোদের ছ'জনের মধ্যে চারজনই নাকি বিবাহিত জীবনে প্রচণ্ড অসুখী। তোরা এত অসুখী যে সুযোগ পেলেই তোদের স্ত্রীদের নামে নিন্দা করিস। কেন রে তোদের সবাই এ রকম?'

আমি বললাম, 'এটা যে যার খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি জানি না কারা কারা বলেছে। তবে কী জানিস, অনেক সময় এগুলো আড্ডার বিষয় বা কথার কথা হয়। তারপরই দেখবি তারাই বাড়ি ফিরে সুখে ঘর-সংসার করছে। আর একটা কথা, হয়তো সবার জীবনের ছোটখাটো সমস্যা থাকে, একঘেয়েমি, বিরক্তি থাকে—সে সবই আলোচনা করেছে বন্ধুদের কাছে।'

মণীশ বলল, 'না রে এভাবে আমিও প্রথম প্রথম মৌসুমীকে বোঝানোর চেষ্ট করেছি। কিন্তু মৌসুমী যেটা বলল—সেটা হল, ওর অসুখী বন্ধুরা সবাই-ই ওর কাছে মেন্টালি ও সেক্সুয়ালি আশ্রয় চাইছে।'

'মানে?' আমি চমকে উঠলাম।

মণীশ বলল, 'মৌসুমী বুঝেছে—তার বন্ধুদের বেশিরভাই এখন তাকে একজন একা মেয়েমানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না। আর কারও সাহসও নেই সোজাসাপ্টা ওর সঙ্গে প্রেম করার—সবাই অসুখী বিবাহিত জীবনের গল্প ফাঁদছে। গল্প ফেঁদে নিজের এগিয়ে দেওয়া। কী অদ্ভুত মধ্যবিত্ত তোরা। একটা বন্ধুত্বকে নষ্ট করে ফেলিস।'

এরপর মণীশ আর কোনওদিন আমাকে ফোন করেনি। কাউকেই না। আমরা মধ্যবিত্ত বন্ধুরাও আবার যে যার মতো আপন হাঁড়িতে।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



গল্প

এক অভিনব প্রয়াস

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়



ব্যাঙ্কে ঢুকে দূর থেকে কেবিনের ভিতরটা একবার দেখে নিল জয়তি। এখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। মোটামুটি খালি আছেন কাকলি সেন নামের ওই ভদ্রমহিলা। সকালের দিকে ওঁর টেবিল ঘিরে যা ভিড় থাকে, উনি যা ব্যস্ত থাকেন তাতে ওঁর সঙ্গে তখন কোনও ব্যক্তিগত কথা বলার প্রশ্নই আসে না। এর আগে অন্তত বার চারেক এসে ফিরে গেছে জয়তি। একদিন এসেছিল সকালের দিকে মানে ওই সাড়ে এগারোটা, বারোটার সময়। দেখল কাকলি সেন মাথা তোলার সময় পাচ্ছেন না। ওঁর সামনের চেয়ারগুলি সব ভর্তি।

একদল মানুষ কাঁড়ি কাঁড়ি দরকার, রাশি রাশি জিজ্ঞাসা নিয়ে বসে। মিনিট দশেক অপেক্ষা করে শেষে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল জয়তি। দিন দুই, তিন পরে আবার একদিন একছিল দুপুরে লাঞ্চের সময়। ওই দুটো নাগাদ। তখনও দেখল সেই একই অবস্থা। কাকলি সেনের নাভিশ্বাস ওঠার দাখিল প্রায়। ভদ্রমহিলা বোধ হয় লাঞ্চটা করারও সময় পাননি। বেশ কিছু মানুষ কেবিনে ঢুকে ভিড় জমিয়েছে। উনি একবার তাদের সামলাচ্ছেন। পর মুহূর্তেই আবার রিসিভার কানে দিয়ে ফোন অ্যাটেন্ড করছেন। সেদিনও বেশ অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে গিয়েছিল জয়তি। নাহ! এভাবে হবে না। তার যা কথা এত ভিড়ের মধ্যে, পাঁচজনের সামনে হবে না। ভদ্রমহিলাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য একা পাওয়া দরকার।

এরপর আরও দিন দুয়েক জয়তি এসেছিল বিকেলের দিকে। এই সাড়ে তিনটে-চারটের সময়। দু'-দিনই দেখেছিল কাকলি সেনের কেবিনে ভিড়ভাট্টা কিছু নেই। উনি একগাদা ফাইলপত্র নিয়ে এক মনে কাজ করে চলেছেন। সামনে খোলা কম্পিউটার। ওই দু-দিনও ওঁর কাছে যেতে গিয়ে যেতে পারেনি কাকলি। পা দুটো কেমন যেন আটকে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল গিয়ে কী বলবে! কীভাবে শুরু করবে কথাটা!

আজও কেবিনের দোরগোড়ায় এসে থমকে গেল জয়তি। একটু ইতস্তত ভাব। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কোনও কারণে কাকলি সেনও মুখ তুলে তাকালেন। চোখাচোখি হল দু'জনে। কাকলি'র চাউনিতে যেন আহ্বানের ইশারা। ভরসা পেল জয়তি। সোজা ভিতরে ঢুকে গেল। কাকলি প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি আমার সঙ্গে কোনও দরকার আছে? আগেও বারকয়েক আপনাকে কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম বলে ডাকতে পারিনি।"

বাহ! ভদ্রমহিলার গলার আওয়াজটা তো খুব সুন্দর। আবৃত্তি করলে বা রেডিওতে সঞ্চালিকার চাকরি করলে খুব সহজেই শ্রোতার মন জয় করে নিতে পারতেন। শুধু গলার আওয়াজ কেন, ওঁর চেহারার আকর্ষণই বা কম কিসে? এতদিন সুন্দরী বলে জয়তির নিজের মধ্যে একটা চাপা অহংকার ছিল। আজ কাকলি সেনকে খুব কাছ থেকে দেখার পর সে অহঙ্কার প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ল। কত বয়স হতে পারে ভদ্রমহিলার? মধ্য পঞ্চাশ তো অবশ্যই। এই বয়সেও উনি এত সুন্দর। জয়তির বয়সে না জানি কী ছিলেন কিংবা জয়তি ওঁর বয়সে পৌঁছে কি এত সুন্দর থাকবে? সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব মিশলে একটা মানুষ যে কতখানি আকর্ষণীয় হতে পারে তা এঁকে দেখলে বোঝা যায়।

জয়তি হেসে অস্বস্তিটা কাটাবার চেষ্টা করল। বলল, "হ্যাঁ, ভীষণ দরকার এবং সেটা একান্তই ব্যক্তিগত। যদি একটু সময় দেন।"

সামান্য অবাক হলেও সামনে নিয়ে জয়তিকে বসতে বললেন কাকলি।

সামনের একটা চেয়ারে বসতে বসতে জয়তি বলল, "ধন্যবাদ। আমার নাম জয়তি বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা ব্যাপারে আমি আপনার হেল্প চাই।"

কাকলির বিস্ময় আর এক ধাপ বাড়ল। বললেন, "আপনি বলছেন দরকারটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপারে আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

জয়তি বলল, "বলছি। তবে একটু গোড়া থেকে বললে বোধহয় আমার বলতে সুবিধে হবে। আপনার বুঝতেও। আমি যখন খুব ছোট মানে ছ'-সাত বছরের সেই সময় আমার মা মারা যায়। আমার আর কোনও ভাই বা বোন না থাকায় এবং বাবা আবার বিয়ে না করায় মা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংসারটা স্বাভাবিকভাবেই শুধুমাত্র আমার আর বাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাবাই হয়ে ওঠে একাধারে আমার বাবা, মা, ভাই, বোন সব। সংসারে সব বাবা, মা-ই তাঁদের সন্তানকে স্নেহ করেন, আগলে রাখতে চান। কিন্তু আমার বাবা বোধহয় সব কিছুরই ঊর্ধ্বে। এত স্নেহ যে কোনও বাবা তাঁর সন্তানকে দিতে পারেন তা আমি ভাবতেই পারি না।"

কাকলি চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন। যদিও এখন অবধি মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না এক বাপ, মেয়ের স্নেহ, ভালবাসার গল্প শুনে তিনি কী করবেন। এখানে তাঁর কী ভূমিকা? জয়তি বোধহয় বুঝল ব্যাপারটা। প্রশ্ন করল, "খুব বোর করছি না তো আপনাকে?"

কাকলি নিজের মনের ভাব প্রকাশ হতে না দিয়ে বললেন, "না, না, আপনি বলে যান। আমি শুনছি।"

জয়তি বলল, "আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।"

কাকলি মাথা নাড়লেন, "বেশ, তুমি বলে যাও।"

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বাবার প্রগাঢ় স্নেহের ছত্রছায়ায় থাকতে থাকতে যে আমি কখনও কোনও কিছুর অভাব বোধ করিনি, যে আমার কখনও মনে হয়নি সংসারে বাবা ছাড়া আমার জীবনে আর কারও প্রয়োজন আছে, সেই আমি যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর আইটি সেক্টরে চাকরি করতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই অন্য আর একজনের সঙ্গে জীবনটা জড়িয়ে ফেললাম। আমার আলাপ হল সৌম্যর সঙ্গে। সৌম্যদীপ বসু। আমার বস। দারুণ হ্যান্ডসাম, দারুণ প্রমিসিং। আমাদের দু'জনের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ছিল লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। সেই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম বাবা ছাড়াও সংসারে এমন কেউ আছে যাকে আমার ভাল লাগে। যে আমাকে ভালবাসে, যে আমাকে বোঝে। এদিকে বাবা ততদিনে রিটায়ার করে গিয়েছে। হঠাৎই খানিক ঘরবন্দি যেন। দীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে চলে আসা এক নির্দিষ্ট রুটিন থেকে হঠাৎই ছিটকে যাওয়া। আর এইভাবে এক বাঁধাধরা জীবন থেকে দুম করে ছিটকে গিয়ে সময় কাটানোটা তার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের কাউকেই আর তেমনভাবে পাচ্ছিল না। ফলে এক ভয়ঙ্কর একাকিত্ব ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছিল মানুষটাকে। আমি বুঝতে পারছিলাম কিন্তু কিছু করতে পারছিলাম না। যে আমি এক সময় ছিলাম তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী সেই আমি আমার অফিস, সদ্য গজিয়ে ওঠা প্রেম নিয়ে তখন দারুণ ব্যস্ত। সকাল আটটা ঘেকে সাড়ে আটটার মধ্যে আমি বেরিয়ে যেতাম, এখনও যাই। অফিস করে, সৌম্যদীপের সঙ্গে প্রেম সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। কোনও কোনওদিন আর একটু বেশি। সাড়ে ন'টা, দশটা। এই তেরো, চোদ্দো ঘণ্টা বাবা বাড়িতে সম্পূর্ণ একা।"

একটু থামল জয়তি। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে কয়েক ঢোঁক জল গিলল। কাকলি দেখে যাচ্ছেন, শুনে যাচ্ছেন। জয়তি থামতে প্রশ্ন করলেন, "তুমি চা খাবে?"

জয়তি খানিক লাজুকভাবে হাসল, "না, না, ছেড়ে দিন। শুধু, শুধু...

কাকলি তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যে হালকা হাসির প্রলেপ মাখিয়ে বললেন, "তুমি খেলে আমি এক কাপ খেতাম।"

জয়তি হাসতে হাসতেই হলল, "বেশ তাহলে বলুন।"

"চা না কফি?"

"কফি!"

কাকলি দু-কাপ কফির অর্ডার দিলেন। জলের বোতলটা ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে রেখে জয়তি আবার বলতে শুরু করল, "বাবা কিন্তু এর জন্য কোনওদিন আমাকে বকাবকি করেনি বা আমার কাছে কোনও কৈফিয়ত দাবি করেনি। আসলে বাবা খুব বুদ্ধিমান তো। বুঝে গিয়েছিল তার সেদিনের সেই ছোট্ট বুড়িমা ছোট্টটি আর নেই। চব্বিশ বছর বয়সে তারও নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি হয়েছে এবং সে জগতে তার বাবা ছাড়া অন্য আর একজন কেউও প্রবেশাধিকার পেয়েছে। সারাদিনের চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে বেশ অনেকটা সময় তাকে সেই নবাগতের জন্য ব্যয় করতে হয়। জীবনের খুব স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে বাবা একে মেনেও নিয়েছে। ইতিমধ্যে আমি বাবার সঙ্গে সৌম্যর আলাপ করিয়ে দিয়েছি। বাবা ওকে খুবই পছন্দ করে। ছুটিছাটার দিনে সৌম্য আমাদের বাড়ি চলে আসে। বাবার সঙ্গে খুব গল্প করে। কিন্তু বাবা বুঝতে পারে ও আমার জন্যই আমাদের বাড়ি আসে। ও আমাকে একা পেতে চায়। তাই বাবা হয় জোরজবরদস্তি আমাদের বাড়ির বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেয় নয়তো কোনও ছুতো করে নিজে কোথাও বেরিয়ে যায়। ফেরে অনেক রাত করে। আমার খারাপ লাগে। সারা সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দিনে মানুষটাকে কাছ ছাড়া করতে ইচ্ছে করে না। আবার সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়ে আপত্তিও করতে পারি না। আমি জানি বাবার তেমন কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। আত্মীয়স্বজনের বাড়িও বাবা যেতে চায় না। ফলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবা হয় পথে পথে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় নয়তো কোনও সিনেমা হলে ঢুকে বসে থাকে। আমার খালি মনে হয় আজ মা বেঁচে থাকলে বাবার জীবন এত নিঃসঙ্গ হত না।"

সুন্দর ট্রে-তে চড়ে কফি এসে গেল। কাকলি নিজেই কফি বানিয়ে জয়তির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মৃদু হেসে একটা ধন্যবাদ দিল জয়তি। তারপর কফির কাপে হালকা একটা চুমুক মেরে জয়তি বলল, "ইদানীং বাবা আমার বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সৌম্যকেও বলেছে বারকয়েক। সৌম্য নিজেও যথেষ্ট আগ্রহী। আমাদের কোম্পানি পাঁচ বছরের জন্য সৌম্যকে স্টেটসে পাঠাচ্ছে। বাবা, সৌম্য দু'জনেই চায় বিয়েটা করে নিয়ে আমিও সৌম্যর সঙ্গে যাই। সৌম্য সেইমতো কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে স্টেটসে আমারও একটা অ্যাসাইনমেন্টের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমি রাজি হতে পারছি না। আমি জানি আমি চলে গেলে বাবা সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবে। তাকে দেখাশোনা করার কেউ থাকবে না। এমনকী অসুস্থ হলে এক গ্লাস জল দেওয়ার লোক পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। আজ মাস দেড়েক ধরে আমার আর বাবার মধ্যে এই নিয়ে লড়াই চলছে। বাবা চাইছে আমি এখুনি বিয়ে করে সৌম্যর সঙ্গে চলে যাই। আমি বলছি, না, এখন না। সৌম্য ফিরে আসুক। বিয়েটা না হয় পাঁচ বছর পরেই হবে। নয়তো বিয়েটা এখন হোক। কিন্তু আমি সৌম্যর সঙ্গে যাব না। ও একাই যাবে। আমি এখানে বাবার সঙ্গে যেমন আছি থেকে যাব, চাকরি-বাকরি যেমন করছি করব। পাঁচ বছর পর সৌম্য ফিরে এলে তখন না হয় আমরা সংসার করা শুরু করব। বাবার এতে প্রবল আপত্তি। বাবা চাইছে না তার জন্য আমার আর সৌম্যর জীবন নষ্ট হোক। ওর যুক্তি, সেরকম সুযোগসুবিধে পেলেও আমার কথা চিন্তা করে সৌম্য ওদেশে সেটল করতে পারবে না। শুধুমাত্র আমার কথা চিন্তা করেই তাকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি মরিয়া হয়ে বাবাকে বললাম, তাহলে তুমিই না হয় আমাদের সঙ্গে ওদেশে চলো। পাঁচটা বছর আমাদের সঙ্গেই থাক। আবার আমরা যখন ফিরব তখন আমাদের সঙ্গেই ফিরে আসবে। তাতে আমার কোনও টেনশন থাকবে না। বাবা তাতেও রাজি নয়। বলছে, এই বয়সে ওদেশে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না। তা ছাড়া, আমেরিকায় গিয়েও নাকি আমি, সৌম্য অফিস ইত্যাদি নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকব। একে ওখানকার লাইফ ভীষণ ফাস্ট তার উপর কাজের প্রেসার খুব বেশি। ফলে ওখানে গিয়েও সারাটাদিন ওকে সেই একা একাই থাকতে হবে। এক কথায় কোনওভাবেই মানুষটাকে ঠিক ম্যানেজ করা যাচ্ছে না। নিজের একগুঁয়ে জেদ আঁকড়ে পড়ে আছে। এদিকে সৌম্যর যাওয়ার দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এই রকম চললে শেষ অবধি হয়তো ওকে বিয়ে না করে একা একাই চলে যেতে হবে। পাঁচ বছর পরও ফিরে এলে কী হবে সেটা তো ভবিষ্যৎই বলবে। অবশ্য যদি ও ফেরে। এমনও হতে পারেও হয়তো ফিরলই না। অন্য কোনও মেয়েকে বিয়ে করে ওদেশেই সেটল করে গেল। তার জন্য ওকে আমি দোষও দিতে পারব না। খারাপ লাগছে আমাদের বাপ-মেয়ের সমস্যা, লড়াই ইত্যাদিতে মাঝখান থেকেও বেচারা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

জয়তি থামল। এতক্ষণ ধরে স্মার্টলি কথা বলে যাওয়া মেয়েটার গলার আওয়াজটা শেষের দিকে বেশ বিষণ্ণ শোনাল কাকলির কানে। মনে হল একটু কাঁদতে পারলে বোধহয় ভাল বোধ করত মেয়েটা।

কাকলি বললেন, 'হুম! বুঝলাম। কিন্তু এ তো সম্পূর্ণ তোমাদের পারিবারিক সমস্যা। এর জন্য তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? আমাদের ব্যাঙ্ক বা অফিস তো কোনওভাবেই ইনভলড নয় এ ব্যাপারে।"

জয়তি বলল, "আপনার অফিস না হোক আপনি কিন্তু জড়িয়ে আছেন এ ব্যাপারে। আর সেই জন্যই আপনার কাছে আসা। একমাত্র আপনিই পারেন আমাদের এ সমস্যার সমাধান করতে।"

বেশ অবাক হলেন কাকলি, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না! আমি কীভাবে তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারব?"

"আপনি যদি আমার বাবার দায়িত্ব নেন তাহলে আমার আর কোনও চিন্তা থাকে না।"

এবার বেশ উষ্মা দেখা দিল কাকলি সেনের চোখেমুখে, "কী বলছ কী তুমি! কে তোমার বাবা? কেনই বা আমি দায়িত্ব নিতে যাব?"

এরই মধ্যে নিজেকে বেশ সামলে নিয়েছে জয়তি। একটু আগের সেই আবেগ, সেই বিষণ্ণতা আর নেই। বরং অনেকটা দৃঢ়। বলল, "আমার বাবার নাম পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। এককালের বহরমপুরের পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বোধ হয় খুব অচেনা লাগছে না মানুষটাকে?"

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনে বসেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কাকলির কপালে। আমতা-আমতা করে বললেন, "হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু...

"আপনি আমাকেও চেনেন। চেহারায় না চিনলেও নামে চেনেন। বাবার মুখে অনেকবারই আমার নাম শুনেছেন। আমি কী করি না করি সবই জানেন।"

"আমার কাছে তোমাকে কি তোমার বাবা পাঠিয়েছে?"

"না, না, ইনফ্যাক্ট বাবা জানেও না আমি আপনার কাছে এসেছি। জানলে হয়তো আসতে দিত না। এখন বলুন আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কি না। আপনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেই তিন-তিনটে জীবন নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে পারে।"

কাকলি এখনও অস্বস্তিতে। বললেন, "আমি তোমার বাবাকে

চিনি ঠিকই। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার মতো অতটা ঘনিষ্ঠতা... তা ছাড়া কোন অধিকারেই বা নেব?"

জয়তি হাসল, বলল, "আপনাকে কী বলে ডাকা উচিত জানি না। দিদি, মাসি, ম্যাডাম সেন নাকি...না, পিসি বলা যাবে না। আপাতত মাসিই বলছি। মনে হয় সেটাই শুনতে ভাল লাগবে। মাসি, বাবার অনেকগুলি ডায়েরি আছে। মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবা নিয়মিত ডায়েরি লেখা শুরু করে। কেন শুরু করে সঠিক কারণটা আমি জানি না। তবে যদ্দূর মনে হয় নিজের মানসিক যন্ত্রণা খানিকটা লাঘব করার জন্য। বলে বুক হালকা করতে পারেন এমন কেউ তো পাশে ছিল না। আমি তখন খুবই ছোট। অতএব ডায়েরিই সই। পরে সেটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়। ছোট থেকেই আমি দেখতাম প্রতিদিন রাতে শুতে যাওয়ার আগে বাবা ডায়েরি লিখত। প্রতিদিন নিয়ম করে। একটা দিনও বাদ যেত না। সে যত ক্লান্তই লাগুক, যত ঘুমই পাক বা যত কাজই থাকুক একদিনও এর অন্যথা হত না। এমনকী কয়েক দিনের জন্য বাড়ির বাইরে গেলে বাবা ডায়েরি সঙ্গে নিয়ে যেত। যাতে লেখা বন্ধ না হয়। ছোটবেলায় এসব নিয়ে আমার কোনও কৌতূহল ছিল না। কিন্তু একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার ওই ডায়েরিগুলি আমাকে ভীষণ টানতে শুরু করল। খালি মনে হত এত নিয়মনিষ্ঠভাবে বাবা কী এত লেখে। যেহেতু আমার আর বাবার মধ্যে তেমনভাবে কোনও লুকোছাপা কখনও ছিল না বাবা তাই ডায়েরিগুলি কোনওদিন লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। ওগুলি টেবিলের উপর অথবা বাবার বই-এর শো-কেসে হেলায় ফেলায় পড়ে থাকত। আমি একদিন তারিখ দেখে একে একে ডায়েরিগুলি নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। তবে অবশ্যই বাবার অনুপস্থিতিতে। যেহেতু কথায় বলে পরের ডায়ারি পড়া অনুচিত তাই সব সময় একটা পাপ বোধ আমার মনের মধ্যে কাজ করত। অথচ একে তো কৌতূহল তার উপর লেখাগুলি এত সুন্দর যে ছাড়তেও মন চাইত না। ডায়েরিগুলি পড়তে পড়তে দেখলাম সেগুলি নিছক দিনপঞ্জি নয়। বাবা সেই স্কুলজীবন থেকে তার জীবনের প্রায় প্রতিটা খুঁটিনাটি ঘটনা, যেমন যেমন মনে পড়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে রেখেছে। তাতে আমার ঠাকুরদা, ঠাকুমা, মা, আমাদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, বাবার বিভিন্ন বয়সের বন্ধুবান্ধব সকলের কথা আছে। আছি আমিও। দীর্ঘ কুড়ি, একুশ বছর ধরে প্রায় পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাস লেখা। ফলে অনেকগুলি ডায়েরি। পড়তে পড়তে এক জায়গায় আর একটা নামও চোখে পড়েছিল। কাকলি সেন। সেই ছোট্ট বয়স থেকে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতে থাকতে প্রথমে বন্ধুত্ব, তারপর মন দেওয়ানেওয়া হতে হতে প্রেম। যদিও শেষ অবধি সে প্রেম পরিণতি পেল না। পেল না আমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়া ঠাকুরদার জন্য। তিনি তাঁর ছেলেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, বেনে বাড়ির মেয়েকে তিনি কখনওই বাড়ির বউ করে আনবেন না। যদি ছেলে তাঁর অমতে বিয়ে করে তাহলে তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। ডায়েরিগুলি পড়তে পড়তে আমার মনে অজস্র প্রশ্ন জমা হলেও আমি বাবার কাছে কোনওদিন তার উত্তর চাইনি। মনে হত কী দরকার? যা আছে তা আছে। সব কিছুর উত্তর জেনে আমি কী করব? কিন্তু একটা প্রশ্ন বা একটা কথা আমাকে বড় হন্ট করে গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ঠাকুরদা ত্যাজ্যপুত্র করবে শুনেই আমার বাবা পিছিয়ে গেল কেন? হতই না হয় ত্যাজ্যপুত্র। তাতে ক্ষতি কী হত? প্রেমটা তো বাঁচত। আমার মা'কে বিয়ে করে বাবা সুখী হয়েছিল কি না জানি না। সে বিষয়ে বাবা কিছু লেখেনি কোথাও। তারা অবশ্য খুব বেশিদিন সংসার করেনি। বড় জোর সাত, আট বছর। সুখ তেমনভাবে আকার নেওয়ারই সময় পায়নি। অবশেষে ডায়েরির এক জায়গায় আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। ঠাকুরদা শুধু বাবাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলেননি। বলেছিলেন, বাবা যদি ওই মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে উনি সবার সামনে আত্মহত্যা করবেন। হয় গলায় দড়ি দিয়ে নয়তো গায়ে আগুন দিয়ে এবং তার জন্য দায়ী থাকবে বাবা আর ওই মেয়ে। ব্যস ওইখানেই গুটিয়ে গিয়েছিল বাবা। আর এগোতে সাহস করেনি।"

থামল জয়তি। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে সম্ভবত হাঁপিয়ে গিয়েছিল। দম নিতে চাইল। তা ছাড়া কাকলি সেনের অভিব্যক্তি দেখার জন্যও একটু থামার দরকার ছিল বোধ হয়। চশমার মোটা কাচের আড়ালে কাকলির চোখ দুটো কি ভেজা মনে হল? ভদ্রমহিলা তো প্রায় বাকরুদ্ধ। কোনও কথাই বলছেন না। শুধু হাতে ধরে রাখা কলমটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ফলে শূন্যতা ভেঙে জয়তিকেই আবার কথা শুরু করতে হল, "জানেন, আমি অনেকদিন ধরেই অনেক খুঁজেছি কাকলি সেনকে।"

"কেন?" খুবই অস্ফুটস্বরে কথাটা উচ্চারণ করলেন কাকলি।

"বাবার শেষের দিকে ডায়েরিগুলিতে এই নামটা বড় বেশি করে করে থাকত। পড়তে পড়তে বুঝতে পারতাম বাবার শূন্য মন কী ভীষণভাবে একজনকে খুঁজছে। সম্ভবত এই একজনই পারবে বাবাকে নতুন করে পরিপূর্ণতা দিতে।"

কাকলিও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছেন, "তুমি জানলে কী করে আমি এখানে?"

"সেটাও বাবার ওই ডায়েরি থেকেই। বছর খানেক আগের এক জায়গায় বাবা লিখেছেন, আজ ব্যাঙ্কে গিয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর অপ্রত্যাশিতভাবে কাকলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। একদিন কত খুঁজেছি ওকে। কোথাও পাইনি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। আজ দেখা পেলাম যখন তখন এত ভীষণই ভাবে পেলাম যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। তবে আগের সেই সহজ ভাবটা আর নেই। খানিকটা আড়ষ্ট যেন। আমার সঙ্গে কথা বলতেও সঙ্কোচ বোধ করছিল। দেখলাম এখনও বিয়ে করেনি। কেন করেনি জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। সম্ভবত তারপর থেকে পুরুষ জাতটাকেই আর বিশ্বাস করতে পারেনি।

"কয়েক পাতা বাদ দিয়ে আর এক জায়গায় লেখা, কাজ না থাকলেও শুধুমাত্র কাকলিকে একবার দেখার লোভেই ব্যাঙ্কে চলে যাই। যা—ই, তবে কথা বলতে গেলে কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ি। হয়তো অনেকদিনের ফাঁকের পরে বলেই। ও-ও বোধ হয় একটু অস্বস্তি বোধ করে। মাঝে মাঝে ভাবি আর যাব না। এই বয়সের পক্ষে কাজটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু পারি না। এক তীব্র আকর্ষণ শক্তি ঠিক টেনে নিয়ে যায় আমাকে। বয়সের দোহাই দিয়ে সব ইচ্ছেকে দমিয়ে রাখাও তো ঠিক না।

"এক জায়গায় আবার লিখেছে, আমরা দু'জনেই পরস্পরের কাছে আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসছি। দীর্ঘদিন অদেখা'র ফলে যে সঙ্কোচের বরফ জমাট বেঁধে আমাদের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিল মনে হচ্ছে সে এবার ধীরে ধীরে গলতে শুরু করেছে। ওর কথাগুলি শুনলে বুঝতে পারি এক তীব্র অভিমান ওর মধ্যে জমা হয়েছিল। খুবই স্বাভাবিক। সেই জন্যই প্রথম দিকেও আমার কাছে ঠিক সহজ হতে পারছিল না।

"এরপর বেশ কিছুদিন আপনার কথা আর কিছু লেখা নেই। তারপর আবার একদিন, এই দিন কয়েক আগে লিখেছে, আজ বেশ কিছুদিন হল কাকলির কাছে যাওয়া হয়নি। ইচ্ছে করেই

যাইনি। ও দু-একবার ফোন করেছিল। আমি কায়দা করে এড়িয়ে গেছি। আমি আর কাকলি যে ক্রমশ আবার পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে আসছি সেটা বেশ বুঝতে পারছি। শুধু বুঝতে পারছি না কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না। জয়ী, সৌম্য যদি শোনে তাহলে কী ভাববে? হয়তো ভাববে বুড়ো বয়সে বাবার ভীমরতি হয়েছে। এই বয়সে প্রেম করছে। এই সব নানান ভাবনা মনটাকে অস্থির করে তুলেছে। তাই ক'টা দিন কাকলি থেকে নিজেকে দূরে রেখে মনটাকে একটু স্থিতধী করে পুরো ব্যাপারটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক আজ এতদিন পর কাকলিকে আবার নতুন করে পাওয়ার পর তাকে ছেড়ে থাকাও আমার পক্ষে কষ্টকর। ফলে এখন আমি এক দোটানায় পড়ে রীতিমতো দুলছি। এদিকে জয়ীর বিয়ে দেওয়ারও সময় হয়েছে। সৌম্য আর কতদিন অপেক্ষা করবে? সে চাইছে বিদেশ যাওয়ার আগে বিয়েটা সেরে নিতে। খুবই ন্যায্য দাবি। জয়ী আবার আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। এটা তার অন্যায় জেদ। ও ওদের সঙ্গে আমাকেও আমেরিকা যেতে বলছে। কিন্তু জয়ীকে তো সব কথা বলা সম্ভব নয়। কাকলিকে ছেড়ে আমার পক্ষে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। এতদিন পরে ওকে পেলাম যখন তখন আর হারাতে চাই না।

"এরপর বাবা আর কিছু লেখেনি। তবে এত কিছু শুনে এটুকু নিশ্চয় বুঝতে পারছেন বাবা আপনাকে কতখানি চায়। এমনকী আমার তো মনে হয় বাবা মা'কে নিয়েও কোনওদিন সুখী ছিল না। চিরটাকাল বাবার মন জুড়ে আছেন শুধু আপনি। সেটা বোধ হয় মাও বুঝেছিল। ওই জন্য খুব বেশিদিন বাবার জীবন জুড়ে থাকেওনি। তবে এর জন্য আমি আমার ঠাকুরদা ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ করি না। বাবাকে খানিকটা বাধ্য করা হয়েছিল মা'কে মেনে নিতে। যাক গে সেসব কথা। এখন আপনি বলুন আপনি কী করবেন। সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার উপর।"

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন কাকলি। আস্তে আস্তে যেন নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। পরে নীরবতা ভেঙে বললেন, "এ বিষয়ে দুটো কথা বলার আছে আমার। প্রথমত, এর মধ্যে কেমন একটা স্বার্থের গন্ধ যেন উঁকি মারছে। বাবার দায়িত্ব কাঁধের উপর থাকলে যেহেতু তোমার বিয়ে করে সংসার পারতে, আমেরিকা যেতে অসুবিধে অতএব তুমি তাঁর দায়িত্ব আমার উপর চাপাতে চাইছ। একদিন তোমার বাবাও এইভাবে নিজের পরিবারের স্বার্থে এক লহমায় আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে দিব্যি বিয়ে করে নিয়েছিলেন। আমার কী হবে তা নিয়ে একবারও ভাবেননি। দ্বিতীয়ত, সব-কিছুর একটা সময় বা বয়স আছে। আজ জীবনের তিন চতুর্থাংশ পার করে আসার পর হঠাৎ করে শাঁখা, সিঁদুর পরে ঘোরাটা আমার কাছে অস্বস্তিকর। হাস্যকরও। তা ছাড়া, একটা মানুষের ভার বওয়া ছাড়া এ জীবন থেকে আমার পাওয়ারই বা কী আছে? জীবনের এতগুলি বছর যখন একা একা কাটাতে পারলাম বাকি জীবনটাও নিশ্চয় পারব।"

বোঝাই যাচ্ছিল জয়তি একটু ধাক্কা খেয়ে গিয়েছে। তবু মনে যতটা সম্ভব জোর এনে বলল, "আপনার প্রথম কথার জবাবে বলি, হ্যাঁ, স্বার্থ তো আমার আছেই। কারণ আজ যদি আমার বিয়ে না হয় তাহলে আমার ভবিষ্যৎটা কী হবে সেটা আমি আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, জীবনের তিন-চতুর্থাংশ পার করে এসে শাঁখা, সিঁদুর পরা নিয়ে আপনি যে সঙ্কোচ বোধ করছেন সেটা নির্ভর করছে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। বিয়ে হলেই যে শাঁখা, সিঁদুর পরতে হবে তার কী মানে আছে। আজকাল বহু মেয়েই ওসব ব্যবহার করে না।"

আবার কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ থাকার পর জয়তিই কথা শুরু করল, "তাহলে আমি ফিরে গিয়ে বাবাকে কী বলব?"

চমকে উঠলেন কাকলি, "তুমি যে বললে, তোমার বাবা কিছু জানেন না।"

"জানে না তবে আন্দাজ করতে পারে এবং আমি নিশ্চিত ইতিবাচক একটা কিছু শুনবে বলেই বসে আছে।"

কাকলি বললেন, "তুমি আমাকে একটু সময় দাও জয়তি। এত চট করে তোমায় আমি কিছু বলতে পারছি না।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জয়তি বলল, "বেশ দিলাম। তবে যা করার তাড়াতাড়ি করবেন। সৌম্যর যেতে কিন্তু আর মাস তিনেক আছে মাত্র।"

জয়তি চলে গেল। কাকলি দু'হাতের মধ্যে মাথার ভার রেখে বসে রইলেন। আজ সকালেই আসা তাঁর বদলির চিঠিটা টেবিলেই পড়ে রয়েছে। সামনের সপ্তাহের মধ্যে মুম্বই-এর হেড অফিসে রিপোর্ট করতে হবে। ভেবেছিলেন একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেবেন। আর বছর আড়াই মাত্র বাকি আছে অবসর নিতে। এই সময় যেন আর বদলি না করে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে চলে যাওয়াই ভাল। চলে গেলে এইসব জটিলতা থেকে অন্তত মুক্তি পাওয়া যাবে। এতদিন পরে পরিমলের এইভাবে ফিরে আসার কী দরকার ছিল? পঁচিশটা বছর তো তাঁকে ছাড়াই দিব্যি জীবন কাটিয়েছেন কাকলি। এখন হঠাৎ এসে তাঁকে এইভাবে দুর্বল করে দেওয়ার তো কোনও দরকার ছিল না। চশমাটা খুলে নিলেন কাকলি। জলে ঝাপসা হয়ে আসছে চোখদুটো। কিন্তু কলকাতা থেকে চলে গেলে পরিমলের সঙ্গে যে আর দেখা হবে না। পরিমল কি তাঁর সঙ্গে মুম্বই যেতে রাজি হবেন? অঝোরে কাঁদছিলেন কাকলি সেন। এমন অঝোরেই কেঁদেছিলেন পঁচিশ বছর আগে সেইদিন যেদিন পরিমল তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু

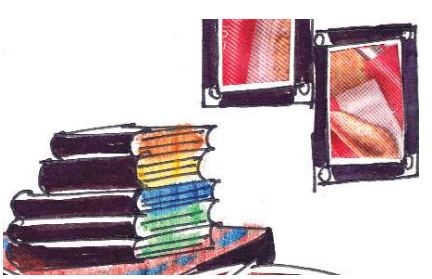

গল্প

ব্যথা, ঝুঁকবেন না

মিহির সরকার



ক'দিন ধরেই পিঠে শিরদাঁড়ার কাছে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করেছে অনল। সরকারি ব্যাঙ্কের অফিসার অনল সেন। বয়স ৪৬ পার হয়েছে সদ্য। ঝুঁকে অ্যাডভান্সের ফাইল দেখার সময় চিনচিনে ব্যথাটা বাড়ে। অফিস ফেরত পথে অনল গেল ডাক্তার সায়ন দাসের কাছে। বহুদিনের পরিচিত ডাক্তার।

—বুঝলেন সেনবাবু বেশি ঝুঁকে আপনার কাজ করা চলবে না। মোদ্দা কথা বেশি ঝুঁকবেন না। ওষুধগুলো খান। দশদিনে ব্যথা না কমলে এক্স-রে করাতে হবে। লিখে দিয়েছি।

প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে ডাক্তার দাস জিজ্ঞাসা করলেন—বিছানা শক্ত না নরম?

—নরম।

—না শক্ত বিছানায় বালিশ ছাড়া শোয়া অভ্যেস করুন।

অনল কিছুটা আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাশে করে তাকায় ডাক্তারবাবুর দিকে। ভাবলেশহীন মুখে বলল—তা হলে আমাকে আলাদা শুতে হবে। কারণ আমার বউ আবার নরম বিছানা ছাড়া ঘুমোতে পারে না।

ডাক্তার দাস হেসে বললেন—বউকে বুঝিয়ে বলুন। অথবা কিছুদিন মেঝেতে বিছানা পেতে আলাদা শোয়ার চেষ্টা করুন। কি পারবেন না?

অনলকে চুপচাপ দেখে ডাক্তার দাস বললেন—কী চিন্তায় পড়লেন মনে হচ্ছে। শুনুন যেমন বিছানায় শোয়ার অভ্যেস সেখানে শয়ন করুন। কিন্তু মি. সেন ঝোঁকা একদম চলবে না। ঝুঁকে কোনও ভারী জিনিস তোলা যাবে না। খেয়াল রাখবেন।

—ডাক্তারবাবু খেয়াল রাখাই কঠিন। পেপার পড়তে গেলে ফাইল দেখার সময়ে ঝুঁকতেই হয়।

—চেষ্টা করবেন চেয়ার বা সোফায় হেলান দিয়ে পেপার পড়তে।

ফাইলও দেখবেন চেয়ারে হেলান দিয়ে। দেখবেন তিনদিনে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

অনলকে চুপচাপ এবং উদাসীন দেখে ডাক্তার দাস প্রশ্ন করলেন—কী ব্যাপার বলুন তো আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।

—না ডাক্তারবাবু তেমন কিছু ব্যাপার নয়। আসলে নরম বিছানা, ঝুঁকে থাকা—না থাকা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। কখন যে ঝুঁকে পড়ব তার ঠিক নেই। অনেক দিনের অভ্যেস।

—চেষ্টা করুন। সুস্থ জীবন পেতে চাইলে, এখন থেকেই খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন চেঞ্জ করতেই হবে। ভাল কথা তেলেভাজা একদম চলবে না। ওটা থেকে পেটে গ্যাস হয়। আর শরীরে গ্যাস অনেক সময় ব্যথা-বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

—তেলেভাজা বলতে সকালে অফিস যাওয়ার সময় ভাত-গরম ডালের সঙ্গে আলু ভাজা খাই। বেশ জমে যায়। আলু ভাজা খাওয়া বন্ধ করে দেব।

—মি. সেন এমন তৃপ্তির খাওয়া আমি নষ্ট করতে চাই না। আলুভাজা খান। কম পরিমাণে। আর একটা কথা—সকাল সকাল উঠে হাঁটুন। রাতে খাওয়ার পর হাঁটুন। গ্যাস-অম্বল কমে যাবে। আবারও বলি, ঝুঁকবেন না। শিরদাঁড়া সোজা রাখতেই হবে।

—ডাক্তারবাবু সকালে-রাতে কোথায় হাঁটি বলুন তো। আপনি তো আমার পাড়া চেনেন। চারদিকে ঘর-বাড়ি। দু-দুটো ফাঁকা মাঠ হাওয়া। ফ্ল্যাট-বাড়ি উঠেছে। সকালে বাজার যাই। বাজার যাওয়া আমার পথে যেটুকু হাঁটা হয়। রাতে হাঁটতে হবে তাহলে ছাদে উঠে।

—তাই করুন। মোদ্দা কথা, খেয়ে বসে পড়বেন না। শুয়ে পড়বেন না। ছাদে উঠে পায়চারি করুন। তাতেও অনেক উপকার পাবেন।

তিনদিন পরে রবিবার। অনল বাজার সেরে চানঘরে ঢুকে দাড়ি কামানোর আগে আয়নার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর অনুভব করল পিঠে ব্যথাটা নেই। আর নিজেকে একজন তেজি পুরুষ বলে মনে হল। দাড়ি কামিয়ে আবার বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। এভাবে দাঁড়ালে দেখতে বেশ লাগে। সুপুরুষ মনে হয়।

চানঘর থেকে বেরিয়ে অনল সকালের টাটকা খবরের কাগজ পড়তে বসল। অভ্যেস বশে ঝুঁকে পেপার পড়া শুরু করেই তার মনে পড়ল—না, এভাবে নয়। সোফায় হেলান দিয়ে পড়তে হবে।

সোফায় হেলান দিয়ে যখন মগ্ন হয়ে পেপার পড়ছে তখন অনল শুনতে পেল একটা কাকের ডাক। মগ্নতা ভেঙে গেল। কাক আবার ডাকল। অনল ভাবল—অনেকদিন পরে কাকের ডাক শুনতে পেয়েছে। কাকটা কোথায়?

জানলা ভেদ করে অনলের নজর গেল পাশে বিশ্বাসবাবুর দোতলায় ছাদের কার্নিশে। হ্যাঁ, একটা কাক লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে। আবার ডাকল। ও কি ওর সঙ্গীকে ডাকছে না খিদে পেয়েছে? সঙ্গীকেই ডাকছে। খিদে পেলে তো চুপচাপ উড়ে এসে ছোঁ মেরে খাবার মুখে নিয়ে আবার উড়ে চলে যায়। খচ করে অনলের মনে একটা ভাবনা পয়দা হল। বেশ মজার ব্যাপার। পাখিদের পিঠ বেঁকিয়ে বা ঝুঁকে কিছু করতে হয় না। পিঠে ব্যথাও হয় না। মানুষের শিরদাঁড়া নিয়ে যত যন্ত্রণা। বয়স বাড়ল শিরদাঁড়া সোজা করে রাখ। কিন্তু শিরদাঁড়া কি সব সময় সব জায়গায় সোজা রাখা যায়?

আহা পাখিদের এসব উটকো ঝামেলা নেই। উড়ে উড়ে বেড়াও। যে যা পাও খাও। মাথা ঝোঁকাবার কোনও কেস নেই। কাকটা আবার ডাকল। তারপর উড়ে চলে গেল। কিন্তু অনল তখনও ভাবছে ওই কার্নিশের দিকে উদাসীন হয়ে তাকিয়ে। অনল ভাবল, আচ্ছা ভগবান মানুষকে শিরদাঁড়ার বদলে দুটো ডানা দিতে তো পারতেন। মানুষ উড়ে উড়ে বেড়াতে পারত। হিল্লি-দিল্লি, মুম্বই, গোয়া, দার্জিলিং, যেখানে খুশি যেতে পারত। মানুষকে অফিস করতে ট্রেনে-বাসে চেপে যেতে হত না। ফলে পৃথিবীরতে কমে যেত অনেকখানি বায়ুদূষণ। ট্যাক্সির ঝামেলা পোহাতে হত না। ইস ভগবান, মানুষ সৃষ্টির আগে এসব কথা আপনার মনে ছিল না। মানুষের কত সমস্যা কমে যেত। মানুষের তো এখন উঠতে-বসতে সমস্যা। মানুষের ছানাগুলো উড়ে উড়ে স্কুলে যেতে পারত। এরপরই অনলের মনে এল একটি সমস্যার কথা। অফিস-টাইমে মানব-মানবী ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে ডালহৌসি, ধর্মতলা, সেক্টর-ফাইভ, হাওড়া-শিয়ালদহ। অনল চোখ বুজে ভাবতে থাকল—বড় বড় ডানা মেলে উড়ে এসে সবাই যখন সকাল দশটায় ডালহৌসিতে নামতে যাবে তখন তো আকাশপথে জ্যাম হতে পারে। ধাক্কা লাগতে পারে ডানায় ডানায়। একটি মানবের ডানা বেখেয়ালে যদি ধাক্কা মারে কোনও মানবীর ডানায় অশালীনতার অভিযোগ তো উঠতে পারে। তন্ময় হয়ে চোখ বুজে পেপারে মুখ ঢেকে অনল ভাবছিল। ভাবনায় ছেদ পড়ল হঠাৎ ঝমঝমে কিছু কথায়। অনল চোখ খুলল।

—এই যে সেই থেকে পেপারে মুখ আড়াল করে বিশ্বাসবাড়ির দিকে তাকিয়ে কী দেখছ শুনি। অনল পেপার নামিয়ে দেখল সামনে বউ—মালবিকা। কোমরে দু'হাত রেখে রণংদেহি।

অনল মৃদু হেসে বলল—কাক।

—কোথায় কাক? সত্যি কথাটা বলতে বুঝি লজ্জা হচ্ছে! বিশ্বাসের সুন্দরী বউকে দেখছিলেন, ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না। সোফায় হেলান দিয়ে পেপারে মুখ ঢেকে কী গোপন খেলায় মেতেছ আমি বুঝি না?

—কী যে বলো? ওবাড়ির কার্নিশে বসে একটা কাক বারবার ডাকছিল। পেপার পড়তে পড়তে ওদিকে নজর চলে গেল। বিশ্বাসবাবুর বউ কোথায়? কী যে বলো?

—তা কাক দেখার কী আছে শুনি! জীবনে কি এই প্রথম কাক দেখছ?

—বিশ্বাস করো, কাক দেখছিলাম। কতদিন পর কাকের ডাক শুনলাম।

—আমি সব বুঝি। দেখছি তো ক'দিন ধরে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে থাক এক ধারে। মাথায় বালিশের বদলে বিছানার চাদর ভাঁজ করে বালিশ করে নাও। আমি কি বুঝি না এসব কেন করো।

তারপর মালবিকা হিস হিস শব্দে বলল—আমাদের মাথা হেঁট করিও না। শিরদাঁড়া সোজা রেখে এ পাড়ায় বাস করি সে কথাটা মনে রেখ। আর মনে রেখ ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে।

—বিশ্বাস করো মালবিকা, কাক দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—

—চুপ করো, এই বয়সে কাক দেখছে। এতকাল ধরে দেখে আসছি ঝুঁকে পেপার পড়ো। আজ সোফায় হেলান দিয়ে পেপার পড়া দেখেই সন্দেহ হয়েছে। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। কাল থেকে এখানে বসে পেপার পড়বে না।

অনল প্রাণপণ চেষ্টায় বোঝাবার চেষ্টা করল—কাক দেখে ভাবছিলাম, মানুষের ডানা থাকলে কী ভালই না হত।

—বললাম তো ঘরে যদি শান্তি চাও কাল থেকে এখানে বসে পেপার পড়বে না। কাক দেখছে, মানুষের ডানা দেখছে। সাত সকালে গল্প বানালেই হবে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করবে না।

ঝুঁকে যে কিছু করা ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন সে কথা ইচ্ছে করেই মালবিকাকে বলেনি অনল। তা হলে রাতে মালবিকার উপর ঝোঁকা বন্ধ করে দেবে। মালবিকাকে হাড়ে হাড়ে চেনে অনল। ভয় সেখানেই। তাই অনল ওষুধ খায় লুকিয়ে।

—বাজার যাবে তো? মালবিকার গলার স্বর স্বাভাবিক।

—অবশ্যই। কী কী আনতে হবে। ফর্দ করেছ?

—এই নাও ফর্দ। ফর্দ ধরিয়ে মালবিকা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বাজার যেতে যেতে অনলের মাথায় ঘুরপাক খেল— বিশ্বাসবাবুর বউ কি সত্যি খুব সুন্দরী? মালবিকা যে বলল। অনল মনে মনে ভাবল, সেভাবে কোনওদিন বিশ্বাসবাবুর বউকে দেখেওনি। নামটা পর্যন্ত জানে না। তবে বিশ্বাসবাবুর বউকে এক পলকে সুন্দরী মনে হয়। আলগা চটক আছে। গায়ের রং দুধে-আলতা না হলেও বেশ ফর্সা। চোখ জোড়া মা দুর্গার মতো। ওই চোখে কাজল পরলে বেশ সুন্দর দেখায়। সহজেই নজর চলে যায়।

বাজার। অনলের চিরকাল বাজার করতে ভাল লাগে। বাজার মানে কত রকম মানুষের সমাবেশ। মাছ-সবজি হইচই দরদাম। সব মিলিয়ে একটা রণক্ষেত্র। পরিমলের মুদি দোকানের সামনে অনল দাঁড়াতেই এক গাল হেসে পরিমল বলল—দাদা ফর্দ দিন। ফর্দ মিলিয়ে পরিমল, ডাল, তেল, বিস্কুটের প্যাকেট, চিনি একটা পলিথিনের প্যাকেটে ঢুকিয়ে অনলের দিকে বাড়িয়ে দিল। টাকা মিটিয়ে অনল দাঁড়াল সবজির দোকানে। আলু-বেগুন-পেঁপে-কাঁচা লঙ্কা কিনতে হবে। কিন্তু সবজি সব নিচে রাখা। ঝুঁকে বাছাই করে কিনতে হবে। ঝোঁকা তো যাবে না। তাই পরিচিত দোকানদার রামুকে বলল—রামু, তুই বেছে বেছে দু'কিলো আলু, বেগুন পাঁচশো, দু'শো কাঁচা লঙ্কা আর ভাল পেঁপে দে। আমার কোমরে ব্যথা। তুই বেছে বেছে দে ভাই।

বাজার সেরে বাড়ি ফিরে দেখল, বিশ্বাসবাবুর বাড়ির দিকের জানলা বন্ধ। অনল পেপার গুছিয়ে শোয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসল। মালবিকাকে চা করতে বলল।

চা দিতে এসে মালবিকা বলল—এ কী আলু এনেছ?

—কেন কী হল?

—কী আবার হবে? দু'কিলো আলুতে তিন খানা কাটা আলু। কাঁচা লঙ্কা তো একটু দেখে আনবে। এ লঙ্কায় ঝাল হবে?

রান্নাঘরে যাবার মুখে মালবিকা ঝাল ধরানো কথাটি বলল—মনের আর দোষ কী? কাটা আলু এনেছ, পচা আলু আনলেও কোনও দোষ নেই। চোখে ভাসছে অন্য ছবি। সে চোখে কি কাটা আলু ধরা পড়বে?

অনল চমকে উঠে বলল—দেখছ রামু হারামজাদার কাজ। কাটা আলুগুলো বেছে আলাদা করে রাখো। কাল ধরব ব্যাটাকে। ওকে বেছে দিতে বললাম। বেইমানটা এই বাছল!

—তুমি বাছলে না কেন? সংসারে তো মন নেই।

—মালবিকা...। বলেই অনল থেমে যায়। মুখ ফসকে বেরিয়ে আসছিল—তার এখন ঝুঁকে কোনও কাজ করা বারণ।

কিন্তু মালবিকা ফোঁস করে উঠল—থামলে কেন? বল। ধমকাবে ধমকাও। তোমার মন এখন কোনদিকে এ তো বাজার করা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

অনল আর কথা বাড়ায় না। আবার পেপারে মন দেয়। খাটে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে।

সোমবার অফিসে পৌঁছে দেখল, তার টেবিলে রাধা ট্রেডার্সের লোন ফাইল। ফাইলটা মনোযোগ সহকারে দেখে রেখে দিল। চা পান করল। খানিক বাদে ম্যানেজারের ডাক।

—অনলবাবু একবার আসবেন।

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে অনল অবাক। রিজিওনাল অফিসের প্রবীণ অফিসার মলয়দা বসে আছে। রিজিওনাল অফিসে মলয়দা লোন ডিপার্টমেন্টেই বসেন। ম্যানেজার সাহেব অনলকে দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, অনলবাবু রাধা ট্রেডার্সের ফাইলটা দেখে একটা নোট তৈরি করুন। আর শুনুন মলয়বাবু আমাদের ক্যাশ-ক্রেডিট অ্যাকাউন্টের স্টক আর বুক ডেট চেক করতে এসেছেন। আপনি হেল্প করুন।

—স্যর রাধা ট্রেডার্সের ফাইল আমার দেখা হয়ে গেছে।

—সাবাস।

—স্যর, ওদের অফিস আর গো-ডাউন ইন্সপেকশন করে নিলে ভাল হত। লোনটা তো স্যর বেশ মোটা টাকার। তাই বলছিলাম।

—তা হলে আপনি মলয়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে কাজটা সেরে আসুন না। যদি মলয়বাবুর কোনও আপত্তি না থাকে।

—আরে কী যে বলেন মি. মজুমদার। এ পার্টির লোন মঞ্জুর করার আগে আমাকেই তো ইন্সপেকশনে যেতে হত। আর আজকে সঙ্গে অনলকে পাচ্ছি। কাজটা করতে সুবিধা হবে।

ম্যানেজার মি. মজুমদার বলে ওঠেন—অনলবাবু সত্যি কাজের মানুষ। কাজটা বোঝেও ভাল।

—স্যর সব আপনাদের আশীর্বাদ। আপনাদের কাছ থেকেই তো সব কাজ শিখেছি। স্যর একটা কথা, রাধা ট্রেডার্সের লাস্ট ইয়ারের ব্যালান্সশিট দেখে আমার মন বলছে এ পার্টিকে তিন কোটি নয়, দু'কোটি কুড়ি লাখ পর্যন্ত ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া যায়।

ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আপনি নোটে তাই লিখবেন। তবে যুক্তিগুলো খাড়া করবেন বেশ আঁটসাঁটভাবে। ওকে এগিয়ে যান।

ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের সিটে ফিরে এসে রাধা ট্রেডার্সের প্রজেক্ট রিপোর্ট পড়তে ঝুঁকে পড়েছিল। খেয়াল হতেই শিরদাঁড়া সোজা করে বসল অনল। গোটা শরীর একটা আলাদা অনুভূতিতে ডুবে গেল।

দিন দশেক পরে অনলের সঙ্গে দেখা হল মলয়বাবুর ধর্মতলায়। ডেকার্স লেনে। স্যাঁকা টোস্ট আর ঘুগনি খেতে খেতে মলয়বাবু বললেন—অনল তোমাকে একটা কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করো। তোমাকে ভালবাসি তাই।

—বলুন মলয়দা। মন খুলে বলুন।

—শোন অনল, তোমার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার তোমায় কাজকর্মে তোমার উপর খুব খুশি। কিন্তু একটা ব্যাপারে একটু চটেও আছেন। বলব সে কথা?

—বলুন।

—শুনে মনে কিছু করবে না? অফিস কালচারে ভাল কাজটাই শেষ কথা নয়। তারপরেও থাকে আনুগত্য। তুমি ম্যানেজারের ঘরে যাও। কিন্তু সারাদিন একবারও মাথা ঝুঁকিয়ে বো কর না। এই ব্যাপারটা তোমার ম্যানেজার কিছুদিন ধরে লক্ষ করেছেন। শোনো ভাই অনল ভাল কাজ দেখানোর পরেও বসেদের সামনে এক-আধবার মাথা ঝোঁকাতে হয়। তাতে তারা খুশি হয়। আর জানো তো বস খুশি হলে, ফারদার প্রোমোশন, ভাল পোস্টিং পেতে সহজ হয়। বেশি বেগ পেতে হয় না।

অনল কী বলবে বুঝতে পারে না। মুখে কথা আসে না। আসলে সে পিঠের ব্যথার কথা কাউকে বলতে চায় না। ছোটবেলা থেকে এই স্বভাব। ছোটবেলার কত কষ্ট মাকে বলত অনল। এখন মা নেই। কিন্তু মায়ের কথাগুলো মনে আছে। মা বলতেন, শোনো বাবা, নিজের সুখ-শান্তি, সুখ-দুঃখ, অসুখ-বিসুখের কথা কাউকে বেশি বলতে নেই। অনেকে মজা পায়। তোমার কষ্ট-দুঃখ, সুখ-শান্তি সব তোমার। কাউকে বললে অসুখ সেরে যাবে, শান্তি ফিরে আসবে তা তো হয় না। তোমার যা হারিয়ে যায় তা তোমাকেই খুঁজে আনতে হবে।

অনল মনে মনে ভাবে, তার এখন সবজির দোকানে, বসের সামনে ঝোঁকা যাবে না। কিছুদিনের জন্যে সে কোথাও বেশি ঝুঁকতে পারবে না। না ঘরে, না বাইরে। তারপর হো-হো করে হেসে উঠে বলে—মলয়দা ভাল কথা মনে করিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু

গল্প

আকাশের মৃত্যু

দেবাশিস কর্মকার



আকাশের মৃত্যুর খবরটা পেলাম ভোরবেলায়। ডাক্তার ঋত্বিক সেন ফোনে খবরটা জানাল। এত ভোরে আমার ঘুম থেকে ওঠার কথা নয়। সাধারণত একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠি। তার কারণ ভোরে উঠে আমার কোনও কাজ নেই। কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ মন-মেজাজটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। রাতে ঘুম ঠিকমতো হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকি বারান্দায়। সিগারেট খাওয়াটা ইদানীং বেড়ে গিয়েছে। আমি নিজেও বুঝতে পারি, এটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। কিন্ত নিজের উপর নিয়ন্ত্রণটা থাকেছে না। পরশুও পারিবারিক চিকিৎসক ঋত্বিক একদফা চেক-আপ করেছে। সুগারটা বেড়েছে। ব্লাড প্রেশারটাও ওঠানামা করছে। শুধু চিকিৎসক নয়, ছোটবেলার বন্ধু হিসাবেই মন শান্ত রাখার পরামর্শ দিয়েছে ঋত্বিক।

পৈতৃকসূত্রে উত্তর শহরতলিতে ভিটের অংশ পেয়েছিলাম। সুরঞ্জনা সেখানে থাকতে চায়নি। যুক্তি ছিল, ওখানে থাকলে মেয়েকে মানুষ করতে পারবে না। তাই ভিটের অংশ বিক্রি করে দিয়ে উঠে এসেছিলাম পূর্ব কলকাতার এই ফ্ল্যাটে।

তিন কামরার ফ্ল্যাট। মানুর জন্য একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বড় হওয়ার পর থেকে সেই ঘরেই রাতে ও ঘুমোয়। ওই ঘরে ওর আলাদা জগৎ। অন্য একটা ঘরে সুরঞ্জনা আর আমি কিছুদিন আগে পর্যন্ত একসঙ্গে ঘুমাতাম। কিন্তু এখন রাতে আমার শোয়ার ব্যবস্থা আলাদা করে নিয়েছি। এখন আমাকে রাতে বারবার উঠতে হয় বলে সুরঞ্জনার ঘুমের ব্যাঘাত হয়। তৃতীয় ঘরটা এতদিন আমার কাজ, পড়াশোনার জন্য ব্যবহার করা হত। কেউ দেখা করতে এলে সেখানেই বসানো হত। আগে থেকেই একটা সিঙ্গল বেড ছিল এই ঘরে। রাত পর্যন্ত কাজ করতে করতে ক্লান্ত লাগলে শুয়ে পড়তাম।

আকাশের মৃত্যুর খবরটা পাওয়া ইস্তক শরীরে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। হৃদপিণ্ডটা লাফাতে লাফাতে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। মাথার কাছে রাখা বোতলটা নিয়ে গলায় ঢেলে অনেকটা জল খেয়ে নিলাম। মন শান্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা। বিছানায় আর শুয়ে থাকতে পারলাম না।

মানুর ঘরে দরজাটা দেখলাম ঈষৎ ফাঁক করা। একটু ঠেলে দিলাম। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। এখনও তবে খবরটা শোনেনি। বুকে জড়ানো সেই বাদামি রঙের টেডি বিয়ারটা। তিন বছর বয়স থেকে এটা ওর ঘুমোনোর সঙ্গী। খুব ছোটবেলায় সকালে পড়তে উঠলে ওই টেডিটাকে নিজের বালিশে শুইয়ে গায়ে চাদর চাপা দিয়ে রাখত। যেন ওর বাকি ঘুমটা ঘুমিয়ে দেবে টেডি। এখন অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে মোবাইল ফোনে চ্যাট করে। নিশ্চয় ওর বয়সি বন্ধুরাও অমন রাত জাগে। নয়তো কাদের সঙ্গে গল্প করবে। মোবাইল ফোনটা বেশ দামি। খুব বায়না করেনি। আমিই নিজের শখ মেটাতে মানুকে ফোনটা কিনে দিয়েছি। মানুর ঘরের অধিকাংশ জিনিসই ওর সাধের আর আমার শখের। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম।



কিচেনে গিয়ে নিজেই একটু চা বনিয়ে খেয়ে, তৈরি হয়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। বেরোলাম বটে, তবে হাঁটতে ভাল লাগল না। পার্কে গাছের নিচে একটা বেঞ্চে অনেকক্ষণ একা চুপচাপ বসে থাকলাম। একঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরে দেখলাম কাজের মেয়েটা এসে গিয়েছে। সুরঞ্জনাও চা নিয়ে টেবিলে বসেছে। আমি চেয়ার টেনে বসতে বলল, "বাজে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে।"

বুঝতে পারলাম, নিশ্চয় খবরটা এসে গিয়েছে। কিছুই জানি না ভাব দেখাতে হবে আমাকে। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "কেন, কী হয়েছে—"

"আকাশ নেই।"

বুঝতে পারলাম না এই সময়ে আমার প্রতিক্রিয়াটা কেমন হওয়া উচিত। চমকে উঠব? প্রচণ্ড বিস্ময় প্রকাশ করবো? স্থবির হয়ে যাব? নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "বলো কী!"

"কাল রাতে বাইকে বাড়ি ফিরছিল। বি টি রোডে একটা ট্রাক পিছন থেকে ধাক্কা মারে। বেশি রাতে হাসপাতালে মারা গিয়েছে। মানুর কোন বন্ধু ওকে কিছুক্ষণ আগে ফোন করে জানিয়েছে।"

"মানু কী বলছে—"

"হাসপাতালে যাবে বলছে। তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

এমনটাই আন্দাজ করেছিলাম। উত্তেজনা চাপতে পারলাম না।

"এই সবের মধ্যে ও যেতে চাইল আর তুমি রাজি হয়ে গেলে!"

"না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকলে কি কম খারাপ লাগবে?"

"আমার ওসবের মধ্যে যেতে ভাল্লাগে না।" আপ্রাণ চেষ্টা করলাম এড়ানোর। কিন্তু আমি জানি, মানু যেতে চাইলে আমার আপত্তিও শেষপর্যন্ত ধোপে টিকবে না। যেতে আমাকে হবেই। বরং আমার কী করা উচিত সেটা চিন্তা করে বের করব ভেবেই থেমে গেলাম।

মানুকে নিয়ে আর জি কর হাসপাতালে যখন পৌঁছলাম তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। সরাসরি একটা ট্যাক্সিতে করে চলে এসেছি। পথে মানুর সঙ্গে কোনও কথা বলারই সুযোগ হয়নি। সারাক্ষণ একের পর এক ফোনে কথা বলে গিয়েছে ও। মেন গেট দিয়ে ঢুকে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। মানুরই বয়সি দুটি ছেলে-মেয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সম্ভবত মানুই ফোন করে ওদের অপেক্ষা করতে বলেছিল। মানু আলাপ করিয়ে দিল, রিমঝিম আর অভিষেক। এরা কলেজের বন্ধু। মানুর বেশ কিছু বন্ধু নিয়মিত বাড়িতে আসে। আকাশও আসত। কিন্তু এদের কখনও বাড়িতে আসতে দেখিনি। আগেই হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছে ওরা। শুনলাম, একটু আগেই আকাশের বডিটা বেড থেকে মর্গে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ কেস হয়ে গিয়েছে। বডির পোস্টমর্টেম হলে ছাড়া হবে।

পুলিস কেস শুনেই বুকটা ধক্ করে উঠল। একটা ঠান্ডা স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। খুব ঘামছি। গলা শুকিয়ে আসছে। মানুর কাছে জলের বোতলটা চেয়ে গলায় ঢেলে একটু খেলাম। চোখে-মুখে-ঘাড়েও খনিকটা জল দিলাম।

বেশ কিছুটা আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে পৌঁছনো গেল মর্গে। লোক থইথই করছে। এত লোক এখানে কেন! বেশিরভাগই অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে। আকাশের পাড়া থেকে, কলেজ থেকে এসেছে। ছাত্রের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতে কলেজ ছুটি হয়ে গিয়েছে। এরা সবাই বন্ধু? একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলের এত বন্ধু থাকতে পারে? আকাশ কোনও হিরো ছিল না কি? নিজের মনেই প্রশ্ন আউড়ে যাচ্ছি।

একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছি। কোনও বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলবে মানু। এতক্ষণ চেপে থাকা আবেগ বাঁধ ভাঙবে। ওকে সামলানো যাবে না। সবাই সান্ত্বনা দেবে। বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে একটা। তবু যত তাড়াতাড়ি এই সব মিটিয়ে বাড়ি ফেরা যায় ততই ভাল।

ইতিউতি ছেলেপিলেরা বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চলছে সিগারেটে টান। আমার এই সময়ে একটা সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছা করছে। কিন্তু মানু সঙ্গে থাকলে আমি কখনও ধূমপান করি না। কোনও দিনই করিনি। সঙ্গে সিগারেট আছে, মানু বন্ধুদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেই ক'টা টান মেরে নেব।

আমারই মতো কয়েকজন অভিভাবকও এসেছেন হাসপাতালে। কেউই নিশ্চয় নিজের ইচ্ছায় আসানি! মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা আবার এই ধরনের সামাজিকতা সম্পর্কে ভীষণ সজাগ। খোঁজ করে জানলাম, আকাশের এক মামা আর এক কাকা হাসপাতালে রয়েছেন। পাড়ার কিছু ছেলেকে নিয়ে সমস্ত ঝক্কি তাঁরাই সামলাচ্ছেন। আকাশের বাবা-মা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে ছুটে এসেছিলেন। চিকিৎসকরা মর্মান্তিক খবরটা শোনানোর পর তাঁদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আকাশের বাবা-মায়ের সামনে পড়লে অত্যন্ত বিব্রত হতে হত। সে কারণেই মানুকে নিয়ে হাসপাতালে আসতে চাইনি। এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

ডাক্তার সেনকে একটা ফোন করা দরকার। এই সময়ে নিশ্চই ক্লিনিকে থাকবে। মোবাইলে ধরা গেল তাকে। দু'বার রিং হতেই ফোনটা ধরল সে। তবে বেশি কথা বলার সুযোগ হল না। শুধু কয়েকটা নিয়মমাফিক পরামর্শ, "মাথা ঠান্ডা রাখো। মন শান্ত রাখো। ওষুধগুলো নিয়ম করে খাও। তেমন হলে মানুদের নিয়ে ক'দিন বাইরে কোথাও ঘুরে আসতেও পারো।"

ব্যস্ত মানুষ ঋত্বিক। অর্থ উপার্জনটা তার নেশা। অজস্র কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। শুধু ভাল ডাক্তার হলেই পসার করা যায় না। এর জন্য অনেক ছক্কা-পাঞ্জা জানতে হয়, করতে হয়। সেটাই রপ্ত করেছে ঋত্বিক।

বারবার ঘড়ি দেখছিলাম। বেলা বেশ অনেকটা গড়িয়েছে। এরমধ্যে ভিড় অনেকটাই হালকা হয়েছে। পোস্টমর্টেম করে বডি ছাড়তে বিকেল গড়িয়ে যেতে পারে। মানুকে এবার বাড়ি ফেরাতে রাজি করতে হবে। মনে মনে ঠিক করে এগোতে গিয়েই দেখলাম মানু একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। তাই চমকে উঠলাম।

মানু বলল, "চলো বাবা। এবার ফেরা যাক। সবাই চলে যাবে। আমারও বিকেলে ক্লাস আছে।"

আজ তিন সপ্তাহ পর অফিসে এসেছি। তবে কাজের ইচ্ছাটাই যেন চলে গিয়েছে। দিন পনেরো হয়ে গিয়েছে আকাশের মৃত্যু। জানি না, ওর মা-বাবা পুত্রশোক সামলে উঠেছে কি না। তবে নিশ্চিতভাবে ওর বন্ধুরা শোক ভুলেছে। মানুও। সব আবার আগের মতো। যে আকাশকে আমি মানুর একটু বেশি কাছের বন্ধু বলে ভাবতাম, প্রেমের সম্পর্ক আছে বলে মনে করতাম, তার অকাল মৃত্যুতেও মানু এত স্বাভাবিক! অবাক লাগে।

আজকাল আয়নার সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়। লজ্জা হয়। অত্যন্ত ঘৃণা হয় নিজের উপর। জানি না, এই সমাজে আমার মতো এমন নিরীহ, ভদ্র সাজা স্বার্থপর শয়তান ক'টা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক'টা লোক এমন হাসতে হাসতে একটা সরল কিশোরকে ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করে দিতে পারে। একটা সুখী-সমৃদ্ধ শান্তির পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে একটা বিকট দৈত্যের।

নিজের মনেই তীব্র প্রতিবাদ করি। দৈত্য কেন! সবাই তার নিজের সন্তানের ভাল চায়। আমিও চেয়েছি। সবাই তার সন্তানকে যে কোনও কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে চায়। আমিও চেয়েছি। এর মধ্যে কোনও অন্যায় আছে? মানু আমার মেয়ে। সে যদি কোনও ভুল পথে চলে তাকে সেখান থেকে যে কোনও উপায়ে ফিরিয়ে আনা একজন বাবা হিসাবে আমার কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্যই পালন করেছি। এর মধ্যে মোটেই অপরাধ দেখতে পাই না।

ছেলেটা খুব বেড়ে গিয়েছিল। আকাশ নামটাতেই মাথায় খুন চড়ে যেত। মাথায় লম্বা চুল। হাতের কব্জিতে পুঁথির ক'টা মালা জড়ানো। কোমর থেকে নেমে যাওয়া জিনস। রাতবিরেতে মেয়েদের মোবাইলে ফোন। বাড়িতে ঢুকে মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। এর মা-বাবাই বা কেমন মানুষ? এই বয়সেই তাকে একটা আস্ত বাইক কিনে দিয়েছে! বাইকের পিছনে মেয়ে বন্ধুদের বসিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বেশ ক'দিন ওর বাইকের পিছনে মানুকেও দেখেছি। একদিন তো গুলি করে দিতে ইচ্ছে করেছিল। হাতে অস্ত্র থাকলে তখনই চালিয়ে দিতাম। না থাকত বাঁশ, না বাজত বাঁশরী।

রাতে শোবার আগে কিছুক্ষণ টিভি দেখা, বই পড়া পুরানো অভ্যাস। কিন্তু আজকাল ওসবেও ঘুম আসে না। ডাক্তার রোজ ঘুমের ওষুধ খেতে বলেছে। কিন্তু ঘুমের ওষুধ খেলেই তো সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসে না। সেইটুকু সময় চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকি। কাল ওই তন্দ্রার মধ্যেই একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হাত বেঁধে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে আমাকে ফাঁসিকাঠে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানু আমাকে সাজা শোনাচ্ছে।

বিছানায় পড়ে থাকা শরীরটা খনিক নড়েচড়ে উঠেছে মাত্র। উঠতে চেয়েও পারিনি। একটা অন্ধকারে ক্রমশ তলিয়ে গেছি।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল শরীরটা বেশ সতেজ লাগছিল। মনটা অবশ্য ততটা নয়। মানুর ঘরে এলাম। মানু ঘুমোচ্ছে। সিলিং ফ্যানটা বন্ধ। বোধহয় ভোরের দিকে ঠান্ডা লেগেছিল। উঠে বন্ধ করে দিয়েছে। গায়ে চাদর রাখতে পারে না মেয়েটা। পাশে শুয়ে পড়লাম। হালকা ঘুমের মধ্যে টের পেয়ে আমার বুকের উপর হাত রাখল। আহ্লাদে বেশ উজ্জ্বল হল মুখটা। সবাই বলে মেয়ে বাবা-ন্যাওটা। আমিও মানি। সেই ছোটবেলা থেকে কিছু স্বভাব এখনও বদলায়নি মানুর। এখনও আমি বাড়িতে থাকলে কলেজে বা টিউশন পড়তে বেরনোর সময়ে আমাকে একটু আদর করে গালে হামি খেয়ে বেরয়। আবার আমি অফিসে বেরনোর সময় এখনও বলতে ভোলে না, "বাবা তাড়াতাড়ি আসবে। আর কিছু আনবে।"

সেই জ্ঞান হওয়া থেকে আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় রাত পর্যন্ত জেগে থাকে মানু। খুব ছোটবেলায় ঘুমিয়ে পড়লেও মাঝরাতে একবার জেগে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করে নিত। পরে স্কুলে পড়ার সময় ক্লান্ত শরীরেও অনেক রাতে আমার ফেরার অপেক্ষায় ঘুমাত না। এখনও সেই অভ্যাস রয়েছে।

কী আশ্চর্য, মানু আমাদের এই রুচিশীল পরিবারে বড় হয়েও ওই বখাটে, আদ্যপান্ত বিশৃঙ্খল ছেলেটাকে এত প্রিয় করে ফেলেছে! আমি নিজে কখনও মানুকে এই নিয়ে আপত্তি জানাইনি ঠিকই। তবে সুরঞ্জনাকে একাধিকবার সাবধান করেছি। প্রতিবারই সুরঞ্জনা আমাকে

আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে, ওরা বন্ধু-ই। এই নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা না করতে।

আমি যেন বাচ্চা ছেলে! আশ্বস্ত করলেই, হওয়া যায়? নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলেও পারি না। ভিতরে লুকিয়ে থাকা আদিম রিপুটা জেগে ওঠে। মনের মধ্যের ঘুমন্ত খলনায়কটা লাফিয়ে ওঠে। কিছু একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। যেভাবেই হোক। যে কোনও পথেই হোক।

রোজ সকালে পার্কের ঝিলের ধারে কতগুলো লোক ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে। ওরা কেমন নিবিড় ধৈর্যের সঙ্গে ফাতনার দিকে চেয়ে থাকে। নট নড়ন, নট চড়ন। সবার ভাগ্যে যে রোজ শিকার জোটে এমন নয়। তবু নিত্য তাদের এখানে এসে মোহিত হয়ে বসতেই হবে। এই মানুষগুলোর একাগ্রতা দেখলে আমি অবাক হই। কেন আমার এমন ধৈর্য নেই? এমন একাগ্রতা নেই?

আমার পাশের ভদ্রলোক ছিপ ধরে এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো বসেছিলেন। হঠাৎ নড়ে-চড়ে উঠলেন। চোখে দ্যুতি। টান মেরে ছিপ তুললেন ভদ্রলোক। বঁড়শিতে একটা কচি মাছ গেঁথেছে। মাছটা এখনও ছটফট করছে। অতটুকু মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। উঃ, কী যন্ত্রণা।

লোকটা বিজয়ীর হাসি হাসছে। আমার কিন্তু তাকে ভিলেনের মতোই লাগছে। উঠে পড়লাম সেখান থেকে। ক'দিন হল সকালে পার্কে হাঁটতে যাওয়া শুরু করেছি আবার। আমার মতো আরও অনেকে বেড়াতে আসে। সবাই আমার সমবয়সি নয়। সবাই মুখচেনা। কয়েকজনের সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ-পরিচয় আছে। রমেশবাবু বলে একজনকে চিনি। মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গে একটু কথাবার্তা হয়। ক'দিন হল তাঁকে দেখছি না? কী জানি, হয়তো শরীর-টরির খারাপ। হতেই পারে। শরীর কখন কেমন চলে কে বলতে পারে?

আজকাল যেন খারাপ ছাড়া কোনও ভাল খবরই পাই না। শুনলাম, রমেশবাবুর কিশোর ছেলেটা ক'দিন আগে মারা গিয়েছে। ক্যানসারে ভুগছিল। জানতাম ছেলেটা কলেজে পড়ে। রমেশবাবু কিন্তু কখনও ছেলের ওসুখের কথা বলেননি। মৃত্যুর খবরটা শুনে শিউরে উঠেছিলাম। আচ্ছা, রমেশবাবু ছেলেকে নিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখতেন? রমেশবাবু অফিসে বেরনোর সময় সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা বলত? যেমনটা মানু আমাকে বলে। ফের আকাশের কথা মনে পড়ে গেল। আকাশও কি বাবা অফিসে বেরনোর সময় বাবাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা, কিছু নিয়ে ফেরার কথা মনে করিয়ে দিত? আকাশের বাবাও কি তাকে নিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখতেন? রমেশবাবু, আকাশেরর বাবা কি তাঁর সন্তানকে আগলে রাখতেন? যেমন আমি মানুকে আগলে রাখি।

সব আলোচনা সবার সঙ্গে হয় না। কিন্তু কাউকে খোলসা করে বিষয়টা বলা দরকার। হঠাৎ মাথায় এসে গিয়েছিল ঋত্বিকের কথা। ঋত্বিক প্রথমে তেমন গুরুত্ব দিতে চায়নি। কিন্তু আমি নাছোড়। কয়েকটা দিন ঋত্বিকও ওর ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এরমধ্যে আমিও মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম। পথটা বাতলে দিল ঋত্বিকই। তা-ও চরম পথ। আমাকে কোনও কিছুতে মাথা ঘামাতে হয়নি। পকেট থেকে তিরিশটা হাজার টাকা দিতে হয়েছিল। ব্যস। ঋত্বিক কথা দিয়েছিল, ওর মধ্যেই সব মিটে যাবে। ক'দিন ওরা ছেলেটার উপর নজর রাখবে। সুযোগ মতো খালাস করে দেবে। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। দু'দিনের মাথায় খবরটা পেলাম।

আয়নার সামনে দাঁড়ালে প্রতিবিম্বে একটা বিকট ভিলেনকে দেখতে পাই। নিজের সন্তানের জন্য ভাড়াটে খুনি লাগিয়ে একটা কিশোরকে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়েই দিলাম! একটা মায়ের কোল খালি করে দিলাম!

ঋত্বিকই বলেছিল, আকাশের মৃত্যুতে মানু ভীষণ মানসিক আঘাত পেতে পারে। সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। আমার নজরে অবশ্য মানুর মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন কিছু নজরে পড়ে না। কলেজ যাওয়া, তাড়াহুড়ো করে টিউশনি পড়তে যাওয়া, মধ্যরাত পর্যন্ত মোবাইলে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাটিং— আগের মতোই ঠিক সব চলছে। কিছুই তো পাল্টায়নি! আমি অবাক হই। তাহলে কি আমি যা ভাবতাম তা ভুল। সুরঞ্জনাই ঠিক ছিল? আরও আডষ্ট হয়ে যাই। তবে কি শুধু নিছক সন্দেহের বশেই জেনেশুনে নরহত্যা করলাম। এ তো ঘোরতর পাতকের কাজ। বিবেকের কাছে কিছুতেই তর্কে পেরে উঠি না।

আমার নিজের কাছেই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আকাশের সঙ্গে মানুর বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ওরা বন্ধুই ছিল। কিন্তু আকাশকে ফিরিয়ে আনা আর আমার হাতে নেই। আমি মহাপাতক। প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। আমার শাস্তি হওয়া উচিত কঠোর শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড আমার প্রাপ্য। একবার মনে হল, যাই থানায় গিয়ে স্যারেন্ডার করি। সব খুলে বলি পুলিশকে। দিক আমাকে জেলের অন্ধ কুঠুরিতে পুরে। বাকি জীবনটা কারাবন্দি থেকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। কিংবা দিক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে।

কিন্তু আমি যে পাপ করেছি, একটা মৃত্যুদণ্ডই কি তার জন্য যথেষ্ট? মানু-সুরঞ্জনা কি আমাকে কোনওদিন ক্ষমা করবে? জানি ক্ষমার যোগ্য কাজ আমি করিনি। তবু নিজে মুখে ওদের অন্তত কথাটা না বলতে পারলে ফাঁসিতে ঝুলেও শান্তি পাব না। আমায় শাস্তি দেবার প্রথম অধিকারী সুরঞ্জনা-মানু। ওদের আদালতে বিচারের মুখোমুখি হওয়াটা ক্রমেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

তবে সুরঞ্জনা-মানুর সামনে আত্মসমর্পণ করতে নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। ক'দিন বাড়ির পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। ওদের চেখে চোখ রাখতে পরিনি। ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল।সে এক কঠিন শাস্তি। ঋত্বিক সব কাজ ফেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের বাড়িতেই ক'দিনের জন্য আস্তানা গেড়েছিল। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে আমাদের সকলকে সঙ্গে করে ভাইজাগ বেড়াতে চলে গিয়েছিল।

সুরঞ্জনা-মানুর মনোকষ্ট আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। অনেক সময় লেগেছে। তবে প্রকৃতির নিয়মেই আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। অভিষেক খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। আমার গত জন্মদিনে মানু ওর সব বন্ধুকে বাড়িতে ডেকেছিল। অভিষেক ওর আঁকা একটা পোর্ট্রেট আমাকে উপহার দিয়েছে। একটা কিশোর। জগৎভোলানো হাসি দিয়ে চেয়ে রয়েছে আমারই দিকে। একেবারে সরাসরি। আকাশের চাউনির সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে ছেলেটার। ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার শোয়ার ঘরে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি ছবিটা। ওর দিকে চেয়ে ইচ্ছা করে উজিয়ে তুলি নিজের মধ্যের অপরাধবোধটা। নিজেকে শাস্তি দিই।

আকাশের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। মানু সার্টিফিকেট দিয়েছে আমায়। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, আকাশের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা। ঘাতক লরির চালককে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও হত্যা-চক্রান্তের হদিশ পায়নি পুলিশ। পরে ঋত্বিকের কাছেও জেনেছি, ভাড়াটে খুনিরা কাজটা করার সুযোগই পায়নি। বরাত পাওয়ার পর ওরা আকাশের উপর নজর রাখছিল। তখনই ওদের চোখের সামনেই বি টি রোডে দুর্ঘটনা ঘটে।

আমি পাতক নই। সেটা দুনিয়ার চোখে। কিন্তু নিজের চোখে? আমি মহাপাতক। শয়তান। নরকের কীট। একটা নিরপরাধ কিশোরের মৃত্যু কামনা করেছিলাম, এটা অপরাধ নয়? এই অপরাধের বোঝা আমাকে বইতে হবে আমৃত্যু। আমিই আকাশের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু





আমার বাবা

অভিজিৎ সিরাজ

যে ভারতের কথা জানে না ডিজিটাল ইন্ডিয়া

বাল্‌বের আভায় ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন

ছেলেবেলার কথা উঠলেই বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাসের একটি লেখার কথা মনে পড়ে। তারাদাস লিখেছিলেন, তাঁর বাবা ছিলেন সবথেকে প্রিয় আপনজন। যদিও তারাদাস একেবারে শৈশবে বাবাকে হারিয়েছিলেন। সে তুলনায় আমি ভাগ্যবান। প্রবীণ বয়স পর্যন্ত বাবার সাহচর্য পেয়েছি। শুধুমাত্র বই পড়া আর গল্প করার জন্যই ছোটবেলায় বাবা আমার প্রিয় ছিলেন। হাজার ব্যস্ততাতেও রোজ রাতে বাবা আমাদের গল্প বলতেন। জিম করবেটের শিকার-কাহিনি, গোয়েন্দা আরকুল পোয়রো-র গল্প রাত জেগে শুনতাম। এখানে তারাদাসের কথা উল্লেখ করলাম, কারণ তারাদাস লিখেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের শৈশব কাটা উচিত হ্যারিকেন-বাতির আলোয়। কারণ সেই আলোয় প্রথম শিশুর মনে রহস্য-রোমাঞ্চ-কল্পনার জগৎ গড়ে ওঠে। আমাদের ছেলেবেলায় হ্যারিকেনের আলো না থাকলেও ঝুলমাখা বাল্‌বের হলদে আভা ছিল একমাত্র সম্বল। সেই আলো আজকের ফ্লুরোসেন্ট বাতির মতো উজ্জ্বল ছিল না। সেই হলুদ বাল্‌বের আলোয় একটা মায়াবী পরিবেশ গড়ে উঠত। সেই পরিবেশেই আমরা ভাইবোনেরা বাবাকে পেয়েছি।

মনে পড়ে, রাত্রে অনেক সময় বাবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। পরদিন ভোরবেলা উঠে মাথার বালিশের কাছে দেখতে পেতাম নতুন বই। তবে বাবা যেহেতু ছোটদের জন্য অনেক পরে লিখতে শুরু করেন, তাই বাবার বই পড়তে আমার আরও সময় লেগেছে। তুলনায় বড়দের জন্য বাবার লেখা গল্প ছেলেবেলাতেই পড়ে ফেলেছি। সেটা ভাষার টানে

খানিকটা। আবার কিছুটা বিষয় বৈচিত্রের জন্য। বড়দের জন্য লেখা, সুতরাং সেটা নিষিদ্ধই ছিল বলা যায়। তবু ছোট বয়সেই পড়ে ফেলি বাবার লেখা একটি বিখ্যাত গল্প 'ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন'। কিছুতেই বুঝতে পারতাম না শেষটায় কী হল। একটা পালিয়ে যাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকা স্টেশনে বসে কী করল? গল্পটা অসম্পূর্ণ ভেবে ছটফট করতাম। তবু বারবার পড়তাম।

তর্কবাগীশ বাবা-ছেলে

বন্ধুমহলে তার্কিক বলে আমার বদনাম আছে। কোনও কিছুই সহজে বিশ্বাস করি না, মানতেও পারি না। সবাই যা নিয়ে শোরগোল তোলে আমি তার উল্টো কথা বলি। সাংবাদিক জীবনে পেশার কারণে আমি সবাইকে কড়া সমালোচক হওয়ার পরামর্শ দিই। এই স্বভাবের কারণ বাবা। বাবা বলতেন, প্রশ্ন করতে না জানলে ইতিহাস, সভ্যতা কিছুই গড়া হত না। সত্যের কাছে পৌঁছতে গেলে অনর্গল প্রশ্ন করতে হয়। বাবার এই ধারণার প্রভাব ছোটবেলা থেকেই আমার উপর লক্ষ করা যেত। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বাবা ছিলেন একইসঙ্গে উদার এবং যুক্তিবাদী। বহু ঘটনায় বাবার এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বাস্তব জীবনে দেখেছি। তাই বাবার শেখানো পথ ধরে আজও সত্যের খোঁজে প্রশ্ন করে যাই। তাতে অন্যরা ক্ষুব্ধ হলেও থামি না। শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাবার দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছে সেটাও শিখেছি বাবার লেখা থেকে।

এবার পুজোয় ফিরে পড়া

আমার বিচারে বাবার সেরা উপন্যাস কিন্তু কোনও মস্ত কাহিনি-গ্রন্থ নয়। এমনকী বহুপঠিত 'অলীক মানুষ'ও নয়। আমার প্রিয় উপন্যাস 'জানমারি'। একে বড় কাহিনি বা নভেলেটও বলা যায়। ছোট্ট একটা পরিসরে মাত্র কয়েকদিনের ঘটনার বিস্তারে গড়ে উঠেছে এর কাহিনি। সেখানে একটি পাগল চরিত্র যিশুখ্রিস্টের মতো মহামানবের মহিমায় উঠে আসে রক্তাক্ত এক অধ্যায়ের মাধ্যমে। বাইবেলে বর্ণিত চিরন্তন এক বাণী উল্লেখ করে লেখক তাঁর কাহিনি শেষ করেন। এখানে মানুষকে সঙ্ঘাতময় জীবনের পটভূমিতে বিশাল ক্যানভাসে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানেই উপন্যাসটির বিশ্বজনীন আবেদন।

বাবা ছিলেন মূলত ছোট গল্পকার। তাঁর বেশিরভাগ গল্পই আমার প্রিয়। তার মধ্যে 'সাজ ভেসে গেছে' গল্পটি আমার মতে লেখকের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা। গ্রামীণ জীবনের যে সংহতি গোটা ভারতকে আজও ধরে রেখেছে তার প্রতিফলন গল্পটিতে পাওয়া যায়। একজন নিরক্ষর, দরিদ্র মুসলিম চাষি বেহুলা-লখিন্দরের পৌরাণিক পালায় অভিনয় করত। কিন্তু বন্যা-দুর্গত হয়ে সবকিছু হারিয়ে ফেলে সে। তার বেদনা ও হাহাকার, তার শিল্পীসত্তার আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ধর্ম-জাতি-সম্প্রদায়ের বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলে এক বৃহত্তর সংহতির অঙ্গন গড়ে তোলে। সেই গ্রামীণ ভারতের কথা জানে না আজকের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'। এবার পুজোয় আমি এই গল্পটি পাঠককে ফিরে পড়ার জন্য বলব।

সিরাজের শক্তি হাসনে আরা

আমার মা হাসনে আরা অল্প বয়সে ঘরনি হয়েছিলেন। বিয়ের আগে মা জেনে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী একজন লেখক। মাকে সেটা বোঝানোর জন্য বাবা একটা আস্ত উপন্যাস লিখেছিলেন। সুদূর গ্রামে বসে কলকাতার সাহিত্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হত না বলেই মা জোর করে বাবাকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাকে কিছু গয়নাও বিক্রি করতে হয়েছিল। বাবা কলকাতায় এসে নিজেকে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করেই নিজের পরিবারকে সেখানে টেনে নিয়ে যান। তখন আমার বয়স বছর চারেক। কলকাতায় এসে বাবার সংগ্রাম স্বাভাবিকভাবেই আরও তীব্রতর হয়। তারপর অবশ্য দ্রুত উত্থান ঘটে। এর পিছনে সবটাই ছিল মায়ের অবদান। আমাদের পড়াশোনা, বেড়ে ওঠা সবই মাকে দেখতে হত। বাবা লেখার জগতে ডুবে থাকতেন। তাঁকে কখনও সংসার নিয়ে ভাবতে হয়নি। তবে বাবা বাজার করতে খুব ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে শৌখিন রান্নাও করতেন। আমার মা-ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কবিতা লিখতেন নিয়মিত। অভিনয় করতেন। মায়ের একটি কবিতার বইয়ের নাম 'লাল শিমুলের দিন'। লেখালিখির ব্যাপারে মাকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জোগাতেন বাবা।

খোশবাসপুরে আমাদের বাড়ি

বাবার লেখার প্রতি ছত্রে রাঢ় বাংলার মাটির গন্ধ। কলকাতায় থাকলেও মুর্শিদাবাদেই পড়ে থাকত বাবার মন। খুব ছোট বয়সে খোশবাসপুরে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে চলে এলেও আমাদের মধ্যেও শিকড়ের টান রয়ে গিয়েছে। কারণ, বাবা কখনও সেটা উপড়ে ফেলতে চাননি। পুজোর ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া আমাদের কাছে তুমুল আনন্দের বিষয় ছিল। দশমীতে মেলা দেখতে যাওয়া ছিল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সেই ঐতিহ্য আজও আমরা বজায় রেখে চলেছি। খোশবাসপুরে বাড়ির বাগানে আজ পাশাপাশি সমাহিত বাবা আর মা। মায়ের হাতে লাগানো গাছ-গাছালি আগলে রেখেছে বাবার প্রিয় গ্রামের বাড়িকে।

চাঁদনির রাস্তায় বাবা আর আমি

বিখ্যাত ব্যক্তির পুত্র হওয়ার জন্য আমাকে কখনও বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি। কারণ, এ দেশে লেখকরা তারকা নন। ব্যতিক্রম কয়েকজন থাকলেও আমার বাবা তাঁদের মধ্যে পড়তেন না। তবে কখনও কখনও বাবার পরিচয় দিয়ে প্রচুর খাতির পেয়েছি। অবাক হয়ে লক্ষ করেছি, বহু মানুষ এখনও সাহিত্যিকদের যথার্থ মর্যাদা দেন। হয়তো এঁরাই প্রকৃত পাঠক। লেখক জীবনের বাইরে বাবার আর একটা পরিচয় ছিল। প্রায় ২৫ বছর সাংবাদিকতা করেছেন। বহু বছর রাতের ডিউটি করতে হয়েছে। তাই এই জগতটা পরিচিত থাকায় আমি আর ভাই পরে কর্মজীবনে সাংবাদিকতায় যোগ দেওয়ার পর কখনও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনি। আমি এখনও অফিস যাওয়ার পথে বাবার চেনা রাস্তা ধরেই হাঁটতে ভালবাসি। সেই রাস্তা ধরেই আমি একদিন বাবার আঙুল ধরে হেঁটে যেতাম। বাবা যে দোকানে সিগারেট কিনতেন আমি আজও সেখানে দাঁড়িয়ে পুরোনো স্মৃতির অনুভব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি।

তারাদাসের আর একটি কথা আজও আমার ভাল লাগে। তিনি লিখেছিলেন, "এই পৃথিবীর মাটি আমার কাছে পুণ্যভূমি। কারণ, এই মাটিতে আমার বাবা বিভূতিভূষণ হেঁটে গিয়েছেন।" তারাদাসের মতো আমি আজও চাঁদনি চকের রাস্তায় দাঁড়ালে বাবার পদধ্বনি যেন শুনতে পাই।

অনুলিখন : পৌষালী কুণ্ডু

ফিরে পড়া

গল্প

সাজ ভেসে গেছে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



'আজ্ঞে সার, নাম মইলোবাস, নিবাস সাকিন মাদারহাট পোস্টোআপিস গোকরোণ, থানা কান্দি, জেলা মুচ্ছিদাবাদ...'

—'ভাল। কী চাই?

—'আজ্ঞে, সাহায্যো!'

—'সাহায্য? কেন? কিসের?'

—'আজ্ঞে সার, বেউলোর দলের।'

ব্লকের সরকারি সমাজ শিক্ষা সংগঠক ভুরু কুঁচকে তাকান।— 'সে আবার কী?'

সঙ্গে এসেছে মতি চৌকিদার। সবিনয়ে হেসে বুঝিয়ে দেয়, 'বেউলানখিন্দর পালা সার। পেচণ্ড বান-বন্যেয় সাজের বাকসোপেঁটরা সব ভেসে গিয়েছে। দেখুন না, দরখাস্তে অঞ্চলপ্রধান সব নিকে দিয়েছেন। মইলোবাস, দরখাস্তটা আগে দাও সারকে।'

অফিসার বাবুটি কলকাতার মানুষ। সবে চাকরি পেয়ে এই অখদ্যে জায়গায় এসেছেন। খিকখিক করে হাসেন। 'তাই বলো। তা কী নাম বললে যেন।'

—মইলোবাস স্যাক, সার।

অফিসার তাকান লোকটির দিকে। বছর বিয়াল্লিশের মধ্যেই বয়স সম্ভবত। বিশাল শরীর। গায়ে ময়লা হাতাগুটানো রঙিন পানজাবি, পরনে মালকোচা ধরনে ধুতি— এলাকার মাটির হলদে ছোপলাগা, পায়ে রবারের ফাটাফুটো স্যান্ডেল এবং কাঁধে তেমনি শ্রীহীন ঝোলা। লোকটার গায়ের রঙ তামাটে। খাড়া মস্ত নাক, বড় বড় কান, টানা চোখে হতচকিত বিহ্বলতা, কপালে তিনটে ভাঁজ। একমাথা বাবরি চুল। তিনি ফের হাসেন— 'তুমি তো শিল্পী তাহলে। আর্টিস্ট! হ্যাঁ?'

মতি হাসে। মইলোবাসও সাহস পেয়ে হাসে। মতির সলাতেই এসেছে। মতি বলে— 'হুকুম পেলে এক আসর গেয়ে দেবে, সার। কিন্তু পেচণ্ড বানে...'

মইলোবাস জুগিয়ে দেয়—'সাজ ভেসে গিয়েছে।'

অফিসার আরামে হেলান দিয়ে বলেন—'তো মইলোবাসটা কী, বলো তো?'

পিছন থেকে তৃতীয় একজন, সে একেবারে তরুণ, কালো বেঁটে ও কুচ্ছিত চেহারা, পরনে ধুতি ও নীলচে হাফশার্ট, ব্যাখ্যা করে দেয়— 'নাম সার মওলা বখ্‌শ। অশিক্ষিত লোক সব। কেউ ডাকে মৌলবাস, কেউ মইলোবাস।'

—'তুমি কে?'

—'আমি সার বাহাসতুল্লা। দলে বৈয়ালি করি।'

—'এ্যাঁ?'

এসব আঞ্চলিক টার্ম ভদ্রলোকের জানবার কথা নয়। মতি সব ব্যাখ্যা করে। বৈয়ালি বা বইয়ালি করা মানে প্রম্পট করা। বাহাসতুল্লা অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানে। সে পালার হাতেলেখা মস্তো খাতা থেকে প্রম্পট করে আসরে। তখন তাকে মাথায় হারিকেন চাপিয়ে আলো দেয় যে তার নাম নগেন বাগদী। আঙুলে সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটে জ্বর হয়েছে বলে আসতে পারেনি। বানের জল নেমে গিয়ে খালে জলায় এখন বেশ মাছ হচ্ছে।

দরবার করতে আরও সব এসেছে। যে বেউলো সাজে, তার গায়ের রং কালো। হালকা গড়ন। মুখে মেয়েলি ছাঁদ। বছর পনেরো-ষোলো বয়স হবে। নাম অমূল্য, জাতে বাউরি। আর লখিন্দর? সে না এসে পারে? দল-দল করেই তার বউ পালিয়েছে। তালাক দিতে হয়েছে। কারণ শ্বশুর লোকটা, ফরাজি সম্প্রদায়ের। তাদের কাছে গানবাজনা হারাম—নিষিদ্ধ। বিয়ের আগে জামাই দলের নিছক 'সাপোট্টার' ছিল। হঠাৎ আগের লখিন্দর খুনের মামলায় জেলে ঢুকল। ঢুকল তো ঢুকলই। ফিরতে বুড়ো হয়ে যাবে। তখন খোঁজ নতুন নখাইকে। লখিন্দর বা নখাই হবে সুপুরুষ—ঢলঢল রূপলাবণ্য, আসরে তাকে দেখাবে দ্বারকানদীর আদিম বিশুদ্ধ আকাশের সেই প্রকৃত চাঁদ (মাদারহাটির ধরণী তহশিলদার আজও বিশ্বাস করেন, সেই চাঁদে আমেরিকান বা রাশিয়ানদের বাবার সাধ্যি নেই পা বাড়ায় এবং সোনাই ফকির হুঁ হুঁ হেসে বলেছিল—'এ চাঁদ কি সে চাঁদ বটে মানিকরা?) সেই চির অলৌকিক চাঁদ ঢুকবে আসরে, চাঁদসদাগরের চোখের মণি! আর চারু মাস্টারের বেহালা শুনে ছৈরদ্দির বিধবা মেয়েটা তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। আসরে তখন বিপুল জ্যোৎস্নায় হাজার বছরের গ্রামীণ বিষাদ জেগে উঠবে। সে কি সহজ কথা? খোঁজ সেই আদরের নখাইকে। নখাই মিলেছিল। আকাশ আলি নাম। বাপের নাম আব্বাস হাজি। হজ করেছে— দাঁত পড়েছে। মোড়ায় বসে শণের দড়ি পাকায়। ছেলে নখাই সাজে তো কী করবে? যৈবনে মানুষ বুনো ঘোড়া। বয়স হলে তখন তৌবা করে মক্কা যাবে। ব্যস!

আকাশ আলি হিরো। তাই তার চুলে তেল বেশি। গায়ে আদ্দির পানজাবি— কিন্তু কুঁচকে জড়োসড়ো। হাতে ঘড়িও আছে। হজে গিয়ে বাপ এনেছিল। পায়ে কাদায় ভূত কাবুলি চপ্পল।

কিন্তু সে বড় লাজুক। পিছনেই আছে। দরজার কাছে। আর আছে 'নারানবাবু' তবলচি। বাবু মানে বাবুবাড়িয়র গাঁজাখোর উড়ুক্কু মাস্তান ছেলে। বাড়ি পাশের গাঁয়ে। ভদ্রলোকের গাঁ। বাবা নমী মুখুয্যে পোস্টমাস্টর ছিলেন। ছেলে নারান ক্লাস ফোরেই বেরিয়ে পড়েছে, স্বাধীনতার স্রোতে ভাসমান। মদতাড়িগাঁজাভাং জমিয়ে টেনেছে এই বয়সেই। কিন্তু সেও শিল্পী ছেলে। তবলায় ঠুংরিগাইয়ে ওস্তাদ হাবল গোঁসাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গোঁসাই বলেছিলেন— 'আয় শালা, সঙ্গ ধর।' কিন্তু সমফাঁকের মুখে গোঁসাইয়ের থাপ্পড় মারা অভ্যেস। একে তো সব সময় মাথায় মধ্যে ভোঁ বাজে। অগত্যা নারান জুটেছে বেউলো দলে। ব্লক আপিসে দলের সঙ্গে রিপ্রেজেন্টেশনে এসেছে। কারণ সঙ্গে একজন বাবুটাবু থাকা ভালই, যদি পাত্তা দেন ওনারা।

অফিসার বলেন—'তাহলে তুমিই চাঁদ সদাগর?'

মইলোবাস সলজ্জ মাথা নাড়ে। মতি বল—'শুধু তাই না সার, ও ছিল একসময় এলাকার সেরা পালোয়ান। মালামোতে ওর জুড়ি ছিল না। সাতখানা মেডেল আছে ঘরে। নতুন গামছা যে কত পেয়েছিল, হিসাব নেই। মৌরিগাঁর বাবুরা। পেতলের ঘড়া দিয়েছিলেন। ওনাদের গাঁয়ে হায়ার করে এনেছিল পচ্ছিমে পালোয়ান। ভকতরাম নাম। তাকেও ধুলোপিঠ করেছিল আমাদের মইলোবাস। কিন্তু শরীলে ব্যামো ঢুকল। এখন ভিতরটা ঝাঁঝরা...'

অফিসার কেমন করে জানবেন এসব? খরার দু'-তিনটে মাস বৃষ্টির আশায় গাঁয়ে-গাঁয়ে মালামো হয় দিনক্ষণ দেখে। একজোড়া ঢোল বাজে। ঢোলের বোল ভারী মজার :

চোল্ টিপাকাঠি টিপ্ টিপাং
ওই শালাকে চিৎপটাং...

জড়াজড়ি দুই জোয়ান মাটিতে দাপাদাপি তুলেছে, গগন-পবন দু'ভাই ঢুলি তাদের ঘিরে দ্রুততালে বাজাতে থাকে... চিৎপটাং...চিৎপটাং চিৎপটাং...এবং একজন চিৎপটাং হলেই ঢোলে তেহাইয়ের শ্বাসছাড়া আওয়াজটি ওঠে— ডুড্ডুম! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে হাজার গ্রামীণ মানুষ : এই ও-ও-ও। গাঁয়ের বউঝি চমকে উঠেই হাসে। হাসিটি হাজার বছরের।

একদা মইলোবাস ছিল পালোয়ান। পালোয়ান ছাড়া চাঁদ সদাগর মানাবে কেন? সওয়া হাত বুকের ছাতি না হলে কেমন করে বেরোবে ও ভয়ঙ্কর গর্জন : 'সাবধানে চ্যাংমুড়ি কানী!'

মাথায় লাল ঝলমলে পাগড়ি, গায়ে লাল রেশমি বেনিয়ান রাংতার কাজ করা, পরনে মালকোচাকরা লাল কাপড়, আর হাতে হিন্তালের লাঠি। উঁচু হয়ে থাকা মুখে, পাকানো বিশাল গোঁপ, কপালে লাল ফোঁটা—সাজঘর থেকে হঙ্কার দিতে দিতে

আসরে আসে—'জয় শম্ভো! জয় শম্ভো!'

—'বলো হে চাঁদসদাগর, একবার পার্ট বলো শুনি!'

মতি শশব্যস্তে বলে—'নজ্জা করছে সার। সরকারি আপিস বটে কি না। আসরে হলে...'

—'উঁহু, একবার তো শুনি। নৈলে কেমন করে বুঝব যে সত্যি আছে তোমাদের বেহুলার দল?'

সমস্যা বটে। মতি বলে—'তিন-পুরুষের দল, সার। নিবাস আলি গোমস্তা পালাটা নেকেছিলেন আমার কত্তাবাবার আমলে। সেই খাতা এখনও আছে। তা থেকে নকলে নিয়ে চলছে। বিশ্বাস না হলে এনকোয়ারি করে আসুন।'

বৈয়াল বাহাসতুল্লা বলে—'আমার দাদো এখনও বেঁচে আছে, সার। তার মুখেই শুনবেন। ছেলেবেলায় তিনি বেউলো সাজতেন! তেমন বেউলো আর হবে না সার। মৌরীতলার বাবুদের কেষ্টযাত্রার দল ছিল। ওনারা দু'বছর আটকে রেখে রাধিকে করেছিলেন। শেষে গাঁসুদ্ধ লোক আসর থেকে তুলে নিয়ে আসে। খুব হ্যাঙ্গামা হয়েছিল সার। বাঁশির মতো গলা, আর চেহারাও সার তেমনি। এখন দেখলে মিথ্যে লাগবে।'

বিরক্ত অফিসার বলেন—'ঠিক আছে। দেখব'খন। কিন্তু হবে কি না বলতে পারছি না। এখন এসব ব্যাপার আপাতত বন্ধ।'

মইলোবাস অভিমানে মুখ খোলে আবার। — লক্ষ্মীনারায়ণপুরের মনিরুদ্দি কেষ্টযাত্রার সাজ কিনতে টাকা পেয়েছে। বাবুদের যাত্রার দল তো সব গাঁয়ে টাকা পাচ্ছে। মনিরুদ্দি আমার ভাইরাভাই সার। সে বললে তোমরাও পাবে। তাই এলাম। আসতাম না—বানে যে সাজের বাকসো ভেসে গেল। মাদারহাটিতে এক বুক পানি হয়েছিল, এনকুরি করুন, করে দেখুন!'

অফিসার তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন। তারপর একটু হেসে বলেন—'চৌকিদার, তুমি কিসের পার্ট করো বললে না তো?'

মতি চৌকিদার—সে সরকারি লোক, পরনে রাজপোশাক, তার দাপটে মাদারহাটি থরথর করে কাঁপে। তারও কালো মুখে লজ্জার রং ঝলকে ওঠে। মাথা নিচু করে বলে— 'আমি সার সঙাল। সঙ দিই। কমিক পাটও করি। লেজ লাগিয়ে হনুমান সাজি। চাঁদ সদাগরের লৌকো ডুবিয়ে দিই! আবার ফটিক চাঁদ কুম্ভকারও সাজি। কখনও বিবেকও হই। গান গাই।'

—'বাঃ। তাহলে তুমিই একটা গান শোনাও।'

—'আজ্ঞে?'

সকৌতুকে অফিসার বলেন— 'না শোনালে দরখাস্ত পড়ে থাকবে, চৌকিদার।'

অগত্যা একটু কেসে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে মতি সলজ্জ হেসে বলে—'বরঞ্চ ফটিকচাঁদের গানটাই গাই, সার।'

—'বেশ, গাও।'

মতি আচমকা লাফ দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গেয়ে ওঠে : 'ও কে ডাকলে রে ফটিকচাঁদ পিসে/আষাঢ় মাসে চাক ঘোরে না রইয়েছি বসে/ওকে ডাকলে রে—এ-এ এ/...

আপিসসুদ্ধ তোলপাড় অমনি। এ-ঘর ও-ঘর থেকে কেরানিবাবুরা বেরিয়ে আসেন। বিডিও সায়েব বাইরে। কৃষি অফিসার উঁকি মারেন। প্রৌঢ় হেডক্লার্ক বিরক্ত হয়ে গজগজ করেন। কিন্তু ফাইলের একঘেয়েমি হঠাৎ এক আজগুবি ঘটনার তলায় চাপা পড়ে তো মন্দ না। বড়ি জমেছে বারান্দা অবদি। আরে বাবা, এ তো শহরের কেতাদুরস্ত আপিস নয়। মাঠের মধ্যে একতলা কিছু দালান। পিছনে খাল। দিনমান চাষাভুষো লোকের আনাগোনা। আবহাওয়াটাই এ রকম। মিছিল, দাবিদাওয়া, রিলিফ, সেচ, সার, কত রকম ফিরিস্তি। তার সঙ্গে কালচার। হ্যাঁ, ফোক কালচার। জাতীয় সড়কের ধারে এই বাঁজাডাঙায় এক সময় ফণীমনসা কেয়া ঝোপ আর বাজপড়া তালগাছ ছিল। সেখানে এখন এই বাড়ি আর ফুলবাগিচা। ইউক্যালিপ্টাসের চিরোল পাতা কাঁপে হাওয়ায়। খালের সাঁকোতে জিপের চাকা ঘটঘটাং আওয়াজ তুলে কংক্রিটে গিয়ে উধাও হয়। মাথার উপর বিদ্যুতের তার। দূর মাঠের দিগন্তে বিশাল মঞ্চের সারি। ফলকে লেখা আছে 'এগারো হাজার ভোল্ট, সাবধান'। তার নিচে মড়ার মুন্ডু আর দুটো আড়াআড়ি হাড়। তার আশেপাশে নির্ভীক চাষা লাঙল টেলে—উররর্‌র্‌ হট্‌ হেট্‌ হেট্‌...

ততক্ষণে চাঁদ সদাগরও তৈরি। মতির সাহসে সাহস। সামনে এক পা বাড়িয়ে দৈত্যের মতো লোকটা বিকট গর্জে বলে উঠেছে : 'খবর্দার চ্যাংমুড়ি কানী! প্রাণ যদি চলে যায়, পুবের সূর্য যদি ওঠে পচ্চিমে, শিব ছাড়া ভজব না— পস্টো কথা কহে দিলাম। দূর হয়ে যাও! দূর দূর দূর...' এবং তারপর যেন পোজপশ্চার দেখিয়ে বুকের পাশে হাত চেপে চুপ করে গেছে।

হো হো করে হাসেন বাবুরা। কেউ-কেউ বলেন—বরং বেহুলার গান শোনাও হে! বেহুলা কই? আসেনি?

বাউরির ছেলে অমূল্য একটু কেসে এক কানের পিছনে হাত রেখে গেয়ে ওঠে :

একো মাসো দুয়ো রে মাসো
তিনো মাসো যায় রে সোনার কমলা।।
জলে ভেইস্যে যায় রে সোনার কমলা।।
ও কী, জলে ভেইস্যে যায় রে।
সোনার কমলা।।'

সত্যি বড় মিঠে গলা। সুরে আদিম আবেগ আছে একটা। দুয়েকজন বাবুর ফোক সঙের বাতিক আছে। তাঁরা অভিভূত হন। একজন বলেন—'আমাগো পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরাও এগুলি গাইত। আর গাজীর গানও ছিল। তহন আমরা সব পোলাপান! এক্কেরে এইটুকখানি!'

সমাজশিক্ষা সংগঠক বলেন—'রিয়েলি, আমার ধারণাও ছিল না এসব। মুসলমানরাও বেহুলা-কেষ্টযাত্রা করে? মাই গুডনেস্‌। শরৎ চাটুয্যের ওই এক গহর ছিল। ভাবতুম, নিছক গুল! অথচ...ভাবা যায় না!'

মাদারহাটির বেহুলা দলটি মুখ তাকাতাকি করে। ছ'মাইল জলকাদার মাঠ ভেঙে এসেছে। সময়টা হেমন্ত। রোদ এখনও কড়া। দরদর করে ঘাম ঝরায়। সবুজ মাঠ এবার পলির রঙে হলুদ। পচা ধানপাতায় কটু গন্ধ ছড়াচ্ছে। গাঁয়ে ফিরে এক দফা কটু-কাব্য শুনতে হবে বুড়োদের। আর কিছু বলার কথা ছিল না? সাজ কেনার সাহায্য চাইতে গেলে এই দুঃসময়ে? ঘরে-ঘরে মুখ চুন, খড়িপড়া চেহারা, রিলিফের পথ চেয়ে উসখুস করছে প্রতীক্ষায়। আর এই দুঃসময়ে কিনা বেউলো দলের সাজ ভেসে গেছে, সাহায্য চাই? লক্ষ্মীনারায়ণপুরের মনিরুদ্দি মাস্টার কেষ্টযাত্রার সাজ সাহায্য পেয়েছে, ভাল কথা। সেখানে তো বানবন্যা হয়নি। ডাঙা দেশ। শুখা-খরা নেই। ক্যানেলের জলে চাষ হয়। তাই বলে ডুবো দেশ মাদারহাটর তো এ শখ মানায় না—

তবে সে জন্যে এদের মুখ তাকাতাকি নয়। সার যে গহরের নাম করলেন, তাই শুনে। তার সঙ্গে চাটুয্যেও বললেন। এতেই সব প্রাঞ্জল হয়েছে। নতুন গাঁর গহর আলি পাক্কা ছাড়াদার অর্থাৎ কবিয়াল। তার গুরু চাটুয্যে বটেন, তবে শরৎচন্দ্র নন— পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণবাবু এখন বুড়োমানুষ। তার ওপর সেবার গাজনে নিজের

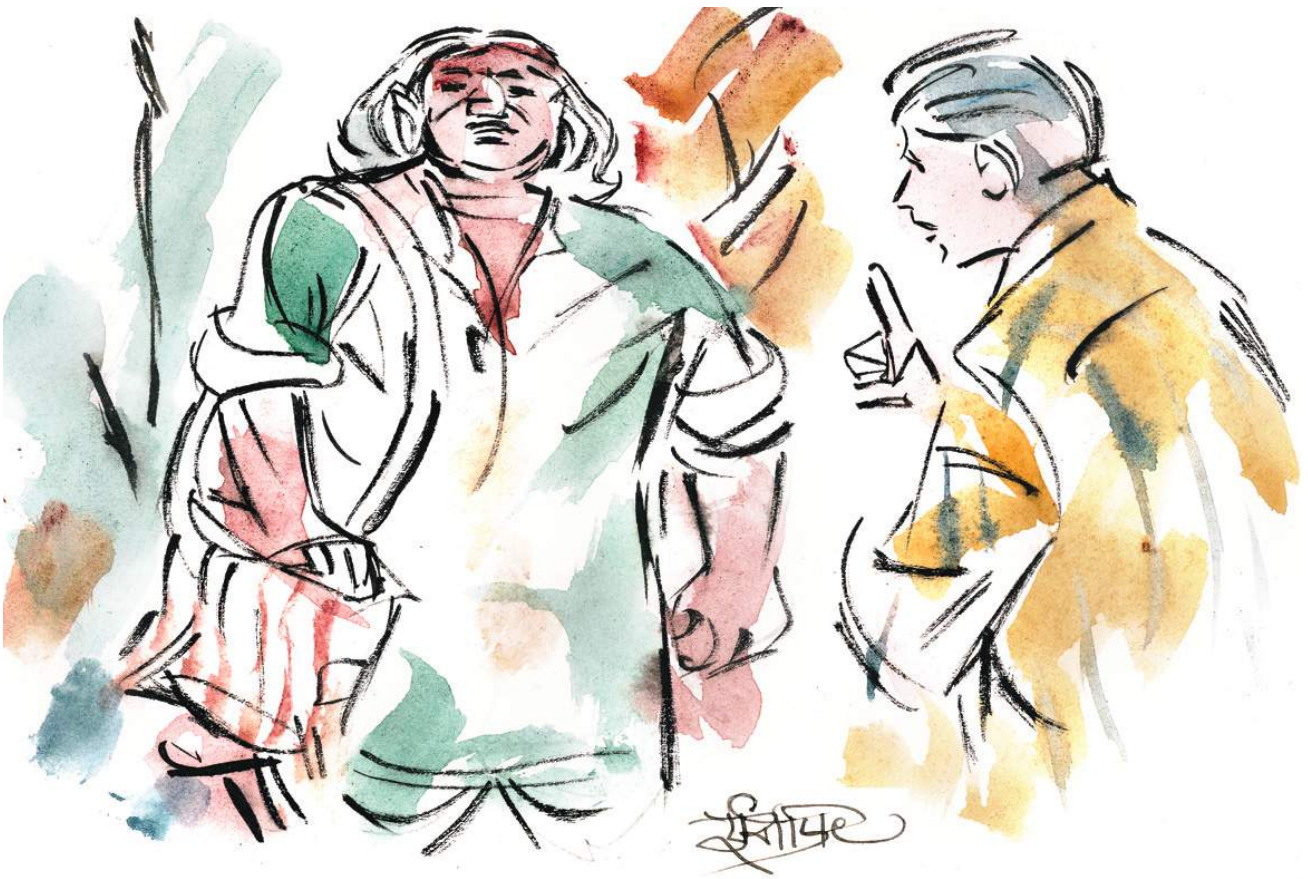

বেহাইয়ের নামে (কেলেঙ্কারির) সঙের গান বেঁধে জামাই চটান এবং মেয়ের দুর্ভোগ বাধিয়ে বসেন। শেষ অবদি মেয়ের মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই শেষ। ওদিকে গহরের রবরবা বেড়ে যায়। সেই গহরেরও এবার বরাত মন্দ। নতুন গাঁ ডুবেছে। গহর বুক চাপড়ে কেঁদেছে। সদ্য কিনে আনা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানাও সর্বনাশা দ্বারকা ভাসিয়ে নিল! রামায়ণ-মহাভারত গেল যাক। ওস্তাদ চাটুয্যে বলেছেন— আমাদের— আমারগুলো নিয়ে যেও। পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, প্রভাসখণ্ড চেয়েচিন্তে ক'দিন ধারে জোগাড় করেছে রমজান দোকানির কাছে। দোকানির কারবার নুনতেলের। যৌবনে শখ ছিল ছড়াদার হবে। হতে পারেনি। কিন্তু শাস্ত্র-পুরাণতত্ত্বে মহাধুরন্ধর সে। বড় বড় কবির আসরে প্রখ্যাত কবিয়ালদেরও আসর থেকে উঠে আচমকা এমন প্রশ্নে করে, ঘোল খাইয়ে ছাড়ে। এদিকে সন্ধার নমাজের আজান শুনলে মাথায় টুপি দিয়ে মসজিদে যায়। তার তিন ছেলেও এ সব তত্ত্বে বিশারদ। বোলানের দল করেছে। তারা আসরে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চায়। পালটা কাবু হলে বাপের কাছে দৌড়ে আসে।... হ্যাঁ গো, কুশঘাসের জন্ম কিসে বলে দাও তো শিগগিরি? রমজান হেসে বলে—বরাহ অবতারের তিন গাছা লোম তুলে রেখেছিলেন মহামুনি বাল্মীকি। তাই থেকে কুশ। তবে পাল্লাদারকে শুধোস তো বাবা, আদিতে যখন নিরাকার, তখন ভগবান ভাসলেন বটপত্রে। বটগাছ নিরাকার ব্রহ্মাণ্ডে তাহলে এল কোত্থেকে? এমনি সব পৌরাণিক রহস্যের জগতে বাস তাদের। একখানা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বন্যায় ভেসে গেলে একটা রহস্যময় ভূভাগ হারিয়ে গেল সামনে থেকে। সবে সৃষ্টি বর্ণনাটা পড়া হয়েছিল গহরের। এই দুঃসময়ে দশটা টাকা পাবে কোথায়?

তল্লাটে একখানা আছে বটে, তার খোঁজ গহর রাখে। ...গুনুটির মুকুন্দ রাজবংশীর। একবার মেডেল আর কলা আসরে ঝুলিয়ে কবির লড়াই চলেছে ঈশানপুরের মেলায়। বিপক্ষে কবিয়াল প্রশ্ন করেছে, ব্রহ্মার কন্যার নাম কী? জবাব জানে না গহর। রসিক শ্রোতা মুকুন্দ আসরেই বসে ছিল। বলেছিল— নামটা আম্মো জানি। পেটে আসছে, মুখে আসছে না। ঘরে শাস্তর আছে আমার! না বলতে পারলে কলা পাবে গহর। কাকুতি মিনতি করে মুকুন্দকে রাজি করাল। দু'জনে চুপিচুপি শেষ রাতে জলকাদা ভেঙে গুনুটি গেল। লম্ফ জ্বেলে নামটা খুঁজল। হুঁ সন্ধ্যা। দু'জনে আসরে ফিরল আবার। গহর সেবার

মেডেল পেয়েছিল। সেই থেকে দু'জনে বড় ভাব। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুকুন্দ প্রাণ গেলেও বই হাতছাড়া করবে না।

এসব খবর কিছু গোপন থাকে না তল্লাটে। গাইয়ে-বাজিয়েদের কাজ মানুষ নিয়ে, মানুষের সঙ্গে। আবেগবান হৃদয়। সহজেই সব গলগল করে উগরে দেয়, সমস্যা বা সুখ-দুঃখ। কে না জানে সর্বনাশা বানের পর গহর হাহাকার করে বলে বেড়াচ্ছে, আমার মাগ ছেলে ভেসে গেল না কেন? আমি ভাসলাম না কেন? হায় রে হায়, আমার বুকের নিধি ভেসে গেল...

তাহলে কি সরকার বাহাদুরের দয়া হয়েছে হতভাগা ছড়াদারের প্রতি? মাদারহাটির সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা মুখ তাকাতাকি করে। খুশি হয়। আশা জাগে। মতি চৌকিদার বলে— 'গহর টাকা পেল, সার?'

শুনেই অফিসার হো হো করে হাসেন। এত জোরে হাসেন! দলসুদ্ধ চোখে পলক পড়ে না। ও হাসি কিসের বোঝে না তারা। একটু পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তিনি বলেন— 'গহরকে চেনো?'

মতি বলে—'চিনি সার। লতুন গাঁর। উঠতি কবেল। ভাল গায়।'

অতি গম্ভীর অফিসার মাথা দুলিয়ে বলেন— 'সে গহর নয়। যাক গে, শোন। এখন তো ফ্লাড রিলিফের সময়। এখন কালচারাল ব্যাপারে টাকা-পয়সা দেওয়া আপাতত বন্ধ। কয়েক মাস যাক। এসো। দেখব'খন।

সকাতরে মইলোবাস বলে— 'সামনে মাসে লবান্ন হবে সার। তখন বায়না পাব। কী নিয়ে গান করব?'

—'নবান্ন?' উনি একটু হাসেন আবার। 'ধান তো পচে গেছে। নবান্ন কিসের?'

গতিক বুঝে মতি ব্যাখ্যা করে— 'ডুবো দেশে বান হয়েছে। কিন্তু ডাঙা দেশে তো ধান হয়েছে সার। সেখানে লবান্ন হবে। মাদারহাটির বেউল না শুনে লবান্ন হবেই না। খুব নামকরা দল। অঞ্চলে পেধান...'

অফিসারটি ঘড়ি দেখে বিরক্ত হল এবার। —'যারা বায়না দেবে তাদেরই বলো গে না বাবা! আপাতত কোনও উপায় নেই। আচ্ছা, তোমরা এস। আমি বেরোব...'

সামনে অঘ্রান। এবার অঘ্রানে ডাঙাদেশ অর্থাৎ উঁচু মাটির এলাকায় শুভদিন বেছে-বেছে নবান্ন উৎসব হবে গাঁয়ে-গাঁয়ে। হিন্দু-মুসলমান সবারই উৎসব। মুসলমানরা জামাই আনবে। কত খাওয়া-দাওয়া হবে। হবে না শুধু মাদারহাটি—নতুন গাঁ—ন'পাড়া—রামেশ্বপুর এলাকায় বানভাসা গাঁগুলোতে। পচা ধানের কটু গন্ধে বাতাস ভরা এখানে। বাবুরা লঙ্গরখানা খুলেছেন ইতিমধ্যে অনেক জায়গায়। টেস্ট রিলিফের কাজও চলছে অল্পস্বল্প। মাদারহাটির কাদা এখনও শুকোয়নি। ধসে যাওয়া ঘরের উঠোনে অনেক পরিবার খয়রাতি তেরপলের তলায় বাস করছে। কিছু জোতজমিওলা গেরস্থর উঁচু ভিটের বাড়ি এখনও টিকে আছে। বেউলো দলের দু'চারজনেরও দৈবাৎ টিকেছে। ঘর গেছে স্বয়ং চাঁদ সদাগরের। তার ঘরেই ছিল সাজের বাক্স। গাঁয়ের শেষে ঢালু জমিতে তার বাড়ি। নিশুতি রাতে আচমকা বিলের জল হু হু করে এসে ধাক্কা মেরেছিল। কোনমতে বউ আর চার-পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চাকে জানে বাঁচাতে পেরেছিল। তার প্রায় সবই ভেসে গিয়েছে। কিন্তু গতর আছে যখন, সব করে নেবে। আবার ঘর বানাতে পারবে। জমিতে চৈতালি ফলাতে পারবে। তাই সে নিয়ে ভাবনা নেই— ভাবনা সাজ ভেসে গিয়েছে। দেড়-দুশো টাকার কমে এ বাজারে পুরো সাজ হবে না। কিছুটা চাঁদায়, কিছুটা কয়েক আসরের বায়নার টাকা জমিয়ে আগের বছর নতুন সাজ কেনা হয়েছিল। হারমোনিয়াম তবলা ঢোল কত্তালগুলি ভাগ্যিস ছিল আকাশ আলির বাড়ি। উঁচু ভিটে তাদের। সামনের খামার বা উঠোনটাও উঁচু। সেখানে বৃষ্টিহীন রাতে 'রিহাস্যাল' চলে। তাই ও বাড়ি ছিল যন্তরগুলো। যদি সাজের বাক্সটাও রাখা হত সেখানে, এই বিপদ ঘটত ন। তবে এখন আর পস্তে কী হবে?

বিনিসাজে গাইতে গেলে কেউ শুনবেই না পালা। কেন শুনবে? নগদ পাঁচ টাকা বায়না, তিন ধামা মুড়ি, আধ টিন গুড়— তার উপর বিড়িও আছে। দূরের গাঁ হলে তো ডাল ভাতও খাওয়াতে হয়। এত সব খরচ করে লোকে সাজের ঝলমলানি দেখবে না? তা ছাড়া তলোয়ার? হায় হায়! ও দুটোও বাক্সের মধ্যে ভরা ছিল! মুকুট ছিল। ঝকমকে ত্রিশূল ছিল। বল্লম ছিল। পুঁতির মালা ছিল। হা বাবা আল্লা ভগবান! এর চেয়ে চাঁদ সদাগরকে ভাসিয়ে নিলি না ক্যানে?

মাঠের পথে দলটা গাঁয়ে ফিরে চলেছে। হতাশ, ক্লান্ত, চুপচাপ। মইলোবাস মাথাটা ঝুলিয়ে হাঁটছে সবার পিছনে। তার মনে অপরাধবোধ প্রচণ্ড। তার ঘরেই তো সাজের বাক্স ছিল। এখন ব্যর্থ দরবারের পর সেই অপরাধবোধ আরও তীব্র হচ্ছে। চাঁদ সদাগর সে। তার আত্মীয় দাঁড়িয়ে আছে এক অহঙ্কারি উদ্ধত বিশাল পুরুষ—ক্রমশ দিনে দিনে সে তাকে দেখতে পেয়েছে। আসরে জনমণ্ডলীর সামনে যখন সেই ভিতরের পুরুষ পা ফেলে হাঁটে— সাজঘর থেকে আসরে, তার মনে হয় কাকেও পরোয়া করার নেই। গায়ে সাজ চড়ালে দফাদার কনস্টেবল দারোগা এস-ডি-ও ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাবৎ সরকারি ব্যক্তি ও ক্ষমতাকে সে গ্রাহ্যই করবে না! আর তখন সে তো এ যুগের মানুষ নয়! তখন তার সাত ছেলে সাত-সাতটা বাণিজ্যতরী নিয়ে সমুদ্দুরে চলেছে। তরী ডুবে যাওয়ার খবর দিয়েছে বিবেক। তো কিসের পরোয়া? জয় শম্ভো জয় শম্ভো! চ্যাংমুড়ি কানীকে পুজো করবে তাই বলে? হাতের হিন্তাল যষ্টি নাড়া দিয়ে গর্জন করেছে সে। তার ঠোঁটে ঘৃণা, চোখে ঘৃণা। হুঁ, এখন বাবুই হও, লাট বেলাইট হত—তফাত যাও। চাঁদ সদাগর জানে শুধু একজনকে। তিনি শম্ভু—শিব। দেবাদিদের মহাদেব। এই ভাই বইয়াল! আস্তে। পাঠ মুখস্থ আছে। গায়ে সাজ চড়ালেই সব মুখের ডগায় ভেসে আসে। সাজ চড়ালেই তাকে 'সে' এসে ভর করে— যে মাথা নোয়াতে জানে না। সাজ চড়িয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পায় কঠিনতম লোহার বাসরঘর— দেয়াল ঘুরে হিন্তাল কাঠ কাঁধে নিয়ে পাহারা দেয়। হায়, সেই ঘরে ছিদ্র ছিল। সোনার নখাই নীলবর্ণ হল। চাঁদ সদাগরের মাথা ঝুলে পড়ে।— 'আঃ আঃ আহা হা!'

—'কী হল হে মইলোবাস? পাঠ বুলো নাকি?

মতি চৌকিদার পিছন ঘুরে বলে। কেউ কেউ হাসে। মইলোবাস বলে, 'না।'

—'কী বুলছ মনে হল?'

—'হুঁ', একটা কথা ভাই চৌকিদার।'

—'বুলো।'

এখন নিজেদের ভাষায় কথা বলছে ওরা। ও তো বাবু ভদ্রজনের সঙ্গে কথা বলা নয়, আপিস-কাছারিও নয়। এখন মাতৃভাষায় না বললে সুখ নেই। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মতি আবার বলে—'বুলো হে কথাটা!'

—'যদি সাজের বাকসোটা আকাশের ঘরেই থাকত!'

মতি ভর্ৎসনা করে— আবার উই কথা? সেই এক কথা?'

—'ই দুঃখুটা মলেও যাবে না ভাই!'

—'আবার কিনব! ভগবান মুখ তুলে তাকাক।'

চুপ করে যায় বিশালদেহী মানুষটা। আবার ভেসে ওঠে কিছু প্রতিচ্ছবি—শামিয়ানার তলায় হ্যাসাগের শনশন শব্দ ভাসে, চারপাশে মুগ্ধ শ্রোতা, চারু মাস্টারের বেহালা বাজে করুণ সুরে। আর সাজঘর থেকে ঝলমল লাল পোশাকে হিন্তালের লাঠি নেড়ে এগিয়ে আসে চাঁদ সদাগর। কী তার রূপ! মুহূর্তে আসর চুপ। কেঁদে ওঠা বাচ্চার মুখে মায়ের থাবা পড়ে। জয় শম্ভো! জয় শম্ভো! যেন আকাশে মেঘ ডাকে— 'সাজের বাকসোটা!'

—'আবার? তুমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে মইলোবাস। সাবোধান।'

আবার চুপ। ক্রমশ মাঠ ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে নাবাল অঞ্চলের দিকে। দেখতে দেখতে সূর্যও ডুবেছে। ধূসর আলোয় দূরের গ্রাম কালো হয়ে আসছে। ধানপচার গন্ধ, পলির গন্ধ, মরা জানোয়ারের হাড়গোড়ের গন্ধ। নাক ঢেকে দলটা চুপচাপ চলতে থাকে। সবার পিছনে মইলোবাস।

এবং একটু পরেই— 'আঃ আহা হা হা!'

মতি একবার ঘোরে। কিন্তু কিছু বলে না। কী বলবে? হাহাকার তো তার বুকেও কম জমে নেই। ডাঙাদেশে নবান্নের মরশুম এবার তাদের ফাঁকা যাবে। অন্য দল এসে গাইবে। তারা হবে শ্রোতা। গভীর ঈর্ষায় চনমন করবে। ফটিকচাঁদ কুমোর তার মতো করুক না, কে করে! তার মতো হনুমান সাজুক না, কে সাজে!

আবার পিছনে ডুকরে ওঠা চাপা আক্ষেপ—আঃ হা হা হা!

মতি চৌকিদার অফিসারকে বলছিল—এখন শরীরে ব্যামো। ভিতরটা ঝাঁঝরা। ঝাঁঝরাই বটে। সাত বছর ধরে মইলোবাস চাঁদ সদাগরের পার্ট করে আসছে। এ সাত বছর সে মালামো লড়েনি। সাত বছর আগের জ্যৈষ্ঠে তার শেষ লড়াই হয়েছে গঙ্গার পূর্বপারের প্রখ্যাত কুস্তিগির মোহিনীবাবুর সঙ্গে। কী সব মারাত্মক প্যাঁচ জানত মোহিনীবাবু! এমনভাবে ফেলে দিল যে তারপর বাড়ি ফিরে থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠে। প্রথমটা গ্রাহ্য করেনি। পরে বুকে ব্যথা বাড়লে ডাক্তার দেখিয়েছিল। বুকের ছবি তুলতে হয়েছিল। পাঁজরের একটা কাঠি ভেঙে গিয়েছে। সেই ভাঙা পাঁজর নিয়ে সে সাত বছর কাটাচ্ছে। কলজেতেও একটু দাগ পড়েছে। এখনও গতর খাটাতে মাঝে মাঝে টাটানি টের পায়। বোঝা তুলতে কষ্ট হয়। জোরে চেঁচাতে গিয়েও দম আটকায়।

অথচ যেদিন থেকে চাঁদ সদাগরের সাজ গায়ে চড়াল, যেন ভাঙা ঝাঁঝরা শরীলের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক বিশাল শক্তিধর পুরুষ। যতক্ষণ সাজ গায়ে থাকে, ততক্ষণ সে সেই বীর্যবান দুর্ধর্ষ পুরুষ। মেঘের মতো হাঁকলেও দম আটায় না। আসরে দেবী মনসার সামনে ভাঙা পাঁজরে হাতের থাপ্পড় মেরে সগর্জনে বলে—'সাতটা পুত্রসন্তান আমার, সাতখানি বকখের পাঁজর। ভাঙবি তো ভাঙ রে বুড়ি চ্যাংমুড়ি, তবু কভু ভুরুক্ষেপ নাই'! সামনের মাটিতে জোরে লাথি মারে সে। টেরই পায় না কলজেটা চড়াৎ করে ওঠে কিনা। কিন্তু আসরের পর দিনে মাঠের জমিতে হাল বাইবার সময় হঠাৎ খামচানি ব্যথা বুকের মধ্যিখানে—হাত চেপে সে বলদ ডাকায়—ইররর্‌র্‌ হেট হেট।

সেই ব্যথাটা এতক্ষণে অন্ধকার মাঠে জেগে উঠেছে। মইলোবাস ককিয়ে উঠছে পাঁজরে হাত চেপে— 'আঃ হা হা হা!'

মতি ভাবছে সাজের বাকসোর দুঃখে ককাচ্ছে লোকটা, বাহাসতুল্লাও তাই ভাবছে। আকাশ আলি, নারায়ণবাবু—আর সবাই। জলকাদায় পা ফেলার শব্দ উঠছে। চারদিকে জোনাকি উড়ছে, দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। খালে এক কোমর জল। একে-একে পার হয়ে যায় সবাই। ওপারে বাঁধ। জায়গায়-জায়গায় ধসে গিয়েছে। আর মোটে এক মাইল দূরে গাঁ। বাঁধে উঠে মতি চৌকিদার বলে—'এস, বিড়ি খেয়ে লিই।' দেশলাই জ্বালে কেউ কেউ। বিড়ি ধরায়। বৈয়াল বলে— 'চাঁদ সদাগর! বিড়ি লাও হে।'

মতিও ডাকে— 'কই হে নখাইয়ের বাপ! ধুঁয়োমুখ করো!'

আকাশ ভরা নক্ষত্রপুঞ্জ এই হেমন্তের রাতে। বাঁধের উপর শুকনো মাটিতে বসে পড়েছে সবাই। নক্ষত্র দেখতে দেখতে বিড়ি টানছে। পাশে জুতো রেখেছে। কাপড় উরুর উপর গোঁজা—যা জলকাদা! নিচে ঘন পাটবন। বন্যায় গলা অবদি ডুবেছিল। অন্ধকার পাটবনের উপর জোনাকির আলো। আকাশ আলি দেখতে দেখতে ডাকে— 'পিতাঠাকুর, উই দ্যাখো তুমার সাজ!' আবার মুখ তুলে আকাশ দেখে আকাশ আলি বা লখিন্দর হাসতে হাসতে ডাকে— 'পিতাঠাকুর হে! পরবে নাকি উই সাজ? নকশাখানা দেখ!'

রসিক মতি রসিকতায় সাড়া দিয়ে বলে—'তুমার পিতাঠাকুরের নাল রং পছন্দ। সেবারে খাগড়ার বাজারে সাহাবাবুর সাজের দোকানে আমার পছন্দ হল একখানা জামা। ওইরকম কালোর উপরে সোনালি কাজ করা। বুইলে? খাঁটি বেলবেট। আমি বুললাম—দাম? তো পঞ্চাশ টাকা। তো বুললাম, মইলোবাস, টাকা থাকলেই সাজটাই লিতাম। তুমাকে যা মানাত! হুঁ! ঘাড় নেড়ে বুললে—আমার নাল রং পছন্দ!'

বৈয়াল বলে—'পালোয়ান। লাল রঙেরই ভক্ত!'

আকাশ ফের ডাকে—'কই বাপ পিতাঠাকুর, নখাই এত ডাকছে, কথা বুলো না ক্যানে?'

তারপর খোঁজ পড়ে যায়। সবাই ডাকাডাকি করে। দলে তো নেই, কখন পিছিয়ে পড়েছে দেখ দিকি! মতি চেঁচিয়ে ডাকে—'মইলোবাস হে! হেই—ই—ই...'

অন্ধকারে স্যাঁতসেঁতে জলকাদার পৃথিবীতে ডাকটা কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায়। ওই পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে কোথায় একা থেকে গেল এক অভিমানী ক্ষুব্ধ সাজহীন বিশাল মানুষ?

ফটিক কুম্ভকার, নখাই আর বৈয়াল খালের জলে নামে। পাড়ে উঠে তিনজনে একগলায় ডাকে—'হেই-ই-ই-ই...'

আলের পথে পা বাড়াতেই ঠোক্কর খেয়ে মতি পড়ে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে—'মইলোবাস! ও মইলোবাস! পড়ে আছ ক্যানে ভাই? কী হল তুমার? কী হয়েছে?'

নখাই দেশলাই জ্বালে। মুখের উপর। ঠোঁটের দু'পাশে রক্ত নিয়ে হাঁফাচ্ছে বিশাল সেই পুরুষ— নাকি বিশাল সেই পুরুষের খড়মাটির টাট—সাজহীন। অনেক কষ্টে বলে—'পা পিছলে পড়েছিলাম।... আমি বাঁচব না হে...বাঁচব না!'

মতি কেঁদেকেটে বলে—'রেতের বেলা জলকাদার রাস্তায় অমন করে হাঁটে ভাই? বুয়েছি, বুয়েছি! উই কথাটাই তুমাকে খেলে হে! উই ভাবনাটাই তুমার বিনেশ কল্লে! আঃ হা হা।

তিনজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে চলে চাঁদ সদাগরকে। পাঁজরভাঙা, কলজেয় দাগধরা শরীর থেকে গভীরতর দুঃখের মতো রক্ত গড়ায় কষ বেয়ে। এবার প্রকৃতি নিজের হাতে তাকে শেষবার লাল পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন। তবু সে বিড়বিড় করে বার বার—'সাজের বাকসোটা ভেসে গেল হে! সাজের বাকসোটা...'

লেখক পুত্র অভিজিৎ সিরাজের সৌজন্যে প্রাপ্ত

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

গল্প

কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়



এখানে সবুজ ঘাস বিছিয়ে রয়েছে এক অন্তহীন কার্পেটের মতো
এখানে মাদার তার শতবাহু ঊর্ধ্বে তুলে ডাক দেয়, এসো এসো, এসো হে পথিক
এখানে কৃষ্ণচূড়া পাপড়ি বিছিয়ে রেখে অভ্যর্থনা জানাবে তোমাকে
এখানে সেগুন তার মঞ্জরী মেলে ধরে আপ্যায়নে সদাই প্রস্তুত
আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে শুধু লেখা হয় সবুজের রূপকথাগুলি—

ঘন সবুজের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছিল কজ্জল আর মনে মনে ভাঁজছিল পরবর্তী কবিতার কয়েকটা পঙক্তি। লালতাকুঁড়ি এক সবুজের দেশ। যেদিকে দু-চোখ যায় যায় কজ্জল নজর ন্যস্ত করে দেখে শিমুল-পাকুড়-পলাশ-জিওল-সপ্তপর্ণী-শমীর এক বিস্তৃত সহাবস্থান। গাঁ-দেশে এমন সবুজ তো থাকেই, কিন্তু লালতাকুঁড়িতে এমন আশ্চর্য সেই সবুজের ঢেলখেল যে, পথ দিয়ে হাঁটার সময় মনে হয় একটা গুহার ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। দু'পাশে অজস্র সবুজ শুধু নয়, সেই সবুজ তার নুয়ে পড়া সবুজ ডালপালা আর পাতালতা নিয়ে মাথার উপরে সৃষ্টি করেছে আর্চের মতো। এতটাই ঘন সবুজ যে, মধ্য গগনের সূর্যেরও প্রবেশাধিকার ছিল না সেই পথে। গ্রীষ্মে পথ চলাও ছিল আশ্চর্য আরামের।

সেই লালতাকুঁড়ি গাঁয়ে একদিন শোনা গেল সভ্যতা বাহাদুর আসবেন শকটের ধোঁয়া উড়িয়ে। বিষয়টি নিয়ে ঘোর বলাবলি হচ্ছে গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে। দু-কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে ট্রেন ধরতে হয় কজ্জলকে, যাওয়ার পথে দেখল ছোট ছোট জটলা, জটলারা ব্যস্ত আলোচনায়।

কজ্জল ব্যস্ত হল না, থামল না, গুহার মতো পথ ধরে যেতে থাকে স্টেশন অভিমুখে। কিন্তু মধ্যপথে গিয়ে সহসা চমকে দেখল একটি লাশ পড়ে আছে পথের পাশে, তার কোঁকড়ানো সবুজ চুলে শুকনো হওয়ার প্রস্তুতি। সে এক মুহূর্ত থামল, নিরিখ করল লাশটি, তারপর চলতে শুরু করল আবার। কিছু পরে দেখল আবার একটি লাশ পড়ে আছে একইভাবে। নিস্পন্দ, প্রাণহীন। সেই দৃশ্য নিয়ে বলাবলি হল লালতাকুঁড়ি গাঁয়ে। বলাবলি চলতেই থাকল।

পরের দিন আবার দুটো লাশ আবিষ্কৃত হল একইভাবে। লালতাকুঁড়ি গাঁয়ে বাড়তে লাগল সেই আলোচনা। সভ্যতা প্রবেশ করবেন গাঁয়ে। রাস্তা চওড়া করতে দু'পাশেও নয়, মাথার উপরেও আর সবুজ থাকবে না।

কজ্জলের সদ্য বিয়ে করা বউ কবিতা প্রায়ই সন্ধের পর হেঁটে যায় স্টেশনের রাস্তায়। কবিতার মুখখানা এতই সুন্দর যে দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা ভোরের রোদে-হলুদ রঙের ডালিয়া ফুটে আছে পাপড়ি মেলে। কজ্জল ট্রেন থেকে নেমে আসার সময় কবিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় পথে, দু'জনে গল্প করতে করতে ফেরে বাড়ির দিকে। সেদিনও দেখা হল যখন একটা-দুটো করে নক্ষত্র ফুটেছে আকাশে। অন্যদিন থাকে কবিতার ঠোঁটে উচ্ছ্বাস, আজ এত-এত নক্ষত্রও আলো ফোটাতে পারেনি। কজ্জল বলল, কী হল কবিতার ছন্দে যেন বিচ্যুতি!

কবিতা বলল, চারপাশে এত-এত লাশ, গাঁয়ের কেউ কিছু বলছে না!

কজ্জল বিব্রত হয়ে বলল, কেউ তো কিছু বলছে না!

যত লাশ বাড়তে থাকে, লালতাকুঁড়ির সবুজে-ঢাকা ছায়া-ছায়া পথে হঠাৎ খুব দ্রুত আবির্ভাব ঘটতে লাগল চড়া রোদ্দুরের। মাথার উপরে সবুজ সরে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নীল, কিন্তু সেই নীল যেন ঠিক নীল নয়, আকাশের সেই চাঁদোয়ায় অজস্র কালো কালো বিন্দু। লালতাকুঁড়ির মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে সেই কালো বিন্দুর আবির্ভাব। তারা বলাবলি করে হঠাৎ আকাশটা যেন এমন খুঁতো আর বেরঙা হয়ে যাচ্ছে। কবিতা সেই দৃশ্য দেখে আর বিমর্ষ হয়ে বিড়বিড় করে, কী মুশকিল, লালতাকুঁড়ির আকাশ কেন এমন হল! কী হবে লালতাকুঁড়ির!

কজ্জল রোজ অফিসে যায় আর দেখে প্রতিদিন একটি-দুটি করে লাশ শুয়ে পড়ছে ভাঙা-ইট বিছোনো পথের উপর। আর আকাশটা বড় হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। বড় বড় ট্রাক আসছে, খুব ধোঁয়া উড়োচ্ছে, কালো ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে লালতাকুঁড়ির বাতাস, তাতে ট্রাকগুলোর ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা লাশগুলি তুলে ভরে ফেলছে বড় বড় ট্রাকে, ভারী ট্রাক রওনা হয়ে যাচ্ছে কোনও দূর দেশের পথে।

ঘরে ফিরে কবিতাকে রোজ সেই লাশের গল্প শোনায়, আর তত ম্রিয়মান হয়ে পড়ে কবিতা। বলে, দেখেছ লালতাকুঁড়ি নামটার মধ্যেই একটা ছন্দ ছিল, এখন ক্রমে ছন্দহীন!

পরের দিন কজ্জল অফিস যাওয়ার পথে দেখল বিশাল একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল তেরাস্তার মোড়ে, সারা বছর সবুজ, গ্রীষ্মে লাল, তার কাণ্ড-ডাল-পাতা ছাঁটা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব, পথের উপর ঠিকরে পড়ছে তার টুকরোগুলো, উড়ে বেড়াচ্ছে তার ছিন্ন পাতার রাশি, সন্ধেয় ফেরার পথে দেখল অত বড় লাশটা ঢলে পড়েছে পথের উপর। সবুজ পাতা থেকে যেন রক্ত ঝরছে লাল। লোকে সেই বিশাল লাশ পেরোতে হিমশিম।

পরদিন সকালে নিধন শুরু হয়েছে একটি শিমুলের, সারা বছর সবুজ, বসন্তে লাল। লাল ফুলে ভরে থাকে যার বিশাল সব কাণ্ড, তার ডালপালা ছিন্নভিন্ন হয়ে বিকট শব্দে ঝরে পড়ছে সভ্যতাকে জায়গা করে দিতে। পরদিন আবার একটা বিশাল মাদারের লাশ হওয়ার পালা।

কবিতা সন্ধের পর স্টেশনে যাওয়ার পথে সার সার লাশের ভিতর দিয়ে হেঁটে যায়, আর কী যেন বলতে থাকে একা-একা। সারাদিন বিড়বিড় করতে থাকে পাগলের মতো। কজ্জল প্রায় প্রতিদিনই দেখতে পায় কবিতা এক-একটি গাছ আঁকড়ে ধরে বসে আছে পরম মমতায়। যেন প্রতিটি গাছই তার সন্তান, তাদের প্রত্যেককে মায়ের মমতায় বিদায় দিচ্ছে লালতাকুঁড়ি থেকে।

বাড়ি ফিরে কবিতা দিনদিন আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছে অগণিত মহিরুহের নিধন দৃশ্যে। তার বুকের আঁচল খসে পড়ে লুটোচ্ছে ধুলোয়, তার সারা শরীর ছিন্ন ফুল-পাতায় মাখামাখি।

একদিন কজ্জলকে বলল, কেউ কিছু একটা বলো! গাঁ যে লাশে ভরে গেল!

কজ্জলও বিড়বিড় করে, কে কী বলবে! সভ্যতা যে আসছেন গাঁয়ে!

—কিন্তু সভ্যতা এলে আর কেউ কবিতা লিখতে পারবে না যে!

লালতাকুঁড়ির আকাশ যত বড় আর খুঁতো হয়ে যাচ্ছে, কবিতার পাগল- পাগল ভাব বেড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। এখন তেমন কথাও বলে না কজ্জলের সঙ্গে। আগে অকারণে হেসে উঠত উচ্ছল ভঙ্গিমায়, সেই হাসি তার ঠোঁট থেকে কবে অন্তর্মিত। এত-এত লাশ দেখতে দেখতে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছে কবিতা।

কজ্জল চেষ্টা করে তার চোখে হাসির ঝিলিক ফিরিয়ে আনতে। তার কবিতা পড়েই একদা তার প্রেমে পড়েছিল কবিতা। কবিতা আজও তার কবিতার একনিষ্ঠ পাঠিকা ও ভক্ত, তার স্মৃতি খুবই প্রখর, কজ্জল তার নিজের কবিতা মুখস্থ বলতে পারে না, বই কিংবা ডায়েরি দেখার প্রয়োজন হয়, কিন্তু কবিতা যখন-তখন স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে দিতে পারে কজ্জলের দু-দশটা কবিতা। সেই কবিতা দিয়েই কবিতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চাইল কজ্জল। দেখল কবিতা বিছানায় শুয়ে আছে ছাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে, হঠাৎ তা কাছে গিয়ে বলল, অনেকদিন তোমার মুখে কবিতা শুনিনি।

কবিতা সেরকমই শূন্য দৃষ্টিতে বলল, তুমিও অনেকদিন কোনও কবিতা লেখনি!

— কী করে লিখব! তুমি এরকম গুম হয়ে থাকলে কি আমার কলমে ভর করে কবিতা!

কবিতা তেমনই শুয়ে থাকে নিরুত্তাপ। তার চোখে যেন অচেনার চাউনি।

— জানো, সেদিন 'বিন্দুবিসর্গ' পত্রিকা থেকে আমাকে একগুচ্ছ কবিতা পাঠাতে লিখেছে?

— তাই! শুনেও কবিতার কণ্ঠে কোনও উচ্ছ্বাস নেই! অথচ ক-দিন আগে হলেও হই হই করে বলত, শিগগির লিখে ফ্যালো। এবার তোমার কবিতায় যেন পলাশ-শিমুল থাকে। দেখেছ লালতাকুঁড়িতে এবার ফুলের মহাউৎসব!

বলল না, বলবেই বা কী করে, কতগুলো পলাশ আর শিমুল কাটা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

কজ্জল মস্করা করার চেষ্টা করে, বুঝলে, একটা লাইন এমন ভেবেছি, 'আকাশে উঠেছে এক বিন্দুহীন চন্দ্রবিন্দু'। বলো কেমন হয়েছে। চাঁদের চিত্রকল্প হিসেবে 'বিন্দুহীন চন্দ্রবিন্দু' কেমন?

কবিতা নিরুত্তর, যেন কজ্জলের এমন একটি লাগসই উপমাও তার চেতনায় স্পর্শমাত্র করেনি।

কজ্জল একবার শেষ চেষ্টা করে, বলো কবিতা, কতদিন কবিতা লিখিনি, তুমি আগে কত উসকাতে আমাকে, বলতে, 'কী হল, কবিতা লিখছ না অনেকদিন। কবিতা না-লিখলে তো তুমি মনমরা হয়ে থাকবে। লেখো নতুন কবিতা।' বলতে, 'রোজ কবিতা লিখতে হয়, রোজ না লিখলে সোনার কলমেও মরচে ধরে। বলতে না?'

কবিতার চোখ তেমনই ছাদ বিদ্ধ করতে থাকে এক অপার ঔদাসীন্যে।

কজ্জল প্রতিদিন মন খারাপ করে অফিসে যায়। সারাদিন এক ঘোর বিষণ্ণতা ঘিরে থাকে তাকে। আগে ট্রেনে যাতায়াতের পথে তার ভিতরে গুনগুন করত নানা কবিতার পঙক্তি, তার কবিতায় উপচে পড়ত লালতাকুঁড়ির সবুজ ঐশ্বর্য, তার গাছ-লতা-পাতার কথা, তার অজস্র ফুলের কাহিনি। কিন্তু লাশ ডিঙোনোর দিন শুরু হওয়ার পর থেকে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল তার কলমের ডগায় আর এক পঙক্তি কবিতাও আসছে না। কবিতা না-লিখলে তার ফুল-ফোটা বউ পাপড়ি গুটিয়ে শোক-শোক মুখ করে থাকবে।

কজ্জল বহু এলোমেলো দীর্ঘ ভাবনার পরে সিদ্ধান্ত নিল একদা কবিতা লিখেই জয় করেছিল কবিতার মন। এখন আবার নতুন নতুন কবিতা লিখে কবিতাকে নিয়ে আসবে সমে।

বাড়িতে বসে তার কবিতা লেখার ডায়েরি খুলে বহুক্ষণ কলমের ডগা কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল, অজস্র কাটাকুটি করল, এক-একটা পঙক্তি লেখে আর কাটে, কিছুতেই পছন্দ হয় না তার। একসময় তার ডায়েরির খাতা বন্ধ করে দেয়, চুপ করে বসে থাকে তার লেখার টেবিলে।

কবিতা কখনও তার লেখার টেবিলের কাছে আসে, তার কাটাকুটির দৃশ্য দেখে, তার কলম হাতে নিয়ে বসে থাকার অসহায়তা দেখে, মুখে কিছুই বলে না।

কজ্জলের মাঝেমধ্যে অভিমান হয় রচনার এই নৈর্ব্যাক্তিক হাবভাব দেখে। কী আশ্চর্য, যে কবিতা তার কবিতা এত ভালবাসত, তার কবিতার পঙক্তি তার মুখে-মুখে ঘুরত, এখন একটি কথাও বলে না! বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে থাকে কীভাবে ফিরিয়ে আনতে পারবে সমে!

পরদিন সকালে উঠে খুলে বসল তার কবিতার ডায়েরি। গোলাপি রেক্সিনে মলাট দেওয়া তার প্রিয় ডায়েরি, যার প্রথম পৃষ্ঠায় কবিতা খুব যত্ন করে কজ্জলের নাম লিখে দিয়েছিল মুক্তাক্ষরে। তার নিচে লিখেছিল, কবির কলমকে উসকে দিতে এই ডায়েরি।

সেই ডায়েরিতে ভরে উঠেছিল একটির পর একটি কবিতা। তারপর কতদিন ধরে তাতে পূর্ণ হয়ে ছিল ডাহা শূন্যতা। আবার সেই ডায়েরি খুলে বসে কবিতা লেখার চেষ্টা করছে কজ্জল। একটি ভাল কবিতা লিখলেই সে পড়ে শোনাবে কবিতাকে।

কবিতা মনমরা হয়ে ঘুরছে ফিরছে তার দাঁড়াচ্ছে কজ্জলের পিছনে। কজ্জল টেবিলে ঝুঁকে পড়ে লিখছে ডায়েরিতে, কী লিখছে তা পড়ার চেষ্টা করছে।

কয়েকদিন পরেই কবিতা আবিষ্কার করেছিল কজ্জলের ডায়েরিতে লেখা কিছু অসংলগ্ন পঙক্তি। পড়ে অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বলেছিল, এগুলো কি কবিতা?

কজ্জল বলে, কী জানি কী লিখছি!

— না। এ সব কবিতা নয়। কবিতা উঠে আসবে ভিতর থেকে। তা উচ্চকিত হয়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় নয়। মনে হচ্ছে তোমার মনোসংযোগ হচ্ছে না!

— আমি চেষ্টা করছি, কবিতা। কিন্তু তোমার মন খারাপ থাকলে আমারও মন খারাপ। কী করে কবিতা লেখায় মন দিই বলো?

— তুমি তো বুঝতেই পারছ কেন মন ভাল নেই!

— তা হলে! তোমার মন ভাল থাকা না-থাকার সঙ্গে আমার কবিতা লেখার সম্পর্ক।

— কজ্জল, তুমি তো জানো সভ্যতা এলে ধুলো-ধোঁয়া-কংক্রিটের চাপে কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা আর থাকে না! নগরসভ্যতা ছিনিয়ে নেয় কল্পনার বিশাল জগৎ। কিছুতেই সুস্থির হতে পারছি না!

— তুমি সুস্থির না হলে আমিও বা হই কী করে! কবিতা, তুমিই তো ছিলে আমার কবিতা লেখার প্রেরণা। যতবার কবিতায় নিমগ্ন হতে চাই, কে যেন টেনে ধরে আমার যাবতীয় প্যাশন। আমি আবেগহীন হয়ে পড়ছি দ্রুত। তুমি সমে ফিরে এসো, তা হলেই আমি আবার কবিতা লিখতে পারব।

কবিতা কিছু বলে না।

— কবিতা, সভ্যতা একদিন আসবেই। তাকে ঠেকানো যাবে না। সভ্যতা আসছে বলে তুমি এমন প্রিয়মান থাকলে আমি কী

করব? তুমি আগের মতো সহজ হয়ে ওঠো।

কবিতার সঙ্গে কবিতা নিয়ে এমন কত না কবিতাসকাল কবিতাসন্ধে কাটছে কজ্জলের। ক্রমে কবিতা এখন কজ্জলের যেমন অতীত, কবিতার কাছেও।

কবিতা এখন কবিতার সেই মগ্নতা-স্নিগ্ধতা পেরিয়ে বাস করছে এক অন্য পৃথিবীতে।

কজ্জল তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে মানবজাতির প্রগতির কথা, মানবসভ্যতার অগ্রগতির কথা, সভ্যতা তার নিজের নিয়মে একদিন না একদিন আসবেই, তাকে ঠেকানো অসম্ভব।

কবিতা যেন শুনেও শোনে না। তাকে যেন জাগতিক কোনও বিষয় আর টানছে না। একদিন অনেকটা রাতে তাকে হঠাৎ কে যেন টানতে টানতে নিয়ে গেল ছাদে, তখন কত রাত হবে, বারোটাও হতে পারে, একটাও, কজ্জল ঘুমিয়ে কাদা, রচনা কখন যে মশারি থেকে বেরিয়ে একা একা উঠে গিয়েছিল ছাদে, সে জানতেও পারেনি, কবিতা সেখানে কী দেখেছে সে-ই জানে, আলুথালু হয়ে নেমে এল তাদের ঘরে, তাকে গা ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে বলল, চলো তো উপরে, দেখবে চলো!

কজ্জল ঘুমচোখে, ঘুমের আবুলি কাটিয়ে কবিতার পিছু পিছু উঠে এল ছাদে। হয়তো আজ অমানিশা, কালো আঁধারের চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে গোটা পৃথিবী, দু-একটা অচিন পাখির রাগরাগিণী ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই চরাচরে, ছাদ থেকে যতদূর দেখা যায় শুধু একঢালা অন্ধকার।

— কী হয়েছে বলো?

— দ্যাখো আকাশের দিকে তাকিয়ে!

কজ্জল ঘনান্ধকারে দেখতে থাকে আকাশের গাঢ় শরীর, কিছুই দেখতে পায় না প্রথম তাকানোয়।

— দেখছ না আকাশটা কেমন ছিঁড়েখুঁড়ে একশা! কেমন লন্ডভন্ড হয়ে গেছে প্রিয় আকাশ।

কজ্জল আকাশের শরীরে আঁতিপাতি চোখ রেখে খুঁজতে থাকে সেই লন্ডভন্ড।

— দ্যাখো ওই জায়গাগুলো, আকাশের গায়ে কেমন বিশ্রী সব ঘা! দগদগ করছে একজিমার মতো! কী সাঙ্ঘাতিক! কী ভয়ঙ্কর!

কজ্জলরও মনে হচ্ছিল আঁধারের কালো পর্দায় কেমন সব কাটাকুটি দাগ।

— দেখেছ? একদিন এই একজিমা ভর্তি চাঁদোয়া কালো কফিনের মতো নেমে আসবে মানবসভ্যতায়।

কজ্জল কবিতার গলার স্বরে শিউরে উঠেছিল।

সে রাতে না-কজ্জল না-কবিতা কেউই নেমে আসতে পারেনি ছাদ থেকে। সারা রাত না-ঘুম কাটিয়ে দু'জনে দেখছিল কালো আকাশের গায়ে দগদগ করে বেড়ে উঠছিল ভয়ঙ্কর ঘায়ের ছবিগুলো।

সকালে কজ্জলের চোখ ভরে গোটা পৃথিবীর ঘুম, কিন্তু কবিতার চোখে ঘুম নেই।

ক্রমে সেই নিধনপর্ব বাড়তে থাকে চক্রবৃদ্ধিহারে। লালতাকুঁড়ির সবুজ লাশগুলি পড়ে থাকে সার সার। চোখ উল্টে পড়ে থাকে দুর্ধর্ষ সেগুন। প্রাণহীন পড়ে থাকে প্রেমিক-পলাশ। নিঃসাড়ে শুয়ে আছে উদাসীন শিমুল। খণ্ড খণ্ড ছড়িয়ে আছে উদ্ধত কৃষ্ণচূড়া। এরকম কত কত লাশ!

অতঃপর আকাশ থেকে নেমে আসবে রাশি রাশি কালো কফিন। সেই কফিনে একটি একটি করে মোড়া হবে অর্জুন, পলাশ, শিমুল, মাদার, শিশু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শাল, সেগুন। আরও কত কত গাছ। যেদিন থেকে লাশগুলো শুয়ে পড়া শুরু রয়েছে কবিতার বুকে একটি বিট হারিয়ে গিয়েছে হৃদপিণ্ডের। এখন তার হৃদপিণ্ড চলে থেমে থেমে, পজ দিয়ে।

বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে কবিতা দেখছিল জানালা ফুঁড়ে কিছু রোদ্দুর ছুঁয়ে ফেলছিল তাদের বিছানা। এ রোদে কী ভয়ঙ্কর তেজ আর ক্রোধ। এ রোদ ছিন্নভিন্ন করে নেমে আসছে আকাশের শরীর। এ রোদ তছনছ করে দিচ্ছে পৃথিবীর জীবনযাপন।

রোদ ক্রমে বিছানা ছাপিয়ে তার দাঁড়া বাড়াচ্ছে কবিতার ছড়িয়ে রাখা হাত লক্ষ করে। চৈত্রের ঝাঁজালো রোদ জানলা দিয়ে ঠোঁট বাড়িয়ে চামড়া ফুঁড়ে ফেলছে কবিতার। তার ডান হাত ছুঁয়ে ফেলেছে রোদের ধারালো ঠোঁট, কবিতার কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু হাতটা সরিয়ে নিচ্ছে না, বরং রোদকে খেতে দিচ্ছে মুখে আলতো হাসি ঝুলিয়ে। তার ফরসা হাতের চামড়ায় আজ ফোস্কা পড়বে নির্ঘাৎ। পড়ুক। পড়ুক।

বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে কবিতা দেখছিল চৈত্র পেরনোর আগেই তাদের জানলা দিয়ে যে পলাশগাছটা দেখা যায় তার ডালে একটাও ফুল নেই। পলাশের লাল কবিতার ভারি প্রিয়। ক'দিন আগেই যে ডালগুলো ফুলে-ফুলে ভর্তি ছিল সেই ফুলগুলো খুন করে গিয়েছে কোনও চেনা আততায়ী। পাথাও ঝরে গেছে তার ডাল থেকে। ন্যাড়া পলাশগাছটা একটা বীভৎস কঙ্কাল হয়ে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে কবিতার দিকে তাকিয়ে।

জানালা দিয়ে এই বীভৎস দৃশ্য দেখাটা ক-দিন ধরে অভ্যাস হয়ে গেছে তার।

একটু দুরেই কজ্জল খুলে বসেছে তার কবিতা লেখার ডায়েরি। বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে দূর থেকে কবিতা দেখতে থাকে কজ্জলের কাটাকুটি খেলা। লিখছে আর কাটছে, লিখছে আর কাটছে। কোনও পঙক্তিই যেন পছন্দ হচ্ছে তার। যেন পঙক্তিগুলি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে তার কলম থেকে।

কবিতা দেখতে থাকে কজ্জলের হতাশা, তার বিরক্তি, তার যন্ত্রণা। হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে থাকে যেমন হাসে পথে পথে ঘোরা পাগলের দল। তারপর একসময় জানালার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করল, আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে শুধু লেখা হয় সবুজের হত্যাকাণ্ডগুলি —

কজ্জল চমকে চোখ রাখে কবিতার দিকে। কবিতা তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে কবিতার পঙক্তি। হাতে তুলে নিয়ে শুনতে থাকে কবিতার কণ্ঠস্বর। পরক্ষণে কবিতা আবার বিড়বিড় করল, আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে শুধু লেখা হয় সবুজের হত্যাকাণ্ডগুলি—

কজ্জল লিখতে গিয়েও কিছু লিখতে পারল না।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



গল্প

অব্যক্ত

গৌরী সেনগুপ্ত



শ্রাবণের সন্ধ্যা। আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ ধরে চলেছে অসিত। অন্ধকারের মধ্যেই পথ ঠিক করে নেয় সে। কিছুক্ষণ হল একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ভিজে মাটির কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ ভেসে আসছে। প্রাণভরে নিশ্বাস নেয় অসিত। ভিজে মাটির গন্ধে মনটা তার ভরে ওঠে। মাথার উপরের কয়েকটা গাছ থেকে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ে। তবে এখন বৃষ্টি থেমে গেলেও আবার যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হতে পারে।

অসিত চলেছে তার এক পুরনো বন্ধুর বাড়ি। বহু বছর পর সেদিন হঠাৎই বাসে দেখা হয়েছিল ওই বন্ধুর সঙ্গে। প্রায় দশ বছর পর। মৈনাক। আজ থেকে দশ বছর আগে জেলে আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে। জেল থেকে বেরনোর পর আর দেখা হয়নি।

এখন অনেক ভাল আছি, ভাবছিল অসিত। এই দু'হাজার পনেরো সালে বর্তমান সরকারের আমলে বেশ সুখেই আছি। আজ এই তেত্রিশ বছর বয়সে স্মৃতির সরণি বেয়ে ওর মনে পড়ে গেল ফেলে আসা দিনের কথা। উগ্র বাম-রাজনীতি করত তখন অসিত। একটা খুনের অপরাধে জেলে যেতে হল। দীর্ঘদিন কেস চলল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রমাণ করতে পারল না কিছুই। আদালতের রায়ে বেকসুর ছাড়া পেয়ে গেল সে। কিন্তু ততদিনে জেলে কেটে গিয়েছে দশ-দশটা বছর। মৈনাকও একই অপরাধে জেল খেটেছিল। তবে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। মাত্র পাঁচবছর কারান্তরালে ছিল মৈনাক। মৈনাক ছাড়া পাওয়ার আরও পাঁচবছর পর যখন অসিত বেরল জেল থেকে, তখন কত কিছু পালটে গিয়েছে— রাস্তাঘাট, বাড়িঘর... মৈনাকের সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। আর নীতা? না, তাকেও আর দেখতে পায়নি অসিত।

বাম-রাজনীতির অসারতা এতদিনে বুঝতে পেরেছে অসিত। তার অনেকগুলো দিন নষ্ট হয়ে গেছে এই রাজনীতি করতে গিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের এখনকার বাতাবরণ, রাজনৈতিক পরিবেশ তার বেশ ভাল লাগে। বাবা-মা তার জেলে যাওয়ার আগেই মারা গিয়েছিলেন। ভাই-বোন কেউ নেই। অসিতই একমাত্র সন্তান। আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গেও আর দেখা করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু নীতাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। নীতা হয়তো এখনও অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। যদি একবার...

সেদিন বাসে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল মৈনাকের সঙ্গে। কিন্তু তার সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারেনি অসিত। স্টপ এসে যাওয়ায় নেমে পড়তে হয়েছিল তাকে। মৈনাক একদিন যেতে বলেছে ওর বাড়িতে। ঠিকানা, ফোন নম্বর সব দিয়ে দিয়েছে। ভদ্রেশ্বরের সারদাপল্লিতে বাড়ি করেছে মৈনাক।

রবিবার হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপল অসিত। গন্তব্যস্থল মৈনাকের বাড়ি। আগে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল, সে যাচ্ছে। মৈনাক বলেছিল, রাতে তাদের বাড়িতে থেকে খাওয়াদাওয়া করে সেদিন থেকে যেতে হবে। অসিত হেসে বলেছিল, "দাঁড়া, আগে পৌঁছই তো!"

ভদ্রেশ্বর স্টেশনে নেমে একটা রিকশায় চাপল অসিত। রিকশাচালক বলল, এখান থেকে সারদাপল্লি মিনিট পনেরোর রাস্তা। দুপুর থেকেই আকাশ মেঘলা করে ছিল। এবার বৃষ্টি নামল। রিকশায় বসে থাকলেও বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছিল অসিতের গায়ে। ছাতা খুলে সামনের দিকে ধরে বৃষ্টি আটকানোর চেষ্টা করল সে।

পনেরো মিনিট লাগল না। দশ মিনিটেই পৌঁছে গেল অসিত সারদাপল্লিতে। রিকশা থেকে নেমে একজন ভদ্রলোককে হনহন করে আসতে দেখে অসিত প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, বলতে পারেন মৈনাক সান্যালের বাড়িটা কোথায়?"

ভদ্রলোক বলেন, "আমি ওদিকেই যাচ্ছি, চলুন আমার সঙ্গে।"

কিছুদূর যাওয়ার পর ছোট কিন্তু বেশ ছিমছাম একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বলেন, "এটাই মৈনাকবাবুর বাড়ি।"

প্রথমে একটু ইতস্তত করে, কলিংবেল টিপল অসিত।

কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলে দেয় মৈনাক।

জেলের ভেতরে পাঁচ বছর আগে শেষবার দেখা মৈনাকের চেহারার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। মৈনাক ছাড়া পাওয়ার পরও তো পাঁচবছর জেলে কাটাতে হয়েছে অসিতকে। চেহারার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে তারও। এতদিন পর দেখা... সেই কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল বাসে। তারপর আজ... দু'জনে জড়িয়ে ধরল দু'জনকে। মৈনাক হাঁক পাড়ল ভিতরের ঘরে, "শুনছ, এদিকে এসো একবার।"

অসিত বুঝল, মৈনাক তার স্ত্রীকে ডাকছে। ওর সঙ্গে আলাপ করাবে।

বৃষ্টি একেবারে থেমে গিয়েছে। আকাশ এখন পরিষ্কার, ঝকঝকে। মেঘমুক্ত আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সামনের বাগানে। সেদিকে তাকিয়ে ছিল অসিত। মনটা বারবার ফিরে যাচ্ছিল অতীতে। মিনিট খানেক পরেই ঘরে এসে ঢুকল মৈনাকের স্ত্রী। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অসিতের পায়ের নিচের মাটি যেন কেঁপে উঠল। মাথায় সিঁদুর, আর হাতে শাঁখা-পলা পরা যে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে, সে তো নীতা! দশ বছরে তার এমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। একটু মেদবৃদ্ধি হয়েছে শুধু। তাকে চিনতে না পারার কোনও কারণই নেই।

নীতাও মনে হয় চিনতে পেরেছে অসিতকে। বয়স দশ বছর বেড়ে গেলেও অসিতের চেহারায় এমন কিছু পরিবর্তন হয়নি যে, নীতা তাকে চিনতে পারবে না। না চেনার কোনও প্রশ্নই নেই। নীতা কি দেখে ভয় পেয়ে গেল? তার পুরনো প্রেমিককে সামনে দেখে কি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়ল নীতা? ভাবল অসিত।

"এর কথাই তোমায় বলেছিলাম", মৈনাক হাসল, "আমার বন্ধু অসিত। জেল-বন্ধুও বলতে পারো।"

হাসল নীতাও। কিন্তু সেই হাসি কি স্বতঃস্ফূর্ত? নাকি অনিশ্চিত কোনও কিছুর আশঙ্কায় দোদুল্যমান তার মন? ভাবতে-ভাবতে অবশ্য সহজাত প্রবৃত্তিতেই হাত দুটো জড়ো হয়ে গেল অসিতের। দশ বছর আগের সেই চঞ্চলা হাস্যময়ী নীতা। অসিতের কীরকম একটা কষ্ট হয়।

নীতার সঙ্গে অসিতের পরিচয় কলেজে। তারপর সেই পরিচয় দাঁড়ায় গভীর প্রেমে। বড়লোক বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে ছিল নীতা। ধনীর দুলালি। কিছুদিন পর অসিতের হাত ধরে সে-ও নেমে পড়ে উগ্র বাম রাজনীতিতে। চিরদিন বিলাসিতায় মানুষ হওয়া নীতাকে সেইসময় অসিত বলেছিল, "এ শখ তোমার থাকবে না নীতা। এ পথ বড় দুর্গম, বড় কঠিন।" কিন্তু নীতা অসিতের কোনও যুক্তি, কোনও আপত্তি শোনেনি। দলের সবাই ভালবাসত নীতাকে। এত সরল আর ছেলেমানুষ মেয়েটা...বিশেষ করে তার কাজ করার উৎসাহ আরও বেশি করে আকর্ষণ করেছিল সবাইকে। একসময় দু'জনেই একসঙ্গে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাস করার পর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল। আর একসঙ্গে রাজনীতি করে বেড়াতে লাগল। নীতার বাবা যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর মেয়ে বিগড়ে যাচ্ছে কতগুলো গুন্ডা ছেলেমেয়ের পাল্লায় পড়ে, তৎক্ষণাৎ তার বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ করে দিলেন। সে বছর নীতা আর অসিত দু'জনেই এমএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল। সুতরাং ইউনিভার্সিটি যাওয়ার ব্যাপার নেই। নীতার বাড়ি থেকে বেরনো একদম বন্ধ হয়ে গেল। এর কিছুদিন পরই জেলে গেল অসিত। ব্যস, নীতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন।

এরপর দশ বছর আর কোনও যোগাযোগই ছিল না নীতার সঙ্গে। নীতার সঙ্গে অসিতের সম্পর্ক যে জায়গায় পৌঁছেছিল, তাতে চেনাজানা সকলেরই স্থির বিশ্বাস ছিল, ওরা বিয়ে করে ঘর বাঁধবে। কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেল। জেলে যেতে হল

অসিতকে। প্রথমদিকে বাড়ি থেকে লুকিয়ে দু-চারবার নীতা জেলে এসে অসিতের সঙ্গে দেখা করলেও, ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো নীতার বাবা সন্দেহ করেছিলেন যে, নীতা অসিতের সঙ্গে জেলে দেখা করতে যায়। জেল থেকে বেরনোর পর নীতাকে খুঁজেছিল অসিত, কিন্তু কোনও খোঁজ পায়নি। সেই বাড়ি বিক্রি করে ওরা চলে গিয়েছে অন্য জায়গায়। আর আশপাশের লোকজনও ওদের সম্বন্ধে কোনও খবর দিতে পারেনি। অসিত এখন টিউশনি করে। ইলেভেন-টুয়েলভ আর বিএ ইংরেজি অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের পড়ায়। আয়ও করে নেহাত মন্দ নয়।

মৈনাক অসিতকে বলল, "শোন, এসেছিস যখন, দু'দিন থেকে যাবি এখানে। তুই একটু বসে নীতার সঙ্গে গল্প কর, আমি এক্ষুনি আসছি। সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস, খুব খিদে পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কাছেই একটা দোকানে দারুণ কচুরি ভাজে, নিয়ে আসি," বলে অসিতকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে গেল মৈনাক।

নীতার দিকে তাকাল অসিত। নীতা মুখ নিচু করে বসে আছে। দু'জনেই চুপচাপ। কে কথা শুরু করবে, বোধ হয় বুঝতে পারছিল না। হ্যাঁ, নীতা চিনতে পেরেছে অসিতকে। নীতাই প্রথম কথা শুরু করল, "আমায় ভুল বুঝো না অসিত। এছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না।"

অসিত একটু ম্লান হাসি হাসল। বলল, "তোমার ছেলেমেয়েদের দেখছি না, নীতা? ক'টি ছেলেমেয়ে তোমার?"

নীতার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল অসিত। নীতার চোখ চিকচিক করছে। একটু চুপ করে থেকে নীতা বলল, "আমার ছেলেমেয়ে হয়নি, অসিত। হবেও না। আমার কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা তোমার বন্ধুর।"

অসিত একটু থতমত খেয়ে গেল। প্রশ্নটা করা বোধহয় ঠিক হয়নি, ভাবল সে।

"তুমি বিয়ে করেছ?" নীতা জিজ্ঞেস করল।

"নাঃ, বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া বিয়ে আর করবও না। এভাবেই চলে যাচ্ছে বেশ," একটু ম্লান হাসল অসিত।

"চাকরি?"

"নাঃ, অনেকগুলো টিউশনি করি, ওতে ভালভাবেই চলে যায় আমার। আমি একা। আমার আর চিন্তা কিসের," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অসিত।

"তোমাকে একটা কথা বলব? হাতে বেশি সময় নেই। তোমার বন্ধু এসে পড়বে এখনই।"

একটু থমকাল অসিত। তারপর বলল, "বলো। কী কথা?"

"আমার একটা ইচ্ছেপূরণ করবে তুমি?"

"ইচ্ছেপূরণ? কী সেটা, বলো", নীতার কথায় একটু অবাক হল অসিত।

"মৈনাকের ঔরসে আমার কোনওদিন সন্তান হবে না। কিন্তু আমার সন্তান চাই। তুমি আমার এই ইচ্ছেপূণ করো।"

অসিত স্তম্ভিত হয়ে গেল একথা শুনে। এ কী বলছে নীতা! এ-ও কি সম্ভব!

নীতা উঠে অসিতের দুটো হাত ধরল। বলল, "তুমি যদি জেলে না যেতে, তাহলে তোমার সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হত। আমি অপেক্ষা করছিলাম, তোমার ফিরে আসার। কিন্তু বাবা খুব অশান্তি শুরু করল আমার বিয়ে নিয়ে। জেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করাও বন্ধ হয়ে গেল। তারপর দেখাশোনা করে জোর করে আমার বিয়ে দিল বাবা। আর কাকতালীয়ভাবে সেটা হল তোমার বন্ধুর সঙ্গেই। তখন আমি তোমার বন্ধুকে চিনতাম না। ও-ও চিনত না আমাকে। আর বাবাও জানতেন না যে, ও জেল খেটে এসেছে পাঁচবছর।"

অসিত চুপ করে বসে রইল। তার বাক্যস্ফূর্তি হল না।

নীতা বলল, "তুমি তো এখানে দু'দিন আছো। কাল তোমার বন্ধু অফিস বেরিয়ে যাবে..."

অসিত বলল, "নীতা, তুমি জানো, তুমি কী বলছ?"

"আমি জানি। আমি সব ভেবেচিন্তেই বলছি। তাছাড়া তুমি তো বিয়ে করোনি, আর কোনওদিন করবেও না বললে। তাহলে..."

"ঠিক আছে", অসিত মাথা নিচু করে বলল, "আমাকে আজকের দিনটা ভাবতে দাও।"

"ভাবার কিছু নেই অসিত, আমার এই কথাটা তোমায় রাখতেই হবে। আমি উঠছি, ও এখনই এসে পড়বে।"

নীতা উঠে চলে গেল ভেতরের ঘরে। ঘরে একা বসে রইল অসিত। নীতাকে বলা হল না, আমি তোমাকেই এতদিন খুঁজে বেড়িয়েছি নীতা। তোমাদের পুরনো বাড়িতেও গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো এখনও অপেক্ষা করে বসে আছে আমার জন্য। মনের কথা অব্যক্তই রয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরেই মৈনাক এসে ঢুকল। এক হাতে কচুরির ঠোঙা, আর এক হাতে মিষ্টি।

"একটু দেরি হয়ে গেল রে। আসলে ভিড় ছিল তো দোকানে। প্রচণ্ড বিক্রি তো দোকানটায়", হাসতে হাসতে বলল অসিত।

রাত বারোটা পর্যন্ত গল্প করল দু'জনে। মৈনাক নীতাকেও ডেকেছিল ওদের মধ্যে, কিন্তু নীতা আসেনি। বলেছিল, মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

সব জানল অসিত। মৈনাক একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। প্রাইভেট কোম্পানি হলেও ভাল মাইনে পায়। বেশ উঁচু পদে আছে ও। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কয়েকমাস আগে এই বাড়িটা করেছে। এরপর যে কথাগুলো বলল সেগুলো কিছুক্ষণ আগে নীতাই বলেছে অসিতকে। কোনও সন্তান নেই ওদের। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আছে। অর্থের কোনও অভাব নেই। কিন্তু সব সময় যে যন্ত্রণাটা কুরে-কুরে খায় মৈনাককে, সেটা সন্তানহীনতা।

মৈনাক বলল, "এবার তুই শুয়ে পড়। কাল আবার আমার অফিস আছে। অফিস থেকে ফিরে, তোকে নিয়ে বেরোব, আশপাশে ঘুরে আসবি একটু। দেখবি, এই জায়গাটা তোর ভাল লেগে যাবে।"

রাতে ঘুম এল না অসিতের। নীতার কথাগুলো মাথা থেকে ফেলতে পারছিল না। না, নীতার প্রস্তাব মানা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। যাকে কোনওদিন নিজের করে পেল না, তাকে ... আর মৈনাকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা...তা-ও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

পরদিন অন্ধকার থাকতে-থাকতে বিছানা থেকে উঠে পড়ল অসিত। সারা রাত সে চোখের পাতা এক করতে পারেনি। ঘুরেফিরে নীতার একটা কথাই মনে পড়ছিল তার— "আমার একটা ইচ্ছেপূরণ করবে তুমি?" সারা রাত জেগে থেকে মাথাটা ধরে গিয়েছিল। মৈনাক আর নীতা ঘুমে আচ্ছন্ন। ভোর চারটে এখন। এখানে আসার সময় যে চামড়ার ব্যাগটা সঙ্গে ছিল অসিতের, টেবিলের উপর থেকে সেটা নিয়ে দরজা খুলে বাইরে পা দিল ও। কাউকে না জানিয়ে নিঃশব্দে বিদায় নেবে এ বাড়ি থেকে। এখানে থাকা এখন অর্থহীন। আর কোনওদিনও আসবে না সে এখানে। দ্রুত হাঁটা দিল সে। সকালের প্রথম ট্রেনটাই ধরতে হবে। ফিরে যেতে হবে বাড়িতে, যেখানে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটিয়ে দেবে বাকি জীবনটা।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু

গল্প

ছোট পিসিন, আবার আমি আসব

গীতা সরকার প্রামাণিক



সুমিত্রাদের ছোট্ট স্যান্ট্রো গাড়িটা যখন এক নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনিতে সুমিত্রার বাবার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, সুমিত্রা হাতব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে দেখল, আটটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকে আর হাতে ঘড়ি পরে না সুমিত্রা। কিন্তু চিরকালের একটা অভ্যেস এখনও ছাড়তে পারেনি, ঠিক কতক্ষণ সময় লেগেছে তার হিসাব করা।

দু'ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লেগেছে। বালুরঘাট থেকে সকাল ছ'টায় রওনা দিতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু রাস্তা ফাঁকা থাকার জন্য একটু তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ হলেও শীত এখনও ভালমতোই উত্তরবঙ্গে।

বাড়ির সামনে তো এল। কিন্তু বাড়ি কই? সুমিত্রার চমক ভাঙল; বাড়ি তো আর থাকার কথা নয়; ভিটেটুকুই আছে শুধু পৈর্তৃক। এখানে ছাব্বিশশো স্কোয়্যার ফুট জুড়ে তৈরি হচ্ছে এক সাততলা। থাকবে লিফট। গ্রাউন্ড ফ্লোরে এক বিরাট জায়গা জুড়ে থাকবে গ্যারাজ। থাকবে সিকিউরিটি। বাবা-মায়ের নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে নাম হবে সুপ্রিয় অ্যাপার্টমেন্ট।

এক জীবনে এত পরিবর্তন দেখতে হবে সুমিত্রা ভাবতেও পারেনি কোনওদিন। প্রথমে আটটা ভাইবোনের কারও কারও মত ছিল না। এক এক করে এক সময় সবারই মত হয়ে গেল। কলোনির সব বাড়িই এখন বহুতল, দু'-একখানা বাদ দিয়ে। তবে বাকিরাও প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাত বছর আগে মাত্র আধঘণ্টার মতো সময় বাড়িতে এসেছিল সুমিত্রা কলকাতা যাওয়ার পথে। সেই তার শেষ বাড়িতে আসা। ছোটবেলার কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়ানো বাড়িখানা আর কোনওদিন দেখতে পাবে না। ইট-কাঠ. কড়ি-বরগা, দরজা-জানালা কোনও কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। যেন কোনওদিনই এখানে কিছু ছিল না। ছিল না হাসি-কান্না, আনন্দ-দুঃখ মেশানো আটান্নটি বছর।

সাতবছর আগে যে আধঘণ্টা সময়ের জন্য এসেছিল, আজও ঠিক তাই, হয়তো আধঘণ্টাও সময় হবে না থাকার। শুধুমাত্র দাদার সঙ্গে দেখা করার জন্যই। দাদা এখন ভাড়া বাড়িতে থাকে, কাছেই। বাড়ি তৈরির পর ফ্ল্যাট পাবে। কিন্তু দাদার বাড়িতে তালা। দাদা-বউদি দু'জনে একসঙ্গে কোথাও বেরিয়েছে। বয়সের কারণে, আবার হয়তো অসুস্থতার জন্যই কেউ কাউকে ছাড়ে না। কিন্তু বড় অসহায় লাগছে সুমিত্রার। মনে হল সব দিকেই কেউ যেন তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ নেই এখানে।

সুমিত্রার সঙ্গে ছোট ছেলে প্রান্তিক, ছোট বউ অজন্তা আর আড়াই বছরের ছোট্ট নাতনি তমোম্মি।

সুমিত্রার দাদা সুপ্রভাত। আটটা ভাইবোনের মধ্যে সব থেকে মেধাবী হয়েও তার মধ্যে এক অনিশ্চয়তা কখনও তাকে স্থির থাকতে দেয়নি। যার জন্য প্রথম জীবনে চাকরি। একসময় সরকারি চাকরি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেন। পরে ব্যবসা। তারপর ব্যবসা ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি, তাতেও ভাল পসার হয়। কিন্তু তাও একসময় ছেড়ে দেন। এখন লেখালিখিতে মনোনিবেশ করেছেন। যা কিছু করেছেন, তাতেই সাফল্য এসেছে। ভাই-বোনদের মানুষ করেছেন, তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাদের বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করেছেন। এককথায় একজন সফল মানুষ, কিন্তু নিজে কোনও কিছুতেই স্থির থাকতে পারেননি। সেই 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে' —দাদাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে সারাজীবন। সম্প্রতি দাদার লেখা গবেষণামূলক একটি বই পাবলিশড হয়েছে। মালদা বইমেলাতে ভাল বিক্রি হয়েছে। সারা জানুয়ারি মাস দাদা বইমেলাতে যাতায়াত করেছেন। আর একটি কবিতার বই প্রকাশের অপেক্ষায়। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া ও নেপালি—পাঁচটি ভাষায় লেখা কবিতার বইটি 'পঞ্চরস' নামে প্রকাশ পাবে। এবছর কলকাতা বইমেলাতে প্রান্তিকেরও একটি বই পাবলিশড হয়েছে। প্রান্তিক খুব ব্যস্ত থাকার জন্য কলকাতা ছেড়ে উত্তরবঙ্গে আসা, তাও আবার নিজের প্রয়োজনে আসা, সম্ভব হয় না। নিতান্ত মা, বউ মেয়েকে নিয়ে ফেরার পথে মামার সঙ্গে একটু দেখা করা; সেই সঙ্গে মামাকে এক কপি বই দেওয়া, কিন্তু কোনও কিছুই হল না, সময়ও খুব কম। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। প্রান্তিক চিন্তায় পড়ে গেল, কারণ মায়ের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, খুব সহজে ফেরা যাবে না।

সুমিত্রাদের বাড়ির ঠিক সামনে পাপড়িদের বাড়ি। এখন 'আশীর্বাদ অ্যাপার্টমেন্ট'। পাপড়ি সুমিত্রার ছোটবেলার বন্ধু। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আর কোনওদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। পাপড়ি চাকরি করে কলকাতায়। পাপড়ির মা সুজাতা কাকিমা খুব ভালবাসত সুমিত্রাকে। বলত—"সুমি তুই যখন আসিস তখন পাপড়ি থাকে না, আবার পাপড়ি যখন আসে তখন তুই থাকিস না, তোদের দু'জনের দেখাই হয় না। দু'জনেই চাকরি করিস। একজন স্কুলে আর একজন অফিসে। তাই দু'জনের ছুটি তো একসঙ্গে হয় না। কবে তোদের আবার দেখা হবে কে জানে?" সত্যিই আজও দেখা হয়নি পাপড়ির সঙ্গে সুমিত্রার। তখন তো মোবাইল যুগ ছিল না তাই কোনও সংবাদ তাড়াতাড়ি পাওয়া যেত না। একবার গরমের ছুটিতে বাড়িতে এসে সুজাতা কাকিমার মৃত্যুসংবাদ শুনে সুমিত্রার খুব কষ্ট হয়েছিল। স্বজন হারানোর ব্যথা সেদিন অনুভব করেছিল সুমিত্রা। দুই বাড়ির মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল। পাপড়ির দুই পিসিন স্কুলে পড়াতেন। বার্লোতে বড় পিসিনের কাছে সুমিত্রারা সব বোনেরাই পড়েছে। ছোট পিসিন কলোনির স্কুলে পড়াতেন। এখন বড় পিসিন কলকাতায় থাকেন। ছোট পিসিন থাকেন এখানে। ছোট পিসিনকে গিয়ে প্রণাম করে সুমিত্রা। দাদাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বইটাও দেয়। ছোট পিসিন আস্তে আস্তে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ান। সুমিত্রা গাড়ির দিকে এগোতে যায় কিন্তু এক দুর্নিবার আকর্ষণে যন্ত্রচালিতের মতো বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। প্রান্তিকও খানিকটা এগিয়ে যায়— "মা তুমি জানো তো বাড়ি পৌঁছতে কত রাত হবে?" সুমিত্রার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে আবার বলে "দাদা চিন্তা করবে, সময় নষ্ট কোরো না মা, কী আর দেখবে তুমি? দেখা তো হয়ে গেল"— প্রান্তিকের গলাও কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হল।

কিন্তু সত্যিই কি দেখা হয়ে গেল? সুমিত্রা তখন তো চলে গেছে পাঁচের দশকে। উনিশশো চুয়ান্নর দুর্গাপুজোর সেই দিনটি। এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল শারদীয়ার সকাল। ষষ্ঠীর সকাল। বিবিগ্রামের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে আজই তারা এক নম্বর কলোনির বাড়িতে এসেছে। দরজায় মঙ্গলঘট, সারা বাড়িতে আলপনা, দরজার মাথায় মাথায় আমপাতা সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া, যদিও বাড়ি পুরো তৈরি হয়নি। কোনওরকমে দু'খানি ঘর তৈরি হয়েছে। মেঝে ফাঁকা, বাউন্ডারি ওয়াল হয়নি। ছেঁচাবেড়া দিয়ে ঘেরা, দরমার দরজা।

কলোনির মাঠে দুর্গাপুজো, ঢাকের বাজনা, বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো, বাস্তুপুজো, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, উলুধ্বনি। সুমিত্রাদের সব বোনেরে গায়ে একরকম ছিটের জামা। সুমিত্রার মা সুনন্দাদেবী নিজের হাতে মেশিনে সেলাই করেছেন। একই জামা গায়ে দিয়ে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমা, দশমী। সুমিত্রা একবার দৌড়তে দৌড়তে মাঠে, এবার দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি। সেই ছোট্ট মনে কী আনন্দের জোয়ার এসেছিল সেদিন, এত বছর অতিক্রম করেও তা ম্লান হয়নি এতটুকু।

।। ২।।

এখানে তো আমবাগান ছিল। পাশে রথতলা। সামনে এক বিরাট পুকুর। পুকুর অর্ধেক বুজিয়ে তার উপর দিয়ে চলে গেল রেললাইন একেবারে ঝলঝলিয়া স্টেশন পর্যন্ত। আর আমবাগান কেটে তৈরি হল এক নম্বর কলোনি। আমবাগান কেটে বসতি। বিপুল সংখ্যক বাস্তুহারা, যারা সব সরকারি কর্মচারী, অপশন দেওয়া চাকরিটুকু সম্বল করে মালদহ শহরে এসেছিল। রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, বগুড়া, ময়মনসিং, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা—সব মিলেমিশে

একাকার। সরকারি আনুকূল্যে তাদের পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা। তাই গভর্নমেন্ট কলোনি। সবাই করণিককুল। সরকারি হওয়ার জন্য পাঁচমিশেলি বৃত্তির মানুষ নেই। তবুও নিজেদের সুবিধার জন্য মাস্টার, প্রফেসর, ডাক্তার কয়েকজন ছিলেন। সবার অর্থ সামর্থ্য, আশা আকাঙ্ক্ষা যেন এক সুরে বাঁধা। সবাই মিলে যেন এক পরিবার। সব বাড়ির সামনে রাস্তা, কেউ কারও পিছনে নয়। আড়াআড়ি করে ইটপাতা রাস্তা, মোড়ে মোড়ে জলকল। সবার বাড়ির সামনে ইলেকট্রিকের আলো। ভিতরে বিরাট মাঠ। মাঠের একপাশে প্রাথমিক স্কুল, অন্যদিকে দুর্গাপুজোর মন্দির। শুধু দুর্গাপুজো নয়, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী সব।

যদিও সব বাড়িই অসম্পূর্ণ, বেশির ভাগই ছেঁচাবেড়া দিয়ে ঘেরা, দরমার দরজা, মস্ত উঠোন, সব বাড়িতেই একখানি দু'খানি টিনের চাল। কাদার গাঁথুনি, সব বাড়িতেই গাছপালার সংখ্যাই বেশি। নিজেদের হাতে লাগানো ফল-ফুলের বাগান। গাছপালা ঢাকা বাড়িগুলো যেন তপোবনের মতো।



সুমিত্রার বাবা প্রিয়তোষ সরকার অপশন দেওয়া চাকরিটুকু সম্বল করে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিঃসম্বল হয়েই মালদহ শহরে এসেছিলেন। বিবিগ্রামের ভাড়া করা বাড়িতে চার বছর বাস করার পর সরকারি জমি ও লোন পেয়ে বাড়িটুকু করেছিলেন। বাড়ি তৈরির কথা মনে হতেই সুমিত্রার মনে পড়ে গেল ফকির মিস্ত্রির কথা। ফকির মিস্ত্রি চেক চেক লুঙ্গি আর ফতুয়া গায়ে গিয়ে সন্ধের পর আসত টাকা নিতে। পরের দিন কী কী জিনিসের দরকার, সে বিষয়ে কথাবার্তা মিটিয়ে চলে যেত। মা-র সঙ্গে যতক্ষণ বাড়ি তৈরি সংক্রান্ত কথাবার্তা চলত ততক্ষণই সুমিত্রা মার কাছে বসে থাকত। বাবা দুপুরে অফিসে থাকতেন তাই মা বাড়ি তৈরির কাজকর্ম নিজেই দেখাশোনা করতেন। যেদিন স্কুল ছুটি থাকত, সেদিন নতুন বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য সুমিত্রা মার সঙ্গ নিত। দেশভাগের কথা সুমিত্রার মনে আছে। তখন দেশে সুমিত্রাদের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ফেলে রেখে চলে আসতে হয়েছিল। প্রিয়তোষ সরকার চাকরিতে অপশান দেওয়ার পর প্রথমে কলকাতা, তারপর জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ বিভিন্ন জায়গায় সংসার পেতেছেন শুধু চাকরিটুকু সম্বল করেই। সে সব দিনের কথা সুমিত্রার সব মনে আছে, দেশ ছাড়ার পর সেই কষ্টের দিনগুলো।

প্রান্তিকের ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে— "মা আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে?"

দেরি তো হয়েছেই, হ্যাঁ অনেক দেরি হয়ে গেছে। সুমিত্রার মনে হল তাকে আরও আগে আসতে হত। ওদিকে, মিস্ত্রিদের হইচই শোনা যাচ্ছে। ঢালাই হচ্ছে। বিরাট বিরাট কংক্রিট ঢালাই। সুমিত্রার মনে পড়ে গেল—তাদের নতুন বাড়িতে যেদিন ছাদ ঢালাই হয়েছিল, সেদিন ফকির মিস্ত্রি আরও অনেক মিস্ত্রিকে সঙ্গে করে এনেছিল। ছাদ ঢালাই বলে কথা। এত মিস্ত্রি এক সঙ্গে? ছোট্ট সুমিত্রার সে কী আনন্দ। সুনন্দাদেবী সেদিন নিজের হাতে রান্না করে মিস্ত্রিদের খাইয়েছিলেন, বিবিগ্রামের বাড়িতে। নিজের মনের মতো করে দেশের বাড়ির অনুকরণে লম্বা বারান্দার সঙ্গে লম্বা লম্বা সিঁড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। সুনন্দাদেবী নিজে ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। পাড়ার মেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী, দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজোয় নাটক করাতেন। সমস্ত রিহার্সাল হত সুমিত্রাদের উঠোনে আর সিঁড়িতে। একবার পুজোয় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক করিয়েছিলেন। সুমিত্রার পার্ট ছিল রাজা গোবিন্দমানিক্যের। রানি গুণবতী হয়েছিল তৃষ্ণা। তৃষ্ণাকে ঠিক রানির মতোই লাগছিল। পুষ্পিতা খুব ভাল অভিনয় করত, ওকে দেওয়া হয়েছিল রঘুপতির পার্ট। কিন্তু পুষ্পিতা সে বছর স্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পেয়ে কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়েছিল, রঘুপতির পার্ট লিখে নিয়ে গিয়েছিল। একদিনও রিহার্সাল দিতে পারেনি। পঞ্চমীর দিন কলেজ ছুটি হওয়ার পর ও এসেছিল। অষ্টমীর দিন ছিল নাটক। প্রতিদিন রিহার্সাল পুষ্পিতার প্রক্সি দিতে দিতে সুমিত্রার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল রঘুপতির পার্ট। পুষ্পিতা এসে যেদিন রিহার্সাল দিল, সেদিনের কথা আজও ভোলেনি সুমিত্রা। পুষ্পিতার গমগমে গলায় "ঘোর কলি এসেছে ঘনায়ে/বাহুবল রাহুসম ব্রহ্মতেজে গ্রাসিবারে চায়/সিংহাসন তোলে শির উচ্চ বেদি পরে/হায়! হায় কলির দেবতা/তোমরাও চাটুকার সভাসদ সহ/নতশিরে রাজ আজ্ঞা বহিতেছ/চতুর্ভুজা চারি হস্ত আছো জোড় করি/বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে কেড়ে দৈত্যগণে/গিয়েছে দেবতা সব রসাতলে/শুধু দানবে মানবে মিলে বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ"—মা বলেছিলেন, আজ একেবারে জমে গেছে।

সুমিত্রা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল উঠোনটা দেখার, কিন্তু উঠোন কই, সিঁড়িই বা কোথায়? বড় বড় মোটা মোটা কংক্রিটের থাম সাততলা ধরে রাখবার প্রয়াসে সব জায়গাটাকেই অধিকার করে নিয়েছে। সে যেন কোন অতীতকাল, সুনন্দাদেবীর হাত দিয়েই বাড়িতে দশটি বিয়ের অনুষ্ঠান। কত আলো, কত বাজনা, লোকজন, আত্মীয়স্বজন, অতিথি অভ্যাগত। সুমিত্রার মনে পড়ে গেল নতুন বাড়িতে প্রথম উৎসব বড়দির বিয়ে। সন্ধ্যার কিছু পরে ফুলমালা দিয়ে সাজানো গাড়িটা ঠিক এই রাস্তার উপরেই এসে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে, বরের গাড়ি। বরের সুন্দর চেহারা দেখে সবাই যখন খুব প্রশংসা করছিল, সুমিত্রার মনে আছে মেজদি তখন কানে কানে বলেছিল—"দেখ সুমি, জামাইবাবুকে দেখতে ঠিক রাজপুত্রের মতো।" সেদিন কী গর্ব সুমিত্রার। বড়দি কনের সাজে সেজে বসে

আছে ঠিক যেন রানির মতো। সেদিন ছিল পঁচিশে বৈশাখ। সুমিত্রার ঝঙ্কার ক্লাবে আবৃত্তি করতে যাওয়ার কথা ছিল। কবিতা মুখস্থ করেও যায়নি সুমিত্রা। কী জানি কেন সেদিন বড়দিকে ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না একটুও, সঙ্গে জামাইবাবুকেও। যেখানে বড়দি, সেখানেই সুমিত্রা।

পৌষপার্বণে সারা উঠোনে আলপনা দিতেন মা, মেজদি। সারাদিন ধরে পিঠেপুলি হত। সারা উঠোনে আলপনা। মস্ত এক হাতি আঁকা হত। তার পেটে গহনার বাক্স, টাকার বাক্স।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমায় সব বাড়িতে সবার নেমন্তন্ন। হেমন্তের মিষ্টি মধুর দিনটি কী সুন্দরভাবে কেটে যেত। সারাদিন উপোস গায়েই লাগত না। রাতে জ্যোৎস্নায় ভেসে যেত সারা মাঠ। সেদিন গায়ে জ্যোৎস্না মেখে মাঠে সবাই জেগে থাকত। কারও চোখে ঘুম থাকত না। সুমিত্রারা সব বোন মায়ের সঙ্গে উপোস করে থাকত, যতক্ষণ না পুজো হয়। সারাদিন ধরে তৈরি হত খইয়ের নাড়ু, নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, ফুলতোলা, মালা গাথা, আলপনা দেওয়া। নানা কাজেই কেটে যেত সারাদিন। সন্ধ্যার সময় পুজো করতেন মা নিজে। চিনেমাটির লক্ষ্মী। প্রতিবছর পুজোর সময় মা নিজে চোখ-মুখ পরিষ্কার করে নতুন করে আঁকতেন। ভারি সুন্দর ঘোমটা দিয়ে বসে থাকা মা লক্ষ্মী মূর্তি। দেশভাগের পর ভিটেমাটি, বাড়ি-ঘর সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র ফেলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর ফটো সযত্নে সঙ্গে করে এনেছিলেন সুনন্দাদেবী। পরবর্তীকালে বদলির সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় সংসার পাততে হয়েছে। সঙ্গে লক্ষ্মী নিয়ে ঘুরেছেন। কোজাগরীতে লক্ষ্মীর ফটো সাজিয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কতকগুলো গল্প বলার রীতি ছিল। গল্পগুলো সব মর্তধামে মা লক্ষ্মীর পুজো প্রচার বিষয়ক গল্প। লক্ষ্মী আগে একতলার ঘরে থাকত, পরবর্তীকালে দোতলায় ঠাকুরঘর তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আজ সে লক্ষ্মী কোথায়? সুমিত্রার মনে হল আজ কি দেশভাগের থেকেও বড় দুর্দিন?

নবান্ন হত অগ্রহায়ণ মাসে। নবান্নতে সারাদিন ধরে রান্না করতেন সুনন্দাদেবী। নতুন চালের ভাত, পায়েস নানারকম পদ রান্না হত। নবান্নতে নিয়ম ছিল বাবার কাছ থেকে অনুমতি চাইতে হত—"বাবা আমি নবান্ন করব?" বাবা বলতেন, "হ্যাঁ, নবান্ন কর।" এরপর কলার পাতায় নবান্নর প্রসাদ নিয়ে কাকের উদ্দেশে বলতে হত, "কাকগুলি কাকগুলি নবান্ন কর।" তারপর বারান্দায় সার দিয়ে বসে নবান্নর অন্ন গ্রহণ করা হত।

সুমিত্রার মনে পড়ে গেল বারান্দায় পড়তে বসার কথা। পড়ার জায়গাটা ছিল বারান্দা। বাবা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে পড়াতেন একই লণ্ঠনের আলোয়। বাবার কাজ ছিল সবাইকে নিয়ে পড়াতে বসানো, সকাল-সন্ধ্যায়, কারও উপায় ছিল না ফাঁকি দেওয়ার। যে পড়াশোনায় ভাল, বেশি নম্বর পাবে সে বাবার বেশি প্রশংসা পাবে, সুবিধা পাবে। মেজদি বাবার খুব প্রিয় ছিল। অঙ্কে একশোতে একশো পেত। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ডবল প্রোমোশন পেয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে উঠে গিয়েছিল। উনিশশো চুয়ান্নতে স্কুল ফাইনালে প্রথম বিভাগে পাস করেছিল। সুমিত্রার মনে হল, মেজদিকে ধরাছোঁয়ার ক্ষমতা তার কোনওদিনই ছিল না। মেজদির একটা আলাদা জগৎ ছিল। সেখানে একটা কাজই ছিল নিজেকে তৈরি করা, প্রতিষ্ঠিত করা। বাবা কোনও ফাঁকি পছন্দ করবেন না। বাবার যেটুকু সময় অফিস, তার বাইরের সময়টুকু ছিল ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পড়ানো। পড়ানো ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

বাবার কথা ভাবতে ভাবতেই সুমিত্রার মনে পড়ে গেল সেই বেদনাদায়ক রাত্রির স্মৃতি। ঊনত্রিশে নভেম্বর উনিশশো পঁয়ষট্টি। মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে বাবার অকালমৃত্যু। চাকরিকাল শেষ হতে তখনও তিন বছর। কনকনে শীতের রাত। সন্ধ্যার কিছু পরেই বাবা চলে গেলেন। সুমিত্রা তার আগে কখনও এত কাছ থেকে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেনি। চোখের সামনে প্রিয়জনের জীবনদীপ নিভে যাওয়া। তার বাইশ বছরের জীবনে প্রথম মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করা। মা পাথর হয়ে গেলেন। ছোট ছোট ভাই-বোনের কান্নার রোল। অনেক রাতে দাদার বন্ধুরা একটা ট্রাক ভাড়া করে নিয়ে এল। বাবাকে নিয়ে যাওয়া হবে সৌদুল্লাপুরে, গঙ্গায়। ট্রাকটা যেন ঠিক এই জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল—সুমিত্রা যেন বিড়বিড় করে কী বলছে—দূর থেকে প্রান্তিক সেটা লক্ষ করে এগিয়ে এল—"কিছু বলছ মা।" কিন্তু সুমিত্রা যেন শুনতেই পেল না। সে তখন সেই কনকনে শীতের রাতে পঁয়ষট্টির ঊনত্রিশে নভেম্বরে। ট্রাকটা যখন বাবাকে নিয়ে চলে গেল, ছোট তিনটে বোন তখন রাস্তায় পড়ে, ঠিক যেন যে জায়গাটায় সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই, আকুল হয়ে কাঁদছিল, কেউ ওদের তুলে নিয়ে যেতে পারছে না—এত বছর অতিক্রম করেও সুমিত্রার গলায় দলাপাকানো কান্না।

।। ৩ ।।

সুমিত্রা রাস্তা থেকে নেমে একটু এগিয়ে গেল। মনে হল, বড় গেটটা তো এখানেই ছিল। এইখানেই তো মা এসে দাঁড়াতেন। প্রতিবার মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় মা বাম হাতের ক'ড়ে আঙুল দাঁত দিয়ে কেটে দিতেন। বাম হাত দিয়ে নিজের বাম পায়ের ধুলো তুলে মেয়েদের মাথায় দিতেন। মেয়েদের মঙ্গলকামনায় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে রওনা করে দিতেন। সুমিত্রা কখনও কাঁদতে পারত না। প্রাণপণ বুকের মধ্যে কান্না চেপে রাখত। কেন জানি না রওনা করে দেওয়ার সময়, সেবার সুমিত্রা মাকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কেঁদেছিল— তারপরের বছর মা-ও চলে গেলেন সবাইকে ছেড়ে। সুমিত্রার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সেই বড় গেটে—মা'র দাঁড়িয়ে থাকা, মা'র চিরায়ত প্রথা, আচার নিয়ম, বড় বড় চোখের পলকহীন সজল দৃষ্টি আজ কি সুমিত্রাকে স্পর্শ করল? না, কেউ কোথাও নেই। শুধু কংক্রিট ঢালাইয়ের শব্দ, মিস্ত্রিদের ওঠানামা, তাদের হইচই। সুমিত্রা আজ চিরবিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে।

"মা তুমি আর দেরি কোরো না মা"

প্রান্তিক এবার নিজেই এগিয়ে আসে পরম যত্নে মাকে গাড়িতে তুলে দেয়; তারপর নিজে উঠে আসে। প্রান্তিক বুঝতে পেরেছে, মা কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে গাড়িতে উঠতে পারবে না।

সুমিত্রা যন্ত্রচালিতের মতোই গাড়িতে ওঠে। ছোট ছোট হাত দিয়ে তমোম্মি গলা জড়িয়ে ধরে। অজন্তা গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দেয়। সুমিত্রার হঠাৎ চোখ পড়ে যায় পাপড়িদের বাড়ির দিকে। ছোট পিসিন সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন বইখানা হাতে নিয়ে। যেন বড় বিষণ্ণ, সুমিত্রার দিকেই তাকাচ্ছেন, মুখে ম্লান হাসি। স্নেহের হাসি, ভালবাসার হাসি, প্রশ্রয়ের হাসি কি? সুমিত্রার মনে হল।

সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রার অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য। তার মঙ্গলকামনায় রওনা করে দেওয়ার মতো এখনও কেউ আছেন। ছোট পিসিন কি তাহলে মায়ের মতোই দাঁড়িয়ে আছে? সুমিত্রা প্রাণপণ বলতে চেষ্টা করল—ছোট পিসিন, আমার কিছুই হারায়নি। আবার আমি আসব, তুমি ভাল থেকো ছোট পিসিন, আবার আমি আসব। তুমি এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে রওনা করে দেবে।

কিন্তু কিচ্ছুই বলা হল না। অব্যক্ত এক বোবা কান্নায় গলা বুজে এল সুমিত্রার।

গাড়ি তখন এক নম্বর কলোনির মোড়ে বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায়, চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু

গল্প

অভিমান

তপনকুমার দাস

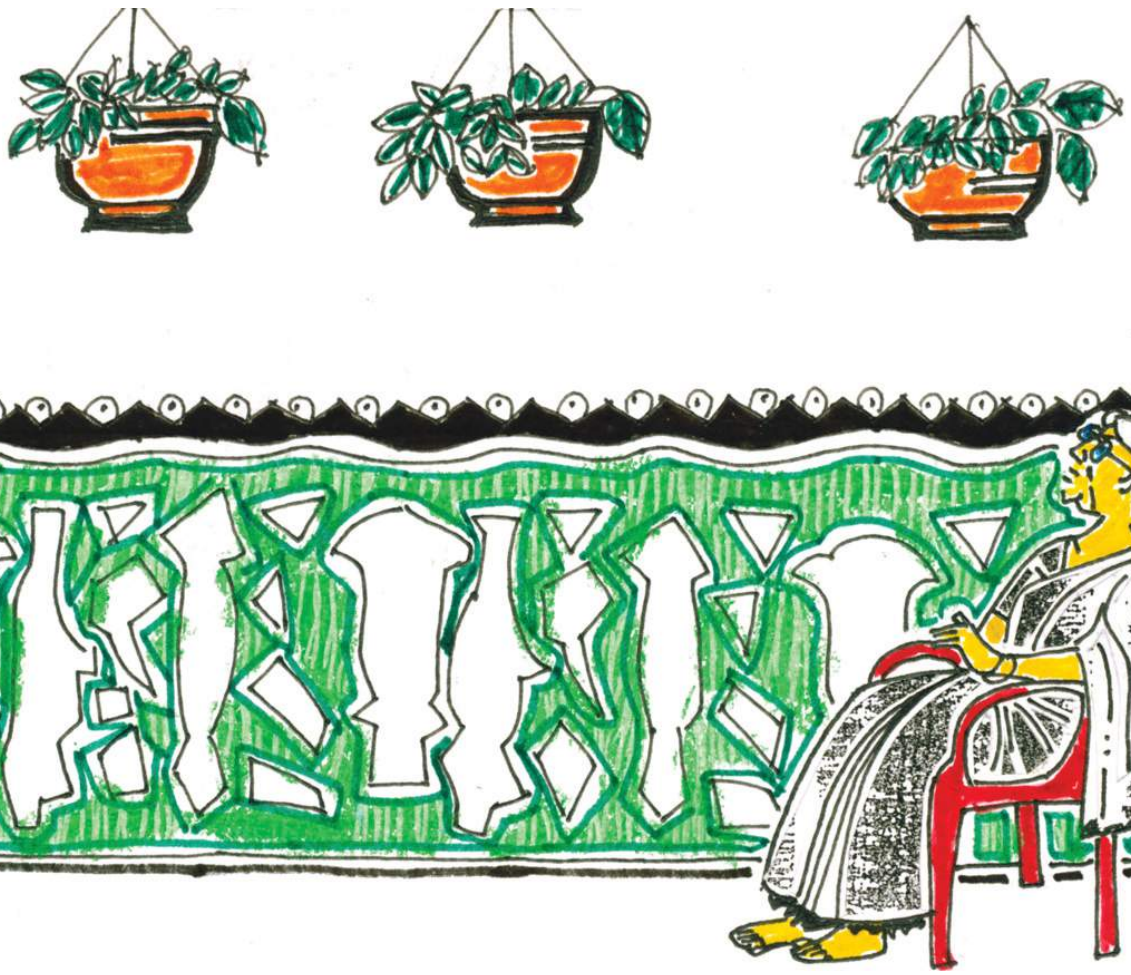

অভিমান হলে নিজেকে নিজের ভিতর গুটিয়ে রাখেন লতিকা। শামুকখোলের মতো একটা আস্তরণ তৈরি করে রাখেন নিজের ব্যবহারে। নির্বাক থাকেন যাপনচিত্রে। একটা উদাসী বাউলমনা জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন নিজের জীবনকে। ইচ্ছে করে সমাজ সংসার থেকে বহুদূরে কোনও নির্জন স্থানে বসে থাকতে।

ইদানীং বছর খানেক হল স্বভাবটা আরও গম্ভীর হয়েছে লতিকার। কখন কী কারণে, কেন, কীভাবে অভিমানের কোলে ঢলে পড়বেন লতিকা, কেউ বুঝতে পারে না। এমনকী দ্যুতিও না। বোঝা যায় যখন লতিকা ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন, তখন।

এ বাড়ির ব্যালকনিটা পিছনদিকে। সামনে রাস্তার দিকে এক ফালি বারান্দা আছে ঠিকই কিন্তু সেখানে নির্জনতা নেই। সাইকেলের ঘণ্টা, রিকশার প্যাঁকপ্যাঁক, চলন্ত মানুষের কলকল কথাবার্তায় মুখর। সেই মুখর প্রাঙ্গণে নিজের ভিতর নিজেকে গুটিয়ে ধ্যান-বিহ্বল করে রাখা যায় না। পিছনের ব্যালকনিটা অনেক বেশি প্রশস্ত। গ্রিলের বাইরে চার কাঠা জমি জুড়ে সুন্দর বাগান, আম, কাঁঠাল, সবেদা, লিচু, বাতাবি লেবুর গাছ।

লতিকার যখন অভিমান থাকে না, ঝলঝলে মনটা আনন্দ ফুর্তিতে ভরে থাকে, তখন হিড় হিড় টানতে টানতে দ্যুতিকে নিয়ে আসেন পিছনের এই ব্যালকনিতে। মাথাটা প্রায় ঠুকে দেন নকশা কাটা লোহার গ্রিলের উপর। বলেন, দ্যাখ। মন দিয়ে দ্যাখ।

কী দেখব? অবাক দ্যুতির চোখগুলো তখন ঠিকরে আসে।

কী দেখবি মানে? সামনে যা আছে তাই দেখবি। হাতে সাজানো একটা সবুজের বাগান দেখবি। এই বয়সেও খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেদিন আমি বাগানের চার কোণে চারটে বকফুলের গাছ লাগিয়েছি। যখন সাদা সাদা থোপা থোপা ফুল ফোটাবে তখন দেখিস বাগানের চেহারাই পাল্টে যাবে।

আগে তো ফুটুক। তখন দেখা যাবে— ঠাম্মির উপর একটু বিরক্ত হয় দ্যুতি। দিনের আলো ফুরিয়ে হাঁটি হাঁটি পায়ে বিকেল নামতে শুরু করেছে। বাগানের গাছের ফাঁকা দিয়ে কোথাও কোথাও চুঁইয়ে পড়ছে বিন্দুমাত্র রোদ। বাকিটা সব ছায়ায় ঘেরা। রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা। যদি আম কাঁঠাল সবেদা লিচুর বাগান না হত, গলা ছেড়ে দিত দ্যুতি—আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা। গান শুনে খুশি হত ঠাম্মি। নিজেও গলা মিলিয়ে বাতের ব্যথা ভুলে নেচে উঠত দু'পাক।

এখনই বা দেখবি নে কেন? দ্যাখ, গাছগুলোর রূপ দ্যাখ। যেন এক-একটা মৌন সন্ন্যাসী। প্রকৃতির ধ্যান করছে। কখনও কখনও পাতাগুলো হাওয়ায় দুললেও ওদের সারা শরীর অনড় হয়ে আছে। ধ্যানমগ্ন ঋষি। গাছের কাছে মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে। অনেক।

বাগানে মগ্ন লতিকা যখন দু'চোখ বন্ধ করে গাছের সৌন্দর্য বোঝাবেন, ঠিক তখনই সুযোগ পেয়ে নিজের ঘরে পালিয়ে যাবে দ্যুতি। স্কুটি নিয়ে ততক্ষণে ময়নার আসার সময় হয়ে যায়। সেই দে পাড়ায় দু'জন মিলে টিউশন পড়তে যাবে অতনু স্যারের কাছে।

ঠিক তখনই অভিমান হবে লতিকার। দ্যুতির পালিয়ে যাওয়াটা মনে হবে ঠাম্মির প্রতি উপেক্ষা। মনে হবে পুরনোকে নতুনের অবমাননা। লতিকা তখন কিছুতেই বুঝতে চাইবেন না যে দ্যুতির সত্যি সত্যি সময় নেই। সামনে পরীক্ষা।

বিকেলে একটু ঘরে কাটা ছানা আর চারটে চিনি ছাড়া বিস্কুট খান লতিকা। দ্যুতির মা অমিতা স্কুল থেকে ফিরেই শাশুড়ির জন্যে ছানা কাটে। টাটকা ছানা আর বিস্কুটের প্লেট হাতে চলে আসে পশ্চিমের ব্যালকনিতে। সকাল দশটার পর থেকে ফেলে যাওয়া সময়টুকুর খবর নেয়— আজ আর ব্যথা বাড়েনি তো? ওষুধগুলো সময়মতো খেয়েছিলেন? ছোড়দি ফোন করেছিল? ভুট্টাই কি পরশু ফিরছে? উমা মালিশ করে দিয়েছিল তো? এবং আরও অনেক প্রশ্ন। সঙ্গে সংসারের টুকিটাকি খবর।

কিন্তু না। লতিকা তখন অমিতার কোনও প্রশ্ন, কোনও কথার উত্তর দেন না। চোখ বন্ধ করে বোবার মতো গুম হয়ে থাকেন। অমিতা বুঝতে পারে অভিমান হয়েছে শাশুড়ির। ছানা বিস্কুটের প্লেট ছোট্ট একটা টি-টেবিলের উপর রেখে দু'হাতে মালা করে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে লতিকাকে। শাশুড়ি নয়, অমিতা তখন ছোট্ট মেয়েটি হয়ে মায়ের কাছে আবদারের ভঙ্গি করে— কী হয়েছে তোমার? রাগ হয়েছে? কেন? ভুঝেছি, উমা মালিশ করতে দেরি করেছে। আসুক কাল, খুব বকে দেব। ছাড়িয়ে দেব উমাকে। তোমার ছেলেকে বলবে সেন্টার থেকে ভাল একজন মাসি জোগাড় করে আনতে। তুমি খেয়ে ঘরে যাও। চেঞ্জ করে এসে আমিই মালিশ করে দিচ্ছি।

অমিতার এত তোয়াজের পরেও ভাবলেশহীন থাকেন লতিকা। উদাস চোখ মেলে গাছগুলো দেখতে থাকেন আপন মনে। গাছের ফাঁকে সূর্য লুকিয়ে পড়েছে। দিনের আলো একেবারে নিভে না গেলেও অন্ধকারের হাল্কা রেশ জড়িয়ে গিয়েছে গোধূলির গায়ে। আম কাঁঠাল গাছের পাতার ফাঁকে ঝাঁক ঝাঁক পাখি ফেরা শুরু করেছে নিজেদের ভাষায় বকবক করতে করতে।

দ্যুতি বুঝি তোমায় কিছু বলেছে? লতিকার অভিমানের উৎসে পৌঁছতে চেষ্টা করে অমিতা। না, জবাব পায় না। লতিকার পিঠে নাক ঘষে অমিতা। আদর করে বলে, তুমি তো আমার ভাল মা। সোনা মা। আমার উপর রাগ করেছ? দেরি হয়েছে বলে? কী করব বলো, ট্রেন লেট।

জ্বালাস না তো — এক ঝটকায় পুত্রবধূর হাত ছাড়িয়ে তখন উঠে দাঁড়ান লতিকা। হাঁটুর ব্যথা কোমরের ব্যথা ভুলে হন হন হেঁটে ঢুকে যান নিজের ঘরে। পশ্চিমের ব্যালকনি, গাছের কোলাজ, গোধূলির অন্ধকার মাখা ফিকে আলো সব পড়ে থাকে পিছনে। অমিতার কাছে।

নিশ্চিত হয় অমিতা— শাশুড়ি মায়ের অভিমান হয়েছে। বীণাপাণি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার পদ থেকে সাড়ে পাঁচ বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন লতিকা চৌধুরি। সুনাম বদনাম মিলিয়ে এলাকায় ডাকসাইটে শিক্ষিকার পরিচয় ছিল। রিটায়ার করার আগে এবং পরেও যুক্ত ছিলেন নানা সামাজিক কার্যকলাপে। অধ্যাপক স্বামী সুনন্দন চৌধুরি রাজনীতি করতেন। পুরসভার প্রধান ছিলেন টানা দশবছর। অনেকটা সেই সুবাদে লতিকা জড়িয়ে পড়েছিলেন মহিলা সমিতির সঙ্গে। সুনন্দনের আচমকা মৃত্যুর পর সতেরো নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী হয়ে পুরমাতা হয়েছিলেন লতিকা। সদ্য চাকরি পেয়ে সুপ্রতিম তখন চলে গেছিল পুণে। ছোট ছেলে অপ্রতিম ছিল মেডিক্যাল কলেজে, ফাইনাল ইয়ারে। স্কুল, পুরসভা, মহিলা সমিতি, রাজনীতি সামলেও সংসারে ছিল নিপুণ আধিপত্য। ভালবাসা। মমতা নিজে পছন্দ করে নিজের স্কুলের প্রিয় ছাত্রী অমিতাকে বরণ করে আনলেন সুপ্রতিমের জন্যে। পুণে থেকে তখন কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে সুপ্রতিম। অপ্রতিমের বন্ধু সুন্দরলালকে মন দিয়ে ফেলেছিল একমাত্র কন্য সুলতা। মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ হলেও সুন্দরলালদের তিন পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা। বাঙালি শিক্ষা সংস্কৃতিতে মানুষ। সুতরাং আপত্তি করেননি লতিকা। দুই ছেলে আর ছেলের বউ অমিতার সঙ্গে পরামর্শ করে সুন্দরলাল আর সুলতার চার হাত এক করে দিয়েছিলেন। অপ্রতিমের বিয়ে দিয়েছিল অমিতা। পিসতুতো বোন স্বাগতার সঙ্গে। ছোট্ট হিপ্পিকে নিয়ে ওরা দিল্লিতে থাকে। রোজ রাতে নিয়ম করে ফোন করে লতিকাকে। মন খারাপ থাকলে জবাব দেন না লতিকা। তখন অমিতাই কলকাতার সব খবর জানিয়ে দেয় এমনকী শাশুড়ি মায়ের অভিমানের খবরও।

দ্যুতি যখন খুব ছোট, ছ'মাসের হাত পা নাড়ানো পুতুল তখনই নিজেকে গুটিয়ে ফেলা শুরু করেছিলেন লতিকা। বাইরের সব কাজ,

পুরমাতার দায়িত্ব সব ছেড়েছিলেন নিজের ইচ্ছেয়। স্কুলের কাজটুকু ছাড়া বাকি সময়টাই বরাদ্দ করেছিলেন দ্যুতির জন্য। মা-অমিতা টেরও পায়নি মা হওয়ার জ্বালা কষ্ট দায়দায়িত্বের বোঝা যে কী সাঙ্ঘাতিক ভারি।

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে। দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে।

উমার রেখে যাওয়া রান্না গরম করতে করতে লতিকার গলা শুনতে পায় অমিতা। গত দু'দিন ধরে অমাবস্যায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন লতিকা। খাওয়া দাওয়া চালচল্‌ন, নিয়ম করে টিভি সিরিয়াল দেখা কোনওটাই বাদ নেই। বাদ শুধু মুখের ভাষা। বাদ শুধু ওষুধ খাওয়া। বাদ শুধু উমাকে দিয়ে মালিশ করানো। বাদ ছেলে, ছেলের বউ আর নাতনির সঙ্গে কথাবার্তা। ডাক্তার চ্যাটার্জিকে ফোন করেছিল সুপ্রতিম। উত্তরে হো হো হেসেছিলেন ডাক্তারবাবু, বলেছিলেন, তোমার মা এখন আর তোমাদের মা নেই, ছোট্ট খুকি মেয়ে হয়ে গেছেন। ঝুমঝুমি কিনে দাও।

ঠাম্মি, ঠাম্মি, ডাক্তারবাবু তোমাকে ঝুমঝুমি কিনে দিতে বলেছেন। কী মজা, তুমি ঝুমঝুমি নিয়ে খেলা করবে। বাপির কাছে শুনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে লতিকার কানে সংবাদটা পরিবেশন করে ফেলেছিল দ্যুতি। আর তখনই যজ্ঞপাত্রে ঘি পড়ে দাউ দাউ জ্বলে উঠেছিলেন লতিকা— তোর বাপ-কে বল ঝুমঝুমির সঙ্গে লালিপপ কিনে আনতে। চিৎকার করেছিলেন লতিকা— নির্বাসনে পাঠিয়ে দে আমাকে। বৃদ্ধাশ্রমের খরচ আমিই চালাতে পারব।

মায়ের চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিল সুপ্রতিম, অমিতা।

ঠাম্মি নির্বাসনে যেতে চাইছে। বৃদ্ধাশ্রমে। সঙ্গে লালিপপ আর ঝুমঝুমি নিয়ে যাবে— দুই হাতে তালি বাজিয়ে হেসে উঠেছিল দ্যুতি।

যাবই তো। একশোবার যাব। এ সংসারে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সবার উপেক্ষার...।

কী বলছ মা? প্রতিবাদ করেছিল অমিতা, তোমার আদেশ ছাড়া সংসারের কুটোটা নড়ে না। তুমি আমাদের চোখের মণি। অন্তরের আত্মা। শরীরের হৃদপিণ্ড।

তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না ঠাম্মি। একটুও না-হঠাৎ ঝরঝর কেঁদে ফেলেছিল দ্যুতি।

আমার তো এখন ঝুমঝুমি দরকার। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঝুমঝুমি বাজিয়ে সারা বাড়ি নেচে বেড়ানোর চেয়ে...।

ও এই কথায় তোমার অভিমান হয়েছে— লতিকার মুখের কথা কেড়েছিল সুপ্রতিম, আচ্ছা মা, তুমি গৌতম ডাক্তারকে চেনো না। কারও সঙ্গে হাসি-মজা ছাড়া কোনওদিন কথা বলেছে?

আমাকে নিয়ে কেউ হাসি মস্করা করুক, আমি চাই না— সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন লতিকা।

সেই থেকে পুরো দুটো দিন কেটে গেছে। বাড়ির কারও সঙ্গে একটি কথাও বলেননি লতিকা। দ্যুতি কতবার কতভাবে চেষ্টা করেছে ঠাম্মির মুখে এক চিলতে হাসি দেখতে কিন্তু পারেনি। অমিতা কতবার অনুরোধ করেছে, একটা গান শোনাও না মা। তোমার প্রিয় রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা— আপন হতে বাহিরে হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া। না, সামান্য গুণগুণটুকুও করেননি লতিকা।

আচ্ছা মা, সেই ঘটনাটা তোমার মনে আছে? লতিকার পিঠে হাত রেখে পাশে গিয়ে বসেছিল সুপ্রতিম।

কোন ঘটনা বাপি? সঙ্গে সঙ্গে জানতে চেয়েছিল দ্যুতি।

সে এক মজার ঘটনা, মেয়ের প্রশ্নের যেমন তেমন উত্তর দিয়ে আবার লতিকাকে নিয়ে পড়েছিল সুপ্রতিম— তোমার প্রিয় ছাত্রী অমিতা ক্লাসে বসে টিচারদের কার্টুন আঁকত। একদিন তোমার ক্লাসে মন দিয়ে তোমার কার্টুন আঁকছিল। তুমি গিয়ে খপ করে ধরে ফেললে। তারপর—

তাই মা? তুমি তো খুব দুষ্টু ছিলে—গল্পের টানে পেয়ে বসেছিল দ্যুতিকে, বলো না ঠাম্মি, তারপর কী হল।

না মা বলো না প্লিজ— শাশুড়িকে অনুরোধ করেছিল অমিতা, জানতে পারলে দ্যুতি সারাক্ষণ আমার পিছনে লেগে থাকবে। প্লিজ মা, বলো না। মুখ খোলেননি লতিকা। পুত্রবধূর অনুরোধ কিংবা নিজের অন্তর্মুখী অভিমান, যাই হোক না কেন সুপ্রতিমের উপস্থাপন করা গল্পের শূন্যস্থান পূরণ করেননি। বরং ভাবলেশ চোখে শুধু তাকিয়ে থেকেছেন দেওয়ালে ঝোলানো ডুয়ার্সের সবুজ জঙ্গল ভরা ছবির বুকে।

বলো না বাপি, তারপর কী হয়েছিল, বায়না করে দ্যুতি— ঠাম্মি নিশ্চয়ই একক্লাস মেয়েদের সামনে মায়ের কান মলে দিয়েছিল। ইস্ কী লজ্জা। কী লজ্জা।

থাম তো, ছোটবেলায় ওরকম দুষ্টুমি সব ছাত্রছাত্রীই করে থাকে। আমরা তো আর তোদের মতো রামগরুড়ের ছানা ছিলাম না তাই হাসিঠাট্টাতেও আমাদের কোনও বাধা নিষেধ ছিল। আমরা ছাত্রীরা আর দিদিমণিরা একাকার হয়ে কত মজা করতাম—পুরনো স্মৃতির আতরদান খুলতে কার না ভাল লাগে। সুযোগ পেয়ে সেই ভাল লাগাকে আর একবার প্রকাশ করে ফেলে অমিতা। লতিকার জন্যে, লতিকার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে ওটার জন্যে।

বাপি— ডাক দিয়েছিল দ্যুতি।

বলো মামণি— পেটের ভিতর গল্পের পরিণতি শোনানোর পর দম ফাটানো হাসি গিজ গিজ করছিল। তবুও হাসতে পারেনি সুপ্রতিম। সবাই মিলে অত হাসাহাসি করলে যদি আরও রেগে যান তাই।

বলো না, ঠাম্মি কী করল। মাকে কি বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিল? আবদার করে দ্যুতি।

আমিই বলছি শোন। মায়ের কাছে ধরা পড়ে আমার সে কী কান্না। কাঁদতে কাঁদতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

তাই—বিস্ময় প্রকাশ করে ক্ষান্ত হয়েছিল দ্যুতি।

পুরো দু'দিন কেউ গলার স্বর শোনেনি লতিকার। সুপ্রতিম ছুটে গেছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, মাসিমার এটা মনের রোগ। এই রোগের উৎস একাকিত্ব। অমন কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সরে এসে নিজেকে একা ভাবছেন। তার উপর দুই ছেলে-মেয়ে বাইরে থাকে। মোবাইল চালু হওয়ার পর থেকে আত্মীয়স্বজনরাও কেউ কারও বাড়ি পা মাড়ায় না। আমাদের এই শহরতলি এখন শহর হয়ে গেছে। ফ্লাটবাড়ির মতো। ঘরের পাশে আরশিনগর থাকলেও সেখানে যে পড়শি বসত করে তা আমাদের জানা নেই।

তা হলে উপায়? চিন্তায় ঢলে পড়েছিল সুপ্রতিম। গৌতম ডাক্তারের চেম্বারে বসেই দিল্লিতে ফোন করেছিল অপ্রতিমকে— তুই মানে তোরা শীঘ্রি চলে আয় ভাই।

উপায় একটাই। ছোট্ট শিশুর মতো আগলে রাখতে হবে মাসিমাকে। যখন যা চাইবেন, বায়না করবেন সব কুলোতে হবে।

মা তো কিছুই চান না—

চান। তোমরা বুঝতে পারো না।

গত সপ্তাহে প্রেশারের ওষুধ আনতে বলেছিলেন। আমি গুরুত্ব দিইনি। কারণ একপাতা ওষুধ তখনও মায়ের কৌটোয়। এক পাতা মানে দশদিনের ওষুধ— অনেকটা নিজের কথা নিজের কাছে বলার মতো বিড় বিড় করেছিল সুপ্রতিম, সেটা যে এত সিরিয়াস হবে কী করে বুঝব?

তোমার ওষুধ এনে দেওয়া উচিত ছিল, রায় শুনিয়েছিলেন ডাক্তার গৌতম মুখার্জি— আমি মাসিমাকে যেটুকু চিনি জানি তাতে ওঁর স্বভাবটাই ওরকম। সংসারে কোনও জিনিস বাড়ন্ত হোক উনি পছন্দ করেন না। জিনিস থাকতে জিনিস জোগাড় করে রাখাটাই ওঁর স্বভাব। সে ওষুধই হোক কিংবা চাল ডাল মশলা।

আপনি ঠিক বলেছেন গৌতমদা— সুপ্রতিমের সঙ্গে আসা অমিতা এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। ডাক্তারের মুখে হক কথা শোনার পর চুপ করে থাকতে পারেনি—মা রোজ সংসারের খবর



নেন। ভাঁড়ার দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

বললাম তো মাসিমার জন্যে তোমরা আর একটু বেশি সময় দাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। চিন্তা কোরো না বউদি, মাসিমার সব ম্যানিয়া ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া মান-অভিমান নিয়েই তো সংসার। মাসিমা ভাল হয়ে গেলে তোমরা পাল্টা অভিমান শুরু করবে। দেখবে বিষে বিষে বিষক্ষয় হবেই।

ওভেন নিভিয়ে চুপি চুপি দরজার পাশে এসে দাঁড়ায় অমিতা। ভুল নয়। গান গাইছেন লতিকা— আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে—।

কী সুন্দর গলা। অনেকটা মোহরদির মতো। হবে না কেন, মোহরদির সব রেকর্ডই তো আছে মায়ের সংগ্রহে। খুশি হয় অমিতা। ভীষণ খুশি। মা তাহলে শামুকখোল ছেড়ে বাইরে আসছেন। উলু দিতে ইচ্ছে করে। শঙ্খ বাজাতে ইচ্ছে করে অমিতার।

ঠাম্মির গান শুনে ছুটে আসে দ্যুতি। চোখের ইশারায় কাছে যেতে নিষেধ করে অমিতা। ফিস ফিস করে মেয়ের কানে— গাইতে দে। গান গাইতে পারলেই মা আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবেন।

দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে— পরের লাইন গাওয়ার আগেই কোথায় যেন বেজে ওঠে মোবাইল। দৌড়ে যায় দ্যুতি। যাওয়ার আগে ধরতে হবে। ঠাম্মির সব ফোনই প্রায় দ্যুতি ধরে দেয়। বাতের ব্যথায় দৌড়াদৌড়ি করে ফোন ধরতে পারেন না লতিকা।

হ্যালো, পিসিমণি। ধরো, ঠাম্মিকে দিচ্ছি—

টেলিফোনে উচ্চস্বরে কথা বলা দ্যুতির অভ্যাস। অমিতা জানতে পারে সুলতা ফোন করেছে মেমপিস থেকে। সুলতার ফোন এলে লতিকার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। কথা বলার জন্যে। সুতরাং রান্নাঘর ছেড়ে লতিকার ঘরে পৌঁছে যায় অমিতা।

দশদিন পরে মায়ের খবর নেওয়ার সময় হল? ফোনের শুরুতেই মেয়ের কানে অভিমান ঢেলে দেন লতিকা, কেমন সন্তান তোরা? মা বেঁচে থাকল না মরে গেল খবর নেওয়ার সময় পাস না? তোদের যদি অতই ব্যস্ততা থাকে, ফোন করিস না। তিনকাল ছেলে শেষকালের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি। এ কালটাও ঠিক পার করে দেব।

ফোন কেটে দেন লতিকা। অমিতা বুঝতে পারে অভিমানের মেঘ একটু ফিকে হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। ভরসা একটাই, মা কথা বলেছেন।

পিসিমণিকে তুমি খামোখা বকে দিলে ঠাম্মি—লতিকার পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়ে দ্যুতি।

বেশ করেছি। হাজারবার বকব। ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়। অথচ শেষ জীবনে তাদের কাছ থেকে কোনও প্রতিদান পাওয়া যায় না—দ্যুতিকেও দুমদাম কথা শোনাতে ভোলেন না লতিকা।

কই আমার মা তো আমাকে মানুষ করার জন্যে কষ্ট করে না, পরিবেশ হাল্কা করার চেষ্টা করে দ্যুতি।

তোমাদের কথা হয়ে গেছে? দাও, সুলতাকে দাও—ঘরে ঢুকেই ফোনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয় সুপ্রতিম।

কেটে গেছে— জানিয়ে দেয় অমিতা।

চলো মা, আজ আমরা একসঙ্গে ডিনার করব—লতিকাকে আহ্বান করে সুপ্রতিম।

না। আমার ওই সব মাছ-মাংসের আঁশটে গন্ধ সহ্য হয় না। তোরা যা— গম্ভীর জবাব দিয়ে বিছানার উপর গুছিয়ে বসেন লতিকা।

আজ তো শনিবার। নিরামিষ। চলো না মা, অনেকদিন এক টেবিলে বসে খাওয়া হয় না — লতিকাকে কোলের ভিতর জড়িয়ে ধরে অমিতা।

ছাড়, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না—অনেকদিন পরে পুত্রবধু নয়, ছাত্রীকে বকে দেন লতিকা।

আমাদের ভালবাসা তোমার আদিখ্যেতা মনে হয়, ছলছল করে অমিতার চোখ— তুমি জানো না, তোমার স্থান আমাদের কাছে কোথায়। তুমি আমাদের চোখের মণি। অথচ তুমি বলছ আদিখ্যেতা। ঠিক আছে— শাশুড়িকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অমিতা। পা বাড়ায় রান্নাঘরের দিকে। কারণ এখনই পালিয়ে না গেলে স্বামী-কন্যার সামনে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না।

দাঁড়া। কোথায় যাচ্ছিস? ধর আমাকে— খপ করে অমিতার আঁচল চেপে ধরেন লতিকা।

ঘুরে দাঁড়ায় অমিতা। ঝাঁপিয়ে পড়ে শাশুড়ির কোলে। সারা শরীরে ঢেউ তুলে তুলে ডুকরে কেঁদে ওঠে — তুমি আর কখনও আমাদের উপর অভিমান করবে না। কথা দাও।

চুপ কর। চুপ কর— অমিতার পিঠে হাত বোলান লতিকা। — কেন যে তোদের উপর মাঝে মধ্যে এত অভিমান হয় কে জানে। তোরা আমাকে এত ভালবাসিস অথচ আমি তোদের ভালবাসতে পারি না। কেন? কেন?

আহ্! মা। তোমরা কী শুরু করলে? এগিয়ে এসে মাকে ছুঁয়ে দেয় সুপ্রতিম। পাশে দাঁড়িয়ে দু'চোখের ধারা ঝরায় দ্যুতি। ঠিক তখনই দ্বিতীয়বার বেজে ওঠে লতিকার মোবাইল। ঝাপসা চোখে দেখে নেয় দ্যুতি—মেমপিস থেকে আবার ফোন করেছে সুলতা

দে, আমাকে দে— মেয়ের হাত থেকে নিয়ে ফোন কানে তোলে সুপ্রতিম।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু

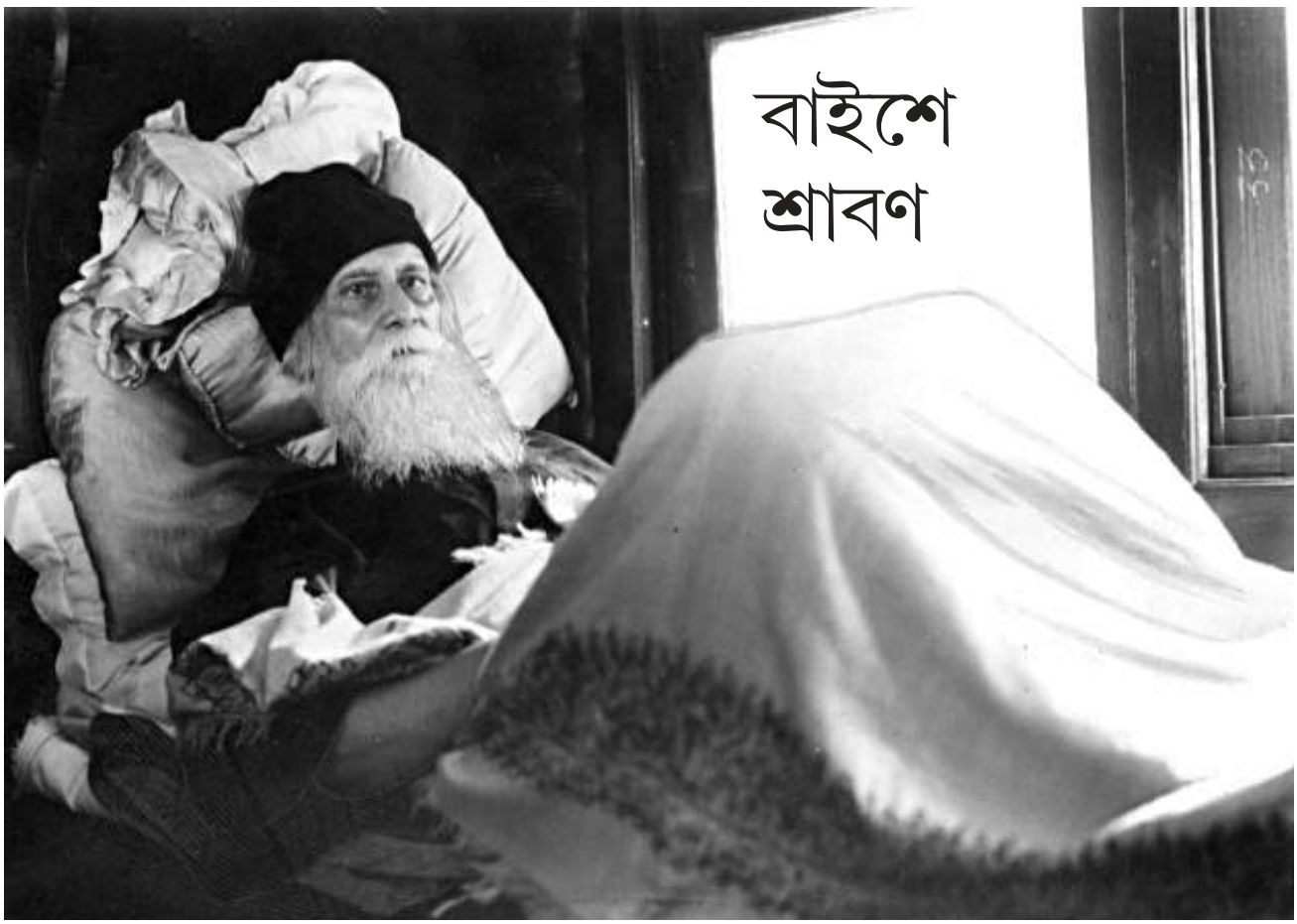
বাইশে
শ্রাবণ

অতি রবীন্দ্রভক্তি সেদিন লজ্জা দিয়েছিল

অসীম গণ

না সেদিন শ্রাবণধারায় অবিরাম বৃষ্টি হয়নি, তবুও বুকফাটা চাপা কান্নায় সমস্ত আকাশ এক অদ্ভুত আঁধারে ঢেকে গিয়েছিল। এক অপূর্ব জীবন-সংগীতের মূর্ছনা যেন সমে এসে থামল— এই বাইশে শ্রাবণে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তারিখ।

ওপরওলার কী এমন অঙ্কের হিসেব যে, একটা মানুষ তার শৈশব থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দুঃখ, যন্ত্রণা, মান অপমান থেকে মুক্তি পায় না! অথচ, তাঁর লেখনীতে দিনের আকাশে প্রখর রৌদ্রপ্রতাপ, আর রাতের আকাশে অযুত সহস্র নক্ষত্ররাজি। কর্তব্যে অবিচলিত সরস্বতীর বন্দনায় যেন এক স্থিরকল্প ঋষি। এই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালির আহ্লাদের শেষ নেই। সে এক অপূর্ব গীতবিতান।

কবির সাহিত্যকর্মের ওপর আলোকপাতে আমার স্পর্ধা নেই। তাঁর ব্যক্তিজীবনের এত শোক-তাপ থেকে তিনি কখনও পরিত্রাণ পাননি। এমনকী মৃত্যুর পরেও না! একটা চাপা অব্যক্ত বেদনার চোরাস্রোত রয়ে গিয়েছে কবির জীবনে আমৃত্যু! 'অতোবড়ো জীবনের আবির্ভাব জগতে রোজ হয় না। এমন জীবন পাঠ করলে আমাদের ক্ষুদ্রজীবন ক্লিন্নতা থেকে পরিত্রাণ পায়। জীবনে জীবন যোগ হয়।'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ পুত্র রবি ছোটবেলায় মায়ের আদর পাননি। শৈশব কেটেছে চাকরবাকরদের তত্ত্বাবধানে। যখন তাঁর বয়স ৭/৮ বছর, দাদা বিয়ে করে আনলেন কাদম্বরীকে। ছোট্ট রবি খেলার সাথি পেলেন বউদিকে। সেই প্রাণাধিকা বউদি চোদ্দোবছর পর আত্মহত্যা করলেন! সে খবর ঠাকুরবাড়ি থেকে চাপা দেওয়া হল! সে কষ্ট, সে যন্ত্রণা বুকে যেন শেল বিঁধে রইল সারাটা জীবন ধরে। তাঁর যখন বয়স ত্রিশ, তখন কবির স্ত্রী এক অজানা রোগে গত হলেন। অনেক যত্ন করেও স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলেন না। তিন কন্যা ও দুই পুত্রকে কবির কাছে রেখে গেলেন।



তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকা ক্ষয় রোগে মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর প্রিয় পিতাকে ছেড়ে চলে গেল। এর প্রায় চার বছর পর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় কলেরায়। বড় আদরের সন্তান চলে গেল। কবির চোখে নীরব জলধারা, ওই দিনেই পাঁচ বছর আগে কবির স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর 'মনে হল, আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।'

বিপদ যেন তাঁর পথ ছাড়ে না। আবার অকালমৃত্যু। দশ বছরের মধ্যে বড় মেয়ে মাধুরীলতার ক্ষয়রোগ ধরা পড়ল। তখন এসব রোগের কোনও চিকিৎসা বের হয়নি। আদরের মাধুরী ছিল কাদম্বরীর প্রিয় লেখক বিহারী চক্রবর্তীর পুত্রবধূ। কিন্তু জামাইবাড়ির সঙ্গে কবির সদ্ভাব ছিল না। তাই, জামাই যখন অফিসে বেরিয়ে যেতেন, কবি আসতেন চুপি চুপি রুগ্‌ণা মেয়ের কাছে। তাকে গল্প শোনাতেন, কবিতা শোনাতেন। একদিন এ গল্পও শেষ হয়ে গেল। মাধুরীলতা চলে গেলেন, নির্বাক অপার নির্বাসনে ফেলে দিয়ে এলেন এক একাকী অসহায় প্রিয় পিতাকে।

বেঁচে রইল শুধু মীরা ও রথীন্দ্রনাথ। কবি বেঁচে রইলেন মীরার ছেলে নিতুকে নিয়ে। এই নাতিকে নিয়েই কবির যত আহ্লাদ। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি কবিকে কখনই শান্তি দেয়নি। উত্তাল ঝড়ের মুখে ৭১ বছরের বৃদ্ধ কবি বড় আদরের নিতুকে হারালেন। কবি কাঁদতে পারছিলেন না। পুত্রহারা কন্যার করুণ পরিণতি দেখে কবি বাকস্তব্ধ। তাঁর কম্পিত দেবচক্ষুতে চিকচিক করে নীরব অশ্রুধারা।

এত কষ্ট, এত যন্ত্রণার মধ্যে তার বিরামহীন লেখালেখি, অন্যদিকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এক শ্রেণির লেখককুল অপমানিত করে চলেছেন ধারাবাহিকভাবে। আরেকদিকে দেশমাতৃকার পরাধীনতার জ্বালা। দিনে দিনে ক্লান্ত শরীরটা ভেঙে পড়ছিল। অসুস্থ শরীরে গ্রামের লোকের সীমাহীন জলকষ্টের কথা শুনে, ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে রাগে, দুঃখে বিদ্রোহ করে ওঠেন কবি, "এদের লজ্জা করে না নিজেদের সিভিলাইজড গভর্নমেন্ট বলতে? আমার তো এই জলকষ্টের কথা মনে করলে সমস্ত শরীরের রক্ত গরম হয়ে হয়ে ওঠে। এরা সভ্য জাত? আজ দুশো বছরের সিজিলাইজড রাজ্যশাসনের ফলে দেশে না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র, না আছে স্বাস্থ্য, না আছে শিক্ষা।... মনে হয় হাতে যদি বন্দুক থাকে দেই একেবারে গুড়ুম"— উত্তেজনায় আর কথা বলতে পারেন না, ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

জীবন যত শেষ হয়ে আসছিল, ক্লান্ত শরীরে যুদ্ধ করার শক্তিও বোধহয় হারাচ্ছিলেন। তাঁকে নিয়ে অহেতুক তোষামুদেদের তিনি পছন্দ করতেন না। অবজ্ঞায় চোখ ফিরিয়ে থাকতেন। তাঁকে নিয়ে যাঁরা ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতেন। অনেক আগে ১৯২৫-এর ২৫ ফেব্রুরারি বন্ধু রম্যাঁ রল্যাঁকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার অতি প্রিয় বন্ধু, আমি ভগ্ন ও ক্লান্ত হয়ে আসছি। আমি ফিরে আসছি সেই দেশে, যা অতিমাত্রায় ব্যস্ত, যার আমায় বা আমার আদর্শ নিয়ে ভাবার এতটুকু সময় নেই। এখানে আমার কোন প্রয়োজন নেই, অন্তত এই মুহূর্তে নয়। আমার ভয় হয়, আমাদের দেশের মানুষ আমার আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ভাবনাকে অপরিণত ভাবতে চায়, ভাবতে চায় একটি কাব্যিক বিলাস হিসাবে যা এযুগে অচল...।'

এই ভাবনার প্রায় পনেরো বছর পর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ২১ এপ্রিল, ১৯৪১ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এক চিঠিতে লিখছেন, ওই একই খেদোক্তির অনুরণন : কল্যাীয়াসু,

আমাকে ভুল বোঝবার সময় ঘনীভূত হয়ে এসেছে এইটেই আমার সবচেয়ে দুভার্গ্যের বিষয়। ... আমি নিজেই বিশ্বাস করিনে এবং আশা করি যারা আমাকে জানে তারা সে কথাগুলো সত্য বলে নেয় না।

ইতি-প্রলাপভাষিত কবি।'

অবশেষে এল সেই শেষের সে সেদিন, ২২শে শ্রাবণ। কবি চাইছিলেন না, তাঁর অপারেশন হোক। কবি চাইছিলেন না তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আনা হোক। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অশক্ত বৃদ্ধ ক্ষীণপ্রায় কবিকে জোর করে কলকাতায় আনা হল এবং তাঁর অপারেশন হল। আজ ২২শে শ্রাবণ। তিনি অমৃতলোকে চিরশান্তিতে শায়িত হলেন। কবি অপারেশনের আগে বুঝেছিলেন, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তিনি বারবার বলতেন, মৃত্যু না থাকলে জীবনের কোনও মানে নেই। মারা যাবার আগে গুরুদেব নির্মলকুমারীকে মনে করে দিয়েছিলেন, একবার নয়, একাধিকবার বলেছিলেন, "তুমি যদি আমার সত্যি বন্ধু হও, তাহলে দেখ আমার যেন কলকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে, 'জয় বিশ্বকবি কি জয়, জয় রবীন্দ্রনাথের জয়, বন্দেমাতরম্'— এই রকম জয়ধ্বনির মধ্যে সমাপ্তি না ঘটে। আমি

যেতে চাই শান্তিনিকেতনের উদার মাঠের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলায়, আমার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে। সেখানে জয়ধ্বনি থাকবে না, উন্মত্ততা থাকবে না। থাকবে শান্ত স্তব্ধ প্রকৃতির সমাবেশ। প্রকৃতিতে মানুষে মিলে দেবে আমাকে শান্তির পাথেয়। আমার দেহ শান্তিনিকেতনের মাটিতে মিশিয়ে যাবে— এই আমার আকাঙ্ক্ষা। চিরকাল জপ করেছি 'শান্তম্'। এখান থেকে বিদায় নেবার আগে যেন সেই 'শান্তম' মন্ত্রই সার্থক হয়। কলকাতার উন্মত্ত কোলাহল, জয়ধ্বনির কথা মনে পড়লে আমার মরতে ইচ্ছে করে না। তোমাকে সব বলে রাখলুম আগে থেকে।"

একথাগুলো বলতে গেলে তিনি অনুরোধ করেছিলেন নির্মল কুমারীকে। কিন্তু ওই উদভ্রান্ত অশিক্ষিত অচেনা তোষামুদের দল, মৃত্যুর পর কবির দেহখানি তার আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কবির শেষ ইচ্ছাকে দাম দেওয়ার মনোবৃত্তি ওদের নেই। জীবনে এমন মরণেও এমন প্রাপ্তি? এই ঘটনার নির্মম বিবরণ নির্মালকুমারীর কাছ থেকে শোনা যাক—



তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে নির্মলাকুমারী জোড়াসাঁকোতে এসে দেখেন জোড়াশাঁকোর প্রাঙ্গণে মহাজনসমুদ্র, এ পার হয়ে উপরে ওঠা অসম্ভব। অন্যপথ দিয়ে তিনি উপরে আসলেন। ততক্ষণে কবি সব মায়া ত্যাগ করেছেন। 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন : কবিকে 'যখন স্নান করানো হচ্ছে, নিচের জনতার মধ্যে একদল উপরে এসে বাইরে থেকে টান মেরে দরজার ছিট্‌কিনি খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল। কী দারুণ অপমান কবির চৈতন্যহারা এই দেহটার! যে মানুষ এত স্পর্শকাতর ছিলেন, যে মানুষ বাইরের মানুষের সামনে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা কখনও প্রকাশ করতে পারতেন না, সেই মানুষের আত্মহীন দেহখানা অসহায় ভাবে জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে পড়ে রইল। তাড়াতাড়ি তাঁকে ঢাকা দিয়ে সুরেনবাবুরা সবাইকে ঠেলে বাইরে বের করে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করলেন। এক-একটা দরজায় এক-একজন পাহারা। ভিতর থেকে ছিট্‌কিনি সত্ত্বেও হাত দিয়ে ঠেলে ধরে রাখা হয়েছে। তবু বাইরে থেকে প্রাণপণ ঝাঁকানি আর উন্মত্ত চিৎকার—দরজা খুলে দিন, আমরা দেখব। ... জনতার উন্মত্ত কোলাহল সমুদ্র গর্জনের মতো কানে আসছে। ঘরের মধ্যে অপরিসীম শান্তি বিরাজমান। কবি চিরনিদ্রায় মগ্ন। মুখের মধ্যে চেয়ে দেখলাম সেই শান্ত সমাহিত মুখশ্রীতে দেহের কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই। সাদা বেনারসীর জোড়, কপালে চন্দন। আজানুলম্বিত চাদরখানা পাট করে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোড়ে-মালার ফুলের গন্ধে ঘর আমোদিত। শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ। ...অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখছি।...

...বেলা তিনটের সময় একদল অচেনা লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে নিমেষে আমাদের সামনে থেকে সেই বরবেশে সজ্জিত দেহ তুলে নিয়ে চলে গেল। যেখানে বসেছিলাম সেইখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। শুধু কানে আসতে লাগলো—'জয় বিশ্বকবির জয়, জয় রবীন্দ্রনাথের জয়, বন্দেমাতরম্।'

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ শোকে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আত্মীয় বন্ধুরা, বাড়ির লোকজন শোকে বিহ্বল। এই প্রবল উৎশৃঙ্খল জনতার উন্মত্ত আচরণে অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখলেন, কবি আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেলেন, তাঁদের চোখের সামনে থেকে।

বিজয়া রায় 'আমাদের কথা'-য় লিখেছেন, জীবনের এই অধ্যায়টা আমি ভুলতে চাই। 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। যে মানুষটিকে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জিনিয়াস বলে আমি মনে করি, তিনি কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর দিন তাঁর মরদেহটাকে নিয়ে যা তাণ্ডবনৃত্য হয়েছিল, সে কথা ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। ...আমরা জোড়াসাঁকো থেকে বুলাদাদের কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। কারণ, ওই রাস্তা দিয়েই শবযাত্রা যাবে, এবং ওঁদের তিনতলার বারান্দা থেকে ভাল করে দেখতে পাব। কিন্তু যা দৃশ্য দেখলাম, তাতে ভয় হচ্ছিল, দেহটা অক্ষত অবস্থায় শ্মশানে পৌঁছতে পারবে কি না।

কাঁধের ওপর খাট বহন করে যাচ্ছিলেন বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে দেহটাকে পেয়ে যা কাণ্ড করছিল, ভাবতে এখনও লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে। হাত-পা ধরে টানা, দাড়ি ছেঁড়া, চুল ছেঁড়া, শোকে যেন সবাই পাগল হয়ে গিয়েছিল। এরকম একজন মানুষের প্রতি কোথায় শ্রদ্ধা জানাবে, তা না করে এরকম নারকীয় বর্বরতা যেন কল্পনা করা যায় না। আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছিল।'

ওই দিন মৃণাল সেন প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নিমতলা শ্মশানে। 'বাইশে শ্রাবণ' প্রসঙ্গে তাঁর স্বগতকথন : "রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছি তাঁর মৃত্যুর দিনে। আজ এখানে (নিমতলায়) অন্য কোন মৃতদেহ আর ঢুকতে পারবে না। সবদিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেখলাম এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কোলে একটা দামি তোয়ালে, সেই তোয়ালের মধ্যে তাঁর মৃত সন্তান। রবীন্দ্রনাথের মৃতদেহ যখন নিয়ে আসা হল, 'একটা প্রকাণ্ড মানব সমুদ্রের ঢেউ' ...ওই ভিড়ের ধাক্কায় সে ভদ্রলোকের হাত থেকে তোয়ালেটা মাটিতে পড়ে গেল, মাটিতে পড়ে গেল তাঁর মৃত সন্তান, একটা শিশুর মৃতদেহ হারিয়ে গেল জনতার পায়ের নিচে!"

কলকাতার আকাশে তখন উন্মত্তের চিৎকার, লক্ষকণ্ঠের অসম-ধ্বনির ডঙ্কারে নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে—'জয় রবীন্দ্রনাথের জয়', 'জয় বিশ্বকবির জয়' ধ্বনিতে। সে লজ্জা এখনও অনরণিত হচ্ছে!

তখন বোধহয় 'শান্তিনিকেতনের উদার মাঠের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলায়' বিশ্বভারতীর ছেলেমেয়েরা নিঃস্তব্ধ 'শান্তম' মন্ত্র উচ্চারণের কবির প্রতি প্রার্থনা করছিল :

'যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি, ...।'

উপল খণ্ড

তিন আনন্দমূর্তি

অশোক বসু











সাড়ে চুয়াত্তর ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৩ সালে। এখনকার ভাষায় তখনকার ব্লকবাস্টার ছবি। উত্তম-সুচিত্রা জুটির বিজয়যাত্রা শুরু এই ছবি থেকেই। ছবিটির একটা সংলাপ ষাট বছর পরেও জীবন্ত। 'মাসিমা, মালপোয়া খামু।' কিন্তু এই সংলাপ উত্তমকুমার বা সুচিত্রা সেনের মুখে ছিল না। ছিল আর পাঁচটা সাধারণ চরিত্রের মতো একটা চরিত্রের মুখে।

এই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ক'দিন আগে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। এদের বাড়িতে এখনও রেকর্ড প্লেয়ার আছে। পুরনো রেকর্ডগুলো ওরা মাঝেমধ্যে বাজিয়ে শোনে। সেদিন প্রচণ্ড গরম ছিল। বাতাসে আর্দ্রতা ছিল প্রচণ্ড বেশি। তার মধ্যেই হঠাৎ পাওয়ার চলে গেল। এখন যা হয়ই না। লোডশেডিং শব্দটাই মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। হয়তো এলাকায় কোনও মেরামতির কাজ চলছিল। তাই পাওয়ার বন্ধ করে দিয়েছিল সিইএসসি। অল্প কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ ঘরের ছাদপাখাটা ঘুরতে শুরু করল। আমার বন্ধু উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, ঘুরসে, ঘুরসে, আমাগো পাখা ঘুরসে। এই কথাগুলো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা কমিক স্কেচের সংলাপ। যে স্কেচটা বেরিয়েছিল চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে।

তপন সিংহর 'নির্জন সৈকতে' ছবিতে এক ওড়িয়া পান্ডার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রবি ঘোষ। তাঁর মুখে ওই ছবির একটা ডায়ালগও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। পাড়ার রোয়াকে রোয়াকে তখন এই শব্দ ক'টা খুব ঘুরেফিরে বেড়াত। অলু অছি, অলু। কিংবা জহর রায়ের এক সময়ের কমিক স্কেচের একটা সংলাপ। জহর রায়ের ভাষায়, যে সংলাপটা বললেই শ্রোতাদের করতালিতে ফটফট করে এক ঝাঁক পায়রা যেন একসঙ্গে উড়ে যেত। সংলাপটা ছিল, 'ন্যাপা চেপে যা'। এই সংলাপটাও খুব মুখে মুখে ঘুরত। এখনও কারও মুখে এই সংলাপ শুনলে বিচিত্র ভঙ্গিতে মঞ্চের উপর জহর রায়ের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এঁরা বাংলা বিনোদনের তিন আনন্দমূর্তি। দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের উজাড় করে দিয়ে অঢেল আনন্দ বিলিয়ে গিয়েছেন। হাজার দুঃখেও অনেকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। কিন্তু বিনোদন জগতের বাইরেও এঁরা ছিলেন সাক্ষাৎ আনন্দমূর্তি। যেখানেই থাকতেন সেখান আনন্দে ভরে যেত। আর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকের কাছেই এঁরা ছিলেন জীবনানন্দ। সামান্য কিছু ঘটনায় ওঁদের জীবনানন্দ ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি এই নিবন্ধে।



ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন কলকাতায় প্রচুর ফাংশান হত। পুজোর পরে বিজয়া সম্মিলনীর হাত ধরে শুরু। শেষ হতে হতে সরস্বতী পুজোর পর। সারস্বত সম্মিলনী। এগুলোকে বলত বিচিত্রানুষ্ঠান। অর্থাৎ বিচিত্র রকমের অনুষ্ঠান। তাতে গান থাকত, নাচ থাকত, বৃন্দবাদন থাকত। যন্ত্রসংগীত আর কৌতুকাভিনয়ও এই তালিকায় ছিল। কমিক স্কেচ। সব অনুষ্ঠানে অন্তত গোটা দুয়েক কমিক স্কেচ থাকতই। কমিক স্কেচের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাদ দিলে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেককেই হয়তো এখন অনেকেরই মনে পড়বে না। সেই সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিলেন নবদ্বীপ হালদার। বিকৃত গলায় কমিক স্কেচ করতেন। নবদ্বীপবাবু স্টার থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয়ও করতেন। বিকৃত গলার জন্যই বিখ্যাত ছিলেন তিনি। কিছু পরে নবদ্বীপ হালদারের গলা অনুকরণ করে কমিক করতেন সুশীল চক্রবর্তী নামে এক কমেডিয়ান। ফাংশানে খুব পপুলার ছিলেন তিনি। পাড়ার ফাংশানগুলোতে হেমন্ত-মান্নাকে যেমন খুব পাওয়া যেত না, তেমনই জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনার ক্ষমতাও সকলের ছিল না। সেই সমস্ত ফাংশানে কমিক স্কেচ করতেন সুশীল চক্রবর্তী। পরের দিকে সুশীলবাবু গীতা দে-কে সঙ্গে নিয়েও অনেক কমিক স্কেচ পরিবেশন করেছেন। সুশীল চক্রবর্তী ছিলেন সেই সময়ের জনপ্রিয় নজরুলগীতির গায়ক দিলীপ চক্রবর্তীর দাদা। অল্প বয়সে খুব নাম হয়ে গিয়েছিল দিলীপ চক্রবর্তীর। প্রচুর ফাংশান করতেন। একদিন রাতের শোয়ে মেট্রোয় সস্ত্রীক সিনেমা দেখতে গিয়ে চেয়ারের তলায় রাখা বোমা ফেটে মারা গিয়েছিলেন দিলীপ চক্রবর্তী। বেঁচে থাকলে আরও অনেক নাম করতেন।

তখন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে কমিক স্কেচের রেকর্ড বেরোত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সুশীলবাবু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ডের জনপ্রিয়তা দেখে নিজেই গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে গিয়েছিলেন রেকর্ড করার ইচ্ছে নিয়ে। রেকর্ডিং অধিকর্তা তাঁর স্কেচও শুনলেন। শুনে আশ্বাস দিলেন, তাঁরা ওঁর রেকর্ড করবেন। বাইরে বেরিয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে সুশীল চক্রবর্তী ছুটেছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। নানা অনুষ্ঠানে এক সঙ্গে কমিক স্কেচ করতেন ওঁরা। এক সঙ্গে মানে দু'জনের মিলিত নয়। দু'জনেই সেই বিচিত্রানুষ্ঠানের শিল্পী থাকতেন। সেই সুবাদে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ছিলেন সুশীলবাবু। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁর কথা শুনে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

তারপর মাঝে মাঝেই সুশীলবাবু গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডিং অধিকর্তার কাছে খোঁজ নিতেন কবে তাঁর রেকর্ড করা হবে। বারবারই রেকর্ডিং অধিকর্তা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, হবে। হবে। দিনের পর দিন কেটে যায়। হয় না। শেষকালে একদিন রেকর্ডিং অধিকর্তা তাঁকে বললেন, এখন আমরা আপনার রেকর্ড করতে পারব না। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিকের রেকর্ড খুব চলছে। এখন আমাদের নতুন কারও রেকর্ড করার আর পরিকল্পনা নেই। কথাটা শুনে খুব মুষড়ে পড়েছিলেন সুশীলবাবু।

মাঝে মাঝেই সুশীলবাবু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ কলকাতার চারু অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে যেতেন। কখনও আড্ডা দিতে। কখনও ফাংশানের খোঁজখবর নিতেন। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে একদিন সকালে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন সুশীলবাবু। শুকনো শুকনো মুখে। ভানুবাবু ওঁকে দেখে বলেছিলেন, কীরে, মুখখান অমন ভ্যাবলার মতো কইরা আছস ক্যান? কী হইসে? সুশীলবাবু কোনও উত্তর দেন না। একটু থেমে ভানুবাবু তাঁর মুড বদলাতে জিজ্ঞাসা করলেন, তর রেকর্ডিংয়ের কী হইল? গ্রামোফোন কোম্পানি কী কইত্যাসে? কবে হইব? ভানুবাবুর এই কথা শুনেই ভেঙে পড়লেন সুশীলবাবু। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ও আর হবে না ভানুদা। ভানু বললেন, হইব না ক্যান? ওরা তো তর টেস্ট লইসিল। তারপর তো কইসিল হইব। হইব না ক্যান? কথাটা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন সুশীলবাবু। কিন্তু ভানুবাবুর চাপাচাপিতে বলেই ফেললেন যে, গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তা বলেছেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিক স্কেচের বাজার এখন খুব ভাল। আমরা আর নতুন কাউকে দিয়ে এখন কমিক স্কেচ করাব না। শুনে একটু থম মেরে গেলেন ভানুবাবু। তাঁর জন্যই এক তরুণ শিল্পীকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে—এটা তাঁকে খুব আঘাত দিয়েছিল। একটু পরে সুশীলবাবুকে বললেন, ফোনটা ঘুরা তো। কাকে ফোন ঘোরাবে?—জিজ্ঞাসা করলেন সুশীলবাবু। ভানু বললেন, ধর। ওই গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তারে ধইরা আমাকে দে। আড়ষ্ট হয়ে গেলেন সুশীলবাবু। গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তাকে ফোন করে ভানুদা কী বলবেন কে জানে। আমার তো হলই না। ভানুবাবুর কথা শুনে উনি যদি চটে যান তাহলে ভানুদারও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ডায়াল না ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ভানুবাবু আবার বললেন, কী রে, তরে ফোনটা ঘুরাইতে কইলাম

না। সুশীলবাবু আমতা আমতা করে বললেন, থাক না ভানুদা। ও নিয়ে আর কথা বাড়ানোর দরকার আছে? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, তরে ধরতে কইলাম ধর। ধইরা আমারে ফোনটা দে। কী হইব না হইব তরে ভাবতে হইব না। কী আর করেন। সুশীলবাবু গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তাকে ফোনটা করে রিসিভারটা ধরিয়ে দিলেন ভানুবাবুর হাতে। ফোনটা ধরেই বললেন, শোনেন, আমি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কইত্যাসি। এবার পূজায় আমি আপনাদের কোম্পানি থিক্যা রেকর্ড করুম না। ওপারে যিনি ছিলেন, তিনি যা বললেন তার উত্তরে ভানুবাবু বললেন, না না, সে সব কিস্যু না। আমি অন্য কোনও কোম্পানি থিক্যা কোনও অফার পাই নাই। পাইলেও লইতাম না। এবার আমি রেকর্ড করুম না অন্য কারণে। ওপারে যিনি ছিলেন তিনি বোধহয় জানতে চাইলেন, তাঁদের অপরাধটা কী। তার উত্তরে ভানুবাবু বললেন, আপনারা জুনিয়র আর্টিস্টদের লগে দুর্ব্যবহার করেন। কথা দিয়া রাখেন না। হেইটাই কারণ। এতক্ষণ বেশ শান্ত গলায় কথা বলছিলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে নিজের মতো করে। এবার আর ভিতরের চাপা রাগ ধরে রাখতে পারলেন না। শোনেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে কি দ্যাশ থিক্যা কমেডি উইঠ্যা যাইব? সুশীল চক্রবর্তী নামে একজন জুনিয়র আর্টিস্টরে আপনারা কথা দিসিলেন, তার রেকর্ড করব্যান। এখন কইতাসেন, ভানু ব্যানার্জির রেকর্ড খুব পপুলার হইসে। জুনিয়র আর্টিস্টের প্রয়োজন নাই। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথা শুনে তিনি যা বলেছিলেন তার উত্তরে ভানুবাবু বললেন, না না। হেইডা রাগের কথা নয়। এথিকসের প্রশ্ন। আমি জুনিয়ার আর্টিস্টদের সঙ্গে লইয়া ফাংশান করি। আর আমার জন্য একজন জুনিয়র আর্টিস্টের রেকর্ড হইব না হেই সব কথা শুনতা রাজি নই। সবায় কইব, বুড়া ভানু বাঁড়ুজ্যে জুনিয়রদের পথ আটকাইয়া বইয়া আসে। আরও কিছুক্ষণ কথা চলল। পরে, টেলিফোনটা ছেড়ে সুশীল চক্রবর্তীকে বললেন, তুই আজই এইচএমভি-তে চইল্যা যা। মনে হয় কাল পরশুই তর রেকর্ড হইয়া যাইব।

গীতা দে মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে একদিন ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে সুশীল চক্রবর্তীও ছিলেন। এই কাহিনিটা বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ভানুদার মতো মানুষ না থাকলে আমি বোধহয় কোনওদিনই এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না। ভানুদা আমার দেবতা।

ভানুদার মতো মানুষ না থাকলে হয়তো আরেকজনেরও রূপকথার জগতে পৌঁছনো হত না। তাঁর নাম সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়রা দশ বোন। ওঁর বাবা শশধর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেলের স্টেশন মাস্টার। দু'হাতে রোজগার করতেন আর চার হাতে খরচ করতেন। বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব থেকে শুরু করে বারো মাসে তেরো পার্বণ। দেশ ভাগের পর সেই মানুষটিকেই তাঁর দশমহাবিদ্যা কন্যাদের নিয়ে ছিন্নমূল হয়ে চলে আসতে হল কলকাতায়। সাবিত্রীরা দশ বোন বলে আত্মীয়-স্বজন পাড়ার লোকেরা তাঁদের দশমহাবিদ্যা বলে ডাকত। বাবাকে বলত দশমহাবিদ্যার বাবা। শশধরবাবু কলকাতায় এসে ভবানীপুরে যদুবাবুর বাজারের কাছে একটা জায়গায় বাসা গেড়েছিলেন। যেটুকু সঞ্চয় সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তা দিয়ে একটা পান-বিড়ি, সোডা-লেমোনেডের দোকান দিয়েছিলেন। সে দোকান অবশ্য বেশিদিন চলেনি।

সাবিত্রীর খুব সিনেমা দেখার ঝোঁক ছিল। সংসারে চরম দারিদ্র। সাবিত্রী কার কাছে যেন শুনেছিলেন কাছেই টালিগঞ্জ পাড়ায় স্টুডিওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ভিড়ের দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য লোক নেয়। দশ টাকা করে পাওয়া যায়। এইরকম চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তেমন কিছু ফল হয়নি। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সাবিত্রীদের কোনও একরকম আত্মীয়। ইস্কুলে পড়ার সময়ে মাঝে মাঝে শখ করে রাসবিহারীর মোড়ের পানের দোকান থেকে বরফের উপর সাজিয়ে রাখা রাংতা মোড়া মিষ্টি পান খেতেন সাবিত্রী। পান খেতে খেতেই আড্ডা মারতেন বন্ধুদের সঙ্গে। সেইরকম আড্ডা দিতে দিতে একদিন দেখলেন রোগা মতো একটা লোক ওঁর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। যেন গিলে খাচ্ছে। একদিন নয়। পরপর ক'দিন লোকটা উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ওঁকে দেখত। একদিন বাসে ওঠার সময়ে সেই লোকটা সাবিত্রীর সামনে এসে হাজির। এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি আরতির বোন? লোকটার মুখে দিদির নাম শুনে থমকে গেল সাবিত্রী। মনে হল, দিদির শ্বশুরবাড়ির কেউ হবে। কিন্তু ওর দিকে অমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে কেন? মতলবটা কী? লোকটা বলল, তোমারে আমি চিনি। কোথায় থাক তাও জানি। ঠিক তোমার মতো একটা মাইয়াই আমি খুঁজতাসিলাম। তোমারে আমার খুব পসন্দ হয়েছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল সাবিত্রীর। মনে হল, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করেন। নির্বিকারভাবে লোকটা বলল, পসন্দের কথাটা কুউদ্দেশ্যে বলি নাই। ক'দিন ধইরা তোমার চলন-বলন লক্ষ করলাম। তুমি আমাদের থিয়েটারে পার্ট করবা? বাঙ্গাল ভাষার নাটক। আগাগোড়া দ্যাশের ভাষা। শুনে লোকটার উপর থেকে রাগ চলে গেল। তবু গম্ভীর হয়ে সাবিত্রী বললেন, এ ব্যাপারে আমার বাবার সঙ্গে কথা বলবেন। লোকটা হাঁফ ছেড়ে বলল, ঠিক আসে। আমি কালই তোমাগো বাড়ি যাইয়া তোমার বাবার সঙ্গে কথা কমু। এই ভদ্রলোকই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'উত্তর সারথী' নামে ওঁদের একটা অ্যামেচার থিয়েটার গ্রুপ ছিল। তারা 'নতুন ইহুদি 'নামে একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে চলেছে। পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষকে নিয়ে নাটকটা। সব চরিত্রের মুখেই বাঙাল ভাষার সংলাপ। বাবা রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বলেই নতুন ইহুদি-তে সাবিত্রীর অভিনয় পাকা হয়ে যায়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই।

নতুন ইহুদির রিহার্সাল দিতে যাবেন সাবিত্রী। সেই সময় তাঁদের এমন অবস্থা যে, তাঁর পায়ে দিয়ে যাওয়ার মতো জুতো ছিল না। একবার ভেবেছিলেন স্কুলে যে শতচ্ছিন্ন কেডস জোড়াটা পরে যান, সেটাই পরে যাবেন। কিন্তু সেটা এতই ছেঁড়া যে পরার সময় আর পরতে পারেননি। খালি পায়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ ভানুবাবু দেখলেন সাবিত্রীর পায়ে জুতো নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, জুতা পরে আস নাই? সাবিত্রী বললেন, নেই। একটু ভেবে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বললেন, আইস আমার সঙ্গে। বলে রাসবিহারী মোড়ে একটা জুতোর দোকানে ঢুকে একজোড়া নতুন জুতো কিনে দিয়েছিলেন। সেই জুতোটা ছিল সাবিত্রীর জীবনের অক্ষয় স্মৃতি। ছিঁড়ে যাওয়ার পরেও যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছিলেন বহুদিন।

নতুন ইহুদি নাটকটা খুব জমে গিয়েছিল। ওই নাটকে অভিনয় করেছিলেন পরে জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, বিনু বর্ধন এইরকম অনেকে। ওঁরা সকলেই কমবেশি পরিচিত মুখ। বিনু বর্ধন ছিলেন পরিচালক সুধীর মুখার্জির সহকারী। সুধীরবাবু তখন 'পাশের বাড়ি' ছবিটা করার তোড়জোড় করছেন। কিন্তু নায়িকা পাচ্ছেন না। বিনুবাবু নতুন ইহুদির রিহার্সাল রুমে সে সব কথাই বলছিলেন একদিন। হঠাৎ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উঠলেন, তরা কীরকম নায়িকার খোঁজ করতাছস? বিনুবাবু বললেন,

সিরিওকমিক ছবি। খুব চটপটে আর রসিক মেয়ে দরকার। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চাইলেন, হিরোইনের বয়স কত? বিনুবাবু বললেন, ১৮-১৯। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একবার সাবিত্রীর দিকে দেখে নিয়ে বললেন তুই কটকটিরে লইয়া সুধীরদার কাছে যা। সাবিত্রীর নামই কটকটি। আরও কিছু কথাবার্তার পর বিনু বর্ধন সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সুধীর মুখার্জির কাছে গেলেন। শেষ পর্যন্ত পাশের বাড়িতে সাবিত্রীর কাস্টিং ফাইনাল হয়ে গেল। আর সেই পাশের বাড়ি ছবিটাই সাবিত্রীকে রুপোলি পর্দায় পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিল।

বছর কুড়ি আগে সাবিত্রীকে নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম। সেই সময়ে ওঁর সঙ্গে নানা জন সম্পর্কে কথা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এসে গিয়েছিলেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল ওঁর। বলেছিলেন, ভানুদা আমার জন্য যা করেছেন তা শোধ করার নয়। তাঁর হাত ধরেই আমার নাট্যজগতে প্রবেশ। এবং তাঁর সুপারিশেই সিনেমার নায়িকা হওয়ার সুযোগ। ভানুদা আমাকে জন্মসময় থেকে চেনেন। জন্মের পর ষষ্ঠীপুজোর দিন আমার মুখ দেখে এসেছিলেন। তারপরে কোথায় কত দূরে চলে গিয়েছিলেন খোঁজ ছিল না। আবার ওঁর হাত ধরেই আমার কিশোরী বয়সে থিয়েটার করতে আসা। ভানুদা তারপর থেকে আমার জীবনে যত ঝড়ঝাপটা এসেছে, সবসময় পাশে থেকেছেন। আমাকে সাহস জুগিয়েছেন। উপদেশ দিয়েছেন। আমার জন্য লড়াইও করেছেন। বাবা-মা-দিদিরা ছাড়াও কারও কাছেই আমি এই স্নেহ পাইনি।

সাংবাদিক রবি বসুর সঙ্গে সেই সময়ের সিনেমা, সাহিত্য, সংগীত জগতের দিকপালদের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সিনেমায় বলতে গেলে প্রায় সকলেই তাঁর আত্মীয় ছিলেন। সংগীত জগতেও পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল থেকে শুরু করে নবীনতম শিল্পীদের প্রিয়জনদের তালিকায় তিনি ছিলেন। সাহিত্য জগতের বিখ্যাত সকলেরই তিনি ছিলেন বাড়ির ছেলে। সেইরকম সম্পর্ক ছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। রবিবাবু মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরের মানুষ। কলকাতায় এসে বিচিত্র কাজকর্ম করতে করতে সিনেমা জগতের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রবিবাবু তাঁর বাড়ি তমলুকে প্রচুর সিনেমা, থিয়েটার, বিচিত্রানুষ্ঠান করাতেন। বিখ্যাত শিল্পীরা রবিবাবুর অনুরোধ ঠেলতে পারতেন না। যেতেই হত। স্মৃতির সরণিতে বাংলা চলচ্চিত্রের অর্ধশতাব্দীর নানা কাহিনি নিয়ে তাঁর বই 'সাতরঙ'-এ রবিবাবু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একটা ঘটনার কথা লিখেছেন। সেবার তিনি একটা নাট্যানুষ্ঠান করিয়েছিলেন তমলুকে। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ। তাতে যে সব শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা সবাই প্রায় স্টার থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করতেন। জহর গাঙ্গুলি, বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর পুত্র নবকুমার। এই নবকুমারই পরে কী কারণে জানি না স্টার থিয়েটারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তখনকার জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেত্রী দীপিকা দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক শিল্পী ছিলেন। সবাইকে গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা শ্যামা লাহা। তিনিও অভিনয় করেছিলেন। সম্ভবত তমলুকের রূপশ্রী সিনেমা হলে নাটকটির অভিনয় হয়েছিল। রবিবাবু লিখেছেন, নাটকটা খুব জমে গিয়েছিল। আমার যে সব স্নেহভাজন এই নাটকের পিছনে টাকা লগ্নি করেছিলেন তাঁরা সব খরচখরচা বাদ দিয়ে কিছু লাভও করেছিলেন। অভিনয় শেষ হতে হতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। সব কাজকর্ম শেষ করে রবিবাবু যখন শিল্পীদের যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে গেলেন, দেখলেন তখনও জেগে আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। রাত্রি তখন একটা বেজে গিয়েছে। রবিবাবু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখনও শুতে যাওনি? ভানুবাবু বললেন, না। তর জন্যই অপেক্ষা করত্যাসি। রবিবাবু বললেন, কেন ভানুদা? খাওয়া-দাওয়ায় কোনও ত্রুটি হয়েছে? ভানুবাবু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বললেন, একদম না। চমৎকার। শোবার ব্যবস্থাটিও। যারে কয় দুগ্ধফেননিভ শয্যা। রবিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে? আবার তাঁর সহজাত ভঙ্গিতে ভানুবাবু বললেন, তর কানটি কইয্যা মুইল্যা দিমু বইল্যা অপেক্ষা করত্যাসি। রবিবাবু বুঝলেন, দোষ-ত্রুটি নয়, ভানুবাবু খুব মুডে আছেন। অন্য কিছু বলতে চান। রবিবাবুও মজা করে ভানুবাবুর দিকে কানটি এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দাও না মুলে। তবে তার আগে বলবে তো কোন অপরাধে আমার এই শাস্তি? ভানুবাবু বললেন, অপরাধ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তারপর ভানুবাবু তাঁর নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে যা বললেন তার সার কথা—আমরা অভিনয় করে সকলেই টাকা পেয়েছি। শো ছিল হাউসফুল। তার মানে যাঁরা টাকা ঢেলেছিল তারা আসল তো ফেরত পেয়েইছে। সঙ্গে বেশ ভালই লাভ হয়েছে। কিন্তু তুই যে এই মাস খানেক ধরে মুখের রক্ত তুলে খাটলি তোর পকেটে ক'টা টাকা এল? এক হাত জিভ কেটে রবিবাবু বলেছিলেন, ছিঃ ছিঃ। এটা কী বলছ ভানুদা? পাড়ার ছেলেরা সবাই ধরেছে। আমি তাদের জন্য গায়ে গতরে খানিকটা খেটে দিয়েছি। এর জন্য কি টাকা নেওয়া উচিত? ভানুবাবু বলেছিলেন, এই রোগেই তো ঘোড়া মরে। জীবনের সার কথা বলি। যে কোনও ব্যাপারে প্রফেশনাল না হলে কোনওদিন উন্নতি করা যায় না। কথা ক'টা বলে পকেট থেকে একটা খাম বের করে রবিবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, এটা রাখ। এর মধ্যে সাড়ে তিনশো টাকা আছে। এখানে অভিনয় করার জন্য আমি চারশো টাকা পেমেন্ট পেয়েছি। চারশো টাকা সে আমলে খুব কম কথা নয়। ভানুবাবু বললেন, এই সাড়ে তিনশো টাকা এক্ষুনি বাড়ি যাইয়া বউমার হাতে দিবি। এ নিয়ে একটা কথাও কইবি না। কইলে আর কোনওদিন তর মুখদর্শন করুম না। রবিবাবু একটা কথাও বলতে পারেননি। তাঁর জন্য ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এমনভাবে ভেবেছেন! তাঁর বুক ফেটে কান্না উঠে এসেছিল।

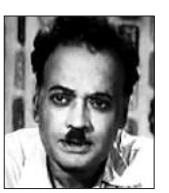

জহর রায়

জহর রায়ের প্রচণ্ড বই পড়ার নেশা ছিল। এই নেশাটা তাঁকে ধরিয়েছিলেন অহীনবাবা। মানে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরি। জহর রায়ই বলেছেন, আমরা সবাই ওঁকে অহীনবাবা বলে ডাকতাম। ওঁর ছিল প্রচণ্ড বই পড়ার নেশা। গোপালনগরের বাড়িতে বিরাট বইয়ের কালেকশন। হেন বিষয় নেই যে, সে বিষয়ে ওঁর বিশাল লাইব্রেরিতে কোনও বই নেই। বিশাল লাইব্রেরি হলেও সদস্য সংখ্যা গুটিকয়। বাড়ির ক'জন। বাইরের কেউ এসে বই নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন বটে, কিন্তু বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। জহর রায়ই বলেছিলেন, বই হল অহীনবাবার প্রাণ। আমাকে বলতেন, বই পড়ো। বই পড়ো। যে লাইনে এসেছ, সেখানে পৃথিবীর অন্য দরজাগুলো তোমার সামনে বন্ধ। কিন্তু বই পড়া তো তোমার কেউ আটকাতে পারবে না। পড়তে পড়তে দেখবে পৃথিবীর সব

বন্ধ দরজা তোমার সামনে খুলে গিয়েছে। শুধু অহীনবাবা বলেছিলেন বলে নয়, নিজের ভিতর থেকেও একটা তাগিদ ছিল বই পড়ার। আসলে জহর রায় নিজে খুব বেশি পড়াশোনা করার সুযোগ পাননি। তার আগেই সংসারের জোয়াল ঘাড়ে চেপে গিয়েছিল। সেজন্যই যখন হাতে একটু টাকা আসতে শুরু করল তখন থেকেই বই কিনতে শুরু করেছিলেন জহর রায়। উনি থাকতেন মির্জাপুর স্ট্রিটে অমিয় নিবাস বলে একটা মেসবাড়িতে। যাকে বলা হত বোর্ডিং হাউস। অমিয় নিবাসে দু'-দু'টো ঘর নিয়ে রেখেছিলেন জহর রায়। দু'টো ঘর মানে ছ'জনের থাকার জায়গা। জহর রায় থাকতেন একা। মাটিতে একটা ছু'ফুট বাই তিন ফুট বিছানা পেতে শুতেন। বাকি সব বইয়ে ভর্তি। যখন হাতে অঢেল টাকা এসেছে, তখনও যেমন নিয়মিত বই কিনেছেন তেমনি যখন অভাব চলছে, তখনও বই কেনায় তাঁর ইচ্ছের অভাব হয়নি। অহীন্দ্র চৌধুরির মতো তিনিও বই কাউকে দিতেন না। বলতেন, মার্ক টোয়েন যেমন বলেছেন বই আর বউ দু'টোকেই সর্বদা নিজের তাঁবে রাখবে। কখনও হাতছাড়া করবে না। বইয়ের পুরোপুরি মালিক হতে না পারলে তৃপ্তি আসবে না। সর্বদা নিজের হাতে থাকবে, নিজের আলমারিতে থাকবে। ইচ্ছেমতো পড়বে। পড়তে পড়তে একটা বই ভাল না লাগলে আরেকটা বই ধরবে। সেইজন্যই জহর রায় অমিয় নিবাসের দুটো ঘর ভর্তি লাইব্রেরি করেছিলেন। বলেছিলেন, অহীনবাবার কথাটাই ঠিক। লাইব্রেরিতে গিয়ে হয় না। কখন আমার কোনটা পড়তে ইচ্ছে হবে সে কি আর লাইব্রেরি আমাকে দিতে পারবে?

সত্যিই কি অহীনবাবার ইচ্ছেতেই জহর রায়ের বই পড়ার নেশা তৈরি হয়েছিল? তা বোধহয় নয়। এটা অন্যতম একটা কারণ। এর বাইরেও আরও কিছু কারণ রয়েছে। সংসারের দায়-দায়িত্বের চাপে জীবনে তিনি উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাননি। পাটনা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢুকে পড়তে হয়েছিল চাকরি জীবনে। কুড়ি টাকা মাইনেতে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রুফ রিডারের চাকরি নিয়েছিলেন। কিছু বাড়তি রোজগারের সুযোগ এসে যাওয়ায় পাটনা ইউনিভার্সিটির প্রুফ রিডারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালসের মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। পরে সে পেশাও ছেড়ে দিয়ে পাটনাতেই একটি দর্জির দোকান দিয়েছিলেন। টেলারিং শপ। এক মুসলমান দর্জির কাছে হাতে-কলমে কাজ শিখেছিলেন। যখন যে পেশাতেই থাকুন না কেন, বইয়ের প্রতি ওঁর একটা টান ছিল। লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়তেন। পরে অহীন্দ্র চৌধুরি সেটাকেই আরও উস্কে দেন। যে লোকটা সারাদিনে চার-পাঁচটা ফাংশানে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কৌতুক নকশা পরিবেশন করতেন সেই জহর রায়ই বোর্ডিংয়ে ফিরে বইয়ের নেশায় মজে যেতেন। কখনও কখনও পড়তে পড়তে রাত দুটো-আড়াইটে হয়ে যেত। সে রাতে দু'টো বিস্কুট আর জল খেয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন। বইয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম এত নিবিড় ছিল যে, মাঝে মাঝেই নতুন কেনা বইয়ের গন্ধ শুঁকতেন জহর রায়। বলতেন, শিল্পীদের পক্ষে সাহিত্যপাঠ খুব জরুরি। সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় কত বিচিত্র চরিত্র নির্মাণ করেন। পড়তে পড়তে সেই চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। অভিনয় করার সময়ও আমার সেই সব চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়।

এক সময়ের জনপ্রিয় সুরকার ও সংগীতশিল্পী প্রশান্ত ভট্টাচার্য বলছিলেন, জহরদার মতো মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। রসিক মানুষ। দেখা হলেই নানারকম রসের কথা বলতেন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে। মনে হত যেন ফাংশানের মঞ্চে উঠে কোনও কমিক স্কেচ করছেন। খুব অপ্রিয় কথা মুখের উপর সরাসরি বলে দিতেন। প্রশান্তবাবুর সঙ্গে জহর রায়ের প্রথম সাক্ষাৎ কলকাতার চোরবাগানের এক ফাংশানের সুবাদে। তখন পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর বিচিত্রানুষ্ঠান হত। সারাদিন শুটিং করে সন্ধেবেলা ফাংশানের 'খেপ' মারতেন জহর রায়। সেইরকমই একটা 'খেপ' ছিল চোরবাগানের ফাংশান। শিল্পীতালিকা বিরাট। এবং সকলেরই তখন যথেষ্ট নাম। সকলেই ফাংশানে এসে চেষ্টা করতেন কত তাড়াতাড়ি সেখানকার পাট চুকিয়ে চলে যাওয়া যায়। তেমনই ওই ফাংশানে এসেও সব শিল্পী তাড়াতাড় অনুষ্ঠান সেরে নিতে চাইতেন। ওইদিন অনুষ্ঠানে দুটো বড় আকর্ষণ ছিল এক, রবীন মজুমদারের গান। রবীন মজুমদার তখন গায়ক-নায়ক হিসেবে দারুণ পপুলার। আর জহর রায়ের কমিক স্কেচ। দু'জনেই ওই ফাংশান থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন কুড়ি টাকা করে। প্রশান্তবাবু তখন তরুণ। ওই ফাংশানের সঙ্গে যুক্ত। ওঁর দায়িত্ব পড়েছিল রবীন মজুমদার আর জহর রায়কে যেমন করে হোক একটু ঠেকিয়ে রাখা। যাতে ওঁরা তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠান করে চলে যেতে না পারেন। কারণ, ওঁদের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে ফাংশানের চার্ম অর্ধেক চলে যাবে। দর্শক শ্রোতারাও পালাই পালাই করবে। অতএব, ওঁদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে। এই গুরুদায়িত্বটা পড়েছিল প্রশান্তবাবুর উপরে। ফাংশানের পাশে অস্থায়ী গ্রিনরুমে বসে রবীন মজুমদার আর জহর রায় আড্ডা দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝেই প্রশান্তবাবু ওঁদের চায়ের জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন। স্টেজে তখন গাই গাইছেন নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। হঠাৎ প্রশান্তবাবু দেখলেন, জহর রায় আর রবীন মজুমদার দু'জনেই গ্রিনরুম ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। খানিকটা এগিয়েও গিয়েছেন। মাথায় বাজ পড়ল প্রশান্তবাবুর। এই রে! ওঁরা পালাচ্ছেন নাকি? তাহলে তো ওঁর অবস্থা আজ খারাপ হয়ে যাবে। এই দু'জনই আজকের ফাংশানের মেন অ্যাট্রাকশন। ওঁরা চলে গেলে কারও মার আর মাটিতে পড়বে না। উনি দৌড়লেন দু'জনকে ধরতে। গিয়ে ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকালেন। বললেন, প্লিজ আপনারা চলে যাবেন না। তাহলে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। আপনারা আমার দায়িত্বে আছেন। জহর রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, বাবা। সারাদিন ডিরেক্টরদের ইচ্ছেপূরণ করে এসেছি। এখানে বসেছিলাম তোমাদের ইচ্ছেপূরণ করার জন্য। তোমরা কথা দিয়েছিলে, বেশিক্ষণ লাগবে না। এলেই স্টেজ পেয়ে যাব। কিন্তু বসে আছি তো বসেই আছি, স্টেজ আর মেলে না। সত্যি কথাটা বলো তো বাবা, কুড়ি টাকার ফাংশান করতে এসে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? শেষ পর্যন্ত ওঁরা ফিরে এসেছিলেন। প্রশান্তবাবু অনেক কাকুতি-মিনতি করে ওঁদের ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই থেকে প্রশান্তবাবুর সঙ্গে জহর রায়ের সম্পর্কটা নিবিড় হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭২ সালে পলিডর রেকর্ডে একটা কমিক স্কেচ করেছিলেন জহর রায়। ফাংশান থেকে শ্মশান। জহর রায়ের বিখ্যাত নকশা 'ন্যাপাসুর বধ'। কলকাতার কুমোরটুলি থেকে বিশ্বকর্মা ঠাকুর নিয়ে যাওয়ার সময়ে একটা হাতির মাথা ভেঙে গিয়েছিল। সেই ঘটনা থেকেই ওঁর মাথায় আসে ন্যাপাসুর বধ কমিক স্কেচ করার পরিকল্পনা। এই স্কেচটা খুব জনপ্রিয় ছিল। পুরনো দিনের লোকেদের অনেকেরই হয়তো মনে থাকবে। নতুন পাঠকদের জন্য বলি। নকশার কাহিনিটা ছিল, পাড়ার দুর্গাঠাকুর আনতে গিয়ে অসুরের মুন্ডু ভেঙে গিয়েছে। তখন আর এমন সময় নেই যে আবার নতুন ঠাকুর নিয়ে আসবে কিংবা নতুন করে অসুরের মাথা

তৈরি করা হবে। সেই জন্য পাড়ার বেকার ছেলে ন্যাপাকে অসুর সেজে ডিউটি করতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুজোর ক'দিন। তাই নিয়েই একটা দারুণ মজার স্কেচ। গ্র্যান্ড হোটেলের নিচে নিউ ক্যাথে রেস্টুরেন্টে জহর রায়ের একটা মদ্যপানের আড্ডা ছিল। এই মদ্যপানের আসরে বসেই জহর রায় তাঁর বহু বিখ্যাত কমিক স্কেচের জন্ম দিয়েছিলেন। ন্যাপাসুরেরও জন্ম নিউ ক্যাথে রেস্টুরেন্টে। সেইরকমই ফাংশান থেকে শ্মশান কমিক স্কেচটা হল এক শিল্পীর মফস্সলে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে উদ্যোক্তাদের হাতে পড়ে চূড়ান্ত দুর্গতির কাহিনি। এটা ওই বছরই রম্যবাণী বলে একটি পুজো সংখ্যায় জহর রায়ের লেখা হিসেবে ছাপা হয়েছিল। এই স্কেচটা অবশ্য নিউ ক্যাথে রেস্টুরেন্টে জন্ম নেয়নি। কারণ, জহর রায় তখন অসুস্থ। বোর্ডিংবন্দি। ১৯৭২ সালে জহর রায় প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জন্ডিস হয়েছিল। সেই সময় মেগাফোন রেকর্ড থেকে ওঁর কমিক স্কেচ বের হত। সেবার তখনও মেগাফোনের সঙ্গে ওঁর কোনও কথা হয়নি। প্রশান্ত ভট্টাচার্যই তখন পলিডর রেকর্ডের পূর্ব ভারত অঞ্চলটা দেখতেন। পলিডর সেই সময় এইচএমভি-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুজোর রেকর্ড বের করত। বাংলা আর বম্বের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা গান গেয়েছিলেন পলিডর রেকর্ডে। সেবার প্রশান্তবাবু জহর রায়কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন পলিডরে রেকর্ড করার জন্য। জহর রায় এককথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কমলের ওখানে আমি রেকর্ড করি। ওখানেই করব। কমল বলতে কমল ঘোষ, তখন মেগাফোনের কর্তা। প্রশান্তবাবু বুঝিয়েছিলেন ওদের সঙ্গে তো আপনার এখনও কোনও কথা হয়নি। তাছাড়া আপনি অসুস্থ। এবার ওরা আপনার রেকর্ড করবে কি না তারও ঠিক নেই। তবুও আপনি ওদের কথাই ভাববেন! জহর রায় বলেছিলেন, না। এতদিন ওরা আমার রেকর্ড বের করে এসেছে। করলে ওদের ওখানেই করব। সেই সময়ে জহর রায় কিছুটা অর্থকষ্টের মধ্যেও ছিলেন। চিকিৎসার জন্য প্রচুর খরচ হয়ে যাচ্ছিল। প্রশান্তবাবু ওঁকে দু'হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে এসেছিলেন। জহর রায় নিতে চাননি। বলেছিলেন, টাকাটা আমার খুবই দরকার। কিন্তু আমি যখন পলিডরে রেকর্ড করব না, তখন টাকাও নিতে পারব না। প্রশান্তবাবু বলেছিলেন, আপনি টাকাটা রাখুন। এটা আপনার চিকিৎসার জন্য। এবার না হোক, পরে কখনও যদি মনে হয় পলিডরে রেকর্ড করবেন, বলবেন। পলিডর আপনাকে শিল্পী হিসাবে পেলে ধন্য হবে।

সেবারই জহর রায় পলিডরে রেকর্ড করেছিলেন ফাংশান থেকে শ্মশান। নিজেই প্রশান্তবাবুকে ডেকে বলেছিলেন, তোমার জন্যই আমি মত বদলালাম। পলিডরেই রেকর্ড করব। রেকর্ডটা খুব চলেছিল সেবার। ওই অর্থকষ্টের সময়ে বেশ কিছু টাকা এই রেকর্ড থেকেই রোজগার হয়েছিল জহর রায়ের।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। দর্জির দোকান তুলে দিয়ে জহর রায় কলকাতায় চলে এসেছিলেন অভিনয় করবেন বলে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হঠাৎ সুখে থাকতে আপনাকে ভূতে কিলোল কেন? জহর রায় হেসে বলেছিলেন, হুঁ হুঁ বাবা। আমি চার্লি চ্যাপলিনের কাছে অভিনয় শিখেছি। তারপর কি আর দর্জির দোকানে কাটিং আর সেলাইংয়ের কাজ করা যায়? চ্যাপলিন সাহেব আমার মাথা বিগড়ে দিলেন। জহর রায়ের বাবা অভিনয় করতেন। ওঁর শরীরে অভিনেতার রক্ত। সিনেমা, থিয়েটার খুব দেখতেন। বিভিন্ন অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতেন। কিন্তু চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখে আর থাকতে পারেননি। দর্জির দোকানের পাট গুটিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন। পাটনা থেকে ওঁর কলকাতায় আসাটাও ছিল বেশ মজার। বর সঙ্গে নিয়ে একদল বরযাত্রী কলকাতায় আসছিল। জহর রায় ভিড়ে গেলেন তাদের সঙ্গে। হইহুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া, আর বিনে পয়সায় কলকাতায় আসা।

কৌতুকশিল্পকে উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে জহর রায়ের ভূমিকা কম ছিল না। তিনি তরুণ কৌতুকশিল্পীদের নানাভাবে পরামর্শ দিতেন। বলতেন, জানিস উত্তমের কেন এত নামডাক? উত্তম প্রতিটি কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে। নিবেদিত প্রাণ। ধর এই অমিয় নিবাসে উত্তম এসেছে। হঠাৎ দেখি বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তম নানা অঙ্গভঙ্গি করছে আর নিজেকে দেখছে। দেখতে কেমন লাগছে। কোথায় ভুলত্রুটি। সে সব আবার নিজে নিজেই শুধরে নিচ্ছে। এই নিষ্ঠা না থাকলে কারও পক্ষেই ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। জহর রায় কীভাবে তরুণ শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন তা নিয়ে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। ওঁদের সময়ে কৌতুকশিল্পীদের একটা ঢল নেমেছিল। নবদ্বীপ হালদার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে সুশীল চক্রবর্তী, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তরুণ শিল্পীরাও ছিলেন। শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেহারাটা একটু অন্যরকম ছিল। দেখলেই হাসি পেয়ে যেত। দর্শকদের কাছে ওঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'ঘোড়ামুখো শেতল'। দর্শকরা যে তাঁকে ঘোড়ামুখো শেতল বলে ডাকত, তাতে তিনি কিছু মনে তো করতেনই না, বরং ব্যাপারটা খুব উপভোগ করতেন। সেটাকে কাজেও লাগাতেন। ওঁর নানা কমিক স্কেচে নিজের চেহারা নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ছিল। শীতলবাবু মঞ্চে উঠলেই হাসির তুফান বয়ে যেত। শ্রোতাদের হতচকিত করে তিনি শুরু করতেন, আমার চেহারা দেখে হাসছেন তো? আচ্ছা বলুন তো শ্যামল মিত্রর সঙ্গে আমার চেহারার তফাতটা কী? ওমলেটের এপিঠ আর ওপিঠ। তবে ভগবান আমার দিকের পিঠটায় দু'টো কাঁচা লঙ্কা বেশি করে দিয়েছে। তাই শুনেই আবার হাসির হুল্লোড় উঠত। একবার মফস্সলের একটা অনুষ্ঠানে জহর রায় আর শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনেই গিয়েছিলেন। সেখানেই শীতলবাবু একটা দারুণ মজার রোমান্টিক স্কেচ করেছিলেন। স্টেজের পাশে বসে সেটা দেখেছিলেন জহর রায়। স্কেচটা ছিল, এক প্রেমিক তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা অত্যন্ত জরুরি কথা তাকে বলবে বলে। কিন্তু কোথাওই তার মনের কথাটা প্রেমিকার কাছে বলতে পারছে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে শীতলবাবু স্কেচটা জমিয়ে দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান থেকে ফিরে পরের দিন সকালে শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর বোর্ডিংয়ে ডেকে পাঠালেন জহর রায়। বললেন, শোন। কালকে তোর স্কেচটা দেখলাম। খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু এটাকে আরও ভাল করা যায়। শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় আপ্লুত। বললেন, দাও না গুরু। সাজেশনটা কাজে লাগাই। জহর রায় বললেন, তোর স্কেচের ক্লাইম্যাক্সটা জমলো না। ছেলেটি যে মেয়েটিকে ভালবাসার কথা বলবে সেটা তো শ্রোতারা আগেই ধরতে পেরে গিয়েছে। ওখানে তুই একটা কাজ করতে পারতিস। শীতলবাবু বললেন, কী? জহর রায় বললেন, ক্লাইম্যাক্সে ছেলেটি মেয়েটিকে বলুক, তুমি হয়তো ভাবছ, আমি তোমায় আমাকে ভালবাসার কথা বলব। কিন্তু তা নয়। আমাকে ভালবাসার দরকার নেই। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুমি সারা ভারতবর্ষের মানুষকে ভালবাস। দেশকে ভালবাস। দেখবি শেতল ব্যাপারটা দারুণ জমে যাবে। শীতলবাবু বললেন, দারুণ তো! তাহলে এটা দিয়েই শেষ করি! জহর রায় বললেন, এতে আর দারুণের কী দেখলি? দারুণটা তো একটু পরে। শীতলবাবু বললেন, মানে? জহর রায়

বললেন, এখানেই শেষ নয়। দর্শক যখন হাততালি দেবে, তখন সেই হাততালি থামিয়ে দিয়ে তোর ছেলেটি তার প্রেমিকাকে বলবে, আর সেই ভারতের মানুষ হিসাবে তুমি আমাকে একটু বেশি করে ভালবাস। দেখবি এই কথাটা শুনে হাততালির চোটে প্যান্ডেলে পায়রা উড়ে যাবে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন স্টার থিয়েটারের গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পী ছিলেন, জহর রায় ছিলেন রঙমহলের। ষাটের দশকে রঙমহলের মালিকরা থিয়েটার হলটিকে বিক্রি করে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। অতগুলো শিল্পী একসঙ্গে কর্মহীন হয়ে পড়বে। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন শিল্পী-কলাকুশলীরা। মালিকদের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করা হল। কিন্তু ফল মিলল না। তখন রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী নামে একটা সংস্থা তৈরি করে আন্দোলনে নামলেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত রঙমহলের মালিকরা থিয়েটার পরিচালনার ভার শিল্পীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। সংস্থার ডিরেক্টর হলেন প্রবীণ অভিনেত্রী সরযূবালা দেবী এবং জহর রায়। সরযূদেবী প্রবীণ মানুষ। বয়সও হয়ে গিয়েছিল। তাই কাজকর্ম যা করার সব করতেন জহর রায়ই। সরযূদেবী পরামর্শ দিতেন। তারপর কোনও একটা কারণ সরযূদেবীর সঙ্গে জহর রায়ের মতান্তর হতে লাগল। ক্ষুব্ধ সরযূদেবী রঙমহলে আসা বন্ধ করে দিলেন। ব্যাপারটা জহর রায় খুব ভালভাবে নিতে পারেননি। তিনি সরযূদেবীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে চাননি। অথচ অন্য শিল্পীদের ইন্ধনে তাই করে চলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত একদিন আর পারেননি। মার্কাস স্কোয়ারের পিছন দিকে সরযূদেবীর শ্যামাদাস রোডের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। ভরদুপুরে। সরযূদেবী নিজেই দরজা খুলেছিলেন। খোলা মাত্রই জহর রায় তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, বড়মা। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। জহর রায় প্রথম যে নাটকে সরযূদেবীর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন সেই নাটকে সরযূদেবী ছিলেন ওঁর বড়মা। সেই থেকে জহর রায় সরযূদেবীকে বড়মা বলেই ডাকতেন। সরযূদেবী প্রথম ধাক্কায় হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর জহর রায়ের কান্না দেখে তিনিও আর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। বলেছিলেন, ওঠ বাবা। এমন করে কাঁদে না। তোর জন্য যে আমারও বড় কষ্ট রে। সেই দুপুরে সরযূদেবী নিজের হাতে দুধ, চিড়ে, কলা, সন্দেশ মেখে মা যেমন করে শিশুকে খাওয়ায় তেমন করে জহর রায়কে খাইয়েছিলেন।



রবি ঘোষ

তখন 'উল্টোরথ' নামে একটা জনপ্রিয় সিনেমার পত্রিকা ছিল। এখনকার প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে উল্টোরথ নামটা পরিচিত না হলেও প্রবীণ সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে উল্টোরথ একটা মাইলফলক। একটা উন্মাদনা। বাড়ির মহিলাদের কাছে উল্টোরথ ছিল দুপুরের বিনোদন। তপন সিংহর 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে ধনঞ্জয়রূপী রবি ঘোষ দুপুরবেলা মহিলাদের উল্টোরথ পড়ে শোনাচ্ছে, এমন একটা দৃশ্যও ছিল। সেই সময়ে উল্টোরথ প্রতি বছর বাংলা সিনেমা থিয়েটারের শিল্পী ও কলাকুশলীদের পুরস্কার দিত। সেই পুরস্কারের মর্যাদা এখনকার অনেক পুরস্কারের চেয়ে বেশি ছিল। ওঁদের 'সিনেমা জগৎ' নামে একটা মাসিক সিনেমার পত্রিকাও ছিল। উল্টোরথের কর্ণধার প্রসাদ সিংহ এবং তাঁর বন্ধু গিরীন্দ্র সিংহ দু'জনেই সিনেমার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। গিরীন্দ্র সিংহ তো প্রযোজক হিসেবেই বিখ্যাত ছিলেন। বহু জনপ্রিয় বাংলা ছবি তাঁর প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে। প্রসাদ সিংহ 'মণিহার' বলে একটা ছবি করিয়েছিলেন। যখন উত্তম-সুচিত্রার ব্যাপক রমরমা, সেই সময়ে মণিহার ছবিটা অন্য সব ছবিকে তুড়ি মেরে বেরিয়ে গিয়েছিল। বহুদিন টানা চলেছিল। এ ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আর রোমান্টিক জুটি বিশ্বজিৎ-সন্ধ্যা রায়। ছিলেন রবি ঘোষও। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক। এ ছবির গানগুলো সেই সময় লোকের মুখে মুখে ঘুরত। এখনও অনেকেই সে গানগুলো মনে রেখেছেন।

মণিহার ছবির সাফল্যে দারুণ খুশি হয়েছিলেন প্রসাদ সিংহ। তার অবশ্য অন্য কারণও ছিল। সে কথা আলাদা। এখানে বলার মতো নয়। মণিহার-এর জয় সেলিব্রেট করতে একটা পার্টি দিয়েছিলেন প্রসাদ সিংহ। তখনকার বিখ্যাত চিনে খাবারের হোটেল নানকিং-এ। ছবির শিল্পী-কলাকুশলী সবাই তো এসেছিলেনই, সেই সঙ্গে উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ পত্রিকার কর্মীরাও সেই আনন্দ পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম সেই পার্টিতে। সেটাই আমার কলকাতায় প্রথম কোনও বড় হোটেলে যাওয়া। নানকিং-এর চিনে খাবারের স্বাদের আমি এখনও কোনও বিকল্প পাইনি। পরে অবশ্য নানকিং হোটেলটা উঠে যায়। সেদিনের সেই পার্টিতে সবাই খুব জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। আমি তখন খুবই ছোট। তারকাদের মজলিশ। কিন্তু আমি কোনও তারকাকেই চিনতাম না। সবাই নানারকম গল্পগুজব করছিলেন। সে সব কথা এখন আমার আর মনে নেই।

তবে এই ছবির শুটিং করতে গিয়ে রবি ঘোষ নাকি একটা মজার কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। সেই গল্পটাই একজন আরেকজনকে বলছিলেন। মণিহার ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল, রবি ঘোষ কোনও একজনের বাড়িতে এসেছেন। তাঁকে চায়ের সঙ্গে ওমলেট খেতে দেওয়া হয়েছে। এই দৃশ্যটা তোলা হবে। ছবির দৃশ্য তোলার সময়ে আরও কতকগুলো কাজকর্ম থাকে। সেগুলো করতে একটু সময় লাগে। সেইসব রেডি হলে তারপরই শট টেক করা হয়। এ কথা তো বলাই বাহুল্য। সেইরকম এই শটটা টেক করার আগে যতবার ওমলেট দেওয়া হয়েছে, রবি ঘোষ শট নেওয়ার আগেই সেটা খেয়ে শেষ করে দিয়েছিলেন। আবার একটা এসেছে, আবার একটা শেষ করেছেন। এইরকম তিন-চারবার হওয়ার পর নাকি ছবির পরিচালক সলিল সেন রবি ঘোষকে বলেছিলেন, আর ওমলেট দেওয়া হবে না। কিন্তু শটটা টেক করা হবে। রবি ঘোষ যা পারেন তা করে শটটা দেবেন। রবি ঘোষ বললেন, কোই পরোয়া নেই। আপনি টেক করুন। আমি শট দিয়ে দিচ্ছি। খালি প্লেটে চামচ নিয়ে এমনভাবে রবি ঘোষ শটটা দিলেন, ছবিতে দেখে মনে হল, যে ওঁর প্লেট থেকে পাছে কেউ ডিমের ওমলেটটা ছোঁ মেরে নিয়ে নেয়, তাই উনি সেটাকে নানাভাবে আড়াল করছেন। স্বতঃপ্রণোদিত দৃশ্য। সলিলবাবু নাকি রবি ঘোষকে বলেছিলেন, তাহলে এতগুলো ওমলেট না বানালেই হত।

রবি ঘোষ যে কী করতে না পারতেন, তার হিসেব পাওয়া যাবে না। তপন সিংহ মারা যাওয়ার অল্প কিছুদিন আগে একদিন তপনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেক দিন বাদে। ওঁর 'হুইলচেয়ার' ছবিটা দেখার পর ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব ভেবেছিলাম। ফোন করে কথাও হয়েছিল। কিন্তু যাওয়া হয়নি। সেই যাওয়াটা হয়েছিল অনেক দিন বাদে। মারা যাওয়ার অল্প কিছুদিন আগে। সেদিন প্রায় ঘণ্টা তিনেক ওঁর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন সাংবাদিক লেখক সুমন গুপ্ত আর পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুমন আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু

পলাশবাবু ওখানে আগে থেকেই ছিলেন। উনি তখন তপন সিংহর সহকারী হিসাবে কাজ করছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'গল্প হলেও সত্যি'র কথা উঠল। আমি তপন সিংহকে বলেছিলাম, দেখুন, আমি অনেক ছবি দেখি। কিন্তু আমাকে যদি কেউ দু'টো সেরা বিনোদনমূলক ছবির কথা বলতে বলেন আমি তাহলে যে দুটো ছবির নাম করব সে দুটোই বাংলা ছবি। এক 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'। দুই 'গল্প হলেও সত্যি'। আবার যদি কেউ আমার দেখা সেরা দুটো বুদ্ধিদীপ্ত ছবির নাম করতে বলেন তাহলেও আমি বলব গুপি গাইন আর গল্প হলেও সত্যি। দুটো ছবিতেই অনবদ্য রবি ঘোষ। যেখানে ওঁর কোনও বিকল্প হয় না। তপন সিংহ বললেন, গল্প হলেও সত্যি ছবিটা আমি রবিকে ভেবেই করেছিলাম। ওই চরিত্রে রবিকে ভেবেই কাহিনিটা লেখা। রবিই বরং আমাকে বলেছিল, সবাই তো নামকরা হিরোকে নিয়ে ছবি করে। আপনি আমাকে হিরো করে ছবি করছেন। কিন্তু আমি রবির ব্যাপারে খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম। জানতাম, ও এই চরিত্রটাকে জীবন্ত করে তুলবে। এই যে ম্যাজিকম্যান, তার আচারে-আচরণে, চলনে-বলনে—সব কিছুতেই বুদ্ধির ছাপ থাকবে। রবিকে নিয়ে আমি ভুল করিনি।

এই ছবিটার ছায়ায় হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় হিন্দিতে 'বাওয়র্চি' করেছিলেন। ধনঞ্জয়ের চরিত্রটা করেছিলেন রাজেশ খান্না। তপন সিংহ যেমন রবি ঘোষকে দিয়ে ম্যাজিকম্যানের কাজটা করাতে পেরেছিলেন, হৃষীকেশবাবু ওঁকে দিয়ে তেমন করাতে পারেননি। বাওয়র্চি আর গল্প হলেও সত্যির ধনঞ্জয়ের আকাশ পাতাল তফাত।

তপন সিংহের হাত ধরেই বলতে গেলে সিনেমা জগতে এসেছিলেন রবি ঘোষ। আগে দু'-তিনটে ছবিতে কাজ করলেও কার্যত তপনবাবুর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ছবি দিয়ে ওঁর সিনেমা জীবন শুরু। রবি ঘোষ সম্পর্কে তপন সিংহ বলেছেন, রবি ছিল অসম্ভব নিষ্ঠাশীল। বাড়িতে স্ক্রিপ্ট নিয়ে গিয়ে হোমওয়ার্ক করে ফ্লোরে আসত। ফ্লোরে এসে আর স্ক্রিপ্ট নিয়ে, ক্যারেক্টার নিয়ে কোনও কথা নয়। হই হই করে গল্পগুজব করত, আড্ডা দিত। কিন্তু শটের সময়ে একেবারে পারফেক্ট। কুইক থিংকিংয়ের ক্ষমতা ছিল রবির। অনেক সময় হয়তো এক্সটেম্পোর ডায়ালগ দিত। তার অনেকগুলোই আমি রেখে দিয়েছি।

রবি ঘোষকে নিয়ে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল তপনবাবুর সঙ্গে। বলেছিলেন, রবিকে কমেডিয়ান ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু টোটাল অ্যাক্টর বলতে যা বোঝায়, রবি ছিল তাই। স্টেজ থেকে সিনেমায় এসেছিল রবি। প্রচুর পড়াশোনা ছিল ওর। অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা করত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অভিনয়ের শিক্ষা ছিল ওর।

পর্দায় তপন সিংহর হাত ধরে এসেছিলেন রবি ঘোষ। আবার পর্দা থেকে চলে গেলেন তপনবাবুর টিভি সিরিয়াল 'হুতোমের নকশা'র কাজ করতে করতে। ওই ধারাবাহিকে রবি ঘোষের সঙ্গে ছিলেন মনোজ মিত্র। তপনবাবু বলেছিলেন, মনোজ মিত্র আর রবি ঘোষকে নিয়ে আমার একটা স্ল্যাপস্টিক করার ইচ্ছে ছিল। ও মারা যেতে জুটিটা ভেঙে গেল। তাই আর করা হয়নি।

'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছবিটা বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল। অভিনেতা হিসেবে গিয়েছিলেন রবি ঘোষ ও তপেন চট্টোপাধ্যায়। গুপি আর বাঘা। ওঁর এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, রবি ঘোষ যেমন সবসময় আসর মাতিয়ে রাখেন, সকলের সঙ্গে খুনসুঁটি করেন, এর ওর তার পিছনে লাগেন, সেইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বার্লিনের হোটেলে। হয়তো ঘটনাটার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে, তবু কিছুটা তো ঘটেছিলই। রবিবাবুর ওই সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন, রবি ঘোষ খুব ওয়াকিবহাল ব্যক্তি ছিলেন। সারা পৃথিবীর খুঁটিনাটি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। পৃথিবীর বড় বড় হোটেলে কীভাবে পরিষেবা দেওয়া হয় সে সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা ছিল ওঁর। বার্লিনে তপেন চট্টোপাধ্যায় আর ওঁকে এক ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তপেনবাবু প্রথম বিদেশে গিয়েছেন। বড় হোটেলের আদবকায়দা সম্পর্কে তাঁর তেমন ধারণা ছিল না। রবি ঘোষ তপেন চট্টোপাধ্যায়কে ঘরের দেওয়ালে একটা কলিং বেলের সুইচ দেখিয়ে বলেছিলেন, টেপ টেপ। ওটা টেপ। তপেন চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন? ওটা টিপলে কী হবে? বললেন, টেপ না। দেখতে পাবি কী হবে। রবি ঘোষের সাহস পেয়ে তপেন চট্টোপাধ্যায় বোতামটা টিপে দিয়েছিলেন। টিপে দিতেই মিনিট খানেক পরে এক তন্বী তরুণী এসে হাজির। দরজা খুলে রবি ঘোষ তাঁকে কিছু একটা বলে বিদায় করেছিলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তপেন চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, দেখেছিস, এই বোতামটা টিপলে সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে এসে হাজির হবে। তপেন চট্টোপাধ্যায় বললেন, ধ্যাত। তাই নাকি? রবি ঘোষ বললেন, দেখ না। আরেকবার পরীক্ষা করে দেখ। সুন্দরী মেয়ে আসে কি না। সাহস করে আরও একবার বোতামটা টিপে দিলেন তপেন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্য এক মহিলা। রবি ঘোষ চোখ টিপে তপেনকে বললেন, দেখেছিস। যা বলছিলাম না। ঠিক এই রকমই। যখন যেখানে থাকতেন, তখন সেখানটা মজায় মাতিয়ে রাখতেন রবি ঘোষ।

রবি ঘোষের প্রিয় বন্ধু ছিলেন ভোলা দত্ত। স্কুলজীবন থেকেই। ভোলা দত্তরা স্কুলে একটা হাতে লেখা পত্রিকা বার করতেন। তার নাম ছিল 'হাতেখড়ি'। সেই পত্রিকার সুবাদেই রবি ঘোষের সঙ্গে ভোলা দত্তর পরিচয়। ভোলা দত্তর জেঠতুতো ভাই শিবদাস তাঁকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। রবি ঘোষের ডাকনাম ছিল টুনটুনি। খুব ভাল পেনসিল স্কেচ করতে পারতেন। 'হাতেখড়ি' পত্রিকার জন্য টুনটুনির কাছ থেকে কতকগুলো পেনসিল স্কেচ নিয়েছিলেন ভোলা দত্ত। ওই স্কেচগুলোর তলায় টুনটুনি নিজের নাম রেখেছিল রবীন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার। পরে আশুতোষ কলেজে এসে দু'জনে একসঙ্গে হয়েছিলেন। রবি ঘোষের হাত ধরেই ভোলা দত্তর থিয়েটারে আসা। উৎপল দত্তর লিটল থিয়েটার গ্রুপে ওঁরা একসঙ্গে অভিনয় করতেন। ভোলা দত্তকে নিয়ে রবি ঘোষ পরে বিভিন্ন ফাংশান করতেন। প্রথমদিকে শুরু করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের হাসির কৌতুক নকশা দিয়ে। পরে দেখলেন যে ঠিক জমছে না। তাই নিজেরা বেশ কিছু কমিক স্কেচ লিখেছিলেন। দু'জনেই। রবি ঘোষ, ভোলা দত্তও। রবি ঘোষ বলেছিলেন, মাথায় থাক আমাদের রবীন্দ্রনাথ। ওঁর সূক্ষ্ম কৌতুক মাঠ-ময়দানের দর্শক-শ্রোতাদের জন্য নয়। তাই নিজেরাই মাঠ-ময়দানের দর্শকরা নেবেন এমন স্কেচ করেছিলেন। ওঁরা আবার স্টেজে উঠতেন চরিত্র অনুযায়ী ড্রেস, মেকআপ করে।

১৯৬৫ সালে জীবনের প্রথম ছবি তৈরি করার সময়ে পূর্ণেন্দু পত্রী পাশে পেয়েছিলেন রবি ঘোষকে। পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় আরও অনেকটা পরে। উনি আমার বাবার যে ক'জন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন। ওঁর ছেলে পুণ্যব্রত আমার বন্ধু। যদিও আমি ওঁকে ডাকতাম পূর্ণেন্দুদা বলেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে অন্তত একটা ছবিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করব। পূর্ণেন্দুদা তখন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' করছেন। প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। সেই সময়ে আমার ইচ্ছের কথাটা পূর্ণেন্দুদাকে বলেছিলাম। পূর্ণেন্দুদা এমন একজন মানুষ যিনি যেখানে হাত ছুঁইয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলেছে। আমার ইচ্ছেপূরণ হয়নি। তবে তারপর পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিশেষ করে পূর্ণেন্দুদা যখন 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় কাজ করছেন। পূর্ণেন্দুদা একদিন বলেছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটা

নিয়ে আমি আমার জীবনের প্রথম ছবি করার কথা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমার ছবিতে ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায় আর চারুপ্রকাশ ঘোষ। সেই সঙ্গে আরেকজনের নাম এল। রবি ঘোষ। রবি তখন অঙ্গার নাটক আর অভিযান সিনেমার জন্য বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। চিত্রনাট্যটা শুনতে চেয়েছিলেন চারুপ্রকাশ ঘোষ। ওঁর বাড়িতে পড়া হয়েছিল। রবিও ছিল। সেই সঙ্গে ছিল আমাদের এক সাংবাদিক বন্ধু। চিত্রনাট্য শুনে চারুপ্রকাশের সংশয় হয়েছিল, এ ছবি আদৌ চলবে কি না। বলেছিলেন, এ তো ভীষণ এক্সপেরিমেন্টাল। তবে সেই সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল রবি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে 'স্বপ্ন নিয়ে' শেষ করেছিলাম। মুক্তি পাওয়ার পর আমাকে প্রায় ঝাঁটাপেটা করেছিল চিত্রসমালোচকরা। রবিরও খুব ধাক্কা লেগেছিল। এরপর রবিরা ওদের গ্রুপে একটা থিয়েটার করবে ঠিক করল। নাটকটার নাম 'স্বপ্ন নয়'। আমাকে চাঙ্গা করার জন্য রবি সবসময় বলত, হইচই করো। আনন্দফূর্তি করো। সব দিন সমান যায় না। তোমারও দিন আসবে। তখন এই সমলোচকরাই তোমাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করবে। আমাকে কাজে লাগিয়ে রাখার জন্য রবি ওদের গ্রুপের স্বপ্ন নয় নাটকের লোগো, পোস্টার আমাকে দিয়ে করিয়ে নিত। এরপরে রবির সঙ্গে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক হয়ে গেল। পরের সব কাজকর্মের শুরু থেকেই রবি যুক্ত হয়ে পড়ত। মাধবীর জন্য চতুরঙ্গর চিত্রনাট্য লিখেছি। মাধবীর বাড়িতে শোনানো হবে। সেখানেও রবি আর অনুভা হাজির। আমার যখন খুব দুঃসময় যাচ্ছে, সেই সময়ে রবি আমাকে সাউথ ক্লাবে টেনে নিয়ে যেত। আমার তখন সাউথ ক্লাবে পানাহার করে বাড়িতে ফেরার ট্যাক্সি ভাড়াও থাকত না। রবি আমার বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা করে দিত নিয়মিত। ওই আসরে সেন র‍্যালের পিআরও থাকতেন। তখন সেন র‍্যালের খুব রমরমা। উনি থাকতেন বাগুইআটির দিকে। রবির নির্দেশে তিনি ফেরার সময়ে রোজ আমায় বাঙ্গুরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যেতেন।

এক লহমায় যদি অভিনয়ের বাইরে রবি ঘোষকে চিনতে হয়, তাহলে তার জন্য দিকপাল সম্পাদক সাগরময় ঘোষের একটা ছোট্ট লেখা হুবহু তুলে দিলেই যথেষ্ট। লেখাটি সাগরবাবু লিখেছিলেন রবিবাবু মারা যাওয়ার পর।

'কালীঘাটে আমাদের একটা আড্ডা ছিল। যেটাকে আমাদের আড্ডার ভাষায় বলা হত ঠেক। আড্ডাধারী ছিল আমাদের বিশ্বনাথ। গ্রিন্ডলে ব্যাঙ্কের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সন্ধের দিকে জোর আড্ডা বসত। অনেকেই আসত। ওই আড্ডায় ওই পাড়ারই একটি ছেলেও আসত। বয়সের অনেক ফারাক। কিন্তু সে এলে আনন্দের ঝড় বয়ে যেত। বয়সের ব্যবধান-ট্যাবধান সব ঘুচে যেত। ছেলেটি কে? বিশ্বনাথ বললেন, রবি। এই পাড়ারই ছেলে। বড় মজার ছেলে। যেখানে রবি সেখানেই আনন্দ। রবি যেদিন আসত না, আমরা বলতুম, কী হল? আজ আসছে না কেন?

রবির আকর্ষণ শক্তি এইরকমই ছিল। অনর্গল গল্প বলার ক্ষমতা, উইট আর হিউমারের ছড়াছড়ি। আর রবির সবচেয়ে বড় ক্ষমতা ছিল ক্যারিকেচার। সেকালের বিখ্যাত অভিনেতাদের ম্যানারিজমের অনুকরণ। শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য। রবিকে একবার বললেই হল, রবি আজ একটু শিশিরবাবু হোক।

আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ছিল। বোঝাই যেত ছেলেটা খুব থিয়েটার দেখে। দেখে অসীম আগ্রহ নিয়ে। আর মনে রাখতে পারে। ভাল ভাল ডায়ালগ সব মুখস্থ। আমাদের আড্ডায় সে একাই বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করে মুগ্ধ করে দিত। আর ঝোঁক ছিল সমস্ত ব্যাপারটাকেই আমোদের করে তোলা। দুঃখও আনন্দের। আনন্দও আনন্দের। সবটাই আনন্দের।

পুনশ্চ

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর জহর রায়ের সম্পর্ক নাকি ভাল ছিল না। দু'জনেই নাকি সুযোগ পেলেই দু'জনকে লেঙ্গি মারার চেষ্টা করতেন। এই সব কথা নিয়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, লোকের কথায় কী আসে যায়। আমি কী, হেইডা জহর ভাল কইরাই জানে। জহর রায় বলতেন, যারা এই সব রটায় তাদের কথার উত্তর দিতে হলে বাথরুমে যেতে হয়। ওখানেই ওদের কথার উপর শরীরের বর্জ্যপদার্থ ঢেলে দিতে পারলে ঠিকঠাক জবাব দেওয়া যায়।



■ মিস প্রিয়ংবদা ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৭৭ সালে জহর রায় মারা যাওয়ার পর প্রখ্যাত আবৃত্তিকার জগন্নাথ বসুর ইচ্ছে হয়েছিল জহর রায়কে নিয়ে রেডিওতে একটা স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান করেন। উনি তখন আকাশবাণী কলকাতার অন্যতম প্রযোজক। অনুষ্ঠান করার জন্য স্টেশন ডিরেক্টরের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। জগন্নাথবাবু প্রস্তাবটা আকাশবাণীর কেন্দ্র অধিকর্তার কাছে পেশ করলেন। স্টেশন ডিরেক্টর ভদ্রলোক খুব একটা রাজি ছিলেন না। জগন্নাথবাবু তাঁকে বোঝালেন জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ তিনজনে মিলে কমেডিকে শিল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছেন। যে কারণে সত্যজিৎ রায়ও গুপি গাইন বাঘা বাইন ছবিতে জহর রায়কে দিয়ে একটা দুরূহ চরিত্র অভিনয় করিয়েছিলেন। রাজি হলেন স্টেশন ডিরেক্টর। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হল স্মৃতিচারণ করার জন্য। স্মৃতিচারণ করতে বসে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকক্ষণ নির্বাক থেকে তারপর হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় দু'জনের সম্পর্ক কী ছিল।

আর রবি ঘোষ প্রসঙ্গে বলতে হয়, সাগরময় ঘোষের লেখা দু'-তিনটে লাইন। 'আমরা তখন অঙ্গারের যুগে রয়েছি। সকলের মুখেই অঙ্গারের প্রশংসা। আমরা একদিন দেখতে গেলুম সকলে মিলে। রবি এই নাটকে ছিল। শুনেছিলুম। কেমন অভিনয় করবে জানতুম না। যখন সে মঞ্চে এসে, আলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাস্কি ভয়েসে একটি মাত্র কথা বললে—অন্ধকারেও মানুষ চেনা যায়। তখন আমাদের রোমাঞ্চ হচ্ছে। কলকাতার সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল রবি ঘোষের নাম, সেই ডায়ালগ—অন্ধকারেও মানুষ চেনা যায়।'



মা কালীর সামনে

বীথি চট্টোপাধ্যায়

ফুলের মতন ছোট
ভাইবোনগুলো,
রাত্রে বোধহয় কিছু
না-খেয়েই শুলো—

বাবা রেখে গিয়েছেন
অজস্র দেনা,
টাকা ছাড়া এতগুলো
পেট চলবে না।

এরপর একদিন
দুরুদুরু বুকে,
অনিমেষে তাকালেন
মা কালীর মুখে।

তামাম ভুবন যার
শ্রীচরণে রাখা,
তার কাছে চাওয়া যায়
কয়েকটা টাকা?

অমাবস্যার রূপ
ঘনঘোর কালো,
দূরের তারার থেকে
আসা কোনও আলো।

নিজের জন্যে কিছু
চাইতে না-পেরে,
কত কী বদলে দিল
সংসার ছেড়ে।



শুধু ওই একদিন
দুরুদুরু বুকে—
অনিমেষে চেয়েছিল
মা-কালীর মুখে।

নিজের জন্যে কিছু
চাইতে না-পেরে...
হেঁটে গেল বহুদূর
সংসার ছেড়ে।



বিষ্ণুর দশ অবতার

তপনদেব চট্টোপাধ্যায়

সৃষ্টির আদিতে মৎস্য অবতারে
অনন্ত সাগরে তুমি কর বিচরণ,
দ্বিতীয় কুম্ভ অবতারে তব
জলে স্থলে অবাধ গমান।
তৃতীয়ে উঠিলে স্থলে তুমি
বরাহ রূপেতে অবতার,
চতুর্থে নৃসিংহ অবতারে প্রভু
প্রহ্লাদেরে করিলে উদ্ধার।
বলদর্পী বলিকে দমিলে পঞ্চমে
দেখা দিয়া বামন অবতারে,
ষষ্ঠে মহাবীর পরশুরাম রূপে
নিঃক্ষত্রিয় করিলে কুঠারের ভারে।
বলরাম তুমি হলাঘাতে
মৃত্তিকা সরস করি পৃথ্বীরে কর অন্নময়,
অতঃ প্রজারঞ্জন প্রভু রামরাজা
প্রজাগণে করিলে নির্ভয়।
নবমে হিংসার প্রাবল্যে তুমি—
শান্তির বাণী আনিলে বুদ্ধ অবতার,
দশম অবতারে কল্কি নামে এস
পাপ অনাচার দূর করি
নিপীড়িত বিশ্বজনে কর হে উদ্ধার।



সাধ-না

ঐশানী কর

রাধা হতে চাই না
আমি।
মীরা তো
হতেই পারি বলো?
ধেনু নিয়ে কাটছে,
তোমার
সাধের দিবাগুলো।

গোটে যাও,
বেনু বাজাও,
রাখালসাজা ভালো।
রাধা নই,
আমি মীরাই,
সাধতে বলো গেল।

তোমার জন্য

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

তোমার জন্য নদীর পাড়ে
বসে থাকি
নদীর জলে তোমার মুখের
ছবি দেখি
তোমার জন্য অনন্ত এক
অপেক্ষাতে
মনের বাঁধন ভাঙতে থাকে
দিনে রাতে
তোমার জন্য ছুটে বেড়াই
সাগর পাহাড়
তোমার জন্য সব ছেড়েছি
নিদ্রা আহার
তোমার জন্য লিখছি আমি
কাব্যগাথা
তোমার জন্য জমিয়ে রাখা
বুকের ব্যথা
তোমার জন্য হিমেল রাতে
জেগে থাকা
তোমার জন্য নিজের মাঝে
লুকিয়ে থাকা
তোমার জন্য পথ চলা
হবে না শেষ
তোমার জন্য অপেক্ষাতে থাকতে হবে
এই তো বেশ।



‘বর্ণময় এ সময়’

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

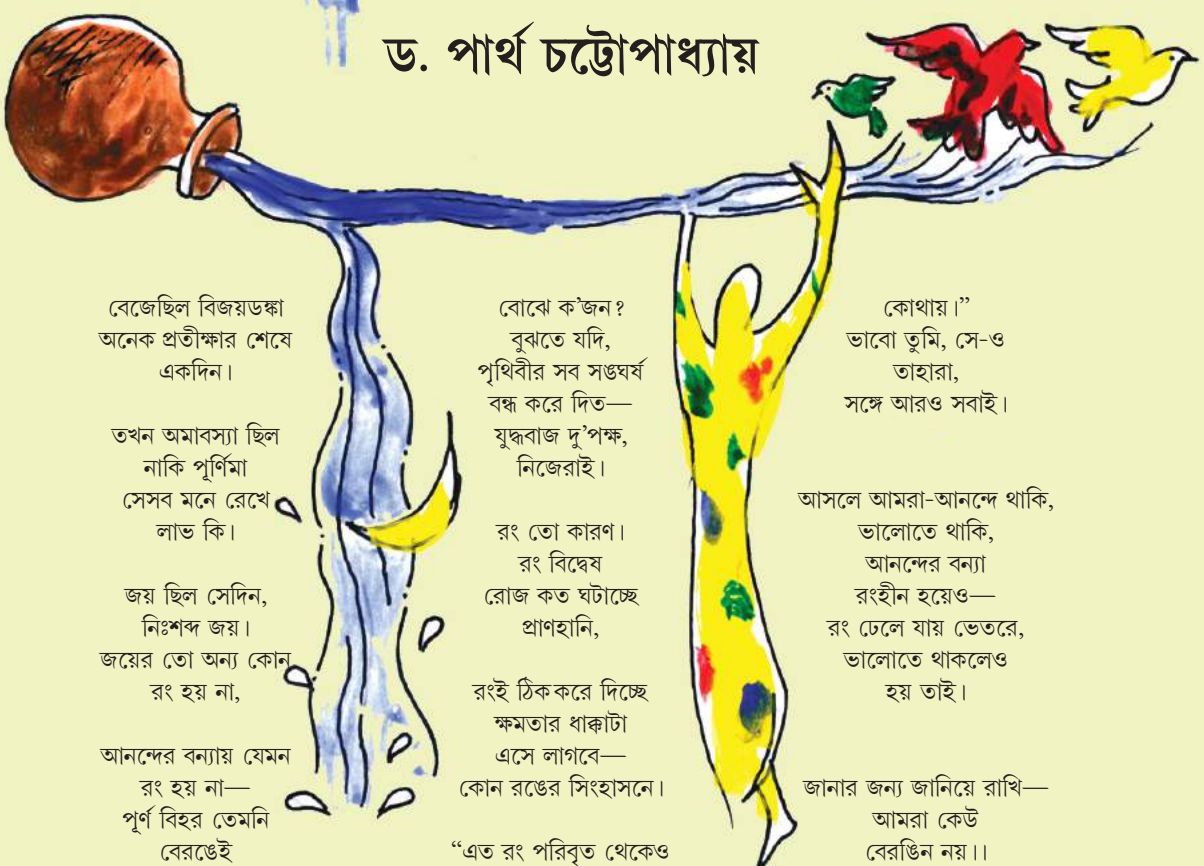

বেজেছিল বিজয়ডঙ্কা
অনেক প্রতীক্ষার শেষে
একদিন।

তখন অমাবস্যা ছিল
নাকি পূর্ণিমা
সেসব মনে রেখে
লাভ কি।

জয় ছিল সেদিন,
নিঃশব্দ জয়।
জয়ের তো অন্য কোন
রং হয় না,

আনন্দের বন্যায় যেমন
রং হয় না—
পূর্ণ বিহ্বর তেমনি
বেরঙেই
দুকূল ছাপায়।

বোঝে ক'জন?
বুঝতে যদি,
পৃথিবীর সব সঙঘর্ষ
বন্ধ করে দিত—
যুদ্ধবাজ দু'পক্ষ,
নিজেরাই।

রং তো কারণ।
রং বিদ্বেষ
রোজ কত ঘটাচ্ছে
প্রাণহানি,

রংই ঠিককরে দিচ্ছে
ক্ষমতার ধাক্কাটা
এসে লাগবে—
কোন রঙের সিংহাসনে।

“এত রং পরিবৃত থেকেও
শরীরে রং লাগে
কোথায়।”
ভাবো তুমি, সে-ও
তাহারা,
সঙ্গে আরও সবাই।

আসলে আমরা-আনন্দে থাকি,
ভালোতে থাকি,
আনন্দের বন্যা
রংহীন হয়েও—
রং ঢেলে যায় ভেতরে,
ভালোতে থাকলেও
হয় তাই।

জানার জন্য জানিয়ে রাখি—
আমরা কেউ
বেরঙিন নয়।।

নাটক

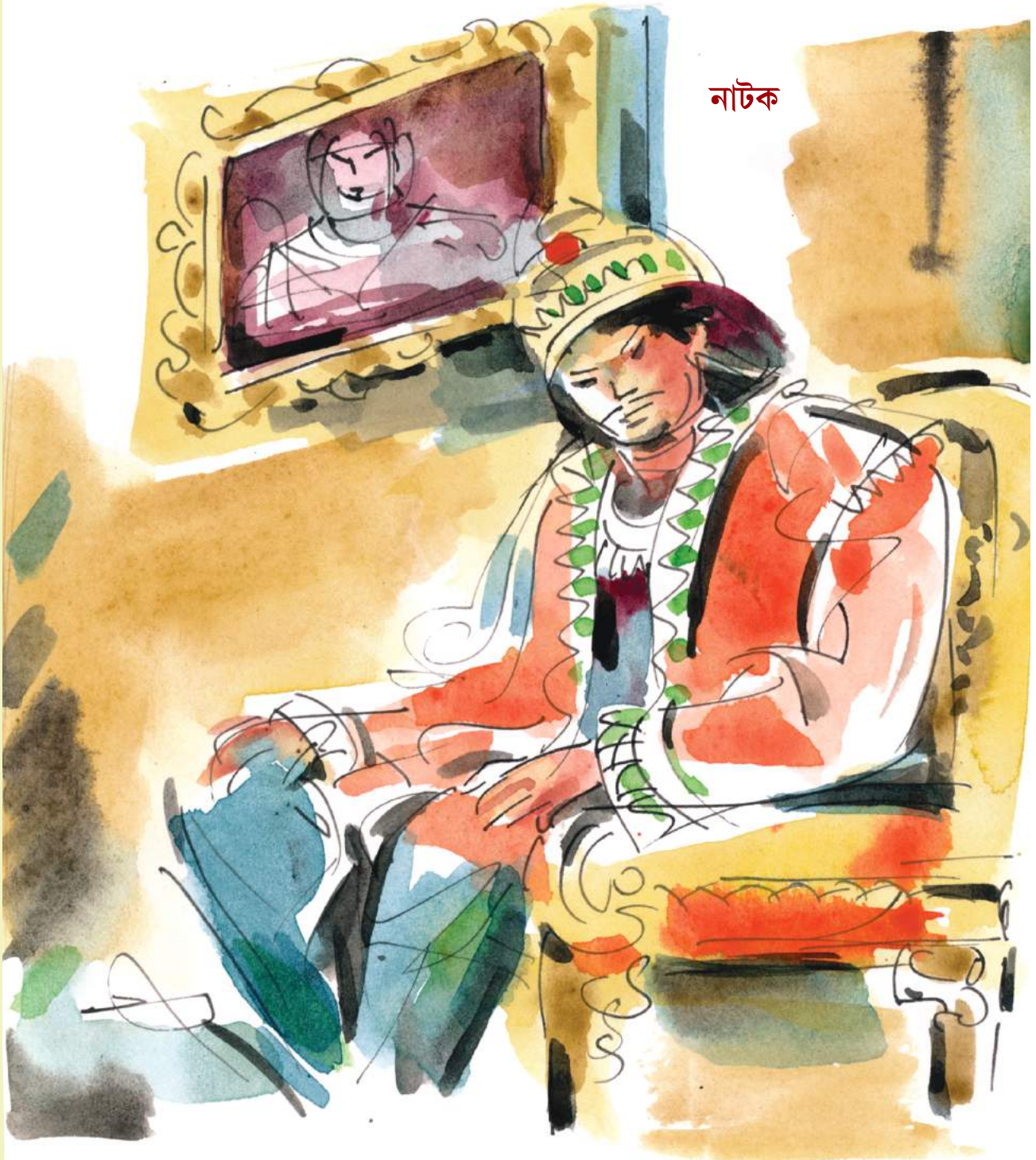

ইলা-গুঁড়েষা

ব্রাত্য বসু

প্রস্তাবনা

কোচবিহারের রাজা বীরনারায়ণের আখ্যান সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারি শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বিরচিত মহাগ্রন্থ 'বৃহৎ বঙ্গ'-তে। দীনেশচন্দ্র জানাচ্ছেন এই আখ্যান তিনি পেয়েছেন ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে রাজবাড়ির মুন্সি জয়নাথ ঘোষের হাতে লেখা কোচবিহারের ইতিহাস থেকে। জয়নাথ এই চারশো উনসত্তর পাতার বইটি লিখেছিলেন কোচবিহারের তদানীন্তন রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ-এর প্রধানমন্ত্রী কালীচন্দ্র লাহিড়ীর নির্দেশে। দীনেশচন্দ্র এও বলছেন, "এ পর্যন্ত বহিখানি ছাপা হয় নাই।" এরপর আমি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোচবিহারের ইতিহাস' পুস্তকে লিপিবদ্ধ সংক্রান্ত নথি উল্টোই। তাতে মোটামুটিভাবে জয়নাথ ঘোষের হস্তলিখিত ইতিহাসের সঙ্গে এক ধরনের সাযুজ্য পাই। কোচরাজার ঘটনাটি অনেকদিন মাথার ভেতর ঘুরছিল। সেই উপলক্ষে 'ইলা-গুঁড়েষা' লেখা হল। এটি একটি ইতিহাস আশ্রিত কল্পনাট্য যা হয়তো মানবজাতির চিরন্তন ট্র্যাজেডিকে উন্মুক্ত করে। সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। দীনেশচন্দ্রকে আ-ভূমি প্রণাম।

ব্রাত্য বসু
সেপ্টেম্বর, ২০১৫

চরিত্রলিপি : **কোরাস, কোরাস দলপতি, পণ্ডিত নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী, প্রদ্যোৎ, বীরনারায়ণ, ব্রততী, শাণিত রায়, উমারত্ন জৈন, পদ্মাবতী, কুলার্ণব তান্ত্রিক, মোদক বর্মন, বৃন্দেশ্বরী, ইলা, ধূর্জটি ভট্ট, রক্ষীর দল, প্রহরিণী।**

প্রথম দৃশ্য

মঞ্চ খুললে কোরাস ঢোকে। প্রথমে দলপতি। পেছনে বাকিরা। তারা মঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ায়। নেপথ্যে দুন্দুভির শব্দ হয়। আওয়াজ ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে। তারপর কমে। কোরাসের দলপতি ও বাকিরা সংলাপ ধরে।

কোরাস : পথ মানে বন্ধুর
বন্ধু মানে দুর্জ্ঞেয়
আত্মা মানে বধির
জ্ঞান মানে শূন্য।
তবু আমরা পরাজয় স্বীকার করি না।
আমরা ভান করি যে জিতছি।
এক গভীর প্রতারণায় নিজের সঙ্গে নিজের খেলা চলে।
নিজেকে বোঝাই অন্যকে দমন করো।
আক্রমণ করো। শব্দ পিঁপড়ে দিয়ে বিষিয়ে দাও অন্যের কান ও শরীর। এই সব শেষ হলে অতঃপর দর্পণের সামনে গিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে হাসো। একেবারে গুপ্তঘাতকের মতো। মরে যাওয়ার পরেও নিজেকে বলো দ্যাখো কেমন বেঁচে রয়েছি আমরা। কেমন জিতেছি। বলো, বলো নিজেকে কেমন জিতেছি।

কোরাসের মধ্যে দিয়ে দৃশ্যের অবতারণা হয়।

স্থান : কোচবিহার রাজ্যের উপকণ্ঠে রাজা শুক্লধ্বজ (চিলা রায়)-এর নামাঙ্কিত জঙ্গলের বহির্ভাগ।
সন : ১৬২৪। কোচ রাজা বীরনারায়ণ-এর শাসনকাল।
সময় : দিনের বেলা।

পণ্ডিত নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শীর কুটির। আবহ আসে। অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজের শব্দ ও তাদের ডাক আবহের সঙ্গে মেশে। দেখা যায় পণ্ডিত নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী ও তাঁর ছাত্র প্রদ্যোৎ দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে। পিছনে রাজা বীরনারায়ণের সৈনিকরা দাঁড়িয়ে। দু'জন সৈনিক নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী ও প্রদ্যোৎকে ধরে আছে। তাঁরা ছটফট করছেন। নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শীর সামনে ভিতর থেকে রাজা

বীরনারায়ণ এসে দাঁড়ান। দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে তাকান। এক মুহূর্ত নীরবতা।

নারায়ণ : কাজটা আপনি ঠিক করলেন না মহারাজ।

বীরনারায়ণ : আমি একদম ঠিক কাজ করেছি পণ্ডিত নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী। ব্রততী আমাকেই চায়।

প্রদ্যোৎ : হতেই পারে না।

বীরনারায়ণ : (প্রদ্যোতের দিকে তাকান। হাসেন) আজকের দিনটা শকুন আর কাকের পক্ষে ভাল। তাই না প্রদ্যোৎ?

প্রদ্যোৎ : মহারাজ আপনি আমাকে হত্যা করতে চাইলে করুন। তাও বলব ব্রততী আপনাকে চায় না। আপনি জোর করে গুরুদেবের কন্যাকে নিয়ে যাচ্ছেন।

বীরনারায়ণ : গুরুদেবের কন্যা না তোমার ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা? (প্রদ্যোৎ চুপ করে থাকে। বীরনারায়ণ হাততালি দেন। কুটিরের ভিতর থেকে নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শীর কন্যা ব্রততীকে দু'জন প্রহরিণী নিয়ে আসে। ব্রততী এসে বীরনারায়ণের বাহুলগ্না হয়। বীরনারায়ণ তাকে ধরে নারায়ণ আর প্রদ্যোতের দিকে তাকিয়ে হাসেন। নারায়ণ আর্তনাদ করেন)

নারায়ণ : ব্রততী, কন্যা তুই স্ব-ইচ্ছায় মহারাজের সঙ্গে যাচ্ছিস?

ব্রততী : হ্যাঁ পিতা। যাচ্ছি। মহারাজ বীরনারায়ণ আমাকে ভালবাসেন। তিনি আমাকে তাঁর মহিষী করবেন।

প্রদ্যোৎ : ব্রততী, মহারাজ বহুবল্লভা। তাঁর অনেক মহিষী।

ব্রততী : আমি কনিষ্ঠতমা হব প্রদ্যোৎ। তাতে কী?

নারায়ণ : মহারাজের সঙ্গে তোর বয়সের ব্যবধান অনেক।

ব্রততী : তা সত্ত্বেও ওঁকেই আমি ভালবাসি। আমি ওঁকেই আমার মন সমর্পণ করেছি।

প্রদ্যোৎ : কবে থেকে?

ব্রততী : মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন। গত বছর যেদিন এই চিলা রায়ের জঙ্গলের ধারে আমাদের রাজ্যে বিশাল উৎসব হল। ব্যাধেরা শিকার করে আনল বন্য শূকর। চালের গুঁড়ো দিয়ে স্বাদু পিঠা বানাল গ্রামের রমণীরা। রঙিন ধ্বজা হাতে নেচে উঠল আবালবৃদ্ধবনিতা—আর এই সময় ঘোড়ায় টানা রথে করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন স্বয়ং রাজা বীরনারায়ণ। চিক্না পর্বতের সমস্ত শিখরে যেন মশাল জ্বলে উঠল। রাজার আয়তচক্ষু, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সুন্দর মুখমণ্ডল দেখে মনে হল ব্রততী যদি কারও জন্য বলিপ্রদত্ত হয়ে থাকে তবে তা আঠারো কোঠার রাজা এই বীরনারায়ণ।

নারায়ণ : বিশ্বাসঘাতিনী।

ব্রততী : পিতা পাণ্ডিত্য আর বিদ্যা সবসময়ই রাজানুগ্রহ প্রত্যাশী। খালি পেটে বিদ্যাচর্চা হয় না পিতা। বরং আপনি আমাদের এই বিবাহ মেনে নিন। আপনি রাজসম্ভাষণে হয়ে উঠবেন এই কোচবিহার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর।

নারায়ণ : নির্লজ্জা ভ্রষ্টা কন্যা। তোকে বিদ্যাদান করেছিলাম। মানুষ করেছিলাম। তার প্রতিদানে এই দিলি তুই আমাকে।

বীরনারায়ণ : হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী। আপনি ভুলে যাবেন না চার বছর আগের কথা। যখন নিতান্ত দীনহীন অবস্থায় আপনার এই অসহায়া বালিকা কন্যাকে নিয়ে আপনি উপস্থিত হলেন আমার মণ্ডপ আবাসে। আপনার শতচ্ছিন্ন মলিন বেশ আর কোটরাগত চক্ষু দেখে রাজদ্বারীরা মনে করেছিল আপনি ত্রিপুরা থেকে আগত বৈষ্ণব ভিক্ষুক। দু'মুষ্ঠি চালভিক্ষা দিয়ে রাজদেউড়ি থেকেই আপনাকে ফেরত পাঠাচ্ছিল তারা। আমি যখন জানতে পারি আপনিই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ত্রৈলোক্যদর্শী নারায়ণ, আমি আপনাকে এই রাজ্যে স্থান দিয়েছিলাম। অন্ন দিয়েছিলাম। ভুলে যাবেন না আমি আপনার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা।

প্রদ্যোৎ : তার বিনিময়ে আজ তাঁর প্রাণাধিক কন্যাকে এইভাবে শ্যেনপক্ষীর মতো ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মহারাজ?

বীরনারায়ণ : অবোধ শিষ্য প্রদ্যোৎ। তুমি ব্রততীকে আকাঙ্ক্ষা করতেই পারো, ভালও বাসতে পারো, কিন্তু চক্ষুষ্মান হও। দেখতে পাচ্ছ না যে ব্রততী আমাতেই সমর্পিত? আমি আমার প্রাপ্য সম্পদ আমার গৃহে নিয়ে যাচ্ছি এই যা। ব্রততী বলো ওকে। বলে দাও।

ব্রততী : প্রদ্যোৎ আমি জানি তুমি আমাকে চাও, কিন্তু আমি তো তোমাকে কখনই চাইনি। তুমি তা জান।

প্রদ্যোৎ : (অস্ফুট কণ্ঠ) কী বলছ ব্রততী? তুমি সব ভুলে গেলে? সেই মাঘীপূর্ণিমার রাতে...কামাক্ষ্যা মন্দিরের নিচে...তুমি কী অপূর্বভাবে তাকালে আমার দিকে—সেই সবই তাহলে মিথ্যে, সবই ছলনা?

ব্রততী : সে তোমারই কল্পনা প্রদ্যোৎ। ওতে আমার কোনও অংশ নেই। একটা কথা মনে রেখো প্রদ্যোৎ আমি রাজা বীরনারায়ণের অহং। আর সেই অহং-এ কখনও আঘাত কোরো না, বিদ্যার স্বাভিমান কখনও রাজ অহং-এর থেকে মূল্যবান নয়।

বীরনারায়ণ : প্রহরিণীর দল! যাও কনিষ্ঠারানিকে চতুর্দোলায় তোলো। আমি নিজে উঠছি আমার রথে। অশ্বারোহীরা, রানির চতুর্দোলায় আমার স্বস্তি চিহ্নিত ধ্বজা উড়িয়ে দাও। গ্রামবাসীরা দেখুক, রায়াকত নেতারা দেখুক—আজ থেকে কোচ রাজা বীরনারায়ণের অন্তঃপুরের নতুন সম্রাজ্ঞী, রানি ব্রততী।

(প্রহরিণীর দল আগে ব্রততীকে নিয়ে ও পরে সৈন্যদল পরিবেষ্টিত হয়ে বীরনারায়ণ বেরিয়ে যান। নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী পড়ে যান। প্রদ্যোৎ তাকে ধরে)

নারায়ণ : ব্রততী এইরকম করল প্রদ্যোৎ? এত লোভ ওর? এত নষ্টা?

প্রদ্যোৎ : না। গুরুদেব না। আমি বলছি ব্রততী যা করেছে তা ভেবেচিন্তেই করেছে। ও জানত ও যদি আজ রাজা বীরনারায়ণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় না যায় তা হলে

বীরনারায়ণ নিশ্চিতভাবে আমাদের সবাইকে হত্যা করবে। গত এক বছরে কোচরাজ্যে ব্রততী বীরনারায়ণের পঞ্চম শিকার। ভেবে দেখুন তার মধ্যে মেচবংশীয় হাড়িয়া চন্দনের পত্নী জীরাও ছিল। চন্দন রাজাকে বাধা দিয়েছিল। জীরাও করেছিল প্রতিবাদ। সেইদিন চিকনা পর্বতের তলায় শিবমন্দিরের থান ভেসে গিয়েছিল চন্দন ও জীরার শোণিতে। গোটা কোচরাজ্য তা জানে। আর ব্রততী কি সে গল্প জানে না ভাবছেন?

নারায়ণ : বিশ্বাসঘাতক। আমার মাতৃহারা কন্যাকে—

প্রদ্যোৎ : গুরুদেব। আপনি বিচলিত হবেন না।

নারায়ণ : (তাঁকে অসুস্থ লাগে) রাজা বীরনারায়ণ আমাকে কখনই পছন্দ করতে পারেননি। আশ্রয় দিয়েছেন, অন্ন দিয়েছেন—এ সবই ঠিক কিন্তু তার বিনিময়ে যে প্রশ্নাতীত আনুগত্য উনি চাইছিলেন তা আমার সাধ্যাতীত ছিল।

প্রদ্যোৎ : জানি গুরুদেব। উনি তো চেয়েছিলেন আপনি মণ্ডপ আবাসের নিকটস্থ কোনও কুটিরে থাকুন। যাতে রাজার চোখের কাছে থাকতে পারেন। কিন্তু আপনি এই নগরীর উপকণ্ঠে উঠে এলেন। এই শুক্লধ্বজ তথা চিলা নামাঙ্কিত জঙ্গলের ধারে।

নারায়ণ : আমি রাজার চোখের আড়ালে থাকতে চাইছিলাম প্রদ্যোৎ। যাতে কোনওভাবে তাঁর অসন্তোষের কারণ না হই।

প্রদ্যোৎ : কিন্তু আপনি বরাবরই তাই-ই ছিলেন গুরুদেব। উনি কখনওই আপনাকে প্রীতচোখে দেখতে পারেননি। চোখের সামনে থাকুন বা আড়ালে, রাজার অসন্তুষ্ট অপ্রীত চোখ সবসময়ই আপনাকে ধাওয়া করে গেছে।

নারায়ণ : (আপনমনে) রাজা আমার স্ববর্গকে দেখেছেন, আমার পাঠশালার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আমার পুত্রদের প্রাগজ্যোতিষপুরে উচ্চ বিদ্যাচর্চার জন্য পাঠিয়েছেন, মাতৃহারা কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং পাশাপাশি আমার চর্চাকে তাঁর নিজস্ব নির্মাণের কাজে লাগিয়েছেন। উপকার করছেন আবার ধ্বংসও চাইছেন! এ কী আশ্চর্য মনোবৃত্তি! উনি চাইছিলেন যাতে নিয়তি আমার সর্বনাশ ডেকে আনে। আর শেষে আমারই জাতিকা আমার নিয়তি হয়ে দেখা দিল।

প্রদ্যোৎ : চলুন গুরুদেব প্রতিশোধ নিই। দিল্লীশ্বরের কাছে গিয়ে ওনাকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলি।

নারায়ণ : না, প্রদ্যোৎ নয়। ভুলে যেও না পণ্ডিত মুকুন্দ সার্বভৌমের কথা। মুকুন্দও ঠিক এক কাজ করেছিলেন রাজার পিতা লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গিরকে তিনি টেনে এনেছিলেন এই কোচবিহারের মাটিতে।

প্রদ্যোৎ : জাহাঙ্গীর তখন উচিত শিক্ষাও দিয়েছিলেন ওই দুর্বিনীত লক্ষ্মীনারায়ণকে। রাজার পিতা সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই থেকে আমাদের রাজ্যে নারায়ণী মুদ্রায় আজও অর্ধেক মোঘল-চিহ্ন। গুরুদেব চলুন আমরা দিল্লি যাই। অসমরাজ আর ভুটিয়ারা বীরনারায়ণকে রাজা বলে মানেনি, রায়াকতরাও ইতিমধ্যেই নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে দিয়েছে, গৃহ আক্রমণে রাজা যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত। এই সময় যদি জাহাঙ্গির কোচবিহার আক্রমণ করেন, তা হলে রাজার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ওই দর্প ওনার চূর্ণ হবে।

নারায়ণ : না, প্রদ্যোৎ না। মনে রেখো মুকুন্দ সার্বভৌম যখন জাহাঙ্গিরের কাছে সাহায্য প্রার্থন করেন, জাহাঙ্গির তখন পূর্ণ যুবক। তারুণ্যের তেজে তিনি তখন মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডের মতো। কিন্তু আজ সেই দিল্লীশ্বর অশক্ত, ন্যুব্জ। বয়সের ভারে জীর্ণ। তদুপরি নামেই এখন তিনি দিল্লীশ্বর। পুরো রাজপাট দেখেন ঘোর সন্দিগ্ধ, মানসিক জটিলতায় দীর্ণ, কুটিলা নুরজাহান। তিনি আমাদের কথায় বিশ্বাস করে কখনই উত্তরবঙ্গে আসবেন না।

প্রদ্যোৎ : তা হলে? প্রতিশোধ নেব না?

নারায়ণ : নেব। যথাসময়ে নেব। চলো আমরা এখন তান্ত্রিক কুলার্ণবের কাছে যাই।

প্রদ্যোৎ : সেই জপসিদ্ধ মহাতান্ত্রিক কুলার্ণব। তিনি তো শুনেছি পর্বতের ওপারে ঘন জঙ্গলের মধ্যভাগে থাকেন। গভীর অমাবস্যা ছাড়া তাঁর দেখা মেলে না।

নারায়ণ : চন্দ্র এখন আকাশের মধ্যভাগে বৎস। চলো হাঁটতে শুরু করি। একমাস পর পূর্ণ অমাবস্যা। সেইদিন ঘোর কৃষ্ণপক্ষের রাতে গভীর অরণ্যের মাঝে তাঁর কুটিরের সামনে আবির্ভূত হবেন দিনরাত্রি বিধায়িনী মনস্তম্ভকারী অনলস্তম্ভী তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ কুলার্ণব। চলো বৎস আমরা হাঁটি। তাঁকে গিয়ে বলি আজ বীরনারায়ণ প্রজাপালক। দক্ষ প্রশাসক। কিন্তু তাঁর কৃতকর্মের মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে পতনের ইঙ্গিত। তাঁর সর্বনাশের ভাবী ইশারা তাঁর মৌল স্বভাবের মধ্যেই আচ্ছাদিত। কুলার্ণব আমাদের বলে দেবেন কোন পথে কোন রিপুর তীরে শেষ হবেন রাজা বীরনারায়ণ। এই কোচরাজ্যে এক সর্বনাশা মারী এসে আগুন হয়ে জ্বলবে সর্বত্র। চলো বৎস, চলো।

(দু'জনে বেরিয়ে যায়। কোরাস ঢোকে। প্রথমে দলপতি। তার পিছনে বাকিরা)

কোরাস : মন্ত্র আনে ঘোর।
স্মরণ আনে ক্রিয়া।
ভাষণ আনে মিথ্যা।
অহং আনে অন্ধতা।

তবু যারা শুধুমাত্র স্বার্থ চিন্তায় রত, তাদেরই জয় হবে।
যারা শুধুমাত্র আত্মোন্নতি ছাড়া কিছু বোঝে না তারাই এ নষ্ট পৃথিবীর যোগ্য।
যারা শ্রমহীন চাতুর্য নিয়ে বাঁচে তাদেরই কালিমাচ্ছন্ন ধরিত্রী শস্যফলফুলে ভরন্ত করে দেবে।
তবু আশ্চর্য এই যে তাদের পতন ঘটায় তারা



নিজে। তাদের স্বভাবই তৈরি করে তাদের আসন্ন সর্বনাশ। আর সেই অমোঘ প্রহেলিকায় পৃথিবী তাই এখনও সচল। অদ্যপি সচল।

(কোরাস বেরিয়ে যায়। মঞ্চ বদলে যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যের পট তৈরি হয়।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান : রাজা বীরনারায়ণের মন্ত্রণালয়।

সময় : দিনের বেলা।

(রাজা বীরনারায়ণ ও মন্ত্রী শাণিত রায় দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের কোণে বল্লমহাতে রক্ষী। শাণিত রায় মাঝবয়সি। রাজা ও শাণিত—দু'জনেই গম্ভীর।)

বীরনারায়ণ : আচ্ছা। তার মানে মোগলরা আবার হানা দিতে পারে?

শাণিত : পারে মহারাজ।

বীরনারায়ণ : কিন্তু পিতা লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে ওদের যে সন্ধি হয়েছিল তা তো কোনওভাবে লঙ্ঘিত হয়নি।

শাণিত : না হয়নি। কিন্তু গুপ্তচর বলছে সেনাপতি মিরজুমলা বহু সৈন্য নিয়ে ক্রমশ বঙ্গের দিকে এগোচ্ছে।

বীরনারায়ণ : ওরা চায়টা কী? আমার কোষাগারের অর্থ?

শাণিত : আর কিই বা হতে পারে? সুদূর দিল্লি থেকে ওরা জানে সাম্রাজ্য দখল অসম্ভব। মাঝেমধ্যে এসে এইভাবে উৎকোচ আদায় করে।

বীরনায়ারণ : সম্রাট আকবরের সৈন্যদের অভিজ্ঞতার কথা কি এরা ভুলে গেছে? আবার এ রাজ্যে সেই দৃশ্যেরই পুনরাভিনয় হতে যাচ্ছে।

শাণিত : না মহারাজ। তখন আমাদের প্রায় দুই লক্ষ পদাতিক ও চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। হাজারখানা জাহাজ ছিল। আজ আমাদের অবস্থা অত ভাল নয়।

বীরনারায়ণ : বারবার পিতার সঙ্গে আমার তুলনা করে আমার অপদার্থতা প্রমাণের চেষ্টা কোরো না মন্ত্রী শাণিত রায়। (শাণিত চুপ করে থাকে) এ কথা ঠিক যে পিতার শৌর্যের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না। কিন্তু পিতার হয়ে সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছিলেন পিতার পিতৃব্য জগদ্বিখ্যাত বীর চিলা রায়। পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেই সাম্রাজ্যই ভোগ করেছিলেন। কিন্তু পিতাও সেই বিশাল সাম্রাজ্য রাখতে পারেননি। নইলে কেন তাঁকে সম্রাট জাহাঙ্গিরের দরবারে গিয়ে মাথা নত করে দাঁড়াতে হয়েছিল? কেন দক্ষিণের ঘোড়াঘাট থেকে পশ্চিমের ত্রিহুত পর্যন্ত বিস্তৃত কোচ সাম্রাজ্য পিতার সময়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল?

শাণিত : সেকথা সত্য মহারাজ।

বীরনারায়ণ : কেন আজ আমার সহোদরা লীলাবতী মোগল সেনাপতি মানসিংহের স্ত্রী? কেন সেই উপঢৌকন দিয়েছিলেন চিরশ্রেষ্ঠ নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণ? লোকে বলে তিনি নাকি অজেয় ছিলেন। এমনই অজেয় যে আমার সেই সহোদরা লীলাবতীকে আমি আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল নিজের চোখে দেখিনি। পিতা মারা যাওয়া পর্যন্ত তিনিও নিজের সেই কন্যাকে আর দেখতে পাননি।

শাণিত : জানি মহারাজ। আমি ও কথা বলিনি। আমি বলেছি

মোগলেরা আবার এই কোচ রাজ্যে হানা দিতে যাচ্ছে। আমি আপনার মন্ত্রী। আপনাকে অগ্রিম যা খবর পাচ্ছি, তা জানানো আমার সমুচিত কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

বীরনারায়ণ : তাহলে অর্থের জোগান আনো শাণিত রায়। রাজকোষে বেশি অর্থ নেই আর। প্রজাদের থেকে আর রাজস্ব নেওয়া যাবে না। এতে ওরা ক্ষুণ্ণ হবে। তাছাড়া ওদের দেওয়ার মতো আর বিশেষ কিছু নেইও।

শাণিত : তাও জানি মহারাজ। প্রজাদের মুখ আজ এমনিতেই মলিন, বিবর্ণ।

বীরনারায়ণ : ওদের আনন্দের উপকরণ দাও। বেশি করে দাও।

শাণিত : তাও দিয়েছি মহারাজ। তার পরেও ওরা ধুঁকছে। ওদিকে রায়াকত নেতারা মাঝেমাঝেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। সব মিলিয়ে আজ আমরা বিপর্যস্ত মহারাজ।

বীরনারায়ণ : ওসব কথা বুঝি না। অর্থ আনো। অর্থ। ধনীশ্রেষ্ঠীদের ডাকো। তাদের থেকে অর্থ নাও। মোঘলদের জন্য কিছু অর্থ রেখে বাকি আমার বিলাসের জন্য তুলে রাখো।

শাণিত : সেই ব্যবস্থা করেছি মহারাজ।

বীরনারায়ণ : কী ব্যবস্থা?

(শাণিত বল্লম হাতে প্রহরীর কাছে যায়। প্রহরী ঘাড় নেড়ে বাইরে যায়)

বীরনারায়ণ : কে আসছে?

শাণিত : আমাদের রাজ্যে নতুন আসা এক শ্রেষ্ঠী। উমারত্ন জৈন।

(উমারত্ন জৈন প্রবেশ করে। শাণিত তাকে অভ্যর্থনা জানায়)

শাণিত : মহারাজ। এনার কথাই আপনাকে বলছিলাম। বস্ত্রশ্রেষ্ঠী উমারত্ন জৈন।

বীরনারায়ণ : কী বস্ত্র বিপণন করেন আপনি?

উমারত্ন : মসলিন মহারাজ। খাঁটি ঢাকার মসলিন। আমি নিজে গিয়ে সেখান থেকে তাঁতিদের থেকে কিনি। তারপর সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিক্রি করি। স্বয়ং দিল্লীশ্বরী নুরজাহান আমার থেকে নেওয়া মসলিনের বিশেষ অনুরাগিণী। আমার মসলিন দেখে উনি বলেছেন, এ মানুষের হাতের কাজ নয়। পরিদের।

বীরনারায়ণ : তা আমাদের রাজ্যে কী মনে করে? এ রাজ্যে খাঁটি ঢাকাই মসলিন কেনার লোক স্বল্প। অত অর্থ ওদের হাতে নেই।

উমারত্ন : আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ এখানে থাকেন মহারাজ। শুনেছি কোচরাজ্যে জৈনদের খুব খাতির। আপনারা শৈব হলেও জৈনদের সম্মান আছে এখানে। তাছাড়া আমার মসলিনের কদর কাছাড়ে, ত্রিপুরায়, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর থেকে সুদূর দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত হরিকেলে। ভাবলাম দেখি কোচরাজ্যে কী ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে আমার? আমার বিপণন নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না মহারাজ। তা আমার ভাবনা।

বীরনারায়ণ : বেশ। এ রাজ্যে ব্যবসা করতে গেলে কিন্তু কোষাগারে শুল্ক দিতে হয়।

উমারত্ন : দেব।

বীরনারায়ণ : এবং তা অগ্রিম।

উমারত্ন : তাই দেব মহারাজ।

বীরনারায়ণ : ভাল। আমাদের রাজ্যে জৈনমন্দিরও আছে বেশ বড়। সেসব ঘুরেছেন?

উমারত্ন : ঘুরেছি মহারাজ। সত্যিই খুবসুন্দর রাজ্য আপনার।

বীরনারায়ণ : আপনাদের সহযোগিতা পেলে এ রাজ্য একদিন জগৎশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে।

উমারত্ন : হ্যাঁ মহারাজ। নিশ্চয়ই।

(বীরনারায়ণ ইঙ্গিত করেন। রক্ষী উমারত্নকে নিয়ে যায়। শাণিত তাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসে)

বীরনারায়ণ : যাক্। তাও কিছু ব্যবস্থা হল। আর আমাদের শ্রেষ্ঠীরা? তারা কিছু সাহায্য করবে না?

শাণিত : তারা হাত গুটিয়ে রেখেছে মহারাজ। বিশেষত আপনার পরপর (চুপ করে যায়)

বীরনারায়ণ : কী শাণিত? চুপ করে থাকলে? বলো। আমি ওই শ্রেষ্ঠী হরমেশ্বরের পত্নীকে লুণ্ঠন করায় ওদের স্বাভিমানে আঘাত লেগেছে, তাই তো?

শাণিত : ওরা ভয় পাচ্ছে মহারাজ। ভাবছে ওদের গৃহেও যদি আপনি আক্রমণ করেন।

বীরনারায়ণ : মন্ত্রী শাণিত। এক্ষেত্রে আপনি কেন আমার পিতার সঙ্গে তুলনা করেন না? তিনিও আমার মতোই সুদর্শন, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও বহুস্ত্রীবল্লভ ছিলেন। তিনি যখন নিজের রাজবংশী প্রজার বাড়ি হানা দিয়ে পরস্ত্রী লুণ্ঠন করতেন, কই সে বেলা তো আপনারা কিছু বলেন না। (থামেন) শ্রেষ্ঠীদের বলুন সুন্দরী রমণী বিবাহ না করতে। তা হলেই তারা নিরুপদ্রব থাকবে। যান, ওদেরও বলুন অর্থের জোগান প্রস্তুত রাখতে। মোগল যদি হানা দেয় এবং আমার সৈন্যদল যদি পর্যুদস্ত হয়, যা তারা হবেই, তখন কিন্তু আমাকে শ্রেষ্ঠীদের অর্থ দিতেই হবে।

শাণিত : ঠিক আছে মহারাজ। আপনি যখন বলছেন তাই-ই হবে।

(বাইরে একটি তূর্যধ্বনি হয়। এরা সচকিত হয়। সেই বল্লমধারী রক্ষী আসে)

রক্ষী : মহারাজ, রানি পদ্মাবতী আসছেন।

বীরনারায়ণ : এখন? এখানে? এখন তো রাজকার্য চলছে। এই সময়ে তাঁর কী দরকার?

রক্ষী : বলছেন জরুরি দরকার। আপনাকে এই মুহূর্তে সমস্ত কার্য কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখতে বলছেন।

বীরনারায়ণ : আচ্ছা। তবে নিশ্চয়ই জরুরি। মন্ত্রী শাণিত, আপনি যান। সভাগৃহে যান। ওদের খবর দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর আমি সভাগৃহে আসছি। বাকি কথা আমি পরে আপনার সঙ্গে বলব।

(শাণিত বেরিয়ে যায়। ভেতর থেকে রানি পদ্মাবতী আসেন। তিনি গম্ভীর)

বীরনারায়ণ : কী হয়েছে রানি? এই অসময়ে তুমি মন্ত্রণাকক্ষে?

(পদ্মাবতী ইশারা করেন। ভিতর থেকে দু'জন প্রহরিণী সাদা কাপড়ে মোড়া ব্রততীর দেহ নিয়ে আসে। তাকে শুইয়ে রাখে)

পদ্মাবতী : আজ সকালে ও আত্মহত্যা করেছে।

বীরনারায়ণ : ওই নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শীর কন্যা? আত্মহত্যা করল? আজ তো আমার সঙ্গে ওর বিবাহের দিন?

পদ্মাবতী : রাজা। তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তোমার জন্য এই নিয়ে রাজ্যে পঞ্চম কুমারী মারা গেল। আর তুমি মূর্খের মতো বিশ্বাস করো এরা তোমাকে ভালবেসে এই প্রাসাদে আসে।

বীরনারায়ণ : আমি তো তাই ভাবি। ভাবতে তাই-ই ভাল লাগে। (থামেন) কী হয়েছিল?

পদ্মাবতী : আমি পূজাকক্ষে ছিলাম। সকাল থেকেই খবর পাচ্ছিলাম আজ রাতে এর সঙ্গে নাকি তোমার ফুলশয্যা।

বীরনারায়ণ : হ্যাঁ। ওতো বলল একমাস ব্রতপালন করবে। তারপর আমাকে বিবাহ করবে। গতকাল ওর ব্রত শেষ হয়েছে।

পদ্মাবতী : হায় হতভাগ্য—ও সময় নিচ্ছিল, তুমি তা বুঝতেও পারনি। আমি পূজা শেষ করে শিবের মাথায় নারকেল দুগ্ধ সবে ঢেলেছি, আমাকে হীরা এসে খবর দিল ব্রততী দরজা খুলছে না। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম। দেখি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তখন এই কঞ্চুকী প্রহরিণীদের ডাকলাম। ওরা এসে দোর ভাঙল। দেখলাম ও নিজের বস্ত্র নিজেরই গলায় জড়িয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে। হায় হতভাগিনী।

বীরনারায়ণ : ও, তা এত বিচলিত হবার কী আছে। ওকে পুড়িয়ে দাও। আচ্ছা আমি সৎকারের ব্যবস্থা করছি। (ডাকেন) এই কে কোথায় আছিস।

পদ্মাবতী : তোমার মধ্যে কি আর মনুষ্যত্বের অবশিষ্ট নেই রাজা? গরিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে, তুমি তাকে জোর করে ধরে আনলে। মূর্খের মতো বিশ্বাস করলে যে স্ব-ইচ্ছায় আসছে। আসলে ও ভালবাসত ওর পিতারই মেধাবী গরিব শিষ্য প্রদ্যোৎকে।

বীরনারায়ণ : (সচকিত) তুমি জানলে কি করে?

পদ্মাবতী : আমি জানি। ওর ব্রতপালনের সময়ে একদিন আমি রাতে ওর প্রসাদ দিতে গেছিলাম। দেখি অনিদ্রায় অনাহারে জলকষ্টে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি। আর ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছে। আমি ওর মুখের কাছে আমার কান নিয়ে গেলাম। দেখি ঘুমের মধ্যে বলছে, 'প্রদ্যোত, প্রদ্যোত। তুমি আমাকে বাঁচাবে না'?

বীরনারায়ণ : নির্বোধ তরুণ-তরুণী। কে এসে বাঁচাবে ওকে? আমি জানতাম। যেদিন ব্রততীকে হরণ করে নিয়ে আসি ওদের চোখ দেখে মনে হচ্ছিল একটা কিছু গন্ডগোল আছে। ওদের ভেতরে কিছু একটা যড় আছে।

পদ্মাবতী : সেই যড় পরস্পরকে ভালবাসা। ওরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসত। বিশ্বাস করত একে অন্যের জন্য নির্দিষ্ট। (থামেন)। ও আমার মেয়ের বয়সি রাজা। আর ওর মুখটা দ্যাখো। কুন্দফুলের মতো সুন্দর। আমার কষ্ট হচ্ছে রাজা।

বীরনারায়ণ : মেয়ের মতো। মেয়ে তো নয়। দ্যাখো পদ্মাবতী আমার একাধিক রানি। আর কত যে সন্তান আমার তাও ভাল করে জানি না। একটা বয়স পর্যন্ত শুনেছিলাম। এখন আর শুনিও না। কারণ আমি জানি তুমি আমার পাটরানি। আমার বাকি স্ত্রী আর সমস্ত সন্ততিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব তোমার। আমি রাজকার্যে ব্যস্ত থাকি। অন্তঃপুরের দিকে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।

পদ্মাবতী : রাজা, তুমি যখন যা বলেছ, আমি আজীবন তা মুখ বুজে মেনে গেছি। গেছি কারণ ভেবেছি এটাই রানিদের ভবিতব্য। সেই কোন ছোট বয়সে তোমার হাত ধরে এই রাজবাড়িতে ঢুকেছি। এত সম্পদ, এত বিলাস, এত উপকরণ—তবু বন্দির মতো তাকিয়ে থেকেছি প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়ে—ওই বাইরে—ওই বৈকুণ্ঠপুরের রাস্তায়—যেখানে সরলা মেয়েরা হাসতে হাকতে চলে, নাচতে নাচতে বাঁচে, খাবার তাদের একবেলা জোটে কি জোটে না, কিন্তু তাদের যে আনন্দ আমি দেখতে পাই আমার তা নেই। আমি লোভীর মতো তাকিয়ে দেখেছি, যে এয়োতি কপালে সিঁদুর দিয়ে পুজো করছে তুলসীমণ্ডপে, যার গলায় আঁচল, স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনায় যে সর্বদা তটস্থ, তার দুঃখের মতো পবিত্র দুঃখও আমার নেই। আমি শুধু জানি এখানে এভাবেই আমাকে মরতে হবে একদিন; আমার মাথার চুলগুলো বড় নদীর শণের নুড়ির মতো ধবধবে হয়ে যাবে; মন্দিরের পিছনে বাস্তুসাপের মতোই এই রাজবাড়ির গর্তে-অলিন্দে-ফোকরে আমার দেহ পড়ে থাকবে—আর ডাঁশ পিঁপড়ের দংশনে ভরে উঠবে আমার সমস্ত শরীর।

বীরনারায়ণ : তা বেশ তো। সেই বিলাপ এখানে এসে কেন করছ? মানুষ মরণশীল—কে না জানে। এখন যাও এই বোকা মেয়েটার সৎকারের ব্যবস্থা করো। আর ওই পণ্ডিত নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী এবং ছাত্র প্রেমিক প্রদ্যোৎকে খবর দাও। যদি তারা সৎকার করাতে চায়।

পদ্মাবতী : তুমি জানো না তাদের খবর?

বীরনারায়ণ : আবার কী? তারাও আত্মহত্যা করেছে না কি?

পদ্মাবতী : তুমি তাদের সর্বনাশ করে চলে আসার পর ব্রততীর অনুরোধে ক'দিন বাদে আমি গোপনে লোক পাঠিয়েছিলাম। ওর পিতার কুটিরে। তারা কেমন আছে জানবার জন্য। খবর পেলাম তার পরদিন থেকে আশপাশে প্রতিবেশীরা তাদের আর কেউ দেখেনি। তারা উধাও হয়ে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারেনি। ব্রততীকে সে খবর দেওয়ায় সে চুপ করে রইল।

বীরনারায়ণ : যাক্ বাঁচা গেল। মনে হয় এরা কাছাড়ে পালিয়ে গেছে। তবু সাবধানের মার নেই। আমি আমার লোককে বলছি ওরা কোথায় গেল তা সন্ধান করার জন্য। নতুন কোনও উপদ্রব আমি আর চাই না। (থামে) ওই প্রদ্যোৎ ছেলেটি সাংঘাতিক। ওর মধ্যে কায়স্থের জেদ আছে। সঙ্গে আছে ওর গুরুর ব্রাহ্মণবুদ্ধি। খবর নিতে হবে। এখন যাও এখান থেকে। যাও। বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। (পদ্মাবতী চলে



যান চোখের জল মুছতে মুছতে বীরনারায়ণ এগিয়ে আসেন) পণ্ডিত নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী আর প্রদ্যোৎ। কোথায় গেল এরা? দিল্লিতে? জাহাঙ্গিরের কাছে? ওই মুকুন্দ সার্বভৌমের মতো? (রাজা চলে যান। কোরাস আসে। আগে দলপতি। পিছনে বাকিরা। তারা সংলাপ ধরে। পিছনে আবহ হয়)

কোরাস : হে শিব, হে নটরাজ
তোমার রুদ্রমূর্তি আজ বিষুবসকাশে।
তোমার তাণ্ডবনিমিত্তে অপেক্ষারত
আমরা অভাজন।
তুমি এসো। আবির্ভূত হও।
তোমার নৃত্যছন্দে কেঁপে উঠুক আজ তাবৎ মেদিনী।
প্রলয় আসুক। ঝড় হোক।
সমগ্র ঝাঁকিয়ে দিয়ে তোমার অস্থির পদচারণ
জানিয়ে দিক পাপিষ্ঠ ধরাকে
তুমি আজও দেদীপ্যমান।
আর্ত আমরা তোমার দিকে তাকাই।
হাতজোড় করে করি শেষ জাগরণ স্তব।
তুমি এসো। ধ্বংস করো
ধ্বংস করে ধৌত করে দাও এ ভূমিকে।
পাপ থেকে পরিত্রাণ করো।
আলো দাও। শান্ত করো।
জ্ঞান দাও তোমার সকাশে

(কোরাস থামে। তৃতীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। মঞ্চ তৈরি হয়।)

তৃতীয় দৃশ্য

মধ্যরাত। গভীর জঙ্গলের ভিতর তান্ত্রিক কুলার্ণবের কুটির। কুলার্ণব তাঁর তন্ত্রের সামগ্রী সাজিয়েছেন। সামনে হাতজোড় করে নারায়ণ ত্রৈলোকদর্শী ও প্রদ্যোৎ। কুলার্ণব তাঁর সাজানো শেষ করে স্তব করতে শুরু করেন। নেপথ্যে আবহে ঢাক বাজছে।

কুলার্ণব : ওং ক্লীং ফট্ স্বাহা—
কায়া কোথা হতে পাইলা কাহাতে উদয়।
প্রথমে কহিবা গুরু কায়া-পরিচয় ॥
দ্বিতীয়ে কহিবা গুরু এ তণু কারণ
অজপা কাহাকে বলি জপে কোন্ জন ॥
ও ক্লীং ফট্ স্বাহা।

(ঢাক বেড়ে যায়। কুলার্ণব ত্রিশূল হাতে নৃত্য করেন। নারায়ণ ও প্রদ্যোৎ হাতজোড় করে মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করেন। ঢাক কমে। কুলার্ণব আবার মন্ত্র বলেন)

কুলার্ণব : নবমে-পবন আছায়ে কোন লক্ষে।
সভার আহার আছে বায়ু কিবা ভক্ষে ॥
দশমে নিদান বুঝি কেহ নাহি রয়।
দীপ নিবাইলে জ্যোতি কোথা গিয়া রয় ॥

(ঢাক বাড়ে। নারায়ণরা মন্ত্রোচ্চারণ করেন। ঢাক কমে যায়। কুলার্ণব ত্রিশূল রাখেন। ধীরকণ্ঠে বলেন)



কুলার্ণব : রাজা বীরনারায়ণ অণিমা। আর তোমরা লঘিমা। কিন্তু দহনী শক্তির বৃদ্ধি চাই। অষ্টাঙ্গক্রিয়া তোমাদের সহচর হোক। দিনরাত্রিবিধায়িনী মনস্তম্ভনকারিণী শক্তি তোমাদের সহায়ক হোক। বশকারিণী নয়, তোয়স্তম্ভিণী নয়, সেই গূঢ় শক্তি তোমরা ধারণ করো যাতে তোমাদের সমস্ত গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি একমাত্র কুলার্ণব ছাড়া সকলের ক্ষেত্রে ধ্বংস ডেকে আনে।

(কুলার্ণব পাশে রাখা পাত্র থেকে তুলে সুরা পান করেন)

কুলার্ণব : তোমরা ভেবো না শুধু আবেগের কারণে আমি তোমাদের সমর্থন করছি। এই পৃথিবীতে আবেগ, কৃতজ্ঞতা, মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক—এগুলির সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটেছে। যা বেঁচে আছে তা এক জ্বলন্ত হুতাশন—তার নাম কখনও লোভ, কখনও তার নাম বিকৃতি। আবার তার নাম কখনও উন্মত্ততা। এসো আমাদের হৃদয় প্রতিশোধের জন্য শক্ত করি। এসো আমাদের মন থেকে সমস্ত সুকোমল প্রবৃত্তি খসিয়ে তাকে চিক্‌না পর্বতের সানুদেশের মতো চ্যাটালো ও খরখরে করে তুলি। নিজের ভিতরে দাউদাউ করে আগুনের কড়া জ্বালাও। তার ভিতর থেকে এনে ফ্যালো তোমার শত্রুর খুলি। চচ্চড় শব্দে চুলভর্তি খুলি ফাটুক, ঘিলু গলে পড়ুক আগুনের ভাপে। চূর্ণ হোক, সেদ্ধ হোক শত্রুর মস্তক, হৃদয় ও তার সমগ্র শরীর। ওং শান্তি ওং। স্বাহা-স্বাহা।

(আবার ঢাক বাজে। নারায়ণরা নতজানু হন। কুলার্ণব আবার সুরাপান করেন। মন্ত্রগম্ভীর কণ্ঠে বলেন)

কুলার্ণব : তোমরা জান আমার পিতা মহাতান্ত্রিক সর্ববিদ্যাকে হত্যা করেছিলেন, এই বীরনারায়ণের পিতামহ নৃপতি নরনারায়ণ। সে সময়ে নৃপতি নরনারায়ণ অজ্ঞাতবাসে। কোচবংশের সিংহাসনে তখন এক বছরের জন্য নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজ তথা চিলা রায়। এই গভীর জঙ্গলে ওই দুষ্ট নরনারায়ণ আমার পিতার সঙ্গে ছদ্মবেশ গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে মিশে ভাল ব্যবহার করে তাঁর থেকে সমস্ত গুপ্ত তন্ত্র বিদ্যা শিখে নেয়। শিখে ওই পাপিষ্ঠ নরনারায়ণ মনস্থ করে সে সঙ্গোপনে নিজের রাজ্যে পালাবে। পালানোর আগে স্থির করে আমার পিতাকে সে ভোররাতে হত্যা করবে। কিন্তু আমার পিতা তার সেই নষ্ট অভিসন্ধি ধরে ফেলেন। সূর্য তখন সবে পুবের আকাশে আলো দিচ্ছে।

নারায়ণ : তারপর?

কুলার্ণব : সেই ভোরে নরনারায়ণ পর্বতের নিচে এই জঙ্গলে ছুটতে শুরু করল। আমার পিতা তার পিছনে খোলা খড়্গ হাতে ধাওয়া করলেন। নরনারায়ণ সহসা খরগোশ হয়ে ঘাসের জঙ্গলে দৌড়ল। পিতাও তৎক্ষণাৎ বন্য সারমেয় হয়ে তাকে তাড়া করলেন। নরনারায়ণ তখন মৎস্য হয়ে জলে ঝাঁপ দিল। পিতাও নিমেষে মাছরাঙা পাখি হয়ে তার পিছনে চললেন। নরনারায়ণ শালিক হয়ে আকাশে উড়ল। পিতা বাজ হয়ে তাকে অনুসরণ করলেন। উপয়ান্তর না দেখে নরনারায়ণ একটি কৃষকের বাড়িতে ধানের গোলার কাছে গিয়ে একটি ধানের দানা হয়ে অসংখ্য দানার সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু পিতাও নিমেষে একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুট সেজে ধানের প্রত্যেকটি দানা খুঁজে তাকে বের করলেন।

প্রদ্যোৎ : তারপর?

কুলার্ণব : পিতা যখন তাকে বধ করতে যাচ্ছেন তখন ওই দুষ্ট নরনারায়ণ আমার পিতার কাছে শেখা ডাকিনী বিদ্যা স্মরণ করে নিমেষে একটি বৃহৎ শার্দুল হয়ে তার বাঘনখ দিয়ে আমার পিতার পিঠ চিরে দিল। পিতা, আমার বৃদ্ধপিতা ফালাফালা হয়ে পড়ে রইলেন এই গভীর শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে। আমি তখন ছোট। গ্রামে মায়ের কাছে থাকি। যেদিন খবর গেল পিতা মৃত তার দু'দিন পরে চিলা রায়ের সিংহাসনে আবার ফিরে বসলেন নৃপতি নরনারায়ণ। তারপর ষাট বছর কেটে গেছে। নরনারায়ণ মারা গেছেন, তার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণও—কিন্তু জন্মান্তরের প্রতিশোধস্পৃহা আমার ভিতরে ধিকিধিকি চলেছে। আজ আমি প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি, কিন্তু যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে এই গভীর জঙ্গলে এই অমাবস্যার ঘনকৃষ্ণ রাতে তোমরা উপস্থিত। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচব না, কিন্তু তোমাদের সেই মন্ত্র দিয়ে যাব, যাতে এই বীরনারায়ণের সমূহ সর্বনাশ ঘটে। তার বিনাশ হয়।

(নারায়ণরা হাতজোড় করেন। কুলার্ণব আগুন জ্বালান। সেই আগুনে হাত রেখে কুলার্ণব মন্ত্রপাঠ করেন। নেপথ্যে আবহে তন্ত্রমন্ত্র পাঠ হয়। মন্ত্র থামে। ঘোর নিঃস্তব্ধতা। তার মধ্যে কুলার্ণব চোখ খোলেন)

কুলার্ণব : ইলা।
নারায়ণ : প্রভু?
কুলার্ণব : (হাসেন) ইলা। ইলা।
প্রদ্যোৎ : ইলা কে প্রভু?
কুলার্ণব : খোঁজ নাও। জানো। ইলা কে? খোঁজ নাও। নিজের উৎসকে জানো বৎস। জানতে শেখো।

(আবার মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হয়। সঙ্গে প্রবল হাওয়া। মঞ্চে শুকনো পাতা উড়ে যায়। দেখা যায় কুলার্ণব যেন নারায়ণ আর প্রদ্যোতের কানে কানে কিছু বলছেন। বলছেন আর হাসছেন। কোরাস এসে মঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় স্থাণু হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে খড়্গ। অন্ধকার হয়)

বিরতি

দ্বিতীয়ার্ধ

চতুর্থ দৃশ্য

(পর্দা খুললে দেখা যায় কোরাস দাঁড়িয়ে আছে। সকালবেলা। ওই একই স্থান। পিছনে বেদির উপর দর্শকদের দিকে পিছন ঘুরে নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী ও প্রদ্যোৎ। তারা যেন কুলার্ণবের অস্থি জঙ্গলের মধ্যে নদীতে ভাসাচ্ছে। কোরাস দলপতি সংলাপ ধরে। বাকিরা সঙ্গে বলে)

কোরাস : আলো বাড়ে। ক্রমে।
দেখা যায় চরাচর।
আকাশে মন্থর মেঘ জমে
যেন উত্তুরে চাদর।
এ ভরা বাদর
এ মহা ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
নদীপাটে খেয়া নৌকা ভেড়ে
জমাট কুয়াশা। বাঁকা চর।
খইরঙা পানকৌড়ি ওড়ে
একেবারে মাথার উপর।
এ ভরা বাদর।
মহা ভাদর।
শূন্য মন্দির মোর।
দু' পাশে বাতাস কাঁপে
হিয়া থরথর।
ভাঙা দেউল, ঘন সুপারির বন
টলটলে পুকুর।
আঢাকা পানিফল এসে পড়ে তাতে
দেখে মনে হয়
গভীর দুধের ঘন সর।
এ ভরা বাদর
মহা ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

(কোরাস বেরিয়ে যায়। ইতিমধ্যে প্রদ্যোৎ ও নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী মঞ্চের সামনে এসেছে।)

নারায়ণ : প্রদ্যোৎ। দৌড়ও। থেমো না। দৌড়ও।
(আবহ হয়। তিনজন রক্ষী এসে নারায়ণকে ধরে। প্রদ্যোৎ দৌড়ে পালায়। বীরনারায়ণ আর শাণিত ঢোকেন।)
বীরনারায়ণ : প্রতিশোধ ঠান্ডা হলে আরও মিঠে পিঠার মতো হয়। পুরনো প্রবাদ ভুলে গেলে পণ্ডিত?
মন্ত্রী শাণিত, রক্ষীদের প্রদ্যোতের পিছনে তাড়া করতে বলুন। আমার পোষা বন্য সারমেয়দের ছেড়ে দিন। এই গভীর জঙ্গলে যাতে ওরা প্রদ্যোতের চামড়ার গন্ধ শুঁকে ওর অবস্থান নির্ণয় করে। একেবারে যেন কণ্ঠনালিতে ওদের দাঁত বসায় ওই বন্য সারমেয়রা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করবেন আমাকে।
(শাণিত হেসে মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। বীরনারায়ণ উঠে বেদির কাছে যান। নদী দেখে ফিরে আসেন)
বীরনারায়ণ : কুলার্ণবও তবে দেহ রাখলেন। ভাল। বড় বাসনা ছিল ওই ভণ্ড তান্ত্রিককে আমি নিজের হাতে ত্রিশূল দিয়ে গেঁথে দেব। যেভাবে ওর পিতাকে হত্যা করেছিলেন আমার পিতামহ নৃপতি নরনারায়ণ।
নারায়ণ : আপনি-আপনারা বিশ্বাসঘাতক।
বীরনারায়ণ : না। আমরা সাপের মতো। আবার ওঝারও মতো। আমি তোমাকে খরিশ হয়ে দংশন করব, আবার গুনিন হয়ে ঝাড়ফুঁক করে তোমাকে বাঁচাব।

তারপর আবার মারব।

নারায়ণ : আমাকে মারলেও তুমি নিস্তার পাবে না মহারাজ।

বীরনারায়ণ : সে তো পরের কথা। না পেলে না পাব। কোন রাজা কবে নিস্তার পেয়েছে? রাজনীতি, কূটনীতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের শেষপর্যন্ত নিস্তার পাওয়া দুরূহ। তা বলে এই মুহূর্তে সাধারণ নাগরিককে অত্যাচার বা বধ করব না পরে কী হবে তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করে তা তো হতে পারে না পণ্ডিতপ্রবর। এত পুঁথি পড়েছ আর এইটুকু জান না?

নারায়ণ : পাপিষ্ঠ। ভ্রষ্টাচারী।

বীরনারায়ণ : জোরে। আরও জোরে বলো। ওই ভাঙা দেউল, তার ভিতরের পোড়া ইটের খিলানের ধ্বংসাবশেষ আর তারও ভিতরে সরসর শব্দে ঘুরে বেড়ানো বিষাক্ত সর্পের দল শুধু তোমার ওই ফোঁসফোঁসানি শুনতে পাবে। চিৎকার করো নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী। জোরে চিৎকার করো।

নারায়ণ : অত্যাচারী। হন্তারক।

(বীরনারায়ণ ইশারা করেন। দু'জন রক্ষী নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শীকে ধরে তাঁর মাথা হাঁড়িকাঠে ঢোকায়। এই সময়ে উল্টোদিক থেকে টলতে টলতে শাণিত রায় প্রবেশ করেন। তার শরীর রক্তে মাখা)

শাণিত : আঃ মহারাজ। আমাকে মেরেছে। আমাকে মেরেছে। কী ভয়ানক।

(শাণিত পড়ে মারা যান। খোলা খড়্গ হাতে প্রদ্যোৎ প্রবেশ করে। আবহ হয়। বীরনারায়ণ সচকিত হন। তিনি হাততালি দেন। উল্টোদিক থেকে বিশালদেহী মোদক বর্মন ঢোকে। তারও হাতে খোলা খড়্গ)

বীরনারায়ণ : নির্বোধ প্রদ্যোৎ আমার সঙ্গে লড়তে চাও। এই নাও আমার সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা মোদক বর্মন। লড়ো ওর সাথে দেখি কেমন পারো।

(আবহে সেতারের ঝালা বাজে। প্রদ্যোৎ আর মোদক খড়্গ হাতে পরস্পরের দিকে তাকায়। বীরনারায়ণ মঞ্চের সামনে আসেন। দর্শকদের দিকে পিছন ঘোরেন। তার রাজবেশ হাওয়ায় উড়ছে)

বীরনারায়ণ : মূর্খ প্রদ্যোৎ। পণ্ডিত নারায়ণ ত্রৈলোকদর্শী— তোমাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন যাতে আরও ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে সেইজন্য এই তথ্য তোমাদের জানাচ্ছি। ব্রততী পরশুদিন আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর আগে সে আমার পাটরানি পদ্মাবতীকে জানিয়ে গেছে যে আমাকে নয়, সে প্রদ্যোৎকে ভালবাসত। আমার সঙ্গে সে প্রণয়ের অভিনয় করেছিল যাতে তোমরা বাঁচতে পারো। তার এই দ্বিবিধ প্রতারণার জন্য এবং তাকে নিজের হাতে হত্যা করতে পারিনি বলে আমি এই গভীর জঙ্গলে তোমাদের দু'জনকে স্বহস্তে মারতে এসেছি। মোদক যাও-ও, ওকে হত্যা করো।

(আবহ বাড়ে। প্রদ্যোৎ আর মোদক খোলা খড়্গ হাতে পরস্পরের দিকে তেড়ে যায়। দু'জনে যুদ্ধ করে। অবশেষে প্রদ্যোৎ তার খড়্গ দিয়ে মোদককে হত্যা করে। মোদক পড়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পাঁচজন রক্ষী তীরধনুক নিয়ে ঢুকে মঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় বসে প্রদ্যোতের দিকে তীর তাক করে)

নারায়ণ : প্রদ্যোৎ পালাও। পালাও। কুলার্ণবের বিদ্যা তোমাকে এতজনের সঙ্গে জেতাতে পারবে না। অথচ প্রতিশোধ নিতেই হবে। এই রাজাকে ধ্বংস করতেই হবে।

(প্রদ্যোৎ দৌড়ে পিছনের বেদির উপর ওঠে)

প্রদ্যোৎ : বীরনারায়ণ। তোমার দিনও ঘনিয়ে আসছে। তোমার প্রবৃত্তি, তোমার দম্ভ, তোমার আত্মরতি তোমাকে শেষ করবে। করবেই।

(বেদির থেকে পিছনে দর্শকদের চোখের আড়ালে লাফিয়ে পড়ে। আবহে জলের শব্দ আসে। বোঝা যায় প্রদ্যোৎ নদীতে লাফিয়ে পড়েছে। দু'জন রক্ষীও লাফিয়ে বেদির উপর ওঠে। তারা হাঁটুমুড়ে বসে কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তির লাগায়। পিছন ফিরে নদীর দিকে তাক করে তারপর ফ্রিজ হয়ে যায়। কুকুরের ডাক আসে। বীরনারায়ণ নারায়ণের কাছে আসেন)

বীরনারায়ণ : ও কী বলে গেল? কী শেষ করবে আমাকে? (নারায়ণ উত্তর দেন না) যাই হোক। আমার প্রিয় সাঁতার জানা পোষ্য সারমেয়দের ছেড়ে দিয়েছি। ওরাও নদীতে সাঁতার কাটছে। ওদের গতি তোমার ওই নির্বোধ শিষ্য প্রদ্যোতের থেকে বেশি।

(নারায়ণ কোনও উত্তর দেন না)

ঠিক আছে। ওরা যখন প্রদ্যোৎকে ধরে আনবে ওকে হত্যা করার আগে ওর থেকেই আমি জেনে নেব কে আমার সর্বনাশের মূল। কী আমার সর্বনাশের মূল?

(নারায়ণ বিচিত্র হাসেন। তিনি ধীরে উচ্চারণ করেন)

নারায়ণ : গূঢ়ৈষা।

বীরনারায়ণ : বুঝলাম না। আবার বলো।

নারায়ণ : গূঢ়ৈষা। গূঢ়ৈষা।

বীরনারায়ণ : সে আবার কী?

(নারায়ণ চুপ করে থাকেন)।

গূঢ়ৈষা? মানে কী? বড় জটিল কথা। যাই হোক আমি প্রদ্যোতের থেকেই শব্দটির মানে বুঝে নেব। আপাতত ব্রহ্মহত্যার দায়ে আমার অক্ষয় নরকবাস নিশ্চিত করি।

(খড়্গ তোলেন নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শীর মাথার উপর। অন্ধকার হয়। আবহের মধ্যে পঞ্চম দৃশ্যের অবতারণা হয়)

পঞ্চম দৃশ্য

কোরাস এসে দাঁড়ায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে ধানের ছড়া। তারা প্রথমে গান ধরে)

কোরাস : (গান গায়)

গঙ্গা পূজি আইল বাড়ি আনিয়ে নূতন পিঁড়ি

চন্দ্রাবতী করাইল স্নান।
সোনার জড়িত গায় নানারত্ন শোভে তায়
দিব্যবস্ত্র দিল পরিধান ॥

করিল বিচিত্র বেশ পরিপাটি কন্ধে কেশ
অধিবাস করাইল সকলে।
সময় হইল বেলা পাঠাইল চতুর্দোলা
বর লয়ে গেল ছাদনা তলে ॥

চারিদিকে বাদ্য বাজে ভাউয়ে রোমজানি নাচে
বাজিতে রজনী কৈল দিন
পূর্বমুখে বর বৈসে কোন্ বা পণ্ডিত দোষে
ব্যতিক্রম মত যে প্রাচীন ॥

(থামে। কোরাস সুরে কথা বলে)

হেথায় গঙ্গাজল ডেকে আনে এয়ে
সুন্দর সুবেশা হয়ে আসে রাজার মেয়ে ॥
তার হাতে জোকা, তাড়ে বাজুবন্ধ।
নাকে নথ, ছোলা দাঁতা, কথায় থাকে ছন্দ ॥

কন্যা তার সাথি পেল থুইল নৈঋত কোণ
ছাউনি করিল ধরাধরি
ছাঁদনাতলে দুগ্ধ আনি পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী
মালাবদল ফুলের চেহারি।

হিঙ্গুলে মণ্ডিত কান্ধা দুইদিকে পিত্তল বান্ধা
মালগিরি দিব্য দুই ঘর
গ্রন্থি বান্ধিয়ে বাসে থুইল নিজের পাশে
সম্প্রদান করে বাজিকর ॥

কোরাস চলে যায়। দৃশ্য জেগে ওঠে চোখের সামনে।

কালজানি নামক স্থান। একটি গৃহস্থের বাড়ির কুটির। সন্ধেবেলা বৃন্দেশ্বরী নামক মাঝবয়সি মহিলা তুলসীতলায় পুজো করছেন। শাঁখে ফুঁ দেন। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে নমস্কার করেন। পুজো শেষ হয়। হাতে সন্ধ্যারতি নিয়ে বৃন্দেশ্বরী সামনের দিকে আসেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি ডাকেন।

বৃন্দেশ্বরী : ইলা। ইলা।

(ভিতর থেকে ষোলো বছর বয়সে অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী ইলা বেরিয়ে আসে)

বৃন্দেশ্বরী : পুজোর সময়টা থাকিস না কেন এখানে? ঘরের মধ্যে বসে আছিস।

ইলা : আমি তো নাড়ু তৈরি করছিলাম আই-মা। হয়ে গেছে। পুলিগুলিও করে রেখেছি।

বৃন্দেশ্বরী : বেশ করেছিস। তোর মা কোথায়?

ইলা : চান করতে গেল। আমি বারণ করলাম। বললাম এই অবেলায় যেও না। শুনল না। বলল প্রতি সন্ধেয় নাকি চান করে।

বৃন্দেশ্বরী : হ্যাঁ সে স্বভাব তোর মায়ের বিয়ের আগে থেকেই। জানিস তো তোর মায়ের একটা পোষা টিয়াপাখি ছিল। রোজ তাকে বিকেলে ছোলা খাইয়ে তোর মা চুয়ায় নাইতে যেত।

ইলা : (হাসে) গঙ্গাজল! গঙ্গাজল! নাইতে যায় চুয়ার পাড়।

বৃন্দেশ্বরী : পানবরজ। ধুঁধুল গাছ। সাঁতার দেয় আচিম মাছ।।

ইলা : গঙ্গাজল! গঙ্গাজল! পপরভাজ নোয়াসিদার।

বৃন্দেশ্বরী : শাকের খেত। গোয়ালঘর। অমলকাঁসা সখী আমার।

ইলা : গঙ্গাজল! গঙ্গাজল! মুনিয়া পাখি উড়তে চায়।

বৃন্দেশ্বরী : তলুয়া ধান। ঐরাবত। মাঠের ধারে। পালিয়ে আয়।

(দু'জনে হাসে)

ইলা : উফ্। মায়ের কাছে ছড়াটা শুনে শুনে পুরো মুখস্থ হয়ে গেছে।

বৃন্দেশ্বরী : তোর মা খুব খেলতে ভালবাসত। একদম ছেলেদের মতো। আমরা যেখানে ছেলেবেলায় পুতুল খেলা কি পুতুলের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত, তোর মা যেত কুমোর পাড়ায় কড়ি খেলতে।
আর তোর মায়ের হাতে যা জোর ছিল কোনও ছেলে তোর মায়ের সঙ্গে এঁটে উঠত না। আর তুই হয়েছিস তোর মায়ের ঠিক উল্টো!

ইলা : খালি ঘরে বসে থাকি। তাই তো? কী করব বলো আই-মা। আমার যে বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া মা যখন আসে বারবার বলে একদম বাইরে যাবে না। আই-মার কাছেই বাড়িতে থাকবে।

বৃন্দেশ্বরী : (হাসে) তুই বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে আমারও চিন্তা হয়। তোর মা প্রত্যেক বছর যখন আসে তোকে দেখতে, আমাকে জিজ্ঞেস করে তুই ঠিকঠাক আছিস কি না। আর আমি বলি মেয়ে হয়েছে, মায়ের উল্টো। মা ছিল যেমন ডানপিটে। মেয়ে তেমনই শান্ত। একটু বেশি ঠিকঠাক থাকে।

ইলা : আই-মা, যাওয়ার আগে মাকে তুমি আজ ওই কথাটা বলবে তো?

বৃন্দেশ্বরী : (কপট ছলনায়) কোন্‌টে?

ইলা : আবার মজা করে। না, তুমি যদি মাকে না বলো তো আমি মায়ের সঙ্গে যাব না।

বৃন্দেশ্বরী : উফ্। বলব রে বাবা বলব। তোর ভাবী বর যে জল্লেশ্বরের মতো। সেও তার ভক্তকে না দেখে বেশিদিন থাকতে পারবে না।

(ইলা বৃন্দেশ্বরীকে জড়িয়ে ধরে)

ইলা : আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারব না আই-মা।

বৃন্দেশ্বরী : তোকে থাকতে দেবও না। তোর মা তো সাতদিনের জন্য তোকে নিয়ে যাচ্ছে। আটদিন হলেই আমিই গিয়ে তোকে নিয়ে আসব। ওখানে তোকে থাকতেই দেব না।

ইলা : আমি থাকবও না।

(লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে পদ্মাবতী প্রবেশ করেন। তিনি হাসিমুখে বলেন)

পদ্মাবতী : তোকে রাখবও না। তোর আই-মার সঙ্গে কথা ছিল তোর ষোলো বছর বয়সে আমি তোকে



সাতদিনের জন্য রাজবাটিতে তোর বাবার কাছে নিয়ে যাব। সাতদিনের জন্যই। পরশু তোর ষোলো বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এবার তোকে নিয়ে যাব। তোর বাবাকে চমক দেব।

ইলা : মা, বাবাও জানে না আমি এখানে আই-মার কাছে বড় হয়েছি?

পদ্মাবতী : না। আমার ব্রতপালন ছিল। তোর বাবাকে বলতে মানা ছিল। তোকে নিয়ে গিয়ে যখন দেখাব তোর বাবা চমকে যাবে।

বৃন্দেশ্বরী : সে তুই তোর বরকে চমকে দে গঙ্গাজল। আমার মেয়েকে কিন্তু ঠিক সাতদিনের মাথায় ফেরত চাই।

পদ্মাবতী : হ্যাঁরে বাবা, সাতদিন পরেই ফেরত পাবি। কে তোর মেয়েকে সাতদিনের বেশি ওই জায়গায় রাখবে? আমিই এসে ওকে দিয়ে যাব।

বৃন্দেশ্বরী : সত্যি প্রতি মাসে একবার করে এখানে এসে ইলাকে দেখে গেছিস, মহারাজার সন্দেহ হয়নি? কেন তুই প্রতি মাসে বাপের বাড়িতে যাস?

পদ্মাবতী : মহারাজের ভারি এসে যায় আমি মাসে ক'বার আমার গ্রামের বাড়িতে যাই কি না যাই। শোন্ গঙ্গাজল, মহারাজারা রাজকার্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে

বেশি, ঘরের দিকে তাদের খেয়ালও থাকে না, তুই যেন জানিস না?

বৃন্দেশ্বরী : সত্যি। ভাবতেই আমার অবাক লাগে। মহারাজের মেয়ে এখানে কালজানিতে আমার কাছে বড় হল। আর মহারাজ জানলেনও না যে তাঁর এত সুন্দর একটা মেয়ে আছে।

পদ্মাবতী : তোকে তো অনেকবার ভাই বলেছি গঙ্গাজল ইলা জন্মাবার পরেই ওর মুখ দেখে আমার মনে হল ওই বৈভব, আড়ম্বরের মধ্যে ওকে মানুষ করব না। তার মধ্যে আমার বাণেশ্বরের মানত ছিল। আমার প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তাকে ষোলো বচ্ছর রাজার চোখের আড়াল রাখব। তুই তো সবই জানিস গঙ্গাজল। যাই হোক, কাল ভোরে বেরোব। চতুর্দোলা বেয়ারাগুলি সকালেই চলে আসবে। তিনদিন বেশ কাটল এখানে। মা মারা যাবার পর কালজানিতে তুই ছাড়া আর আপনার জন কেউ রইল না রে গঙ্গাজল।

বৃন্দেশ্বরী : (ইলার দিকে তাকান। গলা খাঁকারি দেন) তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল গঙ্গাজল।

পদ্মাবতী : কী বল্।

বৃন্দেশ্বরী : তোর সঙ্গে আলাপ করাব বলে সন্ধেবেলায় একজনকে ডেকেছি।

পদ্মাবতী : কাকে?

(বৃন্দেশ্বরী ইতস্তত করে। ইলা এগিয়ে আসে)

ইলা : উদয়দাকে?

পদ্মাবতী : উদয়দা? কে উদয়দা?

ইলা : এই গ্রামে কিছুদিন আগে এসেছে।

বৃন্দেশ্বরী : ইলার সঙ্গে শিবচতুর্দশীর মেলায় আলাপ হয়েছে।

পদ্মাবতী : (কঠোর গলায়) বৃন্দেশ্বরী! এসব কী বলছিস তুই? আগে তো কখনও এর কথা শুনিনি।

বৃন্দেশ্বরী : আমি জানি না ভাই। তোমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করো। সবসময় রানির মেজাজ ভাল লাগে না।

পদ্মাবতী : কোথায় তোকে মেজাজ দেখালাম? আমি জিজ্ঞেস করলাম এই উদয়ের কথা আগে শুনিনি কেন?

ইলা : আমিই আই-মাকে তোমাকে বলতে বারণ করেছিলাম। যদি তুমি রেগে যাও।

পদ্মাবতী : কতদিন হয়েছে আলাপ?

ইলা : প্রায় ন'মাস মতো।

পদ্মাবতী : সে কি এই কালজানিরই ছেলে?

বৃন্দেশ্বরী : না। মরিচবাড়ির ছেলে। শিবচতুর্দশীর মেলায় ঘুরতে ঘুরতে দেখা। এক কোণে বসে ভাওয়াইয়া গান গাইছিল। ইলার গান শুনে খুব ভাল লাগল। তখন আলাপ।

ইলা : দারুণ গায় গো মা। আমি গান শুনে আলাপ না করে পারলাম না।

পদ্মাবতী : তোমার মনে হয় তোমাদের এই সম্পর্ক তোমার বাবা মেনে নেবে?

বৃন্দেশ্বরী : সম্পর্ক হলে তো মানবি ভাই গঙ্গাজল। সদ্য আলাপ পরিচয় হয়েছে। অত রাগ করার মতো কিছু ঘটেনি।

ইলা : না ঘটেছে। আমি যদি বিয়ে করি তো ওই উদয়দাকেই করব।

পদ্মাবতী : ইলা। এত বড় কথা তুমি এভাবে বলতে পারো না। (থামেন) আচ্ছা ঠিক আছে তুমি রাজবাড়ি থেকে ফেরো। তারপর না হয় আমি তোমার উদয়দার সঙ্গে আলাপ করে বিষয়টা নিয়ে ভাবব।

ইলা : তুমি কী ভাবছ? ওখানে নিয়ে গিয়ে আমার মন ভুলিয়ে দেবে? মাগো মা আমি আই-মার কাছে বড় হয়েছি। রাজবাড়ি কী তা আমি জানিও না। ওখানে যাই থাকুক না কেন, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, তা আমায় উদয়দা আর আই মা-র চেয়ে বড় হতে পারে না।

পদ্মাবতী : বেশ। তাই হবে। তোমার উদয়দাকে আমি আগে তো দেখি। তুমিও তোমার বাপের বাড়ির ভিটে দ্যাখো। এমনও তো হতে পারে তোমার বাবারই উদয়দাকে খুব পছন্দ হয়ে গেল।

ইলা : আমি জানি তোমরা চাও আমার অনেক দূরে বিয়ে হোক। সেই সুদূর মারওয়ারে। উদয়দা আমাকে বলেছে দশ রাত্রি লাগে শুধু দিল্লি যেতে। সেখানে থেকে আরও চার রাত্রি মারওয়ারে।

পদ্মাবতী : এসব ওকে তুই কেন বলেছিস বৃন্দেশ্বরী?

বৃন্দেশ্বরী : কেন বলব না? ওর জানা উচিত ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে রাজার ঘরে।

পদ্মাবতী : তুই আসলে চাস মেয়ে তোর যেমন আছে থাকুক। জামাইও তোর হোক। ওকে দূরে পাঠাতে দিবি না। সব কাছাকাছি থাকবে। তুই ভুলে যাস না বৃন্দেশ্বরী ইলা রাজা বীরনারায়ণের মেয়ে। ও তোর এখানে বড় হতে পারে—(থেমে যান)

বন্দেশ্বরী : থেমে গেলি কেন বল? কাঠকুড়ানির বাড়িতে হলেও রাজকন্যে রাজকন্যেই থাকে। এই বলবি তো?

পদ্মাবতী : আমি তা বলিনি। আমি মনে করি ও যেমন আমার মেয়ে তেমনই তোরও—কিন্তু মহারাজ এসব শুনে কী বলবেন, আমি জানি না।

ইলা : ওই তো, উদয়দা এসেছে।

(অন্ধকার থেকে উদয় বেরিয়ে আসে। দেখা যায় যে ছদ্মবেশী প্রদ্যোৎ। তার মুখে দাড়ি)

উদয় : প্রণাম হই মহারানি। আমিই উদয়চাঁদ ক্ষেণ। রাজবংশী জাতক্ষত্রিয়। আমার জন্মের সময়ে কুলাচারের স্পষ্ট আদেশ ছিল—

(সুর করে বলে)

হংস পার মদ ভাত মহিষ শূকর।
কুকুরা ছাগল উপহার নিরন্তর ॥
পাতিলা নাচন তথা মাদল বজাই।
সবারো মাজত তুলিলন্ত দেওধাই ॥

মহারানি, আমি ওই ধানের গোলার আড়াল থিক্যা আপনাদের সব কথা শুনেছি। আপনি নিশ্চিন্তে ইলাকে মহারাজার কাছে লয়্যা যান। উনি মত না দিলে আমাদের বিয়া হবাম না।

ইলা : কী বলছ তুমি উদয়দা।

উদয় : ওর কথায় আপনি দুঃখ পাবেন না মহারানি। সন্তানেরা অনেক সময় পিতামাতার অবাধ্য হইয়া যায়। বুইতে না পেরে হয়। পরে যখন তারা মাতাপিতা হয় তখন বুইতে পারে কমবয়সে ভুল করছিলাম।

পদ্মাবতী : দেখুন উদয়চাঁদ। আমি আপনাকে চিনি না। আমার কাছে আপনি অজ্ঞাতকুলশীল। কাল আমার মেয়ের ষোলো বছর বয়স হয়েছে। ওকে কাল আমি ওর বাবার কাছে নিয়ে যাব। ওখানে ও সাতদিন থাকবে। এই সাতদিন আমার ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী মহারাজা জানতেও পারবেন না ইলা ওনারই মেয়ে। সাতদিন পর আমার ব্রত যখন সম্পূর্ণ হবে আমি ওর বাবাকে ওর পরিচয় দেব। তখন আপনার কথাও ওনাকে বলব। যদি কোনও অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে মহারাজ তার মেয়ের বিবাহ দিতে সম্মত হন তো হবেন। নইলে আপনি ওকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবেন।

উদয় : (হাসে) আপনার কথাগুলি রাজবাড়ির মতোই মিঠা। আর তার সুবাস আমার সর্বাঙ্গে নদীর জলে জোনাক পায়ার মতো ছড়াচ্ছে। প্রতি শব্দ আমার কানে ঝিলিক দিচ্ছে। শোনেন মহারানি—

(গান ধরে)
ধন কাঙালি সাউধের ছাইলা রে
(আরে মোর) ধন্‌ক নাইগো মন,
ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা ও মোর বন্ধু
বেদেশে গমন।
বালাই দেঁভ্ পিরীতের মাথাত রে।
গছ্ মধ্যে শিমিলার গছ্‌রে,
(আরে মোর) স্বরগে ম্যালেরে ভাল,
নারী হয়্যা এ জীবন (ও মোর বন্ধু) রাখিস কতকা
বালাই দেঁভ্ তোর পিরিতের মাথাত রে।

(গান শেষ হলে পর ইলা গিয়ে উদয়রূপী প্রদ্যোতের হাত ধরে)

ইলা : আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারব না উদয়দা।

উদয় : ইলা, সেই জীবনই খারাপ জীবন যাতে কোনও রহস্য নাই। ইলা, সেই জীবনই নষ্ট জীবন যাতে কোনও বৈচিত্র নাই। ইলা সেই জীবনই পচা হাঁড়িয়ার জীবন যাতে কোনও ফুলুঙ্গা নাই, তাও নাই, শুধু একঘেয়েমির চাবানো আছে। তুমি যাও। রাজবাড়িতে যাও। আমি তোমার লগেই আছি। তোমার চতুর্দোলার পিছন পিছন আমি ধাওয়া দিব। তুমি সর্বখানে আমারে দেখতে পাবা। চাষির ঘরে হাড়িপন্তার ভিতর, বালির চরে কাশফুলের ভিতর, যুথিফুলের গায়ে ভোমরার ভিতর, সবুজ জঙ্গলের ভিতর দিয়া উড়ে যাওয়া বনটিয়ার ভিতর, সিংমারি নদীর কাচের জলের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া চোয়াতর মাছের ভিতর, সর্ষেরঙা ধানখেতে মুরলিভুমরা আউশের ভিতর তুমি আমারে পাবা ইলা। আমারে সর্বত্র পাবা।

আবহ আসে। কোরাস এসে দাঁড়ায়। তারা গান গায়।

কোরাসের দল : আবের পতন ঘর খাকের বন্ধন
তার মাঝে করে খেলা সাম নিরঞ্জন।
পবনে চালাইয়া দাগ আতসের পাণি
রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাথুনি ॥
তার মধ্যে জুড়িয়াছে সুবইনের ফুল।
পাতালে সেও ত পতি সর্‌গে তার মূল ॥
তা অঙ্গে শুসন্ধি সুওর বেমা যাএ।
সেই ফুল নিরখিলে বন্দের দেখা পাএ ॥
দুই মুখ ফুতে ফুল ঘরে দিপ জ্বলে।
প্রেম নিরখিয়া দেখ উদয়চাঁদ বলে ॥
আল সই, কি আজু পোহাইল কাল নিশি

(শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে ধুয়া ওঠে। অন্ধকার হয় তার মধ্যে ষষ্ঠ দৃশ্যের অবতারণা হয়)

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজা বীরনারায়ণের বাড়ির দালান। সময় বিকেল। বীরনারায়ণ ও কবি ধূর্জটি ভট্ট উপস্থিত। ধূর্জটি ভট্ট কাব্যপাঠ করছেন। বীরনারায়ণ শুনছেন।

ধূর্জটি ভট্ট : (তাঁর হাতে ভূর্জপত্র খোলা। তিনি পড়েন)
দেখি আনন্দিত হৈলা যত দেবগণ।
করিলা আপনে শিব নৃত্য ঘনঘন ॥
ত্রিশূল হাতে বুক তার ভিতরে বিঁধায়।
ভূমিতে পড়িবা মাত্র রুধির তুলিছে জিভায় ॥
ছিটায় পার্বতী উমা কমণ্ডুলের জল।
জলের ছিটায় ভস্ম হইছে সকল ॥
করেন ইন্দ্রদেব বজ্রের প্রহার।
দেবগণে স্বর্গমধ্যে করে মহামার ॥
শিবাগণে মরামাংস টানি টানি খায়।
রক্ত খাইয়া অস্থি অপরে চাবায় ॥
রুধির করিছে পান ডাকিনী সহায়।
নেশাপানে মত্ত শিব ডমরু বাজায় ॥

বীরনারায়ণ : (সহসা বিরক্ত হয়ে কাব্যপাঠ থামান)
এটা কী কবি ধূর্জটি ভট্ট? এত বীভৎস রস? এতো পাঠকের সুকোমল বৃত্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে? তোমার মতো রাজভক্ত কবির থেকে এ আশা করা যায় না।

ধূর্জটি ভট্ট : না মহারাজ। এ সময় ধ্বংসের সময়। এ সময় আত্মহননের সময়। আমি সেই অমাবস্যার মহাসংগীত, সেই মহাসময়কে আমার কাব্যে ধরতে চাই। তাই...

বীরনারায়ণ : বটে? তার মানে স্বীকৃতি চাও না? রাজভূষণ চাও না? খেতাবের বরমাল্য তোমার গলে ঝুলুক তাতে

তোমার অনীহা?

ধূর্জটি : সে সবই চাই। বেশি করে চাই। আপনার দেয় কুটিরেই তো আছি। তাও লেখার বার্তায় চাই মহাকাল স্বতন্ত্রভাবে বিচার করুক আমাকে।

বীরনারায়ণ : এসব জটিল মহাকাল-সমকাল ইত্যাদি প্রহেলিকায় ঢুকতে আমি নারাজ কবি ধূর্জটি ভট্ট। আমার কাছে মহাকাল মানে ঐরাবত।

ধূর্জটি : আজ্ঞে?

বীরনারায়ণ : মানে হাতি। আপনি দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। আমাদের উত্তরের লোকেরা হাতিকে ভয়ে মহাকাল বলে জানেন তো? নাম মুখে নেয় না।

ধূর্জটি : আজ্ঞে মহাকাল তো ঐরবাতের মতোই বিশাল ও মহাকায়। সেই সন্ধ্যাভাষাই তো আমার কাব্যের অন্বিষ্ট।

বীরনারায়ণ : আজ্ঞে না। মহাকাল মহাকালই। আর তার মানে হাতিই। ওসব কোনও উপমা আমি চাই না। আমার স্তুতিবাচক কাব্য কোথায়? ফরমায়েশি লেখাও রাজানুগ্রহ পেয়ে লিখতে ভুলে গেলেন কবিবর?

ধূর্জটি : না মহারাজ। ভুলিনি। তাও এনেছি (দ্রুত পাতা উল্টোন) এই তো। (বের করে পড়েন)

বীরনারায়ণ সৃষ্টি ধরায় অমূল্য রতন
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান ॥
রাজা মানে আমাদের কিতাব কোরান।
বীরনারায়ণ মানে সেই তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞান ॥
তিনিই পরম দেব তিনিই ঈশ্বর।
তিনি বিনে ভেদ নাই ঠাকুর কিঙ্কর ॥

বীরনারায়ণ : পরের পঙ্‌ক্তি দুটি আমি বলে দিই?

ধূর্জটি : নিশ্চয়ই মহারাজ। নিশ্চয়ই।

বীরনারায়ণ : (ছন্দ করে পড়েন)
তুমিই জগতের মূল তুমিই মাতাপিতা।
স্বয়ং বীরনারায়ণ তুহুঁ জগতের পিতা ॥
কোটি কোটি তীর্থ স্নান রাজার সমান।
ধূর্জটি কবি ভণে শুন পুণ্যবান ॥

ধূর্জটি : অপূর্ব। আমি এখুনি লিখে নিচ্ছি। অপূর্ব।

বীরনারায়ণ : হ্যাঁ লিখে নিন। আর শুনুন ওইসব ধ্বংসের লেখা, তাণ্ডবের রচনা একদম লিখবেন না। লেখা হবে সুন্দর, মনোরম, যেন কুলু কুলু রায়ডাক নদী। যা পড়ে পাঠকের মনে দিব্যি এক হৃষ্ট হ্রেষা জেগে ওঠে। ঠিক আছে?

ধূর্জটি : অবশ্য মহারাজ। অবশ্য।

বীরনারায়ণ : যান এখন আসুন। বেলা হয়ে গেল। আমারও স্নান-আহারাদির সময় এসে গেছে। কাল রাজসভায় দেখা হবে।

(ধূর্জটি বীরনারায়ণকে প্রণাম করে বেরিয়ে যান। বীরনারায়ণ আপন মনে ঘরের কোণ থেকে একটি ছোট বীণাজাতীয় যন্ত্র তুলে নেন। বাজান কিন্তু তার অপটু হাতের ছোঁয়ায় তার ছিঁড়ে যায়। বীরনারায়ণ বিরক্ত মুখে ওঠেন। তার পাল্টাতে ভিতরে যান। উল্টোদিক থেকে ইলা আসে। এসে দাঁড়ায়। আবহ আসে। ইলার ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পরে গুঁড়ি মেরে প্রদ্যোৎরূপী উদয় ঢোকে। সে ইলাকে জড়িয়ে ধরে।

ইলা : একি উদয়দা, তুমি। তুমি এসেছ?

উদয় : নিশ্চয়ই। আমি তো তোমারে কয়েছিলাম সর্বত্র সর্বখানে তুমি আমারে পাবা।

ইলা : (খুশিতে) আমি ভাবতেও পারিনি তুমি সত্যিই এসে পৌঁছতে পারবে।

উদয় : আমি ওই জানলাপথে ন্যারাম-থ্যারাম কইর‍্যা মথলিয়া আইছি। কেউ আমারে দ্যাখে নাই। তোমার মায়ে যেমন কইছে তুমি রাজারে এখন তোমার পরিচয় দিবাম না। আমি ওনারে তোমার পরিচয় গলায় ছেদনিয়া পড়া দিবানে। তুমি ঝিৎ মাইরা থাকো। আমার বিশ্বাস উনি আমারে দেখলা আর আমার গলায় অঘুন গান শুইনলা আমাদের বিয়া উনি আউলিয়া করতে পার্বান না। এ আমি হলফ কইর‍্যা কইতে পারি।

ইলা : মা-ও আমাকে বাবার কাছে পরিচয় দিতে বারণ করেছে উদয়দা।

উদয় : দিও না। এক্কেরে দিও না। আমি লুকোই। ভুইদমকা শব্দ হয়। বোধহয় উনি আসতাছেন। (তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। রাজা বীরনারায়ণ আসেন। ইলাকে দেখে থমকে যান। ইলা হাসে)

বীরনায়ারণ : তুমি কে বালিকা? কী সুন্দর দেখতে তোমাকে। বুঝেছি শাণিত রায়ের পর আমার নতুন মন্ত্রী নীলধ্বজ ঘোষ আমার ভোগের জন্য তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। (আবহ আসে। ইলা অবাক হয়। বীরনারায়ণ তাকে গিলে ধরেন)
ভয় পেও না বালিকা। চলো আমরা রাসমন্দিরে বিগ্রহের পিছনে যাই। বিগ্রহের পিছনে অন্ধকার। প্রদীপের নিচের মতোই। ওখানে গিয়ে তোমার সমস্ত বসন আমি উন্মুক্ত করি। তারপর চলো সতীর তিপান্ন পীঠের মতো তোমার দক্ষিণ বাহু আমি কর্তন করে ফেলি চট্টলে। দক্ষিণ পাদপীঠ নিয়ে গিয়ে ফেলি ত্রিপুরীতে। জয়ন্তিয়ায় ফেলব বামজঙ্ঘা আর কামাখ্যাদেবীর কাছে কর্তিত হয়ে পড়বে তোমার জননেন্দ্রিয়। এসো সতী এসো।

(ইলা প্রাণ ভয়ে দৌড়য়। মঞ্চের বেদির পিছনে যায়। বীরনারায়ণ তাকে ধাওয়া করে যান। দু'জনে চোখের আড়াল হয়। প্রদ্যোৎরূপী উদয় বেরিয়ে আসেন। সে একটি গান ধরে।)

উদয় : (খঞ্জনী বাজিয়ে গান গায়)
প্রথমে বন্দিলাম সূর্য করি যুগ পাণ।
পূর্বব্রহ্ম সনাতন দেব দিনমণি ॥
খর্ব স্থূল লম্বোদর বিঘ্নাবিনাশন।
প্রণমহ গণপতি গৌরীর নন্দন ॥
ইন্দ্র আদি দিকপাল নবগ্রহ আদি।
সবার চরণ বন্দম্ এ জীবনাবধি ॥
যার যা বাসনা যাকে করহ কামনা।
অতঃপর কালী কালী বলো সর্বজনা ॥
দণ্ডবৎ হও সবে মায়ের চরণে।
উদয়চাঁদ প্রদ্যোৎ এই কথা ভণে ॥



যেবা ভণে যেবা শুনে যে করে সিরিণী।
মায়ের প্রসাদে সেই বাড়ে দিনি দিনি ॥

(গান শেষ হয়। আবহও। ইলার আর্তচিৎকার ভেসে আসে। নিঃস্তব্ধতা। পদ্মাবতী আসেন। তিনি উদয়রূপী প্রদ্যোৎকে দেখে থমকে যান। উদয় হাত দিয়ে পদ্মাবতীকে সেই বেদির পিছনে দেখায়। তারপর উঠে বেরিয়ে যায়। পদ্মাবতী পিছনে গিয়ে আর্তচিৎকার করে ওঠেন। রাজা বীরনারায়ণ অসম্বৃত অবস্থায় বেদির উপরে উঠে আসেন। পদ্মাবতী অস্ফুট কণ্ঠে বলেন)

পদ্মাবতী : রাজা। রাজা। ও তোমার ঔরসজাত কন্যা। তোমার জাতিকা। ইলা।

বীরনারায়ণ : (অদ্ভুতচোখে তাকান) কী?

(পদ্মাবতী কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়েন। বীরনারায়ণ আস্তে আস্তে বসে পড়েন। কোরাস ঢোকে। দলপতি একা শুধু সংলাপ বলেন। বাকিরা পিছনে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে।)

কোরাস : অনেক রাত্রির পর এই পৃথিবী আলো দেখে।

দলপতি : শুদ্ধ বলে মনে হয় নাকি? সময়ের সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ে তটে। এইসব নিরন্তর হতাহত ভিড় গ্লানি বিবমিষা ক্লেদরক্ত ছানি অতিক্রম করে আলো পায় অন্তরস্থল। পায় নাকি?

তবু রক্ত অবিরল।
তবু হত্যা ছলোচ্ছল ॥
হে হৃদয়
হে অনন্ত হৃদয়
তুমি জানো ঈর্ষা জয়ী হবে। হিংসা জয়ী হবে।
জয়ী হবে বিকারের নখ
গাঢ় অরণ্যে চিতাবাঘ ছুটে যাবে।
মরে যাবে রাশিরাশি হরিণশাবক।
সব আস্থা শেষ হবে।
সব স্তব।
আত্মা বিদীর্ণ করে দেখে যাব
বধ্যভূমিতে স্তূপাকৃতি পরিজন-শব
তবু এই আলোর কাব্য বলি
ঘুমের স্বাদে জড়ানো জিভে এইসব বানাই।
মৃত আশ্বাসের সাঁকো গড়ি
পার হই আরেকবার, আয়ু ফুরোবার আগে।
হে জীবন তুমি জানো
এইসব বিদায়ের কথা।
আমাদের এইসব সাংঘাতিক
মগ্ন ভ্রান্তির কথা।
তুমি জানো এইসব অন্তহীন হননকাহিনি
হরিধ্বনি হয়ে নেচে ওঠে আমার ভিতরে।
ভয় পাই। চোখে জল আসে।
শব্দে লুকোই। লুকোই অবসাদে।
একদিন দেখা হবে জানি আবার
আমাদের নিবিড় প্রমা-তে।
হে হৃদয়
হে অনন্ত হৃদয়
আমাদের দেখা হবে জানি গভীর প্রমাদে।

(অন্ধকার ও সপ্তম দৃশ্যের অবতারণা হয়)

সপ্তম দৃশ্য

আলো এলে দেখা যায় মঞ্চের মাঝখানে রাজা বীরনারায়ণ মাথায় হাত দিয়ে ভগ্নমনোরথে বসে। কোরাসের বাকিরা তাঁকে ঘিরে আছে। বোঝা যায় এঁরা এখন বিভিন্ন অমাত্যাদিতে পরিণত হয়ে গেছেন। তাঁরা রাজাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কবি ধূর্জটি ভট্টও আছেন। রাজা বিলাপ করছেন। তিনি এখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। পদ্মাবতী প্রায় মূর্ছিতা। তাঁকে বৃন্দেশ্বরী ধরে আছেন। গম্ভীর আবহ। তারই মধ্যে প্রদ্যোৎ ঢোকে। রাজা বীরনারায়ণ প্রদ্যোৎকে দেখে ওঠেন। তারপর তার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ নীরবতা। সবাই এদের দেখে।

প্রদ্যোৎ : বলবেন কিছু?

বীরনারায়ণ : তোমার প্রতিশোধ সম্পন্ন হয়েছে তো? তোমার আত্মা শান্তি পেয়েছে তো?

প্রদ্যোৎ : (নম্রকণ্ঠে) রাজা যা করার আপনিই করেছেন। আমার কিছু করার দরকার পড়েনি। না প্রতিশোধ। না কিছু।

(পদ্মাবতী তাকে দেখেন। কাছে আসেন)

পদ্মাবতী : তুমি! তুমি কে?

প্রদ্যোৎ : (পদ্মাবতীর দিকে ফেরে। ধীরকণ্ঠে বলে) আমি পণ্ডিত নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শীর শিষ্য। আমার নাম প্রদ্যোৎ।

পদ্মাবতী : তুমি। তুমিই সে—

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ। আমিই ব্রততীর সেই পুরুষ। ব্রততী আমার সেই নারী। ও অশৈশব আমার সহচরী ছিল। (পদ্মাবতী কপালে কারাঘাত করে বৃন্দেশ্বরীর জানুতে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। বৃন্দেশ্বরী তাঁকে ধরেন)

বৃন্দেশ্বরী : শঠ। প্রতারক।

প্রদ্যোৎ : (উঁচু গলায়) আমার অবাল্য সহচরী যখন এই রাজপ্রাসাদের অলিন্দে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করল তখন তো কেউ তার মৃতদেহ ধরে বলেনি সে কতটা সুন্দর, নিষ্পাপ আর নিরপরাধ ছিল।

বীরনারায়ণ : ভুল হয়ে গেছে প্রদ্যোৎ। আমার বড় ভুল হয়ে গেছে।

ধূর্জটি : রাজা। একে ছাড়বেন না। এই মূল অপরাধী এই কে কোথায় আছিস, একে দড়ি দিয়ে বাঁধ।
(দু'জন রক্ষী এসে প্রদ্যোৎকে বাঁধে)

বীরনারায়ণ : না। ওকে ছাড়ো। ও আমার কন্যার কাছে নিজের পরিচয় লুকিয়ে গেছিল একথা ঠিক, কিন্তু যে ঘৃণ্য পাপ আমি করেছি তাতে তো ওর কোনও দায় নেই।
(রক্ষীরা প্রদ্যোতের বাঁধন খুলে দেয়। বীরনারায়ণ ওর কাছে যায়।)

বীরনায়ারণ : আমার আত্মাকে ধৌত করে দাও। সম্পূর্ণত। তোমার ক্ষমা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

প্রদ্যোৎ : মহারাজ আপনি শান্ত হন। আমাদের বিকার ও বিক্রিয়া আজ আবরণ সরিয়ে পরস্পরের মুখদর্শন করেছে। আমাদের স্পৃহা, প্রবৃত্তি, স্নায়ু ও উচাটন আজ স্তব্ধ এবং শান্ত।
(বীরনারায়ণ নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন। কোরাস দলপতি ঢোকে, তার পাশে একটি মেয়ে। তার হাতে একটি সোনার থালা। তা রঙিন কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত।)

দলপতি : মহারাজ, আপনার জন্য আরও বড় দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে।

বীরনারায়ণ : আর কী দুঃসংবাদ থাকতে পারে আমার জন্য?

দলপতি : মহারাজ। আপনার মেয়ে ইলা এই ঘটনার পর দৌড়ে প্রাসাদের প্রাকারে যায়। সেখানে কেবলমাত্র (পার্শ্ববর্তী মেয়েটিকে দেখায়) রানির এই প্রহরিণী ছিল। ইলা দৌড়ে প্রাকারে আসে। এই প্রহরিণীর কোমরান্ধে একটি ঝকঝকে নূতন তরবারি ছিল। ইলা তার বিবাহের জন্য যে পাঁচটি স্বর্ণ দিয়ড় তথা দীপদান রাখা ছিল তা প্রথমে প্রজ্জ্বলিত করল। এই হতভাগিনী প্রহরিণী প্রথমে কিছুই বোঝেনি। সে বিস্মিত হয়ে ইলার কার্যকলাপ দেখছিল। তারপর ইলা প্রহরিণীর কোমরবন্ধ থেকে ওই তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি জোর করে ছিনিয়ে নিল। প্রথমে সে ওই

কোষমুক্ত উজ্জ্বল তরবারি দিয়ে নিজের স্তনযুগল কেটে ফেলল। তারপর নিজের হাতে ওই রক্তমাখা কুচযুগ তুলে এই স্বর্ণথালাতে রাখল। রেখে প্রহরিণীকে বলল—
(প্রহরিণীর দিকে তাকায়। সে বলে)

প্রহরিণী : পিতাকে দিও। তিনি তাঁর যা বাঞ্ছিত তা যেন গ্রহণ করেন। এই বলে সে ওই দীপাধার মাথায় তুলে প্রাকারের ছাদে উঠে নিচের নদীতে ঝাঁপ দিল। কুমারী নদী ইলার রক্তে ভেসে গেল।
(বীরনারায়ণ থরথর করে কাঁপেন। তারপর তিনি বলেন)

বীরনারায়ণ : হে মহাদেব, হে মৃত্যুঞ্জয়, হে নটরাজ—ব্রহ্মা সন্ধ্যাতে উপগত হওয়ার চেষ্টা করাতে তুমি ঊর্ধ্বশির ছেদন করেছিলে, আজ কেন তোমার ওই পাপঘাতী ত্রিশূল তুলে আমাকে আঘাত করো না। হে শূলপাণি, আজ তুমি আমাকে গ্রহণ করো। আমি আমার ঔরসজাত আমারই হাতে ধর্ষিতা কন্যার অনুসারী হই।
(বলে তিনি ছুটে বেরিয়ে যান। পদ্মাবতী, বৃন্দেশ্বরী, প্রদ্যোৎরা তার অনুসরণ করেন। কোরাস শুধু থাকে। পিছনে আবহ হয়। আবহ থামে। মন্ত্রী নীলধ্বজ প্রবেশ করেন)

নীলধ্বজ : হে দলপতি মহারাজ বীরনারায়ণ কুমারী নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন। তিনি সম্ভবত মৃত। আর তিনি আমাদের মাঝে আসবেন না।

দলপতি : তা হলে এখন?

নীলধ্বজ : তা বলে রাজকার্য থেমে থাকতে পারে না। আমাদের রাজ্য বহিঃশত্রুর দ্বারা যেকোনও সময় আক্রান্ত হতে পারে। রাজপুত্র প্রাণনারায়ণ এখনও নেহাতই বালক। তবু আমরা তাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক দেব। হে দলপতি, বয়সের ভারে তুমিই এদের মধ্যে প্রাজ্ঞ। তুমি রায়াকতদের খবর দাও। বঙ্গেশ্বরকে জানিয়ে দাও কোচরাজ্যে নতুন রাজা হিসাবে আসছেন মহারাজ প্রাণনারায়ণ। সামনের শুক্লপক্ষের সূচনায় নতুন মহারাজের অভিষেক উৎসব।
(নীলধ্বজ বেরিয়ে যান। কোরাস এক জায়গায় জড়ো হয়। দলপতি ও বাকিরা সংলাপ ধরেন।

(প্রচণ্ড হাওয়ার শব্দ আসে)

কোরাস : এ অন্ধকার জীবনের মতো।
এ স্মৃতি আজও বহমান।
অনেক বিনাশ সাঙ্গ করে
পৃথিবীর নতুন স্পন্দন
জন্ম নেয়।
আবার নতুন মাংসে হাড়ে পৃথিবী যায় ভরে
নতুন সংকেত, নতুন উত্তেজনা
নতুন দৌড় শুরু হয় তারপর প্রজাতিতে।
জীবনের মৃত্যু নেই।
জীবন অনন্ত অপার
নষ্ট স্বপ্ন পচে বারবার
নতুন জাতকের মৃত্যুর এপিটাফ
লেখে নতুন সময়।
সব সংকল্প, সব স্বপ্ন
তুচ্ছ হয়ে যায়।
পণ্ড হয়ে যায়।
জেগে থাকে শুধু
গনগনে লোভ।
নতুন সফলতা অন্বেষণের পর
শরীরের হাড় জেনে যাবে
বাঁচে শুধু কীটদষ্ট ক্ষোভ
আর পরাস্ত মানব।
আমরা তো আদার ব্যাপারি
জীর্ণশীর্ণ কবি।
মানবের মৃত্যু হলে পর
প্রকৃতি থাকে,
থাকে নীলিমার নীল।
ওড়ে শুধু নক্ষত্রপানে
লক্ষ কোটি কীট
আর মৃত্যুর ছবি।
শুধু মৃত্যুর ছবি?
শুধু পরাস্ত সবই?

(আবহ বেড়ে যায়। কোরাসেরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। পর্দা পড়ে)



বড় গল্প



দীপার প্রেম

প্রদীপ আচার্য

তিরিশ বছর পর সেই সেন্টেনারি বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতেই বসে পড়লাম আমি। রাই আজই এই কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে প্রথম ক্লাসে এল। আমি বাংলা পড়েছি বলে নয়, রাই ওর নিজের পছন্দেই বাংলা পড়ছে। আমি একপ্রকার জোর করেই ওর সঙ্গী হয়েছি।

বলেছি, 'চল না, তোকে ইউনিভার্সিটির গেটে এগিয়ে দিয়ে আমি অফিস যাবখন। আমার আজ অত তাড়া নেই।' রাই বলেছে, 'তুমি চাপ নিচ্ছ কেন? আমি কি কচি খুকি নাকি?'

আসলে আমি এসেছি এক অমোঘ টানে। তিরিশ বছর আগে আমিও যে বাংলা পড়তে এসেছিলাম এখানে। এই আশুতোষ বিল্ডিংয়েই আমাদের ক্লাস ছিল। সবই প্রায় একইরকম আছে। শুধু শাড়িতে সজ্জিত দীপারা হারিয়ে গেছে। এ যুগের দীপারা স্কিন টাইট জিনসে আর টাইট টপে, লেগিংস আর কুর্তিতে বেশ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। ওদের ভিড়ে সালোয়ার শোভিত দীপাও আছে কয়েকজন। আমার মেয়ে রাই তাদের দলে। রাইকে আমার ছাত্রাবস্থার সব গল্পই বলেছি। তবে দীপার কথা রাই জানে না। রাইয়ের মা কেয়াকেও বলিনি। বলব কী? সে বড় ব্যথার অধ্যায়। আমার জীবনের সেই করুণ কাহিনী শুনিয়ে মেয়ের করুণা কুড়তে চাইনি আমি। কেয়া দীপার কথা তুলে উঠতে বসতে খোঁচা দিতে ছাড়ত না। সে আমার বুকের অতলে ঘুমিয়ে থাকা গভীর গোপন ইতিবৃত্ত। সত্যি বলতে কী, তিরিশ বছর আগের এই বাংলা ডিপার্টমেন্টের সেই অপরূপা দীপাই আজ আমাকে এখানে টেনে এনে বসিয়ে দিল।

রাই হাত নেড়ে আশুতোষ বিল্ডিংয়ে উঠে ঢুকে গেল। আর আমি এক মর্মান্তিক স্মৃতির ভারে বসে পড়লাম সেন্টেনারি বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে। দুই হাঁটুতে দুই কনুই ঠেকিয়ে দুই হাতের বেষ্টনিতে মাথা নত করে কপালের ভার ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজলাম। কী আশ্চর্য! চোখ বুজতেই আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দৃশ্যমান হল তিরিশ বছর আগের এক রোববারের দুপুর। সেই আউট্রাম ঘাটে। একেবারে চলচ্চিত্রের মতো ঘটনা পরম্পরা।

আমার হৃদযন্ত্র কাঁপিয়ে দিয়ে দীপা বলল...

'চ নৌকো চড়ি' দীপা উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ির পাটে খানিক আঙুল চালিয়ে নিয়ে ফের বলল, 'নে ওঠ',

'নৌকো চড়বি কীরে?

প্রশান্ত আসবে না?' সত্যিই যেন ব্যাপারটা আমার অবাক লাগল। আসলে এর চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে? না ঠিক সুখ বলা যায় কি? একটা খুশির হাওয়ায় ভেতরটা দুলে উঠেছিল, নৌকো চড়ার কথা শুনে মাত্র। সস্তার সুখ আমি চাইনে। বড় কথা যখন জানিই দীপার প্রেমিক আছে।

দুপুর দুপুর ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আউট্রামের জল পুলিশ অফিসের কাছাকাছি গঙ্গামুখি কাঠের বেঞ্চিতে বসে আছি, আমি আর দীপা। প্রশান্ত এল না। তার জন্যে দীপার খুব একটা এল-গেল বলে মনে হল না। কেন কে জানে? কথা দিয়েও নির্দিষ্ট সময়ের দু-দুটো ঘণ্টা পরেও ওর প্রেমিক এল না। তা নিয়ে দীপার উদ্বিগ্নতা তো ছাড়, সামান্য ভাবনা হল বলেও বোঝা যায়নি। তার ওপর নৌকো চড়তে চায় শুনে সত্যিই অবাক লাগল আমার।

কথার ফাঁকে আমিই বলেছি কী হল তোর প্রশান্তর? এটুকু নেহাৎই সৌজন্য। যার অনারে আসা, সেই-ই এল না। এ নিয়ে আমার যেন বড় আফসোস হচ্ছিল। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলেই তো আসল ফাঁস হয়ে যাবে। পারব সত্যিটাকে ঢেকে দিতে? আসলে প্রশান্ত না আসুক, মনেপ্রাণে আমি সেটাই যে চাই, দীপাকে বুঝতে দেওয়া যায়?

দীপার সঙ্গে আজকের এই মুহূর্তগুলোর পুরোপুরি আনকোরা স্বাদ আমার। এর আগে কি কোনওদিন ভাবতে পেরেছি যে, এমন একটা দিনও আসতে পারে? দীপা আমার এত কাছাকাছি ঘণ্টা দুয়েক বসার পরও একান্ত নিভৃতে নৌকোয়ও না জানি আরও কতক্ষণ থাকবে! তবে? বোকার মতো আমি এটা কী করে চাই যে, প্রশান্ত এসে এই অনন্য মুহূর্তগুলো কেড়ে নিক? আর আমি বাঁয়ে চলে যাই। দীপা না জানলেও এটা তো ঠিক যে, দীপার কাছে থাকলে আমি সব ভুলে যাই। স্মৃতি, বিস্মৃতি কিছুই মনে আসে না। তাছাড়া কোনও পুরুষই বা না চায়, দীপার মতো ষোলোকলা পূর্ণ নারীর সঙ্গে দিনের চার-পাঁচ ঘণ্টার আপস সান্নিধ্য? উপরি পাওনার মোহ যখন মানুষের সহজাত, তখন তো কোনও প্রশ্নই আসে না। অনেকে আদর্শর কথা বললেও, আমি অত আদর্শবান হতে পারিনে।

সময়র মুখে শুনেছিলাম কথাটা প্রথম। বিশ্বাস হয়নি। তার পর এর-ওর মুখে গোপন মূল্যবান খবরের মতো ছড়াতে দেখে সেদিন দুপুরের দিকে সোজা চলে গেলুম বুবুনদিদের বাড়ি। বুবুনদির বাবা নেই। তবে বাবার পৈতৃক ভিটেবাড়ি অর্থাৎ ঠাকুরদার আমলের মোটা মোটা থাম্বা দেওয়া অদ্ভুত বাড়িতে অনেকগুলি ঘর। এখন সব ভাড়া দেওয়া আছে। তবু বুবুনদির নিজস্ব একটা আলাদা ঘর। সে ঘরে সচরাচর কেউ আসে না। বুবুনদির ছোট ভাই বা বোনেরা মাসিমা কেউ-ই।

মোমের আদলে ছিপছিপে গড়নের বুবুনদি। বিলুদার সঙ্গে বুবুনদির সম্পর্কের কথা কারুরই যেমন অজানা ছিল না, তেমনি কারুরই জানতে বাকি নেই। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কেন? জানতে চেয়েছি। বুবুনদি বলেনি কিছুই। তবে সমরের মুখে যা শুনেছি, তার সত্যি-মিথ্যে আমাকে জানতে হবে।

গিয়ে দেখি বুবুনদি বাড়ি নেই। খানিক আগেই বেরিয়েছে কোথায়। মাসিমা বললেন। জানি না। কথা না বাড়িয়ে গিয়ে বুবুনদির ঘরে বিছানায় টানটান শুয়ে থাকলাম। বুবুনদির ঘরের সব আসবাবে, বিছানায় একটা বহু ব্যবহারের পুরনো ছাপ। সারা সংসারেই একটা অস্বচ্ছলতার অনাবিল ছবি ফুটে ওঠে। বাবা বেঁচে থাকতে বুবুনদিদেরই এ চত্বরের সবচেয়ে অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়েছে। একটা বিদেশি ফার্মের স্টেনো ছিলেন বুবুনদির বাবা। আমি ইংরেজি নিয়ে আসতাম এ বাড়ি।

কেউ জানত না তখন, আমার মনে হয়েছে বুবুনদির মধ্যে একটা অলক্ষ্য মাতৃত্ব আছে। বুবুনদির কাছে এলে নিরাপদ মনে হয়েছে, সে যাই ঘটুক না কেন। সেই আমারই মধ্যে কখনওই যে ধীরে ধীরে কামনার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল! বুঝলাম সেদিন, যেদিন অনাবশ্যকভাবে বুবুনদিকে জড়িয়ে ধরে গলার কণ্ঠায় চুমু খেয়ে বসলাম। কিছু বলেনি সেদিন বুবুনদি আমায়। আর তার জন্যেই পাপবোধ আমার ভেতরে ভেতরে ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে লাগল। বুবুনদির কাছে গেলেই শুধু একই ভাবনা দুরদুর বুকের ভেতর কেঁপে উঠত। সে রকম একদিন আরও। আমার মধ্যে বেধড়ক অস্বাভাবিকতা নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেল। হুট করে জাপটে জড়িয়ে ধরেই বুবুনদির বুকের রেখায় অনবরত চুমু খেতে গেলুম। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রূঢ়ভাবে বুবুনদি বলেছিল 'অসভ্য কোথাকার, এভাবে কেউ দিদিকে আদর করে?' লজ্জায় অপমানে বিপন্ন ফেরারির মতো পালিয়ে এসেছি। সেই থেকে ক'দিন গিয়েছি ও বাড়ি শুনে বলা যাবে।

ছোট বোন শীলুকে দিয়ে খবর পাঠালেও বুবুনদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হয়নি। প্রাণ খুলে সেই থেকে বুবুনদি আর ডাকতে পারিনি। ভাবলে নিজের ওপর ঘৃণায় গা শিরশির করে ওঠে. কলজে চুঁইয়ে অনবরত ঘৃণার জল নেমে আসে।

সেই বুবুনদিকে নিয়ে এমন একটা ভয়ঙ্কর কথা এ-মুখ সে-মুখ হচ্ছে। যখনই হোক বুবুনদির কাছেই খোলাখুলি জেনে নিতে

হবে। বুবুনদির বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে আচ্ছন্নের মতো ঘুম এসে যাচ্ছিল। সন্ধের পর বুবুনদি এল। আলোর সুইচ দিয়ে আমায় দেখে বলল, কখন এসেছিস? আমি চট করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমায় নিয়ে কী কথা উঠেছে খবর রাখ? ভাবলেশহীন বুবুনদি উত্তর দিল, 'আমি জানি । যা শুনেছিস সব সত্যি,'

'তার মানে?' আমচকা আর কোনও কথা বেরুল না আমার মুখে থেকে। বুবুনদিই বলল, 'আবার তুই জানতে চেয়েছিলি না, তোর বিলুদা কেন আসে না? এ জন্যেই আসে না।' তার পর স্বগতোক্তির মতো বলল, 'ইডিওলজি ধুয়ে জল খাই আর এত বড় সংসারটা ডুবে যাক।' তাই বলে তুমি ছবি আঁকিয়েছের সামনে ওভাবে...'

'চুপি কর, হাল্কা ধমকে উঠেছিল বুবুনদি। দেহ ভাঙতে রাস্তায় বেরুলে সুখী হতিস?'

বাঁচার জন্যে বুবুনদি আদর্শর তোয়াক্কা করে নি। তাকে নিবরাবরণ দাঁড়াতে হয়, ছবি আঁকিয়েদের সামনে।

দীপার কাছে এলে অন্তত আমার আদর্শ শব্দটা নিয়ে কিছুমাত্র ভাবনা হয় না। প্লান প্রোগ্রাম করে বাড়িঘর ইত্যাদি তৈরি করা যায়। কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখা যায় কি? অথবা শান্তি পাওয়া যায়? কেউ পেয়েছে? পাওয়া যায় না বলেই তো অন্যের প্রেমিকা জেনেও নিছক আদর্শের জন্যে দীপার সঙ্গে একই মন নিয়ে মেলামেশাতে? পিছপা হই না। হবার সাধ্যিও নেই আমার। কেবল দীপার চোখ দুটো যেন এক অমোঘ শাসনে বেঁধে রাখে আমার সম্পূর্ণ সত্বাকে। কেন? তা জানিনে।

'কী হল ওঠ', নৌকোয় চড়ার জন্যে এবারে তাড়া দেখিয়ে আমার হাতে হেঁচকা টান দিয়ে আমায় দাঁড় করাল। আমি বললাম, 'হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন। নৌকোয় চড়ার জন্যে?'

'তুই আয় তো' বলেই দীপা খেয়াঘাটের দিকে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। আমিও পিছু নিলুম। আবারও বললুম, 'তোর প্রশান্ত তাহলে এলই না, ধুর ছাড় তো ওর কথা। নিজের প্রেমিক সম্পর্কে এত নিস্পৃহতা, উদাসীনতা থাকতে পারে কারুর? দীপাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না আমার।

আরও অনেক কিছুই বিশ্বাস করতুম না যদি কিনা স্বচক্ষে না দেখতুম বা জলজ্যান্ত প্রমাণ না পেতুম। সংসারে আইপাস বলে যেমন চমকে ওঠার মতো কিছু নেই, তেমন ধুর আমার বিশ্বাস হয় না বলার মতো অবিশ্বাস্যও কিছু নেই।

একেবারে হুটহাট ঘটে গেল ঘটনাগুলো। যেন ঠিক নিয়ম অনুযায়ী এরকমই ঘটার কথা। ঘটেছেও তাই। অথচ সব কিছুই কি আর নিয়মাফিক হয়? অনিয়ম বলে একটা কথা আছে তে? মাঝে মাঝে সেই অনিয়মই নিয়ম হয়ে আসে। আবার নিয়ম, অনিয়মের ঘাড়ে হাত রেখে আপস করে।

এমন তো অনেকেই আছে যারা শুধু ঝামেলা-ঝক্কি এড়াবার জন্যেই সব কিছুর সঙ্গে নির্বিকাকে আপস করে। সাত জন্মের শত্তুরকেও হাতরে কাছে পেয়ে আপসে ছেড়ে দেয়। অবশ্য ভালবাসা থাকলে সব হয়। শ্যামলকে দেখেই সে নিয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। শুধুমাত্র আলোকে ভালবাসে বলেই শ্যামল আলোর সব দোষ আপসে মেনে নিয়েছে।

একটা ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্সে সারা রাত থাকার পর ভোরের দিকে চা খেতে ক্যান্টিনে গিয়ে আলোর সঙ্গে শ্যামলের পরিচয়, সেই থেকে টুকটাক ইঙ্গিতময়তার কথাবার্তা, যা কানে এলে ধরে ফেলা যায়। দু'জনেরই দু'জনকে পছন্দ। শ্যামলের সঙ্গে আমি নিজেও ছিলুম। আমিও পারতুম শ্যামলের আগে আলাপ জমিয়ে নিতে। অবশ্য পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। আমি এত জোর দিয়ে কী করে বলি আমাকে তার পছন্দ হতই। তবু ভাল লেগেছিল আলোকে আমারও।

আলো চলে গেলে সেদিন ছেলেমানুষী খুশিতে হাবি-জাবি এটা-ওটা খাইয়ে দিল শ্যামল। বলল, সাকসেস গুরু, দারুণ পছন্দ আমার। পছন্দসই প্রেম হলে মানুষ তো খুশিতে পাগলও হয়ে যেতে পারে। শ্যামল যা শুরু করেছিল সেদিন, আমার মনে হয়েছে একটা তারাবাজি জ্বালিয়ে ওর হাতে দিলে ও জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে শিশুর মতো। এত সহজেই প্রেম অ্যাভিলেবল হলে আমার আবার খাপছাড়া লাগে। জানলুম না চিনলুম না পর্যন্ত দু'জন দু'জনকে ভালভাবে, ব্যস দুমদাড়াক্কা প্রেম!

কোনও কষ্টই পেতে হল না। বুকের ভেতর আচমকা ধড়ফড়ানি! অনর্থক গলা শুকনো, ঘন ঘন অহেতুক ঘাম ঝরল না। দীপাকে দেখলেই ভেতরে আমার যেমন হয়। বিশেষ করে প্রথম দেখার দিন যেমন হয়। বিশেষ করে প্রথম দেখার দিন যেমন মারাত্মাকভাবে এসব হয়েছিল। তবেই না প্রেম। সত্যিকারের টানটা তো আসে সে থেকেই। এসব অবশ্য আমার ধারণা। অন্যের সঙ্গে মতের অমিলও হতে পারে। তাই এ নিয়ে শ্যামলকে কিছুই বলিনি। পাছে আদার ওয়াইজ নিয়ে নেয়?

আলো নিয়মিত আসতে লাগল শ্যামলের কাছে। সন্ধে সন্ধে দেখা করত ওরা। ছোট মফস্বল শহরের আউটডোরে হসপিটালের দিকটা নিরিবিলি নির্জন। অন্ধকারে হসপিটালের বারান্দায় রোজ সন্ধেতেই ওদের নিশ্বাস উভয়েরই, এক সময় চূড়ান্ত গরম হয়ে উঠত। দু-চার দিন শ্যামলের সহযোগী হয়ে আমিও দূরে বসে শুধু সিগারেট টেনেছি আর আঁচ করেছি এসব। আর একটাই কথা মনে হয়েছে শুধু শ্যামল আসলে দু'জনই তোরা একটা মোহের শিকার হয়ে গেছিস রে। কেউ কাউকে তেমনভাবে ফিল করিসনি। তাহলে এভাবে অন্ধকারে এসে বসতিস না রোজ।'

সেই আলো বেশিদিন থাকল না শ্যামলের কাছে। হঠাৎ করে আসা বন্ধ করে দিল। আর আসেইনি, শেষ পর্যন্ত। আলোর বাড়িতে শ্যামলের অবাধ যাতায়াত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অল্পেতেই বাড়ির সবাই মেনে নিয়েছে। পর পর দিন দশেক আলো না আসতে শ্যামল একদিন সন্ধেতে আলোকে বাড়িতে ধরল। সঙ্গে আমিও ছিলুম। আলোর দিকে সরাসরি তাকাতে পারছিলুম না। শ্যামলকে দেখে আলোর কোনও ভাববিকার ঘটল না। আলাদা ঘরে গিয়ে বসলুম আমরা তিনজনে। 'দেখা করা না কেন?' জিগ্যেস করতেই শ্যামলের মুখের ওপর আলোর জবাব ছিল 'দেখা করার প্রয়োজন এখনও বাকি আছে?'

'তার মানে? তুমি কী বলতে চাও?' আলো যেন অবাক হল, বলল, তুমি কী বলতে চাও পরিষ্কার করে বল।' সেদিন শ্যামল ভালবাসার জন্যেই আলোকে কিছু বলতে পারেনি। দুঃসাহসিকভাবে কিছু একটা করে বসেনি।

আলো কলকাতা মাঠে ভলিবল, কবাডি এসব খেলতে আসে। শ্যামল ভলি ফেডারেশন থেকে কবাডি ফেডারেশন করে প্রায়ই গিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে আলোকে দেখেছে তার পরেও। আলোর পিছু নিয়ে কলকাতা অব্দি ছুটে এসেছে, কেন আলো এভাবে পাল্টে গেল? যদি কিছু জানা যায়।

সেভাবেই একদিন আকাশবাণীর কাছে শ্যামল দেখেছে আলোর সঙ্গে বেমানান একজন বয়স্ক লোক ওর কোমর পেঁচিয়ে একটা ফিয়েটে ড্রাইভিং শেখাচ্ছে আলোকে। চোখে দেখেই শ্যামলের বিশ্বাস হচ্ছিল না এসব। বিশ্বাস হয়? সেই আলো একটা বয়স্ক লোকের কাছে খেলাধুলোর ভাল সুযোগের জন্যে

সব ভুলে যাবে, ভাবা যায়?

দীপার পেছন পেছন আমি খেয়াঘাটের সিঁড়ি ভাঙছিলাম। পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দীপা জিগ্যেস করল, 'এর আগে চড়েছিস নৌকো কোনওদিন?'

'কেন চড়িনি! বা রে আমার তো নর্থবেঙ্গলেই ছিলুম বেশি।' সিঁড়ি শেষ হতেই প্যাঁচপ্যাঁচে কাদার ওপর জোড়া করে ইটাপাতা, একহাত দেড়হাত ফারাক মাপে। সন্তর্পণে পা ফেলতে গিয়ে দীপা বলল, 'আমার হাতটা একটু ধর।' আমি চট করে ধরে ফেললুম হাতটা। সাবধানে পায়ে পায়ে এগুতে থাকলাম।

দীপাকে আজ আমি নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। আবিষ্কার করতে পারছি। মাঝে মাঝেই দীপা আমার শূন্যবুক ভরে দিয়ে তাকিয়েছে। দীপা এত অদ্ভুত তাকাতে পারে? ছেলেমানুষের মতো আমার মনে হয়েছে দীপা। পাকাপাকিভাবে আমার চোখে এভাবে তাকালে হয়তো আমার সাতজন্ম খিদেই পাবে না। এখন পর্যন্ত খুব একটা হইচই কথার ফুলঝুরি উড়িয়েছে, তা না। অল্প-স্বল্প যে দু-চার কথা বলেছে আর ছেলেমানুষী হেসেছে, তাতে আমার শুধুই মনে হয়েছে, অনেক শক্ত কথাও ইচ্ছে করলেই বলে দিয়ে নিরাপদ থাকতে পারব। শক্ত কথা বলতে তো ওই একটাই কথা আমার মনে আসে, দীপা আমার মধ্যেই প্রশান্তকে খুঁজে নিক না।

এসব ভাবা অন্যায়। দীপা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে কেচ্ছার শেষ থাকবে না। তলে তলে তুই এতটা প্রদীপ! এতটার কী আছে? তোকে ভাল লাগে আমি তোকে ভালবাসি ব্যস আর জানিনে কিছুই। জানিনে কিছুই আবদার আর কী! 'কুমির তোমার জলকে নেমেছি' ছেলেখেলা যেন।

কেনও কিছুই ছেলেখেলা না। বস্তুত দীপার প্রেমিক আছে, ভেবে নিজেকে সচেতন করা বা গুটিয়ে নেওয়ার আগেই তো ভরাডুবি হয়ে গেছে। ছেলেখেলা তো দীপাই করেছে গোড়া থেকে। নইলে প্রথম দিন করিডোরে অপরিচিতের দিকে এভাবে কেউ তাকায়? প্রাণান্ত ইশারা করে কেউ ওভাবে হাসে? অন্তত নিজের একজন প্রেমিক থাকতে! আমার বুকে কার্তিকের হিম জমাট বেঁধে আছে সেই থেকে। দীপার জন্যেই তো। দীপা ছাড়া অন্য কারুর তাপে কি সে হিম ছাড়বে বুক থেকে?

মেয়েদের মধ্যে সুমিতার সঙ্গেই প্রথম আলাপ হয়েছিল। সুমিতাই দীপাকে ডেকে পরিচয় করিয়েছিল আমার সঙ্গে। দু-চার কথা বিনিময় হয়েছে সব মিলিয়ে, তখুনিই অসীম এলে সুমিতাকে ডেকে নিল। সুমিতা চলে গেলেও দীপা যাওয়ার কোনও লক্ষণই দেখাল না যখন হুট করে আমিও কী করে চলে আসি? দীপার মতো মেয়ের সামনে দাঁড়ালে অনেক আচ্ছা আচ্ছা কলিজাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। তবু সৌজন্যমূলক কোনও কথা তো অন্তত বলে রেহাই পেতে হবে। সহসা ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলতে গেলাম আপনাকে আগেই দেখেছি। কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই সে হাসি বিপন্ন ম্লান হয়ে ঠোঁটের বাইরে ঝুলে থাকল। দীপা দমকে হঠাৎ এমনভাবে হেসে উঠল মনে হল কাঁচের জার মেঝেয় পড়ে ভেঙে চৌচির হয়েছে। আমার অস্বাভাবিক ভেতরটা কি ও বুঝতে পারল? এভাবে হেসে উঠল?

দীপার দুধ-ফরসা নিখুঁত দু-পাটি দাঁত এক হতেই বলল, 'আমাকে আপনি কেন?' সংকোচের কাঁটা সরে গেল অনেকটা। বললাম, 'এখানে সবাই তুই-তুকারি করে। আমি চট করে কারুকে তুই বলতে পারিনে। আমার আসে না।' দীপা বলল, 'আমাকে তুমি তুমিই বোলো।' তার মানে? তুমি বলবে— 'আর আমি বাধ্য শিশুর মতো তোমার কথায় তুমি তুমি করে, তোমার ওপর আমার দুর্বলতাকে সাড়ম্বরে জানান দিই আরকি। আমার ভেতরে কেন জানি এসব মনে হতেই আমি বলে বসলাম, 'এখানে সবাই যখন তুই বলতে পারে, তখন আমাকেও তো চেষ্টা করে পারতে হবে।' কথাগুলোকে এমন ধীরে-সুস্থে বললাম, যেন দীপার মতো আলাদা গোছের একটা সুন্দরী মেয়ে, আমার চোখে কই, তেমন তো কিছু দেখলাম না? এমনই উন্নাসিকভাবে তাকাতে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু সত্যিকারের আগুনে কি আর শিশির ভেবে হাত রাখা যায়? আমার দিকে দীপার অদ্ভুত প্রগলভ চাউনি দেখে একটা তীব্র সুখ যন্ত্রণার আকারে বুকের রক্তে আঘাত করতেই সমস্ত রক্ত নুয়ে পড়ছিল। তখনও কি জানতুম এই দীপার একজন প্রেমিক আছে?

মেয়েদের চোখে আমি নাকি মুখচোরা গোছের। এ কথা আমার কানে এসেছে বহুবার। সুমিতা দীপা এরাও তাই ভেবেছে নিশ্চয়ই। তবে যে অর্থে ওরা আমায় মুখচোরা ভাবে, সেদিক দিয়ে কারুর চাইতে আমি কম যাইনে। তবু চট করে কারুর সঙ্গে তেমনভাবে জমিয়ে নিতে পারিনে।

সেই আমার সঙ্গে দীপার মতো সপ্রতিভ চরিত্রের মেয়ের পরিচয় হওয়াটা নিতান্তই দৈবাৎ। আরও বেশি দৈবাৎ ঘটনা ঘটে গেল ফ্রেসার্স ওয়েলকামের দিন।

কাউকে জানাইনি কথাটা। আগের দিন ঠিক করে ফেললুম মনে মনে। বলেও ফেলতে পারতুম। কিন্তু তুষার, অসীম, সুমিতার সঙ্গে দীপাও ছিল। রহস্যময়ভাবে কথাটা তাই চেপে গেলুম বেমালুম। এখানে আমার এ বিষয়ে কেউ জানে না কিছু। তাই সামান্যও ধারণা বা আঁচ করতে পারেনি অথবা সে নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাও ওঠেনি। তলে তলে ব্যবস্থা পাকা করেছি আমি একা। দীপা না থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়তো বলেই ফেলতুম কথাটা। প্রথমদিন আলাপের পর দীপার সঙ্গে আমার আর কোনও কথাই হয়নি বলতে গেলে। ইউনিভার্সিটিতে সবার সামনে মাঝেমধ্যে আমার সুপ্ত বাক্‌পটুতার আত্মপ্রকাশ ঘলেও, দীপা এসে গেলেই আমর 'ক' বর্ণ কথাও নিতান্তই মূল্যহীন মনে হয়েছে। কেবলই মনে হয়েছে যা বলছি সে তো হাজার হাজার লোকের মুখের বহু ব্যবহৃত কথা। দীপাকে আমি এমন কোনও কথা শোনাই, যা শুনে দীপার মনে হবে যেন, সম্পূর্ণ আলাদা গাছের, সম্পূর্ণ আনকোরা, দারুণ মূল্যবান, অথচ সহজ হৃদয়গ্রাহী। যে কথা এর আগে কেউ বলেনি। এসব ভেবে বাক্‌হীন জড়ের মতো সবার কথার মধ্যে বসে থেকেছি। মাঝে মধ্যে দু-চার কথায় সায় দিয়েছি। দীপার সঙ্গে সরাসরি কোনও কথাই হয়নি। ও-ও বলেনি। আমিও সহসা পারিনি কিছু বলতে।

পরদিন ফ্রেসার্স ওয়েলকামে এসেছি অনেক আগে থেকেই। তখনও কাউকে বলিনি কিছু। কাউকে বলে ফেললে হয়তো ভেতরের ভয়টা অনেক হাল্কা হয়ে যেত। তবু সবাইকে চমকে দেওয়ার একটা তীব্র স্পৃহা কাজ করল মনে মনে। ভয়টা তার জন্যেই বাড়ছিল আরও বেশি। যতই সময় এগিয়ে আসতে লাগল, ততই কী হয় কী হয় ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছিল।

তখন অনেকেই এসে পড়েছে। দীপাও এই এল। হালকা আকাশ রঙের ফিনফিনে হাওয়ার মতো পাতলা গোছের শাড়িটায় কালচে বুটি। এই শাড়িটার জন্যে দীপার শরীরের দ্যুতিটা আরও বেশি ফুটেছে নাকি? দু-একটা বিশেষ তারা যেমন আকাশে কখনও-সখনও দেখা যায়। সুমিতা সোনালি, তুষার, বিমল ওদের সঙ্গে এদিক-ওদিক যাচ্ছে, আসছে, হাসছে, কথা কইছে। আমিই কেবল ওদের কাছ থেকে কখনই খাপছাড়া হয়ে একা একা হয়ে



যাচ্ছি। কেবলই মনে হচ্ছে শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে না। সুমিতার 'কখন এলি?'র উত্তর দিতে গিয়ে তখন অস্পষ্ট গলা ক্ষীণ কেঁপে গিয়েছিল। এখন হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না।

দীপাকে সারপ্রাইজ দেব। ওর পছন্দসই হবে কিনা, সে নিয়েই কিন্তু আসলে ভয়টা আরও বেশি ছিল। আমি যেটাকে সারপ্রাইজ ভাবছি, দীপার কাছে তা সারপ্রাইজ নাও হতে পারে। একজনের গান আরেকজনের কাছে কান্না হতে পারে, আবার কারুর কান্না কারুর কাছে গানের মতোও হতে পারে।

এক সময় এমন ছিল আমার বুরুনদিকে যখন তখন সারপ্রাইজ দিতে ইচ্ছে করত। শুধু মনে হয়েছে নতুন আরও নতুনভাবে চমকে দি বুরুনদিকে। তখন আমি জানতুম না যে পৃথিবীতে নতুন করে চমকে ওঠার মতো কোনও টাটকা ঘটনা আর নেই। সব ঘটনার রংই বিবর্ণ ফিকে হয়ে গিয়েছে। নতুন করে রং চড়ালেও চটে যাবার বীভৎস ভয় আছে।

'বুরুনদি তুমি জান না। তোমাকে চমকে দেবার জন্য তোমার ঘরে খাটের নিচেয় গিয়ে লুকিয়ে ছিলুম। বিলুদা এসছিল তোমার ঘরে। তোমার সঙ্গে বিলুদাকে সেদিন ভাল দেখিনি আমি। তখন ব্যাপারটাকে সঠিক উপলব্ধি করতে না পারলেও আজ পারছি। লোকটা গোড়া থেকেই ভাল ছিল না। তুমি ভাল থেকো। ভালবাসা নিও।'

অডিটোরিয়ামে সবাই ঢুকে পড়েছে প্রায় অল্প কয়েকজন মৃদুগুঞ্জন ছড়াচ্ছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বাইরে করিডোরে। আমি অডিটোরিয়ামে ঢোকার মুখে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে সিগ্রেটে টান ছিলুম। আমাদের বাংলার কাউকেই চোখে পড়ছে না। সুমিতা, দীপা, বিমল, তুষার ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অডিটোরিয়ামের মধ্যে জায়গা জুড়ে বসে পড়েছে। ওদের সঙ্গে বসার জন্য ওরা আমাকে খোঁজেনি? খুঁজলেও পাওয়ার কথা না। কারণ আমি তো নিজেই জানি আমি অডিটোরিয়ামে বসছিনে। তাই ওদের সবার চোখের আড়ালে থেকেছি। ওদের দেখেছি। ওরা দেখেনি আমাকে। সময় বলতে গেলে আর নেই-ই। দীপা তুমি কোনওদিনই জানতে পাবে না। তোমাকে ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ দেবার জন্যে আমার ভেতরে এখন কী ভয়ংকরভাবে ভূমিকম্পে ধস পেয়ে যাচ্ছে সব।' সিগ্রেটটা মেঝেয় ফেলে পায়ে পিষিয়ে দিলাম। এবার ভেতরে যাব। চোখ তুলতেই দীপাকে দেখলাম। তন্ত্রীতে কোথায় আকস্মিক বাধাপ্রাপ্ত রক্তের বেগ যেন বিমুখী ছুটতে শুরু করেছে।

দীপার থেকে চোখ ফেরালুম না। দীপা সেই অদ্ভুত প্রগলভ চাউনিতে হাসির ছোঁয়াচ রেখে সাবলীলতা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল আমার দিকে। এসেই বললে 'একা এখানে কী করছিস? তুই নাকি গান গাইছিস? কাউকে বলিসনি তো তুই গান জানিস, আজ গাইবি? কী অদ্ভুত স্বাভাবিক দীপার কথাগুলো। যেন কতকালের নিবিড় সম্পর্ক দীপা বয়ে এনেছে এতটা। আমি বললুম কে, বলল?' ইউনিয়নের শ্যামসুন্দরদা বলল, তোমাদের বাংলার উত্তীয় গান গাইছে। সত্যি?' আমি হ্যাঁর মতো করে মাথা নাড়লুম। ভেতরটা কখনওই আমার নিস্তরঙ্গ স্বাভাবিক, আরও

স্বাভাবিক হয়ে গেল। দীপা বলল, 'চ ভেতরে আয়' আমি দীপার সঙ্গে ভেতরে গেলুম।

॥ ২ ॥

যেমন দৈবাৎ পরিচয় হয়েছিল, তেমনই দৈবাৎ ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেল দীপার সঙ্গে সেই ফেসার্স ওয়েলকামের দিন থেকে। দীপা যেখানে সেখানে আমি, আমি যেখানে দীপা সেখানে। বাংলার প্রায় সবাই আমাদের নিয়ে নানান কথা ছুড়তে লাগল, সমালোচনা করত নিজেদের মধ্যে। দীপা ভ্রুক্ষেপ করত না। আমি মাঝে মাঝেই রাগ দেখাতুম। এমনভাব দেখাতুম, যেন এক্ষুণি একটা রিভালভার পেলে ছয়ঘোড়া করেই এক একটার বুকে সিঁধিয়ে দিতুম। সেটা শুধুই আলগা, বাইরের। ভেতরে ভেতরে দারুণ ইচ্ছে করত গিয়ে সবার পিঠ চাপড়ে বলে দিই 'সাবাস বাচ্ছে আউর বোলো। চিলহা চিলহা কর বোলো। সারি দুনিয়াকো মালুম করবা দো।'

একটা ছোট্ট কথাই শুধু বলে ফেলা হয়নি দীপাকে। কীভাবে বলব, কী কথা দিয়ে শুরু করে, সে কথায় গিয়ে দাঁড়াব, কীভাবে সাজিয়ে বললে দীপার সবচে বেশি পছন্দ হবে, ভেতরে ভেতরে এসব দ্বন্দ্ব নিয়েই বলা হয়নি। দীপার মতো মেয়ে, আগ বাড়িয়ে একথা বলতে পারে? আমার ধারণা নেই। আমাকেই বলতে হবে। আবার মনে হয়েছে, সব শুনে দীপা যদি বলে বসে নারে উত্তীয়, এ আমি চাইনি, আমি বন্ধুত্ব চেয়েছি। তুই আমাকে ভুল বুঝিস না!' এসব নেহতাৎই ভয়। দীপা আমাকেই ভালবাসে। একথা আমি চোখ বুঁজে বাঁ হাতে লিখে গেলেও, একটা অক্ষরও হেরফের হবে না। আমি হলফ করে বলতে পারি।

কত কথা মনে হয়েছে বলব। দীপার কাছে যেতেই আবার মনে হয়েছে, কথা নেই কোনও। কোনও কথা থাকে না, সেইটেই স্বাভাবিক মনে হয়েছে বারবার। রবিঠাকুরের গান পছন্দ করে দীপা, কেবলই ইচ্ছে হয়েছে দীপাকে একটা রেয়ার গান শোনাই। দীপার সঙ্গে আমার যেন সবদিক দিয়েই একটা আদ্যন্ত মিল রয়ে গেছে। কোনও কবিতা ভাল লেগে গেলেই সেটাকে মুখস্থ করে ফেলেছি। দীপাকে শুনিয়েছি। ও খুশি হয়েছে। খুব সহজে খুশি না হওয়াটাই যেন দীপার বিশেষত্ব। কিন্তু যখন মনে হয়েছে, দীপা সত্যিই খুশি হয়েছে, তখন সুখী মানুষের মতো সুরের যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা ভরে গেছে।

দীপা আমার খুচ্‌খাচ সব ব্যাপারেই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। একটুতেই ডাক দিয়েছে। চোখ পাকিয়ে শাসনের ধরন নিয়েছে। তখন আরও বেশি করে মনে হয়েছে দীপা তুই আমার। একচেটিয়া সুখের আধিপত্য নিয়ে বিশ্ব সংসারে আমি একটাই এসেছি। তার মূলে তুই।'

কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ওপরে বইটা যেদিন হারিয়ে ফেললুম। দীপা সেদিন আমায় 'তুই একটা যা তা, ইরেসপনসিবল্ কোথাকার' এসব মুখের ওপর বলে দিয়েছে। কার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিল বইটা, তারপর ক্লাসে আমার কাছে দিয়ে বলেছিল 'তোর কাছে রাখ।' রেখেও ছিলুম। তবে ভাবতে পারিনি বইটা হারিয়ে যাবে। আমায় সঙ্গে করে দীপা এ রুম ও রুম ক্যান্টিন, করিডোর, লাইব্রেরি করে খুঁজেছে। যেচে আগ বাড়িয়ে একে ওকে জিগ্যেস করেছে। আর ততই বেশি করে রেগে গেছে আমার ওপর। বারবারই বলেছে একই কথা 'তোর মতো ইরেসপন্‌সিবল্ ছেলে আমি দুটো দেখিনি। তুই একটা কীরে? সামান্য একটা বই দায়িত্বে রাখতে পারলি না?' লজ্জায় অপমানে আমার কর্ণমূল আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। নিজেকে একটা নিরেট অপদার্থ মনে হয়েছে। দীপাকে কোন মুখে কী বলব? কিছু বলার থাকে আর? দীপা আমাকে আর কোনওদিন কিছু রাখতে দেবে না। কোনও ব্যাপারে দায়িত্ব দেবে না। নির্ভর করবে না। এর চেয়ে দুঃখ আর আমার কী থাকতে পারে? কোথায় ফেললুম বইটা কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। মনেই ছিল না। দীপা চাইতেই তখন মনে পড়ল।

অন্যান্য দিন দীপার যাবার সময় আমি ওর সঙ্গে বাস-স্টপ অবদি যাই। ও বাসে না উঠে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়াই। একথা ওকথা বলতে বলতে বাস আসলে, দীপা উঠে যায়। আমি আমার বাসে উঠি।

কিন্তু আজ যাবার সময় দীপা আমায় ডাকল না। সবদিন ডাকতে হয় না, আমি নিজে থেকেই যাই বা সঙ্গে থাকি, যাই। কিন্তু আজ না ডাকলে যেতে পারি? কী বলব গিয়ে যে, 'আমি কীর্তিমান পুরুষ এলুম তোমায় এগিয়ে দিতে বাস-স্টপে?' নিজের ওপর একটা মিহি ঘৃণা, একটা তাচ্ছিল্য। শরীরময় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। ততই নিজেকে আরও দায়িত্বজ্ঞানহীন চরম নগণ্য মনে হয়েছে। সামান্য বেখেয়ালের জন্যে মস্ত একটা ক্ষতি হয়ে যাবে দীপার, ভাবতেই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম নেমে আসছিল। দীপার কাছে আমি ছোট হয়ে যাই, দীপা আমাকে অপদার্থ ভাবুক মনের ভুলেও কোনওদিন ভেবেছি? বরং উল্টোটাই চেয়েছি। সাবলীল সুপুরুষের সব ক'টা গুণ খুঁজে পাক আমার মধ্যে দীপা। আবিষ্কার করুক এক অনন্য নবীনকে।

দীপার কী দোষ? ওকে তো বইটার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে অন্যের কাছে। সে তো আমারই জন্যে। শুধুমাত্র আমার জন্য। দীপা করুর কাছে সহজে ছোট হওয়ার মেয়ে না। সহজে মাথা নোয়ায় না করুর কাছে। কাউকে সেরকম সুযোগ দেয় না। সেখানে যদি, যার বই সে দু'কথা বলার সুযোগ পেয়ে যায়, আর দীপাকে শুনতে হয়, তবে কল্পনাতীত কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে। দীপা আমাকে আরও যা তা বলে দেবে। কথা বন্ধ করে দেবে। 'না দীপা কথা বন্ধ করে দিস্ না। আমার কথা তো তোর ছোঁয়াতেই তো সজীবতা পায়, আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তুই বুঝতে পারিস না?

পরদিন ইউনিভার্সিটি এসেছি। ভয়ে ভয়ে গা আড়াল করে থাকতে ইচ্ছে করছিল, দীপার চোখ থেকে। পারা গেল না। দীপা আমার কাছে এসে বসল। বই নিয়ে কোনও কথা তুলল না। আমিও বললুম না কোনও কথা। দীপার মুখোমুখি অপরাধীর মতো বসেছিলুম। তাকাচ্ছিলুম না ওর দিকে। 'বাড়ি ফেরার পথে কাল কলেজ স্ট্রিটেও তোর বইটা অনেক খুঁজেছি রে পাইনি। দীপা ওর ডান হাতের তর্জনি দিয়ে আমার গ্রিবা ঘুরিয়ে, আমার চোখ ওর চোখের মাপে করে নিয়ে মিহি গলায় বলল, 'আমার ওপর তুই রাগ করেছিস নারে? আমি অপলক তাকিয়েছিলুম দীপার চোখে। পর্যাপ্ত অভিমানে ক্রমে দু'চোখ জলে ভার হয়ে এল আমার। আমি অস্পষ্ট কাঁপা গলায় বললুম, 'কই না তো।' তার পর দীপা ঝুঁকে এল আমার কানের কাছে। পরম গোপনীয়তার সতর্কতায় ফিসফিস করে বলল, 'কাল মেট্রোতে ম্যাটিনির দুটো টিকিট কেটে রাখিস। আমি সময় মতো চলে যাব।'

পরদিন ছুটির দিন। ইউনিভার্সিটি যাবার তাড়া নেই। তারচে দশগুণ তাড়া আমার মেট্রোতে সময় মতো পৌঁছে টিকিট করে নিশ্চিত হওয়ার। সকাল থেকেই তাড়াহুড়ো করে এটা সেটা

ঠিকমতো গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে গিয়েই কত সময় চলে যাচ্ছে। কেবল মনে হচ্ছে কী যেন বাকি থেকে গেল। জামার হাতায় ইস্ত্রির ভাঁজটা উল্টো হল নাকি? টাকা পয়সা ঠিকমতো নেয়া হল তো। কম পড়ে যাবে না তো? কলকাতার রাস্তার বেরুলে টাকা পয়সার মা-বাবা থাকে? কোত্থেকে কী বিপদ হাজির হয়। বেশি টাকা থাকলে সবদিক দিয়ে একটা মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকা যায়। হুট করে ঝুটঝামেলা বাধতে কতক্ষণ! গেলেই তো হল।

দীপা সঙ্গে থাকবে। এটা সেটা যদি হঠাৎ খেতে চেয়ে বসে? কোনওদিন অবশ্য তেমনভাবে চায়নি কিছু খেতে। একদিন শুধু ইউনিভার্সিটিতে ফুচকা খেতে চেয়ে ছিল। বলেছিল, 'খাওয়াবি মাইরি' খাওয়ানোর মতো পয়সা ছিল না আমার পকেটে। অগত্যা আমাকে বলতে হয়েছে, 'ধুর ফুচকা আবার কেউ খায় নাকি?' সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্যে দীপাকে ফুচকা খাওয়াতে পারিনি। দীপা যদি বলত, 'ঠিক আছে ফুচকা না খাওয়াস ভেলপুরি খাওয়া তবে তখন? তখন কী বলতুম? তখন কী বলা যেত যে, ভেলপুরি ছোটলোকি খাবার?

দীপার সঙ্গে একদিন যাচ্ছিলাম এভারেস্ট বিল্ডিং-এ অনিতার জন্যে কোম্পানি সেক্রেটারি শিল্পের প্রসপেক্টাস আনতে। বাসে অত্যধিক ভিড় ছিল। ভদ্রভাবে আব্রু বাঁচিয়ে কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব না, ওই বাসের ভিড় ঠেলে ওঠানামা করা। কেউ করলেও, আমি চোখের সামনে কী করে সহ্য করি যে, দীপা ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছে, আর সেইসব রোগগ্রস্ত মানুষরা তাদের যার যার সাময়িক পাওনা বেপরোয়া বুঝে নিচ্ছে?

বেশি পয়সা পকেটে ছিল না বলে আমি সেদিন দীপার সামনে পৌরুষ জাহির করতে পারিন। সম্রাট অথবা বাদশার মতো চেঁচিয়ে বলতে পারিনি, 'হেই ট্যাক্সি দাঁড়া।' নিদেন পক্ষে একটা মিনিবাস অথবা কোনও ডিল্যুক্স বাসের কথা মনে এলেও দীপার কথা কানে তুলিনি। শেষ পর্যন্ত ভিড় বাসেই উঠতে হয়েছিল।

আরও কতদিন সামান্য কুড়ি পয়সার জন্যে ইউনিভার্সিটি থেকে শিয়ালদা অব্দি হেঁটে এসেছি। ইচ্ছে হলেও একটা সিগ্রেট কিনে ধরাতে পারিনি। এসব কী দীপা জানবে কোনওদিন? জানতে দেয়া যায়? আরও কত কথা দীপা জানবে না আমার। আমিও জানতে পারব না, দীপার অনেক কথাই। গভীর গোপন বলে মানুষের মধ্যে যে জিনিসটা, সেটাকে নিজে নিজেই বুঝতে হবে, মীমাংসা করে নিতে হবে।

পয়সাকড়ির জন্যে এতশত বিপদের কথা ভেবেই পর্যাপ্ত পয়সা জোগাড় করে ফেলেছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে। রাজ্যের জমানো পুরনো পত্র-পত্রিকা সব ওজন দরে দিয়ে দিয়েছি। দীপার সঙ্গে একটানা তিন ঘণ্টা সিনেমা হলের স্থায়ী অন্ধকারে পাশাপাশি বসে, দীপার গা থেকে সন্তর্পণে মেয়েলি গন্ধ নাকে নিয়ে সমস্ত কোষে কোষে ছড়িয়ে দেবার বিপুল কৌতূহলে, আমি সর্বস্ব বেঁচে দিতে পারি। ত্যাগ করতে পারি অনেক দামি জিনিসও।

সকাল থেকে বাড়িতে এমন হুলুসথুলু হুঁড়োপাটা শুরু করে দিলাম। যে কেউ হঠাৎ এসে গেলে, ভাববে বুঝি কোথাও চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ আছে আমার! শ্যামলের থেকে ওর কালো প্যান্টটা চেয়ে নিয়ে এলুম। ভ্যাবলের থেকে চোস্ত সানগ্লাসটা। নিজে হাতে তড়িঘড়ি শোয়েটে কালি করে ফেললুম। জামাটা গায়ে গলাতে গিয়ে দেখলুম নিচের দিকে একটা বোতাম নেই। বেধড়ক খিঁচড়ে গেল মেজাজটা। হাতের কাছে সুঁচ সুতো খুঁজে পেলুম না। রত্না একটা পুরনো জামা থেকে সাদা বোতাম কেটে এনে দিতে গেল। রগের চোটে কী বলতে গিয়ে বলে ফেললুম, 'জল না হলে ওই ট্যাবলেট কি চিবিয়ে খাব?' ভয় পেয়েও কথা শুনে রত্না হেসে দিল। খানিক গম্ভীর থাকার চেষ্ট াকরে আমিও হেসে ফেললুম।

তাড়াহুড়ো করে ভাত খেতে গিয়েমনে হচ্ছিল ভাড়া মাছের কাঁটা বেছে খাওয়া কী অসম্ভব দুরূহ। নাকি কাঁটা বেছে খেতেই শিখিনি? 'আস্তে খা গলায় ভাত ঠেকবে।' মার কথায় মনে হয়েছে বলে দি 'তুমি কি বুঝবে মা? দীপার সঙ্গে সিনেমায় যেতে হলেও তুমিও বুঝতে। একটু দেরি হলেই ওকি অসম্ভব রেগে যায়!' ট্রেনে ভিড়ের মধ্য দাঁড়িয়ে থেকে এসব মনে করে ফিক করে আপনা আপনি হেসে উঠেছি। মুহূর্তে সে হাসি সকরুণ ছাপ ফেলেছে মুখে। কেউ দেখলে ভালই বুঝতে পারত। টিকিট পাব তো?

দীপা বলেছে, স্টুডিওটার সামনে দাঁড়াতে। 'এদিকে ওদিক যাস না কিন্তু কোথাও। শেষে খুঁজতে গিয়ে আমি হয়রান হই। তবে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে তোর।'

অন্য কোথাও যাইনি আমি। পয়লা পয়লা টিকিট দুটো কেটে নিয়েছি। শীতের কড়া রোদ মুখের ওপর পড়ছিল এসে। তবু স্টুডিওর সামনে থেকে এক পাও সরে গিয়ে ছায়া খুঁজিনি। অনেক আগেই আমি এসে পড়েছি। দীপার আসার এখনও অনেক দেরি।

ধারাবাহী জনস্রোত, ফুটপাতে হকারদের বিজ্ঞপ্তি চেঁচামেচি, ডবল ডেকারের পেছন থেকে কালো ধোঁয়া ছেড়ে মোড় নেয়া, অনন্তকাল ধরে বয়ে যাওয়া দ্রুতগতি যানগুলোকে আমার তীক্ষ্ণ নজর ছেঁকে ধরছিল। হাতের কব্জিতে সময় আমার ক্রমেই এগুতে থাকল।

আনমনা গালে হাতের প্রলেপ দিতেই মনে পড়ল এই যা দাড়ি কামানো হয়নি।' তাড়াতাড়িতে বলতে গেলে আসল কাজটাই বাদ পড়ে গেছে। গালভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি রয়ে গেছে। কালো মুখে এই দাড়ি দীপার কাছে মোটেই নয়ন সুখকর হবে না।

এক দুপুরে সুমিতা আমাকে পাকড়াও করল ইউনিভার্সিটিতে। বলল, 'তুইও চল।' আমি বললুম, 'কোথায়?'

'কোথাও না তুই চল তো!'

'আগে বলবি তো কোথায় যাব?'

'যাচ্ছি এক জায়গায় তুই চল না, সবাই যাচ্ছি আমরা।'

'সবাই কে কে?'

'আমি, সোনালি, মালা, কণা, বিমল,তুষার সবাই।'

'দীপা?'

'হ্যাঁ, দীপা তো যাচ্ছেই।'

'কিন্তু কোথায় বলবি তো?'

'দীপাদের বাড়িতে যাচ্ছি।'

'হঠাৎ দীপাদের বাড়ি?'

'বলছে যেতে চল না।'

'আমায় বলেছে কোথায়?'

তাই তো আমায় বলে দিল, তুই গিয়ে বল উত্তীয়কে', এর পরেও আর রাজি না হয়ে পারলুম মা। দীপা বলেছে, আমার কথা? তখনও দীপার সঙ্গে আলাপই হয়েছে মাত্র। তার বেশি কিছু না।

দলে ভারী হয়ে দীপাদের বাড়ি রওনা হলুম আমি। কিন্তু বেরুনোর মুখে দীপা, সুমিতা, কণা ওরা হাসাহাসি শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে। আর ইঙ্গিতে আমাকে বোঝাতে চাইল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোকে দেখেই হাসছি।' কিন্তু কেন? আমার অসম্ভব অপমান লাগল। মেয়েরা আমায় নিয়ে ওভাবে হাসবে, অথচ হাসির কারণ বলবে না, এর চাইতে আর অপমান কিছু আছে? খানিক দেখে

'দোর আমি যাব না' বলে গোঁ ধরে ভেতরে চলে গেছি। আর যাওয়া হয়নি দীপাদের বাড়ি। ভেবেছি, সত্যিই তো নিজে মুখে যখন বলেনি, তখন না গেলেও খুব একটা খারাপ দেখায় না। তার ওপর ওভাবে দন্তবিকশিত বেঢপ হাসবে, আমি কি ফালতু পার্টি নাকি?

তুষার, বিমল ওরাও ধরতে পারেনি। ওদের হাসির কারণটা কী ছিল? পরে আমি জেনেছি সুমিতা বলেছে, ওদের হাসির কারণ, আমার চাঁচাছোলা গোঁফ। সেদিন গোঁফটা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছিলুম। আর সেদিনই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি তোমরাও হাসো, আমি আর গোঁফই রাখছিনে। কিন্তু একই জিনিস নিয়ে মানুষ ক'দিনই আর হাসে। আর হাসেনি পরে।

সুমিতা বললে, 'তুই সেদিন গেলি না। দীপার খুব খারাপ লেগেছে। ও দুঃখ করছিল তোর জন্যে।'

'কী কথক, না ভরত নাট্যম?'

'মানে?'

'মানে কোনটা নাচব? তোদের দীপা দুঃখ পেয়েছে বললি না?'

'ভাবছিস ইয়ার্কি?'

'না ইয়ার্কি কোথায়? তোমাদের দীপাকে বলোগে আমার চাঁচা গোঁফ নিয়ে হাসতে। আর ওর হাসির তালে তালে আমি কথক নাচবখন্' বলেই ভেবেছি এসব বলা ঠিক হল না। খুব রেগে গেলে আমি যে, কী বলি না বলি। মাথার ঠিক থাকে না। আসলে সেদিন ভীষণ অপমান লেগেছে আমার। পরে দীপার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে, তখন একদিন বলেছেন, 'ধ্যাৎ! গোঁফ রাখিস না কেন রে? কেমন বোকা বোকা লাগে?'

সেই দীপার কথায়ই আবার গোঁফ রেখেছি। গোঁফটাও একটু মেকাপ দিয়ে এলে হত। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা একবারও মনে আসেনি সকাল থেকে।

দীপার আসার সময় হয়ে গেছে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি তখনও। রোদটা একভাবেই চোখে লাগছে। তবু সানগ্লাসটা চোখে রাখিনি। ওতে অস্বস্তি বাড়ছিল আরও বেশি। খালি চোখেই দীপাকে দূর থেকে লক্ষ্য করতে সুবিধে হবে। বাইরে দর্শকের ভিড় যতটা ছিল এখন কমে গেছে অনেক।

শো আরম্ভ হয়ে যাবার পরও ঘণ্টা দেড়েক মেট্রোর সারা চত্বরে ঘুরে ঘুরে খুঁজে দেখেছি। আর পরের পর সিগ্রেট খেয়েছি। দীপা আসেনি।

চোখের শিরা-বুক থেকে রক্ত টেনে জড়ো করেছিল। একটুতেই ঝরে পড়বে বুঝতে পেরে পরের পর সন্তর্পণে ঢোক গিলে বুকের রক্ত বুকে ফেরাতে চেয়েছি।

দীপা এল না কেন? কী এমন ঘটতে পারে, যার জন্যে এল না? সিনেমা দেখার কথা তো দীপাই বলেছে! আমি তো বলতে যাইনি। খোশামোদ করতে যাইনি। 'তোকে যেতেই হবে' বলে মাথার দিব্যি দিয়ে তো রাজি করাইনি।

নাকি বই হারিয়ে ফেলার রাগে পড়ে, আমাকে একটা নিরেট গবেট ভেবে পুরোটাই কৌতুক করে মজা পেতে চাইল। দীপার শরীরে কী মহম্মদ বিন তুঘলকের রক্ত আছে? এসব, সবাই আমার বই হারিয়ে ফেলার দুর্বলতার মনে আসছে. খানিকটা রাগে তার চাইতেও দীপার প্রতি চরম অভিমানে। যাকে ভালবাসা যায় তাকে অনাবশ্যক রূঢ় কথা বলা, ও মাঝেমধ্যে তাকেই চরম শত্রু প্রতিপন্ন করার পেছনে একটা সূক্ষ্ম তৃপ্তি আছে। আর কারুর না থাক, আমার আছে। মুহূর্তে এসব মনে এসেছিল এই যা। আসলে দীপাকে আমি খুব ভাল চিনি। এত নীচু মন ওর না, ওর ওপর প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমি একথা বোকার মতো বলেও জিতে যেতে পারি। পারতপক্ষে আসার চেষ্টা করেছে নির্ঘাত। দীপা আবার ভুলে যায়নি তো?

ভুল তো মানুষেরই হয়। সেইটেই স্বাভাবিক। দীপারও ভুল হতে পারে। হয়েছেও এর আগে নিশ্চয়ই। কোনওদিন ভুল হয়নি, আর হবেও না কোনওদিন, কেউ জোর দিয়ে একথা বলতে পারে? কেউ কেউ বললেও আমার কাছে সেইটে নিতান্তই হাস্যকর ছাড়া আর কিই বা বলব?

ভুল সবার হয়েছে একবার না একবার জীবনে। হবেও কম-বেশি প্রত্যেকেরই। অনেক জরুরি কাজেও ভুল হয়ে যায়। পরে মনে হয়, ইস ভুল হয়ে গেছে বড্ড।'

তখন আমি কলেজে। কলেজ সোসাল ছিল সেদিন। আর্টিস্ট কন্ট্রাক্ট, তাঁদের নিয়ে আসা, পৌঁছে দেবার পর ভার আমারই ছিল। করেছিও তাই। সকাল থেকে সে নিয়েই ছুটোছুটি এখানে ওখানে যাওয়া। হই-হুল্লোড়ে কাটিয়েছি।

বিকেল থেকেই মেঘ মেঘ করছিল আকাশটা। সন্ধে সন্ধে গাড়ি নিয়ে কলককাতায় গিয়েছি শিল্পীদের নিয়ে আসতে। গিয়ে বৃষ্টির কবলে পড়ে গেছি। বিকেলের আগে থেকেই ওখানে কম-বেশি বৃষ্টি, তখনও বেশ জোরে হচ্ছিল দেখে এসেছি। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরতে হল অগত্যা। শিল্পীরা কেউই আসতে রাজি নয়। সোস্যাল পণ্ড হয়ে গেছে।

কলকাতায় যখন অত বৃষ্টি দেখে এসেছি, তখন বুবুনদির কাক-ভিজে ফেরাটাই খুব স্বাভাবিক। ফিরেছেও তাই। শুধু তাই না, কলকাতা থেকে সোজা আমাদের বাড়ি এসে ওঠাটা সবার কাছে খুবই অবাক লাগলেও আমার লাগেনি।

একটা চরম আফসোস আর বুবুনদির জন্যে যথেষ্ট কষ্ট নিয়ে কেবলই আমি চেয়েছি লোডশেডিং হয়ে যাক। আলোতে বুবুনদির সঙ্গে আমি কোনও ব্যথা বলতে পারব না। কোনও উত্তর তো না-ই। বুবুনদির চোখেই আকাতে পারব না। আমার ইচ্ছেমতো লোডশেডিং হয়নি। আলোতেই বুবুনদির মুখোমুখি হতে হয়েছে। বেশিক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছে বুবুনদি, বোঝা গেছে। খুব ফরসা মুখ-চোখ তাই বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য মনে হয়েছে। একটা বিশ্রি রাগ আর বিষণ্ণতার ছাপও ছিল বুবুনদির মুখে। বুবুনদিকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হয়েছে, 'ইস্ ভুল হয়ে গেছে বড়।' শীলাকে দিয়ে ডাকিয়ে কাল রাতে চিঠিটা দিয়ে বুবুনদি বলেছিল, 'খুব জরুরি। কাল সকালে তোর বিলুদাকে অবশ্যই দিয়ে আসবি। আর বলবি, আমি ওর অপেক্ষায় থাকব, ও যেন যায় অবশ্য করে।' সেই চিঠি সকাল থেকে কলেজ সোস্যাল নিয়ে ভুলেই গেছি দিতে।

'কীরে দিয়েছিলি চিঠিটা?' নিতান্ত নির্বোধ আর নির্লজ্জের মতো আমি বলেছি 'একদম ভুলে গেছি, মানে...' বুবুনদির কথা শেষ করতে দেয়নি। চলে গেছে। পরে চিঠিটা আমি পড়ে জরুরি দরকারটা জেনেছি।

জরুরি কাজের কথা বুবুনদি আমায় বলেছে, আমি ভুলে গেছি। আমি বললে নিশ্চয়ই আমি ভুলে যেতাম না। যদিও কেউ কেউ নিজে কী বলেছে, নিজেই ভুলে যায়, তবে সেটা নেহাতই কথার কথা বা খেয়ালে বলা কথা.

সিনেমার কথা দীপা যখন খেয়ালে বা কথার কথায় বলেনি, তখন ভুলে যাব কী করে? বড় কথা, নিজে থেকে ওভাবে কথাটা বলে কেউ ভুলে যেতে পারে? আমার ধারণার বাইরে। সদ্য সদ্য কালকের বলা কথা আজই ভুলে যাবার মতো ভুলোমন দীপার না। আমি জানি। তবু নিশ্চয়ই তেমন কোনও কারণে দীপা আসতে পারেনি নইলে ও আসতই, এ ভেবেও সান্ত্বনা পেতে



ইচ্ছে করল না। কেবলই দীপার ওপর তীব্র রাগ ফুঁসলে উঠছিল, ভেতরে ভেতরে।

কাল ইউনিভার্সিটিতে দীপা নিশ্চয়ই এমন একটা মোক্ষম কারণ দেখাবে যে, আমার আর কিছুই বলার থাকবে না। 'মেয়েদের কত অসুবিধে, কত রকম ট্রাবল ফেস করতে হয় তুই তার কী বুঝবি?' হেনতেন অনেক কথাই বলবে, বোঝাতে চাইবে। গত যাই বলুক আর বোঝাতে চাক আমি কোনও কিছুই বিশ্বেস করিনে মুখের ওপর বলে দেব।

নিজেই সিনেমা দেখার কথা বলে, আমাকে উস্‌কে দিয়ে না আসার জন্যে, দরকার হলে দীপার মুখের ওপর আরও রূঢ় কথা অনায়াসে বলে দিতে আমার বাঁধবে না একটুও। আমি তোকে চিনিনে, কোনওদিন তোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। যার কথার দাম নেই তার সব কিছুই মূল্যহীন। আমি কি তোকে বলতে গিয়েছিলুম? তুইতো নিজেই গদ গদ হয়ে বললি। তবে এলি না কেন? একবারও ভেবেছিস, যে একটা ছেলে তোর জন্যে অতদূর থেকে তাড়াহুড়ো করে এসে টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি ভুলেই মেরেছিস? বাঃ বেশ জব্বর শিক্ষে দিলি ভাই ইত্যাদি আর যা মুখে আসবে তাই বলে দেব। অত ছাড়াছাড়ি নেই। অবশ্য দীপা এ-নিয়ে কিছু বলতে এলে তবেই। নিজে থেকে ঘটা করে এসব বলতে যাবার কোন ঠেকা নেই আমার।

তার চেয়ে, দীপা আসেনি, তার জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে খুব, আমি ভীষণ রেগে গেছি, সাড়ম্বরে এসব জানান দেয়াটাই বেশি বোকামি হবে। বরং পারতপক্ষে ভাবসাব এমন দেখাব যে, তুই আসিসনি আরে তাতে কী হয়েছে? আমি একজন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান সুন্দরীকে নিয়ে দিব্যি দেখেছি। সবই তো হাতের মুঠোয় আমার।

দীপার সঙ্গে চোখাচোখি হলে প্রথমদিকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন এই প্রথম দেখছি আগে তো দেখিনি কোনওদিন? তারপর ও তেমন উৎসাহ দেখালে, দেখাবে নিশ্চয়ই, তখনই সেই ভাব আনতে হবে, আরে এতো আমাদের বাংলারই সেই মেয়েটা। ব্যস্ তার বেশি কিছু না। ভেতরে ভেতরে এমনই একটা সতর্কীকরণ নিয়ে পরদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলুম।

আমি জানতুম দেখা হলে দীপা প্রথমেই বলবে 'এই এই কারণে কাল সিনেমায় যেতে পারিনি রে। তুই নিশ্চয়ই এস্‌চিস? শুধু শুধু তোকে কষ্ট দিলাম।' আমিও সেয়ানা ঘুঘুর মত চরম নির্লিপ্ততায় ভ্রূ-কুঁচকে জিগ্যেস করব কী ব্যাপার বলত? কীসের কষ্ট!' দীপা তখন নিশ্চয়ই বলবে 'ওই যে কাল সিনেমা দেখার কথা আমি বলেছি নিজেই অথচ যেতে পারলুম না।' আরে হ্যাঁ সত্যিই তো তুই তো বলেছিলি। কী কাণ্ড আমি তো ভুলেই গেছিলাম। ভাগ্যিস তুই যাসনি!' গেলে কি কেলেংকারি হত বলত? মুহূর্তে ভাবলুম, বরং এইটেই বলে দেব।

কী ব্যাপার দীপা কি আসেনি নাকি? তাকে যে দেখছিনে? তবে কি দীপা বুঝতে পেরেছে কালকের জন্যে আমি রেগে আছি? আর সে জন্যেই কি ও এল না? ইউনিভার্সিটিতে এসে পর্যন্ত পর পর তিনটে ক্লাসেই ওকে দেখলুম না!

একবার ভাবলুম জিগ্যেস করি সুমিতাকে। কিন্তু সঙ্গে মালা কণা ওরাও আছে। এমনি দীপাকে নিয়ে সুমিতা আমায় তেমন কোন টিপ্পনি কাটেনি তবু দলে পড়ে কাটতেও কতক্ষণ? মালা, কণা ওদের সামনে লজ্জায় পড়ে যেতে হবে। তাছাড়া মালা, কণাও তো টুক করে সুযোগ বুঝে কোনও টোনা দেয়া কথা বলে দিতে পারে।

তুষার, বিমল ওদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেনি আজকাল। দীপার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে কেমনই একটা ছাড়াছাড়া ভাবসাব। নিতান্ত ডেকে কিছু না বললে, পারতপক্ষে কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দীপার সঙ্গে থেকে দেখেছি, ওদের আলোচনায় তার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের দিকে চাউনি, ভাবসাবে একটা আলগা শত্রুতার ধরণ আছে। কেনরে বাবা? আমি কী এমন তোদের পাকা ধানে মই দিলুম? তোদেরও তো কম দেখিনে। আর হ্যাঁ তুষার, তুই কোন মুখে বলিস? তোর নিজের গন্ধটা কম পেলি কোথায়? কণাকে নিয়ে তোর বেলেল্লাপনারও তো শেষ নেই রে। আমার কি আর চোখে পড়ে না? কানে আসে না কিছু? চোখ কান আমার খোলাই থাকেরে। নিজের গন্ধটা একটু শুঁকে দেখিস, কতটা মন্দা। নাড়িভুঁড়ি একেবারে উগলে বেরিয়ে আসবে। শালা লোম ওঠা কুত্তা

কোথাকার। কেনরে মনে নেই? সানফ্লাওয়ার দেখতে গিয়ে সারা ছবি জুড়ে কণাকে কম চষেছিস? আমি ছিলুম না তাদের সঙ্গে? কিছু বুঝিনি বলতে চাস? আর কণাটাও জুটেছে ভালোই। শালার যেমনি বলি তার তেমনি খাঁড়া। খালি সতীপনা দেখাবে। আর আছে বিমলটা খালি একান ওকান করে বেড়াবে। কিছু আছে না পুরুষালি মেয়ে আর কিছু মেয়েলি পুরুষ? বিমলটা তাদের দলে। শালাকে দেখলে আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে যায়। সত্যিই তো বিমল তুইও কম যাস কীসে? নেহাত পাত্তা পাস না, নইলে সোনালির পেছনে তোকে তো আকছারই ঘুরঘুর করতে দেখি।

এসব ভাবিই শুধু বলতে পারিনে ওদের। আমার জন্যে ভাবিনে। দীপার জন্যেই। আমার সঙ্গে দীপার মেলামেশার কথা জঘন্যভাবে চারদিক ছড়াবে ভাবা যায়?

সুমিতাকে আলাদা ডেকে দীপার কথা জিজ্ঞেস করা যায় না? কিছু জানে নাকি ও। তা হয় না। সুমিতা ভাববে 'তা একথা আলাদা ডেকে বলার কী আছে?' আবার ফিরে গেলে মালা, কণা ওরাও 'কী বলল রে?' জিজ্ঞেস করবেই। আমি তো আর সুমিতাকে বলতে পারিনে যে, 'কাউকে বলিস না। এমনি জিজ্ঞেস করলুম।' ওরা তো ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। আদার ওয়াজ নেবেই। অথচ সবার সামনে যে স্বাভাবিক কথার কথায় জিজ্ঞেস করব 'দীপার খবর কীরে আসেনি আজ?' তারও উপায় নেই। একেই তো এক পায়ে খাড়া। তার ওপর সাড়ম্বরে সুযোগ করে দেয়া।

দীপার সঙ্গে মেলামেশা করি বলে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে থেকেও সবার অলক্ষ্যে কখন একা হয়ে গেছি। আর ধ্রুব সত্যির মতো বুঝতে পারলাম। আরও চরমভাবে বুঝে গেলাম এই ইউনিভার্সিটির জগতে সবার চাইতে দীপার চোখে আমি সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কাল সিনেমায় না হয় না এল, আজ ইউনিভার্সিটিতে কেন এল না? সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে। কেবলই মনে হচ্ছে দীপা আসেনি, আজ ছুটির দিন, তবু আমরা না জেনে সবাই এসে পড়েছি।

নিজেকে আমার প্রচণ্ড রকম একা আর নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হচ্ছে। দীপা আমার এক কপর্দকও ধরে ফেলেছে। 'আমি তোর কাছে ধরা পড়ে গেছিরে দীপা, সে-কথা নতুন করে আর আমায় বুঝতে হবে না কোনওদিন, তুই এসে দেখে যা।'

সিনেমায় না আসার জন্যে দীপার ওপর আমার সমস্ত ক্ষোভ, অনুযোগ আর অভিমান গলে জল হয়ে, কঠিন কষ্ট হয়ে বুকের রক্তে মিশে গেছে। কাল ইউনিভার্সিটিতে এসে দীপাকে না দেখা পর্যন্ত আমি একটাও স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিতে পারব কিনা সে-নিয়ে ভয়তো ছিলই, আবার সম্ভবপর আতঙ্কে আঁতকেও উঠেছি, কালও যদি দীপা না আসে?

আজ সাতদিন হয়ে গেল দীপা আসেনি। দীপা আসছে না সাতদিন। সাতদিন দেখি না ওকে। মনে হচ্ছে কত যুগ! দীপার মুখটা অচেনা হয়ে যাবে না তো? পেছন থেকে ইতিহাসের সেই মেয়েটাকে দেখে 'দীপা না?' চমকে উঠেছি। মুহূর্তে মনে হয়েছিল, সবাই কি আর দীপা হয়? না সব দীপার জন্যে আমি সাতদিন শুধু একটু অস্থিরতায় কষ্ট পাচ্ছি? ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, রাস্তা-ঘাটে বিপুল জনস্রোতে তো কত হাজার হাজার দীপাই নিত্য হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিক্ষণে। সেই দীপাদের দলে ইউনিভার্সিটির বাংলার দীপা নেই। আমি সতর্ক চোখ রেখেছি ওদের দলে। খুঁজে পাইনি।

সত্যিকারের দীপার সঙ্গে এই সাতদিনের একদিন অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্যও তো দেখা হতে পারত। দীপাও তো রাস্তায় বেরোয়। ইউনিভার্সিটি ছাড়াও এদিক ওদিক দরকারে ওতো যায় আসে। ওষুধের দোকানে, নয় স্টেশনারি দোকানে, নয়



নিদেনপক্ষে মোবাইল রিচার্জ করব বলেও তো বেরুতে পারত। আর রাস্তার মধ্যে পেছন থেকে আচমকা 'উত্তীয়' বলে ডেকে, তাড়াহুড়ো করে কাছে এসে প্রচণ্ড ব্যস্ততায়ও তো বলতে পারত 'এই অসুবিধের জন্যে ক্লাসে যাচ্ছি না। তুই খুব একা হয়ে গেছিস নারে?' একা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কেবলই আঁতকে পেছন ফিরে তাকিয়েছি 'দীপা ডাকল না?' দীপা ডাকে না। আজ সাতদিন দীপার ডাক শুনিনি।

অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে দীপাকেই ভেবেছি শুধু। 'দীপাকে যেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি ভগবান।' রোজ রোজ ভেবেছি 'দীপাকে স্বপ্নে দেখব।' দীপাকে স্বপ্নে দেখিনি। একদিন একটা কালো মেঘ স্বপ্নে দেখেছি শুধু।

দীপা আসার সময় চলে গেছে জেনেও ইউনিভার্সিটিতে দীপাকে না দেখে দীপার বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ফেরার পথেও দীপার বাস-স্টপে এসে দাঁড়িয়েছি রোজ। দীপার বাস এলেই উঠে পড়েছি। গিয়ে নেমেছি সুখিয়া স্ট্রিটে। সুখিয়া স্ট্রিটে দীপাদের বাড়ি শুনেছি। বাড়ির নম্বর জানিনে। তাই সাহসে ভর করে সোজা বাড়ি চলে যেতে পারিনি। শুধু সারা সুখিয়া স্ট্রিট চত্বর অহেতুক ঘুরেছি। বাড়ির জানালা দিয়ে অথবা ঝুল বারান্দা থেকেও তো দীপা আমাকে দেখে ফেলতে পারে। উত্তীয় বলে ডাক দিয়েও তো বলতে পারে 'কীরে তুই এখানে? এইটে আমাদের বাড়ি, নিচে ডানদিকের দরজার পর সিঁড়ি আছে। আয় ওপরে উঠে আয়।'

ইউনিভার্সিটি ঢুকছি। ফুচকাওয়ালাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দীপা একদিন ফুচকা খেতে চেয়েছিল। দীপার প্রিয় যা কিছু আমার কাছে প্রিয়। ক্লাসে থেকে থেকেই মনে হয়েছে, এইতো আমি বসে আছি, এই বুঝি পেছন থেকে নিঃশব্দে দীপা এসে আচমকা পিঠে হাত রাখল। এই বুঝি এসে মায়াবী চোখ পাকিয়ে বলল, 'এখনও রাগ পড়েনি? একি! তাই কাঁদছিস?'

ক্লাসের ভেতর সুমিতা, মালা, কণা, সোনালি, তুষার, বিমল সবার সঙ্গে আমিও বসেছিলুম। সুমিতা গাইছিল, তুষার বেঞ্চ ঠুকে তাল রাখছিল। আমি আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলুম। তারপর নেহাৎই পায়চারির ঢঙে অন্য একটা ফাঁকা ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। বুক কাঁপতে লাগল অনর্থক ভয়ে। কেউ লুকিয়ে আমায় লক্ষ্য করছে না তো? এদিক ওদিক তটস্থ চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর পকেট থেকে একটা চক বার করলাম। হাত কাঁপছিল তবু লিখলাম 'দীপা তুই আসছিস না কেন রে?' লিখেই মুছে ফেললাম। ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে মুখের, গলার অহেতুক ঘামও মুছে ফেললাম।

অস্বাভাবিক মাথার, কপালের শিরায় যন্ত্রণা ঢিপঢিপ করতে লাগল। চোখে জ্বালা জ্বালা ভাব। কান্না ছাড়াও এক ধরনের জল বেরিয়ে আসছিল চোখ থেকে। কাউকে কিছু না বলে রাস্তায় নেমে এলাম। দীপার বাস-স্টপ হয়ে আর সুখিয়া স্ট্রিটে যাবার সাহস হল না। আচ্ছন্নের মত এক অন্য মাদকতায় বেধড়ক মাতালের মতো সোজা বাড়ি চলে এলাম।

সকালের দিকে অরুণ ডাকতার এসে দেখে প্রেসক্রিপশন করে গেছে। চিনদা গাদা খানের ট্যাবলেট, ক্যাপসুল নিয়ে এসেছে। ডান হাতের ফাঁড়া সকালেই আজকের মতো কেটে গেছে। বিকেলে টাকুদা এসে বাঁহাতে ইনজেকট করে যাবে। আজ তের দিনেও দাঁড়াতে পারিনে সোজা। পা কাঁপে। বুক কাঁপে। বাইরে গেছি যখনই চিনদা নয়ত মা ধরে নিয়ে গেছে। জানালা দিয়ে যখন দু-একসময় বাইরেটা দেখি মনে হয় হাঃ পাল্টে গেছে সব কিছু। বাইরের জল, হাওয়া আলো সব পাল্টে গেছে। অনেক দেখা পুরোনো জিনিসও নতুন আঃ কী সুন্দর!

দীপাকে নতুন মনে হবে দেখলে দীপা তোকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। তোকে কতদিন দেখিনিরে! তুই সাতদিন এলি না কেন? তোকে অনেক খুঁজেছি। এখন আমার অসুখ।'

সেদিন দুপুরের পরে দীপাকে স্বপ্ন দেখলাম। জ্বরের ঘোরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। দেখলাম দীপার সারা শরীর সবুজ। সারা গায়ে নক্ষত্র ফুটে আছে। সবুজ নক্ষত্র। আকাশ থেকে মেঘ সরিয়ে দীপা নেমে আসছে। বৃষ্টিতে ভিজলে যেমন শরীর থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ে তেমন দীপার শরীর থেকে নক্ষত্র ঝরে পড়ছে। আমি চেঁচিয়ে বললাম 'দীপা আমি এখানে, এই এখানে আমাকে দেখতে পাচ্ছিস?' দীপা নেমে এসে আমার কপালে, গলার কাছে হাত রাখল। বলল, 'তোকেই তো দেখতে এলাম। কেমন আছিস?' ভাল, এখন ভাল আছি। তুই এতদিন কোথায় ছিলি? রোজ আসবি তো?' 'আসব রোজ আসব।'

ঘুম ভেঙে যেতে দেখি সত্যিই দীপা এসেছে। তবে ওর শরীর সবুজ না। যেমন ছিল তেমনই। সঙ্গে সুমিতাও এসেছে। আমার বিছানার কাছে ওরা বসে আছে। আমি চোখ খুলতেই দীপা বলল, 'কেমন সারপ্রাইজ দিলাম? দেখলি তো চলে এলাম সোজা। স্টেশনে নেমে জিজ্ঞেস করতে করতেই বাড়ি পেয়ে গেলাম। কলেজের পাশে তাতো জানতামই। সুমিতা বলল, 'আমরা তো অবাক এতদিন তোর কোনও পাত্তাই নেই। তাই আসব আসব করে চলেই এলাম।' দীপা সোজা আমার বাড়ি চলে আসতে পারে? বিস্ময়ে মুখ ফুটল না সহসা আমার। দীপা কাছে এসে আমার রোগা বুকে হাত রাখল। তারপর কপালে। অল্প ঘাম হচছিল তখন। দীপা বলল, 'এই তো ঘাম দিয়েছে জ্বর নেই। আর।' আমি অসহায় হাসলাম শুধু। মা এঘরে ওদের জন্যে চা জলখাবার এনে দিল। চা খেতে গিয়ে দীপা বলল, 'আমরা আসছে সপ্তায় বাংলার দশজন শান্তিনিকেতন যাচ্ছি তোর নামও দিয়ে দিয়েছি।' আসছে সপ্তার আগেই আমি ভাল মতো সেরে উঠলাম।

॥৩॥

বিকেল বিকেল পৌঁছুলাম শান্তিনিকেতনে। স্টেশনে নেমে রিকশা নিলাম। বেশ শীত পড়ে গেছে। সোয়েটারটা তখনও গায় চাপাইনি। আমি আর বিমল উঠলুম এক রিকশায়। তুষারটা ঠিক ঝোপ বুঝে কণার পাশে বসেছে গিয়ে। প্রোফেসর দুজন একটায়। সোনালি, মালা, মিত্রা, অসীম, চঞ্চল ওরাও সুবিধে মতো ভাগাভাগি রিকশোয় চেপেছে। দীপা, সুমিতা একটা রিকশোয়।

মিনিট দশ বারোর পথ স্টেশন থেকে টুরিস্ট লজ। এটুকু পথেই রিকশোওয়ালারা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দিল। দীপার রিকশো আমাদের আগে যাচ্ছিল। আমি দু-চার হিড়িক দিতেই কম বয়েসি আমাদের রিকশো দীপাদের ছাড়িয়েও সবার আগে আগে যাচ্ছিল। ঢালাও পিচের রাস্তা মোড় নিল। টুরিস্ট লজে গিয়ে উঠলুম সবাই।

জানালা খুললেই দূরে পর্যন্ত বিস্তর মাঠ চোখে পড়ে। ধান কাটা হয়ে গেছে। পাকা ধান গাছের গোড়াগুলো শুধু রয়ে গেছে। নানান গাছ-গাছালি খেজুর গাছের মাথায় সন্ধ্যের অন্ধকার লটকে যাচ্ছে। শীতের ফিনফিনে হাওয়া আসছিল তাই জানলার পর্দা টেনে দিলাম।

হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে চা নিয়ে বিছানায় গা ছেড়ে আধশোয়া বসলাম। এঘরে আমার তুষার বিমলের বিছানা। দীপা, সুমিতা ওদের জন্যে আমাদের পাশের ঘরটা। মেয়েরা সবাই ওই এক ঘরে। অসীম চঞ্চল ওদের অন্য ঘর। প্রফেসর দুজন অন্য ঘরে।

মেয়েরা এসে প্রথম তাড়া লাগাল বেড়াতে বেরুনোর জন্যে। ওরা এর মধ্যে সেজেগুজে তৈরি হয়ে গিয়েছে। দীপা এসে বলল, 'কীরে তুই বেরুবি না? চ সবাই মিলে একটু বেড়িয়ে আসি।' একটা সবজে অদ্ভুত সুন্দর ছাপা শাড়ি পড়েছে দীপা। তুষার, বিমল ওরাও ঝটপট তৈরি হয়েই বলল, 'নে নে ওঠ তো রাত হয়ে যাবে শেষে।' ট্রেন জার্নি গেছে, তার জন্যে আলিস্যি লাগছিল। শুধুই শুয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল। তবু অগত্যা বেরুতেই হল। প্রফেসর দুজন ওঁদের ঘরে বসে কী কথা নিয়ে হাসছে। আমরা বললাম, 'আমরা স্যর একটু কাছাকাছি ঘুরে আসছি।' বলেই বেরিয়ে পড়েছি।

পিচঢালা রাস্তা ছেড়ে আমরা উঠলাম লাল কাঁকুড়ে মাটির পথে। দু'পাশে বিস্তৃত মাঠ। রাস্তার পাশে প্রায়ই উঁচু ঢিবঢিবে মতন। বাড়িঘরগুলো অন্যরকম সাজানো নানান ফুলগাছ আছে প্রায় বাড়িতেই। আলাদা রুচির ছাপ।

আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে সার বেঁধে হাঁটতে লাগলাম। দীপার এক হাত সুমিতার ডান হাতে। দীপা ডান হাত আমার দিকে বাড়িয়ে বলল 'উত্তীয় ধরবি তো ধর নয়ত কাউকেই দেব না ধরতে।' মুহূর্তে এত শীঘ্র ওর হাতটা ধরে ফেললাম যেন তৈরি ছিলাম। নরম মাংসের পেলব সুঠাম হাতটা দীপার ধরতেই মনে হল, দীপা আমায় কোন কষ্টই দেয় নি। যেটুকু কষ্ট মনে হয়েছে সেটুকু এই সুখ, আনন্দের অঙ্কুর ছিল। আমি তখনও জানতাম না, দীপার প্রেমিক আছে।

জানলাম তখন, যখন তুষার পাশ থেকে টিপ্পনি কাটল, 'একেবারে হাত ধরে গদগদ, আর কত ঝোলাবি ব্যাটাকে?' দীপা রেগে গেল। বলল 'আর যাই বল, উত্তীয়কে নিয়ে এসব আমি সহ্য করব না। সে রকম মন নিয়ে ওর সঙ্গে আমি মিশি না। ও শুধুই আমার বন্ধু। তার চেয়ে বড় কথা অনেক আগে থেকেই আমি প্রেম করি। আমার প্রেমিক আছে।' কথাটা শোনামাত্র আমার বুকের রক্ত ছলাৎ করে পিছলে গেল বীভৎস্য যন্ত্রণায়। কাউকে বুঝতে দিলাম না। দীপার হাত থেকে আমার হাত কখনই আলগা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বুকে হাত চাপা দিলাম। ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কাছে পিঠে বুবুনদি নেই। বুবুনদি এখান থেকে বহু দূরে আছে এখন। তবু চিৎকার দিয়ে বুবুনদিকে বলতে ইচ্ছে করল 'বুবুনদি তোমায় এখন একটা সারপ্রাইজ দিতে পারি। আমি যে মেয়েটাকে ভালবেসেছি, তার অন্য একজন প্রেমিক আছে।'

ঘণ্টা হিসেবে নৌকা চুক্তি করল দীপা। বেলা পড়ে এসেছে। নিরুত্তাপ রোদের জন্যে ভাল লাগছিল। দূরে কোথাও লঞ্চের গুরুগম্ভীর ভোঁ শব্দটা যেন জল সাঁতরে এদিকে ভেসে আসছিল। হাওয়া এসে জলের বুক ছুঁয়ে পাঁই পাঁই ঘুরপাক খাচ্ছে। নৌকা ছেড়ে যেতেই সিগারেট জ্বালালাম একটা স্বপ্নের ঘোরের মতো তাবৎ দৃশ্যপট ছেয়ে থাকল চোখের সামনে আমার। তৃপ্তিদায়ক সিগারেটের ধোঁয়া মুখ ছাড়া হয়ে বাতাসে মিশেই যেন নাচের মুদ্রায় ঘুরে যাচ্ছিল।

কাল ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে দীপার সঙ্গে বাস-স্টপ অব্দি যেতে গিয়ে দীপা বলেছিল 'কাল একবার আসবি তুই?'

'কেন কাল কেন! কাল তো রোববার?'

'বলছি তো সে জন্যেই!'

'মানে?'

'মানে কাল প্রশান্ত আসবে'

'অ তোর ইয়ে তাতে আমি কেন?'

'তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, ভাল হবে।'

'আসছে কোথায়?'

'আউট্রামে তিনটের মধ্যে আসবে। তুই দু'টোর সময় কফি হাউসের সামনে থাকবি। আমি ওখানেই তোকে খুঁজব, তারপর যাবখন' তা তোর প্রশান্ত আসছে তাতে আমার কী? ওর সঙ্গে পরিচয় না করলেই বা আমার কী আসবে যাবে? এসব মনেই এসেছিল শুধু, ওর ওপর এখন অনীহা ভাব দেখালে ধরা পড়ে যাব আরও বেশি করে।

দীপা উঠে দাঁড়াতে গেলেই নৌকো এপাশ ওপাশ দুলে উঠল জোরজার। বেসামাল হচ্ছিল দীপা। এক পাশে কাত হতেই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললুম ওকে। হাঃ দীপা এখন আমার বুকে পরম নির্ভরতায় মুখ রেখে, চোখ বুঁজে ভয়ার্ত নিশ্বাস নিচ্ছে 'যদি পড়ে যেতাম জলে?' 'বাঃ রে আমি তো ছিলামই, মাঝিরাও আছে' এমনভাবে দীপাকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলাম যেন তুই পড়ে গেলে জলের তলা থেকেও তোকে তুলে আনতে পারি। আসলে আমি যে সাঁতারই জানি নে, সেকথা দীপার সঙ্গে এমন একটা চরম মুহূর্তে মনে না আসাই ভাল।

সূর্যটা অস্ত যাবে এক্ষুণি। পশ্চিম আকাশটা যেন রক্ত রঙের আবির মেখে হাসছে। দীপার চোখ সেদিকে।

দীপা বলল, 'কি চার্মিং তাই নারে?'

'তোর চেয়ে আর বেশি কোথায়?' এর বেশি বললে বাড়াবাড়ি হবে। দীপা বন্ধু ভাবে আমায়। সে জন্যেই প্রশান্তর সঙ্গে পরিচয় করাবে ভেবেছে। কিন্তু আশ্চর্য প্রশান্ত এল না। জানি তো এখন আর প্রশান্ত আসছেই না। নির্ভয়ে আরও একবার দীপাকে প্রশান্তর কথা জিজ্ঞেস করা যায়। মাঝে মধ্যে একটু আধটু আপসোস না দেখালে দীপা যদি নির্লজ্জ ভাবে? যদি ধরতে পারে আমার ভেতরটা?

'কী রে তোর প্রশান্ত যে শেষ পর্যন্ত এলই না। ঠিকমত বলেছিলি তো দীপা?' লুকিয়ে কখন চাদ্দিকে অন্ধকার নিঃশব্দে নেমে গেছে। জ্যোৎস্না তখনও পরিষ্কার হয়নি। দীপা আমার কানের কাছে সেই একই রকমভাবে ঝুঁকে এল, তারপর সেই একই রকমভাবে পরম গোপনীয়তার সতর্কতায় বলল 'তুই অত বোকা কেন? আমার প্রশান্ত বলে কেউ নেই রে। আমি তো তোকেই...' সাঁই সাঁই সুখের বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার মধ্যে। দীপা এবার স্বাভাবিক মুখোমুখি বলল 'তোকে এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। আসলে তুই যে আমাকে ভীষণ ভালবাসিস, আমি অনেক আগেই তা বুঝতে পেরিছি। তাই দেখলাম, প্রশান্তর কথা বললেও তুই আসিস কিনা। আমি জানতামই যে তুই না করবি না এবং আসবিও।' তার মানে? দীপা আমার সবকিছু ধরে ফেলেছে? এত সহজেই আমার ভেতরটা ও আঁচ করতে পেরেছে? আমার চালাকি সব ধরে ফেলেছে নাকি? নইলে আমার ওপর এমন অন্ধ ধারণা হয় কী করে? মুহূর্তে ভেবে ফেললুম, আমি তোর সব ধারণা পাল্টে দেব রে দীপা। আমি তোকে ভালবাসি। তোর জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে, তবু সে সব এখন আমি উপেক্ষাও করতে পারি। আমি সহসা বলেই ফেললাম 'তোর ধারণাটা পুরোপুরিই ভুল রে দীপা। তুই আমার শুধুই বন্ধু। আসলে আমার একজন প্রেমিকা আছে। তোকে বলি নি কোনদিন।...'

রাই এসে আমার চুল ঘেটে দিয়ে বলল, বাবা, তুমি এখানে বসে আছো! অফিস গেলে না? আমি রাইয়ের সাড়া পেয়েও মাথা তুলতে পারছিলাম না। তিরিশ বছর আগের সেই দীপা আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছিল না।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

প্রবন্ধ

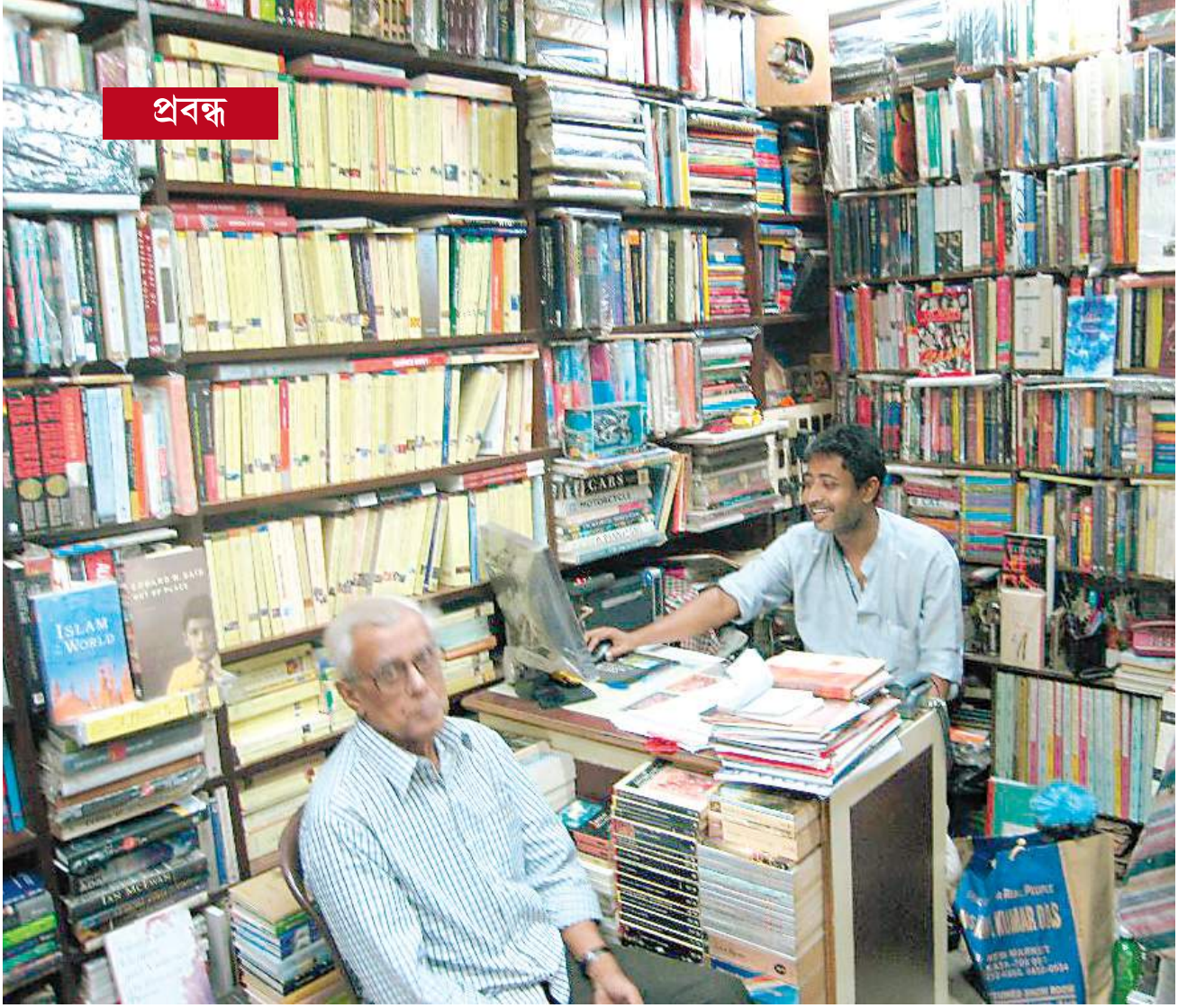

কলকাতায় প্রথম বই বাজার

জহর মুখোপাধ্যায়

একটা গল্প দিয়ে শুরু। গল্প হলেও নির্মম সত্যি। কলকাতার তখন ছেলেবেলা। ছেলেবেলায় কার না হাবাগোবা অবস্থা থাকে। ঘরে-বাইরে জীবনযাত্রার হাঁসফাঁসানি লাগেনি। রাতারাতি বড়লোক হয়ে ভোগবাসনার দাবানলে ঝাঁপ দেওয়ার দৌড় শুরু হয়নি।

এমনকী সুদূর গ্রাম উজিয়ে শহরে এসে ভাগ্যের মরচে পড়া দরজা খোলার অন্বেষা বলতে নেই। টিলেঢালা মন্দাক্রান্তা লয়ে বয়ে চলা জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ান কিছু মানুষ। সেই সময়ে নদিয়ার দাদপুর থেকে কলকাতায় এল গাঁয়ের এক কিশোর। নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। চেহারায় সমাজের গড়পরতা গরিবগুর্বো মানুষের আখ্যানে ভরা। কলকাতা যে কাউকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয় না। রুটিরুজির টানে স্বপ্নের সওদাগর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুই নয়নে অপত্যে ভরা ধাত্রী কলকাতা। মাত্র কিছুদিন আগে বউবাজারে হিন্দু হস্টেল তৈরি হয়েছে। সাহেবদের হাত ধরে ইট-কাঠ পাথরে কলকাতার রূপ অবয়ব তিল তিল করে গড়ে উঠলেও এর মধ্যে কোথায় যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো স্বচ্ছ সলিলা বয়ে চলেছে বুঝতে পারল। ছেলেটি স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী শেষ হার্ডল পার হয়ে পরবর্তী প্রস্তুতির জন্যে মনস্থির করতে পারেনি। কারণ পেট বড় বিষম দায়। ধান্দাপানি কিছু একটা না করলে চলছে না যে আর। যৎসামান্য বেতনে দিনগুজরানোর মতো কাজ একটা পেল বটে তাও হিন্দু হস্টেলে। তার পরেও এখানে-সেখানে কিছু ফাইফরমায়েশ। ক্লান্তি নেই, অভিযোগ নেই নিজের অদৃষ্টের কাছেও। সে দিন থেকে লম্বা দৌড়—লম্বা রেসের ঘোড়ার মতো পথ চলা। মূলধন বলতে ধৈর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সততা। এই তিনটি গুণের জন্যে একদিন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি টেনে ধরল। এক লাফে বাজার সরকার। নোকর থেকে মালিকের স্নেহচ্ছায়ায় হস্টেল ছাত্রদের নানা মুখের আনাগোনা। তরুণ তাজা ফুসফুসের কলরব। কয়েকজন ডাক্তার ছাত্রের সঙ্গে আলাপ জমে উঠল ছেলেটির। পরিচয়ের রং গাঢ় হতেই তাদের উপকারের কথা ভেবে হাত বাড়ালেন বিশ্বস্ত এক বন্ধুর দিকে। বেশ কিছু ডাক্তারি বই হস্টেলের এক কোণে এনে জড়ো করলেন। ছাত্রদের প্রাণভোমরা যেখানে লুকিয়ে আছে। হাতের কাছে বই। এ যেন জল না চাইতে মেঘমন্দ্রের আবাহন। দামের কথা জিগ্যেস করলে, বিনয়ের উপহার মুখে সাজিয়ে রেখে বলতেন, কী দেবেন আর। শুধু কেনা দামটা পেলে যথেষ্ট। ছাত্ররা তার কথাবার্তায় গুণমুগ্ধ। শুধু বই কেনা নয় তারপরেও খুশি হয়ে আরও কিছু উপহার। উৎসাহে তিনি বেশ কিছু বই সংগ্রহ করে গুছিয়ে রাখতেন। এভাবে ডাক্তারি বইয়ের পথ বেয়ে চলে গেলেন দুষ্প্রাপ্য আরও বইয়ের দিকে। আলমারির মাথায় ঝুলিয়ে দিলেন, 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি', নিতান্ত কাঁচা হাতে এক সাইন বোর্ড। সেই প্রথম কলেজ পাড়ায় উঁকি দিল এক বই বিপণি। ডাক্তারি বইয়ের সঙ্গে জীবন ও জীবিকার অন্তরঙ্গ সহবাস। খুব সাধারণভাবে হলেও শুরুতে কার না সাধারণ অবস্থা থাকে। ছোট্ট একটা বীজের মধ্যেই তো লুকিয়ে থাকে মহীরুহের সম্ভাবনা। গুরুদাসেরও সেই রকম। বইয়ের হাত ধরে চলতে শুরু করলেও আর একজনের চোখে পড়লেন। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। হাসি হাসি মুখে চন্দনের বাটি হাতে নিয়ে মা-লক্ষ্মী নিজেই যেন ওঁকে অনুসরণ করলেন। গুরুদাসের কপালে বিজয়তিলক পরিয়ে দিলেন। সেই থেকে শুরু। অন্বেষার একাগ্র দৌড়। গুরুদাস হিন্দু হস্টেলের হার্ডল ডিঙিয়ে পা বাড়ালেন আরও বড় লড়াইয়ের ময়দানে। নতুন ঠিকানায় এসে উঠলেন। কলেজ স্ট্রিটের একেবারে কাছেই বউবাজার। একটা ঘর ভাড়া নিলেন। ১৮৭৬-এর মাঝামাঝি। এবার শুধু ডাক্তারি বই আর নয়। বিচিত্র বিষয় নিয়ে বর্ণময় বইয়ের আরও ছ'টা। দু'মলাটের বাঁধে স্থির হয়ে আছে কত দুর্বার প্রতিভাবান লেখকের বেগবান চিন্তার অনন্ত স্রোত। এমনকী পাঠ্যবইয়ের বিপুল সম্ভারও। 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির' নাম ছাত্র-শিক্ষক-লেখক এমনকী বই প্রেমিকের মুখ বেয়ে বেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক খ্যাতিমান লেখক-গবেষক এক হাতে বুকের সামনে বই ধুতির কোঁচার খুট অন্য হাতে এসে দাঁড়ালেন গুরুদাসের দরজায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বই রাখতে আগ্রহী হলেন। শুধু বই বেচা-কেনার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আরও বৃহত্তর পরিসরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে অনুরোধ করলেন অনেকে। সাহিত্য বাগিচায় নিত্য যে ফুল ফোটে-প্রতিভাবান লেখকের সৃষ্টি সম্পদ সাধারণ মানুষের দরজায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বই প্রকাশনার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন গুরুদাস। সময়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে চলতে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির' নাম বদলে নতুন নামকরণ হল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। নামের সঙ্গে ঠিকানা বদল। এবার নয়া বসত কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের উপরে। টিনের চালাঘর। রাস্তার ধারে। দোকানের সামনে হ্যারিকেনের নিস্তেজ লণ্ঠন বাতি ঝুলে থাকলেও ভিতরে বিদগ্ধ ভাবনার হাজার রোশনাই।

প্রকাশন জগতে হাসিমুখে ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এগিয়ে গিয়েছেন এমন ব্যক্তিত্ব গুরুদাসের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। খুঁজে দেখলে অনেক বঙ্গসন্তানের স্মরণীয় কীর্তি শোনা যায়।

হাওড়া জেলার পাতিহালের জমিদার বরদাপ্রসাদের কথা কারও মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর বংশবৃক্ষে ডাল-পালাদের দিকে চেয়ে দেখলে শিকড়ের কথা জানা যায়। মাত্র বাইশ বছর বয়সে প্রচণ্ড বুদ্ধি এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে লড়াকু বরদাপ্রসাদ হাসিমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করেছিলেন। সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে জমি-জিরেত ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক হয়ে উঠেছিলেন। যশ-অর্থ প্রতিষ্ঠান সৌধের উপর উঠেও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। অগাধ সাম্রাজ্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে পিছলে গিয়ে একেবারে অতলগহ্বরে ডুবে গেলেন কীভাবে সে গল্প মর্মান্তিক আরও। শোনা যায় একদিন নেশার ঘোরে মুহূর্তের ভুলে সেই বিশাল ধনসম্পত্তি বিকিয়ে দিয়েছিলেন এক স্তাবকের কাছে। বলতে গেলে সেদিন থেকে শেষের শুরু। জমি-জিরেত সোনাদানা বাড়িঘর টাকাপয়সা হারিয়ে একেবারে খাদের কিনারায় এসে দাঁড়ালেন। কে বাঁচাবে? এদিকে সময় বড় নিষ্ঠুর বরদাপ্রসাদের দুঃসহ অবস্থার ঘ্রাণ পেয়ে আত্মীয়স্বজন চেনাজানা লোকেরা দূরে সরে গেল। জীবন ও জীবিকার যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে একা হয়ে গেলেন আরও। এমনকী দিকশূন্য অবস্থায় হাতের সামনে একমুঠো বাতাস আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু বিধিবাম। এমনকী পেটে অবাধ্য ক্ষুধার আগুনে দিশাহারা হয়ে পথ ভুলে বউ-ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। কলকাতায়। পাষাণপুরীর আকাশছোঁয়া অট্টালিকার আনাচে কানাচে ফাঁক-ফোঁকরে কত অসহায় মানুষ। পথে পথে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলেন শুধু দু-মুঠো অন্নের সংস্থানে। ভাবলেন, এখানে কত ফন্দি ফিকির। যেমনভাবে পারছে মানুষ বেঁচে আছে। অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার সবাকারঘরে অফরন্ত। এ ভাবে একদিন শোভাবাজারের কাছে একটা জায়গায় এসে ভাল করে দেখলেন চারপাশে। বেশ কিছু লোকের হই-হল্লা শুনতে পেলেন। যেন বাজার বসে গিয়েছে। একেবারে সামনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখলেন। বাজার তো বটে। তবেশাকসবজি, আলু পটল চাল ডাল অথবা মাছ-মাংসের মতো অস্থায়ী জিনিসপত্র নিয়ে সরগরম নয়। এ এক অভিনব বাজার। হালফিল যেমন মুখে মুখে ফেরে বই বাজার নামে। একানে তখন ধর্মগ্রন্থ পাঁচালি আর আদি রসাত্মক বইয়ের সরবরাহে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে টগবগ করে ফুটছে। কৌতূহলে টান টান হয়ে একজন দোকানির সামনে বরদাপ্রসাদ ঝাঁকে পড়লেন। অনেকক্ষণ দেখলেন। তারপর কী এক প্রতিক্রিয়ায় করুণ মুখে অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন ধার-বাকিতে কিছু বই দেওয়ার জন্যে অবশ্য

যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। কলকাতায় বিভিন্ন অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে সেই বই বিক্রি করবেন। বক্তার করুণ মুখে চুপসানো পেটের ছায়া দেখে হৃদয় ছুঁয়ে গেল শ্রোতার। কী ভেবে দোকানদার নিজেই রাজি হয়ে কয়েকখানা বই হাতে দিলেন। সর্বস্বান্ত জমিদার সেদিন জীবনদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন খড়কুটোর মতো সেই বই ক'খানা নিঃশব্দে বুকে নিয়ে। এক নিঃস্ব মানুষের নতুন পরিচয় ছিল কলকাতা। সে এখন বইয়ের ফেরিওয়ালা। চাই বই— ভাল বই। ডাকঘরের অমল ও দইওয়ালার মতো বইওয়ালাও পথে-ঘাটে বই বিক্রি করে চলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কলকাতা। বইওলা যতদূর যাবে স্বপ্নের সওদাগর কলকাতা সঙ্গে থাকবে। বই বেঁচে দিন গুজরানো ছাড়া যাদের নেই কোনও অন্য দিগন্ত। এইভাবে একদিন সেই ফেরিওয়ালা ঘর ভাড়া নিলেন পটলডাঙার বস্তিতে।

পায়ের নিচে নরম মাটি। সামনে লম্বা পথ। সেই পথে একলা পথিক। নিজের মূলধন বলতে কঠিন কঠোর পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস। বই বিক্রি করে আয় বাড়তে লাগল। বেশ কিছু টাকা নগদে হাতে আসতেই গ্রামের বাড়ি থেকে বউ-ছেলেমেয়েকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এবার মাথা গোঁজার মতো শক্ত একটা ঠাঁই। কলেজ স্ট্রিটের কাছে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ির পিছনে অঢেল নিচু জমি। জলে-জঙ্গলে ভরা। স্থায়ী বাসিন্দা বলতে কিছু নিশাচর। নিঝুম নিস্তব্ধ স্যাঁতস্যেঁতে জায়গাটা দিনের বেলাতেও ঝিঁ-ঝিঁর কোরাস কণ্ঠে আর শিয়ালের ডাকে দিনের বয়েস অসময়ে ভারী করে দেয়। এ হেন সেই পতিত জমিতে একদিন মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটল। চার কাঠা জমি জলের দরে কিনে ফেললেন বরদাপ্রসাদ। পায়ের নিচে মাটির ব্যবস্থা হলেও মাথার উপরে ছাটনি দরকার। যেমন তেমন একটা হলে চলে যেত। তাই বরদাপ্রসাদ নিজে উদ্যোগী হলেন। ইটের পর ইট গেঁথে চালাঘর একটা বানিয়ে ছাপাখানার মেশিন স্থাপন করলেন। কিন্তু সেই মেশিন কে চালাবে? সুদক্ষ মেশিনম্যান কোথায়? বরাদাপ্রসাদ চিন্তায় পড়লেন। নিজের হাত দুটিকে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখে মাথায় মস্ত একটা ঝাঁকুনিদিয়ে আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর হয়ে বল্লেন, মেশিন আমি-ই চালাতে পারব। যে সময়ের কথা বলছি সেটা ১৮৬৩ সাল। মাত্র দু'বছর আগে ঠাকুরবাড়ি আলো করে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন মহর্ষির চতুর্দশ সন্তান। এক বিশ্বকবির জন্মস্থান বরদাপ্রসাদের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং কর্মযজ্ঞের আঁতুড়ঘর ঠাকুরবাড়ির কথা ভেবে বরদাপ্রসাদ সঞ্জীবনী শক্তি উপলব্ধি করলেন যেন। তাঁর সংসারে প্রিয়জনেরা কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে আছেন দেখে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নিজের হাতেই এক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিলেন। সহজ কথায় বলতে গেলে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় সেই প্রথম ছাপাখানা। বরদাপ্রসাদ যার নামকরণ করলেন বিপিএমএস প্রেস। বরদাপ্রসাদের প্রেস ব্যবসায়ে নতুন আলো এসে পড়ল। অভাব-অনটনের মস্ত পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন ঘর-সংসার থেকে। এবার এক ঝলক টাটকা বাতাস এসে মুছে দিয়ে গেল পুরনো দিনের সঙ্গে পুরনো গ্লানি যত। ছাপাখানার ব্যবসায়ে অর্থ রোজগারের পথ প্রশাস্ত হলেও ঝক্কি-ঝামেলা সব সামলে নিলেন নিজের হাতে। অনেকদিন পরে হলেও সংসারে সকলের মুখে হাসি ফুটল। মরা গাঙে বান এসেছে দেখে আনন্দে টইটম্বুর হয়ে নিজের পদবিতেও ছোটখাটো একটা সংস্কার করে ফেললেন বরদাপ্রসাদ। দে মজুমদার থেকে শুধু দেব মজুমদারের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। সেই যাত্রাপথ মসৃণ হয়েছিল কতদূর পর্যন্ত তা সময়ই বলতে পারে। আসলে মহাকালই এখানে ভাগ্যনিয়ন্তার তুলাদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৬-তে তৃতীয় পুত্র আশুতোষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সুখের বাতাস বয়ে নিয়ে এল। ছেলেটি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। আত্মমগ্ন। স্কুলের শেষ ধাপ ভেঙে উচ্চশিক্ষার দোরগোড়ায় আসতেই আশুতোষকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিলেন বরদাপ্রসাদ। ছেলে মস্ত ডাক্তার হবে। অসংখ্য গরিব দুঃখী অসহায় মানুষের সামনে প্রাণের প্রহরীর মতো সজাগ হয়ে থাকবে। এমন স্বপ্ন বুনে চলেছিলেন। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। ডাক্তারি পড়তে ভাল লাগছিল না। সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব নিজগুণে অর্জন করা যায়, ভেবে কলেজে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে প্রেস ব্যবসায়ে যোগ দিলেন আশুতোষ। মনের ঢাল গড়িয়ে চলেছে যেদিকে। পিছু পিছু চলতে শুরু করলেন। এইভাবে একদিন কলেজ স্ট্রিটপাড়ায় প্রেস ব্যবসায়ে নতুন নতুন মুদ্রণযন্ত্র জোগাড় করে ছাপাখানা তৈরি করে ফেলেন। লোকজনের যাতায়াতে কাজে কর্মে হই-হট্টগোলে জায়গাটা রাতারাতি বদলে গেল। নয়া পত্তন হল শিল্পের। বাঙালির ব্যবসায়ে এক নতুন মাইলফলক দেখল কলকাতা। সেই সময়ে ঘরে ঘরে বর্ণ পরিচয়ের আলো জ্বলে উঠেছে। লেখাপড়া চর্চা খুব বেশি না হলেও কিছু মানুষ আদা নুন খেয়ে স্কুল-কলেজ তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পড়াশোনায় উন্নততর বিষয় বস্তুর আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপট তৈরি করার ব্যবস্থা করে চলেছেন। আশুতোষ লক্ষ করেন যে বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় অভিধানের বড়ই অভাব। চোখ থাকলেও প্রকৃত বিদ্যার্জন থেকে দূরে আছেন অনেকেই। আশুতোষ অদম্য পরিশ্রম করে অভিধান একখানা লিখে ফেলেন। এবার প্রকাশনা? নিজেই উদ্যোগী হলেন। সেই থানা ইট সদৃশ লাল মলাটে সোনালি জলের সৌকযে দৃষ্টিনন্দন বইখানার মধ্যে বাঁধা পড়ে রইল এক বঙ্গতনয়ের সৃজন মনীষা। আশুতোষের অক্ষয় অধ্যবসায়। এর পরের ঘটনা বাকি ইতিহাস।

১৯২৪ সাল। আশুতোষের বংশবৃক্ষে ডালপালা যেমন ছড়িয়েছে তেমনি সময়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পা ফেলে প্রকাশনা সংস্থা চোখ মেলেছিল নবদিগন্তে। চেয়ে চেয়ে দেখেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের জ্ঞান আহরণে হাহাকার। অশিক্ষা-অজ্ঞানতা অন্ধকার কুসংস্কারের দেওয়াল ভেঙে মুক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার তৃষ্ণা। আশুতোষের মেজ ছেলে সুবোধ দেব মজুমদার সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান সুকুমার চর্চা, এমনকী ছোটদের মনের মতো বই এবং পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজ উদ্যোগে তৈরি করলেন দেব সাহিত্য কুটির। তারপরের ইতিহাস সকলেরই জানা প্রায়। সময়ের দুর্বার আঘাতে গুরুদাস অ্যান্ড সন্স অনেকদিন আগে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু দেবসাহিত্য কুটির রেসের ঘোড়ার মতো টগবগ করে দৌড়তে না পেরে পিছিয়ে পড়েছে। তা হলেও এই দুই বই যাত্রীর অভ্যুত্থান বড় চমকপ্রদ। বঙ্গ সমাজে কিংবদন্তির মতো।

বলতে গেলে উনিশ শতকের শুরু থেকে বটতলার মুদ্রণ সম্পাদকে ঘিরেই বাংলা বইয়ের বাজার আবর্তিত হতে থাকে। প্রকাশন জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান। অথবা মহাকাল জয়ী সৃষ্টির উদ্ভাষ না পাওয়া গেলেও যতটুকু ছাপা হত তাঁর আঁতুড়ঘর ছিল ওই বটতলা। প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানোর পর্ব শুরু হয় তেমনি বাংলা বইয়ের শুরুতে বাবুরাম পণ্ডিতের সংস্কৃত প্রেস ছাপাখানা থেকে বাংলা বইয়ের সূচনা পর্ব শুরু হতে থাকে। কিন্তু বাবুরাম প্রবর্তিত পথ বেয়ে ছাপাখানা যন্ত্র খুব সামান্য অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করলেও সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারল না। এই অবস্থায় বেশ কিছুদিন কেটে গেল। প্রায় ন'বছর

পরে দু'জন আরও বঙ্গসন্তানের মগজ থেকে আরও উন্নত ধরনের ছাপাখানার পরিকল্পনা দেখা যায়। হরচন্দ্র রায়ের আড়পুলি লেনের 'বাঙ্গালী প্রেস' ১৮১৬ সালে তৈরি হয়। জন্মের পরে খুব একটা সুবিধা করতে না পারলেও এর চাহিদা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেনি। ফলে আবার নতুন করে সন্ধান। কিছুদিন পরে আর এক বঙ্গসন্তান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য চোরবাগানে বাঙ্গালা গেজেট যন্ত্র তৈরি করে সবাইকে অবাক করে দিলেন। এর কারিগরি দক্ষতা প্রশংসাই হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজন সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইনি শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেব। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ। ছাপাখানার ইতিহাসে এক নতুন দিন। বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা আগের দু'জনকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। অনেক দূর। এমনকী অনেকের মনোরঞ্জন করতে পারলেন। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, এটাই বটতলার প্রথম ছাপাখানা। এখান থেকেই বই বাজার এক নতুন পথে মোড় নিতে শুরু করে। পুরনো সমাজজীবনের সামনে দিয়ে নতুন অন্বেষায় দৌড় শুরু করে। কলকাতার বড়বাজার থেকে শোভাবাজার, চিৎপুর রোডের দু'পাশ দিয়ে বটতলা, ব্যবসায়ীরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান অথবা ছাপাখানার সামনে বইয়ের পসরা নিয়ে ব্যবসা করতেন। গলা হেঁকে, চিল চিৎকার করে খদ্দের ডাকতেন। হাতের সামনে বইয়ের পাহাড়। ছিরি ছাদহীন সেই সব বইয়ের অন্তঙ্গে কোনও অভিনবত্বের দ্যুতি কিছু না থাকলেও সময়ের বার্তা বহন করে দ্রষ্টব্য হয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বইয়ের চাহিদা বাড়তে থাকে। এই সময়ে ছাপা বইয়ের হাইটেক রোশনাই পাঠকের চোখে লেগে থাকে। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় ঢুকে পথের দু'পাশে বই বিপণির বিচ্ছুরণ দেখে থমকে থেমে যেতে হয়। দোকান থেকে প্রিয় বইখানা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে দেখে মন ভরে যায় আনন্দে। পাশাপাশি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি চমকপ্রদ অগ্রগতি চোখে পড়ে। দিনবদলের ঝোড়ো হাওয়ায় মুদ্রণ পরিকাঠামো যে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে বোঝা যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কলেজ সংস্কৃত কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ বিদ্যাসাগর কলেজের গা ঘেঁসে আশপাশে আঙিনায় চলতি পথে নেমে এসেছে বইয়ের বিচ্ছুরণ। অথচ পিছু ফিরে দেখলে এখনও চোখে পড়ে চিৎপুর গরানহাট, শোভাবাজার বটতলা থেকে আধুনিক সময়ের দিকে বইয়ের স্বপ্নযাত্রা। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। কলেজ স্ট্রিটে একটি মাত্র বইয়ের দোকান। আকাশে একটাই চাঁদ যেমন অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে চেয়ে থাকে। তা হলেও সেই দোকান থেকেই সম্ভবত ছাত্রদের মধ্যে বিনে পয়সায় বই বিতরণ বইদানের কেন্দ্র। ওই অঞ্চলে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির গোড়াপত্তনের জন্যে বীজ বপন করেছিলেন যিনি সেই বেঁটেখাটো আটহাতি ধুতি এবং চাদরে শোভিত দৃঢ়চেতা মানুষটি বর্ণ পরিচয়ের আলো হাতে নিয়ে ঘরে ঘরে কড়া নাড়া দিয়েছিলেন।

১৮৪৭। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বিদ্যাসাগর এক কঠিন বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাতে টাকাপয়সা বলতে নেই কিছু। কলকাতায় তাঁর ঘরসংসারটিও মোটেই ছোট নয়। তার উপর সাহেবসুবোদের তিরিক্কি মর্জি। চাকরিতে গোলমাল হতে পারে ভেবে বিদ্যাসাগর অনেক আগে থেকেই তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে নিয়ে একটা ছাপাখানা খুলেছিলেন। স্বদেশি প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত সেই ছাপাখানার মধ্যে এমন আহামরি কারিগরি দক্ষতা না থাকলেও চারপাশে ক্ষুধার রাজ্যে ওটাই ছিল একটুকরো মরূদ্যান। স্বদেশ আত্মার তাপ এখানেও যে জমে থাকতে পারে সেকথা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর নিজেই যার নামকরণ করলেন 'সংস্কৃত প্রেস'। প্রেস ব্যবসার মধ্যে দিয়ে সামাজিক চর্চিত বিষয়গুলির অনুশীলন, এর মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে নানারকম সংস্কার এবং আন্দোলনের কথা ভাবলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় কলেজ স্ট্রিট পাড়াতেই সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি নামে একটি বইয়ের দোকান খুললেন এমনকী বই লিখে ছাপাখানা থেকে নিজেই প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম বাংলা বই বেতাল পঞ্চবিংশতি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসাবে বিদ্যাসাগর বইটি লিখেছিলেন। পুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশনা তদুপরি বিপণন, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সেই প্রথম উন্নতমানের গ্রন্থ পরিবেশনায় উদ্ভাষ তাঁর হাত ধরেই।

শিয়ালদহ এবং হাওড়ার মধ্যবর্তী যে জায়গাটা হ্যারিসন রোড দিয়ে শহরে দু-প্রান্তে সেতু রচনা হয়েছে তারই আশপাশে তখন হাতে গোনা দু-একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তবু কলকাতার হৃদপিণ্ড বলতে যে জায়গাটা, শিক্ষক এবং ছাত্রদের নিত্য আনাগোনা, যাতায়াতের পথে চোখ মেলে দেখাশোনার অফুরন্ত পরিসর যেখানে বই ব্যবসার উপযুক্ত জায়গা। বিদ্যাসাগরের বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। নারী-পুরুষ, শিশু ও কিশোর ছাত্র-শিক্ষক, আম জনতার সামনে বই সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন। ১৮৪৭ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত বই ব্যবসার সঙ্গে নিবিড়ভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। বই বিক্রি করে মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকারও বেশি আয় করতে লাগলেন। ভাবলে অবাক লাগে। গর্বে বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। বাঙালি জাতি হিসাবে ওই বেঁটেখাটো অদম্য মানুষটি বই ভাবনায় এগিয়ে এসে এক মাইলফলক দেখিয়েছিলেন। তাঁরই প্রদর্শিত পথ ধরে উত্তরকালে অনেক বাঙালি ব্যবসায়ী কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে এসে ভিড় জমিয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রকাশকদের মধ্যে কে ছিলেন? জি সি ঘোষ লাইব্রেরি, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যানিং লাইব্রেরি, শেখ ব্রাদার্স লাইব্রেরি, বিশ্বাস অ্যান্ড সন্স, কে এম মুখার্জি, এরা সবাই মিলে সেদিন শিক্ষা এবং সাহিত্য সহবাসের বাণী মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন।

গুরুদাস আর আশুতোষ দেবের কথা আগেই বলা হয়েছে। এঁদের পিছু পিছু রামতনু লাহিড়ীর পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী এলেন। বি ব্যানার্জি দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং, শেখ মইনুদ্দিন। আবার এর মধ্যে এক নবজাগরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। পাশে প্রেসিডেন্সি কলেজ-অ্যালবার্ট হল—যার আটপৌরে নাম কফি হাউস। এত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের সাড়া পেয়ে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া ততোদিনে সরগরম। সূর্য ডোবার আগে বাড়ি ফেরার তাগিদে ব্যস্ত মানুষের চোখ দুটো একবার ছুঁয়ে যায় কফি হাউসের দরজায়। লেখক-কবি-সাহিত্যিক পত্রপত্রিকার সম্পাদকের নব আনন্দে জেগে ওঠার গুঞ্জন শোনা যায় যেখান থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাঙালির জীবনধারায় যেভাবে নবজাগরণে ঢেউ উঠেছিল তার স্রোত বইপাড়া ছুঁয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে শিক্ষাব্রতী মানুষের দৃষ্টি ঘুরতে শুরু করল বইপাড়ার উপর দিয়ে। বই বিচিত্র বিষয়বস্তুর চাহিদার পাশ দিয়ে তৈরি হল নতুন অভিজ্ঞান। নিত্যনতুন বই সম্ভারে ভরে গেল কলেজ স্ট্রিট পাড়া। সারস্বত আঙিনা থেকে শোনা গেল বীণার ঝংকার।

বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলা সাহিত্য পাঠকের দরজায় এসে কড়া নাড়তে শুরু করল। ফলে প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তনের হাওয়া। এখন শুধু আর পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে

দৃষ্টিনিবদ্ধ না রেখে সাহিত্য বইয়ের দিকে ঝাঁকতে শুরু হল। বহু প্রকাশনীই তো সাহিত্য বই প্রকাশ করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। যে সমস্ত লেখক ঘরে বসে কোল কুঁজো হয়ে গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা লিখতেন তাঁদের সঙ্গে প্রকাশকের গাঁটছড়া বাঁধা শুরু হল। প্রকাশকের দরজায় লেখক নিজের সাহিত্যকর্মটি বগলদাবা করে মুখ দেখাতে শুরু করলেন। ক্রমশ পরিচয়ের রং পাকা হতে শুরু হলে প্রকাশকের পাশের আসনটিও দখলে এসে যায়। তারপর জমাটি আড্ডা। খানা-পিনা পর্যন্ত। এইভাবে একদিন কলেজের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, ছবি আঁকিয়ে শিল্পী এমনকী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সকলকেই চুম্বকর মতো আকর্ষণে টেনে আনল কলেজ স্ট্রিট পাড়া। তার কাছে কী নেই? শুধু কি বই? বসন্ত কেবিন। কলেজ স্কোয়ার দিঘি। গরম চায়ের কাপে ধোঁয়া উড়িয়ে তুমুল তর্কের অফুরন্ত পরিসর। কাঁধের পাশে লম্বা ঝোলা আর শিকারী দুটি নয়নের চাহনি আগে আগে ফেলে শহর এবং গ্রামের কবি ও বিদ্বজ্জনের আনাগোনায় আটপ্রহর জমজমাট। শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্প রাজনীতি ছাত্র আন্দোলন, ভবঘুরের দীর্ঘশ্বাসে ভরা কলেজ স্ট্রিটের বাতাস। জনশ্রুতি আছে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণের আগে মহাকবি বাল্মীকি মুনি রামায়ণ রচনায় নিবদ্ধ ছিলেন। বাঙালির আর একজন ভবিতব্য দ্রষ্টা যিনি চোখের গভীরে কলেজ স্ট্রিটের এতটা বাড়বাড়ন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিও যে বীরসিংহের এক সিংহপুরুষ। মনে কি পড়ে? সেই কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উঠে এসে অ্যালবার্ট হলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। সেদিন তিনি বিশ্বকবি।

সময়ের দাবির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কত নতুন নতুন প্রকাশনী গুরুত্বপূর্ণ বই সম্ভারে কলেজপাড়া জাঁকিয়ে বসেছিল আবার দুঃসময়ের ঝড়ঝাপটা ধরিত্রীর বুকে মুখ লুকিয়েছে। এদের হিসেব খুব একটা কম নয়। ক্যাম ব্রে অ্যান্ড কোম্পানি, কিংবা এস সি আঢ্য অ্যান্ড কোম্পানি, নিউ বেঙ্গল প্রেস, আর্য পাবলিশিং, কমলা বুক ডিপো। বাণীমন্দির, বুকল্যান্ড, এন সিদন্ত অ্যান্ড কোম্পানি, মিনার্ভা লাইব্রেরি, মনমোহন লাইব্রেরি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ওয়াল্ড পাবলিশার্স এরকম আরও কত প্রকাশনা অধোবদনে মুখ ঢেকেছে। সময়ের পলেস্তরার নিচে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে থাকলেও স্মৃতির বেদনা নিয়ে জেগে আছে কলেজ স্ট্রিট। আকাশ থেকে খসে পড়া তারা তীব্র বেগে ধাবিত হলেও অন্ধকারের বুক চিরে চকিতে আলো রেখে যায়। এই সব মৃত প্রকাশীর বই সর্বদাই সহমরণে যায় না। হয়তো কখনও চায়ের কাপে কলরব, কোথায় গেল প্রকাশনার শব? কিংবা কোনদিন চলার পথের হঠাৎ কখনও কোন পাঠকের চোখে পড়ে কৌতূহলে মেলে ধরা বইখানা অনর্গল কথা বলতে শুরু করে। পুরনো সেই দিনের কথা। সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকে। কবির ভাষায় 'হে অতীত কথা কও, কথা কও।'

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়াতে এক নতুন প্রকাশনার অভ্যুত্থান। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। আবির্ভাবেই যে সাড়া জাগিয়েছে। ১৯১০ সাল। রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকার তাঁর ইংরেজিতে লেখা আইনের বই নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা শুরু করেন, পরে তাঁর ছেলে সুধীরচন্দ্র সরকার ব্যবসা হাতে নিয়ে একটুআধটু সংস্কার করেন। আইনের বইয়ের বদলে গল্প-উপন্যাস ছাপতে শুরু করেন। ছোটদের মনের মতো পত্রিকা মৌচাক প্রকাশ করতেই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় হই হই কাণ্ড। বাংলা সাহিত্যে দিগ্বিজয়ী লেখকরা কলম ধরলেন। সেদিন এই মৌচাক পত্রিকা থেকেই হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যখের ধন, বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়, হিরা মানিক জ্বলে, মরণের ডঙ্কা বাজে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ডাকাতের হাতে। প্রেমেন্দ্রকুমার মিত্রের কুহকের দেশে, বিমল মিত্রের নবাবী আমল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাঝির ছেলে, আরও কত কালজয়ী উপন্যাস পাঠকের বুকে উথালপাথাল করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মণিমুক্তোর মতো এই সব গল্প উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের অমৃতের মতো রসাস্বাদনে ডুবিয়ে রাখে। ফলে মৌচাকের জনপ্রিয়তা যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে তেমনি সাহিত্য আকাশে এই সব নক্ষত্রর জ্বলন্ত আলো এসে ঠিকরে পড়ে পাঠকের চোখে। এমনকী এম সি সরকার প্রকাশনা দফতরে স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের আড্ডায় মশগুল হওয়ার গল্প জনশ্রুতির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। শতবর্ষ অতিক্রম করে এম সি সরকার এখন কিছুটা স্থবির কিন্তু ডি এম লাইব্রেরি দৌড় না থামালেও অনেকটা যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। সময়ের খোরাক হলে যেমন হয়। অথচ যার শুরুটা ছিল গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। মাত্র দুই বন্ধুর পদবি জুড়ে বইযাত্রা শুরু হয়েছিল যাদের। বিধুভূষণ দে-র পদবির আদ্যাক্ষর 'ডি' আর গোপালদাস মজুমদারের 'এম।' এই দুটি অক্ষর জুড়ে কিংবদন্তি এক প্রকাশনা গড়ে উঠেছিল কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের উপরে। বিবেকানন্দের বাড়ির খুব কাছেই। ১৯২৩ সাল। অনেকদিন আগেই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণলোকে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু গুরু-শিষ্য দু'জনেই পাকাপাকিভাবে বসে আছেন সমগ্র বাড়িখানা জুড়ে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে মহাকাল। সে আর এক কথা। কিন্তু ডি এম লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়েছিল ঋষি অরবিন্দের সহোদর বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বই 'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী' দিয়ে। বারীন্দ্র জিও অগ্নি আখরে লেখা বিজলী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। গোপাল দাস মজুমদার এবং বিধুভূষণ দে দু'জনেই ছিলেন বিজলী পত্রিকার কর্মী ওরফে বিপ্লবী বারীণ ঘোষের সহযোদ্ধা। তা হলেও প্রকাশনা ব্যবসায়ে এসে দু'জনেই এক সঙ্গে চলতে শুরু করে প্রথমেই কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থস্বত্ব কিনে ছাপতে শুরু করলেন। বিদ্রোহী কবির কলমের ডগায় তোপবর্ষণ হতেই ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। লেখার মধ্যে আগুন। পাঠকের বুকের গভীরে দেশপ্রেমের তাপ। স্বাধীনতার লাভের জন্য আরও বড় রণাঙ্গন প্রস্তুতের আবাহন। কবিতা পড়ে পাঠকেরা হামলে পড়লেন। কবিও যে সৈনিক। নজরুলের বই বিক্রি হল দেদার। বই ব্যবসায়ে গোপাল দাস মজুমদার ফুলেফেঁপে না উঠলেও সিদ্ধিদাতা গণপতি বাপ্পাকে অনেকটা যে কাত করে ফেলেছেন সে কথা ঠিক। নতুন লেখকের প্রতি যে মরমী হাওয়া বইতে শুরু হয়েছিল তার মধ্যেই ছিল চিরনতুনের ডাক। নজরুল ইসলামের রচনা শুধু যে, একটি দিনের চেনার সীমানা পার হয়ে চিরদিনের হয়ে উঠেছিল। সৌভাগ্যের অংশীদারি হয়েছিলেন গোপাল দাস মজুমদারও। ভাল লেখা এবং লেখকের গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশ করে হই হই রই রই কাণ্ড। এমনকী অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম উপন্যাস 'আগুন নিয়ে খেলা' ছাপিয়ে অনেকের দৃষ্টি টেনে ধরেছিলেন। কিন্তু শতবর্ষের কাছাকাছি এসে মহাকালের চোখরাঙানির সামনে জেগে উঠতে পারেননি আগের মতো। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। সর্ব জীবে যা গতি।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

আমার মা

শ্রাবণী সেন





ওলো সই

মা সুমিত্রা সেনের কাছে গান শেখা থেকে গাট্টা... অকপটে কনিষ্ঠ কন্যা।

মা-মেয়ের খুনসুটি-খিটিমিটি

আর মিষ্টি খেয়ো না। একদম আলুর দিকে তাকাবে না। ছোট মেয়েকে নিয়ে মায়ের চিন্তার শেষ নেই। সারাদিন বকাঝকা। হ্যাঁ, এখনও আমি দুষ্টু-দস্যি-একগুঁয়ে। মায়ের কাছে রোজ বকুনি খাই। সব সময় আমার জন্য আতঙ্কে থাকেন মা। তিন-চার বছরের বাচ্চা ভেবে শাসন করেন। বকুনির ভয়ে মিষ্টি-আলু থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করলেও বেশিরভাগ সময়ই অবশ্য লুকিয়ে খেয়ে ফেলি। দু'জনে একসঙ্গে থাকি। একে অপরের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। খুনসুটি-খিটিমিটি আর গান নিয়ে আমাদের ভরা সংসার।

মায়ের গান শুনেই বেড়ে ওঠা। তবে ছোটবেলায় কখনও ভাবিনি শিল্পী হব। মা, স্বনামধন্য গায়িকা। বাড়িতে গানের ক্লাস, রেওয়াজ শুনে অভ্যস্ত হলেও নিয়ম করে গান গাইতে খুব বিরক্তি লাগত। মা ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখাতেন। আমাকে ধরে এনে বসানো হত। আমিও নাছোড়। হারমোনিয়াম ফেলে একছুট। লুকিয়ে পড়তাম। ঠিক খুঁজে খুঁজে কোনও আড়াল থেকে আমাকে বের করা হত। চেপে ধরে বসিয়ে তারপর চলত গান শেখানো। পড়াশোনা করতেও একটুও ভাল লাগত না। ফাঁকি মারতাম দেদার। আমার গান শেখা-পড়াশোনা নিয়ে প্রায়ই বাড়িতে রাগারাগি-অশান্তি হত। তখন মনে হত, বাড়ি ছেড়ে পালাই। মায়ের কাছে গাঁট্টা খাওয়া ছিল বাঁধাধরা। মায়ের হয়তো অনুষ্ঠান করে ফিরতে রাত হচ্ছে। আমি ক্রিম-পাউডার ঘরের মাটিতে ছড়িয়ে রাখলাম। কলিংবেল বাজতেই দৌড়ে মশারির ভিতর। মা আমার অকাজ আঁচ করেই সাবধানে ঘরে পা রাখতেন। তারপর বদমাইশির বহর দেখে ঠিক হত শাস্তি।

গান আর শাড়ি বেছে দেন মা

পরীক্ষার আগের দিন মা আমাকে পড়াতে বসতেন। কিছুই পারতাম না। আমার হাল দেখে মায়ের তখন রক্তচাপ ঊর্ধ্বগামী। প্রথমে বকুনি তারপর হতাশা পর্ব কাটিয়ে মা পুরো সিলেবাস পড়াতে শুরু করতেন। মায়ের সেই পড়ানোর জন্যই দিব্যি রেজাল্ট করতাম প্রত্যেকবার। দিদিকে নিয়ে বাবা-মা'র কোনওদিন টেনশন হয়নি। ও চিরকাল ব্রিলিয়ান্ট। যেমন গাইত তেমনই তুখোড় ছাত্রী। দিদির রেজাল্ট নিয়ে গর্ব করতাম। সবেতেই ফার্স্ট আমার দিদির সাফল্য, প্রায়ই বাড়িতে সেলিব্রেট করা হত। লোকজন আসতেন। আমার গুণপনা নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ ছিল গভীর। কিছুক্ষেত্রে দিদির সঙ্গে তুলনাও চলত। আমার কিন্তু এসব নিয়ে কোনও হেলদোল ছিল না। পাত্তা দিতাম না। দিদি আমার চেয়ে ন'বছরের বড় হলেও আমাদের দারুণ বন্ডিং।

কোনওদিন ভুলেও ভাবিনি গায়িকা হব। ভাগ্যের ফের একেই বলে। আমি কী করব তা নিয়ে মা কখনও জোর করেননি। আবার এই যে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইছি, দর্শক আমার গান পছন্দ করছেন তা নিয়েও কখনও উচ্ছ্বসিত হতে দেখিনি। আমরা গল্প করার সময় গান নিয়ে খুব কম কথা বলি। হয়তো কোনও অনুষ্ঠানে যাব, মা জিজ্ঞাসা করলেন, কী গান গাইবে আমি কিছু না ঠিক করে থাকলে উনি অনুষ্ঠানের বিষয় বুঝে আমার জন্য গান ঠিক করে দিলেন। অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পর জিজ্ঞাসা করেন, কেমন হল আমি বলি, ওই হল। ব্যস, এইটুকুই। তবে হ্যাঁ, মায়ের বেছে দেওয়া শাড়ি পরেই অনুষ্ঠান করতে যাই। এটা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমি ভীষণই ক্যাজুয়াল, বোহেমিয়ান। সাজ-শাড়ি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই না, কারণ আমার ভরসা মা রয়েছেন।

সুখে আমায় রাখবে কেন

গান নিয়ে কোনও সমস্যায় পড়লে তার সমাধানের খোঁজে আজও সবার প্রথমে মায়ের কাছে যাই। মা ঠিক করে দেন। রেকর্ডিংয়ের আগে হয়তো কোনও গান মাকে শোনালাম। ভাল না লাগলে সেটা স্পষ্ট বলে দেন। তারপর যতক্ষণ না মায়ের পছন্দ হচ্ছে ততক্ষণ উঠি না। আবার কোনও গান ভাল লাগলে বলেন, ভালই হয়েছে। গান নিয়ে ভাঙাগড়া আমার ভাল লাগে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি যেভাবে গাই তা পছন্দ করেন আট থেকে আশি। এতেই আমি খুশি। মিউজিক নিয়ে আমার এক্সপেরিমেন্ট মায়েরও ভাল লেগেছে। মায়ের গলায় আমার সবচেয়ে প্রিয় গান 'সুখে আমায় রাখবে কেন'। ভীষণ ভাল লাগে 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছো', 'সখি ভাবনা কাহা রে বলে', 'ওলো সই'। এগুলি মায়ের কণ্ঠ ছাড়া আর কারও কাছে শুনতে ভাল লাগে না। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কোন গানটা তোমার সবচেয়ে পছন্দের উত্তর এল, 'শ্রাবণের ধারার মতো'। এবার পুজোয় শ্রীমতী সুমিত্রা সেনের 'সখি ভাবনা কাহা রে বলে' গানটি পাঠককে ফিরে শুনতে বলব। আমার একটা নতুন সিডি প্রকাশ হচ্ছে, নাম 'কোন সমুদ্রের দেশ'। শ্রোতা-পাঠকদের জন্য এটাই পুজোর উপহার। এর সঙ্গে শুনুন 'ভানুসিংহের পদাবলী'।

এক চান্সে মায়ের পছন্দ

এ বছরের পুজো আমার কাছে স্পেশাল। লাকিও বটে। কারণ আমি যে শাড়িটা এবার মাকে দিয়েছি, সেটা মায়ের এক চান্সে পছন্দ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ প্রতিবার মায়ের জন্য শাড়ি কেনার পর বারবার যে অদলবদল করতে হয় সেটা এবার করতে হয়নি। শাড়ির ব্যাপারে মা ভীষণই খুঁতখুঁতে তারপর একটু কনফিউজডও। আগে দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করতেন। তখনও শাড়ি কিনে বাড়ি ফিরে হয়তো আর তেমন ভাল লাগল না, ব্যস অমনি পাল্টানোর জন্য দোকানে ছুটতে হত। বার দু'-তিনেক এরকম বদলাবদলির পর পছন্দের শাড়িটি খুঁজে পেতেন মা। এবার পায়ের ব্যথার জন্য দোকানে যেতে পারেননি। আমি একাই গিয়ে মায়ের জন্য তসরের শাড়ি কিনি। তসর মায়ের চিরকালের প্রিয়।

অনুলিখন : পৌষালী কুণ্ডু

ঝকঝকে বাবুঘাট

অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গার ওপারে, ভোর ভোর দরজা ভেজিয়ে চলে গিয়েছে যে-কৈশোরের প্রেম ঘুড়ি ওড়াবার দিন, মালতীফুলের বর্ষা কিংবা পুজোবার্ষিকীর কোনও গোপন মলাট বুকের ব্যথা আর বয়সের ভার নামিয়ে রেখে আমি তারই জন্য বাবুঘাটে দাঁড়িয়ে আছি ভাবছি, পুরনো শীতগুলো হয়তো এখনও হাতে লেখা চিঠি ও আদরের আশা করে ভাবছি, একটা ফেলে আসা দিন কিছুতেই সেকেন্ডে এক পয়সার মোবাইল কল হতে পারে না।

কিংবা ধোঁয়া পালটে দশ পয়সার এস-এম-এস হতে পারে না ময়দানের সব বন্ধু ঘাসপাতা বরং শিবপুর আব্দুল থেকে এপারে ছুটে আসছে যেসব শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস তাদের জন্য জল নয়, কাদা নয়, বানিয়ে দিতে হবে ঝকঝকে একটা বাবুঘাট, একটা মিলেনিয়াম পার্ক, একটা রিভার-সাইভ ওয়াক-ওয়ে কিংবা কলকাতা জায়েন্ট হুইল যেসব নিন্দায় প্রতিটি সন্ধ্যায় শিরীষের মতো এই শহরের দু'চোখের দৃষ্টি নেমে আসে মাটিতে সেই সব নিন্দার সামনে।

বরং মন্দিরতলা মৌরিগ্রাম হয়ে ধুলাগড় বাগনান হয়ে নৌকা পালটে ট্রলার উলটে নদীর স্রোতে কারখানার তেলকালি মেখে শুকনো ফুলের মতো যে ভেসে আসছে পুজোর এই ক'টা দিন তারই সঙ্গে শতদল, বাগবাজার, সিমলা, ২৩ পল্লি, সুরুচি, অগ্রণী, আজাদগড়, বাবুবাগান, চালতাবাগান, তেলেঙ্গাবাগান, জোকা, হরিদেবপুর, শ্রীভূমি, নাকতলা এক মণ্ডপ থেকে আর এক মণ্ডপে খুব বেড়িয়ে বেড়াব আর বহুদূর গিয়ে মনে হবে আজ, এতদিন পর কারও ছেড়ে যাওয়া হাতখানি আবারও পেয়েছি ....

অগ্নিবর্ণা : ১৪

ঋজুরেখ চক্রবর্তী



অনন্ত সত্যের গতি।

অবিরল চিনেছি তোমাকে,
অগ্নিবর্ণা,
ক্ষোভে আর কারুবাসনায়।
প্রতিটি দিনের ভগ্ন, ব্যর্থ, অপচয়িত নির্মাণে
সৃজনের বিমূর্ত সংশয়টুকু প্রাপ্তি শুধু,
এই জেনে
পাথুরে নদীর মতো বহে গেছে অরণ্যের স্বপ্নের সঞ্চয়।
তবু তুমি ডেকেছ স্বনামে।

অগ্নিবর্ণা
সমীপবর্তিনী থাকো মোহে ও নির্বেদে।
প্রতিটি দিনের আলোড়ন,
প্রতিটি রাতের ক্ষয়,
সবকিছু মিলেমিশে নিদ্রা সাজাই যদি অমায়িক,
তুমি থেকো অনুসারী ব্যক্ত আবাহনে।



অনন্ত সত্যের গতি।
পুনর্জন্ম, সেও তো অনন্ত!



এক রত্তির মেয়ে

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজপতি সমাজপতি তুমি কি আমায় চেনো,
গাছতলাতে বসে তুমি বিচার কেন কেনো?
এক রত্তির মেয়ে আমি, আলেতে সাইকেল চড়ি
লাল ফিতেতে সবুজ শাড়ি, দু'হাতে বই ধরি।

অঙ্ক করি, ভূগোল পড়ি, চারিদিকে গাছপালা
গ্রামের শেষে বটতলাতে আমাদেরই পাঠশালা।
আসতে যেতে, খেতের ধারে, দু'বেলাতেই থাকে,
মিষ্টি মুখে, লাজুক ছেলে, হাত নাড়িয়ে ডাকে।

কেমন করে বলি তাকে, সে আমার কেউ নয়,
সকাল সন্ধে তাকেই ভাবি, কেউ কি আমার হয়?
ইচ্ছে করে, আগুন জ্বালাই পাশের আখের খেতে
জ্যামিতি শিখি নতুন করে, লম্বা বর্গক্ষেত্রে।

হঠাৎ করে কী যে হল, কি যে হল মনে
আল পেরিয়ে নেমে এলাম সবুজ ঘন বনে
হঠাৎ করে তুমিও এলে আমার পিছু পিছু
হারিয়ে গেলাম সবুজ বনে, কথা কিছু কিছু।

বৃষ্টি এল আকাশ ভেঙে, ভিজল বই খাতা
তুমি আমি একলা বনে, একটাই তো ছাতা।
ছাতার ভেতর তুমি আমি, ছাতার ভিতর বই
দেখে ফেলেছে সমাজপতি, বিচার হল কই?

বটতলাতে সমাজপতি, বটতলাতে আমি
বটতলাতে বিচারপতি, দূরে দাঁড়িয়ে স্বামী
এক রত্তির মেয়ে আমি, "ভিন জাতেতে বেয়ে,"
সাহস তোর বড়ই বেশি, "সমাজ নেবে খেয়ে"।

একি বিচার সমাজপতি, রক্তাক্ত আমি—
ইজ্জত আমার নিল যারা, তারাই হল দামি।
এক রত্তির মেয়ে আমি, অনেক কম দামি
দিনের শেষে প্রেম আমার, ভিন জাতেরই স্বামী।

জগাখিচুড়ি

দীপ মুখোপাধ্যায়

শহরের হই চই কত রংচং
কেউ কেউ সাদামাটা রয়েছে বরং
এসব ফলাও করে পত্রিকা-টিভি
নতুন প্যাকেজে যেন ঘুরছে পৃথিবী।

চকচকে ন্যাড়ামাথা এক কানে দুল
ধারেআর ফুটানিতে বিলাসবহুল
গুগুলের দৌলতে কী প্রখর জ্ঞানী
কলসেন্টার থেকে মেলে জলপানি।

সুবাসিত ফেনা ওঠা ক্যাপুচিনো পান
মলগুলো হয়ে ওঠে প্রেম-উদ্যান
নিজের স্ট্যাটাস দিতে বড় উৎসুক
সেলফিতে ঠেসে দেয় রোজ ফেসবুক।

বর্ণালি বৈভবে দিন কাটে তার
বিয়ে নয়, ওরা বোঝে লিভ-টুগেদার
স্মার্টফোনে বায়বীয় থাকে বোলচাল
কখনও বা মুডঅফে বেহেড মাতাল।

কত কী লিখব আর? থমকায় পেন
ব্যাকবোনলেস কটা ফ্রায়েড চিকেন
নিজের মাতৃভাষা ভুলে গেছে প্রায়
পাড়ি দেবে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায়।

ভুরু কুঁচকিয়ে পাড়াপড়শী তাকান
ওরা নাকি বাংলার কৃতী সন্তান
খাঁই বাড়ে হাইফাই সবকিছুর-ই
অঞ্জলি লহ মোর জগাখিচুড়ি।



যন্ত্রণা

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলি খোকা,
এখনও শুনতে পাই,
বলছে সবাই,
হাঁটি হাঁটি পা পা,
ছুটতাম আমি তোর পিছু পিছু,
মাথা করে নিচু,
হাতে নিয়ে দুধের গেলাস
যদি তুই দয়া করে খাস।
ধুলো মাখা পায়ে।
ময়লা জামা গায়ে
হাঁটতিস এলো মেলো,
কোথা গেল সেই সব দিন গুলো।
মনে পড়ে,
মাঠে গিয়ে খেলতিস ছুটো ছুটি খেলা,
আকাশে মেঘের ভেলা,
এই বুঝি শুরু হল বৃষ্টির বেলা,
তখন শুরু হত হাঁকাহাঁকি,
ফিরে আয় খোকা।
ভিজে যাবি, জ্বর হবে,
ভাল তোকে যাবে নাকো রাখা।
মনে পড়ে,
আকাশের ঘুড়ি দেখে
উঠতিস চেঁচিয়ে,
'আইট, আইট'
বাড়িতে ফেরাতে তোকে
শুরু হত তোর সাথে
মিছিমিছি ফাইট।

মাঠ থেকে ফিরে,
তোর জামার পকেট হাতড়িয়ে,
মিলতো ঘাসফুল, ব্যাঙের ছানা,
চকলেট, মটরের দানা।

কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলি খোকা,
এখন ঘুড়িকে বলিস 'কাইট'।
তোর জামার পকেটে থাকে
পোড়া বিড়ি, ডেনড্রাইট।

এ কেমন যন্ত্রণা
বড় হলি, জানলি না
কাকে বলে বড় হওয়া।
স্মৃতির আকাশে জামকালো মেঘ
বৃথাই তোকে নিয়ে এতকথা কওয়া!



চোখ

সমরেন্দ্র সরকার

ছেলেটার ছোট থেকেই চোখ খারাপ; তখন পাওয়ার মাইনাস নয়। অঙ্কে তুখোড় তবু হল না ইঞ্জিনিয়ারিং।
এরপর রাজনৈতিক ডামাডোল; চোখের বয়স সতেরো। অচেনা লোকের ভীড়ে, ও চিনে নিত— কে পুলিশের গুপ্তচর!
সাতাশ বছর বয়সে সেই চোখ নিয়েই মেডিকেল টেস্ট। ছেলেটা বুঝেছিলো— সরকারি চাকরিটা এবার হচ্ছেই।
তারপর ২০০৬; চোখের বয়স পঞ্চান্ন; মহিয়সী নেত্রীকে দেখে অভিভূত ঘণ্টা দুয়েক। বললেন— ইনি-ই হবেন বাংলার পরবর্তী কর্ণধার।
ছেলেটার চোখ সত্যিই কতটা খারাপ ছিলো— আপনারাই ভাবুন।।



গল্প

জীবনের মিনিয়েচার

রবিশংকর বল



সে শুনেছিল, শহরটা সব সময় আবছায়ায় ঢাকা থাকে; পথঘাট, পুরনো সব বাড়িগুলোয় ধুলোর চাদর, যেন ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে দেখছ শহরটাকে। সীমান্তের কাছাকাছি বলেই হয়তো শহরটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার ইচ্ছে হয় না কারও। এইরকম এক একটা শহর ঘুরেফিরে দেখতে ইচ্ছে করে তার।

সীমান্তবর্তী কয়েকটা ধূসর শহর আগে সে দেখেওছে। কিন্তু এ শহরে ট্রেনটা এসে পৌঁছয় এমন ভোরবেলা যখন নক্ষত্ররা আকাশ থেকে হারিয়ে যায়নি, চাঁদ দেখা যায় কি যায় না। আর সে যেহেতু ডিসেম্বরের ভোরে এসে পৌঁছল, যখন কুয়াশা অন্ধকারকে ঘন করে তোলে, ফলে শহরটার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাবারও সুযোগ রইল না।

মেন স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক পা হেঁটে তাকে ন্যারোগেজ স্টেশনের দিকে যেতে হবে। ওখানেই খেলনা ট্রেন অপেক্ষা করে আছে। রক্তের মতো টকটকে লাল ট্রেন, কাচ ঢাকা বড় বড় জানলা। ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে সে ছবিটা দেখতে পেল, সবুজ অরণ্যঘেরা পাহাড়ি পথে লাল ট্রেনটি চলেছে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, কখনও পাহাড়ি কুয়াশা, কখনও হালকা বৃষ্টি এসে আবছা করে দিচ্ছে ট্রেনটিকে।

এই ট্রেনের যাত্রীদের বেশিরভাগই বিদেশি— ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান জেনেও সে টিকিট কেটেছিল এ কারণেই যে ট্রেনটিতে যেতে যেতে মনে হয়, তুমি কোনও গাড়িতে বসে নেই, নিসর্গের স্রোতে ভেসে চলেছ। যেন একটা স্ক্রোল পেন্টিং-এর মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া? তুষারের দেশে শেষপর্যন্ত যখন সে চলেছেই, তখন তো এভাবেই যাওয়া উচিত। সে তো বেড়ানোর জন্য যাচ্ছে না, কোনও অভিজ্ঞতার জন্যও নয়, তার মনে হয়েছিল, ওই তুষারের দেশে গেলে এমন এক সৌন্দর্যের মুখোমুখি হবে, যার স্মৃতি নিয়ে বাকি জীবনটুকু বেঁচে থাকা যায়। ওই তুষারের দেশেই তো দুশো-আড়াইশো বছর ধরে এমন সৌন্দর্যের জন্ম হয়েছে, যা পাখির চোখে ফুটে ওঠা প্রতিবিম্ব। ওই তুষারের দেশেই তো সেই নায়িকা আছে, যার সঙ্গে চিত্রে, স্বপ্নে বা মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে পারে।

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে প্রথম সে এই সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যাওয়ার পথে সে মেঝেতেই শুয়ে পড়ে। আর কিছু মনে নেই। তাকে কয়েকটা দিন নার্সিংহোমে কাটাতে হয়। ডাক্তারের মতে, মাথায় ছোটখাটো রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে। ডানদিক অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মাস ছয়েকের বেশি বিছানায় শুয়ে থেকে, ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্যে সে আবার উঠে বসতে পারে এবং তার পর হাঁটাচলাও শুরু করা যায়। চিকিৎসা-পর্বেই ওই সৌন্দর্য তার জীবনে এসেছিল আর যতই সে সৌন্দর্যের শিরা-উপশিরার পথে চলেছে, থেমেছে, চলেছে, থেমেছে, আবারও চলেছে, ততই সে স্থির নিশ্চিত হচ্ছিল, তুষারের দেশে তাকে যেতেই হবে। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো সৌন্দর্যকে দেখা নয়, এই জীবনে একটি সৌন্দর্য তাকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। আবারও যদি মাথা তার সঙ্গে বেইমানি করে, তাকে যদি বিছানাতেই আশ্রয় নিতে হয়, তবু ওই সৌন্দর্যকে ছুঁয়েই সে বাকি কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারবে।

এই বিকেলে, যখন শয্যাগত, ঘুম ভেঙে গেল সে তার বিছানার কাছে সোফায় বসে থাকা গীতিষার দু'হাতে উন্মোচিত একটি বই দেখতে পায়। এই মেয়েটি, গীতিষা—তার নার্স—তার চেয়ে অন্তত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছোট। গীতিষা সকালের ডিউটিতে আসার পর থেকে তার ঘরে একটা শান্ত নদী—সে কি চন্দননগরের সেই সরস্বতী, যা আজ মরে গেছে—বয়ে যেত, আর সন্ধ্যায় সে চলে যাওয়ার পর জেগে থাকত শুকনো নদী খাত।

মনে আছে, এক একদিন দুপুরে গীতিষার সঙ্গে তার পিরামিডের ভিতরে চলাফেরার মতো কথা হত, সেইসব কথাবার্তা মাঝে কত হাজার হাজার বছরের স্ফিংক্সের ছায়া এসে পড়ত। যেন তারা দু'জন নয়, কোনও রহস্যকাহিনির অচেনা চরিত্ররা, এক গোপন গর্ভগৃহে বসে কথা বলে যেত :

'আপনি একটা প্রেমের গল্প লিখতে পারেন না?'

'আমি একজন হত্যাকারীর গল্প লিখছি।'

'প্রেমের গল্প লেখেন না কেন?'

'তুমি আমার গল্প পড়েছ গীতিষা?'

'অনেক।'

'কবে পড়লে?'

'যবে থেকে আপনার বাড়িতে আসছি। দুপুরে তো আপনি ঘুমিয়েই থাকেন। তখন আমি আর কী করি? এখানে ওখানে হাতড়াই। সেভাবেই আপনার কয়েকটা বই, পত্রিকায় ছাপা গল্প পড়ে ফেলেছি।'

'আগে পড়তে?'

'না। গল্পটল্প পড়তে আমার ভাল লাগে না।'

'কেন?'

'খুব চালাকি থাকে?'

'কীরকম?...কীরকম চালাকি?'

'সে আমি জানি না।'

'তাহলে কবিতা পড়তে বুঝি?'

'না।'

'কেন?'

'আপনি এ বার মৌসম্বির রসটা খেয়ে নিন।'

'আমি কতদিন বলছি, এ সব খেতে ভাল লাগে না। রোজ আমি আমাকে গেলাচ্ছ।'

'খাওয়া দরকার।'

'আমি আবার কবে উঠে দাঁড়াতে পারব বলো তো? এই বিছানায়।'

'অনেকে আপনার আগেই উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু আপনি তো ভীতু প্রকৃতির—'

'আমি ভীতু?'

'ভীতু নন? ডাক্তারবাবু যেসব এক্সারসাইজ করতে বলেছেন, ক'টা করেন? একটু ব্যথা পেলেই...। এক্সারসাইজ করতে গেলে ব্যথা লাগবে। সেটুকু সইতে পারলেই না উঠে দাঁড়াতে পারবেন।'

'এই রকম মানুষকে ভীতু বলে বুঝি?'

'তাহলে কী বলে?'

'কিন্তু গীতিষা...'

'ভীতু ছাড়া কী বলে?'

'বাদ দাও এসব কথা। তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। আমরা কেউ কোথাও পৌঁছতে পারব না। আচ্ছা, আমাকে ভীতু বলা যায়। তুমি খুশি তো?'

'আমাকে খুশি করার জন্য বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে খুশি করার জন্য নিজেকে ভীতু বলছেন?'

'ক্ষতি কী? চারপাশের মানুষকে খুশি করতে পারলেই টিকে থাকা যায়।'

'আমি আপনার নার্স। আমাকে খুশি করার কী দরকার?'

'দরকার আছে। অ্যাক্সিডেন্টালি তুমি আমার নার্স। অন্যরকম দুর্ঘটনা ঘটলে তুমি হয়তো আমার স্ত্রী হতে। এদের সকলকেই খুশি রাখতে হয়।'

'একেই বলে চালাকি।'

'কী?'

'গল্পে যেমন চালাকি থাকে।'

'তবু তুমি আমার গল্প পড়লে?'

'আপনি ঘুমিয়ে থাকেন। আমার তো কিছু করার থাকে না। জেগে থাকতে হয়। বাড়িতে টিভিও রাখেননি যে সিরিয়াল-টিরিয়াল দেখব।'

'আমার গল্প পড়ে কী মনে হল তোমার?'

'দমবন্ধ হয়ে আসে।'

'কেন?'

'এত খুনের গল্প কেন লেখেন আপনি? আপনার কি খুন করতে ইচ্ছে করে?'

'জানি না।'

'তাহলে এত খুনের গল্প লেখেন কেন?'

অনেকদিন আগে একটা ছবি দেখেছিলাম। এক দীর্ঘ দেওয়াল। তার পাশে এক নারীর মুখ শুধু, যেন প্লাস্টার অব প্যারিস দিতে তৈরি। কপাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্তের ধারা। যেন কেউ গুলি করেছে তার কপালে। তার পর থেকে শুধু খুন, খুনিকে খোঁজা...'

'এ বার আমি যাই।'

'কোথায়?'

'আপনি এ বার ঘুমোবেন।'

'আজ দুপুরে জেগে থাকব।'

'কেন?'

আপনার চালাকিটুকু পুঁজরক্তমাখা গজের মতো ফেলে দেব।'

'আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

'বাজে কথা ছাড়ুন। গল্পটা বলুন।'

'বিশ্বাস করো, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। এক-একটা গল্প তো একটা জীবনের মতোই। কত পুঁজরক্ত সেখানে থাকবে। তুমি তা দেখবে, তারপর ছুড়ে ফেলে দেবে। শুধু এই কথাটাই জেগে থাকবে : "জীবন এখন অনেক বেশি সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা"।'

'কথাটা কোনও একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম।'

'স্বাভাবিক। জীবন একটা বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কী-ই বা।'

'আপনি কি এখন এই সব কথা বলবেন?'

'কী কথা?'

'শুনেছি লেখকরা জীবন-মৃত্যু এই সব নিয়ে অনেক কথা বলে।'

'না, না আমি তোমাকে গল্পটা বলব। কিন্তু, বলো, গীতিষা আমার একটা গল্প পড়ে দমবন্ধ হয়ে আসার পরেও তুমি অন্য গল্পগুলি পড়লে কেন?'

'বললাম তো, আপনি ঘুমিয়ে থাকেন, আমার কিছু করার থাকে না, তাই পড়ি।'

'এমনি এমনি?'

'হ্যাঁ, এমনি এমনি।'

'দমবন্ধ হয়ে আসে, তবুও পড়?'

'কত কিছুতেই তো দমবন্ধ হয়ে আসে, তবু সেসব করতে হয়। গল্প পড়া এমন আর কী।'

'তা হলে গল্পটা শোনো।'

'বলুন।'

'একটা লোক সেরিব্রাল অ্যাটাক হওয়ার পর আর বিছানা থেকে উঠতে পারে না। তার দেখাশোনা করে একজন নার্স। সে সকালে আসে, সন্ধ্যায় ফিরে যায়। লোকটা তো শুয়েই থাকে, বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে, তাই নিয়মমাফিক সেবার কাজটুকু বাদ দিলে নার্সের কিছুই করার থাকে না। সে বারান্দায়, এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে বেড়ায়, কখনও চুপচাপ বসে থাকে।'

'সে কী ভাবে?'

'কে?'

'নার্সটি।'

'জানি না।'

'তার পর?'

'হঠাৎ সে একদিন একটা বাক্সের ভিতরে অনেকগুলি খাতা খুঁজে পেল। এবার রোগীর পাশে এই খাতাগুলিই নার্সের সারাদিনের সঙ্গী হয়ে উঠল। খাতাগুলোর মধ্যে গল্পের অনন্ত প্রবাহ। দীর্ঘ গল্পের ভিতরে একটার পর একটা খুন হয়ে যাচ্ছে। কেন এত খুন, তার কোনও কারণ নেই। বেশ কয়েক মাস চলে গেল গল্পটা শেষ করতে। কিন্তু গল্পের শেষে সে কোনও খুনিকে খুঁজে পেল না। আর তার মনে হল, গল্পের সব চরিত্রগুলিই খুনি। এ ওকে খুন করছে। অসহায়ভাবে খুন করছে। যেন তাদের প্রত্যেকের খুনি হয়ে ওঠাই ভবিতব্য। গল্পটা যে দিন শেষ হল, সেদিন বিকেলে রোগীর পাশে বসে সে জিজ্ঞাসা করল, এত বড় খুনের গল্পটা আপনি লিখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন এত খুন?'

'আমি জানি না।'

'আপনার পৃথিবীতে কেউ কারও হাত ধরে না? কেউ কাউকে ভালবাসে না? কেন ভালবাসে না? বলতে বলতে সেই নার্স তার কাপড়ের ভিতর থেকে বের করে আনল একটি ছুরি, আমূল বসিয়ে দিল রোগীর বুকে। লোকটি সামান্য হেসে বলল, এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পটা শেষ হল। বাক্সের ভিতরে আমি এই লেখা রেখেছিলাম। এই জন্যই কেউ না কেউ বাক্সটা খুলবেই, গল্পটা তাকে পড়তে হবে, আর তার পর সে আমাকে খুন করবেই।'

'আপনি এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'কেন?'

'ঘুম পাচ্ছে না?'

'তুমি কী করবে?'

'আমি আর একটা গল্প পড়ব।'

'আরও একটা খুনের গল্প?'

'দুপুরটা বেশ উত্তেজনায় কেটে যায়।'

'কেউ কখনও তোমার হাত ধরেনি? তোমাকে ভালবাসেনি?'

'মনে নেই। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। ও ঘরে একটা খুনের গল্প আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

গীতিষার কোলেই, দুই করতলের মাঝে খোলা ছিল বইটি, আসলে রয়্যাল সাইজের ছবির একটি মনোগ্রাফ; খোলা পৃষ্ঠার উপর ঝুঁকে পড়ছিল গীতিষার মুখ, যেভাবে পথ চলতে চলতে মুখ ধোয়ার জন্য নদীর কাছে নেমে আসে মানুষের মুখ, এমনই মনে হয়েছিল তার। সত্যি বলতে কি, বইটিও নয় সেই বিকেলে ঘুম ভেঙে, গীতিষার দিকে তাকিয়ে সে প্রথমে থোকা থোকা রং দেখতে পেয়েছিল, তার পর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওই মনোগ্রাফ।

এর পর মাসখানেকেরও বেশি গীতিষার সঙ্গে সারাটা দিন যেন ছবি-ভরা গ্যালারির পর গ্যালারি পেরিয়ে যাওয়া। গীতিষা ছবির নতুন নতুন অ্যালবামগুলি নিয়ে এসেছিল—গাড়োয়াল পেইন্টিংসে, গুলের পেইন্টিংসে, বাশোলি পেইন্টিংসে, কাংড়া মিনিয়েচার্স—পাহাড়ে, তুষারের দেশে জন্ম নেওয়া ছবির পর ছবি, নায়িকাদের ভাব-বিভাব, মান-অভিমান, সঙ্গীতের রাগিণী, ক্রমপরিবর্তমান বারো মাস, শ্রীকৃষ্ণের জীবন, গোপীবিলাস, রাসলীলার সব ছবি। অ্যালবামগুলি খুলে গীতিষাই তাকে ছবি দেখাত; তাদের হাত মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যেত; এক একদিন তার

মুখ ছুঁয়ে যেন গীতিষার চুল; তার মনে হত, এত ঠান্ডা চুল সে কখনও স্পর্শ করেনি। গীতিষা যখন অ্যালবামের পৃষ্ঠা ওল্টাত, সে ছবির সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিত মেয়েটির রক্তাভ আঙুল; তখন ধীরে ধীরে সে উঠে বসছে, তার মনে হত, এই মেয়েটির তর্জনিতে সে স্মৃতির মতো থেকে যাবে।

এক সন্ধ্যায় চলে যাওয়ার সময় গীতিষা তাকে বলে, 'আমি কাল থেকে আর আসব না।'

'কেন? কেন? কেন? তিনবার শব্দটি উচ্চারণ করে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়।'

'আমাকে অন্য জায়গায় ডিউটি দেওয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'আপনি তো ভাল হয়ে গেছেন।'

'কিন্তু তুমি এখানেই থাকবে।'

'তা হয় না। আমাদের কোম্পানি যখন যেখানে ডিউটি দেবে—'

'আমি তোমার কোম্পানিকে বলব।'

'না।'

'কেন?'

'আপনার চেয়ে অন্য কেউ বেশি অসুস্থ—তার কাছেই আমাকে যেতে হবে।'

'কিন্তু ছবিগুলি আমাকে কে দেখাবে? শুধু তো ফিজিওথেরাপিস্ট নয়, ওই মিনিয়েচার পেইন্টিংগুলি দেখতে দেখতে আমি ভাল হয়ে উঠছি। তুমি চলে গেলে—'

'আপনি নিজে দেখবেন।'

'বইগুলো তো তুমি নিয়ে যাবে।'

'না।'

'কেন? ওগুলো তোমার বই।'

'আমি আপনার জন্যই এনেছিলাম।'

'আমার জন্য কিনে এনেছ?'

'কিনে আনিনি। আমার বাবার লাইব্রেরির বই। মনে হয়েছিল, আপনার কাজে লাগবে।'

'এই প্রথম সে হাত বাড়িয়ে গীতিষার হাত ধরেছিল।'—তুমি না এলে—'

'আমরা বেশিদিন কোথাও থাকতে পারি না।'

'কেন?'

'কেউ সুস্থ হয়ে গেলেই অন্য একজন অসুস্থের কাছে চলে যেতে হয় আমাদের।'

'আমি তো সুস্থ হইনি।'

'হাঁটাচলা তো করতে পারছেন। এখন আর আমাকে দরকার নেই।'

'কে বলল?'

'আমাদের কোম্পানি।'

'তোমাদের কোম্পানি বললেই আমি সুস্থ?' তার মুখ রাগ ও বিরক্তিতে মুখোশের মতো হয়ে যায়। গরগর করে বলে, 'টাকা তো আমি দেব।'

'আপনি ভুল করছেন।' গীতিষা হাসে।

'কী?'

'ওরা চায় না, পেশেন্টের সঙ্গে আমাদের কোনও রিলেশন তৈরি হোক।'

'কেন?'

'আমরা ডেইলি-পেড লেবারার।'

'তাহলে চাকরিটা ছেড়ে দাও।'

'কী করব?'

'এখানে থাকবে।'

'আপনি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছেন।'

সে গীতিষার—যে তার সন্তানের বয়সি প্রায়—মেয়েটির কথায় হেসে ফেলে। বলে, 'বুড়ো হওয়ার কী লক্ষণ?'

'কোনও একজনকে আঁকড়ে ধরা।'

'আমি তোমাকে আঁকড়ে ধরেছি মনে কর?'

'তা হলে?'

'তুমি পাশে থাকলে ভাল লাগত। একটা যোগাযোগ তৈরি হয়ে গেছে, এই আর কী। তবু একটা অনুরোধ তোমাকে করব। আজ রাতে তুমি এখানে থেকে যাও।'

'কেন?'

'আমরা আজ এক সঙ্গে ডিনার করব। অনেকদিন প্রিয় খাবার খাইনি। কোনও রেস্তোরাঁ থেকে আনিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আর একটু ড্রিঙ্কস।'

'ড্রিঙ্কস? আনা বারণ।'

'কিন্তু তুমি যদি থাক—'

'থাকব।'

'তাহলে ড্রিঙ্কস চাই।'

'কেন?'

'আজ সারারাত তোমার সঙ্গে গল্প করব।'

'ঘুমোবেন না?'

'না।'

কিন্তু বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেনি সে; তারপর একসময় ভেঙে গিয়েছিল, আলো জ্বালিয়ে সে দেখেছিল, মেঝেতেই শুয়ে আছে গীতিষা; তার পাশে গিয়ে বসেছিল, গীতিষার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়েছিল সে উষার মুখ দেখতে পাচ্ছে। বনাসুরের মেয়ে উষা। এক রাতে স্বপ্নে উষা এমন একটি যুবককে দেখতে পেল, যার চোখ থেকে সারাজীবনেও সে চোখ ফেরাতে পারবে না। পরদিন সকালে উষার সখী চিত্রলেখা তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার? এমন উন্মনা কেন? চিত্রলেখা ছবি আঁকত। উষা তাকে স্বপ্নে দেখা যুবকের কথা বলল, যার চোখ পদ্মের মতো, যার পরনে হলুদ বসন। উষা বলেছিল, সখী, আমাকে অতৃপ্ত রেখে আমার ঠোঁট থেকে মধুপান করে গেছে সে। আমি তাকে দেখতে চাই। তাকে না পেলে সমুদ্রের গভীরেই শয্যা পাতা হবে আমার। চিত্রলেখা তখন দেখা-অদেখা সব রাজপুত্র, গন্ধর্ব, দেবতাদের ছবি আঁকতে শুরু করল, আর এক-একটি ছবি দেখিয়ে উষাকে জিজ্ঞেস করে, দেখো, দেখো, এই কি সেই পুরুষ? শেষ পর্যন্ত চিত্রলেখা এঁকে ফেলতে পারল উষার দয়িতার ছবি—সে দ্বারকার প্রদ্যুম্নের ছেলে অনিরুদ্ধ। ছবি দেখে উষা চোখ নামিয়ে শুধু বলতে পারল, 'এই তো সে'। তার পর চিত্রলেখা দ্বারকায় গিয়ে ঘুমন্ত অনিরুদ্ধকে নিয়ে এল। ঘুম ভেঙে অনিরুদ্ধ অবাক হয়ে গেল, এ কোথায় সে? আর তার পরেই সে দেখতে পেল উষাকে। এই মেয়েটিকেও সে যেন কবে দেখেছে। তার দিকে সে বাড়িয়ে দিল হাত।

গীতিষার মুখের দিকে তাকিয়ে সে গাড়োয়ালের অনামা শিল্পীর আঁকা ছবিটি দেখতে পাচ্ছিল; যেন মেয়েটির স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে সে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখেছিল, গীতিষা চলে গেছে; পাহাড়ি মিনিয়েচার ছবির বইগুলি টেবিলের উপর থাকে থাকে সাজানো রয়েছে।

নিবন্ধ

দুই মনীষীর খাদ্যরুচি

রানাপ্রতাপ দাস

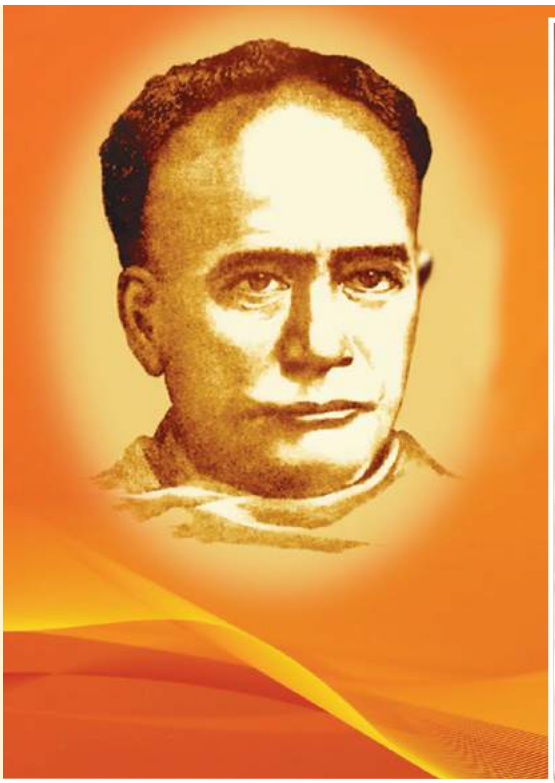



রাজা রামমোহন রায় আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দু'জনেই ছিলেন যুগান্তকারী সমাজসংস্কারক— আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় দুই মহতী ব্যক্তিত্ব। আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রবক্তা রামমোহনকে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও কর্মোদ্যোগের নিরিখে 'আধুনিক ভারতের জনক' বলে চিহ্নিত করা হয়।

আর ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ থেকে বেদান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করায় একদিকে যেমন বিদ্যার সাগর, তেমনি অন্যদিকে দয়ার সাগর হিসাবেও ছিলেন স্বমহিম। শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারের নানান কাজে সরকারি সাহায্যের পরোয়া না করে নিজের উপার্জিত টাকা তিনি ব্যয় করতেন নির্দ্বিধায়। অপরকে সাহায্য করতে গিয়ে কখনও কখনও নিজেকেই করেছেন ঋণগ্রস্থ। আমাদের সমাজে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এঁদের দু'জনের অবদান অসীম। তবু রামমোহনের বিশেষ কৃতিত্ব সহমরণ প্রথা রোধে আর ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবাবিবাহ প্রচলনে। নারী জাতির মঙ্গল ও মর্যাদার পক্ষে দুটোই ছিল যুগান্তকারী কাজ। রক্ষণশীলদের কতটা বিরুদ্ধাচারণ আর কী ভয়ঙ্কর সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে সে-সব কাজ করতে হয়েছিল এঁদের, আজকের দিনে তা কল্পনাতীত। ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।"

এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়—এই দুই বাঙালি মহানপুরুষের খাদ্যরুচি আর খাদ্যাভ্যাস। সময়টা বুঝতে সুবিধার জন্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখি। রামমোহনের জীবনকাল ১৭৭২ থেকে ১৮৩৩ সাল। আর ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের ব্যাপ্তি ছিল ১৮২০ থেকে ১৮৯১।

সংসদ 'বাঙালী চরিতাভিধান'-এ রামমোহন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে—"সেকালের ধনীদের প্রথামত জোব্বা ও চাপকান তাঁর পোশাক ছিল। পান-ভোজন ও বন্ধু ইত্যাদির কারণে গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে 'যবন' সন্দেহ করতেন।"

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার এক সভায় রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কথায় কথায় বলেছিলেন, "রামমোহনকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যেদিন শুনলাম তিনি একটা গোটা পাঁঠা একাই ভোজন করতে পারতেন, সেদিন থেকে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।"

রামমোহনের ভোজন ক্ষমতাকে এতটা সম্মান ও গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ও তাৎপর্য হল, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার নিজেও ছিলেন বেজায় ভোজন রসিক। কিন্তু তা অন্য কথা।

সুনীতিকুমারের মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়, রামমোহন নিছক একজন ভোজনরসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন রীতিমতো ভোজনবীর। এক-দু'কিলো নয়, গোটা একটা পাঁঠা হজম করনেওয়ালা রামমোহন চেহারায় ছিলেন সুপুরুষ, শালপ্রাংশু। সারাদিনে কম করেও বারো সের দুধ খেতেন। আমের মরশুমে অন্ত দেড়-ডজন আম সহযোগে নিয়মিত সারতেন প্রাতরাশ। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার 'বহর' সম্পর্কে এও জানা যায়— তখনকার সময়ে হুগলির মোক্তার গুরুদাস বসুর বাগানে একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন রামমোহন। অতিথির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গৃহকর্তা তাঁর লোককে গাছ থেকে টাটকা একটা ডাব পাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া মাত্র রামমোহন বলে উঠেছিলেন। 'আমি কি কলকাতার ভদ্রলোক যে একটা ডাব খেয়ে বলব, পেট ভরে গেছে? গোটা কাঁদিটাই পেড়ে নিয়ে এসো।"

তাঁর সম্পর্কে আরেকটি কিংবদন্তি : একবার নাকি তাঁকে এক ভদ্রলোক অনুরোধের সুরে বলেছিলেন, —এখন থেকে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন!

রামমোহন জানতে চাইলেন, কেন?

ভদ্রলোকটি বললেন, আপনি হিন্দুদের পুতুল পুজোর বিরোধিতা করছেন, তাই তাঁরা আপনাকে মারবে বলে ঠিক করেছে।

রামমোহন এক চোট হেসে বললেন, কলকাতার লোক আমাকে মারবে? বলছ কী! ওরা কী খায়?

হ্যাঁ, নিজের খাওয়ার ক্ষমতা নিয়ে গর্ব ছিল রামমোহনের। আমিষ খাবারের প্রতি একটু বেশি আসক্ত ছিলেন। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও বাড়িতে রাখা ছিল একজন মুসলিম বাবুর্চি। মাংসের বিশেষ বিশেষ পদ রান্নার জন্য সম্ভবত। এছাড়া, ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ মেলামেশার প্রভাবে মাঝে মাঝেই তিনি 'শেরি' পান করতেন। মদ্যপানের ব্যাপারে রামমোহন ছিলেন সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। কেবল ইউরোপীয় মানুষজন নয়, তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে, বিশেষ করে তাঁর বন্ধু তথা পথপ্রদর্শক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সঙ্গে রামমোহনের যে অন্তরঙ্গতার কথা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তা থেকে এটা সমর্থিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, "আমার স্মরণ হয় যে রাজা (রামমোহন) আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি মাংসাহার করি কি না। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি তোমার পিতাকে বলিও, প্রতিদিন আহারের সময়ে তোমাকে যেন কিছু মাংস দেওয়া হয়। রাজা বলিতেন যে, বৃক্ষমূলে জল সেচন করা আবশ্যক। নতুবা বৃক্ষ উপযুক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এই দেহের সম্বন্ধেও সেই রূপ।

ইতিহাসে অনুসন্ধানী হলে দেখা যাবে, ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ স্বয়ং এবং তাঁর ছোট ভাই রমানাথ তাঁদের কুলাচারগত নানান সংস্কার ও বিধিনিষেধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিলেন রামমোহনের সংস্পর্শে আসার পর। সেই থেকে ঠাকুরবাড়ির দু'ভাই-ই মদ-মাংস খেতে শেখেন এবং ক্রমে এইসব 'নিষিদ্ধ' আহারে তাঁদের বেশ রুচিও হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে এক স্মৃতিচারণায় রমানাথের স্ত্রী অকপটে জানিয়েছেন : "প্রথম যখন এঁরা মাংস খেতে শুরু করেন, এঁদের বমি হয়ে যেত। ক্রমাগত চেষ্টায় পর মাংস খাওয়া এঁদের অভ্যেস হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেশ দূরে উঠোনের এক কোণায় মাটির পাত্রে মাংস রাঁধা হত এবং রান্নার পর সে পাত্র বাড়ির বাইরে ফেলে দেওয়া হত। ক্রমে দুই ভাইয়ের সঙ্গে সায়েবদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা সাহেবদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খানা খেতে শুরু করলেন। আগে আগে খাবার রাঁধত আনন্দ ও পরমানন্দ নামে দু'জন ব্রাহ্মণ পাচক। এখন রামমোহনের সুপারিশে মুসলিম বাবুর্চি রাখা হল।"

এ থেকে বোঝা যায়, সেই সময় ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের খাদ্যরুচিতে রামমোহনের প্রভাব ছিল কতটা।

যাই হোক। এবার বাংলার আরেক সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খাদ্যরুচি-খাদ্যাভ্যাসের কথায় আশি।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন পাঠশালার ছাত্র, ছেলেমানুষ। সামনে সরস্বতী পুজো। তাঁর এক গুরু তাঁকে ডেকে বললেন, ঈশ্বর, শ্রীশ্রী সরস্বতী বন্দনা করে নতুন একটা শ্লোক লেখ দেখি।

ঈশ্বর ভাবে, একে বিদ্যার দেবী, তায় সাধারণ পদ্য নয়, লিখতে হবে দেবভাষায় শ্লোক—এ তো খুব সহজ কাজ নয়। ঈশ্বর রাজি হয় না, এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু গুরুও তাকে ছাড়েন না। চলতে থাকে পীড়াপীড়ি। অবশেষে বাধ্য হয়েই ঈশ্বর লিখে ফেলে অসাধারণ একটি শ্লোক :

লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্।।



> ইতিহাসে অনুসন্ধানী হলে দেখা যাবে, ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ স্বয়ং এবং তাঁর ছোট ভাই রমানাথ তাঁদের কুলাচারগত নানান সংস্কার ও বিধিনিষেধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিলেন রামমোহনের সংস্পর্শে আসার পর। সেই থেকে ঠাকুরবাড়ির দু'ভাই-ই মদ-মাংস খেতে শেখেন এবং ক্রমে এইসব 'নিষিদ্ধ' আহারে তাঁদের বেশ রুচিও হয়ে যায়।

অর্থাৎ, লুচি, কচুরি, মতিচুর, জিলিপি, সন্দেশ, গজা এইসব চমৎকার খাহার যার পুজোয় আমরা খেতে পাই, সেই সরস্বতীর নিরন্তর জয় হেক।

অনুমান করি, এই শ্লোকে মা সরস্বতী এতটাই প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, ভক্তটিকে বর দিয়ে একেবারে বিদ্যার সাগর করে দিলেন।

আসলে, ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লুচির খুব ভক্ত ছিলেন। লুচি পেলে লোভ সামলাতে পারতেন না। তা টাটকা-বাসি যেমনই হোক। লুচির প্রতি তাঁর এই আসক্তি বরাবর ছিল।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। সেটা ১৮৭৮ সাল। বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেবার এম.এ পাস করার পরপর লখনউ যাচ্ছেন সংস্কৃত পড়াতে। শাস্ত্রীমশাই ঠিক করেন, এতটা পথ একটানা না গিয়ে এক রাতের জন্য তিনি কার্মাটারে বিদ্যাসাগরের বাড়ি উঠবেন এবং সেখানে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-টা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একটু ঝালিয়ে নেবেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই মতো বিদ্যাসাগরের বাড়ি উঠে দেখেন, সেখানকার স্থানীয় কয়েকজন সাঁওতাল বিদ্যাসাগরের কাছে এসে তখন কিছু খাবার প্রার্থনা করছে।

তা দেখে হরপ্রসাদ তাঁর হাতের পোঁটলাটি সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, এতে কিছু বাসি লুচি আছে, পথে খাওয়ার জন্য এনেছিলাম, খাওয়া হয়নি, এগুলি ওদের দিয়ে দিন।

বিদ্যাসাগর পোঁটলা খুলে বেশ কিছুক্ষণ লুচিগুলি নানাভাবে নাড়াচাড়া করে যাচ্ছেন দেখে হরপ্রসাদ কৌতূহল ভরে জানতে চান, এমন করছেন কেন?

জবাবে বিদ্যাসাগর, যিনি দয়ার সাগর বলেও পরিচিত, খ্যাত, লজ্জার মাথা খেয়ে বলেন, বেছে বেছে দেখছি, কয়েকখানা লুচি রাখব, নিজে খাব।

রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগর যে খুব খেতেন বা খেতে পারতেন, তা নয়। কিন্তু বেশ খাদ্যরসিক ছিলেন। পাকা গিন্নিদের মতো হলুদ, লঙ্কা ইত্যাদি নিজে বেটে রান্নাও করতেন ভাল। সুযোগ পেলেই নিজে রেঁধে-বেড়ে অপরকে খাইয়ে আনন্দ লাভ করতেন। অতিথিকে প্রাণভরে খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁর রচিত মজার একটা শ্লোকও ছিল। সেটি এইরকম : হুঁ হুঁ দেয়ং হা হা দেয়ঞ্চ করকম্পনে।/শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে।।

এছাড়া বিদ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী হয়ে একটা 'ভোজন সমিতি' গড়েছিলেন স্রেফ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটিকে আনন্দমুখর করে তোলার জন্য। সেই ভোজন সমিতির উৎসাহী সদস্য ছিলেন তখনকার সমাজের বাঘা বাঘা সব মানুষ। যেমন, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য, প্রসন্নচন্দ্র রায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র।

খাদ্যরসিক বিদ্যাসাগর খুব বেশি খেতেন না, আগেই বলেছি, কিন্তু পছন্দের খাবার পেলে কখনও কখনও তা অন্যের পাত থেকে তুলে নিতে বা কেড়ে নিতেও কসুর ছিল না। যেহেতু তাঁর কোনও গোঁড়ামি ছিল না তাই এক্ষেত্রে জাত-পাতও মানতেন না তিনি।

এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের বাড়িতেই। হরপ্রসাদ তখন ছোট। বছর পাঁচ বয়েস। বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছেন তিনি তাঁর দাদাদের পড়ার বই থেকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত জানতেন না, স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁদের বাড়ি আসা-যাওয়া করেন।

তো, একদিন হরপ্রসাদের বাড়িতে নিন্দাসূচক মহা-শোরগোল এবং সেটা আসছে অন্দরের মেয়েমহল থেকে। কেউ বলছেন, কী কাণ্ড, এমনও হয় না কি! এমন তো কখনও শুনিনি। কেউ বলছেন, বামুনের ঘরের ছেলে হয়ে শেষে কায়েতের পাত থেকে তুলে খেল! এ যে ঘোর কলি দেখছি! ছ্যা, ছ্যা! জাত-ধর্ম কি তবে শিকেয় উঠল।—

ইত্যাদি ইত্যাদি এইরকম শুনে বালক হরপ্রসাদের রীতিমতো কৌতূহল হল— ব্যাপারটা আসলে কী? তিনি ছুটে গেলেন তাঁর মায়ের কাছে। জানতে চাইলেন, এত নিন্দা কীসের মা?— কে কার কাছ থেকে কেড়ে খেয়েছে?

মা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, জানিসনি, বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর! বামুনের ছেলে হয়ে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুইমাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে।

রুইমাছের মুড়োর প্রতি বেজায় আসক্ত, আপাত লোভী বিদ্যাসাগর আসলে, ছোট্ট এই ঘটনাটির মধ্যেও তাঁর জাত-পাত ভাঙার প্রবণতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ফিরে পড়া

হারানো কবিতা

মা-মাটি-মানুষের সাত কবি

সেই কবে, মধ্যযুগে, কবি চণ্ডীদাস উচ্চারণ করেছিলেন অমোঘ পঙ্‌ক্তিমালা। বলেছিলেন, 'শুনো হে মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই।" এর থেকে ধ্রুব সত্য আর কী হতে পারে! চিরায়ত-চিরকাল এ বাণী আজও আমাদের পথ দেখায়। বুঝতে পারি, মানুষের মহিমা।

আমাদের এই চলার পথটি নিষ্কণ্টক নয়। সমস্ত প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত অবশ্য মানুষেরই জয় হয়।

জন্মদায়িনী মা তো মাথায় আছেন। মাটিও আমাদের মা। সেই মাটির মহিমাও আমরা জেনেছি কবিদের কাছে। কবিরা সত্যদ্রষ্টা। যুগে যুগে তাঁরাই মানুষকে পথ দেখান, আলো-অন্ধকার চেনান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছিলেন, 'কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা'। সেই কবিদের কবিতার আলোকে আমরা মাটিকে জানার চেষ্টা, মানুষকে বোঝার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-পরবর্তী সময়ের এক বিশিষ্ট কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে/ যদি আমি মাটিকে জানতাম।'

মাটিকে, মানুষকে আমরা জানতে চাই কবিদের অনুভূতিতে। গত বছরের 'জাগো বাংলা'-র শারদীয় সংখ্যায় ছিল, কামিনী রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, বন্দে আলি মিয়া, জসীমউদ্দিন ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রাসঙ্গিক কবিতা। এবারের শারদীয় সংখ্যায় যাঁদের কবিতা সংকলিত হয়েছে, তাঁরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্র সমসাময়িক। এই কবিরা কেউই আর সেভাবে সিলেবাসের বাইরে পঠিত হয় না। তাঁরা নিতান্তই ছাত্রপাঠ্য কবি। এমনটি না হওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রায় বিস্মৃত এই কবিদের সংকলিত কবিতাগুলি পড়ে তাঁদের কাব্যসমগ্র পাঠে নিশ্চয়ই নতুন প্রজন্ম উৎসাহিত হবে। প্রতিটি কবিতাতেই মাটির কথা আছে, আছে মানুষের কথা, আছে জেগে ওঠার কথা।



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯১৩।

পিতা কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র। হুগলি কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর দ্বিজেন্দ্রলাল পড়াশোনা করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কৃষিবিদ্যা নিয়ে পাঠ নেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন বিলেতে।

চাকরিজীবনে কখনও সেটেলমেন্ট অফিসার, কখনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও বা ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড এগ্রিকালচার বিভাগে সহকারী ডিরেক্টর রূপে কাজ করেছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পরিকল্পক তিনি। শুধু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে নয়, সঙ্গীত ও নাট্য ও নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা'। এছাড়াও 'আষাঢ়ে' নামে একটি ব্যঙ্গ কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, 'মন্ত্র', 'আলেখ্য' ও ত্রিবেণী'। হাসির গান রচনায় তাঁর ছিল প্রশ্নাতীত পারদর্শিতা। এই গানগুলি নিয়ে একটি সংকলনগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যরচনাতেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'নুরজাহান', 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস', শাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' তাঁর লেখা মঞ্চ-সফল নাটক।



আবার তোরা মানুষ হ'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কিসের শোক করিস ভাই— আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।।
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু হোস্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ— আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;
ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর ;
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্ —ভণ্ড যে— তাহারে দূর করিয়ে দে—
সবার বাড়া শত্রু সে— আবার তোরা মানুষ হ'।।
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক ;
পুণ্যসেনা নিজেরে কর্ পাপের সেনা শত্রু হোক,
ধর্ম যথা সেদিকে থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্ — আবার তোরা মানুষ হ'।



রজনীকান্ত সেন

জন্ম ১৮৬৫, মৃত্যু ১৯১৩।

জন্ম হয়েছিল পাবনায়। পিতা গুরুপ্রসাদ গীতিকাব্যের চর্চা করতেন। পিতার দ্বারা উৎসাহিত ও প্রাণিত হয়ে রজনীকান্ত কাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, রাজশাহী কলেজ থেকে এফ-এ, সিটি কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর রজনীকান্ত বিএল পাস করেছিলেন। ওকালতি করতেন রাজশাহী কোর্টে। তাঁর গান একদা স্বাদেশিকতার মন্ত্রে বঙ্গবাসীকে উজ্জীবিত করেছিল। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—এমন আরও কত প্রেরণাদায়ী সঙ্গীতের রচনাকার রজনীকান্ত। রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে পছন্দ করতেন। অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী রজনীকান্তর জন্য কবি রাববার আকুলতা প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রন্থ, 'বাণী', 'অমৃতক', 'কল্যাণী', 'অভয়া', 'আনন্দময়ী', সদ্ভাবকুসুম', শেষদান' ও 'বিশ্রাম'।



মিলন

রজনীকান্ত সেন

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান!
ঐ দেখ্ ঝরছে মায়ের দু'নয়ান
আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ, বেদ কোরাণ!
(জাতিধর্ম্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসা বিদ্বেষ ভু'লে গিয়ে রে)
থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্যপান।
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের
দুধ খেয়ে বাঁচি রে)
আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে) (একই ভাতে
একই রক্ত ব'য়ে যায়)
এক ভাই না খেতে পেলে,
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ?
(এমন পাষাণ কেবা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা আছে রে)
বিলেত ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্।
(দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না) তার কাছে তো সবাই সমান রে)





অতুলপ্রসাদ সেন

জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯৩৪।

পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুরে। বাল্যে পিতৃহীন হয়ে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তর কাছে প্রতিপালিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার পর বিলেতে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। ব্যারিস্টারি পাস করে স্বদেশে ফিরে কলকাতা রংপুরে কিছুকাল আইন ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি স্থায়ীভাবে লখনউ শহরে চলে যান। লখনউতেই ব্যবহারজীবী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লখনউয়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'উত্তরা' নামে একটি চমৎকার সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা করতেন দূর-প্রবাস থেকে। অতুলপ্রসাদের খ্যাতি মূলত সঙ্গীতের জন্য। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর ও ঢং, বাউল ও কীর্তন গানের সুর কাজে লাগিয়ে বাংলা গানের এক নতুনতর ধারা তৈরি হয়েছিল তাঁর হাতে। একদা তাঁর গান মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরত। 'বল বল বল সবে শত বেণু বীণা রবে' বা 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর'— এইসব গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'কাকলি', 'কয়েকটি গান' ও 'গীতি গুঞ্জ' তাঁর সঙ্গীত গ্রন্থ।



হিন্দু-মুসলমান

অতুলপ্রসাদ সেন

দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে।
গলে গলে এনু মা, তোর
হিন্দু মুসলমান দু' ছেলে।
এসেছি মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে,
যাব না আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে।

অনুগ্রহে নাই মুকতি,
মিলন বিনা নাই শকতি,
এ কথা বুঝেছি দোঁহে—
থাকবো না আর স্বার্থে ভুলে।
থাকবে না আর রেষারেষি—
কাহার অল্প কাহার বেশি,
দু'ভাইয়ের যা আছে জমা
সঁপিব তোর চরণতলে।
দু'জনেই বুঝেছি এবার—
তোর মতো কেউ নেই আপনার ;
তোরই কোলে জন্ম মোদের,
মুদব আঁখি তোরই কোলে।

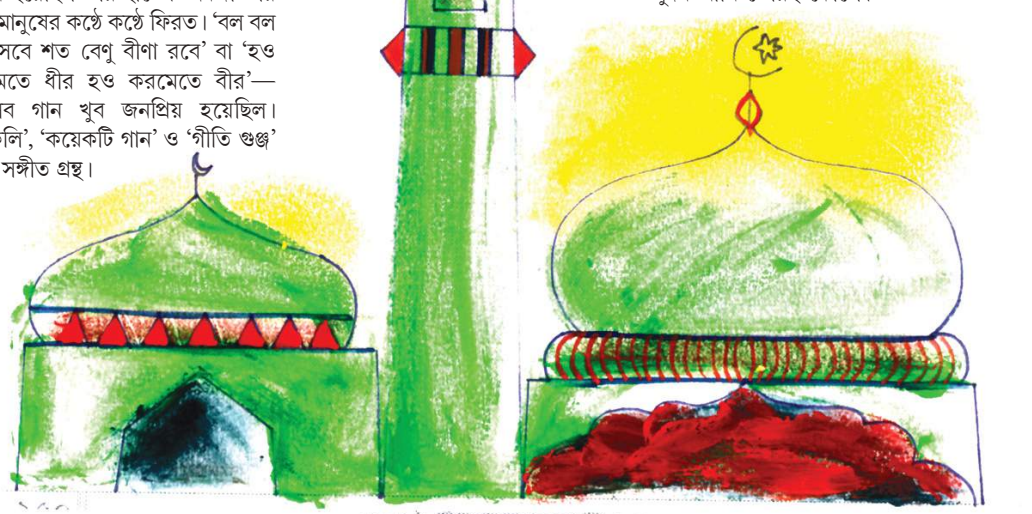

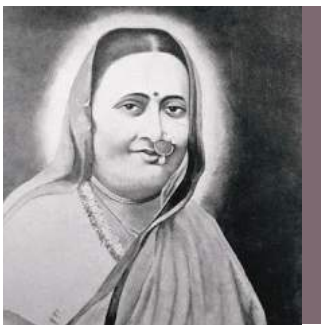

কুসুমকুমারী দাশ

জন্ম ১৮৭৫, মৃত্যু ১৯৪৮।

বরিশালের গৈলা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কবি জীবনানন্দ দাশের তিনি মাতা। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষক সত্যানন্দ দাশের সঙ্গে। দশম শ্রেণির বেশি তাঁর প্রথাগত শিক্ষা হয়নি, সারা জীবন ধরেই অবশ্য শিক্ষায় ও জ্ঞানচর্চায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। ছোটদের জন্য কবিতা লিখে সমকালে খুবই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে'—এই কবিতাটি প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছিল। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর অধিকাংশ কবিতাই 'মুকুল' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। 'মুকুল'-সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী সতত উৎসাহিত করেছেন তাঁকে। আরেকজন, সম্পাদক-লেখক তাঁকে প্রাণিত করেছিলেন। তিনি প্রবাসীর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 'প্রবাসী' ও বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় অজস্র কবিতা লিখেছেন। হয়তো তখন তিনি রন্ধনে ব্যস্ত, সেসময় সম্পাদক রামানন্দ এসে কবিতা দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হয়নি তাঁকে। এক হাতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে আর এক হাতে লেখা হয়ে গিয়েছে কবিতা। সমাজসেবামূলক নানা কাজেও যুক্ত ছিলেন কুসুমকুমারী।



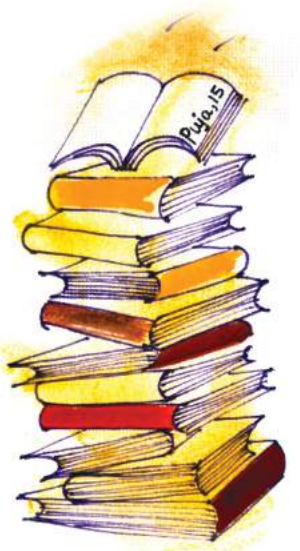

মনুষ্যত্ব

কুসুমকুমারী দাশ

এক দিন লিখেছিনু আদর্শ যে হবে
'কথায় না বড় হ'য়ে কাজে বড় হবে।'
আজ লিখিতেছি বড় দুঃখ লয়ে প্রাণে
তোমরা মানুষ হবে কাহার কল্যাণে?
মানুষ গড়িয়া ওঠে কোন্ উপাদানে ;
বাঙালি বোঝেনি তাহা এখনও জীবনে—
পুঁথি হাতে পাঠ শেখা—দু'চারটে পাশ
আজিকার দিন তাহে মিলে না আশ্বাস।
চাই শৌর্য, চাই বীর্য, তেজে ভরা মন
'মানুষ হইতে হবে' হবে এই পণ—
বিপদ আসিলে কাছে হবে আগুয়ান
দুই খানি বাহু বিশ্বে সবারি সমান—
দাতার যে দান তাহা সকলেই পায়
কেউ ছোট কেউ বড় কেন হ'য়ে যায়!
কেন তবে পদতলে পড়ি বার বার?
'মনুষ্যত্ব' জাগাইলে পাইব উদ্ধার—।
যত অপমান, যত লাঞ্ছনা পীড়ন
একতার বলে সব হইবে দমন!
তেজীয়ান, বলীয়ান সেই ছেলে চাই
সোনার বাংলা আজি হারায়েছে তাই।
আবার গাড়িতে হবে বীর শিশুদল,
বাংলার রূপ যাহে হবে সমুজ্জ্বল।





যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জন্ম ১৮৮৭, মৃত্যু ১৯৫৪।

বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পৈতৃক নিবাস ছিল নদিয়া জেলার হরিরুরে। শিবপুরের বিই কলেজ থেকে যতীন্দ্রনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছিলেন। কর্মজীবনে কাশিমবাজার এস্টেটে কাজ করেছেন। গদ্য সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা করলেও কাব্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের কবিদের অনুসরণ না করে তিনি নিজের মতো করে ভিন্নতর পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবি নিজস্ব আলোতে আলোকিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রয়েছেন সর্বাগ্রে। তাঁর লেখা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ, 'অনুপূর্বা', 'মরুমায়া', 'ত্রিযামা', 'সায়ম্', 'মরীচিকা' ও 'মরুশিখা'। জীবনের পড়ন্ত বেলায় যতীন্দ্রনাথ অনুবাদের কাজে মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। অনুবাদ করেছিলেন 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'কুমারসম্ভব' ও শ্রীমদ্ভগবাদগীতা।'

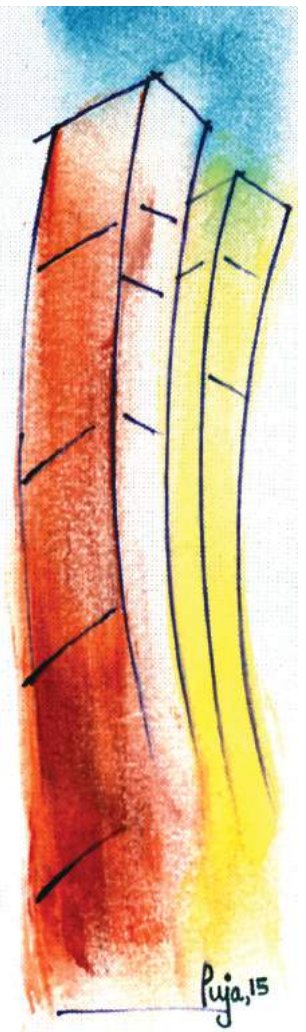



মানুষ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পাঁচনি লইয়া গোরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিক আঁটে !
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষানদী,
জুটে না পারের কড়ি ;
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি'।

ক্ষুধার অন্ন, পরণের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের করো গো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।

জ্যৈষ্ঠ দু'পরে গলদঘর্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কত-না ঝঞ্ঝামুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি ;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণীগর্ভে ধন ;
বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধূলা কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের শ্রদ্ধা করো,
তারা মানুষেরি ভাই।
শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুকু—
জুটে নাই হেন বাস,
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ,
যার নিরুপায় রূপের শিয়াল নিয়ত ঝরে
ঘর্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষ'পরে
লক্ষ দুঃখ ঝড় ;
মাঝপথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে নতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—
ঘৃণা কি কামনা কোরো না তাদের করো গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী!

নির্বোধ যারা, দুর্বোধ যারা পল্লিপারে,
অশ্লীল যার ভাষা ;
আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির নাবালক চাষা!
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে ;
বেতসের মতো সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি।।



মোহিতলাল মজুমদার

জন্ম ১৮৮৮, মৃত্যু ১৯৫২।

প্রথম জীবনে পড়াতেন স্কুলে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিলেন। কবি হিসাবেই তিনি শুধু সুপ্রতিষ্ঠিত নন, প্রবন্ধকার ও সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে তাঁর একটি সম্ভ্রমের আসন ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যে কয়েকজন কবি স্বাতন্ত্র্যে ও স্বকীয়তায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁদের একজন মোহিতলাল। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিভাত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর মতো তরুণ কবিরা কাব্য-জীবনের প্রথম পর্বে তাঁকেই আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার তৃতীয় পর্বে সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠেছিল ঐতিহ্যানুসারী। 'ভারতী' ও 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। সবসময় স্বনামে লেখেননি, কখনও কৃত্তিবাস ওঝা, কখনও সব্যসাচী, কখনও বা সত্যসুন্দর দাস ছদ্মনামেও লিখেছেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বিস্মরণী', 'স্বপন পসারী', 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল', 'স্মরগরল' ও 'হৈমন্ত-গোধূলি'। মোহিতলাল মজুমদারের প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক গ্রন্থে বরাবরই লক্ষ করা যায় এক নিজস্ব দৃষ্টিকোণ। তাই তাঁর প্রবন্ধ সমালোচনা চর্বিত-চর্বণ নয়,মৌলিকতার আলোয় উদ্ভাসিত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যবিচার', 'বাংলার নবযুগ', 'কবি শ্রী মধুসূদন', 'রবি- প্রদক্ষিণ' ও বাংলা কবিতার ছন্দ।

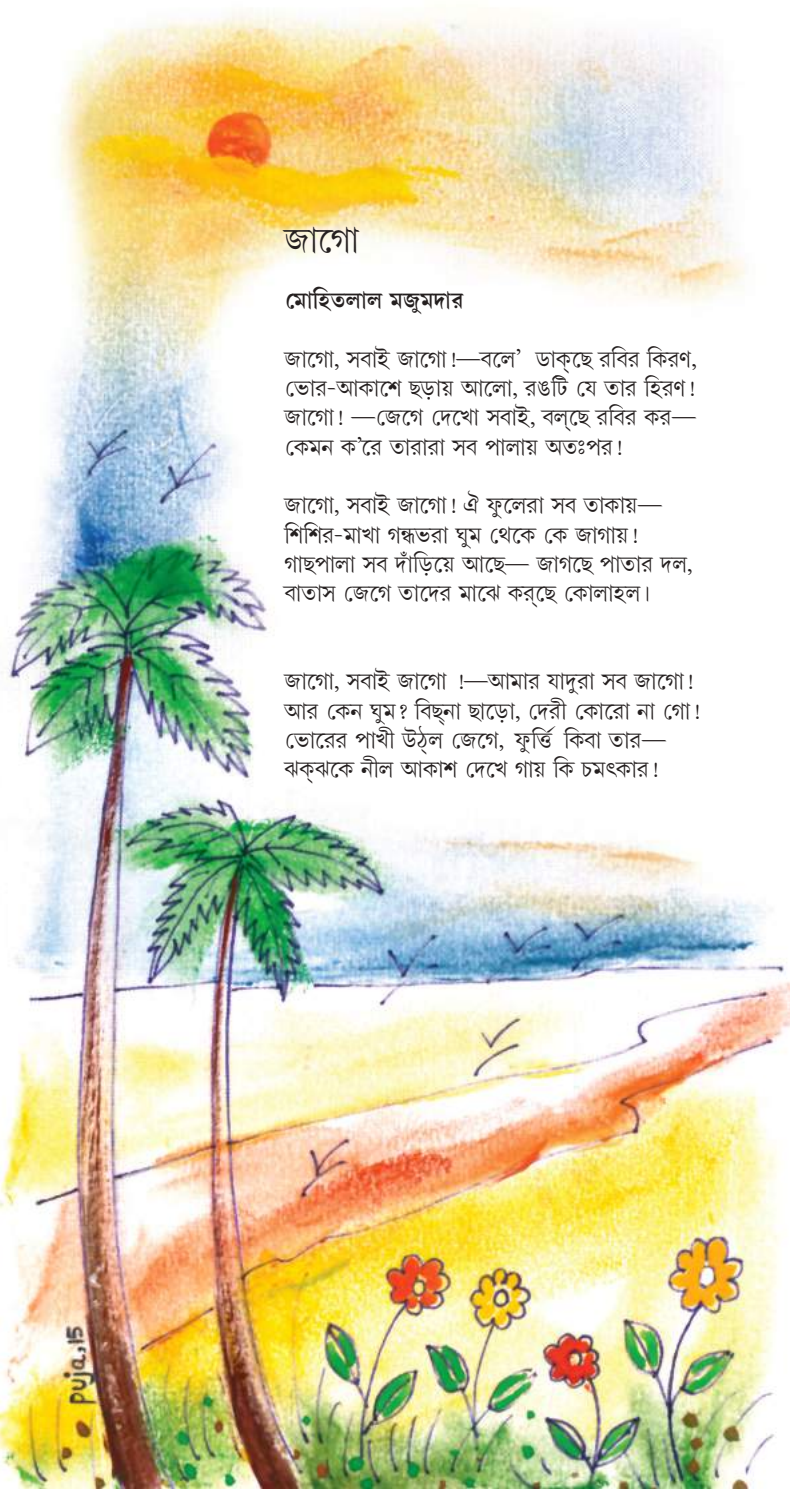

জাগো

মোহিতলাল মজুমদার

জাগো, সবাই জাগো!—বলে' ডাক্‌ছে রবির কিরণ,
ভোর-আকাশে ছড়ায় আলো, রঙটি যে তার হিরণ!
জাগো! —জেগে দেখো সবাই, বল্‌ছে রবির কর—
কেমন ক'রে তারারা সব পালায় অতঃপর!

জাগো, সবাই জাগো! ঐ ফুলেরা সব তাকায়—
শিশির-মাখা গন্ধভরা ঘুম থেকে কে জাগায়!
গাছপালা সব দাঁড়িয়ে আছে— জাগছে পাতার দল,
বাতাস জেগে তাদের মাঝে কর্‌ছে কোলাহল।

জাগো, সবাই জাগো !—আমার যাদুরা সব জাগো!
আর কেন ঘুম? বিছ্না ছাড়ো, দেরী কোরো না গো!
ভোরের পাখী উঠ্‌ল জেগে, ফুর্ত্তি কিবা তার—
ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ দেখে গায় কি চমৎকার!



গোলাম মোস্তাফা

জন্ম ১৮৯৭, মৃত্যু ১৯৬৪।

ওপার বঙ্গের যশোর জেলার মনোহরপুর গ্রামে জন্ম। উচ্চশিক্ষা কলকাতায়। রিপন কলেজ থেকে বিএ পাস করেছিলেন। শিক্ষকতা কর্মের প্রশিক্ষণ নিয়ে, বি.টি পাস করে সরকারি স্কুলে সহকারী শিক্ষকের চাকরি নিয়েছিলেন। পড়িয়েছেন বিভিন্ন সরকারি স্কুলে। এক সময়ে তিনি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে বাংলা পড়াতেন। সেসময় ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ তাঁর 'যখন ছোট ছিলাম' বইতে গোলাম মোস্তাফা কীভাবে ক্লাসে পড়াতেন, সে-বিবরণ দিয়েছেন। কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে তিনি চলে গিয়েছিলেন ফরিদপুরে। ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এই স্কুলেই তাঁর কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, অবসর গ্রহণ করেন। কবিতার পাশাপাশি তিনি গদ্য সাহিত্যেরও চর্চা করতেন। গদ্যে হজরত মুহম্মদের জীবনী রচনা করেছিলেন। সে-বইয়ের নাম 'বিশ্বনবী'। ভাল গানও গাইতেন। আব্বাসউদ্দিনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতেন। সে রেকর্ডও প্রকাশিত হয়েছিল। অবিভক্ত বঙ্গের অধিকাংশ ছোটদের পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। উল্লেখযোগ্য কব্যগ্রন্থ, 'রক্তরাগ', 'খোশ্‌রোজ', 'কাব্যকাহিনী', 'সাহারা', 'হাস্নাহেনা' ও 'বুলবুলিস্তান'। কাব্যে 'কোরআন'ও রচনা করেছিলেন।

পল্লী-মা

গোলাম মোস্তাফা

পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চ'লে প্রবাস-পথে
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়-বেলায় বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

চির-চেনার গণ্ডি কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে,
নূতন করে' দেখা হ'ল অনাদৃতা মায়ের সাথে ;
ভক্তি-পূজা দিইনি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে—
নম্রশিরে প্রণাম করি দূর হ'তে তার মূর্তি দেখে'।

স্নেহময়ীর রূপ ধরে' মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক হ'তে ওই দিগন্তরে।
ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙ্গিনাতে,
দেখছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।

ওই যে মাঠে গোরু চরে লেজ দুলিয়ে মনের সুখে ;
ওই যে পাখির গানের সুরে কাঁপন জাগে বনের বুকে ;
মাথাল্-মাথায় কাস্তে হাতে, ওই যে চলে কাল চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে ওরাই মায়ের ভালোবাসা।

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, বাজায় বেণু অশথমূলে,
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠ্‌ল দুলে ;
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন টুটে',
মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠ্‌ল ফুটে।

দুপুর বেলার রৌদ্র-তাপে ক্লান্ত হ'য়ে কৃষক ভায়া
বস্‌ল এসে গাছের তলে ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধছায়া ;
মাথার উপর ঘন নিবিড় কচি কচি ওই যে পাতা
ও যেন মা'র আপন হাতে তৈরি করা মাঠের ছাতা।

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখলে চেয়ে,
রঙিন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে।
ওদেরই ও ঘরের জিনিস, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে!
কত গভীর তৃপ্তি যে গো লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ, নাই বা জানুক,—সেকথা মোর মনই জানে!
মায়ের গোপন বিত্ত যা, তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মতো তাই ওরা আর ছুটে নাক মোহের পিছু।

গ্রন্থনা ও বিন্যাস : শর্মিষ্ঠা গঙ্গোপাধ্যায়
অলঙ্করণ : পূজা সরকার

গদ্য কবিতা

আইলান

কিংশুক প্রামাণিক



আমার দেহটা তোমরা সবাই দেখলে,
খুব কাঁদলে বুঝি?
ভাবলে কত কষ্ট পেয়েছি আমি।
কোন সে নিষ্ঠুর প্রাণ, যারজন্য এক
শিশুর এমন করুণ পরিণতি।

সমুদ্র নাকি কিছুই নেয় না। বরং ফিরিয়ে দেয়। আমাকেও ফেরত দিয়েছিল। তবে নাকানিচোবানি খাইয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার পর।
ওহ, সে কি কষ্ট। মা-দাদা ছটফট করছিল। নির্দয় এক হত্যালীলা। আমি পাগলের মতো বাঁচার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু... শিশু বলে কোনও ক্ষমা ছিল না আমার প্রতি। এই কি তবে ছিল নিয়তি?

আমি এখন নিথর। প্রাণহীন। কী মজা, আমি আর ডুবছি না। একটু আগেই ডুবতে ডুবতে কত বাঁচার চেষ্টা করেছি। এখন আর কোনও কষ্ট নেই। সাগরের জলে শুধুই ভাসছি। ইস, বেঁচে থাকার সময় কেন শিখলাম না ভাসতে!

আমার গায়ে ছিল লাল টি শার্ট, পরনে নীল হাফ প্যান্ট। আমাকে সবাই লালকমল বলবে, না কি নীলকমল? কেউ মা'র মতো শোনাবে কি ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমির গল্প। আমি জানি না। ভীষণ ভয় করছে এখন। অনেক প্রশ্ন। আমি একা হয়ে গিয়েছি। আসলে আগে তো কখনও মরে যাইনি।

গভীর সমুদ্র থেকে ঢেউ-এর মাথায় ভাসতে ভাসতে আমাকে টেনে এনে ফেলা হল সৈকতে।
অনেকক্ষণ একা একা পড়েছিলাম। সমুদ্র এসে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল অবিরাম।

অবশেষে একজন আমায় দেখল। কিন্তু কাছে এল না।
আরও একজন দেখল, ভয়ে পালিয়ে গেল।
আরও একজন এসে দেখে কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে এল।
আমাকে আর সমুদ্রকে রেখে ওরা কত ছবি তুলল।
তারপর একজন কোলে তুলে নিল আমায়।
বাবা যেমন নিত সেভাবে। আমি ফুঁপিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু, আমার কান্না আর শোনা যায় না। আমার চোখ আর ভেসে যায় না জলে।

আমি কেন মরে গেলাম? আমার মৃত্যুটার কারণ তোমরা জানো? শোনো তা হলে। আমি যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার এক শিশু। আমাদেরও ঘর ছিল। স্কুল ব্যাগে ছিল রংপেনসিল। আমায়ও মা ঘুম পড়িয়ে দিত চাঁদমামার টিপের গল্প শুনিয়ে। আমার পিঠে সড়সুড়ি দিত দাদা। দু'জনে ছুটতাম মাঠে। দৌড় দৌড় দৌড়।

একদিন এল অন্ধকার। যেন উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগ। অত্যাচারীরা অসন্তোষে পুরনো সৃষ্টিকে বার বার করছিল বিধ্বস্ত। বিদ্রূপ করছিল সভ্যতাকে। সেদিন সকালে পরমেশ্বরের নামে আমি খেলছিলাম মায়ের কোলে। গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা পশুরা বলল, আমাদের রক্তে খেলবে হোলি। বাবা মা'কে বলেছিল, চলো, সবাই পালাচ্ছে। এখানে থাকলে আমাদেরও ওরা মেরে ফেলবে।
সিরিয়া আজ আফ্রিকা।

আমরা পালালাম। আমাদের ছোট্ট বাড়িটা ছেড়ে অজনার পথে। মা হাতে দাদা, বাবার হাতে আমি

যখন পালাচ্ছিলাম আমি একবারও কাঁদিনি।
আমার মা কাঁদছিল। আমার বাবা কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কাঁদছিল দাদাও। ঘর ছেড়ে আসার কান্না। আমি কেন কাঁদব, আমার সঙ্গী দু'টো গালে দু'টো চুমু। আমার মা-বাবার। সেটাই আমার সিরিয়া, সেটাই আমার লিবিয়া, সেটাই আমার তুরস্ক।
আমি সেই চুমু দু'টো নিয়েই বিশ্বজয়ী হতে চেয়েছিলাম।

এক নৌকায় শরণার্থী হয়ে পালাচ্ছি আমরা বহু মানুষ। উত্তাল সাগর আমাদের প্রাণ নেবে বলে যেন মত্ত হয়ে উঠল। তীব্র বেগে ঘূর্ণী ডুবিয়ে দিল নৌকা। আমি তলিয়ে গেলাম। মাও। দাদাও। বাবা কত চেষ্টা করল আমাদের বাঁচাতে। কিন্তু... আমরা মরে গেলাম। ওই যে মা ভাসছে, ওই তো দাদা। আর এই যে আমি। বাবা তুমি বেচে আছো। তুমি ভাল থেকো।

আমার চলে যাওয়ার জন্য দায়ী কে। কেউ কি এসে দাঁড়াবে এই মানহারা মানবীর দ্বারে। কেউ কি নতজানু হয়ে বসে বলবে, হিংস্রতা বন্ধ হোক, ক্ষমা করো। বলবে না, এই সিরিয়া আজ আফ্রিকার চেয়েও ভয়াবহ।

বলবে না!

আমি তাই মরে বেঁচে গিয়েছি। আমি দেখাতে পেরেছি, তোমাদের সভ্যতার উলঙ্গ রূপ। আসলে ভদ্রবেশে তোমরা সবাই কত বড় শয়তান। বহু দূরে চলে গিয়ে, আমি আজ খুব ভাল আছি.....

আমি আইলান।

অলঙ্করণ : শান্তনু দে

বহুবর্ণ চিত্র

শিল্পী শান্তনু দে

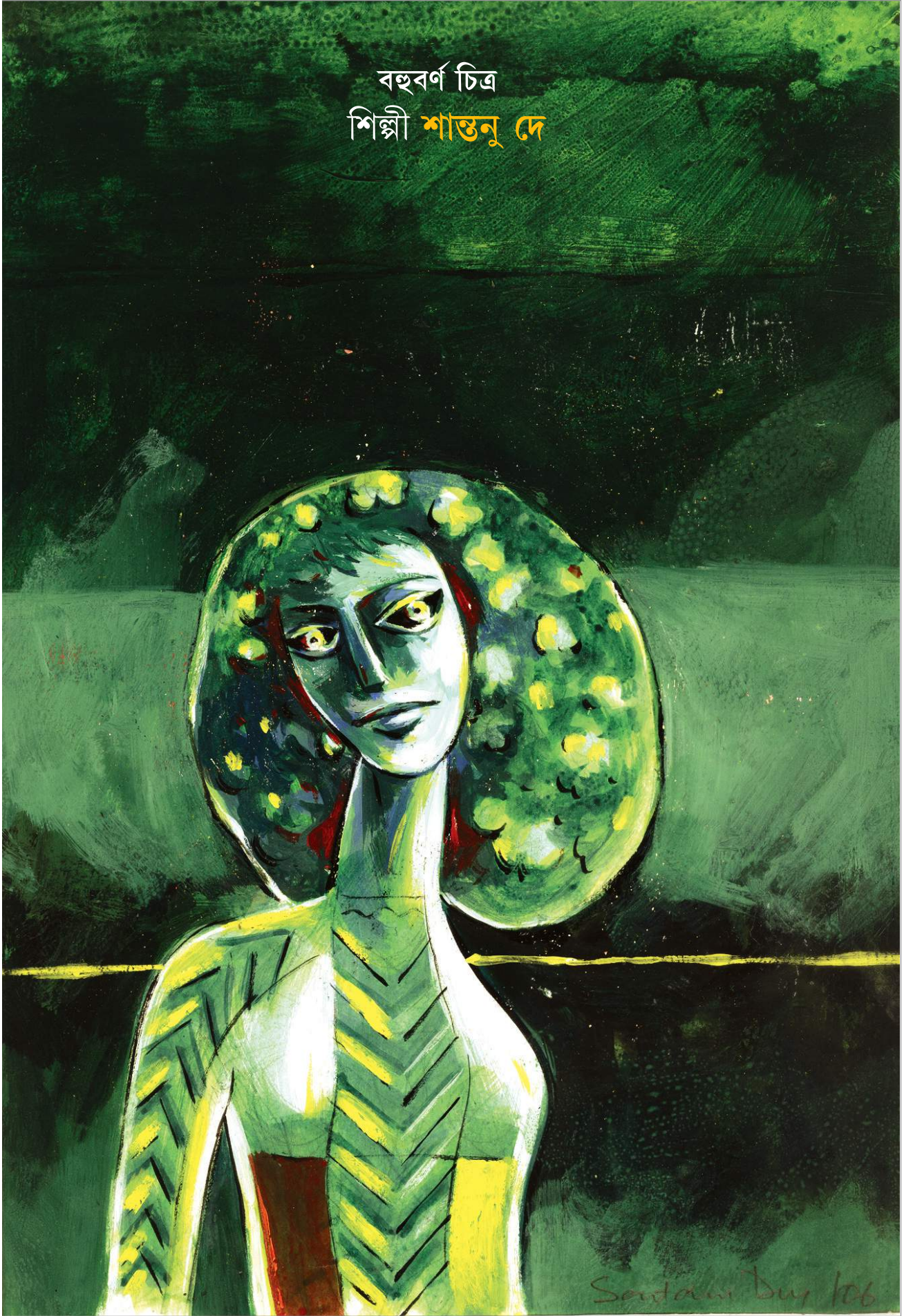

নিবন্ধ

যুগনায়ক বিবেকানন্দ ও শরীরচর্চা

গৌতম সরকার

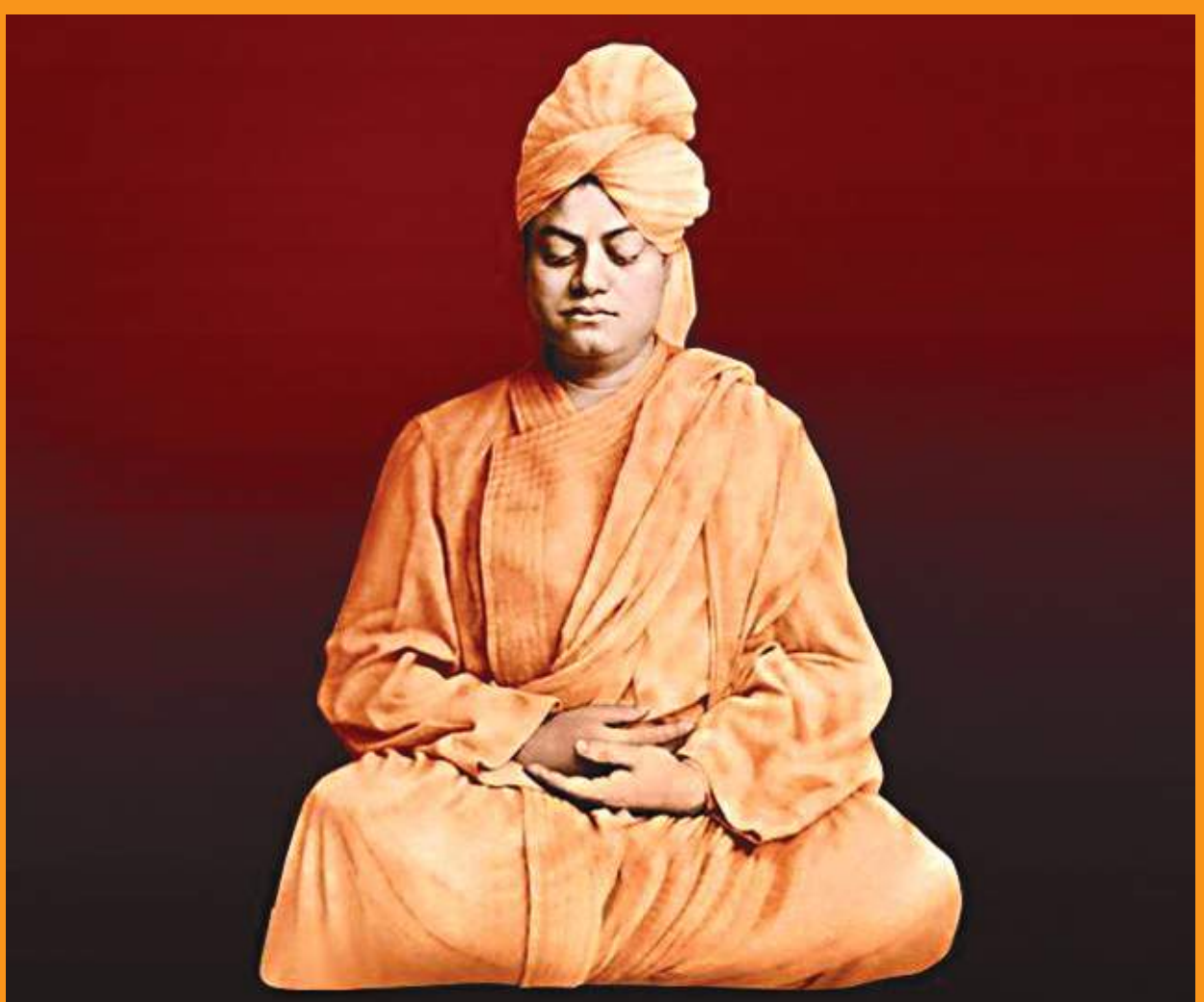

গীতা পাঠ নয়, ফুটবল খেললে বাঙালির চরিত্র দৃঢ় হবে—এ কথা প্রথম যিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি আমাদের যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'Morning shows the day'. ছেলেবেলাই বলে দেয় ভবিষ্যৎ জীবন কার কতটা সুন্দর হবে।

গীতা পাঠ নয়, ফুটবল খেললে বাঙালির চরিত্র দৃঢ় হবে এ কথা প্রথম যিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি আমাদের যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'Morning shows the day'. ছেলেবেলাই বলে দেয় ভবিষ্যত জীবন কার কতটা সুন্দর হবে। যে শিশুটি ছেলেবেলা থেকে আর পাঁচটা ছোট্ট শিশু থেকে আলাদা হয়ে ধ্যান ধ্যান খেলত, সে যে আর পাঁচজনের মতো সাধারণ নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কোনও কিছু পরখ করে বা যাচাই করে নেওয়া ছিল তার স্বভাব। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁর হাত থেকে রেহাই পাননি। শরীর এবং মন একে-অপরের পরিপূরক। তাই তিনি শরীরচর্চার উপর জোর দিয়েছিলেন। ফুটবলও একটি টিম গেম। দেওয়া-নেওয়ার খেলা। এ খেলায় শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তনও অনিবার্য। পরাধীন ভারতবর্ষে মানুষের প্রয়োজন ছিল একত্রিত হওয়া। তা হতে গেলে মানসিক উন্নতির প্রয়োজন সর্বপ্রথম। স্বামীজি তা উপলব্ধি করেছিলেন। তথাকথিত ঈশ্বরচিন্তার বাইরে বেরিয়ে এসে মানুষকে বুঝিয়েছিলেন—ঈশ্বর কোনও মন্দিরে থাকেন না। তিনি থাকেন মানুষেরই মধ্যে। তাই বললেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" একদিকে দেশের পরাধীনতা, অন্যদিকে সমাজে ব্রাহ্মণদের, ব্রাহ্মদের একাধিপত্য—সব মিলিয়ে এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে আবির্ভাব এই মহাপুরুষের। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় নক্ষত্রের মতো প্রকাশ ঘটে বিশ্বের দরবারে এই মহাপুরুষের। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম— হিন্দুধর্ম যে আদপে কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাণহীন কোনও ধর্ম নয়, তা তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর বক্তৃতায়। সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে মানুষকে ভালবাসাই হল ধর্ম। ঈশ্বরলাভের জন্য যে পথ তা তিনি মানুষকে দেখিয়ে গেলেন সহজভাবে। চারটি যোগ বা পথের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরলাভ করতে পারে। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ। সবক'টি পথেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। উপলব্ধি করা যায় সত্যকে। জীবনের চরম সত্যকে না জানতে চাইলে জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। আমরা সকলেই এসেছি এই পৃথিবীতে কোনও না কোনও উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যটুকুকে জানা বা জানতে চাওয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। কিন্তু নানা রকম লোভ, মোহের বশবর্তী হয়ে আমরা ভুলে যাই সে কথা।



তাই আমার মনে হয়, শিশু বয়েস থেকে যদি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা পাঠ্যের অন্তর্গত করা হয়, তাহলে একটি শিশুর মানসিক গঠন সুন্দর করা যেতে পারে। স্বামীজি মানে যে কোনও ধর্ম নয়, স্বামীজি মানে যে কেবলমাত্র কোনও সংগঠনের প্রাণপুরুষ নন, স্বামীজি মানে যে আধুনিকতার শেষ কথা, বিজ্ঞানমনস্ক এক সত্যদ্রষ্টা, তা বোঝাতে হবে যুবসমাজকে। তাদের সুন্দর মানসিকতা তৈরি করতে হবে শিশু বয়েস থেকেই। যাতে তারা জীবনযুদ্ধে প্রতিযোগিতাকে কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা হিসাবেই নিতে পারে। না হলে আজ আমরা যে সময়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তা দেখলে সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মানুষকে জন্তুর সঙ্গে এক করে ফেলছে। যে তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে দেশের স্বাধীনতা এসেছিল একদিন, আজ সেই তরুণ প্রজন্মের হাতে বারে বারে নির্যাতিত হচ্ছে মা, বোনেরা। এ এক ভয়ঙ্কর অবক্ষয়ের যুগ। তরুণ প্রজন্ম নিজেদের সংস্কৃতিকে ঠিকমতো জানতে না চেয়ে পর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে নির্দ্বিধায়। দোষ কাদের তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, দোষ আমাদেরও কিছু কম নয়। আমরা নতুন প্রজন্মকে দিতে পারিনি সুস্থ পরিবেশ। অথচ ভারতবর্ষের মতো মহান দেশে যেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, সারদা মা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহান আত্মাদের আগমন, সেখানে এত অবক্ষয় আসে কীভাবে?

আমার অনুরোধ, শারীরশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষদের জীবনীকেও পাঠ্যের অন্তর্গত করা হোক। শুধু তাই নয়, মহাপুরুষদের জীবনের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রজেক্ট এক্সকারসনে তাঁদের জন্মস্থান ভিজিট করা প্রভৃতির মাধ্যমে এক সুস্থ সুন্দর পরিবেশ প্রদান করা হোক।

মাত্র ৩৯ বছর বয়সে যে বিপ্লব ঘটনালেন স্বামীজি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আধ্যাত্মিকতা ছাড়া মানুষ কখনওই শান্তি পায় না। তাই প্রতিটি মানুষেরই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজন। নতুন প্রজন্ম আজ চরম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে মানসিক অবসাদের শিকার হচ্ছে। এর থেকে বাঁচাতে গেলে তাদের খেলাধুলার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকভাবেও উন্নত হতে হবে। স্বামীজির দেখানো পথে এগিয়ে চলতে হবে। তবেই সমাজ একদিন সুস্থ, সুন্দর হয়ে উঠবে। তার কথাই হবে শেষ কথা—

"ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

আমাদের কাছে বিবেকানন্দের দাবি অসম্ভব বেশি, এমনকী অযৌক্তিকও মনে হতে পারে। যেমনই হোক, তা নৈরাশ্যব্যঞ্জক অন্তত নয়। তা অত্যন্ত জোরালো একটা প্রেরণাশক্তি। স্বামীজি আমাদের বলেছেন, অগ্নিদীপ্ত হতে। যে আদর্শের রূপরেখা তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন, তার জন্য ভিতরে ভিতরে পুড়ে খাক হতে পারে, যেভাবে সেই আদর্শের জন্য দগ্ধ হয়েছিলেন তিনি নিজেও। বিবেকানন্দের আদর্শ একাধারে জটিল, একাধারে সুন্দর, এক সমন্বয়। সমন্বয় ঐক্য এবং একাকিত্বের, একত্ব এবং ব্যক্তিত্বের। বিবেকানন্দের হৃদয়ানুসারী হয়ে বাঁচতে হলে বিশ্বের সমস্ত বিচিত্র শক্তিকে আমাদের মননে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ঐশী ঐক্যে সমন্বিত করতে হবে।

তোমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে

ইন্দ্রনীল সেন

‘চলো যাই চলে যাই দূর বহুদূর’— বাংলা গানের জগতের জন্য একদমই মানানসই এই কালজয়ী গান। ২০১১ সালের আগের বছরগুলিতে বাংলা গান, বাংলা গানের শিল্পীদের সত্যি সত্যিই অনেক ‘দূর বহুদূর’—এ সরিয়ে রেখেছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার,

কিন্তু ২০১১-র ২০ মের পর আমাদের নেত্রী, আমাদের বাংলার সর্বকালীন সেরা মুখ্যমন্ত্রীর শিল্পীসুলভ জাদুস্পর্শে মানুষের অনেক কাছে আজ বাংলার বর্তমান শিল্পীরা। সব শিল্পীকে দু’হাত বাড়িয়ে আমাদের নেত্রী ‘দিদি’ তাঁর জন্মগত শৈল্পিক মনন দিয়ে সবাইকে কাছে টেনে নিয়েছেন। সত্যিই শিল্পী ইন্দ্রনীলদের নতুন স্বপ্নের ঠিকানার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদের গর্বের ‘দিদি’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিদি হয়তো তখন মনে মনে গেয়ে উঠেছেন ‘এসো এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে’।

আমরা সবাই আজ গর্বিত যে বাংলার ২০টা জেলার ৩৪১টা ব্লকের— দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন, জঙ্গলমহল থেকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে আজ আমাদের বন্ধুরা—‘লোকশিল্পী’রা প্রাণ খুলে, বেঁচে থাকার তাগিদে ভিক্ষে করা ছেড়ে দিয়ে আজ আবার উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠতে পারে। তাদের কাছে আজ ভগবান বলুন, আল্লাই বলুন, সবই হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা বাংলায় ইতিমধ্যে ৬০ হাজার লোকশিল্পী আজ সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি দফতরে নথিভুক্ত। প্রত্যেক লোকশিল্পী আজ মাসে কমপক্ষে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সম্মানের সঙ্গে রোজগার করতে পারেন। লোকশিল্পীদের আর মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করতে হয় না বাঁচার তাগিদে। পৃথিবীর একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেই আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এই হাজার হাজার প্রতিভাবান লোকশিল্পীর পাশে—গেয়ে উঠেছেন ‘আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি’— লোকশিল্পীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। বাংলা যা ভাবে সারা বিশ্ব সেটা ভাবে আগামিদিনে, দিদির স্বপ্ন ‘বিশ্ববাংলা’ এখানেই সার্থক। আমি জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যই শুধু নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আগামিদিনে ‘লোকশিল্পী’দের পাশে এসে দাঁড়াবে মানুষ। বাংলার লোকশিল্পীদের পুনর্জন্ম হল দিদির হাত ধরে— বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাই আজ লোকশিল্পীরা তাঁদের কাছের মানুষ, মাটির মানুষ, তাঁদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী এবং অবশ্যই শিল্পী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে সবাই মিলে গেয়ে ওঠেন ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে, আছে সে নয়নতারায়’।

আমরা ২০১১-র ২০ মে’র আগে লক্ষ করে এসেছি হাতেগোনা গুটিকয় কিছু কৃতী সংগীত শিল্পীর সরকারি আঙিনায় বিচরণ। সরকারি পুরস্কার, সরকারি অনুষ্ঠান, সরকারি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধায় তাঁরাই ছিলেন একমাত্র প্রাপ্তি তালিকায়। ২০১১-র আগে বিগত ৩৪ বছর ধরে তাঁদের পাশেই একই সঙ্গে অপমানিত, অবহেলিত হয়েছেন সব কালজয়ী সংগীতশিল্পী, গীতিকার, সুরকাররা। একটা কথা ভেবেই অবাক লাগে—তৎকালীন কোনও বামপন্থী নেতা-মন্ত্রী কি শোনেননি শচীন দেববর্মনের গান? রাহুল দেববর্মনের গান? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোর কুমারের গান? তাঁরা কি জানতেন না রবিঠাকুর থেকে নজরুল, ডি এল রায় থেকে অতুলপ্রসাদ এঁরা সবাই বাংলার গর্ব? গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা না হয় বাদই দিলাম, ওই সব সংস্কৃতি মনস্ক নেতা-মন্ত্রীদের পরিসীমিত ‘জান পয়চানে’র কথা ভেবে। এইসব অবহেলিত শিল্পীর তালিকা প্রকাশ করতে গেলে এই শারদীয়া ‘জাগো বাংলা’র সব পাতা ফুরিয়ে যাবে। লোকশিল্পীদের কথা আর না হয় বললামই না, এই সব রাভা, রায়বেশে, ছৌ-শিল্পীদের কিন্তু খুব ভালভাবেই চিনতেন তৎকালীন বাম নেতা-মন্ত্রীরা—তাঁরা এদের বছরে বছরে একবার করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ট্রেনে করে, বাসে করে নিয়ে আসতেন ব্রিগেড ভরানোর জন্য। হায় হায়!!— মিটিংয়ের পর এইসব নাম-ঠিকানাহীন, বাস্তুহীন লোকশিল্পীদের কলকাতার রাজপথে ভিক্ষে করে ফিরতে হত তাঁদের গ্রামে। শিল্পীর সম্মান তো দূরের কথা,



মানুষের সম্মানও পাননি এইসব লোকশিল্পী বাম আমলে। বামফ্রন্টের ওই সব নেতা-মন্ত্রীর জন্য একটা গানই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার গাইতে ইচ্ছে করে— 'অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি'।

কিন্তু ওই সব নেতা-মন্ত্রী জানতেন না, বুঝতেও পারেননি বাংলার মানুষ প্রকৃতরূপে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অবশ্যই শৈল্পিক স্বাধীনতা পাবে ২০১১ সালে ২০ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে—তাঁরা বুঝতে পারেননি তাঁদের সময়কার সব অবহেলিত শিল্পীরা সবাই মিলে আজ তাদের উদ্দেশেই গেয়ে উঠবেন— 'মার ঝাড়ু মাড় ঝাড়ু মেরে ঝেটিয়ে বিদায় কর'—

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাংলার মানুষ আজ প্রত্যেক কালজয়ী শিল্পী, গীতিকার, সুরকারদের সম্মানে সারা বছর ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের স্মরণে এগিয়ে আসতে পারে। নতুন করে স্মরণ করতে পারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, কিশোর কুমার, শচীন দেববর্মন, রাহুল দেববর্মনকে। তাঁদের গান আজ তাঁদের জন্মদিনের আগে ও পরে সারা বাংলা জুড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক সিগনালে শোনা যায়—সবই শিল্পী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীই জানেন শিল্পীদের মর্যাদা কীভাবে দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম, ডি এল রায় থেকে অতুলপ্রসাদ, আব্বাসুদ্দিন থেকে লালন ফকির— সবার নামেই গত চার বছরে নামাঙ্কিত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ সারা বাংলায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ছোট ছোট উদ্যোগেই বোঝা যায় ইচ্ছে থাকলেই সব হয়—শুধু দরকার একটু শিল্পী মন— যেটা নিয়েই জন্মেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গানের কথা পড়ে, তাঁর গান গেয়ে, তাঁর সুর শুনে, তাঁর ছবি আঁকা দেখে আমি অকপটে বলতে পারি, আমার কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের সেরা রাজনৈতিক নেত্রীর থেকেও অনেক বড় একজন মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন শিল্পী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার অতি প্রিয় একটি কালজয়ী গানকে মাথায় রেখে বাংলার সব শিল্পী বন্ধুর পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে একটা শব্দ পরিবর্তন করে গেয়ে উঠতে পারি—'তোমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

তুমি এত ছোট ঘরে থাক? ঘুম হয়?

প্রবীর ঘোষাল



অটলবিহারী বাজপেয়ী আক্ষরিক অর্থেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী। এসেছেন কালীঘাটে। অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। টালির বাড়িতে ঢোকার মুখে খানিকটা খটকা লেগেছিল অটলজির! সত্যি করেই এই পর্ণ কুটিরের বাসিন্দা দেশের রেলমন্ত্রী।

সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই কিছুটা পরে মমতা বেডরুম দেখে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। এই পাঁচ ফুটিয়া ঘরে থাকেন মমতা?

ঘরের দরজাটা এত ছোট যে বাজপেয়ীর বিশাল বপু সেখান দিয়ে গলছে না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী সুধীন্দ্র কুলকার্নি অনেক চেষ্টা করেও অটলবিহারীকে সেই ঘরে ঢোকাতে পারলেন না। দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বগতোক্তির মতোই বলছিলেন, "মমতা তুমি এত ছোট ঘরে থাকো? এত ছোট খাটে তুমি শুতে পারো? ঘুম হয়?"

সলজ্জ মুখে মমতার প্রতিক্রিয়া ছিল, "আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই তো এইরকম ঘরেই থাকে বা সেটাও পায় না।" ১৯৮২ সালে এই প্রতিবেদকের মমতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সেই থেকে আজও দেখছি, তৃণমূল সুপ্রিমোর সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রা একই আছে। ডিসিপ্লিনড সার্থক। শুধু পায়ে হাওয়াই কেন, পরনে আটপৌরে শাড়িই নয়, মমতার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য সুশৃঙ্খল জীবনযাপন। অতীতের রাজনৈতিক জগতের অনেক রথী-মহারথীর সন্ন্যাস জীবনের কাহিনি আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু চোখে দেখেছি মমতাকেই।

জননেত্রী মমতার একটা দুঃখ, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে পারেননি। যদিও পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন, সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তিনি যে লড়াই করেছেন, সেটা আসলে দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ করেই মমতা পশ্চিমবঙ্গে কায়েম করেছেন গণতান্ত্রিক শাসন। এই আলোচনা অবশ্য অন্যক্ষেত্রে হতে পারে, এই প্রবন্ধে নয়। যে কথা বলছিলাম, শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ না নেওয়ার দুঃখ নয়, আরও একটা আক্ষেপ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর আছে। সেটা হল, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছাড়া, ওই মাপের আর কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ মমতার হয়নি।

কিন্তু লোকমুখে মমতা শুনেছেন, প্রফুল্ল সেন ছাড়াও, বাঙালিরা রাজনীতিবিদদের মধ্যে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, অনেক ক্ষমতা পেয়েছিলেন। প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল ঘোষ, অজয় মুখোপাধ্যায় তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে অনেক বছর রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। তাঁদের উপর বিধানচন্দ্র রায়ের মতো যুগপুরুষ ক্ষমতাসীন কাজে নির্ভর করতেন। বয়স্কদের মুখে মমতা আরও শুনেছেন, তাঁদের চারজনের জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ। বাহুল্য বা বিলাসিতা বলে তাঁদের জীবনে কিছু ছিল না।

মমতা এই সব শুনেছেন আর মনে মনে সংকল্প নিয়েছেন, তিনি ওই চারজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পতাকা বহন করবেন। সেটাই হবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি। ওই কাজের মধ্যে দিয়েই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ না নেওয়ার দুঃখ কিছুটা হলেও মুছতে পারবেন। ওই চার ব্যক্তিত্ব কোনওদিন তাঁদের ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেননি। করার কথা ভাবেননি। তবুও তাঁদের মতো দেবতুল্য মানুষদের চরিত্রহনন করেছে বামপন্থীরা। বলেছে, প্রফুল্ল সেন-অতুল্য ঘোষ কোটি কোটি টাকার মালিক। তাঁদের



জীবনযাত্রা বিলাসবহুল। পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, ওই সব অভিযোগ আসলে ছিল নির্ভেজাল কুৎসা।

মমতা নিজের রাজনৈতিক জীবনেও একই জিনিস দেখেছেন। রাজনীতির ময়দানে মার খেয়ে, পিছু হটে মমতা-বিরোধীরা শুধুই কুৎসাকে হাতিয়ার করেছে। হেন কুকথা নেই, যা তারা মমতার সম্পর্কে বলেনি। বিশেষ করে ক্ষমতার দম্ভে দম্ভিত সিপিএমের নেতা-নেত্রীরা তো বেলাগাম কুৎসা করে এসেছেন মমতার নামে। তাই মমতা মাঝে মধ্যেই বলেন, পৃথিবীর সব বৃহৎ মানুষই কোনও না কোনও সময়ে কুৎসার শিকার হয়েছেন। এমনকী স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত ট্র্যাডিশনের ব্যতিক্রম হননি। তাঁদেরও প্রচুর গলামন্দ হজম করতে হয়েছে।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ড. প্রফুল্ল ঘোষ। ড. ঘোষ ছিলেন কলকাতা ট্যাঁকশালের প্রথম মিন্ট মাস্টার। তাঁর আগে ওই পদটি ছিল শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত। প্রচুর টাকা মাইনে ছিল। কিন্তু গান্ধীজির এক ডাকে সেই রাজার হালের চাকরি ছেড়ে ড. ঘোষ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি, প্রফুল্ল সেন এবং অজয় মুখোপাধ্যায়— তিনজনই ছিলেন অকৃতদার। ভাই, ভাইপো, ভাগনে প্রমুখ আত্মীয়স্বজন ছিল। কিন্তু তাঁরা কখনও স্বজনপোষণ করেছেন, এমন কথা কেউ বলতে পারেননি। কারণ তেমন কিছু ঘটেনি।

মমতার জীবনে মা গায়ত্রীদেবী ছাড়া আর কোনও আত্মীয় কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি। মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন মমতা বাচ্চা মেয়ের মতো তাঁকে আঁকড়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, এখন আমার নিজস্ব পরিবার বলতে কিছু নেই, গোটা রাজ্য, তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাই তাঁর পরিবার। প্রথম যখন এমপি হয়ে দিল্লি গেলেন, মমতার সঙ্গী বলতে কখনও কৃষ্ণা, কখনও ঝরনা, কখনও বেলাদি। এঁদের কারও সঙ্গে মমতার কোনও রক্তের সম্পর্ক ছিল না।

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মুখে মমতা একটা গল্প শুনেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একবার জেলা সফরে গিয়ে প্রণববাবুর বিরল অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাঁরা দু'জনে একটি বাড়িতে উঠেছিলেন। বাথরুম থেকে বেরোতে অজয়বাবুর একটু সময় লাগছে। মাঝে মাঝে ভিতর থেকে থুপ থুপ শব্দ আসছে। খানিক পরে মুখ্যমন্ত্রী বেরোলেন। হাতে সদ্য কাচা ধুতি-পাঞ্জাবি। প্রণববাবু অবাক। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, একটু সময় পেলাম বলে এগুলো ধুয়ে নিলাম।

এই প্রতিবেদকেরও এমন অভিজ্ঞতা আছে। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ দলের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হচ্ছে। তখনও দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণমান্য বিদেশি অতিথিদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন এমপি মমতাও। উঠেছিলেন ঢাকার বিলাসবহুল হোটেল 'সোনারগাঁও'তে। অবশ্যই সরকারি অতিথি হিসাবে। একদিন সকালে বসে আছি তাঁর হোটেলে স্যুটে। ব্রেকফাস্ট নিয়ে হোটেলের বয় এসেছে মমতার ঘরে। জানতে চাইল, 'ম্যাডাম কোথায়?' আমি বললাম, 'বাথরুমে, স্নান করছেন।' ওর চোখ ছানাবড়া। কারণ, বাথরুমের ভিতর থেকে কাপড়-জামা কাচার আওয়াজ আসছে। সেই হোটল বয়ের বিস্ময়ের মন্তব্য, 'মমতাদি নিজের কাপড় কাচছেন? আমাদের দেশের কোনও পলিটিশিয়ান এটা কিছুতেই করবে না!' কথা শেষ হওয়ার আগেই বাথরুম থেকে কাচা কাপড় হাতে নিয়ে মমতা ওই ছেলেটির কাছে জানতে চাইলেন, 'কাপড়টা কোথায় মেলব ভাই?'

নিজের কাপড় এখনও প্রয়োজনে মমতা কেচে নেন। আশ্রমের সন্ন্যাসিনীদের মতোই জীবনের ধারাবাহিকতা এখনও ধরে রেখেছেন তিনি। রেলমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী হয়েও, সেই ধারার ব্যতিক্রম করেননি। কেবল শরীরচর্চা এখন আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। সাতসকালে উঠে খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে চায়ে চুমুক দিয়েই নিজের ঘরে যোগাসনে বসে পড়েন মমতা। আছে হাঁটা, মানে ট্রেড মিলও। কতটা হাঁটলেন তিনি নিজেও জানেন না।

তারপর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে স্নান সেরেই পুজোপাঠ। শুরু হয়ে যায় দিনের রুটিন জীবন। খাওয়া-দাওয়া? ব্রেকফাস্ট বা চায়ের সঙ্গে বিস্কুট। সারাদিন নবান্নে কাজের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকলেও ভারী খাবার কিছুই খান না। রাতে ভাত-মাছ, না হয় ডিম। কিছু তরিতরকারি আছে। অথচ অতিথি আপ্যায়নের, তাঁদের চোব্বচোষ্য করে খাওয়াতে মমতার জুড়ি মেলা ভার। আসলে তাঁর সংযমী জীবনই হল পরিশ্রমের প্রাণশক্তি। কী অসম্ভব মনের জোর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পরিশ্রম করে চলেছেন তার একটা উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধের ইতি টানব।

কিছুদিন আগের ঘটনা। মমতা কার্শিয়াং যাচ্ছেন। দু'দিন ধরে ধুম জ্বরে চলছে। শরীর খুব কাহিল। সকালে বাড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন। মমতার শারীরিক এই অবস্থা দেখে ভায়ের স্ত্রী লতা পরামর্শ দিয়েছেন, "দিদি, এই টুর ক্যানসেল করো। তোমার শরীর বইছে না।"

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, "দার্জিলিং না গেলে অনেকে ভাববে, ভয় পেয়েছি। তাই পিছিয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরের জন্য এখন ভাবলে চলবে না।" আসলে ওই সময় জনমুক্তি মোর্চার কর্তা বিমল গুরুং আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিলেন। মোর্চার বিধায়কদের পদত্যাগের ফতোয়া নিয়ে তখন পাহাড়ের রাজনীতি টগবগ করে ফুটছে।

এই পরিস্থিতিতে দুপুরের বিমানে বাগডোগরা পৌঁছলেন মমতা। কার্শিয়াং রওনা হওয়ার আগেই অবশ্য মমতা বেশ উত্তেজিত। কারণ, তাঁর সেদিনের সফরসূচিতে ছিল কার্শিয়াঙের অনুষ্ঠান সেরেই কালিম্পংয়ের রাস্তা ধরা। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। কারও ভুল পরামর্শে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরসূচি তৈরি হয়েছে। দূরত্বের বিষয়টি তাদের সামনে ছিল না। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার জার্নি। সন্ধের অন্ধকার ঘন হতে পাহাড়ি বর্ষার বৃষ্টির দাপট আরও ঘন হল। মমতার শরীর আরও খারাপের দিকে গেল। রাস্তায় বমি পর্যন্ত হল। আমরা যাঁরা সফরসঙ্গী, সকলেই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।বেশ রাত হয়ে গেল কালিম্পংয়ে ডেলোর বাংলোয় পৌঁছতে। সকলেই পরিশ্রান্ত। তার মধ্যে মমতা কে কোনও ঘরে থাকবে, কী খাবে, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেটা অবশ্য তাঁর বরাবরের স্বভাব। সদরে বেরিয়ে গাড়ির ড্রাইভার, নিরাপত্তারক্ষীদের পর্যন্ত খুঁটিয়ে খোঁজখবর নেওয়া। আমরা যত বলি, "আপনি অসুস্থ, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন।" পাল্টা ধমক দিয়ে মমতা বলে ওঠেন, "আপনার ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করুন, আমি কালই ঠিক হয়ে যাব।"

সত্যিই তাই। রাতে কিছু খেলেন না। আমরা বলাবলি করছিলাম, "কাল আর দিদি মর্নিং ওয়ার্ক করতে পারবেন না।" এই ভেবে আমরা রাতে নিদ্রামগ্ন হলাম। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গীরা কমবেশি সকলেই হাঁটার ব্যাপারে আতঙ্কে থাকেন। কারণ, কেউ মমতার সঙ্গে হাঁটায় পাল্লা দিতে পারেন না। মন্ত্রী-আমলা অনেককেই দেখেছি, হাঁটা শুরু করলেও, পাল্লা দিতে না পেরে অচিরেই রণে ভঙ্গ দেন। সকালে সবাই অবাক হয়ে দেখলাম, মমতা যাবতীয় অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়েছেন।

প্রবন্ধ

তিন অধ্যায়

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়



গণমাধ্যমের তিন অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের দেবতা ছাপাখানা। দ্বিতীয় অধ্যায় ইথার নির্ভর। তৃতীয় অধ্যায় টেলিভিশন। ছাপাখানা থেকে আত্মপ্রকাশ করত খবরের কাগজ। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং সব শেষে দৈনিক। প্রভাতী খবরের কাগজ যে আকারে প্রকাশিত হয় সেই নিউজপ্রিন্টের মাপকে বলা হয় ব্রডশিট।

ছাপা খবরের কাগজ সাবালক হওয়ার পর তা যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হত তাকে বলা হত হট মেটাল (Hot Metal) পদ্ধতি। শৈশবে হাতে অক্ষরবিন্যাস করে খবর ছাপার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৮৬ সালে সেই পদ্ধতির স্থানে এল লিনোটাইপ (Linotype) যন্ত্র। গলিত গরম মিশ্র ধাতু ছাপার বিষয়বস্তুর এক একটি লাইন প্রস্তুত করত।

গরম ধাতুর সাহায্যে এই কাজ করা হত। তাই এর নাম হয়েছিল হট মেটাল পদ্ধতি। প্রায় ২৫ বছর আগে হট মেটাল পদ্ধতিকে আলবিদা জানিয়ে তার স্থান নিয়েছে ডেস্কটপ কম্পিউটার চালিত পদ্ধতি। লিনোটাইপ মেশিনের তুলনায় কম্পিউটার বেশ সুখী যন্ত্র। গরম ও ধুলো তার সহ্য হয় না। তাই তাকে শীতল পরিবেশে রাখতে হয়। এই জন্যই এই পদ্ধতির নাম হয়েছে কোল্ড মেটাল পদ্ধতি।

এই হল সংবাদপত্র মুদ্রণ ব্যবস্থার বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

রেডিওর অনুষ্ঠান প্রচারিত হত বিনা তারে। অবশ্য তা শোনার জন্য বাড়ির ছাদে এরিয়াল এবং বেতার যন্ত্রের সঙ্গে আর্থ লাগাতে হত। দুটি কাজেই তারের ব্যবস্থা ছিল।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচার প্রযুক্তি আধুনিক হল। সেই পদ্ধতিতে প্রস্তুত বেতার যন্ত্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য এরিয়াল বা আর্থ দরকার হল না। ব্যাটারিচালিত এই বেতার যন্ত্রের নাম ট্রানজিস্টার সেট। দেশের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলকে এই বেতার যন্ত্র ঝটিকা অভিযান চালিয়ে দখল করে ফেলল। তাই গণমাধ্যমের ইতিহাসে এই অধ্যায় ট্রানজিস্টার বিপ্লব বলে পরিচিত হল।

১৯৭২ সালে ঢাকায় গিয়ে টেলিভিশনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ভারতে তখন টেলিভিশন প্রবেশ করেনি। একটি জাপানি সংস্থা বাংলাদেশে টেলিভিশন আমদানি করেছিল। সেই টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার জন্য প্রতিটি সেটের জন্য অ্যান্টেনা লাগত।

তার কয়েক বছরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উদ্যোগী হয়ে ভারতে টেলিভিশন যুগের সূচনা করলেন। কোনও কোনও আধিকারিকের এই ব্যাপারটা পছন্দ ছিল না। তাঁদের যুক্তি ছিল, টেলিভিশন অত্যন্ত ব্যয়বহুল পদ্ধতি। তাই ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে তাড়াহুড়ো করে টেলিভিশন চালু করা জরুরি নয়।

ইন্দিরা সেই যুক্তিতে প্রভাবিত হয়নি। আধুনিকতার সঙ্গে তাল রাখতে তিনি টেলিভিশন চালু করার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট কলকাতায় টেলিভিশন সম্প্রচার আরম্ভ হয়। তার প্রধান হোতা ছিলেন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রথম পর্বে দূরদর্শন কলকাতার অনুষ্ঠানের দৈনিক মেয়াদ ছিল অতি সামান্য। ছবির রং ছিল সাদা-কালো। ঢাকার মতো কলকাতাতেও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার জন্য অ্যান্টেনার ব্যবহার ছিল অপরিহার্য।

সেই সব দিন শীঘ্রই হারিয়ে গেল। এখন অ্যান্টেনা বাতিল। সাদা-কালো ছবি অতীত। স্যাটেলাইট নিভর চ্যানেলের সংখ্যা অগুনতি। গোড়ায় ছিল কেবল পদ্ধতি। এখন তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সেট টপ বক্স বা ডিস অ্যান্টেনা। বিনোদনের দুনিয়ার হাজার মজার হাট বসিয়ে দিয়েছে ডিজিটাল টেলিভিশন।

এইটুকুই গণমাধ্যমের তিন অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ও নীরস নীবরণ।

অন্দরমহল

খবরের কাগজের অন্দরমহলে দুটি সরকার একটি ডেস্ক, অন্যটি রিপোর্টিং। রিপোর্টারের সহোদর ভাই ফটো জার্নালিস্ট। দুইয়ে মিলে বার্তা বিভাগ। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করার সময়ে এটাই দেখেছি।

বার্তা বিভাগে রিপোর্টারদের দাদাগিরি চলত। ডেস্ক ছিল যেন জেঠামশাই। রিপোর্টারদের হাত ঘুরে যে সব খবর ডেস্কে পৌঁছত সেগুলি ঘসামাজা, ছোট বা বড় করা, কোন ছবি কোন মাপে কোন পৃষ্ঠায় যাবে তা ঠিক করা, কোন খবর কোন পৃষ্ঠায় ঠাঁই পাবে এবং কোন খবর বাতিল হবে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত নিত ডেস্ক।

দুই বিভাগকে সামনে রাখতেন বার্তা সম্পাদক। তার অনুপস্থিতিতে সেই কাজ করতেন শিফ্‌ট ইনচার্জ বা চিফ সাব।

আজকাল শুনতে পাই বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ পদটি যাদুঘরে ঠাঁই পেয়েছে।

খবরের কাগজে সবার উপরে স্থান সম্পাদকের। একটা সময়ে পেশাদার সাংবাদিকদেরই কাগজের মালিক সম্পাদক নিযুক্ত করতেন। এই ব্যবস্থার ধ্রুপদি উদাহরণ অ্যাডলফ এস ওখস (Addloph S. Ochs)।

এই ভদ্রলোকটি তাঁর ডানা মেলার বয়সে খবরের কাগজের প্রেমে পড়েছিল। যেমন তেমন প্রেম নয়। কাঁঠালের আঠার মতো প্রেম।

আমেরিকার টেনেসি রাজ্যের একটি ছোট শহর স্যাটানুগায় (Chattanuga) তাঁর ভদ্রাসন ছিল। বিষয়কর্ম বলতে ছিল একটি খবরের কাগজ।

কিন্তু ওখস সাহেব ছিলেন পাহাড়ি ঈগল। অত অল্পে তাঁর মন ভরত না। তিনি অনেক বড় একটা কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন।

এমনই একটা সন্ধিক্ষণে তাঁর কানে খবর পৌঁছল, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস কাগজটি দেনার দায়ে লাল বাতি জ্বালাবার অপেক্ষা করছে।

এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ ওখসসাহেব হাতছাড়া হতে দেবেন না। এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ঘটিবাটি বেচে ধারদেনা করে টাকা জোগাড় করে নিউইয়র্কের দিকে ধাবিত হলেন। সেখানে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া নিউইয়র্ক টাইমস কাগজটির মালিকানা কিনে নিলেন।

এর পর হল তাঁর কাজের শুরু। এবার তাঁর সঙ্কল্প হল, কাগজটিকে শুধু বাঁচিয়ে রেখে তিনি তুষ্ট হবেন না। একে এমন প্রভাবশালী করে তুলবেন যাতে কোনও রাষ্ট্রনায়ক নিউইয়র্ক টাইমসকে হেলাফেলা করতে না পারে।

সে কাজ করবে কে? বাস্তববাদী ওখসসাহেবই এই প্রশ্নের ঠিক জবাবটা খুঁজে নিলেন। সেটি হল, বাজার ছেঁকে সেরা সেরা সাংবাদিকদের নিউইয়র্ক টাইমসে টেনে আনবেন। তাঁদের হাতে কাগজটি চালাবার ভার দেবেন। তাঁদের হাতের কাজে উঁকি দেওয়ার জন্য তাঁদের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলবেন না। তাঁরা যে যার কাজ ঠিকঠাক করছে কি না এ সব ছাইপাঁশ ভেবে মাথা গরম করে রাতের ঘুম নষ্ট করবেন না।

১৮৯৬ সালে তাঁর মালিকানায় নব পর্যায়ে নিউইয়র্ক টাইমস যাত্রা শুরু করল। সম্পাদকীয় বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের ডেকে তিনি কাগজের নীতি এবং লক্ষ্মণরেখা ঘোষণা করে দিলেন।

তাঁর কাগজের নীতি, কোনও স্বার্থের বশীভূত না হয়ে, কোনও দল বা গোষ্ঠীর মুখ না চেয়ে, নির্ভয়ে বা দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী না হয়ে পক্ষপাতহীনভাবে সংবাদ পরিবেশন (To give the news impartially without fear or favour Regardless of any party, Sect or interest involved)।

তাঁর কাগজের লক্ষ্মণরেখা ছিল, ছাপার যোগ্য যাবতীয় খবর (All the news that's fit to print)

সম্পাদকীয় বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা কাগজের নীতি সহজেই বুঝে গেলেন। কিন্তু লক্ষ্মণরেখাটির বর্ণনা শুনে ধাঁধায় পড়লেন। খবর তো খবরই। তার আবার যোগ্যতা-অযোগ্যতা কী?

ওখসসাহেব বুঝিয়ে দিলেন, তার মানে হল, বিবেচনা করে দেখতে হবে খবরটি সর্বসাধারণকে জানানো দরকার কি না। পরিবারের দাদু নাতি নাতনি। বাপ মা ছেলে মেয়ে সকালে জলখাবারের টেবিলে

বসে একসঙ্গে যে খবর পড়বে ও পড়তে পারবে, বুঝতে হবে সেই খবর ছাপার যোগ্য। নিউইয়র্ক টাইমস তা প্রকাশ করবে। কিন্তু যে খবর তেমন নয়, ছোটদের সামনে যা পড়তে বড়দের অস্বস্তি হবে এবং ছোটরা যা বুঝতে না পেরে তার মানে জানতে চেয়ে বড়দের অস্বস্তিতে ফেলবে তেমন খবর নিউইয়র্ক টাইমসে ঠাঁই পাবে না।

যেমন, সমকামিতা (Homosexuality), যৌনতা (Sex), ফ্যাশন প্যারেড এবং এই ধরনের খবর নিউইয়র্ক টাইমসে নিষিদ্ধ বিষয়।

নিউইয়র্ক টাইমস ২০০২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ওখসসাহেবের এই লক্ষ্মণরেখা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে। কিন্তু ওই সময়ের পর তা আর পারা গেল না। অতি আধুনিকতার প্রচণ্ড প্লাবনে ওখসসাহেবের তৈরি করা লক্ষ্মণরেখার বাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সম্পাদক হাওয়েল রেইনস ঘোষণা করলেন, নিউইয়র্ক টাইমসে এখন থেকে সমকামিতা সম্পর্কিত খবরও প্রকাশিত হবে। (New york Tims to publish gay, lesbian umions) ।

সার বস্তুটি এইভাবে বর্জিত হল বটে কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ দিকের প্যানেলে এখনও ওখস সাহেবের প্রবর্তিত সাতটি শব্দ ছাপা হয়। All the News That's fit to print।

এবার ডব্লুপি

নিউইয়র্ক টাইমসের পর ডব্লুপি বা ওয়াশিংটন পোস্ট সম্পর্কে দু'চার কথা বলি। আমেরিকা তথা পৃথিবীতে নিউইয়র্ক টাইমসের মতোই প্রভাবশালী কাগজ ওয়াশিংটন পোস্ট। ১৮৭৭ সালে এই কাগজটি চালু হয়েছিল। এখনও ছাপিয়ে চলছে। এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে, টাইমসের মতো পোস্টও ১৯৩৩ সালে অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছিল। লাভের দেখা নেই। লোকসানের বোঝা বাড়তে বাড়তে পাওনাদারদের দাবি মেটানো ছাড়া উপায় রইল না।

পোস্ট নিলামে উঠল। আরও অনেকের সঙ্গে নিলাম ঘরে হাজির হলেন, সদাশয় কর্তাগিন্নি ইউজিন এবং অ্যাগনেস মেয়ার্স। মেয়ার্স দম্পত্তি সর্বোচ্চ দাম দিয়ে পোস্টের মালিকানা হস্তগত করলেন বটে কিন্তু কাগজের আয়-ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারলেন না। পোস্টের পুনর্মূষিকো ভব অবস্থা।

এমন দুঃসময়ে তাঁদের মনে এক শুভবুদ্ধি জেগে উঠল। জামাতাকে তাঁরা পোস্টের কর্তা বানিয়ে দিলেন। তাঁদের জামাতার নাম ছিল গ্রাহাম, কন্যার নাম ক্যাথরিন।

যোগ্য পরিচালনা দিয়ে পোস্টকে ফিল শীঘ্রই শক্ত বনেদের উপর খাড়া করেছিলেন। কিন্তু নিজের তৈরি গাছের ফল তিনি বেশিদিন ভোগ করতে পারলেন না। কারণ, নারীঘটিত কেলেঙ্কারি। পোস্টের সফল পরিচালক ফিল এক মহিলা কর্মচারীর সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। উভয়ের অবৈধ সম্পর্কটা এমন মাত্রায় পৌঁছে গেল যে কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল। ক্যাথরিনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে ফিল ঝাড়া হাত পা হবেন এবং তাঁর লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে নতুন করে সংসার পাতবেন।

কিন্তু মানুষ ছক কষে, বিধাতা পুরুষের দুশমনিতে তা বানচাল হয়ে যায়। ফিলের জীবনেও তেমনটাই ঘটল। তিনি যখন নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছিলেন তখন বিনা নোটিসে তাঁরা ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ পাখা মেলল। তিনি অতি মাত্রায় মদ্যপ হয়ে উঠলেন। পাঁড় মাতাল ফিলের আচার-আচরণ ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে উঠল। পোস্টের অভিভাবক মানসিক অবসাদে ডুবতে লাগলেন।

এমন অবস্থায় যা ঘটা স্বাভাবিক ছিল ফিলের স্ত্রী ক্যাথরিন তা খানিকটা বিলম্বিত করে দিলেন। পারিবারিক মর্যাদার মুখ চেয়ে তিনি বিশ্বাসঘাতক স্বামীকে ঘৃণা করার বদলে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুললেন। তবে এই বাঞ্ছিত পরিবর্তন বেশি দিন স্থায়ী হল না। ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ফিল গ্রাহাম নিজের জন রানা বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন।

নিজ কর্মদোষে বা ভাগ্যদোষে ফিল গ্রাহাম ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নেওয়ার পর রথের লাগাম ধরলেন ক্যাথরিন গ্রাহাম। তাঁর সুপরিচালনায় পোস্টের দুঃসময় কাটল। কিন্তু ক্যাথরিন তাতে সন্তুষ্ট নন। কারণ, তিনি আকাশ ছুঁতে চান। তার জন্য দরকার একজন চৌখস সম্পাদক।

এই ভাবনার মধ্যে যার কথা তাঁর মনে ভেসে উঠল তাঁর নাম বেঞ্জামিন ব্রডলে। সংক্ষেপে বেন। তিনি তখন নিউজউইক সাপ্তাহিকের ওয়াশিংটন ব্যুরোর কর্তা।

বেনের নাম মনে আসতেই ক্যাথরিন হুট করে তাঁকে ডেকে পোস্টে বড় আসনে প্রতিষ্ঠা করলেন না। লোক লাগিয়ে তাঁর সম্পর্কে যতটা খবর পাওয়া যায় তা জোগাড় করলেন। খবরগুলি মিলিয়ে দেখে ক্যাথরিনের ৭০ শতাংশ বিশ্বাস হল তিনি যে পরশ পাথরটি খুঁজছিলেন তিনি তা পেয়ে গিয়েছেন। বাকি ৩০ শতাংশের জন্য তিনি দু'জন প্রবীণ দক্ষ এবং সৎ সাংবাদিকের সাহায্য নিলেন। তাঁরা হলেন ভুবন বিখ্যাত স্তম্ভ (Coloumn) লেখক ওয়ালটার লিপম্যান এবং জেমস রেস্টন।

সব চেয়ে বড় কথা তাঁদের উভয়ের বিচক্ষণ বলে সুনাম আছে। এই ব্যাপারে তাঁদের কোনও স্বার্থ জড়িয়ে নেই।

এই রকম মানুষের বিচার বুদ্ধির উপর আস্থা রাখা যায়। ক্যাথরিন তাই করলেন। তাঁরাও ক্যাথরিনকে নিরাশ করলেন না। বরং মন খুলে বললেন, সাংবাদিকের বাজারে বেন সেরা মাল।

অতএব ক্যাথরিন সময় নষ্ট না করে বেনকে খরিদ করে ফেললেন। ক্যাথরিনকে বেন ডোবাননি। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দক্ষতার গুণে তিনি আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেললেন।

বেন যখন পোস্টে রাজত্ব করছিলেন তখন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নিউনিয়র্ক টাইমসে দাপটের সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আব্রাহাম মাইকেল রোজেনথাল। ডাক নাম অ্যাব।

বেন এবং অ্যাব দু'জনেই ছিলেন প্রায় সমবয়সি। একে অন্যের কাগজকে টেক্কা দেওয়ার দৌড়ে উভয়ের মধ্যে অবশ্যই তীব্র রেষারেষি ছিল। কিন্তু তাঁরা সেটা কাগজের চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে যাননি। উভয়েই ছিলেন পরস্পরের গুণগ্রাহী।

চরাচরে প্রকৃতির নিয়মগুলি অলঙ্ঘনীয়। সেই নিয়ম অনুযায়ী ১৯৮৬ সালে কয়েক মাসের তফাতে বেন এবং অ্যাব ৬৫ বছর বয়সে পা দিলেন। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত জীবন থেকে তাঁদের অবসর নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এল।

পোস্টের বেন এই উপলক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী টাইমসের অ্যাবের সাংবাদিক জীবন এবং তিনি কী রকম সংগ্রাম করে টাইমসকে শক্ত বনেদের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন তার বিশদ বিবরণ দিয়ে পোস্টে তিন কিস্তি ফিচার ছেপে দিলেন।

তা পড়ে অ্যাব খুব খুশি হলেন। তবে ঠাট্টা করে অন্তরঙ্গ লোকদের বললেন, আমাকে নিয়ে বেন তিন কিস্তি ফিচার ছাপল বটে কিন্তু সে যখন অবসর নেবে তখন সেই খবর তাঁরই কাগজ তিন লাইনে শেষ করে দেবে।

এই পরিহাস উদার হৃদয় বেন মন খুলে গ্রহণ করলেন। তার পর অ্যাবকে একটি তিন লাইনের চিঠি লিখলেন, প্রিয় অ্যাব, অনুচ্ছেদটি এই রকম হবে : ওয়াশিংটন পোস্টের ৩০ বছরের নির্বাহী সম্পাদক বেঞ্জামিন সি ব্রডলে আজ অবসর নিয়েছেন। তাঁর বয়স এখন ৭০ বছর। ওকে। —বেন।

রাজ কাহিনি

কোনও কোনও খুব বড় খবরের কাগজে রিপোর্টিং বিভাগের শীর্ষে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা বলে একটি পদ থাকে। শাসক বা বিরোধী পক্ষের হাঁড়ির খবর পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা রাজনৈতিক সংবাদদাতার কাজ।

বর্তমান কাগজটির প্রতিষ্ঠাতা বরুণ সেনগুপ্ত কলকাতার কাগজের প্রথম রাজনৈতিক সংবাদদাতা। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করতেন। সেই হিসাবে তিনি ছিলেন মাস মিডিয়া জগতের একজন সেলিব্রিটি। কেউ কেউ বরুণবাবুকে বলতেন, খবরের কাগজের দুনিয়ার উত্তমকুমার।

অধুনালুপ্ত যুগান্তরে কাজ করার সময় আমাকে দ্বিতীয় রাজনৈতিক সংবাদদাতার পদ দিয়েছিলেন অমিতাভ চৌধুরি। চৌখস সাংবাদিক, বাংলা ভাষার পণ্ডিত এবং রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অমিতাভ চৌধুরি ছিলেন জহুরি। তিনি গুণের কদর করতে জানতেন।

যুগান্তরের ডেস্কে শিরোনাম লেখার জন্য তিনি তরুণ সাব-এডিটর কাজল মিত্রের উপর নির্ভর করতেন। কাজল অকালে মারা গেছেন।

একবার বর্ষাকালে হুগলি-বর্ধমানে বন্যা হল। তার কপিটি কাজলের কাছে অমিতাভদা পাঠিয়ে দিলেন।

মাত্র কয়েক মিনিটে কাজল কপিটিতে চোখ বুলিয়ে শিরোনাম বসিয়ে অমিতাভদার কাছে পাঠিয়ে দিল। শিরোনামটি ছিল : ধেয়ে এল দামোদর।

সাব-এডিটর কাজলের আরও একটি চমকপ্রদ শিরোনাম আজও মনে আছে।

প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। দলের দক্ষ সংগঠক সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সোমেন মিত্র তাঁর দুই বাহু। প্রণববাবু কলকাতা কর্পোরেশন দখল করতে সুব্রত-সোমেনের জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে দিলেন। ক্রমে নির্বাচন সমাপ্ত হল। যাকে বলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সেটাই প্রণববাবুর নেতৃত্বে দেখিয়ে দিল সুব্রত-সোমেনের যুগলবন্দি। বামফ্রন্টের অন্দরে ভোটের ফল নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা। তাদের হাতেই কলকাতা পুরসভা রয়েছে। পরাজয় হলে তারাই কলকাতাকে হারাবে। কিন্তু বামফ্রন্ট জিতলে কংগ্রেস কিছুই হারাবে না। কারণ, তারা তো আগে থেকেই হারার দলে।

ফল ঘোষণাকে ঘিরে প্রচণ্ড উত্তেজনা। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, হাওয়া বলে দিচ্ছিল, কংগ্রেস ভালই লড়াই দিয়েছে। ১৪১ ওয়ার্ডে দ্বিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত ফল দাঁড়াল বামফ্রন্ট ৭০ এবং কংগ্রেসও ৭০। বাকি একজন নির্দল। তাঁর নাম আবদুল খালেক।

অমিতদা এবারও শিরোনাম লেখার জন্য কপিটা কাজলের টেবিলে ঠেলে দিলেন। কাজল যে শিরোনাম লিখল তার পরদিনের কাগজে দেখে অনেকেই প্রশংসা করল। কাজল ওই খবরের শিরোনাম দিয়েছিল, খালেকই এখন মালেক।

মালেক মানে মালিক। কলকাতা কর্পোরেশন কোন পক্ষ শাসন করবে তা ঠিক করে দেওয়ার মালিক নির্দল কর্পোরেটর আবদুল খালেক। তিনি যে দিকে ঢলবেন তারাই বোর্ড দখল করবে।

এত কথা কাজল মাত্র তিনটি শব্দে ফুটিয়ে তুলে তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন।

বয়সের দোষে বা ধর্মে কোথাকার কথা কোথায় এনে ফেললাম। বলছিলাম রাজনৈতিক সংবাদদাতা, বা পলিটিক্যাল করেসপন্ডেন্টের কথা। তা খেই হারিয়ে এনে ফেলেছি সাব এডিটার এবং শিরোনামের কথায়। এবার ফের রাজনৈতিক সংবাদদাতার প্রসঙ্গে ফিরছি।

রাজনৈতিক সংবাদদাতা, এই পদ পরিচিতিতে গ্লামার আছে। কাজটা কিছু সময় বিশেষে খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এতই কঠিন যে মনে হতে পারে, কপিটা শেষ পর্যন্ত নামানো অসম্ভব।

তা যে কতটা কঠিন, কতটা অসম্ভব তা Mechael Dobbs তাঁর House of Cords নামে একটি রাজনৈতিক থ্রিলারে সার্থকভাবে বর্ণনা করেছেন।

ধরা যাক, ব্রিটেনের পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সের নির্বাচন সদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার ফলও ঘোষিত হয়েছে।

এটি ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ভোটের ফলে দেখা গেল, শাসক দল ফের সরকার গড়ার জন্য জনাদেশ পেয়েছে বটে কিন্তু তাদের গরিষ্ঠতায় ভাটা পড়েছে। ভোটের আগে বিরোধীদের সঙ্গে শাসক দলের ব্যবধান ছিল ১৩০ আসনের। এবার তা কমে মাত্র ৩১ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনের বড় বড় খবরের কাগজের রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের কাজের চাপ দারুণভাবে বেড়ে গেল। বার্তা বিভাগের প্রধান তাঁদের কাছে যে যে প্রশ্নের জবাব চান সেগুলি হল : ১) বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী হেনরি কলিনগ্রিস কি ফের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের দখল ফেরত পাবেন? শাসক পার্টির সংসদীয় শাখা তাঁকে ফের সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে মেনে নেবে? নাকি নতুন কাউকে ডাকবে? নতুন মানে কী? নতুন প্রজন্মের কেউ? নাকি প্রবীণ ও পোড়খাওয়া সাংসদদের মধ্যে কেউ?

নাকি কোনও ডার্ক হর্স? ডার্ক হর্সের বাংলা মানে অনেকেই কালো ঘোড়া বলে থাকেন। কিন্তু সেটা আক্ষরিক অনুবাদ হলেও আসল মানে তা নয়।

আমি যখন যুগান্তরে কাজ করতাম তখন অমৃতবাজার পত্রিকায় ঘোড়দৌড়ের টিপস প্রকাশ করা হত। সেই কাজটি যে রিপোর্টার করতেন তাঁর আসল নাম জানতাম না। আমরা তাঁকে ঘোড়ামামা বলে ডাকতাম।

ঘোড়ামামাকেই একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ডার্ক হর্স কাকে বলে?

মামা বললেন, ঘোড় দৌড়ের ব্যাপার হলে ডার্ক হর্স মানে কিন্তু কালো রঙের ঘোড়া নয়। তার মানে হল, যে ঘোড়ার বাজিমাত করার এতটুকু সম্ভাবনা ছিল না সে যখন সম্ভাবনাপূর্ণ ঘোড়াগুলিকে পিছনে ফেলে জয়ের সীমানা টপকে যায় ঘোড় দৌড়ের ভাষায় সেই ঘোড়া ডার্ক হর্স।

অর্থাৎ, ঘোড়াটা কালো রঙের নয়, নতুনও নয়। ঘোড়াটা বরাবর ছিল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে যেন লুকিয়ে ছিল। কেউ তার উপর বাজি ধরত না। অথচ সেই ঘোড়াই একদিন হঠাৎ সকলের সব হিসাব ওলটপালট করে বাজিমাত করে সকলকে চমকে দিল। মাঠের লোকেরা তাকেই বলে ডার্ক হর্সের বাজিমাত।

আবার সেই ভুল হল। ব্রিটেনের ভাবী প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঘোড়ার কথায় চলে এসেছি। ঘোড়ার কথা আর নয়। এবার ফের ব্রিটেনের নতুন সরকারের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। এই বিষয়ে দ্বিতীয় দফার প্রশ্নমালা: ২) শাসক পার্টির সংসদীয় দল হেনরিকে ফের নেতা মেনে নিলে নতুন মন্ত্রিসভা কেমন হবে? পুরনোদের মধ্যে কারা বহাল থাকবেন? কারাই বা বাদ পড়বেন? মন্ত্রী এবং তাঁদের দফতর ওলটপালট হবে কি? যদি হয় তার প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে? মন্ত্রী হতে না পারায় বা শাঁসালো দফতর হাতছাড়া হওয়ায় বঞ্চিত সাংসদ এবং বিক্ষুব্ধ মন্ত্রী এবং তাঁদের সমর্থকরা আয়ারাম-গয়ারামের ভূমিকা নিয়ে হেনরির গদি টলিয়ে দিতে পারবেন কি না?

এই সব স্পর্শকাতর এবং জটিল প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য জবাব দিয়ে লেখা খবর সাতসকালে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। না পারলে কাগজের মর্যাদা ধুলোয়। সার্কুলেশনে টান।

প্রশ্ন অনেক। কিন্তু উত্তর জানেন মাত্র জনাকয়েক নেতা। তাঁদের মধ্যে একজন হেনরি স্বয়ং, কিন্তু তিনি তখন মফস্সলের নির্বাচন

কেন্দ্র থেকে লন্ডনের পথে। রাজধানীতে ফিরে উপরতলার কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে মত বিনিময়ের পর এই বিষয়ে ধোঁয়াশা কিছুটা কাটতে পারে। ততক্ষণ পর্যন্ত সংবাদ শিকারিদের অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

কয়েক ঘণ্টা পরে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি নিবাস ১০, ডাউনিং স্ট্রিট থেকে তাঁর প্রেস সচিব একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রচার করলেন। তাতে বলা হয়েছে, পুনর্নির্বাচিত সব মন্ত্রীকেই মন্ত্রিসভায় ফেরানো হবে। তাঁদের দফতরও বহাল থাকবে। দলের প্রবীণ পদাধিকারীরা প্রধানমন্ত্রীর এই পরিকল্পনায় সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন।

এই সোজাসাপটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে ভবিষ্যতের একটু আভাস দেওয়া গেল বটে। কিন্তু তাতে জল্পনা কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠল। বার্তা বিভাগের শীর্ষস্থান থেকে রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের উপর প্রবল চাপ এল, এই খবরের পিছনের বস্তুনিষ্ট খবর চাই-ই চাই।

এই নির্দেশ পেয়ে দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের রাজনৈতিক সংবাদদাতা, মিস ম্যাটি স্টোরিন পত্রপাঠ যুদ্ধে লেগে গেলেন। কিন্তু সূত্র? ম্যাটিকে কে দেবে খবরের অন্তরালের বস্তুনিষ্ঠ খাস খবর ?

পুনর্নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, শাসক দলের চেয়ারম্যান, একাদিক্রমে সপ্তমবার নির্বাচিত বরিষ্ঠ সাংসদ মান্যবর স্যামুয়েল উইলিয়মস কেউই এই ব্যাপারে মিডিয়ার কাছে মুখ খুলবেন না।

তা হলে উপায়?

ম্যাটি জানেন, উপায় একটা বার করতেই হবে। অতএব নানা দরজার কড়া নাড়লেন ম্যাটি। নানা সম্ভাব্য সূত্রের বৈঠকখানায় ফোন বাজল তাঁর। কিন্তু সবই বিফল। কারও কাছ থেকে তিনি সাড়া পেলেন না।

কিন্তু তাই বলে হতাশ হলে চলবে না।

বিদায়ী সরকারের প্রবীণ সংসদীয় মন্ত্রী এবং চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোহাটের বাড়িতে আরও একবার ম্যাটি ফোন করলেন। কিন্তু অবস্থা যথা পূর্বং, তথা পরং। এবারও কেউ ফোন ধরল না।

কিন্তু ম্যাটি তাতেও অদম্য। তিনি এবার গাড়ি হাঁকিয়ে ফ্র্যান্সিসের বাড়িতে হানা দিলেন। বাইরে থেকে দেখা গেল বাড়ির মধ্যে আলো জ্বলছে। ম্যাটি দরজার কলিং বেল বাজালেন। কিছুক্ষণ পর ফ্রান্সিস নিজেই দরজা খুললেন।

তাঁর মনে হল, তরুণীটিকে আগে কোথাও দেখেছেন। কিন্তু তার নাম বা পরিচয় কোনওটাই চট করে তাঁর মনে এল না। তাই কিছুটা আশ্চর্য হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

এতেই ম্যাটি সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং রাজনৈতিক সংবাদদাতার মুনশিয়ানা দেখালেন। তিনি নিজের পরিচয় ঘোষণা করে বললেন, আমি টেলিগ্রাফের ম্যাটি। আপনার মাত্র দু'-চার মিনিট সময় নেব। ভিতরে আসতে পারি?

ফ্রান্সিস সাবধান হলেন। বললেন, আমি দুঃখিত মিস। গত একটা মাস প্রচণ্ড ধকল গিয়েছে। আমি বড় ক্লান্ত। আপনি বরং পরে একদিন আমার সময় নিয়ে আসবেন। কেমন?

এই সব বলে ম্যাটির মুখের উপর ফ্রান্সিস দরজা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু একটু দেরি করে ফেললেন। ম্যাটি চট করে দরজার দুটি পাল্লার ফাঁকে ডান হাতটি একটু গলিয়ে দিয়ে বললেন, স্যর আমি বিকেল থেকে আপনার সঙ্গে ফোনে বা মুখোমুখি কথা বলার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু একবারও সে সুযোগ পাইনি। আমি জানি আপনি খুবই ক্লান্ত। এখন আপনার বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আমার সঙ্গে কথা বলার এটা উপযুক্ত সময়ও নয়। তবু বাধ্য হয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি। আপনি কেবল বলুন, বিদায়ী মন্ত্রিসভায় ঝাঁকুনি না দেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে আসল কারণটা কী?

বিরক্ত ও বিব্রত ফ্রান্সিস কিছুটা রুক্ষভাবে জবাব দিলেন, আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।

এইটুকু শুনেই ম্যাটি সোল্লাশে বলে উঠলেন, ফার্স্ট ক্লাস। দারুণ খবর। তবে আমার মনে হয়, খবরটা কাল সকালে টেলিগ্রাফে বেরোলে আপনার সুবিধা হবে না। অসুবিধা হবে।

মেয়েটার এইসব কথা শুনে ঝুনো রাজনীতিক ফ্রান্সিস তো আকাশ থেকে পড়লেন। বলে কী? দারুণ খবর?

একটু দ্বিধা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, খবরটা কী?

কেন, মন্ত্রিসভা গড়া নিয়ে শাসক দলের উপরতলায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। দফতর রদবদলের সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রী খারিজ করে দেওয়ায় কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী বিক্ষুব্ধ। সংসদীয় মন্ত্রী ও চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোহাট তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার জন্য চেষ্টা ও আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উচ্চাশায় প্রধানমন্ত্রী জল ঢেলে দিয়েছেন। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত নীতির সমর্থনে একটি কথাও বলেননি।

এই খবরটাই তো কাল টেলিগ্রাফের প্রথম পৃষ্ঠার বড় খবর হবে।

ম্যাটির এই দুষ্টুমির সামনে ফ্রান্সিস হেরে গেলেন। বিক্ষুব্ধ বলে দাগি হওয়ার ভয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তিনি এবার পিছিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে ভিতরে আসার পথ করে দিলেন।

ম্যাটির প্রশ্ন এবং ফ্রান্সিসের উত্তরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল একটি সাড়া জাগানো খবর। পরদিন টেলিগ্রাফের প্রথম পৃষ্ঠায় তা প্রকাশিতও হল:

মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন নিয়ে
প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহের মুখে
রাজনৈতিক সংবাদদাতা, ম্যাটি স্টোরিন

১৪ জুন : নির্বাচন পরবর্তী মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হেনরি কলিনাগ্রিস পরস্পর বিরোধী চাপের মুখে পড়েছেন। কয়েকজন নবীন সাংসদ মন্ত্রী হওয়ার জন্য জোরদার লবি করেছেন। অন্যদিকে কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী আগের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব আশা করছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সকলকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করার কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় তিনি বিদায়ী মন্ত্রিসভার বিদায়ী সদস্যদের সকলকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পুনর্নির্বাচিত সংসদীয় মন্ত্রী ও চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোহাট প্রধানমন্ত্রীর ওই সিদ্ধান্তকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানাচ্ছে, দলের নবীন ও প্রবীণ সাংসদদের চিফ হুইপ বোঝাচ্ছেন, ক্ষমতালাভের জন্য এখন ইঁদুর দৌড়ের সময় নয়। পূর্ণ উদ্যমে কাজের মধ্যে দিয়ে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার সময়।

কিন্তু শাসক দলের অন্দরমহলে ভিন্ন মতও মাথাচাড়া দিয়েছে। একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী নতুন দলনেতা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সরকারকে পুরো মেয়াদ টেকাবার জন্য চেষ্টা করতে চায়। নতুন দলনেতার পদে কে যোগ্যতম প্রার্থী হতে পারেন তা নিয়ে পুরোদমে বিচার বিবেচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিরোধী দলের মুখপাত্র বিজয়ী দলকে টাইটানিক এবং প্রধানমন্ত্রীকে তার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শাসক দলের ঘরের মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছে। তা নেভাবার শক্তি বা সমর্থন কোনওটাই প্রধানমন্ত্রীর হাতে নেই। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে দেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরিস্থিতি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।



কাগজের সম্পদ

যুগান্তরের যুগ্ম সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরি বলতেন, রিপোর্টাররাই কাগজের শিরদাঁড়া। শিরদাঁড়া দুর্বল হলে কাগজ কোনও দিন সবল হয় না।

তিনি আরও বলতেন, রিপোর্টাররা সবই এক কিসিমের হয় না। তিন কিসিমের হয়। যেমন, উপঢৌকন সংগ্রহ এবং পান-ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা ছাড়া কোনও কাজে উৎসাহ পান না তিনি অধম রিপোর্টার।

যে রিপোর্টার নির্দিষ্ট কাজের বা বিটের বাইরে কাজ করতে চান না তিনি মধ্যম মানের রিপোর্টার।

যে রিপোর্টার নির্দেশ পেলেই যে কোনও বিষয়ে, যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে খবরের জন্য ছুটে যান, নির্দিষ্ট কাজ না পেলে বসে বসে রাজা-উজির বধ করেন না। নিজের গরজে খবর খুঁজে বেড়ান— এই রকম রিপোর্টারই উত্তম রিপোর্টার। এই রকম রিপোর্টারই কাগজের সম্পদ।

বরুণ সেনগুপ্ত নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে এক নম্বরে ছিলেন। সকাল থেকে তাঁর কাজ শুরু হত, প্রয়োজনে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি কাজ করতে। সুখরঞ্জন সেনগুপ্তও ছিলেন একজন উত্তম রিপোর্টার। যুগান্তর থেকে তিনি আনন্দবাজারে চলে গিয়েছিলেন। মহাকরণে শীর্ষ আধিকারিকদের ঘরে তাঁর জন্য ছিল অবারিত দ্বার। রাজ্য ও কেন্দ্রের প্রাক্তন আধিকারিক এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় নিশ্চয়ই আমার এই মন্তব্যের পক্ষে বলবেন।

কনিষ্ঠদের মধ্যে সোমা মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতেই হয়। যুগান্তরে তাঁর হাতেখড়ি। এখন আনন্দবাজারে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন।

আর বলি প্রবীর ঘোষালের কথা। ১৯৮৪ সালে বরুণবাবু আনন্দবাজার ছেড়ে অনেক লড়াই করে বর্তমান চালু করে দিলেন। বর্তমানে রিপোর্টিং বিভাগে শেষ রিক্রুট প্রবীর। ছোটখাটো চেহারা, বিনয়ী, স্বল্পবাক প্রবীর প্রথম দিকে ছিল যেন উপেক্ষিত। সেই প্রবীর এমন কীর্তি করল যা দেখে বরুণবাবু তাঁকে কাছে টেনে নিতে সময় নেননি।

৩১ ডিসেম্বর প্রবীরের উপর ফরমাশ হল, কাল দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসবটা একটু দেখে এসো। দু'-তিন প্যারা লিখতে হবে।

প্রবীর তাই করল। অফিসে ঢুকে কল্পতরু উৎসবের রিপোর্ট লিখে সেটা চিফ রিপোর্টারের হাতে দিল। সেই সঙ্গে আরও একটা কপি।

চিফ রিপোর্টার সেটায় চোখ বুলিয়ে কপিটি হাতে নিয়ে বরুণবাবুর কাছে গেলেন। তিনি কপিটা দেখে প্রবীরকে ডাকলেন। জানতে চাইলেন, এই খবরের কোনও প্রতিবাদ হবে না তো? প্রতিবাদ হলে খুব মুশকিল হবে। কাগজের বদনাম হবে।

প্রবীর বলল, আমি জেনে এসেছি, উনি চান এটা ছাপা হোক। উনি প্রতিবাদ করবেন না। আমি কপিটা ওঁকে দেখিয়েছি।

বরুণবাবু কিছুক্ষণ প্রবীরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর যেতে বললেন।

পরদিনের বর্তমানে চার কলম অ্যাঙ্কারে প্রকাশিত প্রবীরের সেই কপি সিপিএম রাজ্য দফতরে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। কপিটি ছিল প্রবীণ সিপিএম নেতা মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের বিপর্যয়ের জন্য তিনি সেই সাক্ষাৎকারে পার্টির নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, পার্টি ধর্মচ্যুত হয়েছে তাই এই ফল।

ওই নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রবীরের সেই বিস্ফোরক রিপোর্টের কোনও প্রতিবাদ মনোরঞ্জনবাবু করেননি। তাতে প্রবীরের উপর বরুণবাবুর আস্থা জন্মেছিল। প্রবীর তা কখনও নষ্ট হতে দেয়নি। সযত্নে রক্ষা করেছিল। তারপর থেকে তাকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। জহুরি বরুণবাবু তাঁর স্নেহের প্রবীরকে অগাধ সুযোগ দিয়ে গিয়েছেন।

সেই দিন প্রবীর যদি কল্পতরু উৎসবের কপি নামিয়েই হাত ধুয়ে ফেলত তা হলে তাকে সেখানেই থেমে থাকতে হত। উত্তম মানের

শ্বাসযন্ত্রের শাসানি

ডাঃ শান্তনু সেন



শ্বাসযন্ত্রের রোগ বলতে আমরা সবাই সাধারণত বুঝি যক্ষ্মা, হাঁপানি, প্লুরিসি, হার্টের অসুখ ইত্যাদিকে। কিন্তু এ ছাড়াও বুকের আরও কতকগুলি সাঙঘাতিক রোগ আছে যা সাধারণ মানুষের অজানা।

হাইড্রোমোক্স :
বুকের ভিতরে প্লুরার মধ্যে হঠাৎ জল জমে গিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই জল ৩০০ থেকে ৪০০ মিলি পর্যন্ত বুকে জমতে পারে। আমাদের বুকের মধ্যে উপরের দিকে ফুসফুসের উপরেই সাপের খোলসের মতো এক একটি কোমল পর্দা ফুসফুসকে ঢেকে রাখে চারদিক দিয়ে থলির মতো। এই পর্দাকে ঝিল্লি বা ইংরেজিতে প্লুরা বলে। স্বাভাবিকভাবে, প্লুরা থেকে অল্প পরিমাণে নিঃসৃত তরল রস প্লুরাটিকে মসৃণ ও পিচ্ছিল করে রাখে যাতে পাঁজরের সঙ্গে কোনওরকম ঘর্ষণ না লাগে ফুসফুসের।

কিন্তু কোনও কোনও সময় কোনও কারণে প্রদাহ হয়ে প্লুরা শুষ্ক এবং প্লুরার আবদ্ধ থলির মধ্যে জল যায়। এই অবস্থাকেই প্লুরিসি বা প্লুরাইটিস বলা হয়ে থাকে। প্লুরিসির ফলে বুকের দু'দিকেই জল জমে। এই পীড়ায় ফুসফুসকে পিঠের দিকে চাপ দেয় এবং বক্ষস্থল ফুলে ওঠে।
কারণ : সাধারণত ফুসফুস কিংবা হার্টের নানারকম রোগের ফলেই জল জমে বক্ষস্থলের প্লুরায়। কারণ এই সব রোগের ফলে এই জায়গায় রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও ব্রাইটস ডিজিজ, লিভার ও প্লীহার অসুখ, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি রোগের কারণে জল জমতে পারে।

এই রোগে আক্রান্ত রোগী ঠিকমতো শুনতে পারে না। শুলে শ্বাসের কষ্ট হয়। একে ডিসপেনিয়া বলে। অথচ, বসে থাকলে রোগীর আরাম বোধ হয়, কারণ বুকের মাঝে জল তলার দিকে নেমে যায়, ফুসফুসের উপরের দিকে খালি হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট কমে। চিত হয়ে শুলে এই রোগের রোগীর খুব কষ্ট হয়। বুকের মধ্যে সমস্ত জল ফুসফুসের উপর ছড়িয়ে চাপ সৃষ্টি করে। এই জল হার্টের উপর চাপ সৃষ্টি করলে রোগীর হার্ট বন্ধ হয়ে মৃত্যুও হতে পারে।
হিমোথোরাক্স :
বক্ষস্থলের প্রদাহের কোনও লক্ষণ না থেকে প্লুরার মধ্যে জলের বদলে রক্ত জমলে তাকে হিমোথোরাক্স বলে। সাধারণ, বুকে কোনও চোট বা আঘাত লেগে, বুকে তির বা অন্য কিছু বিঁধে দিয়ে, বন্দুকের গুলি লেগে পাঁজরায় চোট লেগে ভেঙে গেলে বা কোনও রক্তবাহী নালীতে চোট লেগে থেঁতলে বা ফুটো হয়ে গিয়ে অথবা টিউবাকল বা ক্যানসার হলে এই অসুখ হতে পারে। এই রোগে হঠাৎ রোগীর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়, কোনওরকম কাশি প্রভৃতি না থেকেও। মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। রোগী মূর্ছা যায়।
নিউমো থোরাক্স :
প্লুরাল স্যাক বা থলির মধ্যে বায়ু বা গ্যাস থাকে এর সঙ্গে পুঁজ রক্ত সিরাম থাকে সে জন্য একে নিউমোথোরাক্স বলে। এই রোগ বুকের যেদিকে হবে সেই দিকের পাঁজর ফুলে ওঠে। বুকের বাঁদিকে আক্রান্ত হলে হৃৎপিণ্ডকে ডানদিকে ঠেলে দেয়। রোগ নিচের দিকে নেমে আসে। বুকের ডান দিকে আক্রান্ত হলে লিভারের চাপের ফলে উদর গহ্বরে লিভার নেমে আসে। কোনও কারণে ফুসফুসের প্লুরা ছিঁড়ে গেলে ফুসফুসের বায়ু প্রবেশ করে। এ ছাড়া পালমোনারি কনজেশন এবং বুকে পুঁজ, এম্ফাইমা হলে, ফুসফুসে গর্ত হয়। তখন তাতে বায়ু, রক্ত জমে। হঠাৎ রোগীর বুকের মধ্যে কী যেন একটা ফেটে যাওয়ার মতো হয়। রোগীর খুব শ্বাসকষ্ট হতে থাকে।
এম্ফাইসিমা :
ফুসফুসের এলিওলার টিস্যুর মধ্যে বায়ু প্রবেশ করলে ফুসফুসের বায়ুকোষ বেড়ে যায়। একেই বলে এম্ফাইসিমা। এটা দু'ধরনের হয়—ভেসিকুলার : আক্রান্ত ফুসফুস ফুলে বড় হয়ে যায়। এক একটা কোষ মটরের মতো বড় হয়। একে বসে ভেসিকুলার এম্ফাইসিমা।
ইন্টারলোবিউলার এম্ফাইসিমা :
ব্রঙ্কাইটিস, হুপিং বা দীর্ঘদিনের কাশি জোরে জোরে কাশলে ফুসফুসের লোমের ভিতর বায়ু প্রবেশ করে। বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। এর জন্য ফুসফুসের ক্যাপিলেরিসা শিরাগুলি কুঁকড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ফুসফুসে বায়ু সঞ্চালনের স্থান কম হয়। এ জন্য হার্টের হাইপারট্রফি হয়, ফুসফুস বড় হয়ে যায়। ব্রঙ্কিয়াল টিউব বড় হতে ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। এই অসুখে প্রচণ্ড কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। শরীর অবসন্ন হয়ে যায়।
হাঁপানি :
প্রধানত দু'রকমের হয়। প্যোজমেডিক ও ব্রঙ্কিয়াল। এই রোগে ব্রঙ্কিয়াল টিউবগুলোর পথ সরু হয়ে যায়। তার জন্য ফুসফুসে ঠিক করে বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। শ্বাসকষ্ট বা টান হয়। কখনও কখনও হাঁপানির টানে রোগীর ফিটও হতে পারে। যাদের ঘন ঘন ফিট হয় তাঁদের পরে হার্টের রোগ ও শোথ বা ড্রপসি হয়। হাঁপানি রোগীরা অমাবস্যা- পূর্ণিমায় কষ্ট পায় বেশি। হাঁপানি রোগীদের পথ্য বা খাদ্য সবসময় লঘু পাচ্য বা সহজ পাচ্য হওয়া দরকার যাতে পেটে গ্যাস না হয়। ভূরিভোজ কখনওই করা উচিত নয়। পেট কিছুটা খালি রেখে সব সময় সহজ পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। ধুলো ময়লা বা ডাস্ট এবং ধোঁয়া বা গ্যাস জাতীয় পরিবেশ এড়িয়ে চলা উচিত।
ডায়াফ্রামে ছিদ্র :
হঠাৎ কোনও ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে পেটের কোনও যন্ত্রে পুঁজ হয়ে ডায়াফ্রামে ছিদ্র হয়ে যায়। বুকের কোনও পীড়া হলে ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়। কাশি কিংবা হিক্কা বা শ্বাস কষ্টের মতো হবে। পেটের কোনও রোগের ফলে বমি, কাশির কষ্ট, ভীষণ কোষ্ঠবস্তু হবে। পায়োথোরাস্ক কিংবা ওইরকম কোনও বক্ষ পীড়া হলে ডায়াফ্রামে ছিদ্র হলে পেরিটোলাইটিস হয়। ডায়াফ্রাম হল একটা মোটা পদার্থ। এটা শক্ত পেশি ও টেন্ডন দিয়ে নির্মিত ঘোড়ার পায়ের নালের মতো দেখতে। ওই পর্দা বুক ও পেটের মাঝখানে থেকে বুক ও পেটের মধ্যে সামান্য বিভক্ত করে রাখে যাতে বুকের ও পেটের মধ্যেকার কোনও যন্ত্র পরস্পরকে স্পর্শ করতে না পারে। ডায়াফ্রামের উপরের দিকে থাকে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এবং নিচে থাকে লিভার, পাকস্থলি, প্লীহা, প্যাংক্রিয়াস, অন্ত্র প্রভৃতি। ডায়াফ্রামের প্রদাহ হলে একে বলে ডায়াফার্মাইটিস।
নিউমোনিয়া :
অর্থাৎ ফুসফুসের প্রদাহ। ফুসফুস বা লাংসের মধ্যে দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াত করে। ফুসফুসের মধ্যে মৌচাক বা স্পঞ্জের মতো অনেক প্রকোষ্ঠ বা গর্তের আকারে এসার সেল আছে। নিউমোনিয়া হলে ফুসফুসের ওই গর্তগুলো ভরে গিয়ে নিরেট বা কঠিন আকার নেয়। নিওমো কক্কাই নামক এক ধরনের জীবাণু এই রোগের প্রধান কারণ। ফুসফুসে আঘাত পাওয়া, ঠান্ডা লাগা, পাঁজরের হাড় ভাঙা ইত্যাদি কারণেও নিউমোনিয়া হয়ে থাকে। নিউমোনিয়া কখনও এক পাশে বা দু'পাশে লাংসেও হয়ে থাকে।
উপসর্গ :
নিউমোনিয়ার প্রধান কষ্টদায়ক উপসর্গগুলি হল : ডিসপোনিয়া বা শ্বাসকষ্ট। সায়ানসিস রোগীর শরীর বিশেষত হাত, পা, নখ, আঙুল নীলবর্ণ হয়ে যায়। ফুসফুস নিরেট হয়ে যাওয়ার ফলে ভাল করে বাতাস বা হাওয়া ফুসফুসে ঢুকতে পারে না। হার্টের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। একে বলে কার্ডিয়াক ডিসপোনিয়া। ডিসপোনিয়া স্নায়বিক কারণে হলে তাকে বলে নার্ভস ডিসপোনিয়া। রোগীর বিকার বা ভিলিরিয়াক হতে পারে। উচ্চ মাত্রায় জ্বর হয়। সবশেষে হার্টফেল হওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। নিউমোনিয়া সাধারণত দিন ৭-১০ ভোগায়। অনেক সময় তিন সপ্তাহও লেগে যায় ভাল হতে।

নিবন্ধ

সুভাষচন্দ্রের জীবনে তিন মনীষী

কৃষ্ণকুমার দাস

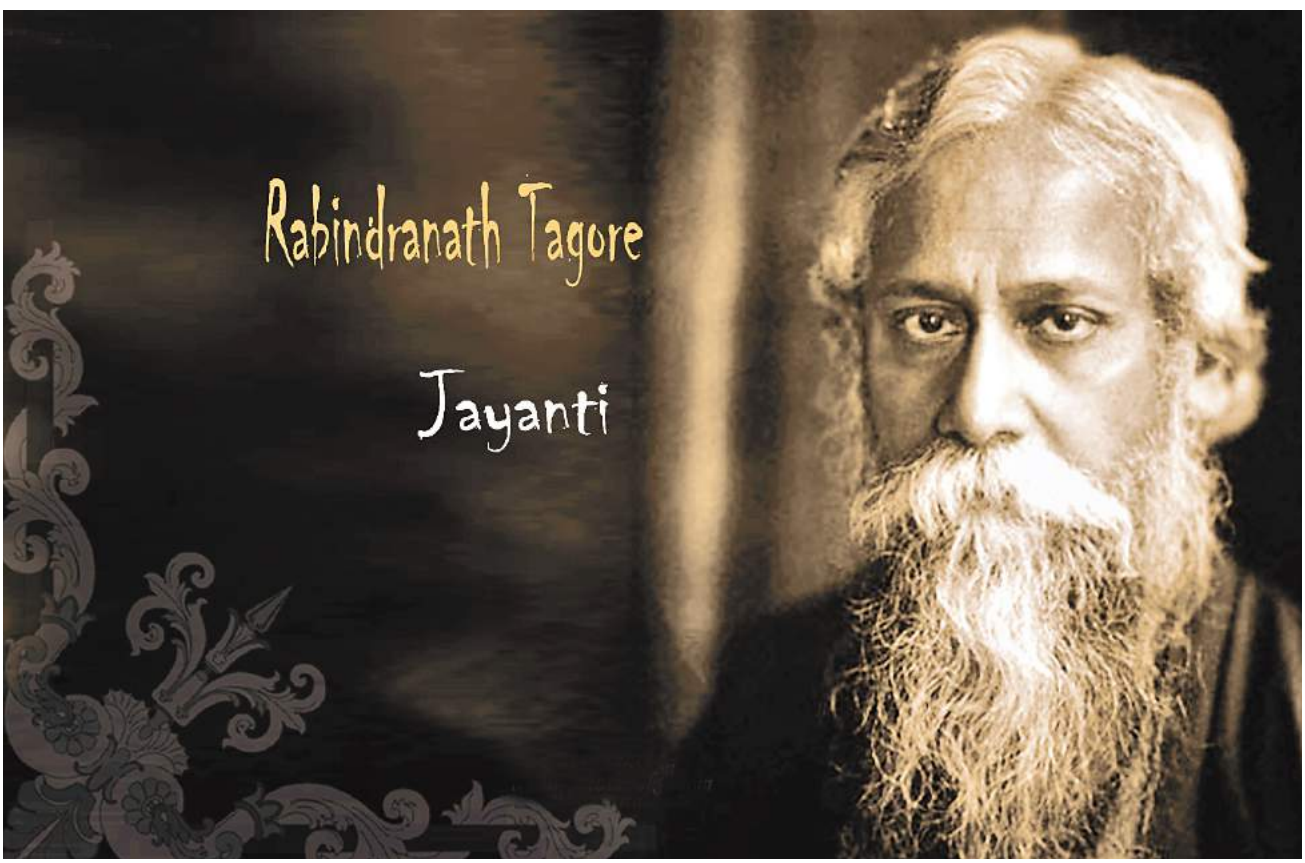

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন— সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই তিন মনীষীর প্রভাব অপরিসীম। বিবেকানন্দের দেহান্তের সময় সুভাষের বয়স পাঁচ মাত্র। কৈশোর ও যৌবনে স্বামীজির শৌর্য এবং সাহসের অসংখ্য উপাখ্যান শোনার মধ্যে দিয়ে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন।

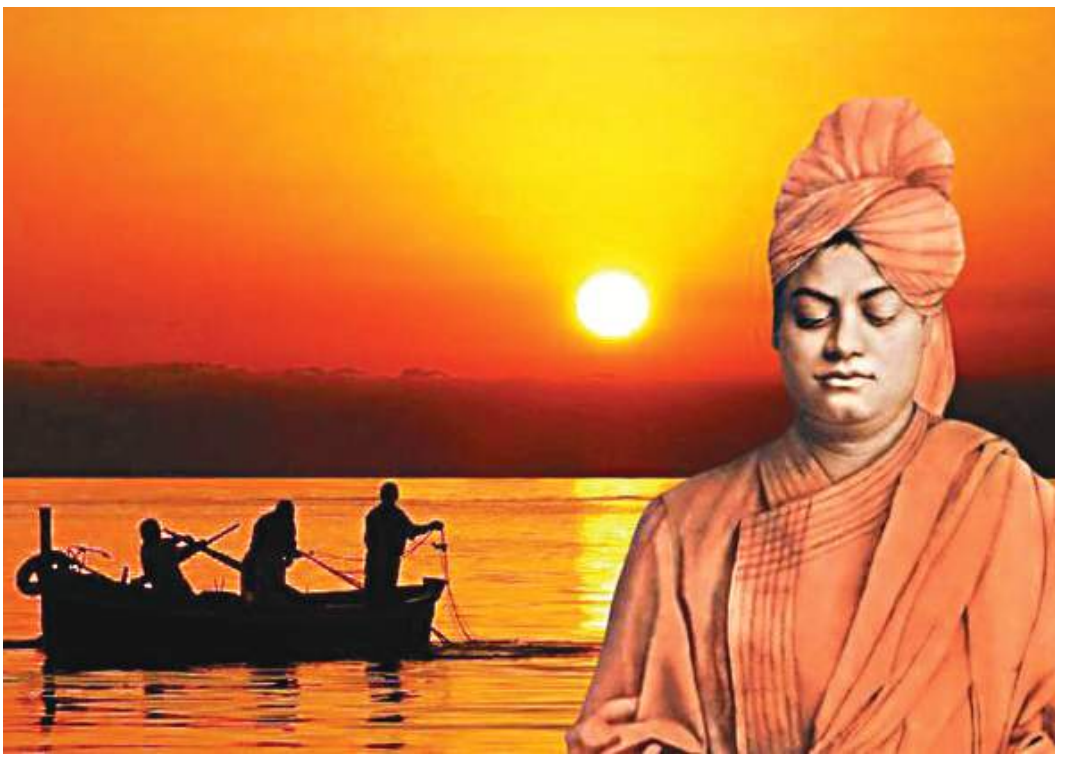

বিবেকানন্দের স্মৃতি সে সময় তরুণদের মনে সদা জাগ্রত। শুধু সুভাষ নয়, তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীরা প্রায় সকলেই স্বামীজির ত্যাগ ও নির্ভিকতার আদর্শ থেকে প্রেরণা পেতেন। উপনিষদে উক্ত বিবেকানন্দের সুখ নিঃসৃত অভীঃ মন্ত্র তাঁকে আজীবন প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। সুভাষের অকুতোভয়তার উৎস স্বামীজির জ্বলন্ত পাবকের মতো দিব্য জীবন।

যৌবনে সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করেন আর একজন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। বিশেষভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন অনেকাংশেই কবিগুরুর ভাবধারায় গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মানসিকতা, উদারপন্থী চিন্তাধারা এবং গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সুভাষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সময় জটিল সমস্যায় আক্রান্ত এবং সঙ্কীর্ণ বিরোধিতায় পর্যুদস্ত সুভাষচন্দ্র পরামর্শ ও সান্ত্বনার জন্য বারবার রবীন্দ্রনাথের কাছে ছুটে গিয়েছেন। ফলে তাঁদের দু'জনার সম্পর্ক ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছয়।

সুভাষের রাজনীতিতে হাতেখড়ি চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে। স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠাতা চিত্তরঞ্জন এই শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে প্রধান অফিসার নিযুক্ত করেন। গান্ধীজির আহ্বানে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি ব্যরিস্টারি পেশা এবং যাবতীয় অর্থসম্পদ দেশ-মাতৃকার উদ্দেশে নিবেদন করে দেশবাসীর দ্বারা 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর এই অসামান্য ত্যাগ সুভাষের ব্যক্তিজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। অবশ্য বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন অহিংসার উপরেই অধিক আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু সুভাষের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এবং পরবর্তী জীবনে তিনি তা প্রমাণও করেছেন যে, দেশের স্বাধীনতা গান্ধীবাদী অহিংস সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্যের পথে মিলবে না, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমেও তা লাভ করা সম্ভব নয়, তার জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন সশস্ত্র বিপ্লবের।

এ পর্যন্ত আমরা সুভাষচন্দ্রের উপর যে তিন মনীষীর প্রভাব উল্লেখ করেছি, তাঁদের মধ্যে এবার বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলার প্রয়াস পাব। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুভাষ যখনই কোনও রাজনৈতিক সমস্যায় পড়েছেন তখনই ছুটে গিয়েছেন কবিগুরুর কাছে। তাছাড়া সঙ্কীর্ণ রাজনীতির আবর্তে যখনই তিনি পর্যুদস্ত হতেন তখনই তাঁর আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াতেন রবীন্দ্রনাথ। পাশাপাশি রাজবন্দি সুভাষের মুক্তির দাবিতে কবিগুরু যে কতবার সরব হয়ে উঠেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে তিনি কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছেন, তাঁকে দিয়ে কলকাতায় উদ্বোধন করিয়েছেন শিল্পপ্রদর্শনীর। স্থানাভাবের কারণে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র উভয়ের সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলির অল্প কয়েকটির উল্লেখ এখানে করব।

১৯২৪ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখের অধ্যাদেশ বলে ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্র-সহ বহু তরুণ কংগ্রেস কর্মীকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য গ্রেফতার করায় ১৯২৭, ৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে খোলা চিঠির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই অর্ডিন্যান্সের তীব্র নিন্দা করেন।

মে, ১৯২৭ ইংরেজ কারাগার থেকে সুভাষের মুক্তিতে শিলং

থেকে প্রেরিত এক বার্তায় রবীন্দ্রনাথ নিজের আনন্দের কথা জানান।

১৯৩০-এর শুরুতে আলিপুর কোর্টে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ রাজনৈতিক কর্মীদের এক মামলায় রবীন্দ্রনাথ আসামী পক্ষে সাক্ষ্য দেন।

১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে ইংরেজ সরকারের হাতে বন্দি অসুস্থ সুভাষের আরোগ্য কামনায় দেশব্যাপী গণপ্রার্থনার আয়োজন করা হলে রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত হন।

বিশ্বভারতীর অর্থসঙ্কটকালে সেই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে দেখে তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। এই উপলক্ষে তিনি সুভাষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : "তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি, দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি, আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখে এ কাজের মধ্য সত্য আছে কি না, পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।" উত্তরে সুভাষচন্দ্র শুধু বলেছিলেন : "যে প্রতিষ্ঠান সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার বিনাশ নেই।"

১৯৩৬, ১০ মে 'সুভাষ দিবসে' রবীন্দ্রনাথ যে বাণী দেন তাতে, সুভাষকে বিনা বিচারে বন্দি করে সরকার যে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

দীর্ঘকাল বিনা বিচারে ইংরেজ কারাগারে বন্দিজীবন কাটাবার পর মুক্তি পেলে ১৯৩৭-এর এপ্রিলে সুভাষকে কলকাতায় যে বিপুল জনসংবর্ধনা জানানো হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে নিম্নলিখিত বাণী পাঠান : "সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি সুভাষকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

১৯৩৮ সালের জুন মাসে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতায় শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের শিল্পীদের নির্মিত চিত্রের এবং শিল্পদ্রব্যের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে সদ্য নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে বলেন : "তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকার করেছি মনে মনে। আমার সঙ্কল্প আছে জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী প্রকাশ করব।"

উত্তরে সুভাষ জানান : "আপনি শুধু জাতিকে— শুধু জাতিকে কেন, সমগ্র মানব সমাজকে আদর্শের পথ দেখিয়েছেন— শুধু দেখিয়েছেন তা নয়, মানুষকে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করে এসেছেন। অন্তরের আদর্শকে আপনি বহির্জীবনে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই— এই আদর্শ আমাদেরও জীবনের আদর্শ।"

মাঘ ১৩৪৫ ইং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত 'তাসের দেশ' নাটিকাটি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন এই বলে: "স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"

১৯ আগস্ট ১৯৩৯ সুভাষচন্দ্র-পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে সুভাষচন্দ্র বলেন :"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন, সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং সেটা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীক স্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। পরিশেষে, আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি। এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ বপন করাতে পারছি যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব।"

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরীতে দ্বিতীয়বারের মতো কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র। হরিপুরা কংগ্রেসের মতো এবারও বামপন্থীরা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এতকাল প্রধানত গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতিরূপে নির্বাচিত হতেন। এ বছর সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন পট্টভি সীতারামইয়া। তাঁকে সমর্থন ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন গান্ধীজি। সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করলে গান্ধীজি বলেন, এটা আসলে তাঁরই পরাজয়। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস অধিবেশনে বলেছিলেন, ইংরেজ সরকারকে অবিলম্বে চরমপত্র দেওয়া হোক এবং উপযুক্ত সাড়া না পাওয়া গেলে আইন অমান্য শুরু করা হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনি বলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার সময় যেন প্রগতিশীল ও সমাজবাদী সভ্যদের নির্বাচিত করা হয়।

প্রধানত সুভাষের এই দুটি প্রস্তাব কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের পছন্দ হয়নি। গোবিন্দবল্লভ পন্থ এপ্রিল ১৯৩৯-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব আনেন যাতে বলা হয়, ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব গান্ধীজির হাতে ন্যস্ত করা হোক, সভাপতির এ ব্যাপারে কোনও মতামত থাকবে না। পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা শৃঙ্খলারক্ষায় দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়ায় গান্ধীজিকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও আস্থা জানান। এই পরিস্থিতিতে ২৯ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলে অনেক জলঘোলার পর সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়। বিনা ভোটে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি ঘোষণা করেন সেদিনের কর্মপরিচালিকা সরোজিনী নাইডু।

সুভাষের প্রতি এই অবিচারে অধিবেশনে উপস্থিত বাঙালি প্রতিনিধিরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। সমগ্র বাংলাদেশ প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশের কাছে সুভাষচন্দ্র এইভাবে অপদস্থ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হয়েছিলেন। কেন না মনেপ্রাণে কবি তাঁকে সমর্থন করতেন। সুভাষের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধির উপর তাঁর আস্থা ছিল। বয়োকনিষ্ঠ হলেও নিঃস্বার্থ দেশসেবক হিসাবে সুভাষকে শ্রদ্ধা করতেন রবীন্দ্রনাথ। নানা উপলক্ষে কবি তাঁর এই আস্থা ও শ্রদ্ধা জনসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেস নিয়ে উভয়পক্ষের বিরোধ চরম পরিণতিতে



পৌঁছনোর আগেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ব্যাপারটির সম্মানজনক ফয়সালার জন্য। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনওরকম উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া না মেলায় কবি হতাশ হন। সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির বিরূপ মন্তব্য রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করে। সুভাষ ছিলেন প্রগতিবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। কংগ্রেসের রক্ষণশীল গোষ্ঠী এই নতুন ভাবধারায় ভীত হয়ে ওঠে। পুরনো রীতি পরিত্যাগ করে নবীন আদর্শ গ্রহণ করার মতো মানসিক ঔদার্য দক্ষিণপন্থীদের ছিল না। তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীলতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেদিন ফ্যাসিস্ট শক্তির গুণকীর্তনের পর হিটলারের সমান শক্তিধর রূপে গান্ধীজির বন্দনা করায়।

এইসব অবাঞ্ছিত বেদনাদায়ক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে লেখেন : "ভালো মন্দের আদর্শের চেয়ে বড় হল চোখ বুজে মেনে চলার আদর্শ। অবশেষে আজ, এমনকী, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসঙ্কোচ জয় ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমি এক জায়গায় লিখেছিলুম, 'Proud power tries to keep truth safe in its own exclusive hand with a grip that kills it.' ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোক গিলিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়।"

ঐতিহাসিকদের মতে, নিঃসন্দেহে সুভাষের সেদিনকার আচরণে কিছুটা অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছিল। সুভাষ যেখানে স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাঁর সমালোচনায় কুণ্ঠিত হননি। আবার তাঁর উপর কৃত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেও কবি নিরন্তর সোচ্চার। প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের উপযুক্ত জবাব তিনি দিয়েছেন সুভাষকে নেতৃপদে বরণ করে 'দেশনায়ক' প্রবন্ধের মাধ্যমে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষের অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনার দিনে নিজের অবস্থান ঘোষণা করতে কবির এতটুকু দ্বিধা হয়নি। ৩মে ১৯৩৯ এক তারবার্তায় রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে জানিয়েছেন : "অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতাবোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে, তাহা হইলেই আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।..."

অকুণ্ঠচিত্তে তিনি সুভাষকে দেশনায়কের পদে অভিষিক্ত করে আশাপ্রকাশ করেছেন : "আজ আমি জানি বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন... সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে সেই ধূলিচক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যকে স্পষ্ট দেখতে পাইনে— আমার দেখার শক্তি নেই। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড় করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ় সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।"



নিবন্ধ

পৃথিবীর প্রথম রাজ্যে স্বীকৃত ন্যাচারোপ্যাথি

তুষার শীল



যোগ ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস। পাঁচ হাজার বছর আগেও যোগের অস্তিত্ব রয়েছে। যার প্রমাণ খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার সাতশো বছর আগে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার সভ্যতায় আবিষ্কৃত, পোড়া মাটির যোগের আসনের অনেক মূর্তি।

যোগ মানুষকে শিক্ষা দেয়, হিংসা পরিত্যাগ করতে, সত্যকথা বলতে, চুরি না করতে, শরীর ও মনের সংযমের আর অপ্রয়োজনীয় কোনও দ্রব্য না নিতে। দেহের বাইরে ও ভিতরে শুচিতা, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা, একাগ্রতা অর্থাৎ কোনও কিছুতেই বিচলিত না হওয়া। জীবনের প্রয়োজনীয় শাস্ত্র ও সৎগ্রন্থ পড়া এবং সবকিছু পরম গুরু ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা-এছাড়া রয়েছে আসন যা নিয়মিত অভ্যাসে শরীর থাকে সুস্থ ও মজবুত। শ্বাস-প্রশ্বাসকে সঠিক পথে পরিচালন করার জন্য রয়েছে প্রাণায়াম আর রয়েছে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। একথাগুলি আমি পাতঞ্জল যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগের থেকে নিয়ে লিখলাম। যোগ কোনও একক ধর্মের জিনিস নয় তার প্রমাণ পাঁচ হাজার বছর আগে এই ধর্মের হানাহানি ছিল না, যোগে বাড়ে মানুষের মনুষত্ব। সুন্দর ও সুস্থ জীবনযাপনের পথ দেখায় যোগ, দূর করে হিংসা, হানাহানি। শেখায় মানুষকে ভালবাসতে আর দেখায় উন্নয়নের পথ।

ভারতের প্রথম যোগী ও মহাপুরুষ যিনি বিদেশে যোগের প্রচার করেছেন এবং নিয়মিত ব্যায়াম, আসন, প্রাণায়াম করে আনন্দ পেতেন এবং সুস্থ থাকার চেষ্টা করেছেন তাঁর নাম আমরা সবাই জানি, তিনি বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। এ ছাড়াও স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়, আয়রন ম্যান নীলমণি দাস, নীরোদ সরকার, মাধবদাসজি। প্রাকৃতিক চিকিৎসক কুলদারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। আমরা গর্বিত এঁরা সবাই বাংলার মানুষ তথা বাঙালি ছিলেন।

যোগের প্রধান তিনটি দিক রয়েছে, যেন শিবের ত্রিশূলের তিনটি মুখ। প্রথম মুখ বা ভাগ অবশ্যই (SPIRITUALISM) মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি। দ্বিতীয় ভাগ চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত THERAPUTIC অর্থাৎ শরীর ও মনকে সুস্থ সবল রাখতে সাহায্য করা। আধুনা আর একটি ভাগ খেলাধুলার অঙ্গ অর্থাৎ যোগের তৃতীয় অঙ্গ আসনের প্রতিযোগিতা যা আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আগেকার দিনে যোগী-মুনিঋষিদের প্রধান পথই ছিল নিয়মিত যোগের সাহায্যে শরীর ও মনকে নীরোগ ও সুস্থ সবল করা। এখন সারা পৃথিবী স্বীকার করে নিচ্ছে যোগের ষঠ্ কর্ম যথা—

- **ধৌতি** (পাকস্থলী পরিষ্কার করা)
- **বস্তি** (মলভণ্ড পরিষ্কার করা)
- **নেতি** (নাসারন্ধ পরিষ্কার করা)
- **নৌলি** (পেটের পেশিও ভিতরের পাচক ক্রিয়া যন্ত্রাদি সুস্থ-সবল রাখা)
- **ত্রাটক** : মনঃসংযোগ বাড়াতে ও চোখের দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে ত্রাটকের জুড়িমেলা ভার। কর্মে আনে একাগ্রতা ও বাড়ায় দূরদৃষ্টিতা। নিঃপলক দৃষ্টিতে কোনও বিন্দু, প্রদীপ শিখা, দূরের কোনও গাছ, ইষ্ট-এমনকী বাবা-মায়ের ছবিতেও মনঃসংযোগ করে ত্রাটক করা যাবে।
- **কপালভাতি** : ফুসফুসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিকে সুস্থ-সবল রাখে, তবে কপালভাতি কোনও প্রাণায়ম নয়।

নিয়মিত আসন অভ্যাসে শরীর ও মন থাকে সুস্থ-সবল। প্রাকৃতিক চিকিৎসার সাহায্যে যথা- আলো, মাটি, জল, বাষ্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে শরীরকে রোগমুক্ত করে রাখা যায় যা প্রাকৃতিক চিকিৎসা নামে খ্যাত। ভারতে বহু মুনিঋষি এই পথ অবলম্বন করে সুস্থ-সবল থাকতেন। এমনকী মাহাত্মা গান্ধীও এই চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন।

বাংলা ভারতকে আবার পথ দেখাচ্ছে। বাংলাই প্রথম রাজ্যে, শুধু ভারত নয় পৃথিবীর প্রথম জায়গা যেখানে যোগকে সম্পূর্ণ আইন তৈরি করে স্বীকৃতি দিয়েছে। যুক্ত করেছে অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় যথা— MBBS, BHMS (হোমিওপ্যাথি), BAMS (আয়ুর্বেদিক) ঠিক তেমনটি যোগেরও রয়েছে BNYS (BACHELOR OF NATUROPATHY AND YOGIC SCIENCE)। এইসব ডিগ্রি কোর্সই সাড়ে চার বছরের। আইনে তিন বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্সও রয়েছে। তা ছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসা শাখায় যেমন সাহায্যকারীর দরকার হয় যোগেরও সাহায্যকারীর জন্য ১ বছরের ট্রেনার কোর্স রয়েছে। যারা চিকিৎসা করতে পারবে না শুধুই যোগ শেখাবে। এতে বাংলার বহু ছেলেমেয়ে উপযুক্ত শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে যেমন নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারবে ঠিক তেমনি যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথির সাহায্যে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হবে অন্য সব ডাক্তারি শাখার ন্যায়। যে কোনও চিকিৎসাই একে অপরের পরিপূরক। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় যোগকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন, শুধু তাই নয় ভারতে স্বাধীনতার পর এই প্রথম একজন মন্ত্রী ও একজন পরিষদীয় সচিবও দিয়েছেন আইনের সঙ্গে সঙ্গে রুল ও ক্যাবিনেটে অনুমোদিত হয়েছে। একটি কাউন্সিলও গঠন করেছেন, যার কাজ হবে এই শাখার উন্নিতসাধন। চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই, আর একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি। যোগ ন্যাচারোপ্যাথি কলেজেরও জায়গা দিয়ে দিয়েছেন। এই কথাটি জানানো দরকার সকলকে।

আমাদের যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথির মূল লক্ষ্য শরীর সুস্থ রাখা। তার সঙ্গে কিছু রোগের চিকিৎসা, যা মানুষকে অকাল বার্ধক্য ও রোগ থেকে মুক্তি দেবে।

লেখক : 'বঙ্গভূষণ' সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি কাউন্সিল



এক যুগের অবসান, নতুন যুগের সূচনা

সোমনাথ রায়



এক যুগের অবসান। আর এক যুগের শুরু! এভাবে যদি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়, তা হলে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে ডালমিয়া যুগের অবসান হয়েছে। সভাপতি পদ সাময়িকভাবে শূন্য থাকার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে সেই শূন্যতা পূর্ণ হতে বেশি সময় লাগেনি।

মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছাতেই সভাপতি হতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিএবির সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়া নিয়ে কারও কোনও ক্ষোভ আপাতত দেখা যায়নি। সিএবির সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই বলেছেন, যোগ্য ব্যক্তিত্বকেই দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সৌরভের দায়িত্বে আসাটা কিছুটা হলেও চমকপ্রদ। ডালমিয়ার প্রয়াণের পরই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ডালমিয়া পুত্র অভিষেক। মুখ্যমন্ত্রী চান সৌরভের সঙ্গে অভিষেকেও সিএবিতে দেখতে। এই বার্তাও সিএবির কর্তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। ফলে বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনে অভিষেকেরও অভিষেক ঘটতে চলেছে।

কিছু প্রশ্ন অবশ্যই উঠে আসছে। ডালমিয়ার মতো দক্ষ হাতে সৌরভ কী পারবেন সিএবি সামলাতে? প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ক্রিকেটীয় দক্ষতা নিয়ে কারও কোনও প্রশ্ন নেই। থাকবেও না। কিন্তু প্রশাসক সৌরভ? এই মুহূর্তে তিনি সিএবির যুগ্মসচিব পদে আছেন। কয়েকটি সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন বাংলার ক্রিকেটের উন্নতিতে। যা ইতিবাচক পদক্ষেপ বলেই মনে সিএবির প্রশাসনিক মহল। তাই বলে সরাসরি সভাপতি! কিন্তু অনেকেই বলছেন, সৌরভ পারবেন। তাঁর বুদ্ধি আছে। বাংলার ক্রিকেটকে হাতের তালুর মতো চেনেন। সবথেকে বড় কথা, ক্রিকেটাররা যদি প্রশাসনে আসেন, তা হলে ক্রিকেটেরই লাভ। কারণ, ক্রিকেটাররাই তো বুঝতে পারবেন ক্রিকেটারদের সমস্যার কথা।

সেই অর্থে কিছুটা হলেও ডালমিয়ার পদাঙ্কই অনুসরণ করছেন সৌরভ। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেট না খেললেও প্রশাসনে আসার আগে প্রয়াত সভাপতিও কিন্তু ক্রিকেটটা খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে এক সময় ডালমিয়া উইকেটরক্ষক হিসাবে ক্লাবে খেলেছেন। আর সৌরভের কথা তো ছেড়েই দিন। তবু কিছু শঙ্কা তো থাকেই। কারণ, কিছুদিন আগে অনিল কুম্বলে কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরের বার আর দাঁড়াননি। সৌরভ অবশ্য সর্বসম্মতিতে সভপতি হয়েছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দ্বারা নয়।

তবে এত কিছু ভাবনার প্রয়োজনই হতো না, ডালমিয়ার প্রয়াণ না ঘটলে। যুগাবসনা বোধহয় একেই বলে। ১৯৭৯-২০১৫। ৩৫ বছরের প্রশাসনিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে অনন্তলোকে যাত্রা করলেন ডালমিয়া।

ভারতীয় ক্রিকেটে কী এমন করেছিলেন ডালমিয়া যে তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় ক্রিকেট শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে তাঁকে শেষবারের মতো ভরিয়ে দিলেন ভালবাসায়!

উত্তর জানতে ডালমিয়ারই এক সময়ের পরম বন্ধু এবং এক সময়ের চরম শত্রু ইন্দরজিৎ সিং বিন্দ্রার কথাগুলি আরও একবার শোনা যাক। যখন কথাগুলি বলছিলেন, তখন আবেগে থরথর করে কাঁপছিল গলা। কান্না ভেজানো স্বর। ডালমিয়া আর নেই, খবরটা শোনার পর কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শব্দ বেরোচ্ছিল না। ধাতস্থ হওয়ার পর ধীরে ধীরে বলে উঠলোন, "আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতকে মহাশক্তিধর তৈরি করার পিছনে 'জগু'-র অবদান সবথেকে বেশি। ওর জন্যই ভারতীয় ক্রিকেটের এত ক্ষমতা!"

অনন্তলোকে বসে ডালমিয়া কি শুনতে পেয়েছিলেন কথাগুলি?

যে বিন্দ্রা বছর খানেক আগেই শারদ পাওয়ার, ললিত মোদি, শশাঙ্ক মনোহরদের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড থেকে ডালমিয়াকে উৎখাত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিলেন, সেই বিন্দ্রাই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে প্রাক্তন বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ! তা হলে কী প্রচলিত কথাগুলিই ঠিক! মৃত্যুর পর সবাই মহান হয়ে যায়। চাপা পড়ে যায় অন্যান্য বিষয়গুলি!

না। ডালমিয়ার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি ঠিক নয়। তা বিন্দ্রায় এখনকার স্বীকারোক্তি দেখেই বোঝা যায়। কারণ, বিন্দ্রারা যা করেছিলেন, বোর্ড রাজনীতির স্বার্থে। তাঁর প্রিয় 'জগু' সম্পর্কে যে উক্তিগুলি করেছেন, সেগুলিই ঠিক। জগমোহন ডালমিয়া নিজের কাজের দৌলতেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। যতদিন ক্রিকেট থাকবে, ততদিন থাকবেন ডালমিয়া।

১৯৪০। তখনও ব্রিটিশ ভারত থেকে চলে যায়নি। কংগ্রেস নতুন পথ খুঁজছে। মহাত্মা গান্ধী না নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পথ ধরে চলবে। কলকাতা তখন এত ঘিঞ্জি হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে হবে। এই রকম এক পরিস্থিতিতে কলকাতায় এক মারোয়াড়ি পরিবারে ৩০ মে জন্মগ্রহণ করেন জগমোহন ডালমিয়া।

ছোট থেকেই ক্রিকেটের প্রতি অদ্ভুত একটা টান ছিল। স্কটিশচার্চ কলেজের ক্রিকেট দলের উইকেটরক্ষক ছিলেন তিনি। সেখান থেকে কলকাতা লিগের ক্লাব। তবে বেশিদিন খেলাকে ধরে রাখতে পারেননি। ব্যবসায়িক বাড়ি। স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিতে হয়। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধির জোরে ডালমিয়াদের ফার্ম অন্যতম সেরা কোম্পানি হয়ে ওঠে দ্রুত। কিন্তু যাঁর মন-প্রাণ ক্রিকেটে পড়ে রয়েছে, সেখান থেকে কতদিন দূরে থাকতে পারেন? সিএবি-তে বাংলার কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসক বিশ্বনাথ দত্তের চোখে পড়ে যান তিনি। বিশ্বনাথ দত্তকে গুরু মেনে ক্রিকেটের প্রশাসনিক পদে বসে পড়েন। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল থেকে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড অফ ইন্ডিয়ায় যেতে খুব বেশিদিন লাগেনি ডালমিয়ার। মাত্র ৩৯ বছরেই বোর্ডের সদস্য হিসাবে বিসিসিআইতে যোগদান করেন।

এরপর উল্কার গতিতে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসক হিসাবে উত্থান। সময় লাগেনি বোর্ডের গুরুত্ব পূর্ণ পদে আসীন হতে। কাকতালীয় হলেও ব্যাপারটা সত্যিই অভিনব। ডালমিয়া যেবার বিসিসিআইয়ের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসাবে কোষাধ্যক্ষ হলেন, সেবারই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেটের জয়ধ্বজা উড়ল। সালটা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে। ১৯৮৩। কপিলদেবের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

এরপর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডালমিয়ার প্রশাসনিক ভাবমূর্তি কাজ করা শুরু করে। আগে ক্রিকেট মানেই লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া বোঝাত। কিন্তু ডালমিয়া বোঝাতে শুরু করলেন ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বাইরেও এই খেলাটা হয়। তা হলে কেন ক্রিকেটকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে না দিয়ে আটকে রাখা হবে ইংল্যন্ড, অস্ট্রেলিয়ায়! কেন বিশ্বকাপ শুধুই ইংল্যান্ডে হবে? কেন অন্যত্র হবে না? ডালমিয়ার প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারেনি। কিন্তু ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে বিশ্বকাপই যে অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে, তা ডালমিয়া বুঝেছিলেন। সেই কারণেই ইংল্যান্ড থেকে বিশ্বকাপ তুলে এনে ভারতীয় উপমহাদেশে করার প্রস্তাব দেন তিনি। তাঁর এবং আইএস বিন্দ্রার উদ্যোগে ইংংল্যান্ডের বাইরে প্রথমবার বিশ্বকাপ করার অনুমতি জোগাড় করে ফেলে ভারত। ১৯৮৭-তে ভারত-পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথমবার বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়।

ডালমিয়ার ব্যস্ততা এরপর আরও বেড়ে যায়। প্রশাসক



ডালমিয়া দেখলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটীয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদেরই দাপট। তারাই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেন। বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। ক্ষুরধার প্রশাসনিক বুদ্ধির দৌলতে বুঝতে পারলেন, আইসিসিতে বদল না আনতে পারলে শ্বেতাঙ্গদের কবল থেকে ক্রিকেটকে মুক্ত করা যাবে না। ঘুঁটি সাজাতে শুরু করলেন।

তাঁর ক্রিকেটীয় রাজনীতি বুঝতে পারল, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডকে বাদ দিয়ে বাকি যারা আইসিসির সদস্য আছে, তাদের একত্র করতে হবে। কাজ শুরু করে দিলেন। এবং তাঁর সর্বপ্রথম কাজ ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকাকে পুনরায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরানো। বর্ণবৈষম্যের অভিযোগে ১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। তারপর ১৯৯০-এ আবার ক্রিকেটে ফিরে এল দক্ষিণ আফ্রিকা। বিরানব্বই বিশ্বকাপেও তারা খেলে। সবকিছুরই পিছনেই ছিল ডালমিয়ার ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। এরপর ১৯৯৭ সালে আইসিসি সভপতি হলেন। তার আগে অবশ্য ১৯৯৬-তে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ আয়োজন করে ফেলেছে ভারত-পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

আইসিসিতে যখন দায়িত্বেএলেন তখন সংস্থার কোষাগারের ভাঁড়ার ছিল প্রায় শূন্য। কয়েক হাজার ডলার সেখানে ছিল। দমে না গিয়ে ক্রিকেটের মার্কেটিংয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি।আস্তে আস্তে ববস্থা ফিরতে লাগল। তিন বছর পর যখন দায়িত্ব ছাড়লেন, তখন আইসিসি-র কোষাগার উপচে পড়ছে। ২০০১এ ভারতীয় বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে রণবীর সিং মাহিন্দ্রাকে সভাপতি করেন ডালমিয়া। এপরই বোর্ড রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েন শরদ পাওয়ার ও শশাঙ্ক মনোহর জুটির কাছে। সঙ্গে ছিলেন এন শ্রীনিবাসনও। এই সময়ে তাঁকে বোর্ড থেকে সাসপেন্ড করাও হয়েছিল। অভিযোগ ছিল আর্থিক দুর্নীতির। কিন্তু যাবতীয় অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে আবার ফিরে আসেন ডালমিয়া।

যে বোর্ড তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ছিল, সেই বোর্ড সদস্যরাই আবার এন শ্রীনিবসন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সরে দাঁড়ানোর পরই অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসাবে তাঁর কাঁধে বোর্ডের দায়িত্ব তুলে দেয়। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। শুধু তাই নয়, বোর্ড সভাপতি পদে শ্রীনিবাসনকে ঠেকাতে সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৫-তে আবর বোর্ডের মসনদে বসেন ডালমিয়া। সেদিন তাঁর চোখে জল দেখেছিলেন অনেকেই।

শেষ পর্যন্ত নিয়তি তাঁকে তাঁর টার্ম শেষ করতে দেননি। কিন্তু যে ইতিহাস তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তা চিরকাল মনে রাখবে ভারতীয় ক্রিকেট।

শেষে সৌরভ। ডালমিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ক্রিকেটার হিসাবে সৌরভ আগেই ইতিসাস তৈরি করেছেন। তবে সেটা বাইশ গজে। এবার ক্রিকেট প্রশাসক হিসাবে নতুন কোনও ইতহাস তৈরি করতে পারেন কী না প্রাক্তন অধিনায়ক সেটাই দেখার। যদিও বাংলার জনগণ তাঁর উপর আস্থা রাখছেন। আস্থা রাখছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। সবাই আশা করে আছেন, লর্ডসের লর্ড আবার জার্সি ওড়াবেন, তবে এবার ভারতী ক্রিকেটর প্রশাসনিক মহলে।

নিবন্ধ

নবকলেবর

কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়

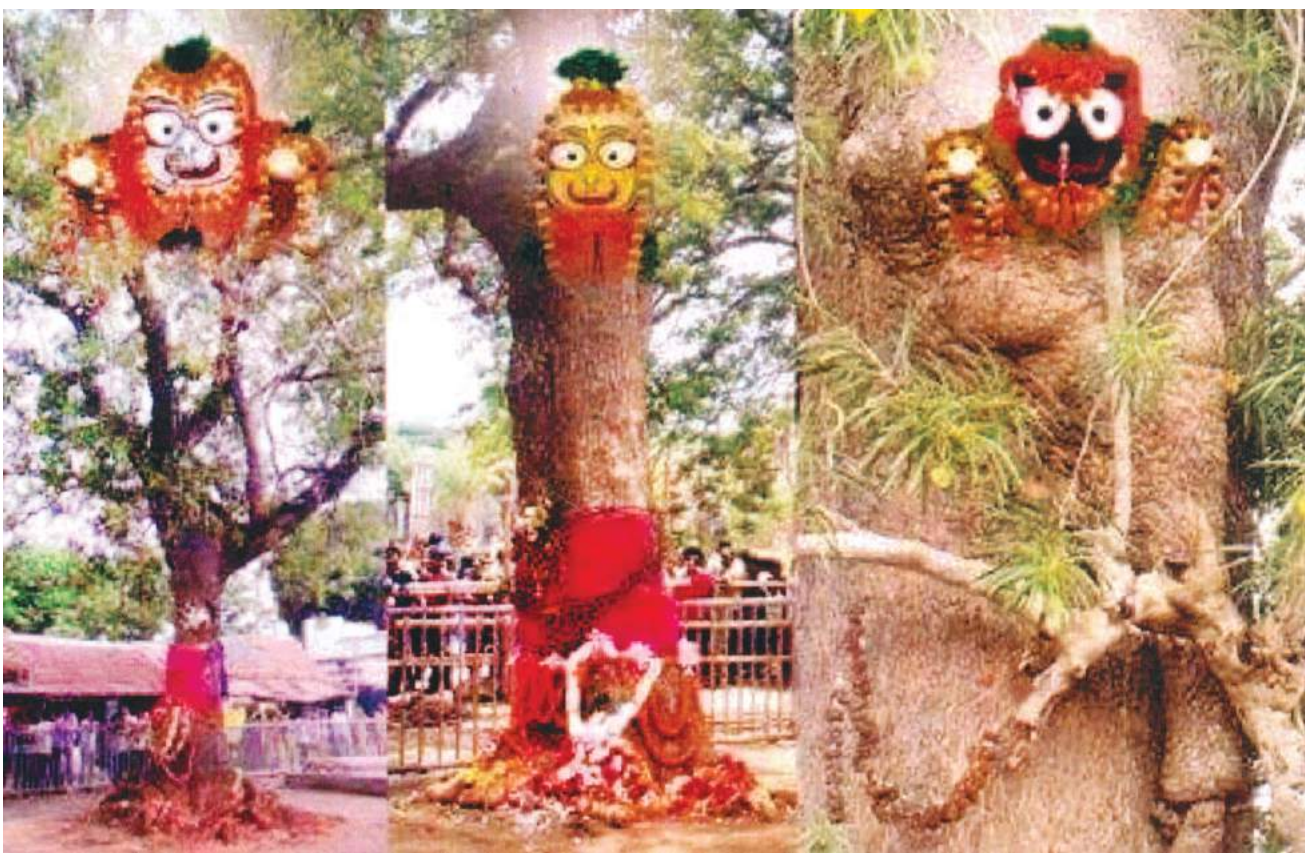

প্রভু জগন্নাথের নবকলেবর ২০১৫ সালে। ১৯৯৬ সালে হয়েছিল নবকলেবর। তার ঠিক ১৯ বছর পর ২০১৫-তে আবার প্রভুর নবকলেবরের আয়োজন। নবকলেবর নিয়ে প্রভু জগন্নাথের সারা পৃথিবীর ভক্তদের মধ্যে তোলপাড় চলছে। সকল ভক্তই মনে মনে প্রভুর এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছে। নবকলেবর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রথমেই জানাতে হবে কী এই নবকলেবর। যে বছরে আষাঢ় মাসে জোড়া অমাবস্যা পড়ে সেই বছরই হয় নবকলেবর।

নবকলেবর হল প্রভু জগন্নাথের নতুন রূপ, প্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন-এর নতুন দারুমূর্তি যার মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হবে আগের মূর্তির মধ্যে রাখা আত্মা বা ব্রহ্মের। এই আত্মা যা প্রভু জগন্নাথের নাভিমূলে রাখা থাকে সেই আত্মা ব্রহ্মের বা ব্রহ্মের প্রতিস্থাপন করা হয় নতুন দারুমূর্তির নাভিমূলে, এই পুরো অনুষ্ঠানটিই হল নব কলেবর।

নবকলেবরের সূচনা হয় রামনবমীর দিন আর চলে রথের আগের দিন পর্যন্ত (20th March to 17th July 2015) রামনবমীর দিন প্রভুর শ্রীমন্দির থেকে প্রভুর আদেশ নিয়ে দৈতাপতিদের একটি বড় দল বেরিয়ে পড়ে প্রভু জগন্নাথের এবং অন্য তিন দেবদেবীর মূর্তির দারু সংগ্রহের জন্য। প্রভু জগন্নাথ, মা সুভদ্রা, প্রভু বলভদ্র ও শ্রীসুদর্শন-এর মূর্তি তৈরি হয় নিমদারুতেই। এই দারুমূর্তির ভিতরেই প্রভুর আত্মা স্থাপন করা হয় বলে এই মূর্তিকে দরুব্রহ্মও বলা হয়। এই চার বিগ্রহের জন্য যে নিম কাঠ খুঁজতে হয় তা আর অন্য সাধারণ নিমগাছের মতো হলে চলে না। এই গাছগুলিতে থাকতে হবে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যা অন্য সব গাছের থেকে এই গাছকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দেয়।

মহাদারুর সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে এই মহাদারুর অবস্থান বা অবস্থিতি কীরকম জায়গায় হয়। মহাদারু মানে হতে হবে একটি প্রাচীন নিমগাছ। এই নিমগাছটি থাকবে গ্রামের বাইরে কোনও স্থানে, যেখানে কাছাকাছি কোনও নদীর অবস্থান থাকবে আর অবশ্যই শ্মশান থাকবে। এই নিমগাছের গায়ে কোনও জন্তু কখনও গা ঘষবে না। অন্য কোনও গাছের শাখা-প্রশাখা যাতে এসে এই গাছের গায়ে না লাগে। এই গাছের গায়ে কোনও সময়ে যেন বজ্রপাত না হয়। আগুনের দ্বারা কোনওভাবে যাতে এই গাছের কোনও অংশ পুড়ে না যায়। আর গাছের গুঁড়ি যেন কোনও ভাবেই জলে ডুবে না থাকে। এই পবিত্র দারুর প্রতিটি পাতা যেন সজীব হয় আর কোনও প্রাণী বা পাখি যাতে এই গাছে বাসা না বাঁধে। এই মহাদারুর রং বা বর্ণও বিভিন্ন প্রকারের হয়। প্রভু জগন্নাথের দারুর রং হয় ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, মা সুভদ্রার দারুর রং হয় হরিশ বর্ণ, প্রভু বলভদ্রের দারুর রং হয় শুক্লবর্ণ, শ্রীসুদর্শনের দারুর রং হয় রক্তবর্ণ।

মহাদারুর শাখাগুলিও হয় বিভিন্ন প্রকারের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। প্রভু জগন্নাথের মহাদারু বৃক্ষের পাঁচটি শাখা হতে হবে। প্রভু বলভদ্রের মহাদারু বৃক্ষের শাখা সাত হাত হতে হবে বা তার অধিক হতে পারে। সুদর্শনের দারু বৃক্ষের শাখা সোজাভাবে কোনওদিকে না বেঁকে উপরের দিকে উঠে যাবে।

জঙ্গলে যে দৈতাপতিরা এই মহাদারুর খোঁজে থাকেন, তাঁরা যখনই এই পবিত্র দারুগুলির সন্ধান পান তখন তাঁরা আরও কয়েকটি বিশেষ জিনিসেরও সন্ধান পান, যেমন মহাদারুগুলির কাছেই দর্শন পাওয়া যায় 'মহানাগ'-এর। কথিত আছে এই মহানাগই মহাদারুগুলিকে পাহারা দেয় বা রক্ষক হিসাবে থাকে। প্রতিটি মহাদারুর বিশেষ কিছু চিহ্ন থাকে। এই বিশেষ চিহ্নগুলি দারুর মধ্যে অবস্থিত হয়। প্রভু জগন্নাথের মহাদারুর মধ্যে থাকে শঙ্খ ও চক্র। প্রভু বলভদ্রের মহাদারুতে থাকে হাল ও লাঙল চিহ্ন এবং মা সুভদ্রার মহাদারুতে থাকে পদ্মচিহ্ন আর শ্রীসুদর্শনের দারুতে থাকে চক্রচিহ্ন। এই মহাদারুগুলির কাছে অবশ্যই উইপোকার ঢিবি থাকা উচিত। মহাদারুর কাছে নিচে সবসময়ই কৃষ্ণ তুলসীগাছ থাকা উচিত। এই দারুবৃক্ষগুলির সামনে আগে পুজো হওয়ার লক্ষণও থাকা দরকার। এই দারুর কোনও শাখা-প্রশাখা কেউ কোনওদিন কোনওভাবে যাতে কেটে না নেয়। এই মহাদারুগুলি যদিও নিম দারু কিন্তু এ দারুর ছালের স্বাদ হয় মিষ্টি।

এই মহাদারুগুলি সন্ধান পাওয়ার পর দারুগুলির গায়ে প্রথমে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে চক্রদণ্ডটি দারুবৃক্ষের সামনে রাখা হয়। এই চক্রদণ্ডটি দৈতাপতিরা সঙ্গে নিয়েই দারুবৃক্ষের সন্ধান করেন। এরপর চলে পুজোপাঠ। এই পুজোপাঠ হওয়ার পর চলে যজ্ঞ যা মহাযজ্ঞ বা অখণ্ড যজ্ঞও বলা হয়ে থাকে।

এই যজ্ঞ শেষ হওয়ার পরই বৃক্ষের ছেদন আরম্ভ হয়। প্রথমে সোনার কুড়াল বা কুঠার পরে রুপো, তামা, পিতল প্রভৃতি নয়রকম কুঠার দিয়ে দারুর ছেদন পর্ব করা হয়।

এইবারের নবকলেবরের দারুবৃক্ষগুলির সন্ধান মেলে যথাক্রমে বলভদ্রের জগৎসিংপুর জেলার ত্রিতোল গ্রামে, সুভদ্রা মায়ের দারুর সন্ধান মেলে জগৎসিংপুর-এর বিরিডিতে, প্রভু জগন্নাথের দারুবৃক্ষ পাওয়া যায় জগৎসিংপুর-এর খারিপাদিয়া গ্রামে, আর শ্রীসুদর্শনের দারুর সন্ধান মেলে খুরদা জেলার গদাকুন্তিয়া গ্রামে।

এর আগে যতবার নবকলেবর অনুষ্ঠান হয়েছে তার কোনওবারই এবারের মতো একই জেলায় প্রভু জগন্নাথ, প্রভু বলরাম, মা সুভদ্রার কয়েক কিলোমিটারের দূরত্বে মহাদারু পাওয়া যায়নি। এবার জগৎসিংপুর জেলাতেই তিন মহাদারুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

এর আগে ১৯৯৯ সালে সুপার সাইক্লোন যখন ওড়িশার উপর দিয়ে যায়, তখন কোনও প্রভাব পড়েনি বলে পান্ডা ও দৈতাপতিদের দাবি। এই চারটি নিমদারু তাদের নিজ উচ্চতায় একটিও পাতা না ঝরিয়ে সুন্দর সতেজভাবে থেকেছে বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা উল্লেখ করেছে।

এই দারুবৃক্ষগুলির সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারেও একটি কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, মা সরলা যা মা চণ্ডীর আর একটি রূপ সেই মা সরলাই এই দারু বৃক্ষের অবস্থান সম্পর্কে স্বপ্ন দেন পুরোহিতদের।

মা সরলাকে প্রভু জগন্নাথ, প্রভু বলভদ্র ও মা সুভদ্রার মা হিসাবেই পুজো করে থাকে সমগ্র ওড়িশাবাসী। মা সরলা এই তিন দারুবৃক্ষের সন্ধান প্রথমে পুরোহিতকে দেন। পরে পুরোহিতের নির্দেশমতো দৈতাপতিরা তা খুঁজে বের করে বলেই কথিত। দারুবৃক্ষগুলির সন্ধান পাওয়ার পর চলে পুজো, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি। এরপর কুড়াল দিয়ে দারুবৃক্ষগুলিকে ছেদন করা হয়। এই সময় জ্বলতে থাকে প্রদীপ, ধূপ, কর্পূর। চারিদিকে ভক্তরা জড়ো হয়ে প্রভু জগন্নাথ, প্রভু বলরাম, মা সুভদ্রা ও সুদর্শনের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে।

দারুগুলি ছেদন করার পর তা মখমলের কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসা হয় মা অমলাচণ্ডীর মন্দিরে। কথিত আছে, মা অমলাচণ্ডী তাঁর ত্রিনয়ন দিয়ে এই দারুগুলিকে শুদ্ধ করে দেন। এরপর মহাসমারোহে এই দারুগুলিকে নিয়ে আসা হয় পুরী শহরের শ্রীমন্দিরে। দারুগুলি নিয়ে দৈতাপতি, পুরোহিতরা যখন শ্রীমন্দিরের উদ্দেশে আসেন তখন শুধু ভক্তদের মেলা। কেউ তখন খঞ্জনী বাজায় তো কেউ কাড়া-নাকাড়া, কেউ আবার কাঁসর-ঘণ্টা, কেউ দুন্দুভি, কেউ মৃদঙ্গ। দারুগুলি শ্রীমন্দিরের উত্তর দরজার সামনে আনা হয়। এরপর উত্তর দরজা দিয়ে কৈলিবৈকুণ্ঠে দারুগুলিকে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়।

কথিত আছে এই উত্তর দরজা দিয়েই মন্দিরে প্রবেশ করেন স্বর্গের দেবতারা। কৈলিবৈকুণ্ঠের মধ্যেই এক গোপন জায়গায় তৈরি হয় চার দারুমূর্তি। কথিত আছে, বিশ্বকর্মার বংশের কয়েকজন নির্দিষ্ট করা কারিগর এই মূর্তিগুলি তৈরির কাজ করেন। মূর্তিগুলি তৈরি হতে সময় লাগে ১৩ দিন। এই ১৩ দিন যাঁরা এই মূর্তি তৈরি করেন, তাঁরা সারাদিন কোনওরকম অন্নগ্রহণ করেন না এমনকী কোনও পানীয়ও না। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর দিনে একবারই তাঁরা প্রভু জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খান।

এই ১৩ দিন পুরী মন্দিরের কোনও পুরোহিত, কোনও দৈতাপতি, কোনও প্রশাসনিক ব্যক্তি, এমনকী রাজপরিবারের কোনও সদস্য বা কোনও প্রতিনিধিও শ্রীমন্দিরের কৈলিবৈকুণ্ঠের কাছে যেতে পারেন না। কৈলিবৈকুণ্ঠের সামনে তখন সারাদিন শুধু অখণ্ড নাম-সংকীর্তন করা হয়। বেজে চলে কাড়া-নাকাড়া, দুন্দুভি, ঢোল প্রভৃতি।

১৩ দিন পর প্রভুর জগন্নাথ ও প্রভু বলভদ্র, মা সুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনের নতুন বিগ্রহ নিয়ে শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করবেন দৈতাপতিরা। যাঁরা বংশপরম্পরায় এই কাজ করে থাকেন।

প্রভু জগন্নাথের নতুন মূর্তির মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ সকলের চোখের আড়ালেই হয়। স্নানযাত্রার পর অনবসরকালে রয়েছেন চার দেবদেবী। এই চার দেবমূর্তির সামনেই বসানো হয় নতুন মূর্তিগুলিকে, বয়স্ক তিন পুরোহিত এই সময় এক বিশেষ পুজো করেন। এরপর তিন বিগ্রহ ও সুদর্শনের উদ্দেশে নিবেদন করা হয় বিশেষ ভোগ যা 'সর্বাঙ্গ পান্তি' ভোগ হিসাবেই পরিচিত। এরপর ভোগ সরিয়ে তিন বয়স্ক দৈতাপতির চোখে আর হাতে কালো রেশমের কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে থাকা অন্য দৈতাপতিরা সেই সময় বিগ্রহের উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে তাঁরা কিছুই দেখতে না পান।

তিন বৃদ্ধ দৈতাপতি তখন প্রভু জগন্নাথ, প্রভু বলভদ্র, মা সুভদ্রা, শ্রীসুদর্শন—এই চার পুরনো বিগ্রহের নাভিমূল থেকে বের করে আনেন 'ব্রহ্ম' বা আত্মা, পুরনো মূর্তির আত্মা বা ব্রহ্মকে স্থাপন করা হয় নতুন মূর্তির নাভিমূলে। এই আত্মা বা বদলের এই অনুষ্ঠানই নবকলেবর। যখন এই আত্মাবদল হয় পুরনো মূর্তি থেকে নতুন মূর্তিতে তখন 'জয় প্রভু জগন্নাথ' ধ্বনিতে মেতে ওঠে গোটা পুরী ওড়িশা-সহ গোটা পৃথিবীর জগন্নাথ ভক্তরা। এইভাবেই প্রভুর জয়ধ্বনি দিতে থাকে মন্দিরের বাইরে থাকা ভক্তরা। আর শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে থাকা দৈতাপতিরা প্রভু জগন্নাথের জয়ধ্বনি দিতে দিতে নতুন মূর্তিকে স্থাপন করে বেরিয়ে আসেন গর্ভগৃহ থেকে।

এরপর প্রভুর পুরনো মূর্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় কৈলিবৈকুণ্ঠেই সেখানে পাথরের সিংহাসনে বসিয়ে সমাধিস্থ করা হয় মূর্তিগুলিকে।

উপরিউক্ত আচারগুলি যখন পালন করা হয় তখন গোটা পুরী শহরকে 'ব্ল্যাক আউট' ঘোষণা করে দেয় পুরীর প্রশাসন, কারণ কথিত আছে, প্রভুর নতুন মূর্তিকে কৈলিবৈকুণ্ঠ থেকে আনা থেকে প্রভুর মূর্তির সমাধিস্থ হওয়া পর্যন্ত দেখা নাকি বারণ, কারণ মহাবিপদের সামনে পড়তে হতে পারে যদি কেউ এগুলিকে দেখে নেয়, কথিত আছে এগুলি দেখা পাপ ও তাই যাঁরা এ কাজের জন্য নিযুক্ত তাঁরা ছাড়া শ্রীমন্দিরে সেদিন অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ করা হয়।

এবার প্রভুর নতুন দারুমূর্তি তৈরি হয়েছে ৩ জুন থেকে আর তা শেষ হয়েছে ১৫ জুন। ১৫ জুন রাতেই হয়েছে প্রভুর 'ব্রহ্মস্থাপন' বা আত্মার বদল। এরপর হয়েছে প্রভুর 'চক্ষুদান'। এরপর থেকে বাকি এক মাস অর্থাৎ ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলেছে প্রভুর নতুন মূর্তিকে কাপড় পরানো। প্রথমে সাদা কাপড়, তারপর হলুদ কাপড় পরানো হয়। তারপর প্রভুর 'চন্দন লাগি' হয়। সবশেষে প্রভুর গায়ে নানা রঙের 'চন্দন লাগি' হয়। সবশেষে প্রভুর গায়ে নানা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। এরপর প্রভু তাঁর নতুন রূপ নিয়ে ১৭ জুলাই প্রথম দর্শন দেন ভক্তদের। এই দর্শনকে বলা হয় 'নবযৌবন দর্শন'।

এবার প্রভু জগন্নাথের 'ব্রহ্মস্থাপন' করেছেন আমাদের সকলের পরিচিত শ্রীজগন্নাথ সাঁই দাশমহাপাত্র। যাঁকে আমরা সকলে জগন্নাথ দৈতাপতি বলেই চিনি।

মা সুভদ্রার ব্রহ্মস্থাপন করেছেন শ্রীরামচন্দ্র দাশমহাপাত্র, প্রভু বলভদ্রের ব্রহ্মস্থাপন করেছেন শ্রীহলধর দাশমহাপাত্র, শ্রীসুদর্শনের ব্রহ্মস্থাপন করেছেন নবকিশোরপতি মহাপাত্র, যিনি বিদ্যাপতি হিসাবেই পরিচিত।

নবকিশোর দাশমহাপাত্র বা বিদ্যাপতিই প্রথমে চার দারুমূর্তির মধ্যে থাকা ব্রহ্মগুলিকে পুজো করেন। তারপরে সেই 'ব্রহ্মগুলি' উপরিউক্ত দৈতাপতিরা চার দারুমূর্তির মধ্যে স্থাপন করেন। এই পুরো কাজটি হয় যে বছরে আষাঢ় মাসে জোড়া অমাবস্যা পড়ে আর সংক্রান্তি এবং অমাবস্যা যে দিন একসঙ্গে পড়ে সেই দিনেই।

এবার যখন 'ব্রহ্মস্থাপন' করা হয় কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তা রাতের বদলে দিনের বেলাতেই হয়।

গোটা পুরী শহর 'ব্ল্যাক আউট' করা ও মন্দিরের সবক'টি দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ১৬ জুন দিনের বেলাতেই 'ব্রহ্মস্থাপন' করা হয়। কী কারণে তা এখনও অজ্ঞাতই রয়েছে। কেউ বলছেন প্রশাসনিক চাপেই এই কাজ দিনের বেলাতে হয়েছে আবার ভক্তরা বলছেন যা হয়েছে তা প্রভুর ইচ্ছা অনুসারেই হয়েছে। যাই হোক, প্রভুর 'ব্রহ্মস্থাপন' হয় বেলা ১২ টা থেকে ২টোর মধ্যে আর প্রভুর সমাধি হয় বিকেল ৩ টা থেকে শুরু করে ৫ টার মধ্যে।

যদিও এবারের এই নিয়ম পরিবর্তন হওয়া নিয়ে গোটা ওড়িশায় হইচই আরম্ভ হয়েছে।

ওড়িশার বিধানসভাতেও প্রশাসনকে এ নিয়ে নানা সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

প্রভুর ব্রহ্মস্থাপন করেছেন যে দৈতাপতি তিনি ও আরও তিন দৈতাপতি ২৭ জুন প্রভুর মার্কণ্ড সরোবরে নিজেদের চুল কেটে স্নান সেরে প্রভুর শ্রীমন্দিরে এসে ব্রাহ্মণ-সহ ভক্তদের সেবার জন্য ভোজন করলেন। সেই দিন অর্থাৎ ২৭ জুন পুরীর শ্রীমন্দিরে প্রায় লক্ষাধিক ভক্ত প্রসাদ পেয়েছেন। এরপরে প্রভুর মাসির বাড়ি যাওয়া বা রথযাত্রা 'নবযৌবন' দর্শনের পরের দিন প্রভু মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। ১৮ জুলাই হয় প্রভুর রথযাত্রা।

এবারে ১৮ জুলাই দাদা বলভদ্র, বোন সুভদ্রা, শ্রীসুদর্শনকে নিয়ে প্রভু মাসির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন যা কি না আমরা শ্রীগুণ্ডিচা বিজে' বলেই জানি।

পুরীর রাজা সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের উপর ঝাড়ু দেন, যাকে আমরা 'ছেড়া পহড়া' বলেই জানি।

প্রভু আটদিন মাসির বাড়িতে কাটিয়ে ২৬ জুলাই শ্রীমন্দিরে ফিরে এলে মাসির বাড়ি থেকে প্রভুর শ্রীমন্দিরে ফিরে আসাকে আমরা 'বাহুড়া যাত্রা' বলেই জানি। প্রভুর সোজা রথের দিন শ্রীমন্দির থেকে বেরনো তারপর রথযাত্রা আর মাসির বাড়িতে আটদিন কাটানোর পর শ্রীমন্দিরে ফিরে আসাকে আমরা 'পহন্তি' যাত্রা বলেই জানি।

'বাহুড়া' যাত্রার পরের দিন একাদশীতে (২৭ জুলাই) হয় প্রভুর সোনার বেশ বা রাজবেশ। এর পরের দিন অর্থাৎ ২৮ জুলাই হয় 'অধর পানা উৎসব'। প্রভুর ঠোঁট অবধি মাটির হাঁড়িতে ভর্তি থাকবে পানা বা শরবত। সেই মাটির হাঁড়ি ভাঙা হবে এই উৎসবেরই নাম 'অধর পানা'। যেহেতু প্রভুর অধর অর্থাৎ কি না অধর পর্যন্ত হাঁড়ির উচ্চতা হয় আর শরবত থাকে তাই এই উৎসবকে বলা হয় 'অধর পানা'।

এর পরের দিন অর্থাৎ ২৯ জুলাই প্রভুর ঘরে ফেরার পালা যা 'নীলাদ্রি বিজে' নামেই পরিচিত। 'নীলাদ্রি বিজে' অনুষ্ঠানে মা লক্ষ্মীকে রসগোল্লা ভোগ নিবেদন করা হয়। যাতে মা লক্ষ্মী তাঁর সব অভিমান ভুলে প্রভুকে তাঁর নিজের ঘরে ঢুকতে দেন অর্থাৎ মাসির বাড়িতে মা লক্ষ্মীকে না নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রভুর উপর মা লক্ষ্মীর যে অভিমান তা প্রভু রসগোল্লা খাইয়ে মেটাতে চান। এই 'নীলাদ্রি বিজে' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই প্রভু তাঁর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন সঙ্গে মা সুভদ্রা, প্রভু বলভদ্র ও শ্রীসুদর্শনকে নিয়ে।

পরের দিন থেকে আবার আরম্ভ হয় প্রভুর নিত্যপূজা। সকল ভক্ত তাঁর প্রাণের ঠাকুরের দর্শন পান শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে।

কমবেশি ১৯ বছরের মধ্যে হতে হবে 'নবকলেবর'। এর আগে প্রভুর নবকলেবর অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯২২, ১৯৩১, ১৯৫০,১৯৬৯, ১৯৭৭, ১৯৯৬ সালে।

পুরীর শ্রীমন্দিরের পুরোহিতরা বলছেন, পরবর্তী নবকলেবর ২০৩৪ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

নিবন্ধ

মার্কিনি মেয়েরা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজিতা দাশগুপ্ত



সেবার মার্কিন মুলুকে একগুচ্ছ ছাত্রীকে পড়াবার সুযোগ হয়ে গেল। ২০১২ সালে ফুলব্রাইট ফেলোশিপ নিয়ে ইন্ডিয়ানার বিখ্যাত সেন্ট মেরিজ কলেজে এক বছরের জন্য গেলাম আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে।

ভারতের ইতিহাসের পাশাপাশি পড়াব ভারতীয় মেয়েদের ইতিহাসও, যার শুরু সীতা সাবিত্রী শকুন্তলার মতো সাহিত্যের চরিত্রের মাধ্যমে প্রাচীন সমাজে নারীদের অবস্থার বিশ্লেষণ থেকে, আর পাঠ্যক্রমের শেষ হবে আমাদের রাজ্যেরই, বস্তুত আমার পাড়ারই এক চিরচেনা, অসামান্যা নারীর কাহিনি দিয়ে।

সেন্ট মেরিজ কলেজে সেন্টার ফর উইমেনস ইন্টারকালচারাল লিডারশিপ নামক গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্ত্রী এলেন মেয়ার-লি, যাঁর কাজই হল বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলা অধ্যাপক, সমাজকর্মী ও উদ্যোগপতিদের মতবিনিময় করতে এখানে এনে জড়ো করা। অন্য দিকে এই কলেজের ইন্টারডিসিপ্লিনারি উইমেনস স্টাডিজ প্রোগ্রাম, যেখানে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপিকারা ক্লাস নেন, সেমিনার করেন, এবং বিভিন্ন দেশের মেয়েদের ইতিহাসকে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেন।

আমার স্বামী জয়ন্তর কর্মস্থলও তখন ইন্ডিয়ানার একই শহরে অবস্থিত নোটর ডাম ইউনিভার্সিটি বলে সেন্ট মেরিজ কলেজে আমি আগেও গেয়েছি। কিন্তু এবার যখন অধ্যাপনার কাজ নিয়ে গেলাম, একটা মিশ্রিত অনুভূতি হচ্ছিল। ফুলব্রাইটের মতো নাম করা ফেলোশিপ নিয়ে এসেছি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবেও বটে। যারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না, তাদের শুধু আমার দেশের ইতিহাসের সঙ্গেই পরিচয় করাতে হবে না, বলতে

হবে ভারতীয় মেয়েদের বিষয়ে। বিশাল বিশাল খেলার মাঠ, মেয়েদের রেসিডেন্সিয়াল ডর্ম, লাইব্রেরি, চ্যাপেল, অডিটোরিয়াম, বাগান, লেক নিয়ে সেন্ট মেরিজের পঁচাত্তর একরের ছড়ানো ক্যাম্পাস, তার এক কোণে ইতিহাস বিভাগের বাড়ি, স্পেস ইউনিকা হল। বিভাগে আমার সহকর্মীরা সবাই ভারি চমৎকার মানুষ, ডিপার্টমেন্টের চেয়ার বিল সভেলমো, যিনি আবার ঔপন্যাসিক এবং অভিনেতাও বটে— এছাড়াও রয়েছেন আরও তিনজন, তুমুল নেপোলিয়ন-অনুরক্ত পোলিশ-আমেরিকান প্রৌঢ় ডেভিড স্টেফানচিচ, সিনিয়র অধ্যাপিকা কেলি হ্যামিলটন, আর ডিপার্টমেন্টের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছটফটে তরুণী জেমি ওয়াগম্যান।

সপ্তাহে দু'দিন দুটো করে দেড় ঘণ্টার ক্লাস। প্রথম সেমেস্টারে পড়াতে হবে সার্ভে কোর্স-Indian Subcontinent, প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ অবধি ভারতীয় ইতিহাসের বিবরণ—আর তার সঙ্গে উপমহাদেশের মেয়েদের নিয়ে আরেকটি কোর্স, Women in South Asia, পরের সেমেস্টারে একটি কোর্স গান্ধী ও তাঁর চিন্তাচেতনাকে নিয়ে, আরেকটির উপজীব্য আমার নিজের গবেষণা, Gender and Politics in Modern South Asia. যেহেতু সবই 'স্মার্ট ক্লাসরুম', তাই মাঝে মাঝেই পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করি—লেকচার আর আলোচনার পাশাপাশি বিবিধ শব্দ আর দৃশ্যাবলির সাহায্যেও সম্পূর্ণ নতুন একটা দেশের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে আমার ছাত্রীরা, যাদের অধিকাংশই খুব শান্ত, ভদ্র শ্বেতাঙ্গিনী।

আমার ভারতীয় ইতিহাসের কোর্সে জন্য কুড়ি ছাত্রী, আর মেয়েদের ইতিহাসের ক্লাসে প্রায় জনা পঞ্চাশ। দেখে আমি অবাক! এত মেয়ে ভারতীয় মেয়েদের কথা জানতে চায়? পরে বোঝা গেল আসলে যাঁর জন্য আমার এই ক্লাসটিতে এত আগ্রহ, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন সবে এক বছর হল চৌত্রিশ বছরের বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল, সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বে একজন মহিলা। আমার ছাত্রীরা এই পর্যন্ত মেনে নিতে পারে। কিন্তু তাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না যখন টাইম ম্যাগাজিনে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ জন ব্যক্তির তালিকায় উঠে আসেন তিনি— এক বাঙালি মহিলা, ইন্দিরা গান্ধীর মতো বংশকৌলীন্য যাঁর নেই, জয়ললিতার মতো ফিল্মস্টারসুলভ গ্ল্যামারের মূলধন সম্বল করে যিনি রাজনীতিতে নামেননি। আমেরিকার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা যাঁর সবচেয়ে বেশি, সেই হিলারি ক্লিন্টন নিজে কলকাতায় এসে সাগ্রহে দেখা করে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে, এই ঘটনা আলোড়িত করতে থাকে সেন্ট মেরিজের মেয়েদের।

আরও বেশি বিস্ময় এই জন্য যে, প্রায় একই সময় দিয়ে দিল্লিতে 'নির্ভয়া'র পাশবিক গণধর্ষণের ঘটনা ঝড় তুলে দিয়ে গিয়েছে মার্কিন মিডিয়ায়। আমার প্রতিটি ক্লাসের প্রশ্নোত্তর পর্বে ঘিরে ধরে মেয়েরা। ভারতীয়রা কি তাহলে এরকমই? একটি মেয়ে যখন নির্দয়ভাবে ধর্ষিত হয় রাতের চলন্ত বাসে, ধর্মগুরুরা মদত দেয় সেই নারকীয় ঘটনায়? মেয়েদের মা-বাবাদের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, তিন মাসের 'স্টাডি অ্যাব্রড' সামার প্রোগ্রামে মেয়েকে ভরসা করে ভারতে পাঠানো কি উচিত হবে? ওখানে তো শুনেছি মেয়েদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা, অধিকার নিট শূন্য? বেশিরভাগ সময়েই উত্তর জোগায় না মুখে। মাঝে মাঝে তা-ও বলার চেষ্টা করি, এত যে বলছ, এ দেশে কী আছে? প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাসে তোমাদের কোনও মহিলা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন আজ অবধি? অবশ্য এটা দেখে আমার গর্ব হয় যে ভারতের দু'জন মানুষকে নিয়ে তারা সদা বিস্ময়বিমুগ্ধ— মহাত্মা গান্ধী আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমজনের কথা ডক্টর মার্টিন লুথার কিং-এর দৌলতে আমেরিকনরা সবাই অল্পবিস্তর জানে। আর ভারতীয় মেয়ে মাত্রই যে দুর্বল, অত্যাচারিত, বঞ্চিত নয়, তার বাইরেও অনেক কিছু, সে কথা আমার ছাত্রীরা সবচেয়ে সহজে বুঝতে পারে, যখন মুখ্যমন্ত্রীর উদাহরণ দেওয়া হয়। তাদের হাজারো প্রশ্ন, জানো কোথায় থাকেন তিনি? কেমন জীবনযাপন করেন? এবার আমার মুখে গর্বের মুচকি হাসি। কেন জানব না? তিনি যে পাড়ায় থাকেন সে তো ছোট থেকে আমারও পাড়া। আর পাঁচটা বাড়ির মতো অতি সাধারণ বাড়িতেই এখনও তাঁর বসবাস। ইচ্ছে করলেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজের জন্য বেছে নিতে পারতেন মহার্ঘতম বাসস্থান। কিন্তু তিনি তা করেননি, উল্টে নেমে এসেছেন হাজারো জনতার ভিড়ে, অক্লেশে, সহর্ষে মিশে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে।

আমার ছাত্রীরা, যাদের হাতে হিলারি ক্লিন্টন বা কন্ডোলিৎজা রাইস ছাড়া আর কোনও জুতসই উদাহরণ নেই। বলে জান, কন্ডোলিৎজা চমৎকার পিয়ানো বাজান। হিলারি চ্যারিটিতে খরচ করেন বিস্তর ডলার। আমি বলি জানি বইকী, তবে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের জন্য জমিয়ে রাখেন না কিছু। যতদূর জানি, তাঁর নিজের লেখা সতেরো-আঠারোটি বই আছে, যার বেশ কয়েকটি বিভিন্ন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়। লেখার পাশাপাশি ছবিও আঁকেন তিনি, সেই ছবি বিক্রির সমস্ত টাকাও দিয়ে দেন দলের অর্থভাণ্ডারে। একদিন দু'টি মেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, এই যে তুমি বলছ তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী তোমাদের প্রতিবেশী, তুমি কী দেখতে পাও তাঁকে? আমি এবার সত্যিই হেসে ফেলি— কেন দেখব না? আমাদের পাড়ার মুক্তদলের রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে বন্যাত্রাণের জন্য মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে অর্থসংগ্রহ, সব কাজেই যে তাঁকে পুরোধার ভূমিকায় দেখেছি অনেকদিন ধরে। হায়, আমার মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীরা চিত্রাঙ্গদা পড়েনি, নয়তো বলা যেত 'স্নেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা' ইত্যাদি।

তার জায়গায় আমি শুধু বলি, মানুষের মনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জায়গা করে নিয়েছেন তাঁর সহজ সাদাসিধে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। আপামর জনসাধারণের মনে গান্ধী যেভাবে জায়গা করে নিয়েছিলেন তাঁর সহজিয়া জীবনদর্শনের মাধ্যমে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেন সেই মত ও পথেরই উত্তরসূরি। ছাত্রীরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা তোমাদের, মানে ভারতীয় মেয়েদের কাছে কি উনিই রোল মডেল, এখানে যেমন হিলারি, কী মিশেল ওবামা? আমি সবিনয়ে স্বীকার করি, সমস্ত ভারতবর্ষের মেয়েরা কী ভাবে জানি না। তবে এইটুকু জানি যে আমার মতো অনেক অনেক বাঙালি মহিলার কাছে উনি পরিবারের বড়দিদির মতো। 'Well, we look up to her as our elder sister.' আমি ভারতের পুবে যে অঞ্চলে থাকি, সেই বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বৃহৎ পরিবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদির মতো, যিনি ভুল করলে ভর্ৎসনা করে শুধরে দেন, আবার বাংলার মানুষের জন্য তাঁর স্নেহের ভাণ্ড উপচে পড়ে।

আমার অধ্যাপনার শেষ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে শিকাগো গেলাম প্রায় ১০০ বছরের পুরনো সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ক্লাবে বক্তৃতা দিতে। বিরাট সভায় একমাত্র অ-মার্কিন বক্তা আমিই, সঙ্গে সহবক্তা দুই পরাক্রান্তা মহিলা—ইলিনয় (Illinois) প্রদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল লিজা ম্যাডিগান, আর সুবিশাল ব্যাঙ্কিং কোম্পানি বিএমও ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের সিইও এলেন কস্টেলো। বক্তৃতার শেষে বহু প্রশ্ন উড়ে এল, আলাপ করতে এলেন অনেক মানুষ। আমার সহবক্তা জাঁদরেল আইনজ্ঞ লিজার সঙ্গেও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা হল অনেকক্ষণ। বললেন তিনি, হিলারিও তো দেখা করতে গেয়েছিলেন তোমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। আচ্ছা, আমি যদি অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা যাই তবে কি দেখা হতে পারে ওঁর সঙ্গে? কেন হবে না, আমি বলি, সবার জন্যই তাঁর অবারিত দ্বার। তাঁর হয়ে আমিই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাকে।

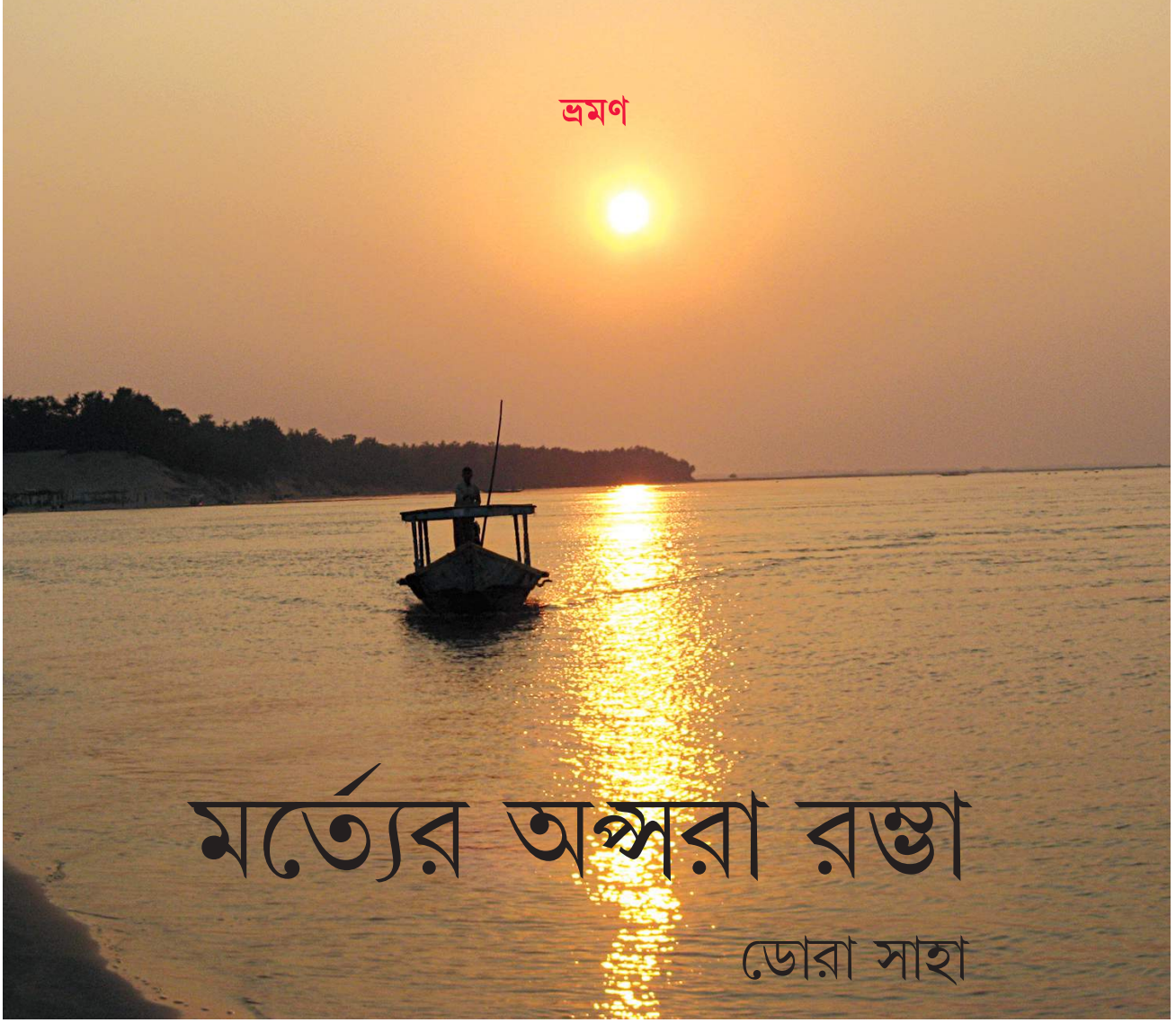

মর্ত্যের অপ্সরা রম্ভা

ডোরা সাহা

স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা নিজের মানবী রূপ আড়াল করে যেন মর্ত্যের অমোঘ টানে নিসর্গের সাজে নেমে এসেছে মাটিতে। আর সেই অপ্সরা রম্ভা তার দু'চোখ জুড়ানো নৈসর্গিক রূপ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওড়িশার গঞ্জাম জেলায়। আর অবিরত হাতছানি দিয়ে ডাকছে এসো কাছে। আমাকে স্পর্শ করো ... পাবে স্বর্গীয় অনুভব।

স্বর্গের অপ্সরা সে। সত্যিই স্বর্গের অপ্সরা। দেবকুলের হার্টথ্রব এই অপ্সরার নাম রম্ভা। দেবরাজ ইন্দ্র রম্ভার অবর্ণনীয় মোহিনী রূপে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, তোমাকে স্বর্গেই মানায়। তুমি স্বর্গ আলো করেই থাকো। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের এই প্রস্তাবে খুব খুশি হতে পারেনি রম্ভা। মর্ত্য-যে তাকে ভীষণ টানে। তাছাড়া তার এই সম্মোহন জাগানো রূপ থেকে মর্ত্যের মানুষ কেন বঞ্চিত হবে? মর্ত্যে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র বাদ সাধলেন। অমান্য করার উপায় নেই। তাই রম্ভা থেকে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতেই। কিন্তু গোপনে নিজের মানব রূপ আড়াল করে হয়তো নিসর্গের সাজে মর্ত্যে এসেছিল রম্ভা। দেবরাজ ইন্দ্র সে কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি। মর্ত্যের অমোঘ টানেই সে এসেছিল। নিসর্গরূপিণী রম্ভার আর ফেরা হয়নি। সেই থেকেই সে তার দু'চোখ জুড়ানো নৈসর্গিক রূপ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওড়িশার গঞ্জাম জেলায়। আর অবিরত হাতছানি নিয়ে ডাকছে, এসো, কাছে এসো... আমাকে স্পর্শ করো... পাবে স্বর্গীয় অনুভব। সেই হাতছানিতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো অসংখ্য ভ্রমণপিপাসু মানুষ

ছুটছেন এই রম্ভায়।

রম্ভায় যাওয়ার জন্যে শীতটাকে বেছে নিলেই লাভ হবে বেশি। খোদ কলকাতা শহরে বসে ওড়িশা টুরিজম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের অফিসে গিয়ে বুক করুন রম্ভার পান্থনিবাসের ঘর। উঠে পড়ুন হাওড়া-চেন্নাই এক্সপ্রেস ট্রেনে। সন্ধে সাতটা নাগাদ ট্রেন। রাতটুকু শুধু রেলগাড়ি ঝমঝম। লুচি আর আলুরদম। তারপর কামরাও থমথম। ঘুমের অতলে যাওয়া যায় স্বচ্ছন্দেই। নিশ্চিন্ত নিরাপদ সফর। কারণ এলএমজি অর্থাৎ লাইট মেশিনগান হাতে ট্রেনের এমাথা থেকে ওমাথা সারারাত ক্রমাগত টহল দেবে রেলরক্ষী বাহিনীর জওয়ানেরা। পরদিন ভোরের পাখি হয়ে ডেকে যাবে চায়ে। চায়ে গরম। ঘুম ভেঙে গেলেও কম্বল মুড়ি দিয়ে আপার বার্থে শুয়ে শুয়ে এই চা পাখির ডাক শোনার অপেক্ষায় ছিলেন গোপাল মাস্টার। আপনার আমার সফরসঙ্গী। মই বেয়ে নেমে আসেন গোপাল মাস্টার। নেমে আসি আমি। আপনি। চায়ের কাপ শেষ হতে না হতেই কামরা সরগরম। কারণ সাতটার মধ্যেই ব্রহ্মপুর পৌঁছে যাবে ট্রেন। তড়িঘড়ি নামতে হবে। লোটাকম্বল ঝড়ের গতিতে গুছিয়ে নেওয়ার তাড়া লেগে যায়। রম্ভা নামে স্টেশন রয়েছে। তার আগেই ব্রহ্মপুর। ব্রহ্মপুরই বলব। কারণ স্টেশনের শান বাঁধানো ফলকে ইংরেজি ও ওড়িয়ায় ব্রহ্মপুরই লেখা আছে। সাহেবরাই ব্রহ্মপুর নামটাকে বিকৃত করেছে। নাম দিয়েছে বেরহামপুর। পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুরেরও নামের বারোটা বাজিয়েছে ওই লালমুখোরা। সেটাও নাকি বেরহামপুর। আর ইংরেজ সাহেবদের খাওয়া-পরা ওঠা-বসা আদব-কায়দা সবকিছু নকল করতে করতে নিজের দেশের জায়গার আসল নাম শিকেয় তুলে রেখে সাহেবদের একসেন্ট নকল করে আমরাও কেন বলব বেরহামপুর?

সাহেবরা এমন অনেক জায়গার নাম বিকৃত করেছে। বালেশ্বর হয়ে গেছে বালাসোর। মহীশূর হয়ে গেছে মাইসোর। সে অন্য প্রসঙ্গ। এই মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য রম্ভা। সফরসঙ্গী একটু পাকাপোক্ত, শক্তপোক্ত ও দক্ষ না হলে চলে না। আমার বরের বন্ধু মিঠুদা এদিক দিয়ে জবরদস্ত টুরিস্ট গাইড। তাই তারই গলা ধরে ঝুলে পড়ি। গোপাল মাস্টারের পরামর্শ হল, সরাসরি রম্ভায় নয়। রম্ভা যাওয়ার পথে গোপালপুরের সমুদ্র দেখে গেলে মন ভরে যাবে কানায় কানায়। সুতরাং নামতে হবে ব্রহ্মপুরেই। সকাল সাতটা। সাড়ে সাতটা বড়জোর।

ব্রহ্মপুরে নামতেই অক্টোপাসের মতো অটোপাসে বাঁধা পড়তে হবে। সার সার দাঁড়িয়ে আছে অটো। আর অটো চালকরা ছেঁকে ধরেছেন আপনাকে। ২০০ থেকে ৩০০ টাকার রফা। একটা বড়মাপের সুটকেশ একটা মাঝারি এবং একটা ছোট এই তিনটের লাগেজ মুহূর্তে পেটে পুরে নেবে অটো। ছুটবে গোপালপুর। শীতের সময়টাই আদর্শ সময়। বিশেষ করে বড়দিনের ছুটিতে। কিন্তু সাবধান। এই সময়ে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েন পুরী এবং এই গোপালপুর সমুদ্রে। তাই অনেক আগেভাগে টিকিট রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা পাকা করুন। একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে হোটেল কলিঙ্গ ও হোটেল পার্ল। বুক করুন। কিংবা মনের মতো ঘরোয়া পরিবেশে রেঁধেবেড়ে থাকতে চাইলে বুক করুন হলিডে রিসর্টের গেস্ট হাউস। বড় বড় ঘর। অ্যাটাচ বাথ। গিজার। বড় কিচেন তাবৎ ইউটেনসিল। গ্যাস ওভেন হোয়াট নট? এই গেস্ট হাউসের ভাড়াও খুব কম। কিচেন ইউটেনসিল ব্যবহারের জন্য বাড়তি ৫০ টাকা প্রতিদিন।

হোটেল কলিঙ্গ ও পার্লের বড় অ্যাডভানটেজ হল, হোটেলের বারান্দাতেই যেন সমুদ্র এসে আছড়ে পড়েছে। একেবারে সৈকতের ওপরেই। হোটেল চত্বরে পায়ের গোড়ালি ছাপানো সবুজ নরম ঘাসের ঢেউ। বেতের ইজিচেয়ার। মাথার ওপর শেড আমব্রেলা। দুপুর গড়ানো পর্যন্ত অন্তত বসুন। দেখুন জীবনানন্দ দাশের সেই 'হায় চিল সোনালি ডানার চিল' আপনার মাথার ওপর ঝলমলে রোদে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে। কেন? খেলবে বলে। কার সঙ্গে খেলবে? খেলবে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে। ঢেউ এসে যেখানে সাপের ফণার মতো উঠছে পরক্ষণেই ভেঙে পড়বে বলে, সেই সফেদ ফেনিল তরঙ্গের সঙ্গে উড়ে উড়ে নেচে বেড়াচ্ছে চিল। দুপুর গড়াতেই উধাও হয় ওরা।

গোপালপুরে ওড়িশা ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের পান্থনিবাসও রয়েছে। এই গোপালপুরের সমুদ্রে ছুঁয়ে এবার চলুন রম্ভায়। পথেই পড়বে গোপালপুর পোর্ট। সমুদ্র সৈকত থেকে বলতে গেলে মাঝসমুদ্র পর্যন্ত কংক্রিটের বাঁধানো জবরদস্ত সেতু। জাহাজ জেটি। আপনার ভাড়া করা টাটা সুমো বা ট্রেকার সোজা ওই সেতু বেয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে মাঝসমুদ্রে। তার আগে বলি। এক পরিবার না গিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তিন পরিবার অন্তত জোট বাঁধুন। তিন পরিবারের ন'জন অনায়াসেই ধরবে টাটা সুমোতে বা ট্রেকারের ভাড়া তিনভাগ হয়ে যাবে। গায়ে লাগবে না ঝড়। সকাল দশটার মধ্যে গোপালপুর ছাড়ুন। গন্তব্য এবার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই রম্ভা। তবে রম্ভাকে কি অত অনায়াসে ছোঁয়া যাবে? গেলেও তা ঠিক হবে না। রম্ভার দুরন্ত রূপ দর্শনের পরে আর কি কিছুই ভাল লাগবে? তাই অপেক্ষাকৃত কম শোভনসুন্দর জায়গাগুলি দেখতে দেখতেই যাওয়া ভাল।

গোপালপুর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার পথ পেরলেই গোপালপুর পোর্ট। ভাবুন তো আপনি মাঝ সমুদ্রে। কংক্রিটের ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখছেন ওই দূরে সমুদ্রের ঝড়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। আর আপনার পায়ের নীচে নীল জল কত শান্ত। কত স্বচ্ছ। ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মাছের দল। রম্ভা যাওয়ার পথে এই পাওনা কি ছাড়া যায়? এরপর আপনার টাটাসুমো বা ট্রেকার ছুটবে কেয়াবনের বুক চিরে। দু'পাশে কেয়াবন, হেঁতুলবন। পথের পাশে ট্যুরিস্টদের জন্যে অপূর্ব সুগন্ধি কেয়াফুল নিয়ে বসে আছেন দারিদ্র্যপীড়িত গঞ্জাম জেলার কিছু মানুষ। একটা কেয়াফুল কিনে ফেলুন যত দাম হয়। রম্ভার পান্থনিবাসের ঘরে ম ম করবে ক'দিন সেই গন্ধ।

এবার গাড়ি উঠে আসবে জাতীয় সড়কে। দু'ধারে পাহাড় কাটা দুরন্ত জাতীয় সড়ক। পথে রম্ভা স্টেশনের লেভেল ক্রসিং। না এখনই রম্ভায় নয়। রম্ভার আগে ছুঁয়ে আসা যাক বরকুল চিল্কা। চিল্কা নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। অনেকে পুরী থেকেও চিল্কাতে আসেন। সমুদ্রের জল এসে পাহাড়ের কোলে কোলে জমে আছে। উপভোগ্য। কিন্তু ততক্ষণে দুপুর একটা কী দেড়টা। বরকুল চিল্কার পান্থনিবাসে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিন। এবার বেড়িয়ে পড়ুন সেই বহু প্রতীক্ষিত রম্ভার উদ্দেশে। সাড়ে তিনটে। এখন বিকেল। রম্ভায় পৌঁছে আগে পান্থনিবাসের ঘরে মালপত্র ঢেলে দিন। না। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট নয়। পান্থনিবাসের ওপারে বাইরে এসে দাঁড়ান। মনে হবে চোখের সামনে একটা ক্যালেন্ডার টাঙানো আছে। এদিক ওদিক শুধুই সবুজ পাহাড়। আর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সমুদ্রের নীল জল স্থায়ী বসত করেছে। এই তো রম্ভা। নীল জলে এবার ভাসিয়ে তরী ছুটুন ওই দূরে পাহাড়ে একটা দ্বীপে। জল খুব বেশি নয়। চারফুট থেকে সাত-আট ফুট জলের গভীরতা। টলোমলো নৌকায় বাঁশি লগি দিয়ে হাল ধরে

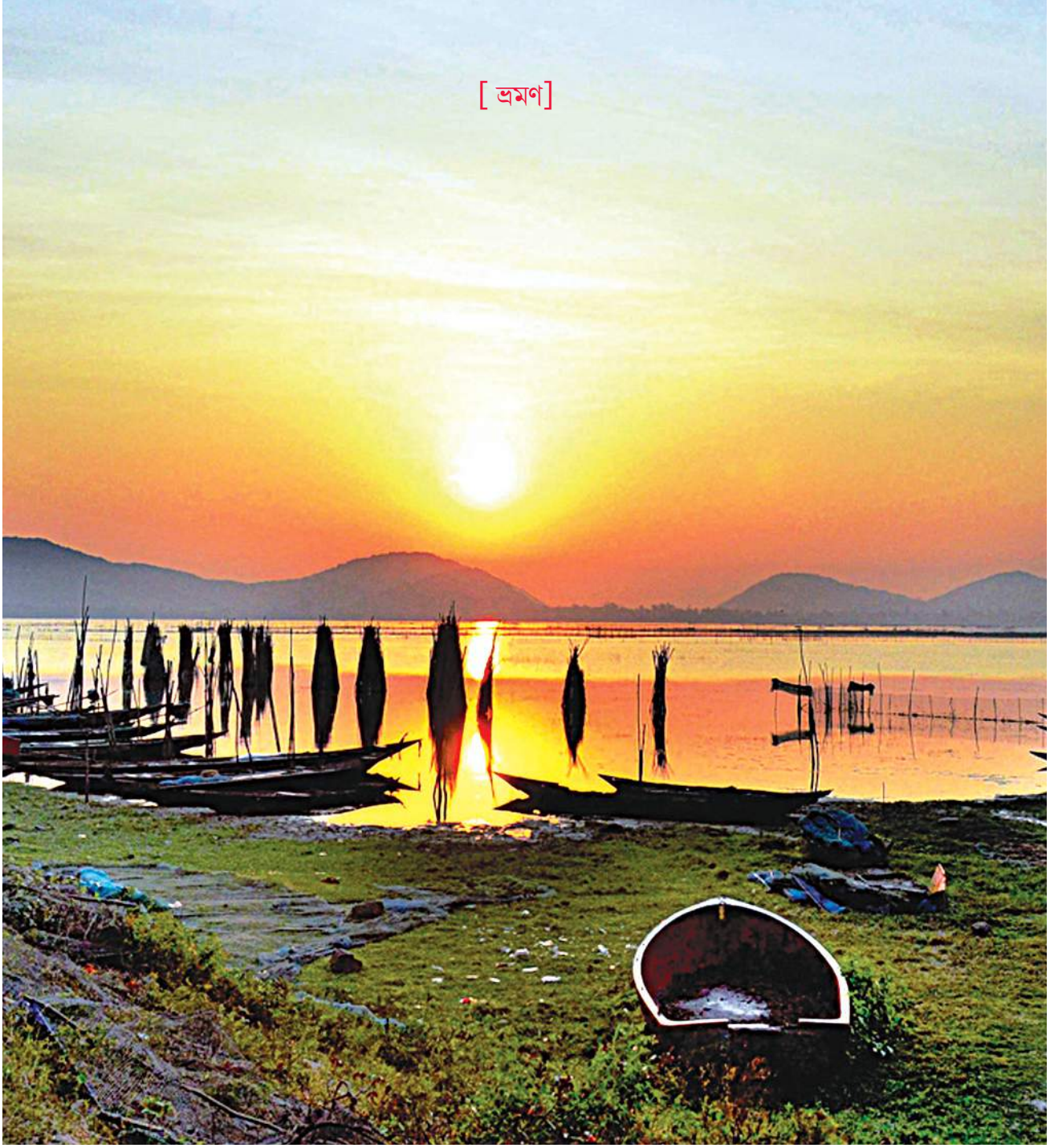

ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বুধুয়া মাঝি। সন্ন্যাসী বেহারা মাঝি। এই সন্ন্যাসী বেহারাকে পেলে লাভ। কারণ ওড়িয়া গানের একজন সত্যিই দক্ষ শিল্পী এই সন্ন্যাসী। নিজেই গান বাঁধেন, সুর করেন। আর তাঁর সপ্তক ছাড়িয়ে গলা ছাড়েন। দুরন্ত সুরেলা আর জমাটি সে গান। পড়ন্ত বেলা। নৌকা যত এগোবে ততই সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পালাতে থাকবে দেশান্তরী পাখির দল। বালিহাঁস। লক্ষ লক্ষ বালি হাঁস। নীল জলে কালো রেখার মতো বৃত্ত রচনা করে থাকে ওই দূরে। কাছে এগোলেই নীলজল থেকে উঠে উড়ে পালাতে থাকে দূরে দ্বীপ পাহাড়ের দিকে। ওদের ডানায় রোদের সোনা। এই তো রম্ভা। স্বর্গীয় রূপ নিয়ে মর্ত্যের অপ্সরা।

বেলা পড়ে আসছে। তীরে ফিরতে ফিরতেই চারপাশের সবুজ পাহাড় রং বদলে নিয়েছে। শ্লেট রঙের সেই পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা লাল চাকতি। ধীরে ধীরে নামছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। জলে সেই সূর্যের অস্তরাগের রং যেন নীল জলে গলানো সোনা ঢেলে দিল। আহ্ এই তো রম্ভা। রম্ভার সূর্যাস্ত। জীবন ধন্য বলে মনে হবে। সূর্যের অস্তরাগের সেই রং মনের গহনে ছড়িয়ে পড়বে। মনের ম্যালিন্য বলে যদি কিছু থাকেও বা মর্ত্যের অপ্সরা আর তার অস্তরাগের রং মুছে দেবে মনের মালিন্য।

গল্প

যদি

সিদ্ধার্থ সিংহ



শোনো মৌনাকী, তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। তবে একটা কথা, আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি কিন্তু সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারবে না। আর রাত দশটার আগে বাড়িতে ঢুকতে পারবে না...

ছেলের মায়ের কথা শুনে মেয়ের বাড়ির লোকেরা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন। এর আগেও দু'-চারজন তাঁদের মেয়েকে দেখে গিয়েছেন। তবে না, কেউই তেমন পুরনোপন্থী নন যে, "একটু হাঁটো তো মা, দেখি..." কিংবা "বলো তো পাঁচফোড়নে কী কী থাকে?"-র মতো প্রশ্ন করবেন।

একজন শুধু বলেছিলেন, আগে কী করেছ জানতে চাই না। যদি কারও সঙ্গে তোমার কিছু থেকে থাকে, ঠিক আছে। তবে আমার বাড়ির বউ হয়ে এলে কিন্তু আর কারও সঙ্গে প্রেমট্রেম কোরো না।

আর একজন বলেছিলেন, কোনও মেয়ের সঙ্গে মেশো না তো?

পাত্রের দিদির কথা শুনে সেবারও ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিলেন। এ আবার কেমন ধারা কথা। এটা আবার কেউ জিজ্ঞেস করে? হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে পারে, কোনও ছেলের সঙ্গে মেশো কি না। এটা জিজ্ঞাসা করলে, তার একটা মানে হয়। কিন্তু মেয়ে দেখতে এসে কেউ যদি কোনও মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, কোনও মেয়ের সঙ্গে মেশো না তো? তার উত্তর কী হবে, সে তো সবারই জানা। তাই সবাই যখন মেয়ের মুখ থেকে 'হ্যাঁ' শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে অছেন। ঠিক তখনই খুব স্পষ্ট করে মৌনাকী বলল— না।

না! 'না' শুনে মেয়ের বাড়ির লোকেরা অবাক। ও মিথ্যে বলল কেন? ওর তো হাজার একটা মেয়ে বন্ধু। যখন তখন আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। আর সেই গল্পের না আছে কোনও মাথা, না আছে কোনও মুন্ডু। তা হলে ও মিথ্যে বলল কেন?

এই প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারতে না মারতেই বাড়ির লোকেদের কানে ভেসে এল তাদের বাড়ির মেয়ের কথা— আমি লেসবিয়ান নই।

মৌনাকীর কথা শুনে পাত্রের দিদির মুখ খুশিতে ভরে উঠল। যাক বাবা, বাঁচালে। এখন চারদিকে যা ঘটছে, ছেলেরা ছেলেকে, মেয়েরা মেয়েকে প্রেম করছে। বিয়ে করছে। বিয়ের পরে কেউ কেউ সেক্স চেঞ্জ করছে। এটা তাও মন্দের ভাল। কেউ কেউ তো আবার বাই সেক্সচুয়াল। শুনে ভাল লাগল যে, তুমি সেরকম নও।

মৌনাকীর কাকা খুব গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। ছেলের দিদির কথা শুনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন, এরা কোন দুনিয়ার লোক! খবরের কাগজে কোথায় ফলাও করে ছাপা হল, একজন লোক দু'বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করেছে কিংবা কোনও একটি ছেলেকে একটি ছেলেকে প্রেম করে বিয়ে করেছে। বিয়ের পরে অপারেশন করে নিজে মেয়ে হয়েছে। অথবা কোনও মেয়ে, আর পাঁচটা মেয়ের মতো একটা ছেলেকে বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনের পাশাপাশি একটি মেয়ের সঙ্গে সমান তালে বজায় রেখেছে গোপন সম্পর্ক, পড়ে অমনি ভাবতে শুরু করে দিল, গোটা পৃথিবীই বুঝি এরকম হয়ে গিয়েছে। ছিঃ। এরা একবারও নিজেদের দিয়ে বিচার করে না! আরে বাবা, এরকম ছুটকো ছাটকা দু-একটা ঘটনা এক হাজার বছর আগেও ঘটত। পাঁচশো বছর আগেও ঘটত। এখনও ঘটে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। কিন্তু এগুলো হচ্ছে ব্যতিক্রমী ঘটনা। এরকম ব্যতিক্রমী ঘটনা দিয়ে গোটা পৃথিবীকে বিচার করলে চলবে না।

মেয়ের কাকা আরও অনেক কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন মেয়ের বাবা-মা'ও। সেই ভাবনা থেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নাঃ । আর যার সঙ্গেই বিয়ে দিই না কেন অন্তত এই পরিবারের সঙ্গে বিয়ে দেব না।

তাই ওই বাড়ি থেকে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মেয়ের বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে গিয়েছে।

তার পরেও সম্বন্ধে এসেছে। মেয়েকে দেখে গিয়েছে। কিন্তু ভবানীপুর থেকে আজ যে পরিবারটি তাদের মেয়েকে দেখতে এসেছেন, এদের কথাবার্তা তো একেবারেই অন্যরকম। কারও সঙ্গেই মিলছে না। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর এত বছরের জীবনে তিনি কখনও কোনও হবু শাশুড়িকে এ ধরনের কথা বলতে শুনেছেন বলেও তাঁর মনে হল না।

যে খবরের কাগজে ওঁরা 'পাত্র চাই'-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সর্বাধিক বিক্রিত সেই বাংলা দৈনিক পত্রিকাতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে কাজ করেন পাত্রের মা। বাবা হাই কোর্টের আইনজীবী। তাঁদের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে ডাক্তার। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। সেই ছেলের বিয়ের জন্যই ফেন করেছিলেন তাঁর মা। প্রথমেই বলেছিলেন, আপনারা তো বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, মেয়ে দেখতে শুনতে ভাল। তার মানে কি সুন্দরী নয়?

মেয়ের বাবা বলেছিলেন, সুন্দরী হলে তো সুন্দরীই লিখতাম। যেটা সত্যি, সেটাই লিখেছি। মিথ্যে বলব না, সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, আমার মেয়ে মোটেই সেরকম দেখতে নয়। তবে দেখতে শুনতে খারাপও নয়।

—লিখেছেন, গায়ের রং চাপা। তা, চাপা মানে কী রকম? কালো?

— না। ঠিক কালো নয়। তবে ফর্সাও নয়। শ্যামবর্ণ বলতে পারেন।

—শ্যামবর্ণ না উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ?

—দেখুন, কোনটা শ্যামবর্ণ আর কোনটা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সেটা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তাই আমি কেনও বিতর্কে জড়াতে চাই না।

তা হলে 'শ্যামবর্ণ' না লিখে 'চাপা' লিখেছেন কেন?

—কারণ, ছাপার অক্ষরে দেখে আর ফোনে বিবরণ শুনেই তো ছেলের বাড়ির লোকেরা আমার মেয়েকে তাঁদের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবেন না। তাঁরা অন্তত দু-চারবার আসবেন। মেয়েকে দেখবেন। কথা বলবেন। যাচাই করবেন। কথাতেই তো আছে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। তখনই তো তাঁরা সব দেখতে পারবেন। জানতে পারবেন। তাই মেয়ের বাবা হিসাবে মেয়ের সম্পর্কে আমি একটু কম কমই লিখেছি।

—এটা আপনার ভুল ধারণা।

—ভুল ধারণা! কোনটা।

—এই যে, ছেলের বাড়ির লোকেরা অন্তত দু-চারবার আসবে। মেয়েকে দেখবে। কথা বলবে। যাচাই করবে...

—করবে না?

—না। অন্তত আমরা করব না। আমরা একবারই যাব। দেখব। আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। মেয়ের সঙ্গে কথা বলব। উভয়ের উভয়কে পছন্দ হলে ওখানেই পাকা কথা দিয়ে আসব।

—তাই?

—হ্যাঁ। আপনাদের কবে সময় হবে বলুন।

— সামনের রোববার?

ছেলের মা বলেছিলেন, না। রবিবার হবে না। ওই দিন আমার অফিস আছে।

—রোববারও অফিস?

—হ্যাঁ আমার বুধবার অফ ডে।

মেয়ের বাবা বলেছিলন, তা হলে ওই দিন সন্ধ্যার পরে যদি আসতে পারেন...

— ঠিক আছে, তাই হবে।

কথা হয়েছিল বৃহস্পতিবার। তার পর আর কোনও কথা হয়নি। তাই মেয়ের বাবা ভেবেছিলেন, বুধবার সকালে একটা ফোন করে ছেলের মাকে মনে করিয়ে দেবেন। কিন্তু না। তার আর দরকার হয়নি। তার আগের দিনই, অর্থাৎ গতকাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ উনি ফোন করে নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, আজ আসছেন।

সেই কথা মতোই তিনি এসেছেন। সঙ্গে ছেলে এবং মেয়ে। তবে ছেলের বাবা আসেননি।

মৌনাকীর বাবা জানতে চাইলেন, আপনার হাজব্যান্ড আসেননি?

ছেলের মা বললেন, না। আসলে একটা জরুরি কেস এসে গিয়েছে। ও আজ সকালে একটু দিল্লি গিয়েছে।

—ও। কবে আসবেন?

—কাল।

—কালই?

—হ্যাঁ। আজ গিয়ে কেসটা একটু দেখে নেবে। কাল কোর্টে উঠবে। বিকেলের ফ্লাইট ধরে সন্ধের মধ্যে চলে আসবে।

— ও তা হলে উনি এখানে কবে আসবেন?

—কেন? আমি দেখে গেলে হবে না?

কেন হবে না? তা নয়। আসলে ছেলের বাবা না দেখলে...

—

ও না দেখলেও চলবে। যার দেখার দরকার তাকে নিয়ে এসেছি, এই যে আমার ছেলে। বিয়ে হলে ও ছাড়া আর যে দু'জনের সঙ্গে আপনার মেয়েকে থাকতে হবে, সেই দু'জনে এসেছি। এই যে আমার মেয়ে আর আমি। কই? আপনার মেয়ে কোথায়? ডাকুন।

মেয়ের মা ট্রে থেকে শরবতের গ্লাস নামাতে নামাতে বললেন, ও রেডি হচ্ছে।

ছেলের মা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথাও বেরোবে নাকি?

— না তো।

— তা হলে বললেন যে রেডি হচ্ছে...

—

না। মানে... বিয়ের ব্যাপার তো।.. প্রথম দিন ছেলের বাড়ির লোকের সামনে একটু ঠিকঠাক ভাবে না এলে... ছেলে আর মেয়ের দিকে তাকালেন ছেলের মা। তার পর বললেন, ও।

তার পর এ কথা ও কথা নানান কথা শুরু হল। পোস্ট অফিসে সামান্য টাকা মাইনে পেয়ে মেয়েকে কীভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় করেছেন। এমএ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁলিয়াজ ফ্রঁয়েজ থেকে ফরাসি ভাষা শিখিয়েছেন। মেয়ের বিয়ের জন্য একটু একটু করে টাকা পয়সা জমিয়েছেন। একটু সোনাদানাও করেছেন।

সোনার কথা উঠতেই ছেলের মা বললেন, যথার্থ শিক্ষা দিয়ে মেয়েকেই যদি সোনা করে তোলা যায়, তা হলে মেয়ের বিয়ের জন্য আর সোনা লাগে না।

দুই বাড়ির লোকজনদের মধ্যে যখন কথা হচ্ছে, পর্দা সরিয়ে ভেতরঘর থেকে খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘরে ঢুকল মৌনাকী।

মেয়েকে দেখে মৌনাকীর মায়ের চোখ একেবারে চড়কগাছ। এ কী করেছে সে। মহা বেয়াদপ তো। পইপই করে বললাম। বলল তুমি যাও, আমি ঠিক মেখে নেব। অথচ একটা কিচ্ছু মাখেনি। পাউডার তো নয়ই। সামান্য লিপস্টিকটুকুও ছোঁয়ায়নি। এ মেয়েকে কেউ পছন্দ করবে! আমার কী! নিজের ভাল নিজে না বুঝলে আমি কী করব! অত দাম দিয়ে সাজার পুরো সেটাটা নিয়ে এলাম। সেটা মাখলই না! কী মেয়ে রে বাবা। আমার কোনও কথা শুনলে তো!

মেয়েকে ঢুকতে দেখে মেয়ের বাবা বলে উঠলেন, আয় মা, আয়।

ছেলে মৌনাকীর মুখের দিকে তাকাল। ছেলের বোন তাকাল মৌনাকীর হাতের দিকে আর ছেলের মা তাকালেন মৌনাকীর পায়ের দিকে। তার পর তিনজন তাকাল তিনজনের দিকে। চোখে চোখ কথা হয়ে গেল। ওদের চোখাচোখি করতে দেখে মেয়ের মা কী বুঝলেন কে জানে, বলতে শুরু করলেন, আসলে আপনারা যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবেন, ও তো বুঝতে পারেনি, তার উপর আপনারা বেশিক্ষণ বসতে পারবেন না দেখে, ও শুধু শাড়িটা পাল্টেই চলে এসেছে। সাজলে গুজলে ওকে কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দরই লাগে।

ছেলের মা বললেন, আমরা তো দেখতে সুন্দর চাই না। দেখতে সুন্দর হলে অনেক সমস্যা আছে। পাড়ার কোনও ছেলে বউয়ের দিকে তাকাল, বাসে উঠলে কোনও লোক বউয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, দুদিনের জন্য অফিসের কাজে কোথাও গেলে নিশ্চিন্ত মনে কোনও কাজ করতে পারবে না। আমার ছেলে সারাক্ষণই টেনশনে থাকবে, বউকে কেউ ফোন করছে না তো... তার চেয়ে একটু কম সুন্দর হওয়া ভাল। অবশ্য সুন্দর বলতে আপনারা কী বোঝেন আমি জানি না। তবে সুন্দর বলতে আমি বুঝি শরীরের উপরকার নয়, ভিতরকার সৌন্দর্যটাকে।

—ভিতরের?

—হ্যাঁ ভিতরের। ওটাই মানুষের আসল সৌন্দর্য। উপরের যে সৌন্দর্য, সেটা তো বিয়ের পরে সামান্য একটা রোগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাথার সমস্ত চুল উঠে যেতে পারে। সারা গায়ে কালশিটে পড়ে যেতে পারে। কোনও দুর্ঘটনায় পুরো মুখটাই বীভৎস কুৎসিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মনের সৌন্দর্য কেউ নষ্ট করতে পারে না। আমাদের দরকার সেই সৌন্দর্য। ওটা থাকলেই আমাদের চলবে। আর কিছু লাগবে না। এ মেয়ে আমার ছেলের পছন্দ হয়েছে। আমার মেয়েরও পছন্দ হয়েছে। আর ওদের পছন্দ মানে আমার পছন্দ। তবে একটা কথা। এই যে, এদিকে তাকাও, শোনো মৌনাকী, তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। তবে একটা কথা, আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি কিন্তু সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারবে না। আর রাত দশটার আগে বাড়িতে ঢুকতে পারবে না...

মৌনাকী এতক্ষণ ছেলের মায়ের কথা শুনছিল। এই প্রথম মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে করে বলল, কেন?

—কারণ, বিয়ে হয়ে আসার পর থেকে সকাল দশটার আগে আমি কখনও ঘুম থেকে উঠিনি। আজও উঠি না। আর রাত দশটার আগে কোনও দিনই বাড়ি ফিরি না।

—সে নয় ঠিক আছে। বেলা দশটার আগে ঘুম থেকে উঠব না। কিন্তু রাত দশটা অবধি রোজ রোজ আমি কোথায় কাটাব?

—কেন, তোমার বন্ধুবান্ধব নেই? এই বাড়ি নেই। কফি হাউস নেই? সাউথ সিটি নেই? আড্ডা নেই?

—কিন্তু রোজ রোজ ওগুলো করতে গেলে যে অনেক খরচ...

—তাতে তোমার কী? তোমার বর আছে না? ও কি কম রোজগার করে নাকি?

কোনও ছেলের মা যে এরকম কথা বলতে পারেন, তা ওঁরা কল্পনা করতে পারেননি। তাই মৌনাকীর মা অবাক হয়ে বললেন, দুপুর দশটায় ঘুম থেকে উঠলে রান্নাবান্না করবে কখন?

ছেলের মা আকাশ থেকে পড়লেন। রান্নাবান্না? ও হোঃ, আমি তো বলতেই ভুলে গিয়েছি। আর একটা কথা, মৌনাকী, তুমি



কিন্তু ভুল করেও কখনও রান্নাঘরে ঢুকবে না...

মৌনাকী ফের প্রশ্ন করল, কেন?

—কারণ, তুমি যদি রান্নাঘরে ঢোকো, তা হলে আমি যা কখনও কোনওদিন করিনি, সেটাই আমাকে করতে হবে।

মেয়ের মা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মানে?

—মানে, বিয়ের পর থেকে সকাল দশটার আগে আমি যেমন কখনও ঘুম থেকে উঠিনি, অফ ডে থাকলেও রাত দশটার আগে যেমন বাড়ি ঢুকিনি— তেমনই লোক না এলে মাঝে মাঝে এক আধবার চা-টা করেছি ঠিকই, কিন্তু রান্না বলতে যা বোঝায়, সেটা আমি কখনও কোনওদিন করিনি।

— তা হলে রান্না করে কে?

—রান্নার লোক আছে তো।

— সে যদি কোনও কারণে না আসে?

—সেন্টার থেকে ফোন করে লোক আনিয়ে নিই।

— সেন্টার? সেটা আবার কী?

—বিভিন্ন সেন্টার হয়েছে না? তারা তো নার্স সাপ্লাই দেয়। কাজের লোক সাপ্লাই দেয়। রান্নার লোকও দেয়।

— তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—ঝড়-বৃষ্টি বা কোনও বড়রকমের দুর্যোগের জন্য যদি সেন্টারেও কোনও লোক না আসে, তখন?

—ছেলের বাবা আছে না? ও খুব ভাল রান্না করে।

—ছেলের বাবা রান্না করে!

—হ্যাঁ। পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল রাঁধুনিরা তো ছেলেরাই।

— ও , আচ্ছা। আচ্ছা, ছেলের বাবা এবার যেমন দু'দিনের জন্য দিল্লি গেলেন, সেরকম হলে?

ছেলের মা গদগদ হয়ে বললেন, তখন হোম ডেলিভারি। একটা ফোন করলেই হল।

—অন্তত সেই সময়টা তো ও রান্না করতে পারে।

মৌনাকীর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলের মা বললেন, না। একদম না। আমি চাই না, এই বয়সে এসে আমার স্বামী আমাকে কোনও কথা শোনাক। বলুক, তুমিও বউ, আর এও বউ। দেখেছ, কী সুন্দর রান্না করে। রাত দশটার আগেই কেমন বাড়ি ঢুকে যায়। সকাল দশটার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। না। একদম না। এই বয়সে এসে আমি কোনও কথা শুনতে পারব না। আমি যা বললাম, এই শর্তে যদি রাজি থাকেন, তা হলে বলুন, আমি পাকা কথা দিয়ে যাচ্ছি।

—কিন্তু... আপনাদের কী কী দাবি? মানে, বিয়েতে আমাদের কী কী দানসামগ্রী দিতে হবে, সেটা যদি আগে থেকে একটু বলেন...

এবার আর মা নয়, মুখ খুলল ছেলে। বলল, খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, সব চেয়ে নামী কোম্পানির বাহান্ন ইঞ্চি টিভি, লেটেস্ট ল্যাপটপ, অন্তত একশো ভরি সোনা, কিছু ফিক্সড ডিপোজিট, একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট...

ছেলের কথা শুনে মেয়ের মায়ের চোখ ছানাবড়া, মেয়ের বাবার মাথা ঘুরতে লাগল।

মেয়ে সরাসরি তাকাল ছেলের মুখের দিকে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছেলে বলল, এগুলো সবই আমাদের আছে। কিচ্ছু লাগবে না। আমরা শুধু মেয়েটিকেই চাই।

ছেলের কথা শুনে শুধু মেয়ে নয়, মেয়ের বাড়ির অন্য লোকেরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

অলঙ্করণ : শান্তনু দে

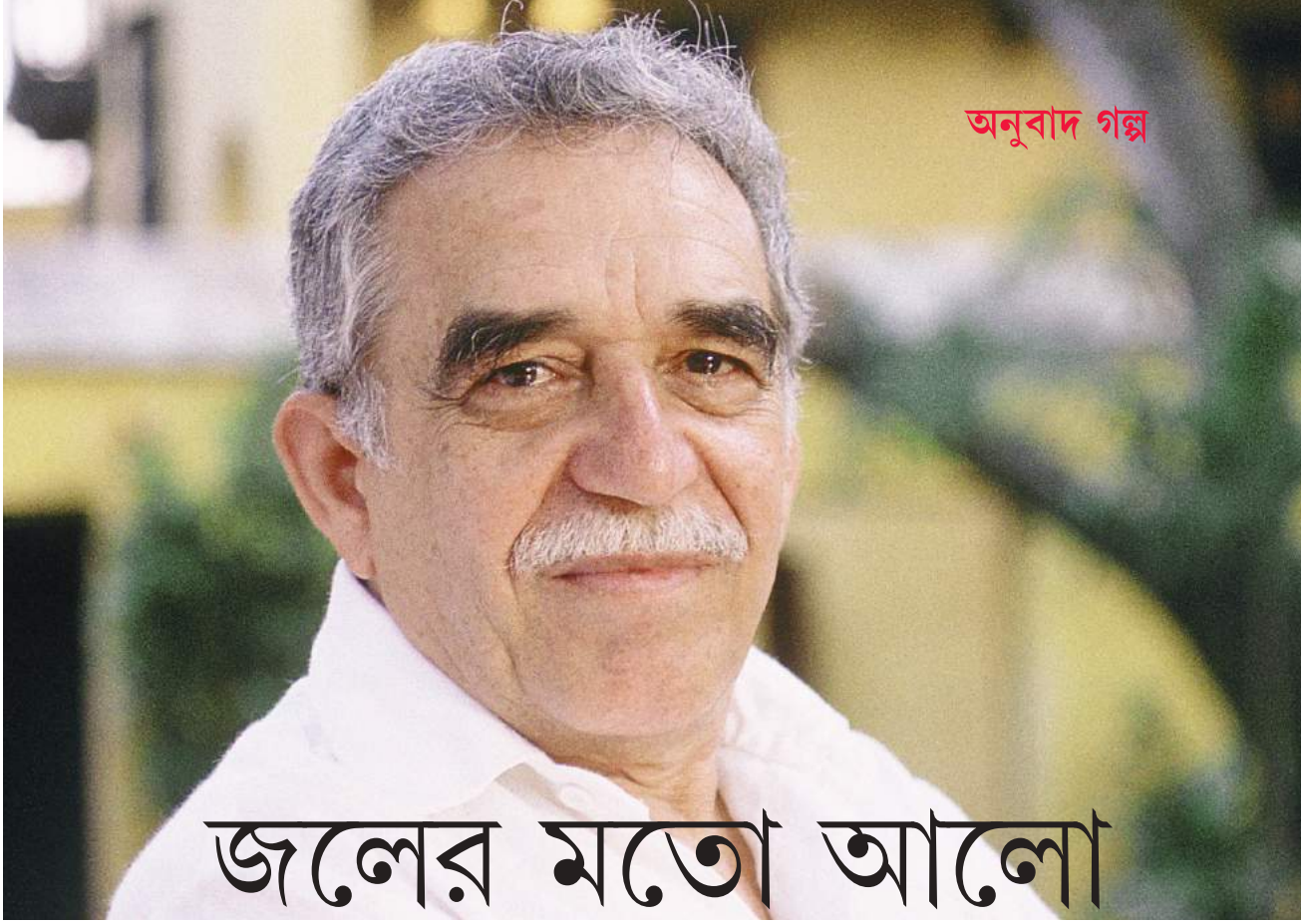

জলের মতো আলো

ভাষা ও ভাষান্তর : গৌতম ঘোষদস্তিদার

[১৯৯২ সাল থেকে ফুসফুসে বয়ে বেড়াচ্ছিলেন মারণ কর্কটরোগ। অবশেষে, ১৭ এপ্রিল রাতে, ৮৭ বছর বয়সে, নিউমোনিয়ার প্রকোপে, প্রয়াত হলেন লাতিন আমেরিকার কিংবদন্তিপ্রতিম লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ। কর্কটাক্রান্ত হয়েও তাঁর কলম ছিল ধরনার মতো সাবলীল, বাস্তবতার কুহক সহজ জলের মতো অবিরল ঝরে পড়েছে সেই কলম থেকে। ঔপনিবেশিকতাবিরোধী, সোস্যালিস্টপন্থী মার্কেজ কখনও বদ্ধ হননি তত্ত্বের কূপমণ্ডুকতায়। সাহিত্য তাঁর কাছে এক স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল বাস্তবনির্মাণ, যে-বাস্তবতা অনায়াসে পেরিয়ে যায় চাক্ষুষ দিগন্তরেখা, কল্পনা আর বাস্তবতা এক নির্ভার স্বপ্নময় গদ্যে ভর করে নিমেষে পৌঁছে যায় অভাবনীয় পরিণতিতে, যে-পরিণতিবিন্দু থেকে পাঠক শুরু করেন তাঁর নিজস্ব অন্বেষণ, কল্পবাস্তবের একান্ত ডানাবিস্তার। অথচ, মার্কেজের সেই অনিশ্চয়তার উড়ান চিরকাল যে-ভূমি স্পর্শ করে থেকেছে, তা এক ভয়াবহ বাস্তব, ঔপনিবেশিকতার অবিরাম বিরুদ্ধাচারণ। সব মিলে মার্কেজের অশীতিপর জীবনসমগ্র আজ মনে হতে পারে এক অসম্ভব বিস্ময়কর বাস্তবতালীন কুহক, যার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে আমাদের অবশিষ্ট আয়ু মোটেই যথেষ্ট নয়।

সম্পূর্ণ নাম গ্যাব্রিয়েল হোসে ডে লা কনকরডিয়া গার্সিয়া মার্কেজ। ১৯২৭ সালের ৬ মার্চ কলম্বিয়ার আরকাতাকা গ্রামে জন্ম। সাধারণ ওষুধবিক্রেতা গ্যাব্রিয়েল এলিসিয়ো গার্সিয়া এবং তাঁর গ্রাম্য-স্ত্রী লাউসা সান্তিয়াগা ইগুয়ারানের প্রথম সন্তান গাবো যে কালে-কালে হয়ে উঠবেন লাতিন-মার্কিন সাহিত্যের অটুট পিতৃপুরুষ, নোবেল পুরস্কার এসে যাবে করতলে, তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেনি কেউ। ভাবার কথাও নয়। পিতৃমাতৃ-নিরপেক্ষ হয়ে

দিদিমা ডোনা ট্রানকুইলিনা ইগুয়ারান আর দাদু কর্নেল নিকোলাস রিকারদো মার্কেজ মেজিয়ার কাছে এক অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন মার্কেজ। জীবিকার তাগিদে বাবা মা তাঁকে দাদু-দিদিমার কাছে রেখেই চলে যান দূরবর্তী বারানকুইলায়। অথচ, তিন বছর বয়সে মাকে দেখেই তাৎক্ষণিক চিনে নিয়েছিলেন গাবো। ১৯৩৭ সালে বাবা-মা নিজেদের একটু গুছিয়ে নেওয়ার পরে তাঁদের সঙ্গলাভ করেন মার্কেজ। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে, কুয়াশার মতো যে-অলঙ্ঘ্য দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা থেকে সারা জীবনই যেন আর নিস্তার পাননি মার্কেজ। কিন্তু, তাঁদের প্রেম, অসহায়তা চিনে নিতে পেরেছিলেন তিনি। 'শতবর্ষের একাকিত্ব', 'কলেরাকালে প্রেম' বা 'হাজার-দিনের যুদ্ধ' উপন্যাসে ধরা আছে সেই অসামান্য সময়ের ঐন্দ্রজালিক বৃত্তান্ত।

মার্কেজের রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল দাদু কর্নেল নিকোলাস রিকারদো মার্কেজ মেজিয়ার প্রভাবেই। মার্কেজ পরে তাঁকে বর্ণনা করেছেন 'ইতিহাস আর বাস্তবতার এক নৌরজ্জু' হিসাবে। 'হাজার-দিনের যুদ্ধ' উপন্যাসে লিবারেল প্রবীণের চরিত্রটি যে তাঁর ধাঁচেই লেখা, তা মার্কেজ জানিয়ে দিয়েছিলেন। দাদু তাঁকে ছেলেবেলায় কখনও অলীক রূপকথা শোনাননি, পরিবর্তে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিলেন দুর্গম অভিধানের গহনে। নিকোলাস ছিলেন এক অসামান্য কথক। তিনি প্রায়ই মার্কেজকে লক্ষের মতো বলতেন, "তুমি ভাবতে পারবে না, একজন মৃত মানুষ কতটা ভারী হয়।"

আর, কম ছায়া ফেলেননি দিদিমা ডোনা। তিনি বালক মার্কেজকে দেখিয়েছিলেন কল্পনার ডানা কীভাবে দিগন্ত পেরিয়ে যায়। বাস্তবতার মধ্যে নিহিত থাকে যে-কুহক, অলীক এবং অলৌকিক, তা হরেক গল্পে বর্ণনা করতেন ডোনা। তিনি ছিলেন যেন কুহকের এক অনন্ত উৎসার। তাঁর গল্প বলার বর্ণনাত্মক ধরনটি বিষম আকৃষ্ট করেছিল বালক মার্কেজকে।

১৯৪৩ সালে মার্কেজ গেলেন কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোতায়, স্কুলের শীর্ষপাঠ শুরু করলেন সেখানেই। দাদু মারা গিয়েছিলেন মার্কেজের ১৩ বছর বয়সে, আর দিদিমার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ২০। দাদু মারা যাওয়ার পরে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন, আর দিদিমা মারা যাওয়ার পরেই 'এল স্পেক্তাদোর' পত্রিকায় বের হল মার্কেজের প্রথম গল্প, পরের মাসেই দ্বিতীয় গল্পটিও। সে-সময় বোগোতায় মার্কেজের মেসের সামনে খুন হলেন উদারপন্থী নেতা হোর্হে এলিয়েসের গাইতান। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গড়ে ওঠে 'বোগোতাসো' গণ-আন্দোলন। আন্দোলনের সূত্রে কিউবার ছাত্রনেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে পরিচয় হয় মার্কেজের, যে-সখ্য অটুট থেকেছে অবশিষ্টকাল।

ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি অফ কলম্বিয়ায় আইন পড়ার সময়ই ভার্জিনিয়া উলফ এবং উইলিয়াম ফকনারের মতো লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন মার্কেজ। ওই দুই লেখকই তাঁকে আলোড়িত করতে থাকেন। ফকনারের বর্ণনাত্মক ভঙ্গি, ঐতিহাসিক কাহিনি আর গ্রামীণ প্রেক্ষিত সে-সময় বহু লাতিন-মার্কিন লেখককে প্রভাবিত করেছিল। স্বভাবতই সেই কুহকে পড়লেন মার্কেজও। ভার্জিনিয়া উলফের একটি চরিত্রের আদলে 'এল এলারদো' পত্রিকায় কলাম লেখা শুরু করলেন। সেই সব রচনা অসম্ভব জনপ্রিয় হল বিষয়, বিন্যাস আর বিশ্লেষণের গুণে।

১৯৪৮ সালে মার্কেজ লিখলেন তাঁর প্রথম নভেলা 'পাতার ঝড়'। লিখলে হবে কী, প্রকাশক পেতে গড়িয়ে গেল সাতটি বছর। ১৯৫৫ সালে ছাপা হল সেই উপন্যাসিকা।

১৯৫৭ সালে মার্কেজ পাকাপাকিভাবে যুক্ত হলেন সাংবাদিকতায়। 'এল মোমেন্টো' সংবাদপত্রের সূত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হল তাঁকে। পরের বছর কলম্বিয়ায় গিয়ে বিয়ে করলেন কিশোরকালের বান্ধবী মার্সেদেস বারচাকে। সে-বছরই ফিরে এলেন কারাকাসে। এল মোমেন্টোর মালিকের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে ছেড়ে দিলেন চাকরি। কিছুদিনের মধ্যেই সম্পাদক হিসাবে যোগ দিলেন 'ভেনেজুয়ালা গ্রাফিকা' সংবাদপত্রে। ১৯৫৯ সালে কিউবার বিপ্লবের পরে ফিদেল কাস্ত্রোর আমন্ত্রণে কিউবা গেলেন। দু'জনের 'মনীষা-বন্ধুত্ব' ক্রমে আরও গাঢ় হল।

১৮ বছর বয়স থেকেই মার্কেজ ভাবতেন একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখার কথা, যে-উপন্যাস গড়ে উঠবে তাঁর দাদুর-বাড়িতে অতিবাহিত ছেলেবেলার উপর ভিত্তি করে। দেড় বছর ধরে ভ্রুক্ষেপহীন নিয়মানুবর্তিতায় লিখে শেষ করলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস। শেষপর্যন্ত ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হল সেই উপন্যাস, 'শতবর্ষের একাকিত্ব'। ১৯৮২ সালে সেই উপন্যাস যখন নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হল, তখন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট তাঁকে নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে আসতে বলেন। এ সময় বের হয় বন্ধু প্লিনিয়ো আপুলিয়ো মেনদোসা-র সঙ্গে সুদীর্ঘ কথাবার্তার বই 'পেয়ারার গন্ধ'।

১৯৯১ সালে মার্কেজ শুরু করেন আত্মজীবনী রচনার কাজ। পরের বছর ধরা পড়ে ফুসফুসের ক্যানসার। কিন্তু, অদম্য জীবনীশক্তির বলে চলে তাঁর লেখালিখি, বক্তৃতা, চলচ্চিত্রনীরিক্ষা, জীবনযাপন। মারণ কর্কট তাঁকে পরাভূত করতে ব্যর্থ হলেও, শেষে চলে যেতে হল দুরূহ নিউমোনিয়ায়। থেকে গেল তাঁর রচনাসমগ্র, কুহক ও মনীষা। আমরা এখন তাঁকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়াস করব।]

বড়দিনের সময় ছেলেরা আবার একটি ডিঙিনৌকার বায়না ধরল। "ঠিক আছে", তাদের বাবা বললেন, "আমরা যখন কারতাজেনায় ফিরে যাব, তখন নৌকোটৌকো কেনা যাবে।" ন'বছরের টোটো আর সাত বছরের জোয়েল বাবার কথায় ভোলার পাত্র নয়। "না", সমস্বরে বলল তারা, "আমরা ওটা এখনই এখানে চাই।" "এখানে তো নৌকো চালাতে হবে", তাদের মা বললেন, "ওই শাওয়ারের জলে।"

তিনি এবং তাঁর স্বামী দু'জনেই ঠিক বলেছিলেন। কারতাজেনা ডি ইন্ডিয়ায় তাঁদের বাড়ির বাগান-লাগোয়া মোহানায় রয়েছে বন্দর, রয়েছে একটি ছাউনি। সেখানে দু'টি বড় নৌকা অনায়াসে ধরে যেতে পারে। অন্যদিকে, এখানে, মাদ্রিদে, তাঁদের থাকতে হয়, ৪৭ পাসেও ডে লা কাসতেল্লানার একটি ছ'তলা জনবহুল আবাসনে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, কেউই ছেলেদের কথা ফেলতে পারলেন না। কেননা, তাঁরা কথা দিয়েছিলেন, স্কুলের প্রাথমিক পরীক্ষায় পুরস্কার পেলে ছেলেদের সেক্সট্যান্ট আর কম্পাস-সহ একটি ডিঙিনৌকা কিনে দেবেন। ছেলেরা পরীক্ষায় পুরস্কার পেয়েছে। বাবার মনে হল, তিনি যেন জুয়ায় হেরে গিয়েছেন। সেই দেনা তাঁকে শুধতেই হবে। ফলে তিনি দেখেশুনে সবকিছুই কিনে আনলেন। অ্যালুমিনিয়ামের একটি সুন্দর নৌকো, নীচের দিকে আঁকা রয়েছে সোনালি তরঙ্গরেখা। স্ত্রীকে তখনই কিছু বললেন না।

"নৌকোটি গ্যারাজে রেখেছি", দুপুরে খাওয়ার সময় বাবা ঘোষণা করলেন, "কিন্তু, সমস্যা হল লিফটে বা সিঁড়ি দিয়ে নৌকোটি কোনওভাবেই উপরে আনা যাবে না। তা ছাড়া মুশকিল হল, নৌকোটি রাখার পরে গ্যারাজে আর একটুও জায়গা নেই।"

পরের শনিবার দুপুরে ছেলেরা তাদের স্কুলের বন্ধুদের বাড়িতে আসতে বলল। সকলে মিলে ধরাধরি করে যাতে নৌকোটি নীচের গ্যারাজ থেকে উপরে তুলে আনতে পারে। শেষ পর্যন্ত নৌকোটি উপরে এনে কোনওরকমে পরিচারিকার ঘরে ঢোকাতে পারল তারা।

"অভিনন্দন", তাদের বাবা বলেন, "এরপর কী?"

"এখন আর কিছুই না", ছেলেরা বলল, "আমরা সবাই চেয়েছিলাম নৌকোটি উপরে তুলে আনতে, এখন সেটা ওই ঘরে।"

বুধবার রাতে, প্রতি বুধবারের মতোই, বাবা-মা সিনেমা দেখতে গেলেন। ছেলেরা আবাসনের লোকজন আর বাড়িওয়ালাকে ডেকে আনল। সকলে মিলে ফ্ল্যাটের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল। বসার ঘরের একটি জ্বলন্ত বাল্ব ভেঙে ফেলল একজন। আর সেই ভাঙা-বাল্ব থেকে সোনালি আলোর মতো ঠান্ডা জল ঝরে পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে ঘরের মেঝের উপর ফুট তিনেক জল জমে গেল। তখন তারা সব আলো নিভিয়ে দিল, পাশের ঘর থেকে বের করে আনল নৌকোটি, দিকনির্ণয় করে বাড়ির দ্বীপগুলির ভিতর দিয়ে ভাসিয়ে দিল নৌকোটি।

আসলে, এই চমৎকার অভিযানটি হয়েছিল সেমিনারে গৃহস্থালি সামগ্রীর কবিতা নিয়ে আমার একটি হালকা মন্তব্যের জেরেই। টোটো আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, একটি সুইচ বন্ধ করলেই আলো নিভে যায় কেন। বিষয়টি নিয়ে দু'বার ভাবার মতো সাহস আমার ছিল না।

"আলো হল জলের মতো", আমি বলে দিয়েছিলাম, "তুমি ট্যাপ খুললেই যেমন জল পড়ে, তেমন।"

তারপর থেকে প্রতি বুধবার রাতেই নৌকো ভাসতে থাকল। সকলে মিলে কম্পাস আর সেক্সট্যান্ট ব্যবহারের কায়দা শিখতে লাগল। যতক্ষণ না তাদের মা-বাবা সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরতেন, ততক্ষণ চলত এই প্রশিক্ষণ। মা-বাবা ফিরে অবশ্য দেখতেন, ছেলেরা খটখটে ভূমিতে ঘুমোচ্ছে দেবদূতের মতো।

কয়েক মাস পরে, আরও দূরে যাওয়ার জন্য, তারা চাইল সাঁতারের পোশাক, মুখোশ, সাঁতারডানা, জলাধার আর বায়ুবন্দুক।

"এটা খুব খারাপ হচ্ছে। তোমরা পরিচারিকার ঘরে একটি আস্ত নৌকো এনে তুলেছ", বাবা বললেন, "তারপর এখন তোমরা আবার সাঁতারের সরঞ্জাম চাইছ। এ ঠিক নয়।"

"আমরা যদি প্রথম সেমেস্টারে 'গোল্ড গার্ডেনিয়া' পুরস্কার পাই?" জোয়েল বলল।

"না", মা বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে।"

বাবা তাঁর দিকে অসহায় চোখে তাকালেন।

"এই ছেলেদের আর পুরস্কার পাওয়ার দরকার নেই, খুব বাড়িবাড়ি হয়ে যাচ্ছে", মা বললেন, "কিন্তু, ওরা যা চাইছে, তা ঠিক আদায় করে নেবে, এমনকী, দেখো, স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের চেয়ারটাও।"

শেষ পর্যন্ত বাবা-মা "হ্যাঁ-না" কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু, জুলাইয়ে টোটো আর জোয়েল দু'জনেই গোল্ড গার্ডেনিয়া পুরস্কার পেয়ে গেল। হেডমাস্টার তাদের সংবর্ধনা দিলেন। সেদিন দুপুরেই, নতুন করে না-চাওয়া সত্ত্বেও, তারা শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল, বিছানার উপর সাঁতারের নতুন পোশাক রাখা রয়েছে। সেগুলির আনকোরা প্যাকেট বেশ চেনা যায়।

পরের বুধবারে, যখন বাবা-মা 'লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যারিস' ছবিটি দেখতে গিয়েছেন, তখন তারা আলোজলে ভরে ফেলল গোটা অ্যাপার্টমেন্ট, ঘরের যে-আনাচেকানাচে এতকাল অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে থাকত, সেখানে তারা খুঁজে পেল নানা টুকিটাকি জিনিস। দুই ভাই আসবাবের নীচে ডুব দিল, ভাসমান বিছানার উপর সাঁতার কাটল শান্ত হাঙ্গরের মতো।

বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, দুই ভাই স্কুলের মধ্যে 'সেরার-সেরা' হয়ে, এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। সৌকর্যের সার্টিফিকেট পেল দু'জনেই। এবার আর বাবা মায়ের কাছে নিজের মুখে কিছু চাইতে হল না। তাঁরা নিজেরাই জিজ্ঞেস করলেন কী চাই ছেলেদের। তারা খুবই বুঝদারের মতো বলল, স্কুলের বন্ধুদের জন্য একটা পার্টি দিলেই তারা খুশি হবে।

বাবা একান্তে স্ত্রীকে বললেন, "ওরা যে বড় হচ্ছে, এটা তারই প্রমাণ।"



ছেলেদের মা বললেন, "তোমার কথা ঈশ্বরের কানে গেলেই হয়।"

পরের বুধবার, যখন তাদের বাবা-মা 'দ্য ব্যাটেল অফ আলজিয়ারস' দেখছিলেন, তখন পাসেও ডে লা কাসতেল্লানার পথচারীরা দেখল, গাছগাছালির আড়ালে থাকা একটি পুরনো বাড়ির উপর থেকে ঝরে পড়ছে আলোর ঝরনা। বাড়িটির সামনের বারান্দা ছাপিয়ে সোনালি জলধারা উপচে পড়ছে অ্যাভিনিউয়ের উপর, বন্যার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে গুয়াডারমা শহরের সব রাস্তায়।

জরুরি তলব পেয়ে অচিরেই ঘণ্টা বাজিয়ে চলে এল দমকলের গাড়ি, কর্মীরা দ্রুত উঠে গেল ছ'তলায়, ধাক্কা মেরে দরজা খুলে তারা দেখল, অ্যাপার্টমেন্টটির মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত অথৈ-আলো ছড়িয়ে পড়ছে। বসার ঘরে লেপার্ড চামড়ার ঢাকনা দেওয়া সোফা আর ইজি চেয়ারগুলি ভাসছে বিভিন্ন স্তরে, সেলার থেকে ছিটকে আসা মদের বোতল আর ম্যানিলা শালে ঢাকা পিয়ানোটি সোনালি আলোর রশ্মিতে গড়িয়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। ঘরের জিনিসপত্র, কাব্যময়তায় পরিপূর্ণ, উড়ে যাচ্ছে রান্নাঘরের আকাশে। ছেলেরা নাচের সময় যে-সব বাজনা বাজায়, সেগুলি ভেসে যাচ্ছে তাদের মায়ের অ্যাকোরিয়ামের উজ্জ্বলরঙা মাছেদের সঙ্গে। নিচু উজ্জ্বল জলায় কেবল মাছগুলিই আনন্দে তিরতির করছে। সকলের টুথব্রাশ ভাসছে বাথরুমে, ভেসে যাচ্ছে বাবার কন্ডোম বা মায়ের ক্রিমের শিশি আর তোলা চশমা, আর বড় ঘর থেকে টেলিভিশন সেটটি ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে এ সব কিছুর পাশে, তখনও তাতে চলছে মধ্যরাতের প্রাপ্তবয়স্কদের ছবির অন্তিমপর্ব।

হলঘরের শেষপ্রান্তে, জলস্রোতে ভাসমান নৌকোর পিছনদিকে বসে, শক্ত হাতে বৈঠা ধরে আছে টোটো, তার মুখে মুখোশ, বন্দরে পৌঁছনোর জন্য সে বুঝে নিচ্ছে বাতাসের গতিবেগ, খুঁজছে সামনের কোনও বাতিঘর, আর জোয়েল, নৌকোর সামনের দিকে বসে সেক্সট্যান্টে চোখ রেখে খুঁজছে ধ্রুবতারা, সাঁইত্রিশজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তারা ভেসে বেড়াচ্ছে সারা বাড়িতে, বন্ধুরা আনন্দের আতিশয্যে মাঝে মাঝেই একটি সারসচঞ্চু-পাত্রে হিসি করছে হাসতে হাসতে, কখনও স্কুলের গানে হেডমাস্টারের নামে নানা কথা বসিয়ে বেদম গেয়ে যাচ্ছে, আর বাবার বোতল থেকে গেলাসে ব্রান্ডি ঢেলে চুমুক দিচ্ছে মঝেমধ্যে। তারা একসঙ্গে এত আলো জ্বেলে দিয়েছে যে ভেসে যাচ্ছে গোটা অ্যাপার্টমেন্ট, আর ৪৭ পাসেও ডে লা কাসতেল্লানার ছ'তলার সেন্ট জুলিয়ান দ্য হসপিটালার প্রাথমিক শ্রেণির দু'টি ক্লাসরুম সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছে। স্পেনে মাদ্রিদের মতো একটি গ্রীষ্মদগ্ধ এবং হিম-হাওয়ার অজ-শহরে, যেখানে কোনও সাগর বা নদী নেই, ডাঙাবদ্ধ অধিবাসীরা কখনও আলোর পথে নৌযাত্রার বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়নি।

স্প্যানিশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ : এডিথ গ্রসম্যান। সংকলন : 'স্ট্রেঞ্জ পিলগ্রিমস'

অলঙ্করণ : শান্তনু দে

প্রবন্ধ

শিশু মনে দাও মন

অনরণ্য আচার্য



কতভাবে মরমে মরে থাকে শিশুরা। আমরাই সেই মরমের হত্যাকারী আমরা কিছু আনাড়ি বাবা-মা। আমরাই গলা টিপে খুন করি আমাদের সন্তানের মরমকে। শিশুর ঘুম ভাঙা সকাল থেকে শুরু করা যাক। আমরা বেশিরভাগ বাবা-মা-ই শিশুর ঘুম ভাঙানোর পদ্ধতিতে বড় ভুল করে ফেলি। চিৎকার করে, গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিই।

অনেকে আবার বেশিক্ষণ ডাকাডাকি করার ধৈর্য রাখতে পারি না। কিছু নির্দয় বাবা-মা আমার ঘুমন্ত শিশুর উরুতে চটাস পটাস বেতের আদর কষিয়ে দিই। নয়তো চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলি ঘুম থেকে। ঘুমন্ত শিশুকে মারধর করে জাগানোর চেষ্টার মতো ঘৃণ্য অপরাধ আর নেই। এমনকী চিৎকার করে ডাকাডাকি করাও রীতিমতো অপরাধ। বাবা-মা হওয়ার সুবাদে এই অপরাধগুলি অবলীলাক্রমে আমরা করে যাই, যে অপরাধের কোনও বিচারই হয় না। বিচার করবে কে? বিচার হয় না। কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি হয়ে যায়। আর এই শাস্তির কোপটা গিয়ে পড়ে ওই ছোট্ট প্রাণ শিশুটির উপর। তাকে মরমে মরে গিয়ে মা-বাবার টনক নড়াতে হয়। মনমরা শিশুটিকে নিয়ে তখন বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ডাক্তারবাবু কী হল কী হল করে পয়সার শ্রাদ্ধ করি। কিন্তু সারা পৃথিবীর ওষুধ গুলে খাওয়ালেও কাজ হবে না। মনের ওষুধ খাওয়াতে হবে কিন্তু বাবা মাকেই। শিশুর মনের ওষুধের খাজানা না জানা থাকলেও সে ওষুধ থাকে বাবা-মা-র কাছেই। অধিকাংশ বাবা-মা তা জানেন না। তাই ওই জনক জননীই থেকে যান। প্রকৃত অর্থে বাবা-মা বা পিতা-মাতা আর হয়ে ওঠা হয় না। বাবা-মাকে জানতে হবে শিশুর ঘুম ভাঙা সকাল থেকে রাতে শিশুর ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের সঠিক ওষুধ। তার সঠিক ডোজ। শিশুর ঘুম ভাঙাতে ঘুমন্ত শিশুর মাথার কাছে বসুন। তার মাথায় আলতো হাতের ছোঁয়া রাখুন। অতি কোমল ও মৃদুস্বরে তার আদুরে নাম ধরে ডাকুন। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তাকে মৃদু নাড়া দিন। সে জেগে উঠবে। তবেই না তার গুড মর্নিং। কিন্তু এত ধৈর্য কি আছে আমাদের? বলুন তো? আমরা ব্যস্ত না? অফিস যাব না? যান। একশোবার যান। কিন্তু দয়া করে সেই ব্যস্ত জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে সন্তানকে আমন্তণ জানাবেন না ঘটা করে। স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে বা কম থাকলে তাকে ফলবতী করার জন্য যে পরিমাণ উদ্যোগ নিয়ে থাকি সন্তান আসার পর তার বেড়ে ওঠার ওষুধ জানার চেষ্টা করি না কেন?

ঘুম ভাঙার পর শিশু যদি ফুলের পাপড়ি মেলে ধরার মতো করে হাসি ছড়িয়ে দেয় বুঝতে হবে সেটাই প্রকৃত গুড মর্নিং হল। আদর করে ঘুম ভাঙানোর পরেও শিশু কাঁদলে তার মনের খবর জানার চেষ্টা করার বদলে তাকে উল্টে বকাঝকা করি। ধৈর্য হারাই। দু-চার ঘা লাগিয়েও দিই। আমাদের এই একটা বড় গুণ। যখন কোনও বাচ্চাকে হাসতে দেখি তখন আমাদের ধৈর্য বেড়ে যায় শতগুণ। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে আমরা তখন ক্রমাগত প্রশ্নবাণে শিশুকে জর্জরিত করি। কেন হাসছিস বল, কেন হাসছিস বল, বলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি। যতক্ষণ না হাসির কারণ জানতে পারি ততক্ষণ বাচ্চার মুক্তি নেই। কিন্তু যখন হাসির বদলে কাঁদতে শুরু করে, তখন আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। প্রচণ্ড বিরক্ত হই। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করিস না, যা চোখের সামনে থেকে ইত্যাকার ঝাঁঝানি, ধমকানি দিয়ে তার কান্না থামানোর চেষ্টা করি। আর 'আবার যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেবো', এই ছড়া তো আর আকাশ থেকে পড়েনি। এই ছড়ার কথা আমাদের বেশিরভাগ বাবা-মায়েরই মুখের কথা। মনের কথা বলতে বেধে গেল। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তা অনেক বাবা-মায়েরই মনের কথাও। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি। বাচ্চা কেন কাঁদছে তা জানার চেষ্টা করি না। বাচ্চার মনের খবর জানারও চেষ্টা করি না। অথচ ওই ছোট্টা প্রাণ শিশুটির মনে প্রায়শই প্রবল ঝড় বয়ে যায়। ঝড় আসে নানা কারণে। প্রথম বড় ধরনের ঝড়টা আসে শিশুর বাবা-মায়ের কাছ থেকে বাবা-মাকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখলেই অনেক বাচ্চার মন খারাপ হয়ে যায়। অনেক দুধের বাচ্চা চিৎকার করে কেঁদেকেটে তার প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু তিন-চার পাঁচ বছরের বাচ্চারা প্রতিবাদ করে না অনেক সময়। ভিতরে ভিতরে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করে। মরমে মরণ শুরু হয় সেখান থেকে। বাচ্চাকে এই জাতীয় মরণ থেকে দূরে রাখতে হলে বাবা-মাকে অনেক সংযত হতে হবে। এমন কোনও আচরণ করা বাঞ্ছনীয় নয় যা শিশুমনে ঝড় তুলতে পারে। কিন্তু 'ও ছেলে মানুষ ও অত বোঝে-টোঝে না'— অনেক সবজান্তা বাবা-মাকে এ কথা বলতে শোনা যায়। বাচ্চার সামনেই তার মায়ের হাত ধরে টানাটানি চলে। বাচ্চার মা-ও কিন্তু জোরালো বাধা দেয় না। ফলে বাচ্চার সামনেই কিছুটা অসংযত হন তাঁরা। কিন্তু দুঃখের কথা হল, যে শিশুটিকে অবোধ-বেবোধ মনে করা হল, সে কিন্তু ব্লটিং পেপারের মতো গোটা সিকোয়েন্সটাই শুষে নিল। শিশুমনের মণিকোঠায় চিরজীবনের জন্য বন্দি হয়ে রইল সেই চলচ্ছবি। ঘুম থেকে জেগে উঠে বাচ্চার কান্নাকাটি জুড়ে দেওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে। ভেবে দেখার মতো কিন্তু বিষয়টি। এই কান্নাই একটু বড় হতে হতে শুকিয়ে গিয়ে ক্রোধে রূপান্তরিত হবে। হতেই পারে। সজল বারুইদের বীজ অঙ্কুরিত হয় এভাবেই। বাবা-মাকে এই শিশুরা কোনওদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না। দেখতে পারে না, কারণ ভুলতে পারে না বাবা-মায়ের সেই চরম অসংযমী হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলিকে। বাবা-মায়ের বচসা, ঝগড়া এমনকী হাতাহাতি পর্যন্ত চোখে দেখতে হয় ওই শিশুটিকে। ফুলের পাপড়ির মতো মেদুর, নরম শিশুমনে ঝড় ওঠে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ক্রমাগত হতে থাকলে শিশুটির মরমে মরণ শুরু হয়ে যায়। বাচ্চারা কিন্তু বাবা-মায়ের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক, স্বাভাবিক আচরণই দেখতে চায়। আসলে এই সব শিশুদের কাছে আমরা এতটাই শিশু যে, শিশুর চোখের সেই সহজ সরল ভাষা আমাদের বোধগম্য হয় না। বাবা-মায়ের গা-মাখামাখি আদিখ্যেতা যেমন অসহ্য শিশুর কাছে, তেমনই অসহ্য বাবা-মায়ের মন কষাকষি, গুমোট সম্পর্কও। বাবা-মাকে হাসিখুশি দেখলেই মন ভাল থাকে বাচ্চার। স্বাভাবিক মনের

বিকাশও হয়। কিন্তু বাবা-মায়ের তো একটা দাম্পত্য জীবন বলেও কথা আছে। বায়োলজির লজিকটাকে অস্বীকার করা যাবে না। তাই তাদের দাম্পত্য সুখের বাড়াভাতে আমি ছাই দিয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপনের পক্ষপাতীও নই। বরং সুখী দাম্পত্য জীবনই সর্বসুখের মূলে—এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাসও করি। কিন্তু বিয়ের আগে প্রেম-পর্ব চলার সময় চুমু-টুমু ইত্যাদি ইত্যাদি স্পর্শসুখ বিষয়ক ব্যাপারগুলি যদি দিব্যি লোকচক্ষুর আড়ালেই চালিয়ে যেতে পেরেছিল, বিয়ের পরে নিজের শিশু সন্তানটির ক্ষেত্রে সেই আড়াল-আবডালটুকু কেন খোঁজার চেষ্টা হয় না? সে শিশু বলে? কিন্তু বাস্তবে তো তা হয় না। একটা বয়ঃবৃদ্ধের চোখ এড়িয়ে যায় অনেক সময় অনেক কিছু। কিন্তু শিশুদের চোখ এড়িয় যায় না কিছুই। বড়রা অনেক সময় বড়দের অনেক ভাঁওতা ধরতেই পারে না। কিন্তু ছোটদের চোখে একতিল কপটতাও বিলক্ষণ ধরা পড়ে যাবে। অথচ বড়দের চোখে ধুলো দেওয়া হল খুব সাজিয়ে গুছিয়ে। আড়াল আবডালে কোনও ফাঁক রাখা হল না। কিন্তু মজার ব্যাপার হল বড়রা অনেক ঘটনা দেখেন। আবার ভুলেও যান। মনে রাখলেও তা সাময়িক অস্বস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ছোটদের মন থেকে ওই ধরনের দেখা ছবি কিছুতেই মিলিয়ে যায় না। বরং শিশু যত বড় হতে থাকে ততই আরও স্পষ্ট হয় সেই সব ছবি। মরমে মরতে মরতে এই শিশুর মধ্যে অলক্ষে যথেচ্ছ যৌনচারের ইচ্ছা প্রবল হতে থাকে। এবং সেই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার সুযোগ খুঁজতে খুঁজতেই একদা নিষ্পাপ সরল শিশু একটি দাগি অপরাধীতে পরিণত হয়। নিজের সন্তানকে এভাবে অপরাধী তৈরি করার যে অপরাধ, তার কি কোনও ক্ষমা আছে? বাচ্চারা বাবা-মায়ের গুমোট সম্পর্ক দেখলে যেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, তেমনি বাবা বা মায়ের পরকীয়া প্রেমের বাড়াবাড়িও নিজের চোখে দেখে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে হয় তাদের। অনেকেই স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রেমিককে সরাসরি নিজের বেডরুমে ইস্তক অভিসারে ডেকে নেয়। অনুরূপভাবে স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগান বাড়ির অনেক কর্তাবাবুও। বউ বাড়ি না থাকলে এইসব বাবুদের খোলস খসে পড়ে। নেহাতই ভদ্র ভাল মানুষগোছের চেহারার বাবুরা বাড়িতে স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়ির পরিচারিকার দিকেও হাত বাড়াতে কসুর করেন না। বাড়িতে দু-তিন বছরের শিশুপুত্র বা শিশুকন্যা রয়েছে। থোড়াই কেয়ার। ও নেহাতই শিশু। কিছুই বুঝবে না। এইখানেই আমরা বড় বেশি হিসাবের ভুল করে ফেলি। শিশুরা যে এ ব্যাপারে বড়দের কান মুলে শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে সে জ্ঞানগম্যি বড়দের নেই একেবারেই। শিশুদের চোখের কর্নিয়ার ক্যামেরা যে ছবি একবার ধরে ফেলে, জীবনেও সেই ছবির নেগেটিভ নষ্ট হয় না। বরং যতদিন যায়, নেগেটিভের জোর বাড়ে। এবং তা পজিটিভের চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়ে যায় এক সময়। বাবা-মায়ের মৃদু ব্যভিচারের লক্ষণ ইস্তক বাচ্চা সইতে পারে না যেখানে, সেখানে ওই ছোট্ট প্রাণকে বাবা-মায়ের বিপুল ব্যভিচারও চাক্ষুস করতে হয়। সেই শিশু আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশুর মতোই হাসবে খেলবে, কথা বলবে, প্রাণোচ্ছল হবে, আশা করাটাই অন্যায়। মা-বাবার যৌন তাড়নার খণ্ডচিত্র শিশুর চোখে কেন ধরা পড়বে? ব্যভিচারের সাক্ষী হিসাবে তাকে দাঁড় না করালেই নয়? এই শিশুরা কোনও দিনও স্বাভাবিক আচরণ করতেই পারে না। স্কুলে গিয়ে এই শিশুরা হাসি খুশি সহপাঠীদের দেখলে ভিতরে ভিতরে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। অহেতুকভাবে সহপাঠী অন্য বাচ্চার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। যা আমরা প্রায়শই শুনতে পাচ্ছি। এখন প্রায়ই খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই দেখতে পাই কিশোর অপরাধের ঘটনা। সহপাঠী এক কিশোর আর এক কিশোরকে খুন পর্যন্ত করছে। হাত কাঁপছে না হাত কাঁপবে কেন? খুব ছোট থাকতেই তো তার মনে তীব্র বিষ ঢেলে দিয়েছে তার অপগণ্ড জনক-জননী, যারা তাদের যৌন জীবনকে আনন্দে ভাসিয়ে দিতে গিয়ে ঘটনাচক্রে সন্তানকে এনেছেন পৃথিবীতে। খুব একটা আকাঙ্ক্ষিত নয় সেই সন্তান। যাঁরা একথা বোঝেন যে, সন্তান না এলে বিবাহিত জীবন পরিপূর্ণতা পায় না, তাঁদের কাছে সন্তানের মূল্য অপরিসীম। চেষ্টা থাকলে তাঁরাই একমাত্র পারেন বাবা-মা হয়ে উঠতে। বাকিরা জন্মদাতা বা জন্মদাত্রী তার বেশি কিছু নয়। অনেক দেবাদেবী তাঁদের বাচ্চাকে প্রতিবেশীর জিম্মায় রেখে হাইফাই পার্টিতে যান। প্রতিবেশীরা বিরক্ত হলেও ভদ্রতার খাতিরে লজ্জার খাতিয়ে মুখে কিছু বলেন না। সুচতুরভাবে রাগ এবং বিরক্তি চেপে রাখেন। কিন্তু তার কোপ গিয়ে পড়ে ওই নিষ্পাপ শিশুর উপর। সারা দিন কেটে যায়। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামে। দেবাদেবী বাড়ি ফিরে আসেন। ওই দীর্ঘ সময় ধরে শিশুটি একা একা প্রতিবেশীর অনাদর অবহেলা সহ্য করতে করতে মরমে মরে কাঠ হয়ে থাকে। শিশুর মনে তখন অভিমান দানা বাঁধতে থাকে। অনেক বাচ্চা কান্নাকাটি করে রাগ দুঃখ প্রকাশ করে। যদি তা করে তো মঙ্গল, না করে শিশু যদি চরম অভিমানে নিজের ভিতরে সেই রাগ-দুঃখকে কবর দিতে থাকে তবে সেই শিশু ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। শিশুকন্যাকে প্রতিবেশীর কাছে রেখে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের অনেক সর্তক হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা প্রায়শই তা হই না। শিশুকন্যার উপর যৌন নিগ্রহ হতে পারে। শিশুকন্যা বুঝতে পারে না কী হচ্ছে। কিন্তু সে বিলক্ষণ বুঝতে পারে পারে এমন কিছু একটা হয়ে গেল যা খুবই লজ্জার। এবং গোপনীয়। শিশুকন্যার হলেও সে শিশুপুত্রের চাইতে এ ব্যাপারে একটু যেন বেশিই বুঝতে পারে। এটা মেয়েদের সহজাত বোধ বলা যায়। কোনও শিশুকন্যা মাকে সব খুলে বলল। বলল তো ভাল হল। সাবধান হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু না বললে? ছোট প্রাণে সেই দুরন্ত ঝড় বয়ে বেড়ালে? পরিণাম খুবই ভয়াবহ হতে পারে। মরমে মরণ শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় শিশুকন্যা ধর্ষণে শিকার হয় এভাবেই।

শিশুর মনের খবর আমরা বাবা-মায়েরা কতটা রাখি? বা রাখার চেষ্টা করি? আজ পর্যন্ত ক'জন বাবা্মা তাঁর বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেছে, "সোনামণি বা সোনা, তোমার আক কোনও বন্ধুর বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছে?" জিজ্ঞেস করি কখনও? উল্টে নিজের বন্ধুর বাড়ি যাই আড্ডা নিতে বা প্রাণ ভরা মনের রসদ নিয়ে ফিরতে। ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাই। বলা ভাল, যেতে বাধ্য করি। বাচ্চা যেতে না চাইলে বিরক্ত হই। বকাঝকা করি। পারলে কান মুলে দিই। জোর করে টেনে-হিঁচড়েও নিজের বন্ধুর বাড়িতে বাচ্চাকে নিয়ে যাই। বলি, "চল আজ অমুক কাকুর বাড়িতে যাব।" কিন্তু ভুলেও জানার চেষ্টা করি না বাচ্চার নিজের পছন্দের বাড়িটা কী? অনেক বাচ্চা বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরোতে পারলেই খুশি। কিন্তু বাবার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে মনমরা হয়ে পড়ে প্রায়শই। সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে কেউ থাকলে অনেক বাচ্চা মানিয়ে গুছিয়ে খেলাধুলোয় মেতে থাকে। অনেক সময় মানিয়ে নিতে পারে না অনেক বাচ্চা। কেন না এক একটা বাচ্চার প্রকৃতি এক এক রকম। তার কেবলই স্কুলের কোনও প্রিয় বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাহস করে না অনেক বাচ্চা। অনেক বাচ্চা আবার মুখ ফুটে বললেও আমরা বলি, উরিব্বাস, না না, গায়ে পড়ে লোকের বাড়ি গেলে



ওরা ভাববে কী? এই লোকের বাড়িটা আর বন্ধুর বাড়ি হয়ে ওঠে না। অথচ আমরা একটু সচেষ্ট হলেই ওই লোকের বাড়িটা বাচ্চারই বন্ধুর বাড়ি করে গড়ে তুলতে পারি। এ ব্যাপারে আমাদের একটু বেশি হয়তো সপ্রতিভ হতে হবে। কিন্তু আমরা এই সপ্রতিভতাটুকু কিছুতেই দেখানোর চেষ্টা করি না। অথচ নিজের মনের তাগিদে আমরা অনেক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেওয়ার সপ্রতিভতা দেখাই। কেউ গায়ে পড়া ভাবতে পারে সেই চিন্তায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সঙ্কোচে মরে যাই না।

বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বন্ধুর বাড়ি যাই হামেশাই। নিজেরা নিজেরা গল্প করি। প্রায়শই সেই গল্পের বিষয় টিয়গুলি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। নিজেরা আবার সেটা বুঝিও জ্ঞানপাপীর মতো। তাই যে বাচ্চাকে টেনে নিয়ে গেলাম, সেই বাচ্চাকেই বলি, বড়দের কথায় মধ্যে থাকতে নেই। যাও ওদিকে খেল গিয়ে। কোনদিকে যাবে? কী খেলবে সে? হয়তো সে বাড়িতে সমবয়সি কেন, কাছাকাছি বয়সের কোনও বাচ্চাই নেই। অথচ তাকে খেলতে হবে কেন আমরা যদি একটু সংযত হই? যদি একথা মাথায় রাখি যে, যে কথা বাচ্চার সামনে বলা যায় না, সে কথা হবে অন্য সময়। আর যদি অসংযমী আলোচনার আড্ডাই আমাদের বন্ধুর বাড়িতে টেনে নিয়ে যায়, তবে বাচ্চাটাকে কেন আরা সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যাই? **অলঙ্করণ : শান্তনু দে**

সরস গল্প

পদোন্নতি

প্রতাপ গুপ্ত



কনস্টেবল থেকে এএসআই। অর্থাৎ অ্যাসিসট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর। অর্থাৎ পদোন্নতি। এমনটি যে হাতে পারে কানাঘুষোয় আগাম জেনেছিল প্রাণকৃষ্ণ। তবু সরকারি ব্যাপার। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তো, এখন নিশ্চিন্তে ঢেকুরও তুলতে পারে প্রাণকৃষ্ণ। কারণ প্রমোশন অর্ডারের একটা কপি ইতিমধ্যে, অবশ্য আজই তার করায়ত্ত হয়েছে।

এখন সে ষোলো আনার উপর আঠারো আনা নিশ্চিত। আজকের দিনটা পেরোতে আর যে কয়েকঘণ্টা বাকি, শুধু সেই কয়েকটি ঘণ্টাই তার কনস্টেবল থাকার মেয়াদ।

কাল মাস পয়লা। হ্যাঁ কাল থেকেই বলার মতো একটা বিশেষণ জুড়ে যাবে তার নামের পাশে। কনস্টেবল প্রাণকৃষ্ণকে চিরকালের মতো বিদায় দিয়ে কাল থেকে থানায় এসে বসবে অফিসার পদমর্যাদার অ্যাসিসট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর প্রাণকৃষ্ণ? এতদিন সহকর্মীদের মধ্যে যাদের সে সমীহ ও ঈর্ষা করত, কাল থেকে অধিকার জন্মে যাবে তাদের দলভুক্ত হওয়ার। শুধু তা-ই নয়, কাল থেকে সে নিজেই হয়ে যাবে কারও কারও ঈর্ষার পাত্র।

ব্যাপারটা ভাবতে ভারী ভাল লাগছে প্রাণকৃষ্ণর। মনে হচ্ছে মুঠি মুঠি খুশির তুলোয় আলতো পা রেখে যেন ফুরফুরে হাওয়ায় হেঁটে বেড়াচ্ছে সে।

বলা দরকার, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো 'হঠাৎ কোনও ছলে' বিশাল বড়লোক বনে যাবার স্বপ্ন প্রাণকৃষ্ণও দেখে। তাই সে নিয়মিত লটারির টিকিট কেটে যায়। কিন্তু আজ যদি প্রোমোশন অর্ডারের পরিবর্তে সত্যি সত্যি কয়েক লক্ষ টাকা পেয়ে যেত প্রাণকৃষ্ণ, সম্ভবত এতটা খুশি হত না। কারণ এই যে, কয়েক লক্ষ টাকা আর যাই দিক, তার এতকাল কনস্টেবল থাকা ক্ষোভটা কিছুতেই ঘোচাতে পারত না।

প্রাণকৃষ্ণ আবার তার প্রমোশন অর্ডারটা পড়ে দেখল। ঠিক আছে। একেবারে পাক্কা।

আগামিকাল মাস পয়লা। কাল থেকেই তার ওজন বেড়ে যাচ্ছে অফিসে, পরিবারে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য পরিচিতদের মধ্যে।

ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার পালটে গেলে অনেকে চেনাজানা মহলে রাশি রাশি পোস্ট কার্ড ছাড়ে। প্রাণকৃষ্ণও কি তাই করবে? জানিয়ে দেবে— কাল থেকে সে আর কনস্টেবল নয়, পুলিশের একজন অফিসার?

না, তার দরকার নেই।

আসলে প্রাণকৃষ্ণর যত আত্মীয়স্বজন চেনা-জানাই থাক, এই মুহূর্তে তার মানস চোখে শুধু একটি মুখই ভেসে উঠছে। মুখটি আর কারও নয়, তার এক এবং একমাত্র শ্যালিকা তনুর।

পুরো নাম তনুশ্রী। দিদি মনোশ্রীর চাইতে বোন তনুশ্রী এক পোচ ফর্সা, একটা পাসও বেশি, তাইতেই ভারী নাক উঁচু। মেজাজি আর ঠোঁট কাটা। দিদির বিয়ের পর পর প্রকাশ্যেই বলে বেড়িয়েছে— জামাইবাবুটি তার মোটেই পছন্দ মতন হয়নি।

প্রথম প্রথম সেটা শ্যালিকার দুষ্টিমিষ্টি ঠাক্কা মনে করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল প্রাণকৃষ্ণ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওড়াতে পারেনি এবং অচিরেই বুঝেছিল সে সত্যি সত্যি তনুশ্রীর মন জয় করতে পারেনি।

পারলে যে কী হত, কতটা হত সেটা অবশ্য জানে না প্রাণকৃষ্ণ। মনের আড়ালে মাঝে মধ্যে উঁকি দেওয়া কোনও গোপন বাসনা কি তৃপ্ত হত? বাসনা বলতে অবশ্য মহাভারত অশুদ্ধ হবার মতন কিছু নয়। তেমন কিছু প্রাণকৃষ্ণ ভাবতেই জানে না। কিংবা জানলেও অতখানি বুকের পাটা তার নেই। এ ব্যাপারে সে স্বভাবভীরু। শ্যালিকার যৎকিঞ্চিৎ আদুরে প্রশ্রয় পেলেই সে বর্তে যেত। তো সেসব দূরে থাক, শালির কাছে আদতে সে কোনও পাত্তায় পায়নি। যন্ত্রণাটা সেখানেই। তার বুকের একটা প্রকোষ্ঠ শূন্যই রয়ে গিয়েছে।

অথচ এমন নয় যে, প্রাণকৃষ্ণ দেখতে শুনতে খারাপ। সাধারণ বাঙালির হাইটের চাইতেও অন্তত এক ইঞ্চি লম্বা সে। কাঁধের মাংসপেশি বা হাতের বাইসেপ চোখে পড়ার মতো। স্ত্রী মনোশ্রীর মেয়েলি আবেদনের তুলনায় সত্যি বলতে কী তার পুরুষালি বলিষ্ঠতা পাল্লায় ভারী। কিন্তু স্বামিত্বের মামুলি অধিকারে একমাত্র মনোশ্রীকে খুশি করা ছাড়া সেসব বাড়তি কোনও কাজে লাগল না প্রাণকৃষ্ণর। কে বলে সুন্দর স্বাস্থ্যের জয় সর্বত্র? বাজে কথা। নেহাত একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছে, তনুশ্রী তাই তাকে করুণার চোখে দেখে— ভাবটা এমনই। নইলে হয়তো কথাটিও বলত না।

কী তার অপরাধ? প্রথম প্রথম উত্তরটা খুঁজে পায়নি প্রাণকৃষ্ণ। শেষে সেটা জানতে পারে মনোশ্রীকে বিয়ের প্রায় বছরখানেক পরে। যখন পরস্পরের মন যুগিয়ে চলার আগ্রহটা অনেকটাই ফিকে হয়েছিল। তখন একদিন কলহের মাত্রা চড়াতে চড়াতে মনোশ্রী একেবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙার মতো করে বলেছিল — "তাহলে শোন সত্যি কথাই বলছি, আমি তোমাকে বিয়ে করি— এটা আমাদের পরিবারের ইচ্ছে ছিল না।"

বলে কি মনোশ্রী? প্রাণকৃষ্ণ যতই তেতে থাকুক, কথাটা শুনে একটু থমকে পড়েছিল। গলা স্বর নামিয়ে জানতে চেয়েছিল— 'কথাটার মানে?'

—'মানেটা বোঝ না? বোঝনি এতদিন?'

—'না', প্রাণকৃষ্ণ বলে, 'তুমি আমাকে বিয়ে করেছো, একথার অর্থ কী? বিয়ের আগে আমি কি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম নাকি? এমনভাবে বলছ যেন তোমার বড়লোক বাবা তোমাকে রাজপুত্রের হাতে তুলে দেবেন বলে ঠিক ছিল, আমি কোটাল পুত্র গিয়ে বাদ সেধেছিলাম, আর তুমি আমাকে দয়া করে—।'

—'দয়া করেই তো।' প্রাণকৃষ্ণর কথা টেনে মনোশ্রী ফের তার ঝাঁজ দেখায়।

— 'কী যা তা বলছ। তোমার আমার দেখেশুনে, সম্বন্ধ করে বিয়ে। উভয় পরিবারের মত ছিল বলেই আমাদের বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে তোমার দয়াটা আসছে কোথায়?'

—'তুমি কিচ্ছু জান না!' মনোশ্রী জানায়, 'আমাদের পরিবারের মত বলতে সেটা ছিল আমারই মত। সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দোনামনা করছিল। শেষে বাবা আমাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, মনো, তোর এখানে বিয়ে করার মত আছে কি না বল, তুই রাজি হলেই আমরা এগোব।'

—'তো?'

—'বাবা তখন অসুস্থ। প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। আমি রাজি না হওয়ার অর্থ বাবার দুশ্চিন্তা বাড়ানো। তাই বলতে পারো, বাবার কথা ভেবেই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলাম!'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ, তাই!'

—'তাহলে তো বলতে হয়— প্রাণকৃষ্ণ বলে, 'পাত্র' হিসাবে আমার কোনও ক্রেডিবিলিটিই ছিল না। আর যদি কিছু থাকে সেটা তোমার বাবার অসুস্থতা।'

—'তাছাড়া আবার কী। আমার বোন, মানে তোমার শালি তনু তো পাত্র পুলিশে কাজ করে শুনেই আপত্তি তুলেছিল, তারপর কনস্টেবল শুনে বলেছিল, দিদি, শেষ পর্যন্ত তোর বর হবে কিনা একটা সেপাই!'

কথাটা মিথ্যে নয়। কনস্টেবলের বাংলা অর্থ সেপাই-ই। তবু কনস্টেবল না বলে কেউ সেপাই বললে রীতিমতো আঁতে লাগে স্বয়ং প্রাণকৃষ্ণর। রেগে গিয়ে সে বলে, 'তোমার বোনের কী ধারণা ছিল, স্বর্গ থেকে উত্তমকুমার এসে তোমায় বিয়ে করতেন?'

—'ওই ভদ্রলোককে নিয়ে আবার টানাটানি করছ কেন?

তাছাড়া আমি কোনওদিনই উত্তমকুমারের ফ্যান ছিলাম না!'

—তবে কার ফ্যান ছিলে, পাড়ার জগা গুন্ডার? আর তাই এই পুলিশকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলে?

মনোশ্রী হেসে ফেলে দাম্পত্য কলহের চরিত্রই এইরকম। কোনও কথায় যদি মেজাজ চড়ে বাষ্প হয়, পরের কথাতেই হয়তো সেটা ঠান্ডা লেগে একেবারে জল হয়ে যায়। হাসতে হাসতে সে বলে, 'এই জন্যেই, এই জন্যেই তোমাকে আমি শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারি না জানো। কথা তুমি দারুণ বলতে পারো। এটা তো একটা গুণই বল? ক'টা মানুষ কথা বলতে জানে? তোমার কিন্তু সত্যি পুলিশ না হয়ে লেখক হওয়া উচিত ছিল।'

—'ভাগ্যিস হইনি!' প্রশংসা শুনেই হয়তো বা প্রাণকৃষ্ণ একটু নরম হয়ে বলে, 'হলে অনেকদিন আগেই বাপের বড়ি চলে যেতে তুমি ।'

—'কেন?'

—'বোঝ না? পুলিশ হয়েছিল বলেই দু'বেলা তবু ডাল-ভাত জুটছে। নইলে, শুধু ফুলের আহ্লাদ আর জ্যোৎস্নার রস খেয়ে বেঁচে থাকতে হত।'

—'এই দ্যাখো, আবার দারুণ একটা কথা বললে। ফুলের আহ্লাদ আর জ্যোৎস্নার রস। এ তো কথা নয়, কবিতার পঙক্তি।' মনোশ্রী প্রশংসার আরেকটি তুবড়ি ফাটিয়ে বলে, 'জানো প্রাণ, আমার খুব ইচ্ছে ছিল, একজন কবিকে বিয়ে করি। তোমায় পেয়ে আমার দুধের স্বাদ ঘোলে মিটেছে। কী বলব... কী বলব, তুমি আমার ঘোল গো—।'

—'ঘো-ও-ল?' —দু'চোখ বড় করে প্রাণকৃষ্ণ ছড়া কেটে বলে—

'বোলো না বোলো না সখী
স্বামীকে বোলো না ঘোল,
লোকে বলবে তোমার মাথায়
বিষম গন্ডগোল'

'—বলুক গিয়ে'। মনোশ্রী প্রাণকৃষ্ণর ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে প্রাণের খোলা বুকের ঘন রোমে আঙুল বোলাতে বোলাতে আদুরে স্বরে বলে, 'হ্যাঁ গো, তুমি কবে কনস্টেবল থেকে অফিসার হবে?'

— 'হয়ে কী লাভ? পুলিশের চাকরিতে কনস্টেবলও পুলিশ, অফিসারও পুলিশ।'

— তা হোক। তবু তনুশ্রীকে একটা জবাব দেওয়া যাবে। তুমি তো জানো না, ও তোমাকে আড়ালে জামাইবাবু না বলে সেপাইবাবু বলে। নিজের বোন হলে কী হবে, ভারী দেমাক তনুর— নয় আমার থেকে একটা বেশি পাস করেছিল, তাই বলে নিজের জামাইবাবুকে এত অবজ্ঞা করবি?

না, নিছক একটা বেশি পাস বলে নয়। প্রাণকৃষ্ণর পুরুষ সত্তা জানে, তনুশ্রীর আসল দেমাক দিদি মনোশ্রীর চাইতেও সে অনেক বেশি সুন্দরী বলে। তার অঙ্গের বিভঙ্গে যে বিদ্যুতের ঝলক খেলে, সে বিষয়েও তনুশ্রী সচেতন। কিন্তু এ কথা এখন, এই মুহূর্তে, মনোশ্রী যখন তার বুকের উপর আবিষ্ট হয়ে আছে, কিছুতেই বলা যাবে না। বললে এক্ষুনি তার বুক থেকে অন্তত পাঁচ ফুট দূরে ছিটকে গিয়ে দাঁড়াবে মনোশ্রী। ফের রাগের পেখম ছড়াবে। এবং প্রাণকৃষ্ণকে নিজের দেওয়া 'কবি স্বীকৃতি' ছিনিয়ে নিয়ে লাম্পট্যের ঘোরতর অভিযোগে অভিযুক্ত করবে।

প্রাণকৃষ্ণ মনে মনে হাসে। মায়ের পেটের যে বোনকে কিছুক্ষণ আগেই সহযোদ্ধা করেছিল, এখন তাকেই শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করছে মনোশ্রী। এটা কি মনোশ্রীরই স্বভাব, না মেয়েদেরই একটা সাধারণ চরিত্র লক্ষণ? নাকি, সবটাই ছলনা— ক্যামুফ্লাঝ, — নিজের পুরুষকে আগলে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা? প্রাণকৃষ্ণ ঠিক বুঝে পায় না। ভারী অদ্ভুত।

মনোশ্রী বলে, —'তাছাড়া তুমি অফিসার হলে নিশ্চয়ই তোমার কাজের চাপও অনেক কমে যাবে—।'

—'কেন?'

—'শুনি তো সরকারি অফিসে নিচু তলার কর্মীরাই কাজ করে—।'

—'উঁচু তলার কর্মীরা ফাঁকি মেরে বেড়ায়।'

—'না, না। ফাঁকি মেরে তোমায় আমি বেড়াতে বলব না। ফাঁকির সময়টায় না বেড়িয়ে তুমি কবিতার কথা ভাববে, কবিতা লিখবে। তখন কী দারুণ ব্যাপার হবে বল তো? তোমার মধ্যে দ্বৈত সত্তা জেগে উঠবে। একদিকে পুলিশের জন্য ডাল-ভাত— না, তখন মাছভাত খেয়ে পেট শান্ত থাকবে, অন্যদিকে কবির জন্য ফুলের আহ্লাদ আর জ্যোৎস্নার জুস পান করে মনটাও থাকবে রসে বশে।'

—'জ্যোৎস্নার জুস? আমি তো তা বলিনি, বলেছি, জ্যোৎস্নার রস,।'

—'ওই হল। রস মানে তো জুসই গো। আধুনিক কবিতা পড়ে পড়ে আমার মগজটাও আধুনিক হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবিতার রহস্যটা আমি এখন বুঝি। পুরনো শব্দকেই একটু ইয়ে — মানে ইয়ে করে— যাইহোক, মোটমাট আমি তোমাকে এ ব্যাপারে হেল্প করতে পারব। দেখবে তখন তনুশ্রীই আমাদের ঈর্ষা করবে। আর তাছাড়া, তখন তুমি তো আর সেপাই থাকবে না। অফিসার হবে। তোমাকে ওর জামাইবাবু বলতেই হবে।

শ্যালিকার মুখ ভাবতে ভাবতে প্রাণকৃষ্ণ তার হাতের প্রমোশন অর্ডারটাতেই একটা চুমু খেল। কাল থেকে পদমর্যাদা তার শুধু অফিসেই বাড়ছে না, শ্বশুরবাড়িতেও বাড়ছে, বিশেষ করে তার এক এবং একমাত্র শালির কাছে। অফিসে কনস্টেবল থেকে অফিসার আর শ্বশুরবাড়িতে সেপাইবাবু থেকে জামাইবাবু। অর্থাৎ, ওয়ান অ্যাকশান ডাবল রেজাল্ট। আগামিকাল সত্যিই তার দ্বৈত সত্তার বিকাশ ঘটছে।

প্রমোশন অর্ডারটা খুব যত্ন করে পকেটে পুরল প্রাণকৃষ্ণ।

অলঙ্করণ : শান্তনু দে




বহুবর্ণ চিত্র
শিল্পী পূজা সরকার
Puja,15

দীর্ঘ কবিতা

তিন মেয়ের গল্প

সুবোধ সরকার



দিয়া

দিয়া নামের মেয়েটি ছিল শরৎকাল,
মনটা গাঢ় নীল
ধানের খেতে ধানের মতো ঢেউ হয়ে সে আসত
ঠোঁটের কোণে দ্বীপান্তরে লুকোনো ছিল তিল।

উড়ে বেড়াত
নদীর ধারে, নদীর থেকে যেত না দূরে
নদীর জলে ভাসত
প্রজাপতির সঙ্গে তার অনেকগুলো মিল।

আকাশ থেকে যেমন নামে সকাল
দিয়ার পায়ে ঘুঙুর
হারানো বাঁশি নিজেই দিত সুর
গ্রামের মাঠ গ্রামের পথ তখন মতিঝিল।

আকাশ থেকে যেমন নামে আষাঢ়
সঙ্গে নামে অলুক্ষুণে আঁধার
উঠোনে এসে দাঁড়াল যেই দিয়া
আষাঢ় আর আঁধার হল হাসিতে খিলখিল।

দিয়া, তোমার গগনে ওড়ে চিল
ভাঙন ধরা স্কুল বাড়িটা পড়াশোনার নিখিল
অঙ্কে ষাট, ইংরেজিতে দারুণ পাস
সবার চোখে দিয়া তখন দু'হাতে ধরা আকাশ।

খবর পেয়ে লুকিয়ে ছিল দিয়া
লোকাল ট্রেনে উঠতে হবে, নামতে হবে কলকাতায়
গড়িয়াহাট বি ফিফটিন, অনেক উঁচু
লিফটে করে উঠতে হবে বারোতলায়।

হাসিটা ছিল শরৎকাল, মনটা ছিল নীল
সে এখন ঝি
সকালে বালিগঞ্জে নামে বাসন মেজে রাত্রে ফিরে যায়।
সে এমন কী!
সে এমন কী?
প্রজাপতির সঙ্গে তার ছিল অনেক মিল।

আমি কৃষ্ণকলি মাহাত, এম এ, পিএইচডি

আমার গা অমাবস্যা
আমার চুল মেষপালকের ফাল্গুন
আমার পিঠ সাঁওতাল পরগনা
আমার দুটো থাই—একটা বাঁকুড়া
একটা পুরুলিয়া।
আমি গড়িয়াহাটার মেয়েদের মতো
আরশোলা দেখে পালিয়ে আসি না।
বোমায় বাঁ-হাত উড়ে যাওয়া বাবা
কতবার আমার বই পুড়িয়ে দিয়েছে
কতবার আমার দুঃখী মা বলেছে মেয়েদের বড় হতে নেই।

মা আমি ইওরোপ থেকে ডাক পেয়েছি, এই দেখো ই-মেল
দলিত সম্মেলনে আমি পেপার পড়তে চলেছি।
মা, আমি তোমার কৃষ্ণকলি মাহাত, এমএ,পিএইচডি।

আমি যার কাছে পিএইচডি করতাম
সেই প্রফেসর আমাকে রায়চকে নিয়ে যেতে চাইলেন
আমি বললাম, কেন রায়চক কেন?
উনি বললেন, রায়চকে না গেলে পিএইচডি পূর্ণ হয় না।
আমি বললাম, আমি আপনার ফ্ল্যাটে যেতে পারি
উনি আঁৎকে উঠে বললেন, না না আমার বাড়ি না।

আমার পি এইচডি এক বছর পিছিয়ে গেল
আমি ফোন করলাম, স্যর আমি রায়চক যাব
হোটেলের ঘরে তিনি আমার মুকুটমণিপুরে হাত দিলেন
আমার সাঁওতাল পরগনার হুক খুলে ফেললেন
হাঁ হয়ে দেখতে থাকলেন আমার বাঁকুড়া আমার পুরুলিয়া
আমার দুই অগ্নিগোলকের কাছে মুখ নিয়ে এলেন
তক্ষুণি চিৎকার আগুন আগুন আমি পারব না
সেদিন আমার প্রফেসর আমাকে ফেলে পালিয়ে গেলেন।

কানায় কানায় ভরা দিঘির মতো শরীর
সীতা কিছুটা শ্লথ
নৌকা এসে দাঁড়াল নৈমিষারণ্যে।
লক্ষ্মণ বললেন দেবী
এখানে আপনাকে নামতে হবে
আপনাকে নামিয়ে আমি ফিরে যাব রাজদ্বারে।

সীতা তাঁর দেবরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন
এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?
তুমি আমাকে বিড়াল পার করার মতো
ফেলে রেখে যাবে লক্ষ্মণ?
তোমার জ্বরের সময়
আমি তোমাকে মাতৃস্নেহে কপালে জলপট্টি লাগিয়ে দিয়েছি
তোমার জন্য কতদিন অন্ন প্রস্তুত করেছি।

লক্ষ্মণ বজ্রের মতো কঠিন স্বরে বললেন
দেবী আমি রাজধর্ম পালন করতে এসেছি
আমি স্নেহের কাঙাল
কিন্তু আমি রাষ্ট্রের অংশ।
সেখানে স্নেহ, সেখানে মায়া, সেখানে ভালাবাসা
তিনটে বিন্দু, স্রেফ তিনটে ঘামের বিন্দু।

সীতা দেবরের দিকে অপলক তাকালেন
ছেলেটাকে আমি এরকম কখনও দেখিনি
রাষ্ট্রের কাছে হৃদয়ের দাম
মানুষ পায়নি কোনওদিন?
আমি জানি হে দেবর তুমি কতদিন
কান্না লুকিয়েছ, রাষ্ট্রকে মেনে নিতে তুমিও পারনি।
সেই তুমি আমাকে পশ্চাতে ফেলে ফিরে যাবে রাজদ্বারে?
তুমি জান আমি সন্তান-সম্ভবা, আমার পাঁচ মাস চলছে
এ সময় বিড়ালও ফেলে না কেউ
আর তুমি আমাকে ফেলতে এসেছ?

সীতা চোখ থেকে করুণা
গ্রীবা থেকে অহংকার
গলা থেকে মাটি
পিঠ থেকে কুয়াশা মুছে ফেলে
এবং
শরীর থেকে রাষ্ট্রের দেওয়া শাড়ি
খুলতে শুরু করলেন
হাত দিয়ে চেপে ধরলেন পেট
পাঁচ মাসের মাংসকে বললেন
আয় আয়
ঝড় আর ঝঞ্ঝা আয়
বৃষ্টি আয় ধারা আয়
ধারাস্নান আয়
কতদিন ভাল করে স্নান করিনি আমি।
লক্ষ্মণ তুমি জানো
আমার পাঁচ মাস চলছে
আমার কুড়ি সপ্তাহ চলছে
আমার দেড়শো দিন চলছে
তুমি যেটা জানো না সেটা হল
আমার পাঁচ মাস অবৈধ
আমার কুড়ি সপ্তাহ অবৈধ
আমার দেড়শো দিন অবৈধ।
আমার পাঁচ মাসের মাংস খণ্ড দুটো
যেন দুই ফাল্গুন।
ফাল্গুন তোমার দাদার নয়
তোমার রাষ্ট্রের নয়
রাজধর্মের নয়।





সীতা ডাঙায় নেমে
গৌরব খুলে ফেললেন
অহংকার খুলে ফেললেন
অগ্নি খুলে ফেললেন
আভিজাত্য খুলে ফেললেন
হাতের বালা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হেসে উঠলেন খিলখিল করে
রাজবস্ত্র ছেড়ে ধীরে ধীরে নগ্ন হলেন
শাল্মলী পাতার মতো নগ্ন
ঘাসের মতো নগ্ন
জ্যোৎস্নার মতো নগ্ন
নদীর জলের মতো নগ্ন
লক্ষ্মণ চোখ বন্ধ করে বললেন আজ্ঞা করুন দেবী
আমি যেন রাজদ্বারে ফিরে যেতে পারি।
নগ্ন সীতা ধীর পায়ে এগিয়ে এসে হাত রাখলেন
দেবরের মাথায়
বললেন, বীর সবসময় বড় হয় না।
তুমি ততটা বড় হওনি যে তুমি
আমার স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

কিন্তু লক্ষ্মণ আমি তাকে বলতে পেরেছিলাম
শম্বুককে মেরো না
কালো হলেই একটা লোককে মারা যায় না
কালো বলে একটা দেশ পুড়িয়ে দেওয়া যায় না
আমার ধর্মে বিশ্বাসী নয় বলে
তার হাত কেটে নেওয়া যায় না
তোমার দাদাকে আমি বোঝাতে পারিনি।
তাকে বোলো শুরু হল আমার নতুন লড়াই
আমি পৃথিবীর প্রথম মা, আমার পাঁচ মাস চলছে
একক মা
আমার সন্তানের কোন বাবা থাকবে না।

আমি তাদের মা
আমি তাদের বাবা
আমি তাদের মাটি
আমি তাদের আকাশ
আমি তাদের অগ্নি
আমি তাদের জল
তমসা মা জ্যোতির্গময়

পৃথিবী কোনওদিন জানতে পারবে না
কে তাদের বাবা
কার ঔরসে তারা আজ পাঁচ মাসের
কেউ জানবে না
শুলেই হয় না ভালবাসাতে হয়।

লক্ষ্মণের নৌকো ফিরে চলল
সীতা বৃষ্টির ভেতর বৃষ্টি হয়ে নাচতে শুরু করলেন
মাটির ভেতর শুয়ে মাটি হয়ে গেলেন
নেমে এল আকাশ
সীতা নিজেই তখন আকাশ।



নৈঋত ও নিয়তির মাঝখানে
সীতা তখন আর রাজবাড়ির বউ নন, মা নন, পুত্রবধূ নন
দুই আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকা
পৃথিবীর প্রাচীনতম একটা গান, একটা কবিতা।
আমি কৃষ্ণকলি মাহাত এমএ, পিএইডি
কত কষ্ট করে কত অপমান সহ্য করে
জঙ্গলে রাত জেগে বই পড়ে আমি এখানে এসেছি
কেউ আমাকে জায়গা ছেড়ে দেয়নি
কেউ কাউকে জায়গা ছেড়ে দেয় না
না পুরুলিয়ায় না কলকাতায়।

মা আমি চেক ইন করে ভেতরে এলাম
মা আমি ইমিগ্রেশনে দাঁড়িয়ে, বাবাকে দেখে রেখো
মানুষটার একটা হাত নেই
অফিসার আমার নাম উচ্চারণ করলেন : কৃষ্ণকলি মাহাত
আমি বিমানের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, মা
বিমান সেবিকা আমাকে ম্যাডাম বলল
আমাকে আমার নাম্বারে নিয়ে বসাল
আমি সিট বেল্ট বেঁধে ফেললাম
প্লেন রানওয়ে ধরে দৌড়তে শুরু করেছে,
দৌড় দৌড় দৌড় কী গতি কী তেজ কী আওয়াজ
আমার মনে হল বিমান রানওয়ে ধরে দৌড়চ্ছে না
দৌড়চ্ছি আমি, আমি, আমি.....
আমি কৃষ্ণকলি আমি মাহাত আমি এমএ, আমি পিএইচডি।

দুটি অবৈধ মাংসখণ্ডের মা

রামবাবু সেদিন একটা সিদ্ধান্ত নিলেন
রামবাবু সেদিন দুপুর বারোটায় একটা সিদ্ধান্ত নিলেন
রামবাবু সেদিন মধ্যাহ্নের আলোয়
একটা সিদ্ধান্ত নিলেন
রামবাবু সেদিন মধ্যাহ্নের আহারের আগে
ক্যাবিনেট না করে
প্রেস না করে
একটা সিদ্ধান্ত নিলেন।

তাঁর স্ত্রী অপরূপা
তাঁর স্ত্রী তপ্ত কাঞ্চনের মতো চাপা কিন্তু লেলিহান
তাঁর বৈশাখের দহন
তাঁর শ্রাবণের লজ্জা
তাঁর আশ্বিনের হঠকারিতা
তাঁর ফাল্গুনের গ্রীবা
দু'হাতে সরিয়ে রেখে ডাকলেন 'লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ'।



দীর্ঘ কবিতা

নতুন জন্ম

শ্যামলকান্তি দাশ



আমি দেখতাম অন্ধকারেও কারও কারও চোখ হিংস্র কঠিন
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে রক্ত লিখছে বনের ভিতর!

উড়ে বেড়াতাম পাখির সঙ্গে—দূর আরও দূর—দুবরাজপুর
উড়তে উড়তে কত কালো হাঁস কত ধলো হাঁস জলা ও পুকুর
কত মাঠ ঘাট খেত ও খামার কত ধান চালবাগান বাগিচা
আমি উড়তাম মনের ওপাশে বনের ওপাশে সন্ধেবেলায়
উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে...থাক সে গল্প! গল্পের কথা!



কথা বলতাম মাটির সঙ্গে ফিসফিস করে সারাদিন ধরে
জলের সঙ্গে কত খুনসুটি—আঁচড় কামড়—কত আহ্লাদ
সাঁতারে সাঁতারে অবিশ্রান্ত এপার ওপার...

গাছের সঙ্গে সারাদিন কী যে ভালবাসাবাসি, সোহাগ প্রণয়
কত আশ্লেষে জড়িয়ে ধরেছি একেকটা গাছ গাছের জীবন
পাতা মর্মর শাখা ও প্রশাখা, কত-না শ্যামল ছবিতে সাজানো
টুপ টুপ করে খসে পড়ে ফল—পাখির খাবার!

আকাশের নীলে ছবি আঁকতাম সারাদিন ধরে কত রং তুলি
কত আঁক কষা—যোগ ও বিয়োগ—কত গুণ ভাগ—সরল জটিল
আঁকতে আঁকতে দিন শেষ হয়, কত-না দুপুর সন্ধ্যা-রাত্রি!
মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগলেই হারিয়ে যেতাম, হঠাৎ হঠাৎ
মুক্তি, মুক্তি, অপার মুক্তি, এত-বা মুক্তি কোত্থেকে আসে!



আমি দেখতাম বনের কিনারে কত লোকজন ভাবুক রসিক
কত দূর দূর দেশ থেকে তারা ঘুরতে এসেছে
পাতাপুতো ছেঁড়ে ফুলকুঁড়ি শোঁকে চাঁদ খুঁটে খায়
আমি দেখতাম অন্ধকারেও কারও কারও চোখ হিংস্র কঠিন
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে রক্ত লিখছে বনের ভিতর!
আমার হয়নি গান হয়ে ওঠা, আমি দেখতাম বিস্ময় চোখে



একটি বা দুটি তিনটি চারটি কয়েকটি লোক
তির্যক চোখে আমাকে দেখছে, লেহন করছে, যখন তখন
হেসে লুটোপুটি, কী সব ইশারা, গড়িয়ে পড়ছে!

ইটভাটা থেকে আমি দেখতাম দূরের প্রদীপ শান্ত মধুর
টিমটিম করে জ্বলছে এখনও ঠাকুরের ঘরে
মায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন মুখে কথা বলছেন
হাসছেন আর গাইছেন দিব্যনয়নে কথা বলছেন
আমি দেখতাম ছোট ছোট বাড়ি, খড়ের ছাউনি, জলের বাতাস
তরঙ্গহীন ছোট্ট নদীটি শত তারকার ঝিকিমিকি নিয়ে
কোথায় যাচ্ছে, হেলতে দুলতে, কোন্ ঠিকানায়!
চাঁদে ভরে ওঠা মাটির দাওয়ায় কারা যেন গান রচনা করছে
শুনশান ফাঁকা শিবমন্দির, চাঁপাগাছটিতে অজস্র ফুল!

আমি দেখতাম লগি ঠেলে ঠেলে নৌকো চালায় নীলমণি মাঝি
কারা যেন সব শেয়াল শকুন নৌকোর খোলে ওত পেতে আছে
বিড়ির আগুনে হয়তো কখনও অর্ধেক চোখ মুখ দেখা যায়
আমি শুনতাম কাদের কান্না, বুক চাপড়ানি, কারা হিস্ হিস্
ঝড়ের রাত্রে ইটভাটা জুড়ে কাদের এমন দাপট ঝাপট—
সাপের ছোবল খেতে খেতে যেন বালিকাশরীর রমণী হচ্ছে!

আমি দেখতাম পাখি উড়ে যায়, পাখি উড়ে আসে, উড়তে উড়তে
ইটভাটা থেকে অন্ধকারের দানা খুঁটে খায়, ডাল জুড়ে বসে,
আমি দেখতাম সব পাখি আর পক্ষিণী হাসছে খেলছে
নাচছে গাইছে মন প্রাণ দিয়ে চির আনন্দে লুটিয়ে পড়ছে—
আমি কোনোদিন দিগন্ত ছেড়ে আসতে পারিনি মায়াসন্ধ্যায়
ধিকিধিকি এই আগুনের নীচে অকূল পাথারে বসতে পারিনি...

সেদিন আকাশে ঘন মেঘ ছিল, মেঘ ছিঁড়েখুঁড়ে বিদ্যুৎরেখা,
চারপাশ জুড়ে ঘুরঘুটি কালো, ভূতের মতন গিলে খেতে আসে,
এমন নিঝুম, এমন নিশুতি বাপের জন্মে কখনও দেখিনি।
হঠাৎ আমাকে এত রাত্রিতে এই ঘুমঘোরে কারা শুঁকে গেল,
কারা যে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল ঘন জঙ্গলে
ছিঁড়েখুঁড়ে খেল ইচ্ছেমতন, রক্তে আমার মাটি ভিজে গেল!
হঠাৎ ধরণী চোখের সামনে দ্বিধা হল আর গুমরে উঠল!
বাঁচবার আগে আমি দেখলাম তিল তিল করে আমার মরণ!
পূর্ণ চাঁদের আলোয় নিজেকে আর কোনোদিন দেখতে পাব না!

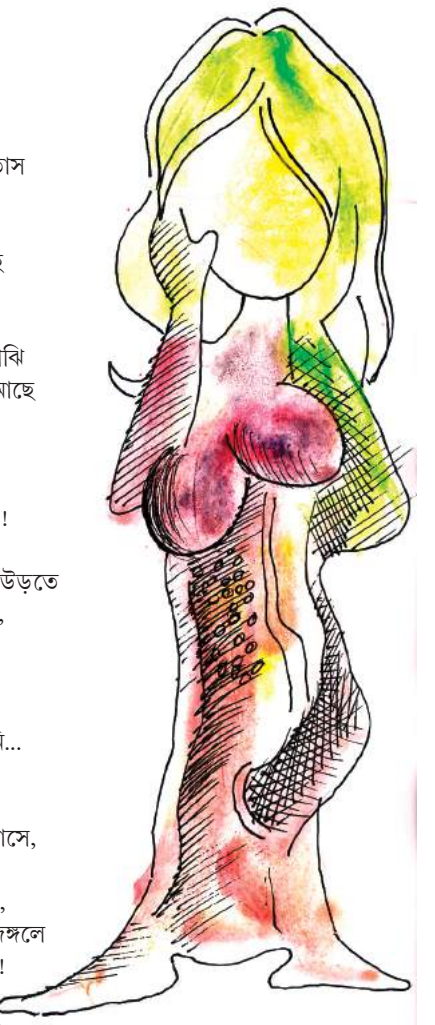

দিন কেটে গেল, সপ্তাহ মাস, একটি একটি বছর ফুরাল
দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল পুরো এক যুগ—
দেখলাম চোখে অশ্রু জমাট, বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদছে!

সব অপমান গ্লানি লাঞ্ছনা ঠেলেঠুলে ফের উঠে দাঁড়িয়েছি
শক্ত মাটিতে কঠিন দু'পায়ে আগুনের শিখা উঠে দাঁড়িয়েছি
মরতে মরতে আমি যে মরিনি, জন্ম নিলাম— আবার জন্ম
সব মৃত্যুকে দু'হাতে সরিয়ে বেঁচে উঠলাম! নতুন জন্ম!

নাম

জয় গোস্বামী

তোমার নাম শুভ্রা নয়। ভুল নাম বল কেন?
তোমাদের গ্রামে ছোট স্টেশনের ধারে
যে কাশবন... তার নাম শুভ্রা।
তোমার দিদির নামও শুক্লা নয়।
সন্ধেবেলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর,
নিজের চারপাশে হালকা শোভা নিয়ে
যে চাঁদ ওঠে— তার নামই শুক্লা।
তোমার ভাইয়ের নাম উৎসব কে বলেছে? ওটাও ভুল।
ঝকঝকে নীলের মধ্যে গ্রামের মাথায়
যে স্তূপমেঘ ভাসছে— ওরই নাম উৎসব।
তোমাদের মায়ের নাম বলতে হবে না। আমি জানি।
দু-দুখানা শিউলি গাছ, যারা রোজ সকালবেলা
শাদা করে রাখে তোমাদের নিকনো উঠোন—
তার নামই তো আনন্দময়ী!

শরৎকাল এলেই তোমাদের নামগুলো
তোমাদের ছেড়ে এদিক ওদিক পালিয়ে যায়—
এ ব্যাপারে কিন্তু আমার কিছু করার নেই।

দিনকাল

বুবুন চট্টোপাধ্যায়

কোথায় যাচ্ছো দিনকাল?
এমন অবেলায়, একা একা!
দুটো মুখেও দিলে না!

আর একটু বসো!
আরও একটু আমার কাছে থাকো।
আমাকে লিখতে দাও।
দু-একটি দুব্বোঘাসের কথা।

আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে,
সকালের চায়ের কাপ ঘিরে পিঁপড়ে।
সেই ছেলেবেলার মতো
এমন শুকনো দিনে
পিঁপড়েদেরই একমাত্র স্মৃতিজীবী মনে হয়।

ফুটপাত জুড়ে সন্ধ্যার উনুন,
ভাত ফুটছে,
পাঁচটি হা-করা মুখ কান খাড়া করে শুনছে
ভাত ফোটার শব্দ।

দিনকাল, কোনদিকে?
দেখো, চারদিকে হাওয়া গরম
যদিও ঠাকুর বলেছে,
'আচ্ছে দিন' আসার আগে এমনই নিয়ম।

সার্থকতা

অমিতাভ চক্রবর্তী

সব কিছু ভুলে ক্রমশ শামুক
হাত পা, পেট বুক এবং মগজ
অভ্যাসের শক্ত খোলসে।
অন্ধের লাঠির মতো দ্বিধাগ্রস্ত
পরখকারি শব্দ আসে
ঋতুচক্র টের পাই
কদাচিৎ শরীর বাড়াই।
বজ্রপাতে ভয়, ভয় উল্কায়,
যেখানে দাবানল জ্বলে
যেখানে তুষার পতন হয়
তার থেকে দূরে দূরে রেখেছি হৃদয়।

একদিনে নয়
দীর্ঘ অধ্যবসায়
আজ আমি সফল, সার্থক।

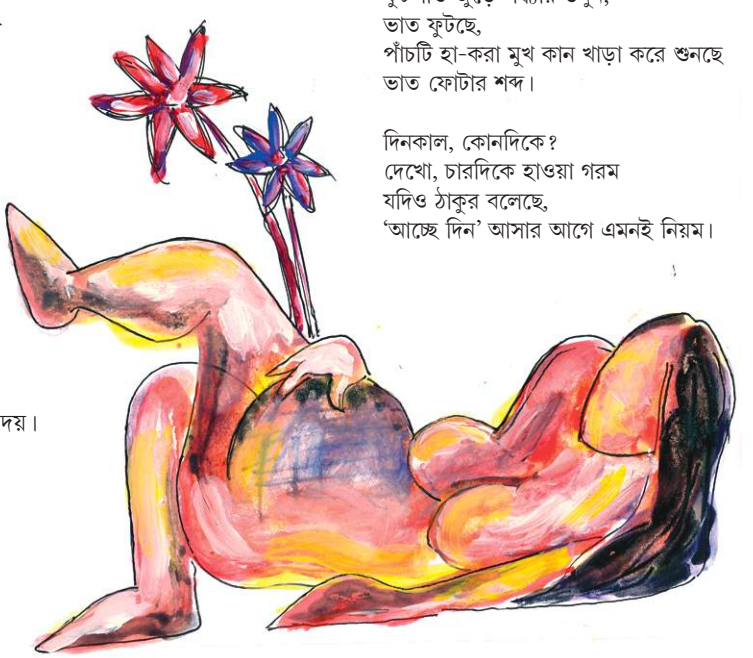

ধুলোস্নান

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ঘুমন্ত চোখ দেখেনি যে সূর্যালোক
তাকে যদি মেখে নাও গায়ে
ভীষণ কৃতজ্ঞ থাকি অন্য ডাকনামে ডাকি
সাড়া দিও পারো যে উপায়ে

নাও দিতে পারো যদি মুহূর্তকে নিরবধি
ভিতরে টানবে মহাকাল
আকাশে যেমন ঘুড়ি মশলায় যেমন মুড়ি
শরীরের যেমন কঙ্কাল

থেমে গেলে পরে কথা থেকে যায় প্রবণতা
সাপ এসে জড়ায় চন্দনে
এমনকী বধ্যভূমি চেয়েছিল ঝুমঝুমি
বাজুক কারণে-অকারণে

চিহ্নিত করুক ক্ষত কে আমার মনোমতো
কে আমাকে গেলে, ওগরায়
মৎস্যকুমারীর নাচ, গঙ্গাপাড়ে বটগাছ
খুঁজে ফেরে আকণ্ঠ তৃষ্ণায়

পার্থিব যে কোনও পথে বেঁচে আছি ভিন্নমতে
কোনও কিছু খুঁজি না সংসারে
জানি যে সমস্ত ধ্বনি তোমারই তো আগমনী
ক্রুশবিদ্ধ করেছে সেতারে

শুনব না কোনও যুক্তি রক্ত থেকে দাও মুক্তি
রং দাও গাছের পাতায়
হাজারও আতর দেশে তবুও তো মন শেষে
তোমার ঘামের গন্ধ চায়

সরিয়েছি কত পর্দা চিবিয়েছি কত জর্দা
তোমার মুখের মতো পান
কোথাও দেখিনি তাও আমার সোনার গাঁও
আমাকে করাল ধুলোস্নান

ধুলো-বালি-স্বপ্ন-তাপ ফুলের ভিতরে সাপ
আমাকে তোমার কাছে টানে
দুপুরে গলন্ত পিচে রাত্রিতে ত্বকের নিচে
ভবিষ্যৎ জ্বলন্ত এখানে



আকাশে ডুবেছে চাঁদ সমুদ্রে মরণফাঁদ
যদি একটু ভয় পেয়ে যাই
বেঁধে রেখো আষ্টেপৃষ্ঠে যাই লেখা থাক অদৃষ্টে
একসঙ্গে পার হওয়া চাই

পার যদি না হলাম তবুও তো থাকলাম
দেখলাম, রাস্তায়, ধানক্ষেতে
জোছনা করেনি আড়ি এসেছে আমার বাড়ি
গলি দিয়ে চলে যেতে যেতে।

তুমি, আমি ও ঈশ্বর

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

তোমার আমার প্রেম
ঈশ্বরও বোঝেন না

ঈশ্বর থাকেন জলে
শক্তি লিখেছিলেন

বিমুগ্ধ অনুভবে
আমার বিশ্বাস—

তিনি থাকেন
তোমার বুকে—

...তোমার ঝিনুকে...



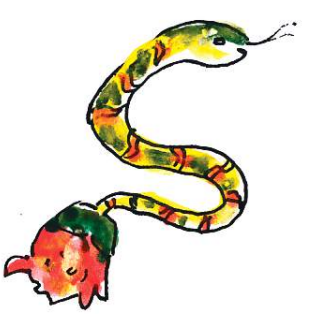

সুখ

মৌমিতা ঘোষ

পুরোটা চাইনি আমি।
খুদকুঁড়ো কুড়িয়ে
চলে যাব নিদারুণ সুখে;
হৃদয়ে তৃপ্তির গন্ধ,
চোখে মুখে ভরসার
নিবিড় আরাম ছাঁট...

পুরোটা চাইনি কখনো
স্বপ্নের বারান্দায়
দুলে ওঠে চাঁদ...

শাওন নন্দী

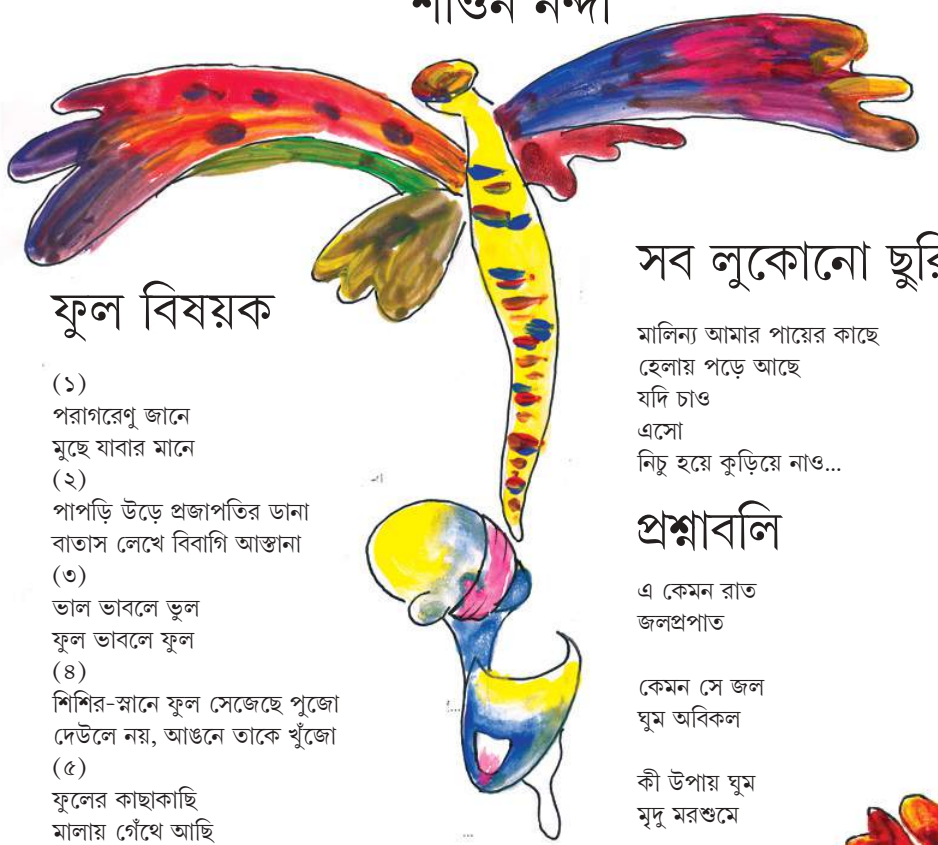

ফুল বিষয়ক

(১)
পরাগরেণু জানে
মুছে যাবার মানে
(২)
পাপড়ি উড়ে প্রজাপতির ডানা
বাতাস লেখে বিবাগি আস্তানা
(৩)
ভাল ভাবলে ভুল
ফুল ভাবলে ফুল
(৪)
শিশির-স্নানে ফুল সেজেছে পুজো
দেউলে নয়, আঙনে তাকে খুঁজো
(৫)
ফুলের কাছাকাছি
মালায় গেঁথে আছি

যত্তসব !

(১)
সহজ মানুষকে নিয়ে কিছু লিখতে চাইছি
অথচ শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না!!
(২)
সভ্যতার পাশাপাশি পৃথিবীতে বেড়েছে দূষণ...
তবু তারা সমার্থক নয়
(৩)
মুখোখ মুখর হলে মুখকে নীরব হতে হয়...
নীরবতা বুকের বাতাস!
(৪)
বুঝেছো হে চারিপাশ... ধর্মের গাছে নাড়া বাঁধা...
নরম শিকড়ে লেখা ঝড়!
(৫)
চমৎকার বলেছো হে, করতালি দিয়েছি আরও ভালো।...
বন্ধুরাও বিমুগ্ধ মাইক্রোফোনে!

সব লুকোনো ছুরিকে

মালিন্য আমার পায়ের কাছে
হেলায় পড়ে আছে
যদি চাও
এসো
নিচু হয়ে কুড়িয়ে নাও...

প্রশ্নাবলি

এ কেমন রাত
জলপ্রপাত

কেমন সে জল
ঘুম অবিকল

কী উপায় ঘুম
মৃদু মরশুমে

মৃদু সে কেমন
আভাস যেমন

কিসের আভাস
দীর্ঘনিশ্বাস

দীর্ঘ কিসের
ধানের শীষের

কীরকম ধান
যেমন আজান

আজান কাদের
এই আমাদের



বর্ষা সংগীত

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

শুরু হয়েছে তানসেনী ধ্রুপদী সংগীত

আকাশের আঙিনায়
মেঘেরা ধরেছে গান
মেঘমল্লার রাগ

বৃষ্টির আলাপে ঝোরে পড়ছে
সব রৌদ্রদগ্ধ জ্বালা যন্ত্রণা

অঝোরে।
বর্ষাকাল ...

অন্তিম অঙ্গীকার

... আরও একবার

পৃথিবীর অন্তিম দিনের অন্তিম মুহূর্তে
রাত্রির জরায়ুতে
প্রতিস্থাপিত করে যাবো
আমরাই
আমাদের উত্তরকাল
আমাদের জন্য...

কস্তুরী সুবাসে আচ্ছন্ন হোক
আমাদের চেতনা...আমাদের সততা...

যত্ন

সৌরভ চন্দ্র

কাঁচের অন্তরালে কখনও ভাঙা মুখ খুঁজো না
খুঁজো না ছাই হয়ে যাওয়া সুখ।
সবকিছু চুকে-বুকে গেলে তাকে দূরে ফেলে দিও
বকে দিও খুব।

বাতাস তীব্রতা নিয়ে জানান দিচ্ছে শীত
ঋতুমতি নারীর সাথে খেলো কিতকিত।

রাতের খবর

অমিতাভ রায়

রাতের খবর জড়িয়ে গেছে পায়
আজ ভেঙেছে ঘুম বড্ড অবেলায়
জলের ধারায় আকাশ ফুটো হয়ে
কাঁদছে অলর বালিকা বিদ্যালয়ে

আকাশের বুকে প্লেনের লাগে না চাকা
মুখর সততা চিরদিন থাকে ঢাকা

মাঝে মাঝে এসে গানের আসরে বসে
রূপকথা থেকে রূপটা যদিবা খসে
বাকিটুকু থাকে বিজ্ঞাপনের আশায়
মদে ডুবে থাকা আমার বাংলা ভাষার।

মাটির দেশে

তুহিন সরকার

মাটির দেশে জন্ম আমার
থাকি মাটির দেশে,
মরতে পারি আমি যেন
মাটিকে ভালোবেসে।

মাটির জন্য জীবন-মরণ
মাটির জন্য বাঁচা,
মাটির জন্য রেখেছি আমি
জীবনের জয় মালা।

মাটির জন্য যুদ্ধে কত
মরেছে শত শত,
তবুও তারা হাল ছাড়েনি
মাটির জন্য লড়ো।

মাটির দেশে জন্ম আমার
মরি মাটির দেশে,
এই মাটিকে ভালোবেসে
চলব জীবন ভোরে।



উড়ালপুল

কৌষিকী দাশগুপ্ত

মাটিতে ঝুঁকে আছে ধনুক শিরঁদাড়া
জুতোর ফিতে বাঁধে উড়ালপুল
কোথায় গেল মাঝি নৌকো দড়ি ছিঁড়ে
ফুটপাতের গায়ে হাজার ভুল।

ভাঙা কলস ভাসে দু'দিন বৃষ্টিতে
মাটিতে পোঁতা আছে স্বর্ণ যুগ
খুঁড়ছি পচা হাড়, আদিম জড়িবুটি
ল্যাপটপের গুঁড়ো অহঙ্কার।

যেমন জোড়া দাও বিবাহ বিচ্ছেদ
যেমন চিনে নাও কার কী রং
তেমন করে ধরা পড়ে না অজগর
হরিণ ছেড়ে যারা মানুষখোর।

ভিখিরি মৈথুন বিষ্ঠা এলোমেলো
পয়লা মের নিচে অন্ধকার
ম্যানহোলের মুখ উল্টে গেলে ঠিক
ভিতরে শোনা যায় কবিতাপাঠ।

তোমার লেখা পড়ি আমার লেখা ছেড়ে
যুদ্ধ শেষ হলে দিই মাশুল
জুতোর ফিতে বাঁধে ধনুক শিরদাঁড়া
মুচকি হাসে মাটি, উড়ালপুল।



মাটির টানে

সুব্রত চক্রবর্তী

ওরা এসেছিল ফুলের গন্ধ নিয়ে,
ওরা এসেছিল এক বুক স্বপ্ন নিয়ে,
ওরা এসেছিল কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে বলে,
ওরা এসেছিল মরুভূমিকে সবুজে সাজাবে,
ওরা এসেছিল মানুষ গড়বে বলে,
ওরা এসেছিল সংসার সাজাবে বলে,
কিন্তু হায়! ঘাত-প্রতিঘাতে কালো ঝড় বয়ে যায়
নিরাশার বুকে সূর্য ওঠেনি,
নন ধারায় ছবিও ফোটেনি,
ওরা চলে গেল, চলে গেল, বন্দেমাতরম বলে,
বাকি যারা রইলো পড়ে,
যায় ডেকে যায়, ওরে তোরা আয়,
আমরাও পারি, মা মাটিকে
স্বপ্নের রঙে রাঙায়।



গরমিলের খেলা

সমর পাল

এখন খেলা দেখতে মাঠে
ভয় করে খুব যেতে,
কখন কোথায় বেটিং হবে
গড়াপেটায় মেতে!

খেলার শেষে ঢাকতে হবে
রুমালে চোখ-মুখ,
খেলায় এখন নেইকো তেমন
হৃদয় ভরা সুখ!

দেখবো কী আর ভাল খেলা
ভেতরে গরমিল,
কালো টাকার গরম লেগে
ঝলসে যাবে দিল!

চিরকুট

সুস্মেলী দত্ত

আদিম ইশারা শরীরে
রোদ রোদ চোখদুটো
ইস্পাত কঠিন
চালাক চালাক
হ্যাঁ তুমিই পারো

বা পারো না
এমন অনেক কিছুই
নগ্নতাটুকু উপেক্ষা করে চওড়া
ইত্যাদি প্রভৃতি

ঠিক তখনই
তৃতীয় আমিগুলি
মাথা চাড়া দিয়ে উঠল
এমন তো কথা ছিল না।

বাস্তবে যা ঘটল
তাই নিয়ে খাদের কিনারায় এখন
আগামী জন্মে সব ভুলগুলো শুধরে নেব
এই ভেবে
হননের প্রস্তুতি

প্রেমিক,
মিথ্যে বলেছি
মৃত্যু নয় এখন বেঁচে থাকার রসদ খুঁজছি।

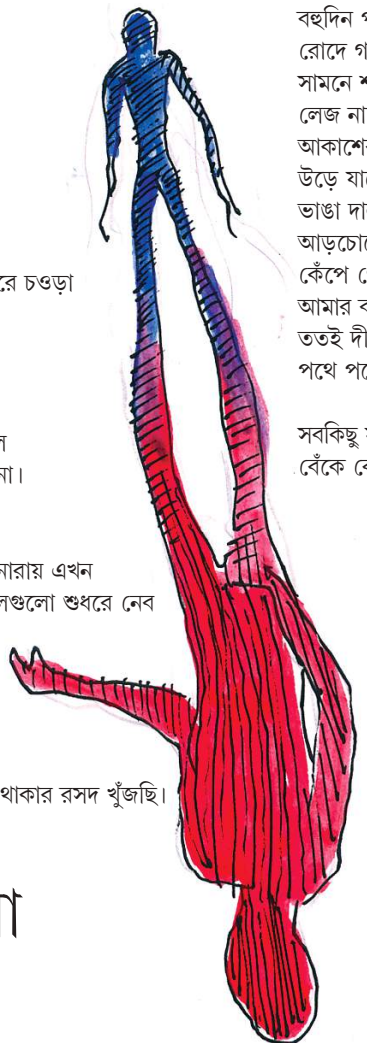

দু'টুকরো

অনীশ ঘোষ

বাউল হয়ে উড়তে চেয়েছি খোলা ডানায়
অনেকেই উপহাস্যে ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ
তবু যদি একদিন ঠিক স্টেশনে নেমে পড়তে পারি
অনাগত সুখের সঙ্গী হয়েছে পরাজিত সুখ।

তুমি আগুন জ্বালালে
আরও কেউ ইন্ধন জোগাবে
এই আশাতেই ঢেলে গেছ গরল জীবনে
আমি সেই গরল পান করে নীলকণ্ঠ
বাইরে ও ভিতরমনে।

ঘরবাড়ি

দেবব্রত দত্ত

বহুদিন পর আমি আমার বাড়ি ফিরছি। খুব রোদ।
রোদে গাছপালা মাটি সব পুড়ছে আর থিরথির কাঁপছে।
সামনে শজনে গাছে সবুজ রঙের একটা পাখি
লেজ নাচাচ্ছে। রোদ থেকে চোখ আড়াল করে
আকাশের দিকে তাকালাম। বালিহাঁসের একটা দল
উড়ে যাচ্ছে। রোদে ঝলকাচ্ছে ওদের কালচে ডানা।
ভাঙা দালানবাড়ির ভিটে থেকে একটা ঘুঘু
আড়চোখে কী যেন দেখে নিয়ে হুস করে উড়ে গেল,
কেঁপে গেল শেষবিকেলের আলো। আমি পাগলের মতো
আমার বাড়ি খুঁজতে লাগলাম। ছায়া যতই লম্বা হচ্ছে,
ততই দীর্ঘ হচ্ছ পথ। কোথায় খুঁজব আমি ঘরবাড়ি
পথে পথে এই ঘনঘোর অবেলায়! প্রতিটি কণায় কণায়...

সবকিছু সরে গিয়ে ভোর হবে, রোদ ফুটবে, লতা
বেঁকে বেঁকে উঠবে আমার জানালায়।

নিজেকে এলিয়েছ

নরেশচন্দ্র মজুমদার

বিষণ্ণতামিশ্রিত
বেদনার টুকরোয়

একবার চোখ পড়া
চোখের ছায়ায়

ফুটে ওঠা
মুহূর্ত
আজন্মের জন্য

অন্ধকারের দিকে
মিলিয়ে যাচ্ছে

তা বলতে না পারলেও
বুঝতে
অস্ফুট রইল না

অন্য হাওয়ায়
নিজেকে এলিয়েছ।

নব-জাগরণ

অশোককুমার রায়

'মাতঙ্গিনী হাজরা' কে আমি দেখিনি—শুনেছি
তাঁরই দৃপ্ত পদক্ষেপ তোমার চরণে,
কণ্ঠে তোমার রুদ্রবীণার সুর—'নবজাগরণ'
উন্নত শিরে দু'হাত বাড়িয়ে
ভেঙেছো যত বন্ধ দুয়ার
ঘৃণ্য চক্রান্তকে তুমি না করি কেয়ার।
উদিত সূর্যের রং-এ নব্য স্নাত হয়ে
জাগরিছ মুমূর্ষু যত বঙ্গসন্তানেরে।
আলোর দীপ্তি তাদের চোখে ঢেলে দিয়ে
শিখায়ছো—কেমনে চলিতে হয় কণ্টকিত পথ
উড়ায়েছো ফুৎকারে যত পরকীয়া মত।
সূর্যমুখী চরণ ছুঁয়ে শিরে আনে দ্যুতি,
হাতের গোলাপ বক্ষে প্রশান্তির তৃপ্তি।
জীবন তরীতে চড়ি উত্তাল নদী তুমি
করি পারাপার—
থামায়েছো ঝঞ্ঝা যত।
তোমায় নমস্কার।



মৃদু পাপ

সমরেশ মুখোপাধ্যায়

এইভাবে ভাবিনি যে ভুলে যাবে
ক্রমশ রাত্রি হবে
পথে ঘাটে ছোটানো সন্ত্রাস...
এইভাবে ভাবিনি যে তুলে নেবে
পুকুরে ছেড়েছ যত হাঁস...

গভীর পায়ের ছাপ পড়ে থাকে
বাগানের মৃদু আলোঘরে
স্নান সেরে চলে গেছ শুধু
তোমার স্পর্শ জল
ঝরে...

এমন শূন্য ঘোরে, আলগোছে
কাঁধে তার এস. এম. এস ভরা...
এখন ভুলেছ সবই, মৃদু পাপ
ফোনালাপ, রাতে চ্যাট করা!



মাধবীলতা

সুকমল ঘোষ

পাশের বাড়ির 'মাধবীলতা' গাছটা
মাসিমার মরদেহ চলে যাওয়ার পর
যেন একলা হয়ে কাঁদলো বহুক্ষণ।

আমার পড়ার টেবিলের ধারের
জানলার পর্দা সরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো
মাসিমার সঙ্গে মাঝে মাঝে
নানান গল্পে মাততাম।
সেই গল্পে অনিবার্যভাবে জুড়ে বসতো 'মাধবীলতা'।

তার সুগন্ধ চনমনে বেড়ে ওঠা
এই সব বলতে বলতে মাসিমার
বলিরেখা ছাওয়া মুখ থেকে
সারা বারান্দায় যুঁইফুল ছড়িয়ে পড়তো।

বৌদিও বেড়াতে গিয়ে আকাশের
তারা হয়ে গেছেন।

এখন কোনো কাক জ্যোৎস্নায়
গাছটার দিকে তাকালে
বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।



গল্প

দিলীপ দেব

গল্প বলি না আর
বলে অন্য লোক
যেভাবে ক্রমশ আঁধার।
গল্প বলি না আর
যারা গল্প বলে
ছায়ার মতন চেয়ারে চেয়ার
আর ধ্বস্ত নামাবলি
কথার কারবারি সব উল্টানো ফানুস।

অন্য চাঁদ

দেবারতি ভট্টাচার্য

পূর্ণিমা। উঠোনময় তারা-বৃষ্টি। মিহিন হাওয়ায়
মুঠো মুঠো মুগ্ধতা—
মুঠো দিয়েছিল খুলে মধ্যরাত
সেদিন সহসা।

সময়স্রোত। ক্রমশ ছোট ছোট বাঁক
লুপ্ত সরলরেখা, লুপ্ত সম্পর্কেরা
অন্যসময়। মাটিতে পড়ে থাকে এখন
হৃৎপিণ্ড তাজা রক্ত ঘিলু
বারুদবাতাস ওড়ায় পরাগ-বিস্ফোরক
দু'চোখে দূর দূর অব্দি কালো জলাভূমি; নেকড়ে চরে
শ্মশানঘাট; গোঙায় অর্ধচাঁদ।
ধরো যদি আজ নিঃস্ব এসে দু'হাত পাতে
কী দেবে, মুঠো খুলে তুমি তাকে?
মস্তিষ্কের কোষে কোষে
জমতে থাকে সময়ের অবিরত ফাটল
গতিরুদ্ধ, যান্ত্রিক নদী—
পলিমাটি সম্বল।

দূরত্ব ঢেকে দেয়, আকাশ চেনা-মেঘ কুয়াশা,
পর্বতচূড়া। সেদিনও আকাশ এমনই হারিয়েছিল
খুঁজে দিতে চাঁদ, নিজেকে জ্বেলেছিল...

'ওরা সব কোথায় গেল?
ফুল পাখি বন্ধু আমার ছিল...'

ভালবাসায় আঁকা

উজ্জ্বলকুমার দাস

একটা কবিতা জুড়ে শুধু তোমার শরীর
একটা কবিতা জুড়ে তোমার রেশমী কালো চুল
একটা কবিতা জুড়ে সিক্ত কদম ফুলের গন্ধ।
একটা কবিতা জুড়ে তোমার কালো গভীর চোখ
একটা কবিতা জুড়ে শুধু ভালবাসা আঁকা—
একটা কবিতা জুড়ে জ্যোৎস্নার ভেজা আলো
একটা কবিতা জুড়ে তোমার পায়ের জলবিন্দু,
একটা কবিতা জুড়ে তোমার চিবুকের উষ্ণতা
একটা কবিতা জুড়ে উষ্ণতার নিবিড় সান্নিধ্য
একটা কবিতা জুড়ে শুধু একরাশ রঙিন স্বপ্ন।
একটা কবিতা জুড়ে মোহময়ী কালির আঁচড়
একটা কবিতা জুড়ে জ্বলছে প্রেমের জাদু লণ্ঠন।



অলৌকিক বদ্বীপ

অণিমা মিত্র

আজ রাতে
চাঁদ ডুবেছে অনন্ত সুতলে
সোনার প্রদীপ আনবে তুলে।

রাংতা বনের সোঁ সোঁ হাওয়ায়
জানু ভেঙে কান্না বারুণিদির
নিশিকান্তের কনসার্ট আশকারায়
মুদ্রাস্ফীতি

শীতলপাটি বিছিয়ে বিম্ববতী
ত্রিভঙ্গ মুরারী জলের চাতালে

পাশের ঘরে সরস্বতীবালার
আলাপ, আলাওয়া বিলাবল
কৌমার্যের বালাই নিয়ে।



ভাঙা রঙে লেগে আছে

সায়ন

ভাল নেই, শুধু নীল আকাশ
নীল নয় অনেকটা কার্বনিক রং
দেহ কেঁপে ওঠে
টু অ্যান্ড হাফ ডাইমেনশনে
সমুদ্রের গভীর নিচে জানলা

অত ভিতরে মানবতাকে চেপে রাখে সিস্টেম

অবলা সমগ্র

সৌম্যজিৎ আচার্য

যে হোটেলের লনে সূর্যাস্তের মেঘ জাতকের গল্প বলে
সে হোটেলের কিচেনের পাশে বাঁধা থাকে একপাল ভেড়া—
প্রেমিক ভেড়ার গলা কাটা হয়, প্রেমিকা ভেড়া দেখে
প্রেমিক ভেড়ার ছাল ছাড়ানো প্রেমিকা ভেড়া হাঁকে—

যে রেস্ট্রন্টের নেমপ্লেটে বড় হরফে 'রেস্টুরেন্ট' লেখা থাকে
সে রেস্ট্রন্টের ভাড়ার ঘরে পাতা খায় একদল ছাগল
মা ছাগলের গলা কাটা হয়, মেয়ে ছাগল চেঁচায়
মা ছাগলের দেহ রান্না হয়, বাবা ছাগল হাঁপায়

জ্যোতি বসু থাকলে বলতেন, এমন তো কতই হয়—
তা ঠিক, আমাদের বড় দেশ, বেশি ছেঁদো কথা

যে রোল কর্নারে প্রজাপতি উড়ে আসে, প্রেম হয়
সে রোল কর্নারের পেছনে জড়ো হয় একগুচ্ছ পালক—
ভাই মোরগের পালক ছুঁতে চায় দিদি মুরগির ডানা
ভাই মোরগের পালক ছুঁতে চায় দিদি মুরগির গলা

যে গ্রামের ধূসর প্রান্তরে উঁকি দেয় বাউলিয়া শীত
সে গ্রামের ঘুমের ভেতর একলা হাঁটে উট
যখন উটটা কাঁটাগাছ খায়, মরুভূমি তাকে ডাকে
যখন উটটা গণতন্ত্র খায়, মরুভূমি তাকে ডাকে

জ্যোতি বসু থাকলে বলতেন, উফ, এমন তো কতই হয়—
তা ঠিক, আমাদের বড় দেশ, বেশি ছেঁদো কথা

মেয়ে গরু লুধিয়ানা যায়, মা গরু দেখে
মেয়ে গরু লাঠি পেটা খায়, মা গরু হাঁকে—
সত্যি, এমন কত মানুষেরই হয়, যত ছেঁদো...

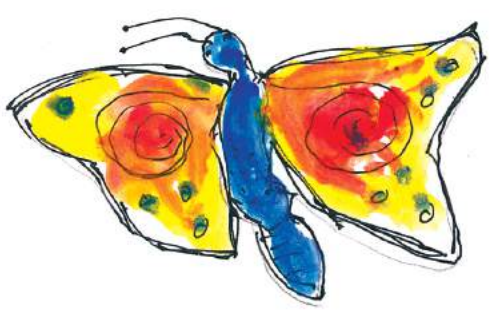



টাপুর-টুপুর

সুব্রতা ঘোষ রায়

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর...

পথে এল বান, পুরনো সেই দিনের কথা অতীত কোন গান,
অতীত ছবি অতীত দিনের, এমন বৃষ্টি-দিন,
ম্যাটিনি-শো টিকিট কাটা, — যাওয়ার আশা ক্ষীণ।
অপেক্ষাতে পথের বানে, ছাতায় পড়ে জল...
আসবে তুমি যেন করেই — এই তো ছিল বল।
আধঘণ্টা ছাতার নিচে বৃষ্টি টিপ্ টিপ্...
আসবে নাকি, আসবে কিনা? বক্ষ ঢিপ ঢিপ।
অবশেষে ২২১ বাসের দরজায়...
মিলল দেখা সেই ছেলেটির, বৃষ্টি যাকে চায়।
কলকাতাতে বৃষ্টি পড়ে, সিনেমা চলে হলে...
কমল হাসন অন্ধকারে দেশের কথা বলে—
ঘুষ নিও না, ঘুষ দিও না 'হিন্দুস্থানী' মুভি,
সিনেমা শেষে বাইরে এসে কলকাতার ছবি—
বৃষ্টি গেছে থেমে তখন,—আকাশ ধোয়া আলো...
যে যার পথে আবার ফেরা, দিনটা ছিল ভাল।
আজ তেমনি বৃষ্টি পড়ে, পথে নামে বান—
যে দিন গেছে, — চলেই গেছে? সবই অবসান?

অবসানের গল্প, তবু স্মৃতির পাতা খোলা—
পুরনো সেই দিনের কথা, কখনও যায় ভোলা?
আজও কেউ বা দাঁড়িয়ে থাকে, এমন বৃষ্টি দিনে...
তেমন করেই কেউ বা আসে পথটি চিনে চিনে...

একলা বসে বদ্ধ ঘরে, নেই রোদ, নেই আলো,
বাইরে তবু বৃষ্টি পড়ে, আজও দিনটি ভাল।
বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি যে যায়...টাপুর-টুপুর দিন...
মনের মাঝে বেজেই চলে হারানো কোন বীন...

স্মৃতি মেদুর

সুতপা দত্ত

তোমায় আমি দেখেছিলাম
অনেক অনেক বছর আগে
আবার এত বছর পরে,
তোমায় দেখার ইচ্ছে জাগে।

যখন তোমায় দেখেছিলাম,
আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা,
মেঘলা আকাশ প্রেক্ষাপটে
তুমি যেন ছবি আঁকা

সেই সময়ে আমি নবীন
তোমায় দেখে কেঁদেছিলাম,
বুকের মধ্যে উথাল পাথাল
তোমায় ভালবেসেছিলাম।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল,
দৃশ্য জগৎ ঢেকে দিয়ে
চোখে জলেও বৃষ্টি ধারা
উঠলে তুমি কূল ছাপিয়ে।

কোপাই, আমায় ভাসিয়ে নিলে
তোমায় সঁপে আত্মহারা
আজকে অবাক! ভাবি বসে,
কাটল জীবন? তোমায় ছাড়া!



তোমার আমার দুগ্গাপুজো

শুভাঙ্কুর ভৌমিক

যাচ্ছে সবাই, যাচ্ছি আমি
যাচ্ছে আমার সব আঁতলামি
যাচ্ছি কোথায় জান কি কেউ?
জানবে কি, হঁশে আছে নাকি কেউ!
দুগ্গাপুজার বাদ্দি বাজে
ফুঁয়ে শাঁখে, উলু পড়ে
কচি কচি মুখ উঠোন 'পরে
প্রসাদ খেয়ে মাথা নাড়ে।
অষ্টমীতে প্রথম দেখা
হালকা হাসি, এমন কারা।
পাগল হয়ে ধুনুচি নাচে
হালকা চাওয়া, আলতো করে
নবমীতে হল বেলা
প্রেমের ঘুড়ি তুঙ্গে তোলা।
এবার মাগো বিদায় বেলা
খুব কেঁদেছি দুপুর থেকে
বললে মাগো ধরা থেকে
বাড়ি তোমার তেপান্তরে
আসবে আবার বছর পরে।



অথচ এখনও রয়েছে

দীপঙ্কর ঘোষ

বড় ক্লান্ত করে এই অর্থহীন পথচলা
দিবারাত্রি হিসাবনিকাশ, শুধু রেষারেষি,
অর্থলোভ, মুখোশ এঁটে সুপ্রভাত বলা—
রাত্রে নেশার ঘোরে অনুতাপ বড় বেশি।
দিন শুরু হলে, আবার শুরু পুরনো খেউড়
কৃষ্টির অভাবে জীবন কেমন ক্লান্তিকর।

অথচ এখনও রয়েছে ভোরের জলপ্রপাত
শিশির ধোয়া ঘাসে সোনাগলা রোদ্দুর—
ঝাউবনে সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
বালুচরে বেলা কদ্দূর?
জীবনের যতখানি গিয়েছে ফাঁকি
পূতিগন্ধময় ক্লেদ অন্তরালে রেখে,
দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে একাকী
মেঘের কোলে আলোর রশ্মিটুকু রেখে।

সৃষ্টির শুরু থেকে যতদিন
ব্যর্থ কাজে নষ্ট হয়েছে সময়,
স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে প্রতিদিন
আকাশের সব তারা গুনিবার, এই তো সময়।।



অলঙ্করণ : সুরজিৎ সিকদার

উপন্যাস

বাস-আবাস

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

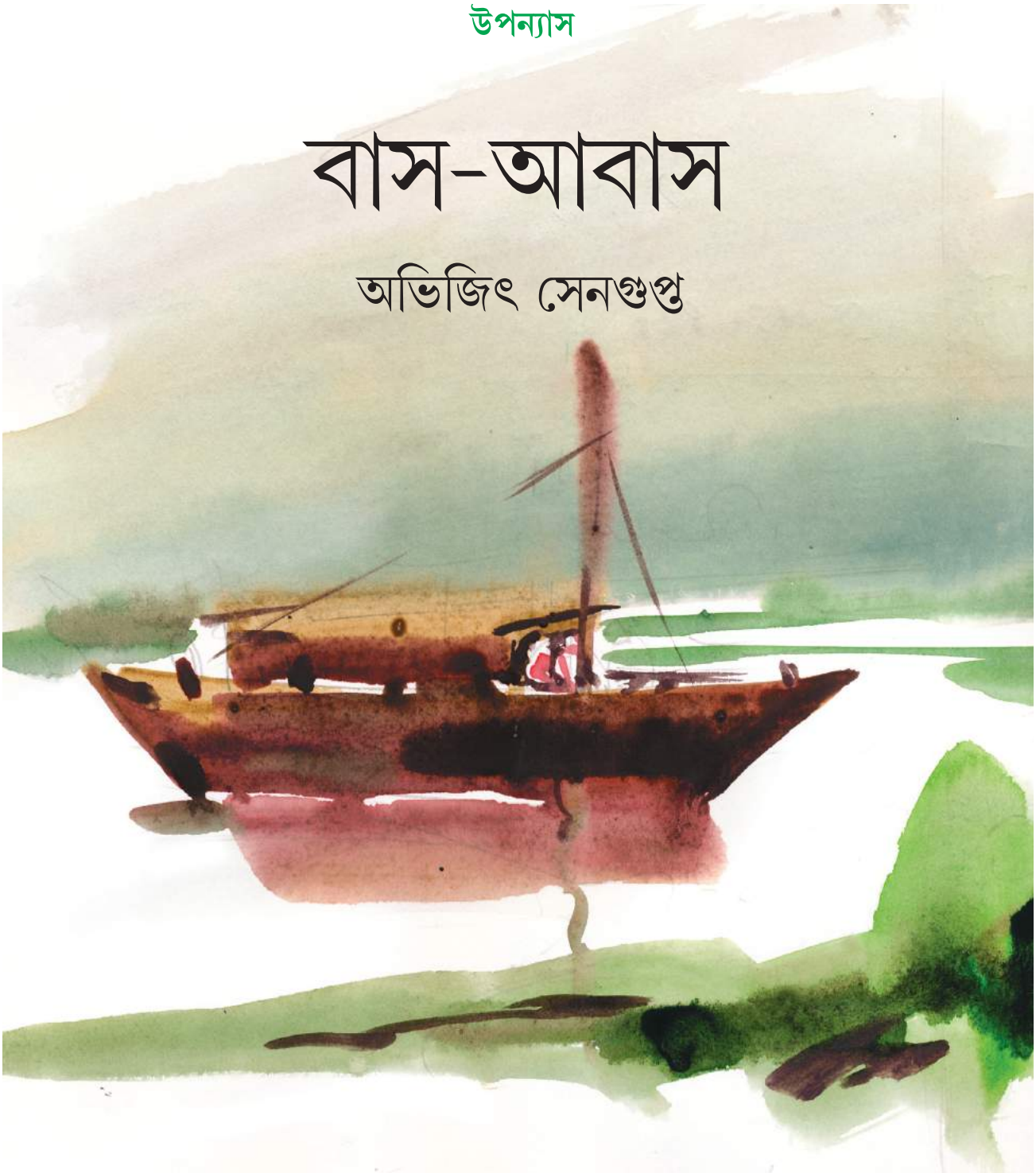

সত্যিই যে লেজওয়ালা ইঁদুরের মতো একটি জন্তুকে টেবিলের উপর শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই এত বিচিত্র সব বিস্ময়ের সৃষ্টি করা যায় তা মণীশ আগে জানতেনই না। কম্পিউটারটা অবশ্য মণীশের ঘরে থাকার কথা নয়। লীনা তা চায়নি, স্বভাবতই অর্কও নয়। কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় কোম্পানিই একরকম প্রায় বাধ্য করেছিল যাতে কম্পিউটারটা দিনের চব্বিশ ঘণ্টা হাতের কাছে রাখে অর্ক। লীনাও একটা কম্পিউটারের কথা বলছিল অনেকদিন থেকেই।

রিসার্চ ফেলো হিসাবে সে যা কাজ করে তাতে তারও নানা তথ্য, নানা ইনফর্মেশন হাতের কাছে মজুত রাখতে হয় সবসময়। স্মৃতিতে রাখতে হয় সেসব। কিন্তু এত অজস্র স্মৃতির ভাণ্ডার আর কে রক্ষা করতে পারে ওই নিতান্ত সাধারণ একটি টিভির মতো দেখতে ওই যন্ত্রটা ছাড়া? তাছাড়া ইন্টারনেট ঘেঁটে কোথায় কী তথ্য পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তাও তো হাতড়ে বেড়াতে হয় লীনাকে। ফলে কম্পিউটারটা কেনার জন্য সে-ই পীড়াপীড়ি করেছিল বেশি।

ফলে কম্পিউটারটা কিনে ফেলতে হয়। কিন্তু তারপর প্রশ্ন উঠেছিল রাখবে কোথায় যন্ত্রটা। একটু ফাঁকা স্পেস তো চাই যেখানে একটু হাওয়া বাতাস চলাচল করতে পারে। যাতে যন্ত্রটা বেশি গরম না হয়ে যায়। কলকাতায় তাদের বহুদিনের এই ভাড়াবাড়িতে স্পেসের বেশ খানিকটা অকুলান। দেশভাগ হবে, খুলনায় দেশের বাড়িতে বোধহয় কোনওদিনই আর ফিরে যাওয়া হবে না এই আশঙ্কায় কলকাতার কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পরই মরিয়া হয়ে ফুড ডিপার্টমেন্টে ছোটখাটো একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিলেন নিশানাথ। অল্পই মাইনে, ইনক্রিমেন্টও যৎসামান্য কিন্তু তার জন্য কোনও আফসোস ছিল না তার। দেশের জমিজমা, সাতপুরুষের ভিটে, প্রদীপজ্বলা তুলসীতলা, গা ছমছম করা গাছতলা, রহস্যময় এক বাস্তুসাপ— যাকে চোখে দেখা যায় না কখনওই অথচ যার অস্তিত্ব অদৃশ্য হাওয়া বাতাসের মতো সবাই মেনে নিয়েছে— এ সবই যখন ছেড়ে আসার কষ্ট স্বীকার করতে পারলেন তখন পরের বাড়িতে ভাড়া থাকা, হাত পা ছড়িয়ে নিজের স্বাধীনতা মতো একটু থাকতে না পারা— এ সব কথাই বা স্বীকার করে নিতে আর অসুবিধে কোথায়?

বস্তুত স্বীকার করে নিয়েওছিলেন নিশানাথ। মানুষের জীবনের নিয়ন্তা যে শেষ অবধি মানুষ নিজে না, এক অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুলমাত্র যে সে এরকম একটা বিভিন্ন উপলব্ধি বোধহয় মৃত্যু অবধি বুকে পুষে রেখেছিলেন নিশানাথ। জীবনের কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনও নতুন উদ্ভাবনাই আর কোনওদিনই উত্ত্যক্ত করেনি তাঁকে। আর কখনও কোনও কারণেই উদ্বেজিত হননি তিনি। সামান্য যে চাকরিতে যে-পদে ঢুকেছিলেন তিনি সারাজীবন প্রায় সেই পদেই রয়ে গেলেন। পদোন্নতির জন্য কখনও কোনও উপরওয়ালার কাছে আবদার বা দরবারও করেননি তিনি। আবদার কাদের কাছে চলে? একান্ত চেনাজানা নিজের মানুষের কাছে। নিশানাথ তো বেঁচে আছেন সম্পূর্ণ বিদেশি এক পৃথিবী, কিছু অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে। এখানে কার কাছে তিনি তাঁর কথা, আবদার জানাবেন? সারাজীবন একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে অফিসে এসে টেবিলে মুখ গুঁজে কাজ করে ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে গেছেন নিশানাথ। কারও কাছেই সারা চাকরিজীবনে একটিবারের জন্যও কোনও অভিযোগ কিংবা নালিশ দায়ের করেননি তিনি। এই বাধ্যতার পুরস্কারস্বরূপই বোধহয় ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মারা যাওয়ার কয়েকমাস আগে নিশানাথকে ডেকে তাঁর আশু প্রোমোশনের কথা জানিয়েছিলেন তাঁর অব্যবহিত উপরের বস— ফুড ইন্সপেক্টর। প্রতিশ্রুতি শুনেই গিয়েছিলেন শুধু নিশানাথ— তার ফল আর ভোগ করে যেতে পারেননি। এই বাড়ির পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ডের দরজা দিয়েই বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নিশানাথের মরদেহ। বন্ধ চোখের পাতার উপর রাখা তুলসীপাতা দুটো যেন চোখের রাজার মতো উপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

নিশানাথ যখন গত হন তখন মণীশের বয়স নেহাত কম নয়। সেও তখন সবে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে কিন্তু কী বিস্ময়কর চরিত্র মানুষের স্মৃতির - কী বিস্ময়কর রকমের ঐশ্বর্যশালী, কী ভয়াবহ রকমের দীন। কম কর দশ বছর আগে উত্তর কলকাতার এসব অঞ্চলে তখনও কিছু ঝোপঝাড় ছিল। মণীশদের বাড়ির ঠিক সামনেই একটা কাঁচা নর্দমায় এখনও কর্পোরেশনের হাত পড়েনি। নর্দমার পাশে ছোট্ট একটা খালের জমি। নর্দমার কালো পাঁকের সার পেয়েই বোধহয় ঘন করে জঙ্গল হয়েছে তার পাশে। লকলকে বিরাট সবুজ মসৃণ কচুপাতা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। সেই টলটলে সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকলে যেন চোখের আরাম হয়। হঠাৎ কোত্থেকে একটা লাল প্রজাপতি এসে একবার বসেছিল সেই সবুজের উপরে। প্রজাপতিটির গায়ে নীলচে কালোর অদ্ভুত ডিজাইন ছিল। দশ বছর আগের একটা সামান্য প্রজাপতির পাখার নক্‌শাটা এখনও যেন বেশ মনে আছে তাঁর কিন্তু নিজের জন্মদাতা পিতা বাইশ বছর যার সঙ্গে জীবন কাটল সেই নিশানাথের মুখাবয়ব আর মনে পড়ে না তাঁর। ঠিক কেমন ছিল নিশানাথের ঈষৎ বাঁকা চোখের চাউনি? একটু কি বিষণ্ণ জিজ্ঞাসাই শুধু লেগে থাকত তার চোখের কোনে নাকি তাতে মেশানো থাকত একটু কৌতুকেরও আভাস? কখনও কি প্রাণ খুলে অট্টহাসি হেসেছেন নিশানাথ? একজন মানুষ বাইশ বছরে কখনও গলা ছেড়ে হাসেনি এরকম তো হতে পারে না কিন্তু সত্যি তো নিশানাথের কোনও হাসির শব্দ মনে পড়ে না তার কিংবা তার কোনও হাস্যমুখ ছবিরও নয়। এই বিস্মৃতি মাঝে মাঝে এতটাই অসহ্য হয়েছে মণীশের যে মনে হয়েছে নিশানাথের মৃত্যুর পর প্রায় একরকম বিছানায় শুয়ে থাকা মনোরমাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে— মা, বাবা কীরকম হাসত আমাকে একটু বলে দেবে? আমি ভুলে গেছি। কিন্তু সত্যি তো এরকম কথা আর জিজ্ঞেস করা যায় না। গেলেও পরলোকগত স্বামীর জন্য মনোরমার মৃত্যুবেদনাকে তো তাতে আরও উসকেই

দেওয়া হবে। চোখের চাউনির চেয়ে একজন মানুষের বড় পরিচয় তো আর কিছু নেই। চোখের চাউনি পড়েই বুঝে নেওয়া যায় একজন মানুষের অন্তরাত্মাকে। নিশানাথের পরিচয়জ্ঞাপক সেই চাউনিটুকুও ভুলে যাওয়ায় বুকের মধ্যে হাহা করে কয়েকদিন মণীশের তারপর সময়ের নিয়মে কবে তাও ভুলে যান তিনি। চলমান জীবন যেমন ভুলিয়ে দেয় সবকিছু। জীবনের কোনও স্মৃতি থাকে না। স্মৃতি শুধু মৃত্যুর।

(২)

এই বাড়িতে সেই থেকেই রয়ে গেছেন তাঁরা। মৃত্যু জীবনকে যতই আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাক না কেন জীবনকে জীবনের নিয়মেই চলতে হয়। নিশানাথের অল্প মাইনের চাকরি, চাকরির মেয়াদও খুব বেশিদিনের নয়, পেনসন যৎসামান্য। ফলে দ্রুত চাকরি খুঁজে নিতে হয়েছিল মণীশকেও নিশানাথের মতোই। জীবনের প্রতি একটি দুর্মোচনীয় ঔদাসীন্যের ফলেই হোক কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাবের দরুনই হোক— মণীশের পড়াশোনার প্রতি খুব সতর্ক মনোযোগ কখনওই দিয়ে উঠতে পারেননি নিশানাথ। খুব বড় কেউকেটা একজন হতে হবে তাকে একমাত্র সন্তানের মনে এরকম কোনও উচ্চাশার বীজ পুঁতে দিতে সমর্থ হননি কখনও নিশানাথ। কিংবা হয়তো বা তা চাননিই। জলের মতো জীবন যেদিকে গড়িয়ে যায় সেভাবেই গড়িয়ে যাবে— এতে কার আর কী হাত থাকতে পারে। ফলে নিজে কী পড়াশোনা করবেন তা মণীশ নিজেই ঠিক করেছিলেন। স্কুল ফাইনাল পাস করার পর আইটিআইয়ের একটা জমিজমা জরিপ সংক্রান্ত ডিপ্লোমা পাস করেছিলেন তিনি নিশানাথের মৃত্যুর মোটে কয়েক মাস আগে। সেন্ট্রাল ফিশারিজের একটা সার্ভেয়ারের পোস্টে দরখাস্ত করে চাকরিটা মাস তিন-চারের পরে পেয়েও যান মণীশ। মাছের ভেড়ি বানানোর জন্য সুন্দরবনের কিছু জনমনুষ্যহীন জংলা দ্বীপ সার্ভে করতে হবে। নৌকোয় মাঝে মাঝেই গিয়ে থাকতে হবে সেখানে। এটাই তার মূল কাজ।

মনোরমা বিমর্ষ গলায় বলেছিলেন— এটা কী চাকরি নিলি রে তুই মনু? সারাজীবন সুন্দরবনের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবি আর আমি? আর চাকরি খুঁজে পেলি না তুই?

মনোরমার এই কণ্ঠস্বরে কি কিছুটা অনুযোগ ছিল? জীবনের কুহক স্রোতের হাতছানির টানে মনোরমাকে উপেক্ষা করার অনুযোগ?

মণীশ বলেছিলেন— চাকরি কি খুঁজলেই পাওয়া যায় মা? চাইলে তুমি আমার সঙ্গে নৌকোয় গিয়ে থাকতে পারো তো।

— হ্যাঁ, ওটাই এখন বাকি আছে। বাড়িঘরদোর ছেড়েছুড়ে এখন নৌকোয় তোদের মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে সুন্দরবনের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কী আক্কেল তোর।

— তাহলে আর কী করবে? এ চাকরি তো আর ছাড়া যাবে না। এ-পাড়ার তো সবাই চেনা তোমার। একলা থাকতে তো কোনও অসুবিধে নেই। আমি মাসের মধ্যে দু'-তিনবার এসে না হয় দেখে যাব তোমাকে। সুন্দরবন তো আর উত্তর মেরু নয় যে একবার গেলে আর আসতেই পারব না।

মনোরমা জেদ ধরেছিলেন— না, একা একা আমি এভাবে থাকত পারব না। একটা বিয়ে থা কর তুই। বউকে এখানে রেখে তুই যেখানে খুশি যা। আমি বউকে নিয়ে থাকব এখানে।

মণীশ মৃদু বলেন— বউ কেন থাকবে এভাবে?

মণীশের মুখের দিকে খানিকক্ষণ স্থির থাকিয়ে থেকে মনোরমা বলেন, বেশ, বউকে নিয়ে না হয় তুই মাঝে মাঝেই রাখিস তোর নৌকোয়— আমার সঙ্গে থাকতে যদি কষ্ট হয় তোর বউয়ের।

মণীশ নিজের মনে বিষণ্ণ একটু হাসেন। এসব মনোরমার যুক্তিহীন ক্ষোভ আর অভিমানের কথা। তাহলে আর মনোরমার নিঃসঙ্গতা ঘুচবে কীভাবে? নিশানাথ চলে যাওয়ার পরই বিশেষ করে এই ক্ষোভ আর অভিমান গ্রাস করে ফেলেছে মনোরমাকে। যেন পৃথিবীর সবার দ্বারা উপেক্ষিত অবহেলিত তিনি। নিজের সন্তানের দ্বারা তো স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি।

চাকরি পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যে বিয়ে অবশ্য করেই ফেলেছিলেন মণীশ মনোরমার কথা ভেবে ততটা নয় যতটা নিজের ভবিষ্যৎ অজানা জীবনের কথা ভেবে। সুন্দরবনের নদী জঙ্গল খাঁড়িতে নৌকোয় ভেসে ভেসে থাকা— কেমন হবে সে জীবন? একেবারেই একা একা থাকতে হবে তাকে, সেই বিজন বিভুঁই পৃথিবীতে? সারাদিন শুধু নৌকোর দাঁড়ি মাঝির মুখ দেখা? ভাবতে ভাবতেই মন যে হঠাৎ দূরে কোথাও উধাও হয়ে যায়নি এমন তো নয়। চোখের সামনে হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠা একেবারে অদেখা অজানা সেই রহস্যময় পৃথিবীর কোনও এক কাল্পনিক দৃশ্যের পাশাপাশি কি ভেসে ওঠেনি আর একটি অজানা, কোনও-দিনও-না-দেখা এক রহস্যময় মুখই যেন ওই নদীজলজঙ্গলের ভূদৃশ্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে সেই মুখ। যেন ওই প্রকৃতিরই কোনও মানবী সত্তা সে। বুকের ভিতরটা হঠাৎ তার কেমন একটা অভাবিত রোমাঞ্চে, হঠাৎ এক আশ্চর্য আশার ঝলকানিতে ঝলমল করে উঠবে না— বয়স তো তখনও তাকে ততটা কঠিন করে ফেলতে পারেনি। বলতে গেলে জীবন তো সবে তখন শুরু করতে যাচ্ছেন মণীশ।

অবশেষে বিয়ে করলেন মণীশ। সভ্যতার আদিমতায় মেশানো এক আশ্চর্য জীবনই শুরু করে দিলেন তারপর। কখনও কখনও টানা একমাসও থাকতে হয় নৌকোয় মণীশকে। অর্থাৎ পুরো দু'টি 'ভরা গোল' আর দু'টি 'মরা গোল'। এক মাস পর সেই নির্জনতা, সেই হাওয়ার নিশির ডাক, ভাটায় জলজঙ্গল থেকে নেমে যাওয়া জোয়ারের জলের কুলকুল শব্দ, অসীম নৈঃশব্দ্যে হঠাৎ মাঝে মাঝে জঙ্গলের মাথায় চক্কর মারা বামুনবাদশা পাখির ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক, গেঁয়ো গরানের জঙ্গলের উপর দিয়ে পরির আঁচলের মতো মেলে দেওয়া ফিনফিনে সাদা জ্যোৎস্না সব ছেড়ে যখন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে এসে ট্রাম থেকে নেমে দাঁড়ান মণীশ তখন চারপাশের জিরাফের মতো ঢ্যাঙা বাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে, আকাশে ট্রামের তারের ঝলকানি আর নিচে লাইনের উপর দিয়ে যাওয়া ট্রামের ঘটাং ঘটাং শব্দ শুনতে শুনতে চুপ করে ভাবেন মণীশ কোন পৃথিবীটা সত্যি? কাল রাতে যে পৃথিবীটা ছেড়ে চলে এসেছেন? না আজ যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছেন? জীবনটাকে যেন অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যার মাঝখানে একটা কুহকের মতো মনে হয়।

(৩)

বিয়ের পর পর ক্ষমা দু'একবার গিয়ে থেকেছে মণীশের নৌকোয়। মণীশের ভাসমান ঘরবাড়ি। কোথাও কোনও পাকাপাকি বন্ধন নেই, শুধু স্রোতের টানে ভেসে চলা। এড়াপের সামনের দিকের পাটাতন থেকে দু'তিন ধাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই ছোট্ট কেবিন। পাঁচশো মনী নৌকোর। দু'দিকে নিচু জানালা, জানালার পাশে কাঠের তক্তা পাতা নিচু খাট। খাটে

শুয়ে থাকলে জানালা দিয়ে পাশে দেখা যায় নদীর অনন্ত জলরাশি। লক্ষ শিশুর মতো খোলা জলের ঢেউ যেন খলবশ করে হাসছে চাপড় মারছে নৌকোর গায়ে। মাঝে মাঝে যখন হাওয়ার দিকে ঘুরে যায়— হাওয়ার বিপরীতে যাওয়ার জন্য নৌকোকে যখন 'গোণ' মেরে মেরে যেতে হয় তখন নৌকো কাত হয়ে পড়ে একদিকে। নদীর জল হঠাৎ উপছে উঠে চ্যাংড়া ছেলের মতো হাততালি দিয়ে হঠাৎ খানিকটা ঢুকে পড়ে কেবিনের মধ্যে। ক্ষমা শিশুর মতোই আর্তনাদ করে ওঠে ভয়ে— ডুবে গেল গো— গেল নৌকো। ভয়ে আপ্রাণ আঁকড়ে ধরে মণীশকে। নতুন বিয়ের বেনারসি শাড়ি আর প্রসাধনের গন্ধ যেন তখনও লেগে রয়েছে তার গায়ে। তখনও ক্ষমা প্রায় এক অপরিচিতা নারী তার কাছে অন্যান্য নারীদের মতোই। অতি পরিচয়ের জোরালো আলো পড়ে তখনও সমান সমতল হয়ে ওঠেনি আলোছায়ার সব মায়াবী রহস্যময় বন্ধুরতা। ক্ষমার শরীরের গন্ধ তখনও এক রহস্যময় দ্বীপের গন্ধ যেন — যে-দ্বীপ অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে এখনও অবধি। মণীশই যেন প্রথম এই অসীম নদীর ঘোলা নর্তনশীল জল, এই অনন্ত আকাশের নিচে সেই অনাবিষ্কৃত দ্বীপের প্রথম আবিষ্কারক। সেই দ্বীপের গিরিগুহার স্পর্শ তার সমস্ত শরীরে— আদিম লতাগুল্মের গন্ধ। সমস্ত শরীর নিশপিশ করে মণীশের। কিন্তু আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অভয় দেওয়ার গলায় বলে— ভয় নেই, আমাদের দু'জনের ভারে ডুববে না এই নৌকো। ক্ষমার এই শিশুর মতো ভয় দেখে জলে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মণ মাঝি হেসে বলে— ভয় নাই মা, ই পাঁচশো মনী নৌকা— ঝড়জলেও ডুববে নি।

ক্ষমা চমকে ওঠে। ওই বুড়ো মাঝিটা এতক্ষণ লুকিয়ে দেখছিল নাকি ওদের। ক্ষমা ছিটকে মণীশের কাছ থেকে সরে গিয়ে ফিসফিস করে বিরক্তির গলায় বলে— এ মা! লোকটা এতক্ষণ ধরে দেখছিল আমাদের। কী বিচ্ছিরি! এদের বিদায় করে দিয়ে আমরা দু'জনে শুধু থাকতে পারি না নৌকোয়? সবসময় ওরা তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে— ধুস্ ভাল লাগে না।

মণীশ হেসে নিচু গলায় বলেন— আস্তে, আস্তে। ওরা শুনতে পাবে। তুমি হাল ধরাটা শিখে নাও আর আমি পাল টাঙানোটা। তাহলেই আমরা দু'জনেই শুধু থাকতে পারব এই নৌকোয়। আর কারুর থাকার দরকার হবে না।

মণীশ রসিকতা করছে বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রায় সদ্যপরিচিত এই মানুষটি যাঁর সঙ্গে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন বাঁধা পড়তে চলেছে— তার দিকে তাকিয়ে কেমন মৃদু লাজুক গলায় বলে— ইস্ ঠাট্টা করছ না? হঠাৎ গলা কেমন যেন অতল খাদে নামিয়ে এনে বলে— এই নৌকোয় নয়, চলো না আমরা অন্য কোথাও গিয়ে থাকি। তুমি কি সারাজীবনই এই নৌকোয় থাকবে নাকি? এটা কীরকম জীবন?

এমন অতলান্ত গভীরতা এমন আতুরতা নিয়ে উঠে আসছিল কথাগুলি যে মণীশকে একেবারে চুপ করে যেতে হয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে বলেছিলেন মণীশ— মানুষের জীবনের কথা মানুষ কি নিজে বলতে পারে ক্ষমা! সে কি সবকিছু জানে, নাকি সবকিছু হাতে আছে তার।

ক্ষমা চুপ করে ছিল। মণীশ বলেছিলেন— কেন? তোমার এই নদী, এই আকাশ, এই সবুজ জঙ্গল ভাল লাগে না? ধরো না আমরা হনিমুনে বেড়াতে এসেছি।

ক্ষমা নিচু গলায় বলে— হনিমুন আর সমস্ত জীবনটা এক বুঝি? তোমরা পুরুষ মানুষেরা কিছু বোঝো না, না?

ক্ষমার গলায় যেন বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে— চলো, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে থাকি। নৌকোয় সারাজীবন শুধু ভেসে ভেসে বেড়াবে নাকি?

নৌকো চেনাগাং ধরে কাঁকড়ামারি চরের দিকে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। জোয়ারের জল বাড়ছে নদীতে। কাঁকড়ামারির চরা অনেকটা ডুবে গেছে জলে। গেঁয়ো গরান হেঁতালের সবুজ মাথা অবশ্য জেগে আছে জলের উপরে। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে সাদা ফ্যাকাশে জলের ধুধু বিস্তার। দূরে প্রায় চুলের মতো সরু সাগর দ্বীপের তটরেখা। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে মণীশের নিজের মনেও তেমন একটা নিরাশ্রয়তার অনুভব ঘনিয়ে ওঠে। হঠাৎ যেন মনে প্রশ্ন জাগে— কোথায় যাচ্ছে এ নৌকো? কোন অকূলের উদ্দেশে?

ক্ষমা চুপ করে বসে ছিল উদাসভাবে সেই অস্তসূর্যের আলো লাগা জলের দিকে তাকিয়ে। প্রায় সদ্য পরিচিত সেই নারীর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুকের মধ্যে যেমন করে উঠেছিল মণীশের।

সত্যি তো, কেন সে বিয়ে করেছে এই নারীকে? কোন্ আকাঙ্ক্ষিত জীবনের সন্ধান তিনি দিতে পারবেন ওকে? সত্যি কোথায় চলেছে তাদের নৌকো? জীবনের কোনও স্পষ্ট ছবি কি তার চোখের সামনেও আছে? অথচ ওই নারী তো শিশুর মতো সরল বিশ্বাসেই তার সমস্ত জীবনটা যেন ওরই হাতে তুলে দিয়েছে। যেন ও নিজেই সে পাঁচশো মনী নৌকো যে ওর জীবনের এই ভার অক্লেশে তুলে নিয়ে কোনও এক আশ্চর্য সুখী স্বচ্ছন্দ দেশে পৌঁছে দিতে পারবে ওকে যে দেশে আজ অবধি আর কেউ পৌঁছুতে পারেনি। সে দেশ আদৌ আছে কিনা কোথাও তা কি নিজেই জানেন তিনি।

নৌকোর মাস্তুলের কাছে স্থির বসে থাকা ওই নারীই কি সত্যি তাঁর সেই স্ত্রী?

নিজের জন্য কেমন একটা অপরাধবোধ— ওই নারীর জন্য কেমন একটা করুণার অনুভূতি যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে ওকে। আর ওই নারীর মুখে যেন একটু হাসি ফোটাবার জন্যই সামনে আঙুল তুলে বলেন মণীশ— দ্যাখো কলাবৌ, সামনে তাকিয়ে দ্যাখো- ওই যে জঙ্গল দেখছ না, কাঁকড়ামারির জঙ্গল— ওখানে বিরাট এক অজগর সাপ থাকে- গায়ে তার সবুজ আদিকাঁটা। এই জঙ্গলের পাহারাদার ও। রাতে ওর হিস্‌হিস শব্দ শোনা যায় অনেক দূর থেকে। কেউ নাকি কাঠ কাটতে যেতে পারে না ওই জঙ্গলে। কেননা ওই অজগর সাপের অনুমতি নেই। দ্যাখো তো, হিস্‌হিস শুনতে পাও কি না। এটা মণীশের একটা বানানো গল্প কি না বুঝবার জন্যই যেন ক্ষমা সরল শিশুর চোখে তাকায় তার স্বামীর দিকে।

—তুমি বানিয়ে বানিয়ে এরকম রূপকথার গল্প শোনাচ্ছ কেন আমাকে বলো তো? আমি কি কচি খুকি নাকি? তুমি এভাবে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও? স্ত্রীর প্রচ্ছন্ন উষ্মায় বিব্রত বোধ করেন মণীশ। বলেন— না, না, বানানো প্রশ্ন না। বিশ্বাস কর, এখানকার মানুষ সবাই তাই বিশ্বাস করে।

এখানে কী আছে কী নেই আমরা বাইরে থেকে তা জানবই বা কী করে? হালে স্থির পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মণ মাঝিকেই সাক্ষী মানেন মণীশ— লক্ষ্মণ, বলো তো তুমি, অজগর সাপ নেই ও-জঙ্গলে?

অস্পষ্ট লাজুক বৃদ্ধ মানুষ লক্ষ্মণ। মণীশ সাক্ষী মানায় তার মুখে যেন মৃদু লজ্জার অস্পষ্ট হাসি ফুটে ওঠে— কী জবাব দিতে যাবে তার আগেই এড়াপের কাছে বসে থাকা যুবক অচিন্ত্য দাঁড়ি বলে ওঠে— রয়িধে বাবু, বিরাট গটা অজগর রয়িধে ওঠি।



মণীশ কৌতূহলী সুরে জিজ্ঞেস করে, তুমি দেখেছ অচিন্ত্য?

—না, খুব আনধার তো বাবু, দেখি নাই কিন্তুক শব্দ শুনিচি— হিস্‌হিস নিশ্বাস নেওয়ার শব্দ। গাছের পাতায় বাতাস বাধলি যেরকম শব্দ হয় সেরকম।

ক্ষমা চুপ করে শোনে তারপর বলে, সব জায়গায় তো আর অজগর নেই। চলো, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে থাকি। থাকার জায়গা নেই কোথাও বুঝি এখানে?

তখন লজ্জায় মুখে কথা জোগায়নি লক্ষ্মণের এখন যেন সেই ভুল সংশোধন করে নেওয়ার জন্য বেশ একটু আগ বাড়িয়েই বলে ওঠে লক্ষ্মণ, এঠি রইবেন মা? কসতলায় বুলা সামন্তরা বকখালি খালের পাশে তাদের জমি বেচি দিতি পারে। বড় মাইয়াকে বিয়ি দিতি হবে। আপুনি বুলারে বলতি পারেন বাবু— আপুনি বললি বুলা না বলবে নি। আপনাকেই বেইচবে জমি।

লক্ষ্মণের দিকে চাপা বিরক্তির চোখে তাকায় ক্ষমা তারপর চাপা বিরক্তিতে বলে— ওঃ! লোকটা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সব কথা শুনছে— নাকি? নিজেদের মধ্যে কথা বলার মতো একটু আড়াল আবডাল সেটুকুও তো নেই এখানে। কী বিচ্ছিরি! তুমি তাহলে থেকে যাও এখানে-তোমার এই হাওয়া-নদী, এই অজগরের হিস্‌হিস এইসব নিয়ে। আমাকে কাল তুমি কাকদ্বীপ পৌঁছিয়ে দাও। ওখান থেকে কাল আমি কলকাতা চলে যাব।

ক্ষমার ক্ষুব্ধ ক্ষমাহীন আচরণে মনটা হঠাৎ কেমন বিরস হয়ে যায় মণীশের। ক্ষমার মনের অবস্থাটা মণীশ যে বুঝতে পারেন না এমন নয়। বিয়েতে কয়েকদিনের ছুটি নিতে পেরেছিলেন মণীশ। সপ্তসখী নদীর ডায়া দ্বীপটির অন্তত প্রাথমিক সার্ভে করে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে চটজলদি। পার্লামেন্টে বাজেট সেশনের আগে মিনিস্ট্রি চাইছে। মণীশ ছাড়া আর কে করবে সেই কাজ! তাই দ্বিরাগমনের দু'দিন পরই রওয়ানা দিতে হয়েছিল মণীশকে কলকাতার বাস-ট্রামের আওয়াজ, মিটিং মিছিলের চিৎকার, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের রেলিংয়ে ঝুলিয়ে রাখা রজনীগন্ধা জুঁইফুলের মালার মিষ্টি গন্ধ, গয়নার দোকানের আলোয় ঝলমল সুন্দরী মহিলাদের শাড়ির খস্‌খস শব্দ, পিছনে ফেলে রেখে আবার সেই নির্জন আকাশ, নির্জন নদীর চর, ভাটা, পাখির ডাক, ভাটার জল নেমে যাওয়ার কলকল শব্দের দিকে।

মনোরমা বলেছিলেন ক্ষমাকে— তুমিও যাও বউমা, ওর সঙ্গে থেকে এসো কয়েকদিন। দিন পনেরো পর ও আবার না হয় তোমাকে দিয়ে যাবে এখানে।

একেবারে সদ্য বিয়ে হওয়া বউয়ের স্বাভাবিক সঙ্কোচেই বলেছিল- থাক্ মা। আমি এখন না হয় আপনার সঙ্গেই থাকি।

—না, তা কেন বউমা। ছেলের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসবে না সে কোথায় থাকে— কোথায় খায় কোথায় শোয়। যাও, জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও তোমার। ছেলের গাড়ির সময় হয়ে গেছে।

মনোরমার কথায় ক্ষমার চোখেমুখে মুহূর্তে যে খুশির বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে গিয়েছিল তা চোখ এড়ায়নি মণীশের। শরীরের রক্তের কোষগুলি সে যে ঝিলিকে মুহূর্তে কেমন সাড়া দিয়ে উঠেছিল তা যেন মণীশের জাগ্রত চৈতন্য ততটা জানে না যতটা টের পায় তার নিশ্চেতন শিরা ধমনিগুলি। শুধু তাঁর সঙ্গ পাবে বলেই ওই এক মানুষীর এত আনন্দ! ঘোমটার (ঘোমটা পরত তখন অন্তত নতুন বউয়েরা। আজ ক্ষমার কথা মনে এলে ওই ঘোমটা পরা মুখের ছবিটাই শুধু স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। কতদিন কোনও ঘোমটা মাথায় নারী আর কোথাও দ্যাখেন না মণীশ।)

ফাঁকে তার চোখের চাউনিটা আর একবার দেখে নেওয়ার লোভ হয়।

মণীশের সঙ্গে পেরিয়ে পড়ার সময় হয়তো ক্ষমা ভেবেছিল দুনিয়ায় আর কেউ থাকবে না শুধু সে আর মণীশ। হয়তো ভেবেছিল দু'দিনের জন্য একটু নিভৃত ঘর-গেরস্তালি পাতবে সে নিজের মতো করে। যে ঘর গেরস্তালি যে কোনও নারীর চিরদিনের স্বপ্ন। কিন্তু সত্যি যে এ কয়টা দিন তাকে নৌকোয় নৌকোয় ভেসে বেড়াতে হবে— ছোট্টো নিচু কেবিনে মাথা গুঁজে থাকতে হবে আর এবেকারে পাশেই যেন তাদের গায়ের উপরই হাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে একজন পুরুষ—হোক বৃদ্ধ- আর সারাদিনই প্রায় কাঠের পাটাতনের উপর দিন, কেবিনের ছাতের উপর দিয়ে ওই দুদ্দাড় দাপাদাপি করে যে পাল টাঙাবে, পালে ঢিলে দেবে আর দু'জন লোক (এরা আবার যথেষ্টই জোয়ান) তা ভাবতে পারেনি ক্ষমা। হয়তো বা সদ্য পরিচিত স্বামী সম্পর্কের ওই পুরুষের আক্কেলের বহর দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কোন বুদ্ধিতে নতুন বিয়ে করা বউকে কোনও স্বামী হুট করে এরকম অচেনা পুরুষ মানুষদের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। নৌকোয় ভাসতে ভাসতে সব কাণ্ডজ্ঞান কি লোপ পেয়েছে তার। তাও স্বামীর প্রতি এই অভিমানের মধ্যেও যে ছেলেমানুষের মতো খুশিতে সে দু'একবার মেতে ওঠেনি এমন তো না। নদীতে খ্যাপলা জাল ছুড়ে আস্তি হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিল একটা বিরাট ভেটকি। চকচক করছে রুপ্‌লি আঁশ। আনন্দে প্রায় শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠেছিল ক্ষমা। মাছের বাজারে না, নদীর কিতয়েই যে আসলে জ্যান্ত লুটিয়ে যাবে এতবড় মাছ তা যেন এই প্রথম জানল ক্ষমা। ঠিক করেছিল মাছের ঝোল সেই রাঁধবে। মশলার খুব সুবিধে নেই, বাটনা বাটার শিলনোড়া নেই— গুঁড়ো মশলা দিয়ে রান্না- তবু তাই রাঁধবে ক্ষমা।

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ মাঝি- সারাদিন যে মিশরীয় কাঠ খোদাইয়ের নিশ্চল মূর্তির মতো হাল ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এড়াপে হঠাৎ সচল হয়ে মৃদু আপত্তি তুলে নরম গলায় বলেছিল— আমরা থাকতি আপুনি কষ্ট করবেন কেন মা? কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করবে আপনার। আপনাদিগের তো অভ্যাস নাই। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ যেন ফন্দি করে তার হাত থেকে মাছ রান্নার কাজটা সত্যি নিয়ে নিচ্ছে, সব বিষয়ে ওদের কর্তৃত্বই বহাল থাকবে এই আশঙ্কায় যেন ক্ষমা প্রায় একরকম কেবিনের বাইরে ছুটে গিয়ে পাটাতনের উপর রাখা মাটির উনুনে কাঠ গুঁজে দিতে থাকে। বলে— না, না মাঝি, আমিই রান্না করব। মণীশ চুপ করে দেখছিলেন এই দৃশ্য। কাঠের উনুনে রান্না করার সত্যি অভ্যেস নেই ক্ষমার। তার উপরে খানিকটা ভেজা কাঠ। গল গল করে সাদা ধোঁয়া ওঠে। ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালাতে হয়। গাছকোমর বেঁধে রান্না করছে ক্ষমা। এই নৌকাই যদি তাদের চলমান সংসার ধরা হয় তাহলে তাদের সংসারের এই প্রথম রান্না ক্ষমার। উনুনের কাছে উবু হয়ে বসে রান্না করছে ক্ষমা, নীল শাড়ির আচলটা গলার কাছে জড়িয়ে এনে মাঝে মাঝে চোখ মুছছে আঁচলে। লাল ব্লাউজের নিচে সমৃণ সাদা কোমরের ফালিটুকু দেখা যাচ্ছে। মুখ চোখ রাঙা দেখাচ্ছে কাঠের আগুনে। তবুও নিজের সংসারের প্রথম রান্নার যে এক অপার্থিব গোপন তৃপ্তি ফুটে উঠেছে সেখানে তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখছিলেন মণীশ। পনেরো দিন আগে তো এই নারী তাঁর জীবনের কেউই ছিল না। আজ অথচ সেই তাঁকেই রান্না করে খাইয়ে খুশি করবে বলে তার যে এই বড় নিভৃত এ চেষ্টা— এর চেয়ে মধুরতর দৃশ্য এই পঁচিশ বছরের জীবনে আর কি কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন মণীশ।

(৪)

জায়গাটা সত্যই সুন্দর। অনেকদূর অবধি দেখা যাচ্ছে বড়তলা নদী। যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে উঁচু একটা গাছ— কোমরসমান উঁচু ঝোপঝাড়। ঢেকে রেখেছে অনেকটা জায়গা।

ক্ষমা প্রায় শিশুর মতো খুশির গলায় বলে— চলো না গো দেখে আসি ওই গাছগুলোর পিছনে কী আছে? মাঝিরা দাঁড়িয়ে আছে নৌকোয়। ওদের দেখছে। মণীশের মনে হয় ক্ষমার এই কৌতূহলও যেন একটা ছুতো— যেন আসলে মণীশকে নিয়ে সে সবার চোখের আড়ালে চলে যেতে— চায়। যেখানে এই গাছগাছালি, এই আকাশ, ওই সাদা মেঘ ছাড়া তাদের দেখবার আর কেউ নেই।

মণীশ মনে মনে ভেবে একটু অবাকই হয়। নৌকোর কেবিনের ছোট্ট নিরাপদ ঘরে যার ভয়— এই ফাঁকা প্রায় আশ্রয়হীন আকাশের নিচে সেই ভয় থেকে মুক্তি! খালের মধ্যে সরু রাস্তা ধরে ওরা চলে গিয়েছিল সেই ঝোপঝাড়ের পিছনে। দূরে কয়েকটা ছোট মাটির বাড়ি কিন্তু চালগুলো খুবই নিচু।

ছেলেমানুষের মতো খুশিতে বলে ক্ষমা— ওমা! কী সুন্দর মাটির বাড়িগুলি। কিন্তু বাড়ির চাল ওরকম ঢালু কেন? যেন মাটির সঙ্গে একেবারে মেশানো?

— এদিকটা এরকম ঢালু দেখছ ক্ষমা। ওদিকটায় কিন্তু এরকম নয়। এটা নদীর দিক বলে এরকম ঢালু— নাহলে বাতাসে উড়ে যাবে চাল। কীরকম হাওয়া দিচ্ছে দেখছ না। বাড়িগুলোও সেজন্য এরকম মাটির সঙ্গে প্রায় মেশানো।

— হ্যাঁ গো। এখানে সব সময় এরকম হাওয়া থাকে বুঝি? এরকম জায়গা আমি কখনও দেখিনি জানো যেখানে সবসময়ে একটা শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ। মনে হয় যেন হাওয়ার একটা কারখানা আছে কোথাও— খালি হাওয়া তৈরি হচ্ছে—

মণীশ বলেন— কেন? তোমার ভাল লাগছে না হাওয়ার শব্দটা—

— না, আসলে শব্দটা একটানা তো, কেমন যেন একটা নেশা লাগে। মনে হয় যেন কানে না, একেবারে মাথার মধ্যে শুনতে পাচ্ছি শব্দটা। যেন কলকাতায় ফিরে গেলেও শব্দটা মাথার মধ্যে থেকেই যাবে — মাথার মধ্যে শোঁ শোঁ করে ডাকতেই থাকবে—

একটু থেমে বলে ক্ষমা— আচ্ছা, কলকাতায় ফিরে না গিয়ে যদি এখানেই কোথাও থেকে যাই। কী হবে কলকাতায় গিয়ে? সেখানে তো আর এরকম হাওয়া নেই—

মণীশ হাসেন। বলেন— এইমাত্র যে বললে, মাথার ভিতর হাওয়ার শব্দটা থেকেই যাবে।

ক্ষমা অন্যমনস্কভাবে বলে— কিন্তু যদি না থাকে?

কী থাকবে— কী থাকবে না কেউ কি বলতে পারে?

মণীশ ঠাট্টার সুরে বলেন— তাহলে উপায়?

ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে যেন নিতান্ত লঘুস্বরেই বলে ক্ষমা— উপায় একটাই আছে, বলো— তা হলে এখানে থেকে যাওয়া এই নদীর ধারে। সারা বছরই বোধহয় হাওয়া এখানে এরকম মানুষের মতো কথা বলে— সত্যি গো, ঠিক মনে হচ্ছে কী একটা কথা যেন খালি বলতে চাইছে হাওয়া কিন্তু বোঝাতে পারছে না— তাই কথা বলেই যাচ্ছে এরকম! যতক্ষণ না কেউ তা বুঝতে পারবে ততক্ষণ সে থামবে না।

লঘু সুরে মণীশ বলেন— কিন্তু কেউ তো সত্যি বুঝতে পারছে না কী একই কথা বারবার বলতে চাইছে সে— দ্যাখো না তুমিই চেষ্টা করে বুঝতে পার কি না কিছু — তাহলে আমরা এখানে এরকম একটা ঘর বেঁধে না হয় থেকেই যাই— সারাদিন হাওয়া দরজার কড়া নাড়িয়ে শব্দ করবে।

ক্ষমা চুপ করে ছিল। মণীশ খুব গম্ভীরভাবে বলেন— ভেবে দ্যাখো ক্ষমা, লক্ষ্মণ মাঝি তো বলছিল কসতলায় বকখালি খালের ধারে নাকি জমি আছে— কে নাকি মেয়ের বিয়ে দেবে বলে বেচতে চায়। থাকবে নাকি ওখানে ওরকম বাসা বেঁধে। শুধু তুমি আর আমি আর আমাদের সামনে দিয়ে বয়ে চলা শুধু ওই বকখালি খাল।

ক্ষমা মণীশের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে— খেপেছ তুমি? আমি কলকাতার মানুষ কলকাতায় বড় হলাম। এখন এসে আমাকে এই জঙ্গলে থাকতে হবে? রাতে বাঘটাঘ বেরোয় কিনা এখানে কে জানে?

না গ মা, বাঘ নাই এঠি। শিয়াল আছে, রাতে শিয়াল ডাকে। মণীশ কিংবা ক্ষমা কেউই খেয়াল করেনি গ্রামের একটি চাষি বউ গরুর দড়ি হাতে ঝোপের আড়াল থেকে কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পিছনে। শীর্ণ চেহারা। মলিন হলুদ একটি শাড়ি পরনে। আধখানা ঘোমটার ফাঁকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ়া মহিলা কৌতূহলী চোখে দেখছে ওদের। কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। নীল শাড়ি পরা ফিটফাট ফর্সা চেহারার ক্ষমা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে একজন গেঁয়ো রমণীর এটাই তো স্বাভাবিক। এরকমভাবে চুল বাঁধা এরকম ফর্সা চেহারার মানুষ সারা জীবনে ক'বারই বা দেখেছে এখানে।

— ও বাব্বা শেয়াল ডাকে নাকি? আমি কখনও শেয়ালের ডাক শুনিনি— মুখে হাত চাপা দিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিল করে হেসে ওঠে ক্ষমা—

যেন শিয়ালের ডাক না শুনে তার জীবনের মস্ত এক ক্ষতি হয়ে গেছে এবং সেই ক্ষতির সান্ত্বনাস্বরূপই যেন সেই প্রৌঢ়া মৃদু সহানুভূতির সুরে বলে— তাতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই মা, আপনারা কলিকাতার মানুষ— সেঠি শুনিঠি নদী জঙ্গল কিছু নাই— শিয়ালের ডাক কোত্থেকতি শুইনবেন আপনারা—

কপট কৌতূহলের সুরে উজ্জ্বল দু'চোখ মেলে জিজ্ঞেস করে ক্ষমা— রোজ শেয়াল ডাকে বুঝি এখানে?

— হঁ। এক পো জোয়ার হলিই শিয়াল ডেকি ওঠে এটি। বামুনবাদশা পাখিও ডাকে মা।

কৌতূহলের চোখে প্রৌঢ়াকে দ্যাখে ক্ষমা। বলে— এ গ্রামের নাম কী মাসি—

কলকাতা থেকে আসা একটি ধবধবে ফর্সা মেয়ে, মাথায় যার কেমন প্রজাপতির পাখার মতো বাঁধা চুল- সে এই গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করছে এতেই বোধহয় কেমন লাজুক কৃতার্থ হাসি হেসে বলে প্রৌঢ়া— ইটা গরিব লোকের গাঁ মা- এর আর কী কুনো নাম আছে?

খিলখিল করে হেসে বলে ক্ষমা— কী বলছ মাসি? তোমাদের গ্রামের কোনও নাম নেই?

— আছে মা, টাঁকের হাট। সিটা কি একটা বুইলবার মতো নাম হোলো?

কয়েকদিন নৌকোয় হাত-পা গুঁজে থাকার পর এই ফাঁকা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অচেনা এই গ্রাম্য প্রৌঢ়ার সঙ্গে এরকম অলস উদ্দেশ্যহীন আলাপে বোধহয় এরকম মজা পায় ক্ষমা। সেরকম খিলখিল করে হেসেই চোখ গোল গোল করে বলে— বাব্বা ট্যাঁকের হাট, সাঙঘাতিক নাম গো মাসি, এ নাম শুনলে বাঘ আর আসে কখনও এ-গ্রামে?

প্রৌঢ়া কিন্তু রাগ করে না। কেমন যেন একটু বিষণ্ণ হাসি হেসেই বলে— তাই তো বলি মা, এ-গাঁয়ে বাঘ নাই। কিন্তু অনেকদিন পূর্বে নাকি মা বাঘ আসত এ-গাঁয়ে। ট্যাঁকের হাটে অনেকদিনের বুড়া একটা মানুষ আছে নাকি মা যে বাঘের ডাক শুনিঠে। বকখালি খাল পেরিয়ে এঠি বাঘ আসত। বাবা দক্ষিণ রায়ের পূজা দিত এঠি। এখন বাঘটাঘ আর কিছু নাই মা—

দড়ির ও-মাথায় বাঁধা হাড় জিরজিরে গরুটা আকাশে গলা তুলে হাম্বা ডেকে অল্প টান দিচ্ছিল দড়িতে। প্রৌঢ়া বলে— যাই মা আমি। ওর খিদা পায়িঠে। ওদিকে নদীর পাড়ে ঘাস রয়িধে—

গরুর দড়ি হাতে ধরে নদীর দিকে হাঁটে প্রৌঢ়া। যেখানে মাথা দোলাচ্ছে লকলকে সবুজ ধানী ঘাস। সবুজ মেঘের মতো দেখাচ্ছে নদীর চর। বাধ্য শিশুর মতো পিছন পিছন যায় গরুটা। সেইদিকে তাকিয়ে হো হো করে মণীশের উদ্দেশে হেসে উঠে বলে ক্ষমা— শুনলে তো, এ গ্রামে পূর্বে বাঘ ছিল, এখন নাই বলে কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল বউটা। বাঘে এখনও ওকে খায়নি বলে কী গভীর দুঃখ মনে পুষে রেখেছে দেখেছ? মানুষের তাহলে কতরকমের দুঃখ আছে বলো। মজা পেয়ে হিহি করে হাসতেই থাকে ক্ষমা। মণীশ চুপ করে দ্যাখে ওকে। হাসতে হাসতেই বলে ক্ষমা— আচ্ছা কী বলে গেল ও— এক পো জোয়ার? তার মানে—

কৌতূহল যেন আর ধরে না ক্ষমার।

মণীশ বলেন — এটা ওদের জোয়ারের একটা মাপ। অর্থাৎ পুরো জোয়ারের সিকি ভাগ।

ক্ষমা হাসে। বলে— যাক বাবা তাও ভাল যে বলেনি যে এক কিলোগ্রাম— বা হাফ পাউন্ড জোয়ার।

অচিন্ত্য ছুটতে ছুটতে এসে বলে— চলুন স্যর! সার ভাঁটা হয়ে গেলি নৌকা একেবারে বসি যাবে। মহিষানি চর তাহলি আজ আর যাওয়া যাবেনি।

বলেই ছুটতে ছুটতে অচিন্ত্য আবার নৌকোর দিকে ছুটে যায়— নৌকোটাকে লগি মেরে জলের দিকে আর একটু ঠেলে দেওয়ার জন্য।

সত্যি আর তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে দৃশ্য উপভোগ করার সময় নেই। নৌকো নিয়ে আর একটা দল চলে গেছে মহিষানিতে— 'স্পট লেভেল' নেওয়ার জন্য জঙ্গল কেটে লেন তৈরি করতে। ওরা সবাই অপেক্ষা করবে মণীশের জন্য।

ক্ষমা ছেলেমানুষের মতো আব্দার করে— এখানে আর একটু থাকি না। বেশ লাগছে—

মাথার উপরে টিট্টির টিট্টির শব্দে ডাকতে ডাকতে ছাই ছাই রঙের একটা পাখি পাক খাচ্ছিল।

ক্ষমা বলে— দ্যাখো— বামুনবাদশা, না কী একটা পাখির নাম বলছিল বউটা, এ নির্ঘাৎ সেই পাখি। ভাঁটা কিছুক্ষণ হয়ে গেছে না? ওই পাখি বোধহয় এই এক পো ভাঁটায়ও ডাকে। এক পো জোয়ারে ডাকলে এক পো ভাঁটায় আর ডাকবে না কেন?

মজার মুখ করে হাসে ক্ষমা। বলে— বউটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে নাকি?

গ্রাম্য প্রৌঢ়ার কথাবার্তা ভাবেভঙ্গিতে সত্যি খুব মজার খোরাক খুঁজে পেয়েছে ক্ষমা কিন্তু মণীশের তো আর মজা করার সময় নেই। এক্ষুনি নৌকোয় গিয়ে উঠতেই হবে তাকে কেননা নৌকো যদি একবার কাদায় বসে যায় তাহলে জোয়ার আসতে আবার সেই ছ'ঘণ্টা। ততক্ষণ এই নৌকোয় নিরুপায় বসে থাকতে হবে

তাদের আর মহিষানির চরে সার্ভে টিমের বাকি মানুষেরা অপেক্ষা করবে ওদের জন্য।

মণীশ তাড়া দেন— পরে পারলে একবার এসে জিজ্ঞেস করে যাব ওকে কিন্তু এখন আর এক মুহূর্তও দেরি না। ক্ষমা, শিগগির নৌকোয় ওঠো।

ক্ষমা ছেলেমানুষের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে বলে— থাকি না বাবা আর একটুক্ষণ এখানে। খুব ভাল লাগছে। কেউ কোথাও নেই। চলো না ওই ঘাসের ঢিবিটার উপর গিয়ে একটু বসি।

এই প্রথম স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে মণীশের হাত ধরে ক্ষমা। সত্যি যতদূর চোখ চলে শুধু নদী, মাঠ, ঝোপঝাড় আবার নদী। এছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। সত্যি তো নৌকোয় অনির্দিষ্ট ভাবে ভেসে ভেসে বেড়াবার হাত থেকে ছুটি নিয়ে একটু ক্ষণ তারা কি স্থির হয়ে এখন বসতে পারে না এখানে?

মণীশ এবার একটু ধৈর্য হারায়। খানিকটা রূঢ় স্বরেই বলে— কী ছেলেমানুষি করছ তুমি ক্ষমা? এটুকু বুঝবে না তুমি? সবাই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। বেশ তোমার ইচ্ছে তুমি থাকো এই ট্যাকের হাটে— আমি চললাম। আমার চাকরি বলে একটা ব্যাপার আছে—

মণীশ সত্যি রাগ করে সামনে এগোয়। যা সে কয়েক মিনিট আগেও ভাবতে পারত না যে তার জীবনে একেবারে সদ্য-আসা ওই নারীর সঙ্গে সত্যি সে কখনও এরকম ব্যবহার করতে পারে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে ক্ষমা দ্যাখে রাগ করে মণীশের এরকম সামনে চলে যাওয়াটা। তাকে 'ট্যাকের হাট' নামক এরকম এক হাওয়া-ডাকা, শিয়াল আর বামুনবাদশা-ডাকা বিজনবিভুঁই প্রান্তরে ফেলে রেখে মণীশ অন্তত ওকে ভয়-দেখানোর জন্যই শুধু এরকম সামনে হাঁটতে পারে তাই যেন বিশ্বাস করতে চাইছিল না ক্ষমা।

(৫)

এরপর মোটে দু'একবারই আর এই অস্থির ভাসমান নৌকোয় এসে মণীশের সঙ্গে কয়েকটা রাত কাটিয়েছে ক্ষমা। অর্ক যখন ভূমিষ্ঠ হল তখনও কিন্তু সপ্তমুখী নদীতে নৌকোয় ভাসছেন মণীশ। ডাক্তারের দেওয়া তারিখের আগেই হঠাৎ ক্ষমার প্রসববেদনা উঠলে মনোরমাই তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন রিকশায় করে পাশের নার্সিংহোমে। মণীশকে খবর পাঠাবার কোনও উপায় নেই— কেননা, সে তখন নদী জঙ্গল আকাশের এক অন্য পৃথিবীতে— সব যোগাযোগের বাইরে। মণীশ যখন পৌঁছলেন কলকাতায় ওদের বাড়িতে তখন অর্কের তিনদিন বয়স হয়ে গেছে। শিশুর মতো বিস্ময় আর কৌতূহলে ক্ষমার পাশে মাংসের কুণ্ডলীর মতো শুয়ে থাকা আত্মজনকে দেখছিলেন মণীশ। অর্কের জন্মের পিছনের গূঢ় গোপন ইতিহাসটা বারবার মনে পড়ছিল তাঁর।

কয়েকদিনের অসুখে ভুগে মনোরমা যখন গত হন তখন অর্ক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে। ফাইনাল ইয়ার সেবার তার। অর্ক যে কখনও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বে বা তিনি তাঁর সন্তানকে পড়াতে পারবেন ইঞ্জিনিয়ারিং তা কখনও ভাবতে পারেননি মণীশ। যদিও মনে মনে এরকম গোপন একটা আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিলই। নিশানাথ তাঁর একমাত্র সন্তান মণীশের জন্য খুব বেশি কিছু করে যেতে পারেননি। সংসারে থেকেও সংসার থেকে কেমন আলাদা আলগা একজন মানুষই রয়ে গেলেন নিশানাথ সারাজীবন। যেন এই গ্রহে তিনি বসবাস করতে আসেননি— অল্প কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন মাত্র। নিজের কেরিয়ার গড়তে পারেননি মণীশ। সাধারণ চাকরি করে নিতান্ত ছাপোষা গেরস্তের মতোই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন তিনি। এই একটা সূক্ষ্ম গোপন দুঃখ বরাবর ছিল তাঁর মনে। এ-দুঃখের কথা তো আর সবাইকে বলা যায় না। সন্তানকে দিয়েই এই দুঃখের ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিলেন যেন তিনি। তাঁর যা হল না— অর্কের যেন তা হয়। সে যেন নিজের কেরিয়ার নিজের জীবন নিজের পছন্দ মতো তৈরি করে নিতে পারে— একজন সুখী সফল মানুষ হয় যেন সে— অসাফল্যের হীনমন্যতা সারাজীবন যেন কুরে কুরে না খায় তাকে। স্বাভাবিকভাবে সন্তানের জন্য এই প্রার্থনা ছিল ক্ষমারও।

অর্কের জন্য কোনও ব্যাপারেই কখনও কোনও কার্পণ্য করেননি মণীশ। অর্কও অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ছেলে। যে সুযোগই যখন হাতের কাছে এসেছে তারই যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে কখনও ভুল হয়নি অর্কের।

বেশি ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই বলেই নিশানাথ দেশভাগ হওয়ার পর শহরতলির মুখে এই ছোট বাড়িটাই ভাড়া নিয়েছিলেন। দু'টো মোটে ঘর, একটা ঢাকা বারান্দা, একটা রান্নাঘর, বাথরুম। নিশানাথের সময় এই স্পেস হয়তো অকুলান ছিল না। কিন্তু সংসারের লোক কিছু বেড়ে গেল। মণীশের বিয়ে হল, অর্ক এল ক্ষমার কোলে, তারপর অর্ক বড় হল। জায়গা ক্রমশ ছোট হতে থাকল। অর্ক বারান্দায় খাট পেতে শোয়, খাটের উপর বসেই পড়াশোনা করে কিন্তু যাতায়াতের পথ সেটা। পড়াশোনায় ব্যাঘাত হয় অর্কের। ফাইনাল পরীক্ষার চার-পাঁচ মাস আগে থেকেই অর্ক পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিল তার নিজের একটা ঘর চাই যেখানে সে একটু একা পড়াশোনা করতে পারবে। রাত জাগতে পারবে নিজের মতো। নাহলে ফার্স্ট ক্লাস পাবে না সে। ফার্স্ট ক্লাস না পেলে কেন এত কষ্ট করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ল সে? ভয়ে ভয়ে ক্ষমা বলেছিল— আলাদা ঘর এখন তোর জন্য কোথায় পাব খোকা? দু'টোই তো ঘর আমাদের।

অর্ক বলেছিল— কেন? এখানেই থাকতে হবে কেন? কলকাতায় বাড়ি নেই আর?

ক্ষমা ভয়ে ভয়ে বলেছিল— অনেকদিনের ভাড়াটে বলে এখনও অনেক কম ভাড়া দিয়ে আছি— নতুন কোনও বাড়িতে গিয়ে উঠতে হলে এরকম একটা বাড়ির জন্য অন্তত চারগুণ বেশি ভাড়া দিতে হবে। সেলামি তো আছেই।

অর্ক ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল— তাহলে বলো পড়াশোনা বন্ধ করে দিই। বাবার আসলে উচিতই হয়নি এসব ইঞ্জিনিয়ারিং টিঞ্জিনিয়ারিং আমাকে পড়ানো—

ক্ষমা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিল— কেন? একথা তুই বলছিস কেন?

অর্ক বলে— ভুল বলেছি নাকি আমি? এসব আসলে বড়লোকের ছেলেদের জন্য।

ক্ষমা বলে— কী বলছিস তুই? যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তারা সব সাঙঘাতিক বড়লোক নাকি?

অর্ক বলে— সাঙঘাতিক বড়লোক না হলেও আমাদের মতো এত গরিব নয় যে একটা নিরিবিলি ঘরও জুটবে না নিজের মতো পড়াশোনা করার জন্য। হাটের মধ্যে বসে পড়াশোনা করতে হবে আমাকে— তাই না? আমার কি সেই দায়িত্ববোধ নেই বলে তুমি মনে কর? কথাটা ক্ষমার মাধ্যমেই



কানে গিয়েছিল মণীশের।

ক্ষমা বলেছিল— ছেলের জন্য ব্যবস্থা করো একটা কিছু। সত্যই তো ছেলে তোমার আগাগোড়া ভাল রেজাল্ট করে এসেছে। আমাদের ছেলে যে এতটাই ভাল করবে আমরা ভাবিনি কখনও। আজ যদি সামান্য একটা ঘরের জন্য রেজাল্টটা খারাপ হয়ে যায় ওর তাহলে আফসোস রাখার আর জায়গা থাকবে আমাদের?

চুপচাপ ভাবেন মণীশ। সত্যি এযে তাঁদেরই ছেলে মনে হয় না মণীশের। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন অন্য কারও ছেলে সে। এত ঝকঝকে এত স্মার্ট। রং অনেকটাই ওর মা-র পেয়েছে। কিন্তু এত ঝকঝকে চোখ, নাক, মুখ? ক্ষমার মুখ-চোখ তো গোলগাল পুতুলের মতো। আর মণীশ নিজের সঙ্গে ছেলের তুলনা করার কথা তো ভাবতেই পারেন না। মণীশ বরং তার জন্মদাতা নিশানাথের চেহারাটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। একেবারেই সাধারণ ছাপোষা চেহারা। দেখলে মনে হতেই পারে যেন অস্তিত্বহীন অস্তিত্বের ভার বয়ে বেড়াচ্ছে সে কোনওমতে। লম্বাচওড়া চেহারার সঙ্গে মিল রেখে এই বাইশ তেইশ বছরেই স্বভাবটাও অর্কের হয়ে উঠেছে অত্যন্ত চাপা গম্ভীর। দরকারি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কোনও কথা বলতেই ভালবাসে না। বলেও না অর্ক। মণীশের মনে হয় ছেলে যেন তাঁর এমন এক জগতের মানুষ যা তাঁর মতো নিতান্ত সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধির নাগালের বাইরে। সাধারণ কোনও কথাও ছেলেকে জিজ্ঞেস করার আগে দু'বার ভাবেন মণীশ। প্রশ্নগুলি অর্কের উত্তরের যোগ্য তো। তেমন অর্থহীন গুরুত্বহীন প্রশ্ন মনে হলে অর্ক কোনও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। একবার বিরক্তির চোখে শুধু তাকায় মণীশের দিকে। মণীশ লজ্জাবোধ করেন— ছেলে এত বড় হয়ে গেল— অথচ তিনি নিজে কি আজও যথার্থ বড় হয়ে উঠতে পারলেন না? জীবনের গুরুত্ব বুঝতেই শিখলেন না? নাহলে অর্থহীন তুচ্ছ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বিব্রত বিরক্ত করবেন কেন তাঁর ছেলেকে? মাঝে মাঝে অবশ্য ছেলের কাছে নিজেকে খুব দীনহীন মনে হতে থাকে। মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে বলেন— এ্যাই, তুই কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিস না কেন রে? উত্তর দিতে গেলে সম্মানে লাগে না কি তোর?

মণীশের দিকে শান্ত গম্ভীর চোখে একবার তাকিয়ে বলে শুধু অর্ক— আজেবাজে প্রশ্ন করলে কী জবাব দেব?

হঠাৎ জ্বলে ওঠেন মণীশ— আজেবাজে মানে? জিজ্ঞেস করলাম পরীক্ষা তোর কবে? এটা আজেবাজে হয়ে গেল?

অর্ক বলে— তা ছাড়া কী? পরীক্ষা কবে জেনে তোমার কী হবে? আমার হয়ে তুমি পড়াটা তৈরি করে দেবে? বলো না— আমার পড়াটা তো আমাকেই করতে হবে।

একরকম 'আইডল কিউরিসিটি' — অলস কৌতূহল। আমার ভাল লাগে না। অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে বলে অর্ক।

মণীশ ছেলের এই কথার জবাবে কী বলবেন বুঝতে না পেরে ক্ষমাকেই সাক্ষী মানেন— শুনছ ক্ষমা, তোমার ছেলের কথা শুনেছ, জিজ্ঞেস করেছি ওর পরীক্ষা কবে সেটাই অপরাধ হয়ে গেছে আমার। এসব নাকি অবান্তর প্রশ্ন।

ক্ষমা বলে— থাক না। ও নিজের মনে পড়াশোনা করছে। ও নিজেরটা নিজেই বুঝবে। তুমি ওখানে গিয়ে পড়লে কেন?

স্ত্রীর কাছ থেকেও কোনও সমর্থন না পেয়ে নিঃশব্দে সরে আসেন মণীশ। কেমন অপমানিত, অতিরিক্ত মনে হয় নিজেকে।

ক্ষমা এবার আস্তে আস্তে অর্কের কাছে এগিয়ে এসে ওর গায়ে হাত দিয়ে বলে— তোর শরীরটরির খারাপ হয়নি তো বাবা—

অর্ক এবার চেয়ার ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়ায়।

— উঃ তোমরা আমাকে একটু নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করতে দেবে নাকি? আমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার শরীর খারাপ হয়েছে? তোমাদের কি আর কোনও কাজ নেই?

ক্ষমা বলে— কাজের কথা ছাড়া কি আর কোনও কথা থাকতে পারে না দু'জন মানুষের মধ্যে?

মণীশ এবার বলেন— থাক্ চলে এসো তুমি, পড়াশোনা করতে দাও ওকে।

ক্ষমা বলে— বাব্বা ওরকম করিস কেন? আমরা যেন তোর শত্রু?

অর্ক বলে— আবার এইসব সেন্টু শুরু করেছ? মোস্ট ডিসগাস্টিং। দুনিয়ায় যাদের কোনও কাজ থাকে না তারা করে এসব।

আহত ক্ষমা পিছিয়ে এসে বিমর্ষ সুরে বলে— বাব্বা কী সব ভাষা হয়েছে আজকাল তোদের মুখে। আর কাজ করে যেন দেশ উদ্ধার করে দিবি।

দু'জনে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেলে মণীশ এবার নিজেই স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন— ছেলের কথায় কিছু মনে না করাই উচিত ক্ষমা। ফার্স্ট ক্লাস পেতে গেলে একটু মেন্টাল টেনশন তো হবেই। সেই টেনশন থেকেই এরকম করছে।

ক্ষমা এবার নরম গলায় বলে— বা রে আমি কোথায় মনে করলাম। ছেলের কথায় তোমার মুখই তো ভার হয়ে গেছে দেখলাম।

মণীশ এবার হেসে বলেন— তা মিথ্যে বলব না ক্ষমা, ছেলের কাছে এসে দাঁড়ালে নিজেকে কেমন যেন বাতিল ফালতু বলে মনে হয়। এই বয়সে কত কিছু জানে শোনে ওরা— কত কিছু বোঝে। সব ব্যাপারে কেমন সুনিশ্চিত মতামত অথচ আমরা যেন কেমন একটা অবুঝ জীবন কাটালাম — যেন বয়স আর বাড়লই না আমাদের। এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না জীবন ব্যাপারটা আসলে কী?

একটু থেমে বলেন মণীশ— তাছাড়া নিজের ছেলেকে দেখলেও তো নিজের ছেলে বলে মনে হয় না।

ক্ষমা বলে— তাহলে? ছেলে কি সুন্দর দেখতে হয়েছে— সেটা বলো। কোত্থেকে এরকম চোখ মুখ নাক পেল কে জানে?

মণীশের কিছুক্ষণ আগের মনের ভারটা যেন নেমে যায়। কিংবা যেন চেষ্টা করেই নামায়। বলে— তা হয়েছে, সত্যি গো, দেখলেই মনে হয় যেন আমার না, অন্য কারও ছেলে। হঠাৎ গলা নামিয়ে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে রহস্যের সুরে বলে— শোনো, আমি তো নৌকোয় নৌকোয়ই থাকতাম— মা-ও তো বুড়ো মানুষ, বাবার ছবির সামনে বসেই দিন কাটাতেন। রাতে ঘরে অন্য মানুষ টানুষ— না, না ওভাবে তাকাচ্ছ কেন? সুন্দর পুরুষমানুষ দেখলে— মিচকি মিচকি ফাজিল হাসি হাসেন মণীশ।

চোখ বড় বড় করে ক্ষমা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে— ছি ছি জিভে কি কোনও আড় নেই। পারলে তুমি এমন একটা নোংরা কথা? মা গো তুমি মানুষ—

— ও মা! নোংরার কী আছে, ধরো এখন যদি কোনও সুন্দরী মহিলা এখনই এখানে আসে তাহলে কি—

— কোনও সুন্দরী মহিলার এমন কপাল পোড়েনি যে তোমার কাছে আসতে যাবে—

ওরকম হাসি হেসেই বলেন মণীশ— তাই নাকি? তাহলে এই মহিলাটি এসেছিল কী করে? ক্ষমার থুতনি আস্তে নেড়ে দেন মণীশ।

— কপাল পুড়েছিল বলে— আর কী বলব? উদাসভাবে বলে ক্ষমা।

মণীশ এবার হেসে ওঠেন— ওঃ বাব্বা। তাহলে সুন্দরী মহিলা কথাটা দিব্বি স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে— লোকে বিনয় করেও অন্তত বলে আমি আর কোথায় এমন সুন্দরী।

— সুন্দরী, কি সুন্দরী নই— তা বোঝোনি সেদিন—

মণীশ জিজ্ঞাসু গলায় বলেন — কোনদিন—

— কেন? সেই মাটির বাড়িতে? ভুলে গেলে সেই রাতের কথা?

অনেকক্ষণ চুপ থেকে মণীশ একদম নিজের মনেই বলেছিলেন— না, ভুলিনি। কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিব না / আমি কভু ভুলিব না— আবৃত্তির সুরে বলেছিলেন মণীশ।

(৬)

ঘরে নতুন মানুষ আবার এল একজন যখন অর্ক বউয়ের মুকুট পরিয়ে ঘরে নিয়ে এল লীনাকে। কলেজে পড়ার সময়েই লীনার সঙ্গে পরিচয় অর্কের। একই কলেজে পড়ে লীনা, দু'বছরের জুনিয়র। লীনাও অত্যন্ত ধারালো তুখোড় বুদ্ধির মেয়ে। হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের প্রোবাবেলিস্টিক ডিজাইনের একটা প্রোজেক্টের কাজে প্রথমে দু'জনের মৌখিক পরিচয়— তা থেকেই ঘনিষ্ঠতা।

মনোরমা এ-বাড়ির যতটা শূন্য করে চলে গিয়েছিলেন ক্ষমা চাইছিল সে-শূন্যতা যে করে হোক ভরে উঠুক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্ক আর একজন নতুন মানুষকে নিয়ে আসুক এ-সংসারে। কিন্তু যে নতুন মানুষটিকে তিনি মনে মনে কল্পনা করেছিলেন সে কি লীনা— প্যান্ট শার্ট আর একজোড়া বুটজুতোর মতো জুতো পরে যে গটগট করে পুরুষমানুষের মতো হাঁটে ঘরের মধ্যে অর্ককে ইয়ার দোস্তের মতো নাম ধরে ডাকে— হাই অর্ক, হোয়াই আর ইউ সো প্যাসিভ ম্যান, বি এ বিট অ্যাগ্রেসিভ। ওরকম মিনমিনে পুরুষ মানুষ দেখলে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়।

ক্ষমার দিকে ফিরে বলে— মাসিমা, আপনার ছেলে কিন্তু একটু গোবেচারা ভালমানুষ। একটু চটপটে স্মার্ট হতে না পারলে ও তো লাইফে দাঁড়াতেই পারবে না মাসিমা।

টপ আর শরীরের প্রতিটি ভাঁজ অবধি ফুটে ওঠে এমন টাইট জিনসের প্যান্ট পরা মেয়েটিকে একপলক দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিতে হত ক্ষমাকে। বিশেষ করে আগ্নেয়গিরির চূড়ার

মতো নারীত্বের দুটি প্রতীকচিহ্ন তার। এ সব অর্কের বিয়ের আগেকার কথা।

ক্ষমার মনে পড়ে তার কিশোরী বয়সের প্রথম স্তনোদ্‌গমের অনুভূতি। কী লজ্জা! কী লজ্জা! পারলে যেন নিজের সমস্ত শরীর দিয়ে যৌবনের এই নির্লজ্জ চিহ্নগুলিকে আড়াল করে রাখে সে। যেন এই যৌবন তার ঘোর অপরাধ। বড় হয়ে যখন শাড়ি ধরল তখন হঠাৎ কোনও অসতর্ক মুহূর্তে বুক থেকে শাড়ির আঁচল খসে গেলে সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে যেত— মনে হত সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওর এই যৌবনলক্ষণের দিকে হাজারটা চোখ মেলে লোভীর মতো তাকিয়ে আছে। প্রায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো অচেতন হাত মুহূর্তে উঠে এসে যেন পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী যথাস্থানে তুলে দিত স্খলিত আঁচল।

সেখানে চোখ পড়লে লজ্জায় কখন চোখ সরিয়ে নেয় ক্ষমা নিজেই জানে না।

আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য অর্ক গম্ভীরভাবে বলে, আমি কীভাবে চলব আমিই জানি লীনা, ইউ নিড নট বদার অ্যাবাউট ইট—

লীনা রুষ্ট গলায় বলে— ও কে। কিন্তু নিজের ভাল তুমি নিজে কতটা বুঝতে পারো সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমাকে কিছু বলাই দেখছি অপরাধ।

এসবই অবশ্য ওদের বিয়ের আগেকার কাহিনি।

ক্ষমা ভয়ে ভয়ে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল অর্ককে— হ্যাঁ রে, তোর মতলব কী? ওই মেয়েকে তুই বউ করে আনতে চাস এ-বাড়িতে?

অর্ক বলে— হ্যাঁ, তাতে তোমার এত দুশ্চিন্তা কীসের? আমার ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও না।

ক্ষুব্ধ অভিমানে বলেছিল ক্ষমা— ও! এটা খালি তোর একার ব্যাপার না?

অর্ক বলে উঃ মা, বিয়ে করব আমি, ব্যাপারটা আমার নয় তো কার? আর কী দোষ করেছে লীনা যে ওর নাম করলেই তোমার মুখটা ওরকম হয়ে যায়? অত্যন্ত ব্রাইট মেয়ে, অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল আর মডার্ন। ক্লাসের সমস্ত ছাত্র এমনকী প্রফেসররা অবধি ওর বিদ্যেবুদ্ধির কী তারিফ করে জানো?

নিজেকে আর সংযত করতে না পেরে লজ্জার মাথা খেয়ে ছেলেকে বলে ক্ষমা— কী দোষ করেছে বুঝিস না? কী পোশাক আশাক ওর? ও এই সংসারের বউ হয়ে আসবে?

ক্ষমার এই বাক্যে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অর্ক— বউ মানে? লীনা শুধু সংসারের বউ হয়ে আসবে নাকি? তার অন্য কোনও পরিচয় নেই বুঝি? ভুলে যাচ্ছ মা, সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করবে সামনের বছর। যা কেরিয়ার ওর, সাবজেক্ট নিয়ে যা পড়াশোনা আর যা আইকিউ ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে যে কোনও কোম্পানি ওকে নিতে পারলে বর্তে যাবে। ওকি সেইসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বউ হয়ে সংসারে হাঁড়ি ঠেলবে।

ক্ষমা একটু দমে গিয়ে বলে— হাঁড়ি ঠেলতে বলছি না ওকে। হাঁড়ি যে ও ঠেলবে না তা না বোঝার মতো নির্বোধ আমি নই রে খোকা কিন্তু পোশাক আশাকটা তো তাই বলে একটু ভদ্রগোছের—

অর্ক খেপে গিয়ে বলে— ভদ্র গোছের মানে? ও কি শাড়িতে কলা বউ সেজে অফিসে যাবে নাকি? ওর এই স্মার্ট পোশাকের জন্যই কোম্পানির এগজিকিউটিভরা বেশি পছন্দ করে ওকে জানো? ওর পোশাকে অভদ্রতা কোথায় দেখতে পেলে আমি বুঝতে পারছি না মা।

এবার চুপ করে যেতে হয় ক্ষমাকে। বিমূঢ়ও হয়ে যেতে হয় খানিকটা। লীনার পোশাক কেন এত দৃষ্টিকটু তা মা হয়ে কী করে তিনি বুঝিয়ে বলবেন ছেলেকে? এতো বুঝিয়ে বলা সত্যই যায় না কিন্তু অর্ক কী করে ভবিষ্যতে মেনে নিতে পারবে এটা যে তার বউ এরকম উদ্ধত যৌবন প্রদর্শনীর পোশাক পরেই কথা বলবে অন্য পুরুষের সঙ্গে!

আর কাকেই নিজের মনের কথা বলবে ক্ষমা মণীশ ছাড়া?

ক্ষমার অভিযোগ শুনে মণীশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অল্প হেসে বলে— ঠিকই তো। ছেলে অন্যায় কী বলেছে? তোমার হবু বউ ইঞ্জিনিয়ার। সে সপ্রতিভ স্মার্ট হবে না কী তোমার মতো— বাপস রে— প্রথমবার সেই নৌকোর দিনগুলির কথা মনে পড়ে? উঃ কী জ্বালানোটাই জ্বালিয়েছ। নতুন বিয়ে করা বউ— আমারই বউ তো সে, আর কারও নয়, সারা গায়ে বিয়েবাড়ির সেন্ট পাউডার বেনারসি শাড়ির গন্ধ লেগে আছে সেই গন্ধের পাশে শুয়ে থাকতে হবে অথচ হাত দিয়ে ধরতে পারব না তাকে। কী মায়াদয়াহীন লজ্জা রে বাপ্।

এই বয়সেও লজ্জায় ঈষৎ লাল হয়ে ক্ষমা বলে— ইস্ অদিখ্যেতা। আমার পাশে শুয়ে থাকতে কে বলেছিল? পাটাতনে গিয়ে শুয়ে থাকলেই তো পারতে।

মণীশ বলেন— হ্যাঁ মাঝে মাঝে এত রাগ হত, ভাবতাম যাই পাটাতনে গিয়েই শুয়ে থাকি— তারপর ভাবতাম অচিন্ত্য লক্ষণ ওরা কী ভাববে। নতুন বর-বউ। একজন শুয়ে কেবিনের ভিতরে আর একজন কেবিনের বাইরে।

ক্ষমা বলে— হ্যাঁ আর আমার মনের অবস্থাটা কখনও বুঝতে পেরেছিলে বুঝি তুমি? তোমরা পুরুষ মানুষেরা কখনও বুঝতেও পারবে না তো। শুনলাম এই নাকি তোমার চাকরি— পৃথিবীতে এরকম চাকরি কখনও শুনিনি — এই নৌকোয় ভেসে ভেসে বেড়ানো। এই নৌকোই নাকি আমার ঘর। শুনে মনটা যে কেমন হয়ে গিয়েছিল তা তো বুঝবে না। কোনও পুরুষ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব কি না জানি না।

মণীশ বলেন— বুঝব না কেন? একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি কাঁদছিলে আমি টের পাইনি বুঝি? জানালায় মুখ রেখে নদীর দিকে মুখ দিয়ে কাঁদছিলে। ভেবেছিলে কেউ বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি। যতই গোপন করার চেষ্টা করো তোমার পিঠ কাঁপছিল কান্নার দমকে।

ক্ষমা হঠাৎ খুব আশ্চর্য হয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চোখে তাকায় মণীশের মুখের দিকে— তুমি সেদিন সত্যি বুঝেছিলে আমি কাঁদছি? কই এতদিন এ-কথা বলোনি তো।

মণীশ বলেন— কী বলব? বলার কী আছে? আমি চুপ করে তাকিয়ে শুধু নিজের মনে বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে মেয়েদের কাছে ঘর জিনিসটার অর্থ আসলে ঠিক কী? ঘর নিয়ে আসলে ঠিক কী করতে চায় তারা—

ক্ষমা ঈষৎ রহস্যের হাসি হেসে বলে— অর্থ খুঁজে পেয়েছ তারপর?

মণীশ অন্যমনস্কভাবে বলেন— জানি না। তারপর যেন হঠাৎ খুব সচকিত হয়ে বলেন— তা তোমার সমস্যাটা এখন কী শুনি ক্ষমা?

ক্ষমা বলে— তোমরা কি চোখে ঠুলি এঁটে থাকতে ভালবাস? সমস্যাটা কী এখনও বুঝলে না? ওই মেয়ে বউ

হয়ে আসবে আমাদের ঘরে? সেদিন একটা পোশাক পরে এসেছে খোকার সঙ্গে— হাঁটু অবধি কালো টাইট প্যান্ট— হাঁটু বেরিয়ে আছে পুরুষ্ট ফর্সা পায়ের গোছা— ইতিহাস বইয়ে ক্লাইভ হেস্টিংসের যেরকম ছবি দেখতাম সেরকম।

মণীশ বলেন— তাতে কি খারাপ লাগছিল দেখতে। চোখের নজর একটু পাল্টালে দেখবে খুব খারাপ নয়।

ক্ষমা প্রায় চেঁচিয়ে বলে— খারাপ লাগবে কেন? অমন ধবধবে ফর্সা মসৃণ পা— বেশ ভাল লাগছিল দেখতে। পুরুষদের পক্ষে একটু বেশি ভাল।

মণীশ মৃদু হাসলেন। বলেন— পুরুষদের দেখাবার জন্য কিন্তু এ-পোশাক পরে না এরা। এরা বলে আমার শরীরটা যখন আমারই তখন আমাদের পছন্দ মতো পোশাক পরার অধিকার আমাদের থাকবে না কেন? পুরুষরা নজর দেবে বলে আমরা নিজেদের মতো পোশাকও পরতে পারব না? পুরুষদের এত গুরুত্ব দেওয়া হবে কেন?

ক্ষমা বেশ অবাক হয়ে মণীশকে বলেছিল— তার মানে? তোমার আপত্তি নেই ওরকম পুরুষালি মেয়েকে বউ করে ঘরে নিয়ে আসতে?

মণীশ বলেন— ওরা নিজেদের ঘর নিজেরা তৈরি করবে— আমরা সেখানে বাধা দেওয়ার কে ক্ষমা? আমরা সেখানে অবান্তর, বাইরের লোক মাত্র।

ভয়ে ক্ষমার মুখ প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল। হয়তো আশা করেছিল মণীশের কাছ থেকে অন্তত কিছুটা মানসিক সমর্থন পাবে সে কিন্তু স্বামী হয়ে মণীশও তার সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ বোধহয় তার ধারণার অতীত ছিল।

ক্ষমা কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করে— তুমি সত্যি করে বলো তো ওরকম পোশাক পরে ও আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে সবসময়ে— খোকাকে হাই হাই বলে ডাকবে এ তুমি সহ্য করতে পারবে?

মণীশ বলে— সহ্য তো করা উচিত ক্ষমা, আমাদের যখন বিয়ে হল তখনও ঘোমটা জিনিসটা লোপ পেয়ে যায়নি। চল্লিশ বছর আগের বউভাতের পরের দিনের সেই রাতটার ছবি আমি যতদিন বাঁচব আমার মনে থাকবে ক্ষমা। পরদিনই কাকদ্বীপ থেকে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে। কলকাতায় একটু কাজ ছিল। রাতে বাড়ি ফিরছি আমার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম আমার বিছানার মশারি খাটিয়ে দিচ্ছে নীল শাড়ি পরা একজন মানুষ— মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টেনে দেওয়া। এমন অভিনব সেই ছবিটা— আমার ঘরে ঘোমটা মাথায় কে ওই রমণী? আমার স্ত্রী? এত রহস্যময় স্ত্রী এই শব্দটি। জানো ক্ষমা আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সেদিন অনেকক্ষণ দেখছিলাম তোমাকে। কিন্তু ঘোমটার আড়ালে ভাল করে দেখা যায় না মুখটা। মাঝে মাঝে ঘোমটা খসে পড়লে খোঁপা বাঁধা তোমার কালো একতাল চুল— দেখা যাচ্ছে। পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে মুখেরও একটু অংশ। আবার মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেই আড়াল হয়ে যাচ্ছে মুখটা। জানো ক্ষমা, ঠিক বর্ষার নীলচে কালো মেঘের মতোই সেদিন রহস্যময় মনে হয়েছিল ঘোমটার ওই আড়ালটুকুকে— কিন্তু এই চল্লিশ বছরেই কোথায় লোপাট হয়ে গেল সেই ঘোমটা। কোনও বউ আর মাথায় ঘোমটা দেয় না এখন না? নিজেদের কেমন নিষ্ঠুরভাবে রহস্যহীন করে তুলল তারা।

ক্ষমা বলে— মেয়েরা সব ছেলে হয়ে গেল— ঘোমটা আর দেবে কেন?

মণীশ হো হো করে হেসে উঠে বলেন— তা বলে নিশ্চয়ই তুমি আশা করতে পারো না যে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা একটি মেয়ে লজ্জাবতীর মতো মাথায় ঘোমটা দেবে।

ক্ষমা বলে— কী দরকার ছাই মেয়েদের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার তাও তো বুঝি না।

মণীশ হঠাৎ কেমন গম্ভীর সুরে বলেন— তা হয় না ক্ষমা তা হয় না। পৃথিবীর সব কিছু পাল্টে যাবে, সবকিছুই সময়ের নিয়মে সামনের দিকে এগুবে, শুধু মেয়েরাই থেকে যাবে যেখানে ছিল সেখানে তা কখনও হয় না। তা হওয়া সত্যি কি উচিত বলে মনে হয় তোমার ক্ষমা। মেয়েরা তো আর পাহাড় পর্বত আকাশ বা নদী নয় যে বিক্রমাদিত্যের সময়ে যেরকম ছিল আজও সেরকমই থাকবে।

ক্ষমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণীশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে— যতই তুমি আজকালকার মেয়েদের পক্ষ নিয়ে সাফাই গাও আমি চিনি না তোমাকে ভেবেছ? মেয়েরা শুধু মেয়েদের মতোই থাকুক মেয়েরা শার্ট প্যান্ট পরবে না, ফুটবল ক্রিকেট খেলবে না। মেয়েদের মাথায় নীল মেঘের মতো ঘোমটা থাকবে এ তুমিই সবচেয়ে বেশি করে চাও। আমাকে তুমি উলটো বোঝাবে ভেবেছ?

মণীশ বলেন— এককালে তাই ভাবতাম সত্যি ক্ষমা— এখন আর ভাবি না। এখন ভাবি মানুষের সভ্যতার গতিই তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত অবস্থা থেকে ক্রমশ উন্নততর অবস্থার দিকে যাওয়ার। কোনওক্রমেই এই উন্নতি তো আর থমকে থাকতে পারে না। কাজেই উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো মূর্খতাও আর কিছু নেই। মেয়েরা সেই আগেকার মেয়েদের মতোই থেকে যাক এরকম কুসংস্কার আজ আর নেই আমার।

লীনা বলেছিল চাকরি না পেয়ে সে কক্ষনো বিয়ে করবে না। সে প্রশ্নই ওঠে না। স্বামীর গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে অসম্মানের আর কিছু হতে পারে না। রেজাল্ট বেরুবার আগেই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে একটা নামী বেসরকারি কনস্ট্রাকশন ফার্মে চাকরি পেয়ে গেল লীনা। অর্কর চেয়ে মাইনে বেশ কিছু বেশিই।

অর্ক বোধহয় অল্প ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিল।

রসিকতার ছলে বলে লীনাকে— যাক এবার আমিই তাহলে তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকব বলো—

লীনা ঠোঁট কুঁচকে বলেছিল— বোকার মতো কথা বোলো না অর্ক— তুমি আমার গলগ্রহ হয়ে থাকবে— তুমি ভেবেছ আই উইল অ্যালাও দ্যাট? এ দুনিয়ায় কেউ কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবে না, সবাই স্বাধীন।

বিবাহ তখনও হয়নি দু'জনের। বিয়ের আগেই এভাবে কথাবার্তা চলত দু'জনের। আর ছেলে ও ছেলের ভাবী বউয়ের এ-আলাপটাই বোধহয় কানে এসেছিল কী করে ক্ষমার। রাতে বিছানায় শুতে যাওয়ার আগে হঠাৎ ক্ষমা প্রশ্ন করেছিল মণীশকে— একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি উত্তর দেবে আমাকে?

ক্ষমার গম্ভীর মুখ দেখে মণীশ রসিকতা করার চেষ্টা করেছিলেন— বাব্বা এই রাত্রিবেলা কী আবার এমন কূট প্রশ্ন ঢুকল মাথায়? দেখো আবার যমকে নচিকেতা যে সব প্রশ্ন করেছিলেন সেরকম প্রশ্নট্রশ্ন করে বসলে কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারব না বাপু—

ক্ষমা খানিকটা অভিমানের সুরেই বলেছিল— তুমি আমার

সব কথাই হালকাভাবে নেবে? জবাব দেবে না আমার প্রশ্নের—

মণীশ বলেছিলেন— আচ্ছা, আচ্ছা জবাব দেব। বলো—

ক্ষমা খানিক চুপ থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল— আমি কি তোমার গলগ্রহ?

খুব গম্ভীরমুখ করে মণীশ বলেন— তাই তো, এটা তো কখনও ভেবে দেখিনি। দাঁড়াও দাঁড়াও একটু ভেবে দেখতে হচ্ছে তো— খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

ক্ষমা বলে— তুমি খালি ঠাট্টাই করবে? কিছুতেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না, না?

— আরে বাবা, দেব না কেন? কিন্তু এই রাত্রিবেলা হঠাৎ এসব প্রশ্ন তোমার মাথায় এল কেন তাই তো বুঝতে পারছি না।

— কেন আসবে না? সারাজীবন তোমার রোজগার করা টাকাতেই তো খেয়েপরে গেলাম— তুমিই তো খাইয়ে দাইয়ে রাখলে আমাকে— এ-প্রশ্ন মনে আসা কি খুবই অস্বাভাবিক?

খুব হালকা গলায় মণীশ বলেন— খাইয়ে দাইয়ে রেখেছি কি সাধে। প্রাণের দায়ে। প্রাণসখা, স্রেফ প্রাণের দায়ে। মাঝে মাঝে যখন অপ্রসন্ন হও দেবী তখন যা মহিষাসুরমর্দিনী রূপ তোমার— ভয়ে প্রাণ তখন খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম— তখন মনে মনে বলি— যা চাইবে দেবী তাই এনে দেব, শুধু অনুগ্রহ কর দেবী, প্রসীদ—। একটু প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাও যে তোমার গলগ্রহ হয়ে আছে— তার দিকে।

ক্ষমা একটু অভিমানক্ষুণ্ণ গলায় বলে— পাড়ার ক্লাবে যে আগে নাটক করতে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেলাম না।

এবার একটু গম্ভীর সুরেই মণীশ বলেন— এই উত্তর কি সহজে দেওয়া যায় ক্ষমা এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না।

সত্যই এ-প্রশ্নের উত্তর শেষ অবধি জেনে যেতে পারেনি ক্ষমা।

(৭)

মনোরমা তাঁর ঘর শূন্য করে চলে গেলেন। তাঁর ছবিও উঠে এল মণীশ আর ক্ষমার ঘরে। মনোরমার শূন্য ঘর ফাঁকা পড়ে থাকে। ফাঁকা ঘর প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয়, এ-বাড়িতে ছিল আগে একজন, এখন নেই। ক্ষমার বুকের মধ্যে হুহু করতে থাকে। কিন্তু স্থান পূরণ চলতেই থাকে জীবনের— মনোরমার শূন্য ঘরে এবার উঠে আসে অর্ক আর লীনার ছবি। ওদের বিয়ের ছবি নয়, এমনকী বিয়ের পরের ছবিও নয়। পূর্বরাগের সময়ের ছবি ওদের। অর্ক বসে আছে একটা চেয়ারে, পিছনের দিক থেকে সেই চেয়ারে একটা পা তুলে দিয়ে লীনা সামনে ঝুঁকে পড়ে হাসিমাখা মুখে কী যেন একটা খুব সোহাগের কথা শোনাতে চাইছে অর্কের কানে কানে— একটা টপ আর একটা টাইট জিনসের প্যান্ট পরা লীনার। টপটা ঢিলে লীনার। সামনে ঝুঁকে পড়ার ফলে বুকের—

টেবিলে রাখার মতো আর কোনও ছবিও খুঁজে পেল না খোকা? ছবির দিকে এক লহমা তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল ক্ষমা। নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকেছিল সে। সামনের টেবিলে তাকিয়ে দেখেছিল সেখানে ওর আর মণীশের কোনও যুগল ছবি নেই। একজন ফটোগ্রাফার বন্ধু তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি কিছু তুলেছিল। কিন্তু তাতে তো অনেক লোকের ভিড়। সে-ছবি টেবিলে বা দেওয়ালে রাখার কথা কখনও মনে হয়নি তাদের। শুধু আলাদা করে দু'জনের ছবি তোলার কথা কিন্তু তখন মাথায় আসেনি কারুর। পরে যখন মণীশের মাথায় এল, মণীশ প্রস্তাব দিল ক্ষমাকে দু'জনে একসঙ্গে ছবি তুলবে কয়েকটা—

ক্ষমা বলল— না, না, ঘটা করে ও ছবি রাখতে হবে না তো টেবিলে।

মণীশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে— কেন? সবাই-ই তো রাখে এরকম ছবি।

ক্ষমা লাজুক মুখে বলে— না বাপ, আমরা যে বউ-বর তা ওরকম চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে বোঝাবার কোনও দরকার নেই বাপু। আমরা যা আছি আমরা তো তাই-ই।

মণীশ কিন্তু ওকে নিয়ে সত্যি এমন কোনও ছবি তুলতে পারল না শেষ অবধি— যেরকম ছবি থাকে প্রায় সব নবদম্পতিরই ঘরের দেওয়ালে কিংবা টেবিলে— পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এক মানব আর এক মানবী। স্বাভাবিকভাবেই মানবী দৈর্ঘ্যে কিছুটা খাটো— তার মাথা তার সঙ্গীর কানের কাছে— কিন্তু ছবিটি দেখে মনে হবে যে এজন্য তার মনে যেন কোনও আক্ষেপ নেই— বরং যেন সঙ্গীর তুলনায় এই যে তার খর্বতা এই যেন তার পরম গৌরব, পরম প্রাপ্তি—এরকম একটা গভীর আত্মনিবেদনের প্রচ্ছন্ন শান্তি থাকবে তার চোখেমুখে। পুরুষটি সামনে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার লেন্সের দিকে খানিকটা নিস্পৃহভাবে কিন্তু বোঝা যায় ওই নিস্পৃহতার আড়ালে রয়েছে এক প্রগাঢ় আনন্দ। এক গভীর প্রাপ্তির স্বীকৃতি— এই জীবনে চলার পথে আজ আর সে একা নয়। একা আর তাকে বহন করতে হবে না জীবনের সব সুখদুঃখ— আজ তার পাশে আছে পরম প্রিয় মানুষ একজন যাকে বলা যাবে জীবনের যে সব কথা যা কখনওই বলা যায় না এ-পৃথিবীর কাউকে যা শোনার মতো মানুষও খসে যেতে থাকে ক্রমশ এ-জীবনের আকাশ থেকে।

জীবন ক্রমশ গড়িয়ে যেতে থাকে জীবনের মতোই জীবনের নিজস্ব নিয়মে— কত ছায়া অন্ধকার, কত ক্লেদ গায়ে মেখে কত দুঃস্বপ্নের খাত পেরিয়ে, মৃত্যু হয় কত স্বপ্নের কত সুগন্ধের কিন্তু অনশ্বর ওই ছবিটি থেকেই যায়— ওই এক নারী এক পুরুষ— পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন, একে অন্যের চোখ থেকে যেন জীবনের মাধুর্য শুষে নিচ্ছে— কত কিছু পালটে যাচ্ছে এ-জীবনের কিন্তু ওরা দু'জন দু'জনের পাশে দাঁড়িয়েই আছে কতকাল ধরে।

মণীশ যেন ওই ছবিটুকুই এই অস্থির চঞ্চল সময়ের পটে স্থির বাঁধিয়ে রাখতে চেয়েছিল— মৃত্যুও এসে যাকে মুছে দিতে পারবে না। তাদের দু'জনের জীবনের এই সময়টুকুকে অমর করে ধরে রাখতে দেবে না ক্ষমা?

ক্ষমা শেষে রাজি হয়েছিল অবশ্য স্টুডিওতে গিয়ে দু'জনের ছবি তুলতে— কিন্তু তা একটি শর্তে। সে ছবি কখনও দেওয়ালে টাঙাতে বা টেবিলে রাখতে পারবে না মণীশ। এছবি শুধু তাদের বাক্সেই গোপন থাকবে। কেননা, এ ছবি একান্তভাবে শুধু তার আর মণীশেরই।

নিজের ঘরে বসে এই সবই ভাবছিল ক্ষমা। ছেলের ঘরে তারপর আর বেশি ঢুকত না ক্ষমা, যেন সেটা পরের ঘর। ক্ষমার মনে হত খোকা আর খোকার বউও যেন চায় না ক্ষমা ওদের ঘরে ঢুকুক— এঘরটা যেন শুধুমাত্র তাদের

দু'জনেরই— আর কারুর নয়।

অর্ক একদিন বলেওছিল ক্ষমাকে— মা, হুটহাট করে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ো না যেন—

ক্ষমা চুপ করে ছিল। অর্ক বলে— ঘরে কিন্তু আমাদের অনেক কাগজপত্র থাকে মা, ছড়ানো ছিটানো অফিসের কাগজ— একটা হারালেও চাকরি চলে যাবে আমাদের।

লীনা পাশে চুপ করে বসে ছিল। লীনাই এবার কথা বলে— খুব শান্ত গলায়— আসলে আপনি বুঝতে পারছেন না মাসিমা, (বিয়ের পর এখনও ক্ষমাকে মাসিমা বলেই সম্বোধন করে লীনা) দারুণ কমপিটিশনের মার্কেট এখন— কর্পোরেট হাউসগুলোর মধ্যে খেওয়োখেওয়ি, পারলে এ ওর গলা কাটে। বাজারে টিকে থাকতে গেলে তো করতেই হবে এসব। বাজার তো আর কারুর কথা শুনবে না মাসিমা। তার কোনও দায় পড়েনি। অফিসের কিছু কনফিডেনশিয়াল ফাইল আমাদের কাছে থাকে— আমাদের প্রোজেক্টের অত্যন্ত সিক্রেট কিছু ডকুমেন্টস। তার একটাও যদি অন্য কোনও হাউসের হাতে গিয়ে কোনওরকমে পড়ে তাহলে তার ফায়দা তুলে নেবে ওরা। আমরা তো সেটা কখনওই চাইব না মাসিমা— আপনি নিশ্চয়ই মানবেন এটা।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে ক্ষমা আস্তে আস্তে বলেছিল— আমরা পুরনো বোকাসোকা মানুষ বউমা, অতশত তো বুঝব না। আমরা জেনে এসেছি মানুষের নিজের ঘরটা তো ঘরই— একান্তই তার নিজের— সম্পূর্ণ মালিক সে নিজেই। সেখানেও অন্য কোনও মালিককে এনে ঢোকাতে হবে— তার ইচ্ছেমতো চলতে হবে— তাহলে মানুষের কি নিজের ঘর বলে কিছুই থাকবে না আর?

লীনা খানিকটা বিরক্তির সুরে বলেছিল— আপনি বউমা বলে ডাকেন কেন আমাকে মাসিমা? অনেকবার তো বারণ করেছি আপনাকে। আমি কি খালি আপনার ছেলের বউ? আমার তো নিজের একটা আলাদা নাম আছে— আমার নামে আমাকে ডাকতে আপনার অসুবিধে কোথায়?

ক্ষমা খানিকটা কুণ্ঠিত গলায় বলে— জানি তুমি আলাদা একজন মানুষ কিন্তু সবসময়ে সেটা খেয়াল রাখতে পারি না। পুরনো দিনের অভ্যাস মা, ছাড়তে কিছুটা সময় লাগবে।

লীনা গম্ভীর গলায় বলে— আপনি কিন্তু আমাদের কথাটা বুঝতে পারেননি মাসিমা? মানুষ তো শুধু তার ঘরটুকু নিয়েই বাঁচতে পারে না। সেটা আমিও পারব না, আপনার ছেলেও না। আমাদের কেরিয়ার আছে মাসিমা, আমাদের অ্যামবিশন আছে, তাই যদি না থাকে তাহলে আর খালি খালি পড়াশোনা করলাম কেন এতদিন।

ক্ষমাও চুপ করে থাকে। সেই বা নিজের কথা কী করে বোঝাবে ওদের বুঝে পায় না। দু'জনে থাকে পাশের ঘরে যেন স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়, যেন হস্টেলের রুম মেটদের মতো— ব্যাচেলররা যেরকম থাকে সেরকম।

ক্ষমা ভাবে লীনা তো বাইরের মেয়ে, সেদিন এ-সংসারে এসেছে কিন্তু অর্ক তো বহুদিন থেকেই আছে এ-বাড়িতে, লীনাকে বিয়ে করার অনেক আগে থেকেই। জন্ম থেকেই এ-বাড়িতে বসবাস তার তবুও এতদিনের বাড়ি, তার আশেপাশের জায়গা মানুষজন সম্পর্কে কোনোদিনও কোনো মায়া বা পিছটানের কথা তাকে বলতে শোনেনি ক্ষমা। বরঞ্চ সে সবসময়ে যেন পা বাড়িয়েই আছে এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য। যেন ছোটবেলা থেকেই তার কানে কানে কেউ বলে দিয়েছে এ-জায়গা তার জন্য নয়। পৃথিবীর কোনও জায়গাই কি এদের জন্য— ভাবে ক্ষমা। কেমন একটা উড়ু উড়ু উদাসীন ভাব, যেন পৃথিবীর মাটিতে পা না ঠেকিয়েই দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে তারা। ঠিক বুঝতে পারে না এদের ক্ষমা, দশমাস দশদিন গর্ভে লালন করা সন্তানকে সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ বলে ভ্রম হয়।

নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে ক্ষমার। ক্ষমার বাবা ছিলেন রেলের স্টেশন মাস্টার। বদলির চাকরি ছিল তার। চার-পাঁচ বছর পর পরই বদলি। রেলের কোয়ার্টারে থাকত তারা। বদলি হলে পাঁচ-ছ' বছরের ঘরকন্না উপড়ে ফেলে আবার নতুন কোয়ার্টারে চলে যেতে হত নতুন সংসার পাততে। কী যে কষ্ট হত এখনও মনে আছে ক্ষমার। কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাওয়ার শেষ দিন ক্ষমার মা লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মুছতেন। ভীষণ মন খারাপ নিয়ে ক্ষমা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করত তার মাকে কিন্তু সবসময়ে পারত না। মা-র কান্না দেখে নিজেও কেঁদে ফেলত। মায়া, সব কিছুর জন্যই। বড্ড মন কেমন করা মায়া। ক্ষমার মা-র শখ ছিল বাগান করার। নতুন কোয়ার্টারে এসে থিতু হতে না হতেই ক্ষমার মা ফুলফলের গাছ লাগাতেন কোয়ার্টারের উঠোনে। শিউলি, গন্ধরাজ ফুলের গাছ কলমের আম। কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যেতে হত যখন তখন সে-গাছ বড় হয়ে উঠেছে। কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় মা সেই গাছ জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন— যাই রে যাই, ভাল থাকিস তোরা। পাতায় ডালে হাত বুলোতেন যেন নিজের পেটের সন্তান তারা। মা-র ছিল একেবারে মায়ার শরীর। অত কান্নাকাটি না করলেও ক্ষমারও কষ্ট হত খুব এতদিনের পরিচিত সব কিছু ছেড়ে যেতে। তবুও মা-র কান্না দেখে মাকেই সেই সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত থাকত। আর দুঃখ হত এই বছরে বাড়িতে যে রাস্তার কুকুরগুলি এসে ডেরা বাঁধত—উচ্ছিষ্ট এঁটোকাঁটা খেয়ে যারা বাড়ির পোষা হয়ে যেত তাদের ছেড়ে চলে যেতে। গাছপালা তাও কথা বলতে পারে না তারা শুধু তাদের নিঃশব্দ অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু কুকুর-বিড়াল তো তা নয়, তাদের চোখের চাউনি আছে, নিজেদের ভক্তি ভালবাসা প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে—তাদের ছেড়ে যাওয়া ছিল যেন আরও কষ্টের। কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় মা আয় আয় করে ডাকতেন তাদের— বিস্কুট, পাঁউরুটি, রুটি—শেষবারের মতো তাদের এইসব খাইয়ে যাওয়ার জন্য। কুকুরগুলোও কি বুঝত? মুখ তুলে কিরকম অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকত তারা। প্রায় মানুষের চোখেই তারা যেন তাকিয়ে থাকত। সবকিছু কি তারা বুঝতে পারত তাহলে? তাদের বুকেও কি বড় মায়া থাকত?

বসে বসে ভাবে ক্ষমা, ভাবতেই থাকে। মায়া কি তাহলে একটা নিম্নস্তরের মানসিক বৃত্তি যা সমস্ত সভ্যতায় অগ্রগমনের বিরোধী? মায়া মানেই বন্ধন, গতিহীনতা, এক জায়গায় আটকে যাওয়া? তাই এদের কোনওকিছুরই উপর কোনও মায়া নেই? অর্ক, লীনা যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করে তাতে যেন তাই মনে হয় ক্ষমার। ভালবেসে পরস্পরকে বিয়ে করেছে তারা কিন্তু ঘর বেঁধেছে কি? যেভাবে থাকে দু'জনে তাকে কি ঘর বাঁধা বলে ক্ষমা বা মণীশের যে-ধারণা ছিল ঘর সম্বন্ধে। সত্যই যাকে বলে ঘর তা যে তারা বাঁধতে চায় না তা এভাবে একদিন টের পাবে বুঝতে পারেনি। মনোরমা বেঁচে থাকার সময়েতেই তো অর্ক চেয়েছিল এই বাড়ি থেকে

চলে যেতে। মুখে না বললেও ক্ষমা ওদের নিজেদের ভিতর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছিল সল্টলেকে একটা খুব বড় ফ্ল্যাট বুক করার চেষ্টায় আছে ওরা। খুবই পশ এলাকা নাকি সেটা, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে একেবারে আমেরিকা উঠে এসেছে কলকাতায়।

অর্ক বোধহয় একদিন বুঝতে পারে এই কথাটা এতদিন গোপন করা হলেও এবার প্রকাশ করার সময় হয়েছে। কথাটা জানা দরকার ক্ষমা আর মণীশের।

ক্ষমা বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিল অর্ক ঘরে ঢুকে বলে— একটা কথা বলছি তোমাকে মা—

ক্ষমা বিছানায় উপর এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে বসে যে মনে হতে পারে নিজের পেটের সন্তান নয়, অচেনা অন্য মানুষ যেন কেউ যার সঙ্গে এরকম ভদ্রতা করতে হয়। নিজের মনে মনেই ভাবে ক্ষমা, ছেলে কি তার সত্যই এত দূরের মানুষ হয়ে গেল যে তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে হচ্ছে? ক্ষমা বিছানায় হাত চাপড়ে বলে— বোস এখানে। অর্ক বসে না। নানা কাজে ব্যস্ত সে। ক্ষমার পাশে বসে গল্প করার সময় নেই।

অর্ক বলে— না বসব না, একটা কথা তোমাকে বলতে এলাম—

ক্ষমা চোখ তুলে তাকায়। 'মা' সম্বোধনটুকু যেন অত্যন্ত গোপনে প্রত্যাশায় করে সে— কিন্তু কতদিন যে সত্যি অর্ক তাকে মা বলে আর সম্বোধন করে না তা যেন আর মনে পড়ে না। এবারও অর্ক কোনওরকম সম্বোধন না করেই বলে— একটা কথা বলতে এসেছি তোমাকে, আমরা একটা ফ্ল্যাটের সন্ধানে আছি সল্টলেকে। এখান থেকে অফিসে যাতায়াত করতে সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি আর লীনা দু'জনে মিলেই কিনব ফ্ল্যাটটা। খুব বড় নয় অবশ্য কিন্তু তুমি আর বাবা চলে আসতে পার।

ক্ষমা মনে মনে একটু আহত হন। কথাটা এভাবে বলল কেন অর্ক যে ও আর লীনা মিলে কিনছে। অর্থাৎ বোঝাতে চাইছে কি যে ফ্ল্যাটটায় পুরো হক নেই অর্কর নিজের— সুতরাং, ও আর মণীশকে যদি থাকতে হয় তাহলে লীনার কেনা জায়গাতেও থাকতে হবে অংশত। এ কি আসলে তাদের ওদের ফ্ল্যাটে যেতে নিরুৎসাহিত করা? সে-ইচ্ছেটা ও এভাবে ঘুরিয়ে প্রকাশ করল।

ক্ষমা একটু বিমর্ষ হাসি হেসে বলেন— না বাবা, ছোট ফ্ল্যাট হলে আমাদের আর জায়গা হবে কী করে? তাছাড়া বাচ্চাকাচ্চা হলে।

হঠাৎ লীনাও বেরিয়ে আসে পাশের ঘর থেকে। ক্ষমার বিছানার কাছে এসে বলে— সেটা আপনি ভাববেন না মাসিমা, আমি আর অর্ক ঠিকই করে রেখেছি আমরা বাচ্চাকাচ্চার ঝামেলার মধ্যে থাকবই না। আপনার ছেলের কথা আমি জানি না সামনের কয়েকটা বছর আমার একেবারে টাইট শিডিউল, নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। এর মধ্যে বাচ্চাকাচ্চার ট্যাঁ ট্যাঁ— উঃ হরিবল! আই কান্ট সিমপ্লি থিংক অর ইট! তিন বছরের মধ্যে প্রোজেক্ট কমপ্লিট করে রিপোর্ট জমা দিতে হবেই হবে। এর উপর নির্ভর করছে আমার পরের প্রোমোশন। আই কান্ট অ্যাফর্ড টু মিস ইট।

অর্ক বলে—কী হল? কী ভাবছ তুমি?

যেন চেতনায় ফিরে আসে ক্ষমা। লীনাকে কথাগুলি বলা যায় না বলে অর্কর দিকে তাকিয়ে বলে ক্ষমা— বাচ্চাকাচ্চা ঝামেলা কী রে? তাহলে তো বেঁচে থাকাটাই তো একটা ঝামেলা।

লীনা অকপটে বলে— ওকে বলছেন কেন মাসিমা? সিদ্ধান্তটা মূলত আমার। বাচ্চাকাচ্চার দায়িত্ব প্রায় সবটাই মেয়েদেরই নিতে হবে কেন? মেয়েদের জীবনের একমাত্র কাজ কী বাচ্চা বিয়ানো আর তাদের মানুষ করা? জীবনের আর সব কাজ পুরুষরা করবে আর মেয়েরা শুধু বাচ্চা মানুষ করেই যাবে?

ক্ষমা শান্ত গলায় বলে— পুরুষরা যে বাচ্চা বিয়োতে পারে না বউমা। কিন্তু বাচ্চা মানুষ করায় পুরুষদের কোনও হাত থাকে না— একথা তো ঠিক নয়। যাই হোক এ তোমাদের সিদ্ধান্ত আমার তো বলার কিছু নেই।

এরপর অর্কের দিকে তাকিয়ে বলে ক্ষমা— তোদের ফ্ল্যাটে জায়গা কম আমরা দু'জনে সেখানে গিয়ে কী করব বল। বাচ্চাকাচ্চা যদি থাকত তারা ছোটাছুটি করে বেড়াত ঘরের মধ্যে— ঘরটাই তখন মাঠের মতো বড় মনে হত। না বাবা, আমরা বড় মানুষ, আমরা গেলে ঘরটা তখন আরও ছোট মনে হবে।

অর্ক বলে— যাই হোক মা তোমাকে বলে গেলাম। এবার তুমি আর বাবা বসে ঠিক করো কী করবে তোমরা।

মা! কতদিন পর তাকে মা বলে সম্বোধন করল অর্ক— তার ছেলে যে যেন কোন ভিনগ্রহের মানুষ— এ-পৃথিবীর অন্তত নয়! যার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই মনে হয় কল্পবিজ্ঞানে পড়া গ্রহান্তরের কোনও অচেনা প্রাণীর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।— যার সঙ্গে তার প্রকৃত সম্বন্ধ কী ছিল তা সময়ের বালির ঝড়ে চাপা পড়ে গেছে।

সেই সম্বন্ধটাকেই আজ নিজের অজান্তেই কি প্রকাশ করে ফেলল অর্ক?

এসব কথা কাউকে বলা যায় না হঠাৎ কেন অকারণে তার দু'চোখের পাতা যেন ভিজে এল। ছেলের গম্ভীর মুখ ঢ্যাঙা চেহারাটার দিকে তাকায় ক্ষমা আর সঙ্গে সঙ্গে যেন তার সেই জন্মমুহূর্তের কথা মনে পড়ে যায় তার— সেই মাটির দোতলা বাড়ি— বকখালি খালের পাড়ে কলতলার বিশার ঝাঁকড়া গাব গাছটায় সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে— সাঁ সাঁ শব্দ করছে হাওয়া। হাওয়ার এত জোর যে মনে হয় এই মাটির বাড়ি এই গাব গাছ সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে সে। এত ভয়ঙ্কর সেই হাওয়ার বেগ তবুও ক্ষমার মনে কোনও ভয়ের সৃষ্টি হয়নি বরং যেন মজাই লেগেছিল তার। দুরন্ত সরল এক শিশুর মতো মনে হয়েছিল সেই হাওয়াকে। মণীশের সঙ্গে সম্পূর্ণ তৃপ্ত শারীরিক মিলনের পর বড় গভীর মুখে সে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। এই বড় আশ্চর্য নক্ষত্রময় রাত, এই গাব গাছের পাতায় বন্দি হয়ে পড়া সমুদ্র, এই উথালপাথাল হাওয়া যার মধ্যে মাটির ঘরটাকেও নৌকোর মতো মনে হয়। এই যে এখানকার সরল শিশুর মতো মানুষগুলি যাদের মন এতটাই সৃষ্টিপ্রবণ যে গাবগাছের কস দিয়ে নৌকোর গাওনা হয় বলে জায়গাটার নামই তারা দিয়ে দিল কসতলা— এদের মধ্যেই আজ মিলন হয়েছে তার সঙ্গে মণীশের। বড় পূর্ণ তৃপ্ত মিলন যেন, ভয় হয় এমনকী কেমন যেন কান্নাও পায়। এই স্বর্গীয় আনন্দ ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তকে কি আনন্দিত করে রাখতে পারবে? বাস্তব জীবন যে বড় কঠিন বড় রুক্ষ। তবু সে সব কান্না ভুলে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে সে ভাবছিল এই মুহূর্ত থেকেই কি একটি ভ্রূণের জন্মপ্রক্রিয়া শুরু হল তার

গর্ভে? এই রাত, এই সমুদ্রের শব্দ, এই হাওয়ার উল্লাস— এরাই কি জন্ম নিতে শুরু করল এই ভ্রূণের মধ্য দিয়ে। ক্ষমার কেমন যেন মনে হয়— বস্তুত মণীশের সঙ্গে নয়, মিলন হল তার যেন এই হাওয়া এই সমুদ্র এই নক্ষত্রের সঙ্গে— জৈব শারীরিক মিলন। কীরকম হবে তার এই মিলনজাত সন্তান? এই হাওয়ার মতো? এই নক্ষত্রের মতো? মিলনসুখের আবেশে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবে সে।

ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া অর্ককে পিছন দিক থেকে একবার দেখে ক্ষমা। এই কি তার গর্ভজাত সন্তান? এরই স্বপ্ন সে দেখেছিল সেদিন সেই মিলনসুখের রাতে?

সারা জীবন নৌকোয় নৌকোয় ঘুরে বেড়াতে হবে বলে কীরকম দুঃখ, ক্ষোভ কিছুটা যেন ভয়ই ছিল ক্ষমার মনে কিন্তু আজ বেশ কয়েকদিন ধরে ভুলে-যাওয়া সেই হাওয়া আর সমুদ্রের শব্দ কেন যে তার বুকের মধ্যে উঠে আসছে কে জানে? কেন?

(৮)

পরদিন সকালে দরজায় কলিং বেল বেজে উঠতেই দরজা উঠে খুলে দেন মণীশ। দরজায় দাঁড়িয়ে এক সুদর্শন যুবক। মিষ্টি হাসি মাখানো কৌতুকে ভরা মুখ। দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করে বলে— আমি পরমেশ ধর, মেসোমশাই। স্যর আমাকে পাঠিয়েছেন।

মণীশ বলেন— হ্যাঁ, আসুন, ভিতরে আসুন।

কমপিউটারের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওকে বসান মণীশ। নিজের মনে বেশ কৌতুকবোধ করেন তিনি। অর্কর কাছে লোকটির কথা শুনে তার যে-চেহারা তিনি মনে মনে এঁকেছিলেন চোয়াড়ে মুখ, কুটিল চাউনি, সন্দিগ্ধ ভাবভঙ্গি— তার সঙ্গে কত তফাত আসল লোকটির। এই লোকটি ইউনিয়ন করে? মানুষের কল্পনার সঙ্গে কত তফাত থেকে যায় বাস্তবের।

কম্পিউটার টেবিলের সামনে টুলে এসে বসে পরমেশ।

মণীশ বলেন— কতক্ষণের কাজ আপনার?

পরমেশ হেসে বলে— তা ঘণ্টা তিন চারেক লাগবেই তো অনেক ডাটা আছে তা সব লোড করে নিতে হবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না মেসোমশাই। দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান— কাজ শেষ হলে আপনাকে ডাকব।

ক্ষমা চা, ডিমের ওমলেট আর মিষ্টি প্লেটে করে টেবিলে রেখে যায়।

পরমেশ লজ্জিত গলায় বলে— না, না, এসব আবার কেন?

মণীশ বলেন— আপনি প্রথম এলেন আমাদের বাড়ি— কিছু মুখে না দিয়ে চলে যাবেন তা কি হয়?

পরমেশ দ্বিধাজড়ানো গলায় বলে— আসলে আমি ঠিক আপনার বাড়িতে নয়, এসেছি একটা অফিসিয়াল কাজে। স্যর একেবারেই চান না অফিসিয়াল কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যাপার মিলেমিশে যাক। জানতে পারলে রাগ করবেন।

মণীশ বলেন— ঠিক আছে জানাবেন না আপনার স্যরকে তাহলেই তো হয়, আপনার স্যর যেমন অফিসিয়ালি সব কিছু দেখতে ভালবাসেন আমরাও তো তেমনি অন্যভাবে সব কিছু দেখতে চাইতে পারি। আপনার স্যর তো আর আমাদের বস্ নন।

কেমন কৌতুক আর কৃতজ্ঞতা মেশানো হাসি ফুটে ওঠে পরমেশের ঠোঁটের কোণে।

—আপনি কিন্তু একেবারেই স্যরের মতো নন।

মণীশ বলেন— দু'জন মানুষ কি আর একে অন্যের মতো হয়। আমি কি আপনার পাশে একটু বসতে পারি?

পরমেশ বলে— হ্যাঁ হ্যাঁ মেসোমশাই বসুন না। কাজ করতে করতে একটু গল্প করি।

মণীশ বলেন— দেখুন কম্পিউটার অনেকদিন থেকেই আছে এ-বাড়িতে আপনার স্যর কাজ করেন কম্পিউটার নিয়ে কিন্তু আমি কোনওদিনও তার পাশে বসে দেখিনি কম্পিউটার কী করে অপারেট করে।

পরমেশ হেসে বলে— স্যর ওরকমই মেসোমশাই, ভীষণ কাজপাগলা, কাজের সময়ে কোনও আড্ডা কোনও ব্যক্তিগত কথাবার্তা একদম পছন্দ করেন না। উনি বলেন, কাজ করার চেয়ে বড় কাজ মানুষের আর কিছু নেই। এসব ব্যক্তিগত আলাপ আড্ডা এ হল কাজ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা— এ হল একরকমের পাপ। এজন্য স্যরের খুব তাড়াতাড়ি একটা প্রমোশনও হবে। হায়ার অথরিটি খুব খুশি স্যরের কাজে।

কথা বলতে বলতেই মাউস ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দ্রুত কিবোর্ডে টাইপ করে যায় পরমেশ। অনুসন্ধিৎসু চোখে দ্যাখেন মণীশ। কম্পিউটারের সামনে আগে কখনও তাকে বসতেই দেয়নি অর্ক।

মনিটরে ফুটে উঠছে কতরকমের ছবি কতরকমের লেখা। মুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে বলেন মণীশ— আচ্ছা, একটা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন না।

একটু দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন মণীশ— আচ্ছা, কম্পিউটারে কি সত্যি ভাগ্যগণনা করা যায়?

হো হো করে হেসে ওঠে পরমেশ।

—ভাগ্যটাগ্য আমি বিশ্বাস করি না মেসোমশাই। আর কম্পিউটার কি মানুষ যে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করবে? মানুষ যা চিন্তাভাবনা করে তাই তো কম্পিউটারের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়— কম্পিউটারও সেভাবেই ভাবে। কোনও মানুষ যদি মনে করে ভাগ্য বলে কিছু আছে এবং তা আগেভাগে গণনাও করা যায় তাহলে কম্পিউটারকে তারা সেরকম ভাবাতে শেখাবে— কম্পিউটারও সেরকম ভাববে।

বস্তুত কম্পিউটার সম্বন্ধে মণীশের ধারণা প্রায় শিশুর মতো। অদ্ভুত অদ্ভুত জিজ্ঞাসা আছে তার কম্পিউটার সম্বন্ধে যা কাউকে বলতেও সে সাহস পান না। কী করে কম্পিউটারকে মানুষ ভাবায় এর কী রহস্য না বুঝতে পারলেও এ নিয়ে তাই কোনও প্রশ্ন করেন না মণীশ।

পরমেশ হেসে বলে— ভাগ্য গণনা করতে পারুক না পারুক কম্পিউটার আরও অনেক এমন জিনিস সম্ভব করতে পারে যা দেখলে সত্যই অবাক হয়ে যেতে হয়।

কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করেন মণীশ— সেটা কেমন?

পরমেশ হেসে বলে— আমরা যে এ-জায়গায় এখন বসে আছি এ-জায়গাটা মনিটরের স্ক্রিনে ফুটে উঠবে দেখবেন? মনিটর মানে টিভির মতো দেখতে এই জিনিসটা— টিভির কোন অংশটা মনিটর তা যে মণীশ জানেন না তা বুঝেই কথাটা যে বলল পরমেশ তা বুঝতে পারেন মণীশ।

মণীশ অবাক হয়ে বলেন— আমাদের এ-জায়গাটা স্ক্রিনে ফুটে উঠবে?

— হ্যাঁ, দেখুন—

এরপর কী সব করে পরমেশ তা ধারাবাহিকভাবে মনে রাখতে পারেন না মণীশ কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সমস্ত টিভির স্ক্রিন জুড়ে ফুটে ওঠে একটা ছবি মনে হয় যেন অনেক উপর থেকে দেখা বাড়ি ঘরদোর রাস্তা গলির একটা ঠাসবুনোট নকশা।

পরমেশ বলে— দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন এটা কলকাতার উত্তরাংশের ছবি। এটা শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়। এই দেখুন সার্কুলার রোড, ওদিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, ওইদিকে সেন্ট্রাল এভিনিউ। এবার দেখুন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে আমরা এগোচ্ছি— এই যে বিডন স্ট্রিট পেরিয়ে গেলাম— এই দেখুন পাশে হেদো— একটু বড় করে দেখাচ্ছি— কী একটা যেন মাউসে ক্লিক করে পরমেশ, দেখা যায় সমস্ত স্ক্রিন জুড়েই হেদোর নীল জল।

হাঁ করে দেখছেন মণীশ। এমন তাজ্জব ব্যাপার যে করা যায় কম্পিউটারে অর্ক তো তা কখনওই বলেনি তাকে। এমন আশ্চর্য ঘটনা অর্ক চেপে রাখল কী করে? তবে কি অর্ক এই ব্যাপারটা জানে না, নাকি এই অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপারটাও অর্কর কাছে এত তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার যে এসব নিয়ে সামান্যমাত্র উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণই খুঁজে পায় না সে। এ তো ছেলেমানুষি ম্যাজিক এসব নিয়ে অর্ক উত্তেজনা বোধ করবে এতটাই কি অনভিজ্ঞ আর অপরিপক্ক সে?

মণীশ বিড়বিড় করে বলেন— সমস্ত পৃথিবীটাই এভাবে দেখা যাবে— বলছেন কী?

মণীশের কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখে হো হো করে হেসে উঠে বলে পরমেশ— কেন দেখা যাবে না? এ তো স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো ছবি। হেদো থাকলে সাহারাও থাকবে। আপনি মিশরের পিরামিড দেখতে চান— উপর থেকে কীরকম দেখায়? দেখাচ্ছি—

অকৃত্রিম উত্তেজনায় মণীশ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না? একি আশ্চর্য কাণ্ড! বরানগরের ঘরে বসে মিশরের পিরামিড দেখা যাবে শুধুমাত্র মাউস ক্লিক করে?

উত্তেজনায় পরমেশের হাত ধরে একেবারে ঘনিষ্ঠ সুরে বলেন মণীশ— পরমেশ, ভাই তুমি আমাকে যা দেখালে তা কী অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের চেয়ে কম আশ্চর্যের নয়। সাহারার পিরামিড তোমাকে দেখাতে হবে না— আমাকে তুমি ভাই একটু পদ্ধতিটা শিখিয়ে দাও তো কীভাবে অপারেশনটা চালানো হল তারপর আমি নিজেই দেখে নেব পিরামিডটা কোথায়— অকৃত্রিম অনুনয়ের সুর ফুটে ওঠে মণীশের গলায়।

পরমেশ হেসে বলে— মেসোমশাই আমার কাজের কী হবে? কাজটা তো শেষ করতে হবে— শেষ না করলে স্যর আমাকে স্পেয়ার করবে না— লিখিত কৈফিয়ত চেয়ে বসবে।

— হবে পরমেশ, কাজ হবে তোমার। তুমি শুধু এটুকু শিখিয়ে দাও আমাকে।

পরমেশ যখন কাজ শেষ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তখন মণীশের মনে হল যেন গোটা একটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয়।

(৯)

তিন বছর হল অবসর নিয়েছেন মণীশ মিত্র। তিন বছরে ছত্রিশবার তিনি ব্যাঙ্কে গেছেন পেনশন নিতে। যতবারই গেছেন পেনশনারদের লাইনে দাঁড়িয়ে— এক বিমিশ্র বেদনা অনুভব করেছেন। জীবন তাঁর সত্যই শেষ হয়ে গেল? লাইনে দাঁড়িয়ে এই অবসরভাতা নেওয়া ছাড়া জীবনে আর সত্যি কোনও কাজ করতে নেই তার? তিনি যে বেঁচে আছেন তার একমাত্র প্রমাণ এই লাইনে দাঁড়িয়ে পেনশনের টাকা তোলা আর বছরে একবার ব্যাঙ্কের কাছে লাইভ সার্টিফিকেট দেওয়া, এটাই জানান দিতে যে তিনি এখনও রক্তেমাংসে বেঁচে আছেন, সত্যিকারের বেঁচে যদি নাও থাকেন। লাইনে দাঁড়িয়ে বিমর্ষ ব্যথায় ভাবতে থাকেন মণীশ মিত্র, বাকিটা জীবন এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে তাঁকে— এই পেনশনের টাকার বেশি অংশটাই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে, কিছুটা তার টেনে টেনে খরচ করে আর হাতের টাকা ফুরিয়ে ফেলতে ফেলতে সাগ্রহে অপেক্ষা করা মাস শেষ হয়ে গিয়ে কখন সময় হবে মাস শেষের পেনশন তোলার। এক একটা মাস শেষ হয়ে যাওয়া মানে জীবনের আয়ু ক্রমশ ফুরিয়ে আসা কিন্তু সে কথা মাথায় না রেখে তিনি মাস কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় নিঃশব্দে যেন তারই প্রতীক্ষা করেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে নিজের জীবনের মেয়াদ কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসে সাগ্রহে তারই অপেক্ষা করেছেন তিনি? হাতে যে তাঁর টাকা কিছু জমেনি এমন নয়। অর্ক লীনা যখন ছিল এ সংসারে তখন অর্ক তার মোটা মাইনের একটা ভাল অংশ দিত মণীশকে তার সংসারের খরচের জন্য। যদিও ছেলে কত মাইনে পায় তা সঠিক কখনওই জানতে পারেননি মণীশ। শুধু জানতেন ক্রমশই একটার পর একটা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ফলে অনেকটাই বেতনবৃদ্ধিই ঘটেছে তার। মণীশ আর ক্ষমা দু'জনেই বলত ছেলেকে, এত টাকা লাগবে না রে দিতে। নিজেদের জন্য কিছু সঞ্চয় করবি তো। গম্ভীর স্বভাবের অর্ক শুধু বলত, সে দেখা যাবে। তাহলে এজন্যই কি এটা বলত অর্ক যে তারা দু'জন আগেই ঠিক করে নিয়েছিল যে মিত্র বংশের অধিকতর চিন্তা আর তাদের কাম্য নয়, এই টাকা উপার্জন শুধুমাত্র নিজেদেরই জন্য। ব্যথিত জিজ্ঞাসায় একথাও ভেবেছেন মণীশ, ভেবে অবাক বোধ করেছেন, এত টাকা উপার্জন নিজেদের কেরিয়ার বৃদ্ধি এসব আসলে কীসের জন্য? নিজেদের জন্য শুধু? নাকি নিজেদের জন্যও নয় শুধু, কখনওই আসবে না যে সন্তান সংসারে তার জন্য তো নয়ই, এ-বাঁচা তাহলে শুধু টাকার জন্য বাঁচা। কেরিয়ারের জন্য বাঁচা? মৌলিক যে মানবিক অনুভূতিগুলি তা থেকে তবে আস্তে আস্তে এভাবে দূরে সরে যেতে থাকবে উন্নতিগ্রস্ত মানুষ?

কম্পিউটারের মনিটর স্ক্রিনে তিরিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখার পর এক সপ্তাহও অতিক্রান্ত হয়নি— মাসান্তের পেনশন তুলতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, হঠাৎ দেখেন দূরে অন্য একটা উইথড্রয়ালের লাইনে দাঁড়িয়ে তিরিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই পৃথিবীটা থেকে উঠে আসা একটা লোক। তিরিশ বছর পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে কিন্তু ও যে বুলা সামন্ত নয় তা স্বয়ং ঈশ্বর এসে বললেও তিনি তা বিশ্বাস করবেন না।

বুলা সামন্তের মতোই লম্বাটে মুখের ধরন, থুতনিটা সেরকমই চাপা— চুলটা সেরকমই পাট করে আঁচড়ানো যদিও তাতে এখন পাক ধরেছে। তিরিশ বছর আগে বুলা সামন্তের চুল ছিল বর্ষার মেঘের মতো কালো আর ঘন। কিন্তু এ কী করে সম্ভব? বকখালি খালের পারে কসতলা নামের সেই অচিনপুর যেখানে অনেক খাল অনেক নদী অনেক রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয় যে জায়গার নাম আজ অবধি পৃথিবীর কোনও মানচিত্রে লেখা হয়নি সেখান থেকে বুলা সামন্ত কেন হঠাৎ উঠে এসে এখানে এই ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়াবে? এক লহমা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েই থাকেন মণীশ। এক লহমায়

বুলা সামন্তের সেই গ্রাম কসতলার ছবি যেন তাঁর চোখের সামনে ফ্রিজড শটের মতো স্থির হয়ে যায়। জেটিঘাট জেটিঘাট... হ্যাঁ এই তো বিদ্যুৎ চমকের মতো হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তাঁর ব্যাসস্ট্যান্ডের নামটা যে নামটা কম্পিউটারে ছবি দেখার সময়ে তিনি কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। বুলা সামন্তকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে তাঁর। বস্তুর সঙ্গে কেমন জড়ানো থাকে তার নামের অনুষঙ্গ। জেটিঘাট থেকে কাঁচা রাস্তাটা ধানখেতের মধ্য দিয়ে কীভাবে চলে গেছে বকখালি খালের দিকে। বকখালির পারে এসে যেখানে থমকে থেমে গেছে রাস্তাটা সেখানে কসতলা গ্রাম। তিরিশ বছর পরে গ্রামের ছবিটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর। এমনিতে বকখালি যাওয়ার রাস্তাটা বৃক্ষবিরল কিন্তু এখানে অনেক গাছ। বকখালির বাঁধের গায়ে তেঁতুলগাছ, গাবগাছ। আরও অনেক গাছের ছায়ায় এই দুপুরবেলাটাও কেমন ঠান্ডা অন্ধকার। কাঠের বড় রথটা দাঁড়িয়ে আছে গাছের নিচে। রথের সময় টানা হয় সেটা। নিচে লেপেপুঁছে তৈরি করা হয়েছে একটা মাটির বড় চাতাল সেখানে দুপুর রোদে কসতলার বয়োবৃদ্ধরা এসে তাস খেলে। তার মধ্যে বসে আছে বুলা সামন্তের বাবা।

মোহগ্রস্তের মতো মণীশ তার লাইন ছেড়ে দিয়ে বুলা সামন্তর লাইনের দিকে এগিয়ে যান। পিছন থেকে লাইনের লোকেরা বলে, লাইন ছেড়ে দিলেন নাকি দাদা, অন্য লাইনে দাঁড়াবেন? মণীশের কানে কোনও কথা ঢুকছে না। খুব ভিড়। কী একটা ফর্ম তোলার জন্য যেন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা ভিড় করেছে কাউন্টারের সামনে। কোনওক্রমে ভিড় ঠেলে ঠেলে যখন মণীশ তার অভীষ্ট কাউন্টারের গিয়ে পৌঁছলেন তখন অবাক হয়ে দেখেন কোথায় বুলা সামন্ত? না, কেউ নেই তো লাইনে দাঁড়িয়ে যাকে দেখতে বুলা সামন্তের মতো। সবটাই তাঁর চোখের ভুল! এরকম ভুল হতে পারে মানুষের? অলীক ভূতের গল্পে এরকম ঘটে থাকে অবশ্য। বিদেহী আত্মা দেহ ধরে দেখা দেয় তার সামনে যে তাকে দেখতে চায়। দুর কী পাগলের মতো ভাবছেন তিনি— দুপুরের স্পষ্ট রোদে এত লোকের ভিড়ে তিনি ভূত দেখলেন নাকি? না না ভূত হবে কেন? বেঁচে থাক বুলা সামন্ত। আসলে বুলা সামন্তকে তাঁর অবচেতন মন তীব্রভাবে দেখতে চাইছিল বলেই কি এভাবে তাকে দেখলেন।

পেনশনের টাকা তোলার কথা মাথায় আসে তার। বাড়ি ফিরে আসেন মণীশ মিত্র। ক্ষমা জানালা দিয়ে দেখে তাঁকে। দরজায় এসে দাঁড়ায়।

— ফিরে এলে এত তাড়াতাড়ি? ব্যাঙ্কের কাজ হয়ে গেল।

— না হল না, জানো ক্ষমা আশ্চর্য এক ব্যাপার। ব্যাঙ্কে বুলা সামন্তর সঙ্গে দেখা হল।

— বুলা সামন্ত? কসতলার? বলো কী? সে তো এক অন্য পৃথিবীর মানুষ— এখানে এসে সে কী করছিল? কলকাতায় আসে নাকি কসতলার মানুষরা?

— জানি না সে কী করতে এসেছিল? অথবা আদৌ এসেছিল কি না?

— মানে? চোখ কপালে তোলে ক্ষমা স্বামীর কথাবার্তায় ভাবেভঙ্গিতে। বলে, এই বললে তার সঙ্গে দেখা হল আবার বলছ সে এসেছিল কিনা তার ঠিক নেই। মানে কী এসব কথার? সেই গানের মতো কথা বলছ যে তুমি— এসেছিলে তবু আস নাই তাই জানায়ে গেলে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

— আমিও কি বুঝেছি ক্ষমা? স্পষ্ট দেখলাম ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, ভীষণ অবাক হয়ে কাছে গেলাম কথা বলতে— দেখি নেই। আশেপাশেও খোঁজ করলাম কোথাও নেই। যেন হাওয়ার মতো মিশিয়ে গেছে।

ক্ষমা বলে, ধ্যুৎ তা কি করে হয়? তুমি আজকাল ভূতটুত বিশ্বাস করতে শুরু করলে নাকি? ভূতই বা দিনেদুপুরে আসবে কোত্থেকে? তাছাড়া কত আর বয়স বুলা সামন্তর— মরার বয়স হয়নি নিশ্চয়ই যে মরে গিয়ে তোমাকে দেখা দিতে এসেছে।

মণীশ বলেন, আমি তাকে দেখতে চেয়েছিলাম বলেই আমি তাকে দেখলাম।

আমার তাকে একটা খুব জরুরি কথা বলার ছিল।

ক্ষমা বলে, কী ছাইপাঁশ বলছ। দেখতে চেয়েছিলে বলেই এসে গেল? আর কী কথাই বা ছিল তোমার তার সঙ্গে?

— বলব, পরে বলব। এখন নয়। এখন ওকে একটা চিঠি লিখতে হবে— দাও একটা কাগজ দাও তো—

কোত্থেকে একটা কাগজ খুঁজে এনে মণীশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে— নাও, কী লিখবে লেখো। কী লিখবে শুনি— বুলা, তোমাকে আমি স্বচক্ষে এখানে প্রত্যক্ষ করিলাম— যাহা একেবারেই অসম্ভব। তুমি ভূত হইয়া আসিয়াছিলে কি? কবে তোমার মৃত্যু হইল ফিরতি ডাকে তাহা অবশ্যই জানাইও। চিন্তায় আছি—

মণীশ গম্ভীরভাবে বলেন, না ক্ষমা, ঠাট্টা নয়। সত্যি তাকে আমার কিছু কথা বলার আছে। চিঠিতে তা হবে না। এখানে আসতে হবে তাকে। সংক্ষেপে লেখেন মণীশ..... বুলা, তোমাকে আজ এখানে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, আমার সামনে দাঁড়াইয়া আছ। কথা বলিতে গেলাম তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখিলাম তুমি নাই। বুঝিলাম— আমি তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়াই তুমি আসিয়াছিলে। কিন্তু কথাটা বলা হইল না। যদিও কথাটা বলা অত্যন্ত জরুরি। তুমি যদি একটু কষ্ট করিয়া একবার আমাদের বাড়ি আসিতে পারো খুব উপকার হয়। আমি সংক্ষেপে পথনির্দেশ দিয়া দিতেছি। তোমার কোনও অসুবিধা হইবে না। চল্লিশ বছর আগে যখন তোমাদের ওখানে যাওয়া আসা করিতাম তখনও তো তোমাদের গ্রামের কেউই প্রায় কলিকাতায় আসে নাই, কলিকাতার মুখ দেখো নাই। কিন্তু চল্লিশ বছর তো অনেক বছর— প্রায় অর্ধশতাব্দী। এখন সময় তো অত্যন্ত দ্রুতবেগে বহিতেছে। আগে তো তোমাদের ওখানে কোনও চিঠি যাইত না। এখন যায় নিশ্চয়ই। সেই ভরসাতেই চিঠি লিখিলাম। পারিলে সত্বর আসিও। সময় হাতে বেশি নাই—

ক্ষমা চিঠি পড়ে উদ্বিগ্নস্বরে বলে, মানে কী এসব কথার, সময় হাতে বেশি নাই—

মণীশ বলেন, না, না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই ক্ষমা! বুলা আসুক না। তখন বুঝবে সব কথা।

খাম বন্ধ করে ঠিকানা লিখতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন মণীশ। চল্লিশ বছর আগে সত্যি এইসব অঞ্চল পিনকোডের অন্তর্ভুক্ত অবধি ছিল না। কোনও পোস্টাল ঠিকানা ছিল না এসব জায়গার। কী ঠিকানা লিখবেন তিনি? কোন ঠিকানায় চিঠি লিখলে যাবে শেষ অবধি? অবশেষে এক অদ্ভুত ঠিকানা

লেখেন মণীশ যাহা ভারতীয় ডাকঘরের ইতিহাসে বিরল। বা ডাকঘরের মহাফেজখানায় সংরক্ষণের যোগ্য। মণীশ ঠিকানা লেখেন... বুলা সামন্ত, কসতলা, ফ্রেজারগঞ্জের জেটিঘাট হইতে বকখালি খালমুখী রাস্তা ধরিয়া শেষ গ্রাম যেখানে একটি বিরাট গাবগাছে বাতাস সাঁসাঁ শব্দ করে— যে গাছের কস জেলেরা তাহাদের জালে মাখে।

চিঠি পড়ে বিস্ময়ে আর কৌতুকে বলে ক্ষমা, মানে কী তোমার এসব পাগলামির? মাথাটাথা একেবারেই গেছে? এটা কোনও একটা ঠিকানা হল? পোস্টাফিসের লোকেরা ভাববে কোনও পাগলের চিঠি। ছিঁড়ে ফেলে দেবে তারা।

মণীশ বলেন, আগে গ্রামের লোকেরা এভাবেই ঠিকানা লিখত জানো। আমি এরকম ঠিকানা লেখা চিঠি দেখেছি। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের তার চারপাশের প্রকৃতির একটা প্রাণের যোগ ছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ তখনও নিতান্তই পিন কোডে গিয়ে ঠেকেনি। গ্রামের পিওনও নিশ্চয়ই জানবে কোথায় সেই গাবগাছ সমুদ্রের হাওয়া সাঁ সাঁ শব্দ করে। সারা গ্রাম ঘুরেই তো তাকে চিঠি বিলি করতে হয়। নিজের ঠিকানার জায়গায় মণীশ জেলা থানা রাস্তা পিন কোডের সংখ্যা লেখে— এখানে কেউ জাল মাজে না— এখানে কোনও গাছ হওয়ায় সাঁ সাঁ শব্দ করে না।

(১০)

দিন চারেক পর এল বুলা সামন্ত। সেও এসে পৌঁছুল দুপুরবেলা। দরজায় মৃদু টোকা শুনে দরজা খুলেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে বুলা সামন্ত। চল্লিশ বছরের ওপার থেকে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। ব্যাঙ্কের লাইনে যেমনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল তাকে প্রায় তেমনিই। তবে সেখানে দেখেছিল বুলা সামন্তের মাথার চুলে অল্প অল্প পাক ধরেছে— কিন্তু সত্যিকারের যে বুলা সামন্ত তার সামনে দাঁড়িয়ে তার সামন্ত মাথার চুল কাশফুলের মতো সাদা।

বুলা হেসে বলে— চিনতি পারছেন তো স্যর।

— হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পারব না কেন? এসো এসো ভিতরে এসো আরাম করে বসো এখানে। মাথার চুল সব সাদা করে ফেললে কী করে?

সামনের চেয়ারে বসে পড়ে বুলা লাজুক হাসে— এই হয়ি গেল স্যর! আপুনি কিন্তু সি রকমই আছেন—

মণীশ হাসেন।

— তাই নাকি? রাস্তায় দেখলে আমাকে চিনতে পারতে?

— পারবুনি কেন স্যর? আপুনি আমাদের গ্রামে কম এসেছেন?

— সত্যিই তো বুলা। আচ্ছা তোমাদের সেই মাটির দোতলা বাড়িটা এখনও আছে?

মাটির বাড়িটা মণীশ মনে রেখেছে বলে বুলা যেন একটু কৃতার্থ হয়। ঈষৎ বিস্ময়ে বলে— মাটির বাড়িটা আপনি মনে করে রেখেছেন স্যর।

— হ্যা বুলা। সেই বাড়ির একটা ঘরে তোমরা আমাদের একরাত থাকতে দিয়েছিলে মনে পড়ে?

বুলা এবার হঠাৎ যেন খুব মজা পেয়ে হেসে ওঠে— মনে রয়িঠে স্যর। খুব জোরে দোখনো দিচ্ছিল আপনি ভয় পেয়ি ভাবলেন বাড়ি ভেঙি পড়বে বুঝি।

মণীশ বলেন— বুলা, কলকাতায় তুমি খুব বেশি আসোনি বুঝি। কী কর তুমি এখন?

বুলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে— বেশ কিছু বছর তো ষষ্ঠীপদ মান্নার মাছ ধরার সাবারে আমি ছোট-এর মাঝি ছিলাম। বার গাংয়ে যেতাম মাছ ধরতি। বহুদিন ষষ্ঠীপদ মান্নার সাবারে কাজ করিঠি আমি— কিন্তু তারপর ছোট-এর বদলে মোটরে চালানো ভুটভুটি আসি গেলা। ভুটভুটি ভুটভুটিতে ছয়লাপ খাল নদী সব। ষষ্ঠীপদ মান্নার সাবার উঠি গেলা। আমার হাতে আর কুনো কাজ নাই। তখন কয়েকবার মাটি কাটার দলের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়িঠি মাটি কাটতি। রাস্তার ধারে তাঁবু খাটায়ি থাকতাম— আমরা লেবাররা স্যর। সারারাত রাস্তার ধারের বড় বড় আলোগুলি জ্বলত মুখের উপর। ভাল লাগতনি স্যর। কসতলা-র কথা খুব মনে পইড়ত। গাবগাছের সিই অন্ধকার— খালের জলে মাছের ঘাই মারার শব্দ— আমরা মাঝি স্যর জলে দাঁড়ের শব্দ না শুনলি প্রাণ বাঁচে না। কলিকাতা থেকতি ফিরি আলাম— আর যাই নাই স্যর। এখন বড় বড় পাঁচশো মনী নৌকা বানাই। তাই নিয়ি রয়িঠি স্যর।

মণীশ বলেন— কই বললে না তো বুলা, সেই মাটির দোতলা বাড়িটা আছে কি না—

— আছে স্যর—

— আর সেই গাবগাছটা?

— সিটাও আছে। আপনি যে ঠিকানায় লিখেছিলেন গাবগাছ হাওয়ায় শাঁ শাঁ শব্দ করে তাই পড়ে পিওন খুব মজা পেইঠে।

মণীশ বলেন— গাছটা আছে তাহলে বুলা?

বুলা এবার একটু চুপ থেকে বলে— এখনও অবধি আছে স্যর কিন্তু থাকবেনি। আমার মাটির বাড়িটাও রাখতি পারবুনি।

মণীশ প্রায় আর্তনাদ করার মতো বলে— মাটির বাড়িটাও চলে যাবে? কেন?

বুলা সামন্ত বলে— সব জায়গা আস্তে আস্তে বিক্রি হয়ি যাইঠে স্যর। কলিকাতার কোন কোম্পানির বাবুরা সব কিনি নিইঠে।

মণীশ বলেন— কেন? কী জন্য কিনে নিচ্ছে তারা?

বুলা সামন্ত বলে— আমরা গ্রামের মুখ্যুসুখ্যু মানুষ আমরা অত জাইনবু কী কইরে? কত কিছু নাকি তারা কইরবে এঠি, বেড়াবার জায়গা হবে, হোটেল হবে— কলিকাতা থেকতি বাবুরা সব আইসবেন বেড়াতি ফুর্তি কইরতি—

যে-কথাটা অনেকক্ষণ ধরে বুলাকে জিজ্ঞেস করবেন করবেন করেও করা হয়ে ওঠেনি সেটা এবার জিজ্ঞেস করেন মণীশ— তোমাদের ওখানে কি চুরি ডাকাতি গুন্ডামি বদমায়েশি এসবও শুরু হয়েছে নাকি?

বুলা সামন্ত বেশ অবাক হয়ে বলে— আপনি কী কইরে জাইনলেন স্যর।

মণীশ বিষণ্ণ হেসে বলেন— আমরা যারা করছি এসব তারাই জানব না তাও কখনও হয় বুলা?

কথাটার অর্থ সম্যক বুঝতে না পেরে বুলা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

বুলা বলে— হ্যাঁ স্যর। অনেক হোটেল হয়িঠে ফ্রেজারগঞ্জ থেকতি বকখালি যাওয়ার রাস্তায়— নানা ধরনের লোক আসা-যাওয়া করিঠে— কাঁচা পয়সা মানুষজনের হাতে— চাষবাস ছেড়ি ছেলে ছোকরারা সব ওঠি ভিড়িঠে। টাকা পয়সার ভাগ বখরা নিয়ি মারামারি নিজেদের মধ্যি আর সুযোগ

সুবিধা পেলিই লুঠ করিঠে অন্যের জিনিস।

যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছেন এমন মগ্নস্বর মণীশ বলেন— তোমার মনে পড়ে বুলা, ওই রাস্তা দিয়ে অনেক রাতে কতবার একলা একলা গেছি। লোক ছিল না জন ছিল না— শুধু সমুদ্র আর দূরের ঝাউবনের শব্দ।

বুলা সামন্ত বলে— সে তো তিরিশ বছর আগেকার কথা সব— আমার মাথার চুলও তো এসব দেখতি দেখতি সাদা হয়ি গেলা।

যে-কথাটা মণীশ অনেকক্ষণ থেকে বলবেন বলবেন ভাবছেন বলা হয়ে ওঠেনি সে-কথাটা মণীশ বলেন— শোনো বুলা, তুমি সপ্তাহ দু'য়েক আগে এসে এখানে একটা ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়েছিলে মনে আছে?

ভীষণ হতভম্ব হয়ে বুলা বলে— কী বইলছেন স্যর, আপনি একদম ভুল দেখিছেন! আমি এঠি আসব কেন? একি আমার জায়গা? পনেরো বছর আগে আমি কলিকাতায় এসিছিলাম— তারপর আর আসি নাই।

— কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছিলাম বুলা। তুমি দাঁড়িয়ে আছো লাইনে। তাই তো বহুদিন পর তোমার কথা মনে পড়ে গেল আমার।

বুলা বিস্ময়ে বিড়বিড় করে— তা কী করি হয় স্যর?

ক্ষমা এসে বলে— কেন মিছামিছি ঘাবড়ে দিচ্ছ ওকে। না বুলা, উনি একেবারে ভুল দেখেছেন তোমাকে। আসলে উনি নিজেই জানেন না উনি দেখতে চাইছিলেন তোমাকে— তাই ওভাবে ভুল দেখেছেন তোমাকে—

মণীশ বলেন— হ্যাঁ তোমাকে আমার খুব দরকার ছিল বুলা। তুমি বলেছিলে না বকখালি থেকে যেখানে কস্তুরা খাল বেরিয়ে গেছে সপ্তমুখীর দিকে সেইখালটায় অনেকটা জমি আছে যা ইচ্ছে করলে কিনতে পারি আমি। আছে সে জমি এখনও? জায়গাটা ভারি সুন্দর— মনে আছে আমার— ঘন গাছপালা, দু'টো খাল এসে মিশেছে একজায়গায় মনে পড়ে? আছে কি এখনও সেই জমি? বুলাকে কীরকম উত্তেজিত দেখায়— আপনি সত্যি সেই জমি নিবেন স্যর? তাহলি তো খুব ভাল হয়। কিন্তু সে জমি কি রয়িঠে এখনও?

— মানে? সেটাও নেই? সেটাও বিক্রি হয়ে গেছে? — উদ্বিগ্ন গলায় বলে ওঠেন মণীশ।

— জানি না স্যর। ওটা তো আমাদের জ্ঞাতি বরেন মান্নার জমি। কলিকাতা থেকতি কি একটা কোম্পানি আয়িছিলা স্যর, ওই জমি কিনবি বলে। বরেন মান্না এখনও কিছু বলে নাই। দরদাম চলিঠে। কলিকাতার কোম্পানিকে জমি দিবার খুব ইচ্ছা নাই বরেন কাকার। কলিকাতার কোম্পানিগুলা তো কসতলার সব জমি কিনি নিইঠে। তবে অনেক টাকা দিলি অন্য কথা।

মণীশ উত্তেজিত গলায় বলেন— বরেনকাকুকে গিয়ে বলো ও জমি আমি নেব। আমিও অনেক দাম দেব। জমিটা যে আমার চাই তা এতদিন বুঝিনি।

বুলা বুঝতে না পেরে বলে— অত দাম দিয়ে ওঠি জমি কিনবেন কেন স্যর? কি কইরবেন?

— আমার তো যাওয়ার আর কোনও জায়গা নেই বুলা। ওই জমিতে ছোট্টো একটু ঘর করে থাকব দু'জনে। আমরা তো দু'জন মোটে মানুষ। বাকি জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকবে। জঙ্গল গাছপালা হবে সেখানে, বামুনবাদশা পাখি ডাকবে, জোয়ারে কলকল করে বকখালি খালের জল ঢুকবে, কাঁচা মাটি, লোনাশাক আর হরকোচের গন্ধ ঘুরে বেড়াবে বাতাসে। মাথার উপর অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকবে ফাঁকা আকাশ। ওই আকাশটা কোনও কোম্পানি কিনে নিতে পারবে না বুলা। গ্রামের জেলেরা যারা মাছ ধরে তারা আমার জমির ভিতরে ঢুকেই মাছ ধরবে। আমাদের দু'জনের জন্য অল্প কিছু মাছ দিয়ে গেলেই হল। এই জমিটা কিনব বলেই আমি ঘোরের মধ্যে তোমাকে দেখেছিলাম ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে আছ।

ঘোরের মধ্যে একসঙ্গে এতগুলো কথা একটানা বলে যান মণীশ মিত্র।

বুলা বলে— কিন্তু স্যর এ তো অনেক টাকা, এতগুলি টাকা দিয়ে আপনি জমিটা কিনে ফেলি রাখবেন?

—এ তুমি বুঝবে না বুলা। যতবার আমি পেনসনের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি— ভেবেছি জীবনের এখন যা চাহিদা তা সবই তো একরকমভাবে মিটেই যাচ্ছে— জীবনের দাবি তো অল্প— এতগুলি টাকা নিয়ে তবে আমি কী করব? তখনই ভেবেছিলাম নিজের পৃথিবীটা যদি আমি নিজের টাকায় কিনে রাখতে পারি সেখানেই কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা। টাকা কড়ি গাড়ি বাড়ি আমি কিছুই চাইনি আমি শুধু চেয়েছি আমার নিজের পৃথিবী।

বুলা কিছুই বোঝে না, হাঁ করে কথাগুলো শুনে যায়। মণীশ যেন শুধু স্বগতভাষণ করে যান।

ক্ষমা মৃদু ধমকে বলে ওকে— এসব কী বলে যাচ্ছ ওকে বলো তো? বেচারির করার কিছু নেই তাই চুপ করে শুনে যাচ্ছে।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মণীশ বলেন— দেখো বুলা, নিজের মনে পাগলের মতো কী সব বলে যাচ্ছিলাম। যাই হোক তুমি কসতলায় ফিরে গিয়ে বরেনকাকুকে বলো আমার কথা। সে যেন জমি আর কাউকে না দেয়।

— বইলবু স্যর, বরেনকাকুকে বইলবু। আপনি বরং স্যর আজ তো রবিবার— বৃহস্পতিবার দিন আসুন কসতলা— ওদিন কসতলা থাকেই বরেন কাকু, গঙ্গার পূজা করে।

মণীশ বলেন— নৌকো কোথায় বানাও তোমরা বুলা?

— ওই তো স্যর ফ্রেডরিক খালের গোড়ায়।

— সব রকমের নৌকো বানাও?

— হঁ স্যর, ডিঙি, ছোট, পাঁচশো মনী নৌকো সব।

মণীশ বলেন— নদীগুলিও যদি সব বিক্রি হয়ে যায়, কলকাতার কোম্পানি সব কিনে নেয় তখন ওই নৌকো দিয়ে কী হবে?

বুলা সরসভাবে হাসে— না স্যর, নদী কি কেনা যায়?

মণীশ বলেন— কেন বুলা? তোমাদের মাটির দোতলা বাড়িটাও যদি বিক্রি হয়ে যেতে পারে নদীটাই বা বিক্রি হবে না কেন?

বুলা তবুও হেসে ঘাড় নেড়ে বলে— না স্যর নদী কখনও বিক্রি হয় না।

বুলা সামন্তের শক্তপোক্ত সরল গ্রাম্য চেহারাটার দিকে তাকিয়ে মণীশের মনে পড়ে যায় কলম্বিয়ার সেই ট্রাইবের কথা যারা মনে করত জমি আবার কেনাবেচা করতে পারে নাকি মানুষ। জমি তো ঈশ্বরের। জমির মালিক তো একমাত্র তিনি-ই। কসতলার বুলা সামন্তর আজ হয়তো আর অতদূর ভাবার ক্ষমতা নেই কিন্তু এতদূর অবধি যে আজও বিশ্বাস করে যে খাল নদী কখনও বিক্রি হয় না, কিংবা ঈশ্বরের তৈরি পাহাড়। কিন্তু অবোধ বুলা সামন্ত জানে না যে পাহাড়ের পাথর



বিক্রি হতে হতে গোটা একটা পাহাড় তো কতই বিক্রি হয়ে যায়— এছাড়াও, সেদিন মণীশ পড়ছিলেন একটা খবর, এই দেশেরই কোনও এক রাজ্যে যেন গোটা একটা নদীকেই নাকি তুলে দেওয়া হয়েছে বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের হাতে কোল্ডড্রিঙ্কস তৈরির জলের জন্য। সভ্যতার লক্ষণ কি তবে এই যে তার কাছে সবই বিক্রয়যোগ্য সবই পণ্য? যারা যতবেশি ভোগ করে তারা ততবেশি সভ্যই শুধু অর্ধসত্য বুলারাই তা বিশ্বাস করতে চায় না। কস্তুরা খালের দু'পাশে জমে থাকা রাশি রাশি কস্তুরা শামুক চুনের ভাঁটিতে চলে যায় চূর্ণ হওয়ার জন্য তবুও সরলপ্রাণ বুলারা ভাবে নদী নালা খাল জঙ্গল নাকি ঈশ্বরের মতোই সার্বভৌম যে-ঈশ্বর কখনও বিক্রি হতে পারে না।

বুলা সামন্তের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়ায় যাবে বলে। মণীশের হঠাৎ যেন খেয়াল হয়। বলেন— এত বেলায় রওয়ানা দিয়ে তুমি কসতলায় পৌঁছুতে পারবে বুলা। নামখানার ওপারে নেমে তুমি বাস পাবে?

— তা পাবু স্যর। এখন তো অনেক রাত অবধি ফ্রেজারগঞ্জ যাওয়ার বাস চলে।

ফ্রেজারগঞ্জ! ফ্রেজারগঞ্জ! হঠাৎ মনের মধ্যে কি যে একটা হাওয়ার ঘূর্ণিপাক খেলে যায় মণীশের। সমুদ্রের পারে জেলে নৌকোর টিমটিমে আলো। সাঁ সাঁ করে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাতাস ছুটে আসছে এডওয়ার্ড ক্রিক থেকে। হাওয়ায় নৌকোর আলো কাঁপছে। মণীশ মনশ্চক্ষে দেখেন— নির্জন নিস্তব্ধ তারাভরা রাত। জ্বলজ্বল করছে মাথার উপর কালপুরুষ, ক্যাসিওপিয়া। এত উজ্জ্বল যে মনে হয় ম্যাগনেশিয়াম তারের আলো। আকাশে চাঁদ নেই। তারার আলোয় পথ চলছে বুলা সামন্ত জেটিঘাট থেকে কসতলা। কী হাওয়া! কী হাওয়া! হাওয়ায় শব্দ ছাড়া কিছু আর শোনা যায় না। কলকাতা নামের শহরে যাওয়ার সমস্ত গ্লানি সমস্ত পরিশ্রম যেন মুছে দিচ্ছে কতদিনের চেনাজানা এই হাওয়া। হাঁটছে বুলা সামন্ত হাঁটছে। ধানের প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হাঁটছে ওই তো দূরে ধুধু দেখা যায় নিকষ কালো গেঁয়ো গরান বাইনের জঙ্গল— বকখালির খালে উপুড় হয়ে পড়া তারাজ্বলা কালো আকাশ— গাবগাছ নাচছে দোয়ানো হাওয়ায়, একটু কান পাতলেই শোনা যায় খালের জলে খলবল খলবল মাছের চলাচলের শব্দ, কয়েকঘণ্টার অলীক নির্বাসনের পর বুলা এবার ফিরছে তার মাটির দোতলা ঘরে— যার জানালা দিয়ে অনেকদূর অবধি দেখা যায় কালো জঙ্গল আর বকখালি খাল। হাওয়া এসে খড়খড় শব্দে নাড়িয়ে দিয়ে যায় খড়ের চাল। সেই মাটির বাড়ি! সেই মাটির বাড়ি! বুলা সামন্তের সঙ্গে কসতলার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মণীশ যেন বহুদিন পর আবার দেখতে পান সেই খড়ের নিচু চালওয়ালা মাটির ঘরটা— খড়ের কাঁচা গন্ধ এসে লাগে নাকে, লেপাপোঁছা মাটির স্নিগ্ধ ছোঁয়া— ওই ঘরেই একদিন সে আর ক্ষমা ... সে এক ভারি নিবিড় মিলনের রাত ছিল ... ক্ষমা ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলেছিল— তুমি কি পাগল হয়ে যাও এই হাওয়ার শব্দে এই মাটির গন্ধে? মণীশ ক্ষমার চিবুক আস্তে নাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল— আর তুমি পাগল হয়ে যাও কীসে বল তো বাপু?

ক্ষমা তৃপ্তির হাসি হেসে বলেছিল— কতদিন নৌকোয় ভেসে ভেসে বেড়াবার পর এই দাঁড়াবার মতো ডাঙা পেয়েছি গো— আঃ এ যে কী আনন্দ কী আরাম তা সারাজীবন যারা ভেসে ভেসে বেড়ায় তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। আমরা স্থলের প্রাণী গো। জলে জলে মাছের মতো ভেসে বেড়ানো কি আমাদের পোষায়?

সত্যি, বহুদিন নৌকোয় নৌকোয় ভেসে বেড়াবার পর হাত পা ছড়ানোর মতো একটা জায়গা পেয়ে যে কী খুশি কী প্রফুল্লই যে দেখাছিল ক্ষমাকে। বুলা আর একবার বলে— যাই স্যর। তখন যেন হুঁশ হয় মণীশের। পকেটে রাখা দুশো টাকার নোট বের করে ধরেন বুলার সামনে।

বুলা বলে— না, না। থাক না স্যর।

মণীশ বলেন— থাকবে কী? তোমার পথখরচা নেবে না তুমি, এতটা পথ এত কষ্ট করে এলে তুমি? ভাবলাম কলকাতার মানুষ আমাকে তোমাদের কসতলার লোকেরা বোধহয় ভুলেই গেছে। কলকাতা কি একটা জায়গা। মনে

রাখার মতো নাকি কলকাতার মানুষরা?

বুলা লাজুকভাবে বলেন— না স্যর কী বলেন, আপনি নৌকো নিয়ে কত আসতেন বকখালি খালের মুখে— নৌকো ভিতরে ঢুকত না, আপনি খালের মুখে নৌকো নোঙর করে জলপায়রার ঝাঁক দেখতেন।

মণীশ আবার বলে— তোমার বরেন কাকার সঙ্গে কথা বলে রেখো তাহলে বুলা। আমরা বৃহস্পতিবার সেখানে যাচ্ছি।

বুলা চলে যায়, রেখে যায় যেন ঘরভর্তি ফ্রেজারগঞ্জের হাওয়া।

(১১)

বৃহস্পতিবার কসতলা যাওয়ার পরিকল্পনা পাকা ওদের।

সকালবেলা দু'জনে বেরুবেন বলে আগের দিনই ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে রাখছিলেন মণীশ। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়তেই দরজা খুলে দেখেন অর্ক। কিছু না বলে ভিতরে ঢোকে সে।

ক্ষমা বলে— কি রে হঠাৎ এই ভরদুপুরবেলা চলে এলি? ভাল তো সব? লীনা কেমন আছে?

অর্ক বলে—লীনাও আসবে ভেবেছিল।

ক্ষমা বলে—ভেবেছিল মানে? এল না কেন তাহলে? অনেকদিন তো দেখি না ওকে।

অর্ক শুকনো গম্ভীর মুখে বলে— সে এলে কি ভাল হত?

প্রশ্নটা না বুঝতে পেরে ক্ষমা হতভম্বের মতো জিজ্ঞাসা করে— কী বললি বুঝলাম না।

অর্ক সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে—তোমরা দু'জনে যে আজকাল কসতলা যাওয়া আসা-করছ তা তো জানতাম না।

ক্ষমা অবাক হয়ে বলে—ওমা! তুই এতসব জানলি কোত্থেকে? যাওয়া-আসা করছি কে বলল? সে অনেক অনেক আগের কথা তুই তখন জন্মাসওনি— তোর বাবা তখন নৌকোয় থাকত। তোর বাবার কাছে গিয়ে আমি নৌকোয় ছিলাম অনেকদিন। নৌকোয় ঘুরতাম এখানে ওখানে। তখন গিয়েছিলাম—এতদিন পর আবার যাচ্ছি।

অর্ক জেরা করতেই থাকে— কেন যাচ্ছ শুনি? সেখানে জমি কিনে থাকবে বলে?

মণীশ বলেন এবার অবাক হয়ে— হ্যাঁ ঠিক তাই? কিন্তু তুমি জানলে কী করে এত কথা?

অর্ক বলে— কেননা, আমি আর লীনা গতকালই সেখান থেকে এলাম।

ক্ষমা অবাক হয়ে বলে— ওমা! তোরাও গিয়েছিলি নাকি? কী আশ্চর্য একথা জানালে তো আমরা একসঙ্গেই যেতে পারতাম।

অর্ক বলে— বুলা সামন্তকে চেন তোমরা?

ক্ষমা ক্রমশ অবাক হতে থাকে।

—ওমা! তোর জন্মের আগে থেকেই তো তাকে চিনি। ওর একটা মাটির দোতলা বাড়ি আছে জানিস— একেবারে বকখালি খালের গায়ে। সন্ধেবেলা কী হাওয়া দেয় সমুদ্র থেকে—ওরা বলে দোখ্‌নো। কাছেই একটা গাবগাছ আছে হাওয়ায় সারারাত সেটা ঝরঝর করে কাঁপে। কী শব্দ তার— মনে হয় যেন আর একটা সমুদ্র। জানিস সে দোতলা বাড়িতে আমরা ছিলাম একরাত। কী হাওয়া তোর বাবার ভয় হল মাটির বাড়ি বোধহয় ভেঙেই পড়ে যাবে। জানিস বলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে যায় ক্ষমা। উচ্ছ্বাসে রাশ টানে। হঠাৎ বুঝতে পারে একথা ছেলেকে বলা যায় না।

মণীশ বলেন এবার— কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না, তোমরা কি সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে?

—বেড়াতে যাব কেন? আমাদের হাতে কি আর কোনও কাজ নেই? তোমরা জানো লীনা অনেকদিন থেকেই একটা প্রোজেক্ট ডেভলপ করছে।

মণীশ বলেন— হ্যাঁ, কিছুটা জানতাম। সে তো তোমাদের নিজস্ব কাজের ব্যাপার। তার ডিটেলস আমরা জানব কী করে? কিন্তু কী কাজের ব্যাপার সেখানে তোমাদের?

অর্ক বলে— কেন? বুলা সামন্ত তোমাদের কিছু বলেনি?

—হ্যাঁ, কিছু কিছু কথা বলেছে কিন্তু তার সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক!

অর্ক বলে— সম্পর্কটা ঠিক আমার না বাবা, সম্পর্কটা লীনার। ওদের কোম্পানির থেকে একটা নতুন আইডিয়ার ইকো-টুরিজম-এর ভেনচার নেওয়া হচ্ছে ওখানে। লীনা সেই অ্যাম্বিশাস প্রোজেক্টের ডিরেক্টর। অনেক সিনিয়র অফিসারদের ডিঙিয়ে লীনাকে এই পোস্টটা দেওয়া হয়েছে তার ক্রিয়েটিভ ডিজাইনের জন্য। লীনা নিজে পুরো সার্ভে টিম নিয়ে গিয়ে ম্যাপ তৈরি করেছে সে-জায়গার দক্ষিণে ফ্রেডরিকের মুখ থেকে উত্তরে কস্তুরা খালের মুখ অবধি। একটা বিরাট জায়গা নিয়ে টুরিজম হবে, রিসর্ট থাকবে, সুইমিং পুল আর পাব থাকবে। একটা ন্যুড ক্লাব রাখারও সাহসী প্রস্তাব রেখেছে লীনা— ফার্স্ট অফ ইটস সর্ট ইন দিজ কান্ট্রি। লীনার মাথা থেকেই এসেছে এ-আইডিয়া। গভর্নমেন্টের পারমিশন সিক করা হচ্ছে যাতে দেশের আইন বাঁচিয়ে তা করা যায়। ফলে ফরেন টুরিস্টদের পক্ষে আদর্শ জায়গা হবে এটা। আর সমস্ত জিনিসটাই হবে একটা দারুণ আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের মধ্য দিয়ে। একটা মাল্টিন্যাশনাল টুরিস্ট কোম্পানির কোলাবরেশনে হবে কাজটা। এ-কাজট উতরে দিতে পারলেই একটা বিরাট লিফ্‌ট হবে লীনার। সারাদিন এর পিছনেই পড়ে আছে লীনা। নাওয়া খাওয়া ঘুম মাথায় উঠেছে তার।

মণীশ দেখেন কী শীতল নৈর্ব্যক্তিকতায় অর্ক, তার ছেলে উচ্চারণ করে গেল ন্যুড ক্লাব শব্দটা। বাবা-মার সামনে উচ্চারণ করতে একটুও জিভে আটকাল না তার!

মণীশ ভাবেন— এতই নির্ভুল প্রফেশনাল এরা যে নিজস্ব বৃত্তির মধ্যেই কোনও কিছুতেই এদের কোনও দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই। পুরুষ ডাক্তার যেমন পরীক্ষার জন্য অনায়াসে স্পর্শ করতে পারে রোগিণীর নগ্ন শরীর।

মণীশ বলেন— ইকো-টুরিজম কী অর্থে বলছ তোমরা? তোমাদের টুরিজম কমপ্লেক্সের মধ্যে তোমরা হরকোচ কাঁটার ঝোপ রক্ষা করবে কিংবা ধানী ঘাস বা লোনা শাকের মতো নিতান্ত তুচ্ছ সব গাছপালা যা জৈব ভারসাম্য বজায় রাখে? কিন্তু যাদের কথা কেউ ভাবে না।

অর্ক বলে— ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু নিশ্চয়ই রাখা হবে— কিন্তু এ-সবই লীনা বেশি জানে। প্রোজেক্টটা তারই। কিন্তু বুলা সামন্তের সঙ্গে তোমাদের কী?

উত্তরটা এবার মণীশই দেন— বললাম তো বুলা সামন্ত আমার অনেকদিনের পরিচিত মানুষ— তোমার তখন জন্মও হয়নি। কস্তুরা খালের উল্টোদিকের অনেকটা জমির মালিক ওর কাকা। আমরা জমিটা কিনে নেব। বহুকাল আগে প্রস্তাবটা

আমাকে দিয়ে রেখেছিল বুলা।

—কিনে নেবে? অবাক হয় অর্ক। ওই জমি নিয়ে কী করবে তুমি? ওই কাঁকড়া শামুক কাঁটা গাছে ভর্তি জমি?

— কী করে মানুষ জমি নিয়ে? আমরা থাকব ওখানে।

— থাকবে? তা কী করে হবে। লীনার প্রোজেক্ট এরিয়ার মধ্যেই তো পড়ছে ওই জমি। ওই জমি নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে কথা চলছে মালিকের।

— আমার সঙ্গেও তো কথা হবে তার। কাল আমরা যাচ্ছি কসতলা।

—বাবা, প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে অর্ক, লীনার কেরিয়ারের সর্বনাশ করতে চাও তোমরা?

—লীনার তো শুধু কেরিয়ার, আমাদের তো গোটা জীবনের প্রশ্ন। আমাদের থাকার আর কোনও জায়গা নেই। প্রায় তিরিশ বছর আগে বুলা সামন্ত বলেছিল আমাকে জমিটা কিনে নিয়ে এখানে থাকতে। তখনও আমি গা করিনি জমিটা কিনতে। ভাবতাম বাঁচার তো কত বড় পৃথিবী পড়ে রয়েছে চারিদিকে।— এখানেই বা কেন থাকতে হবে আমাকে? কিন্তু এই তিরিশ বছরে পৃথিবীটা অনেক যেন ছোট হয়ে এসেছে, দ্রুত কমে আসছে বাঁচার পরিসর।

অর্ক এবার ক্রোধের সুরে বলে— কী যে বলছ বাবা, তোমাদের বেঁচে থাকার মতো আর জায়গা নেই?

মণীশ বলেন— তা তো বলিনি, বলেছি আমাদের নিজেদের যে-পৃথিবীতে বাঁচতে চেয়েছিলাম সে-পৃথিবী ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এই পৃথিবীটা আজ তাদের হাতে যারা এই পৃথিবীর আলো হাওয়া মাটি জল সবই ধ্বংস করে একটা অন্য পৃথিবী বানাতে চায়। আমাদের সেই অন্য পৃথিবীতে বসবাস করার কোনও ইচ্ছা নেই।

হতাশায় মাথার চুলে জোরে হাত বুলোতে বুলোতে বলে অর্ক— আসলে তোমরা কী যে চাও তোমরা নিজেরাই জানো কিনা বল তো? তুমি বলতে চাইছ তাহলে এইসব উন্নয়ন হবে না, ডেভলপমেন্টের কাজ বন্ধ করে দিতে হবে সব? এই প্রোজেক্টটা নিয়ে লীনার এই যে একবছরের চিন্তাভাবনা— সব অর্থহীন? এই পৃথিবীটার কোনওরকম পরিবর্তন হবে না? যেরকম ছিল সেরকমই থেকে যাবে?

মণীশ বলেন— লোভের জন্য, মুনাফার জন্য পাল্টানো নয়, অন্য কোনও কারণে যদি পাল্টায় পাল্টাক। সেখানে আমি খুঁজে পেতেও পারি নিজের পৃথিবীটাকে।

অর্ক অস্থির গলায় বলে— উঃ, তুমি একটা অ্যাবসার্ড কথা বলছ বাবা। আজ অবধি পৃথিবীর যা কিছু পাল্টেছে সবই যে আসলে এই মুনাফা বা লোভের তাগিদে তা অস্বীকার করতে পারো? লোভ না থাকলে তো জড়দ্‌গব হয়ে থাকত মানুষ। আজও সেই আদিম মানুষই থেকে যেত তারা। লোভ আর ভোগপ্রবৃত্তিই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে সভ্যপ্রবৃত্তি যা ছাড়া এই সভ্যতা এতদূর অবধি পৌঁছতেই পারত না বাবা— এই সহজ সত্যটাই তোমরা বুঝতে চাও না— চোখে ঠুলি পরে থাকো তোমরা।

ক্ষমা অবাক চোখে তাকায় তার সন্তানের দিকে। অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবের মানুষ সে। কথা কম বলে। এত উত্তেজিত রূঢ়স্বরে মণীশের সঙ্গে তাকে কথা বলতে শোনেনি কখনও। তাদের কাজের সমালোচনা করা হয়েছে বলে আঁতে এরকম ঘা লেগেছে তার?

মণীশও ছেলের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকেন। তার মুখে উচ্চারিত ন্যুডিস ক্লাব কথাটাও মনে পড়ে যায় তাঁর। মনে মনে বলেন মণীশ— হ্যাঁ, তাই কি শরীর সৌন্দর্য আস্বাদন করার যে কোমল একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি গোপন থাকে মানুষের মনে তাকেও তোমরা এভাবে সর্বজনীন পণ্য বানাতে চাও মুনাফার কারণে? এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? কিন্তু এসব নিয়ে তো আর নিজের সন্তানের সঙ্গে আলোচনা চলে না তাই চুপ করেই থাকেন মণীশ।

নরম গলায় ক্ষমা বলে— একটা কথা বলব বাবু? আর যা করবার করিস তোরা কিন্তু ওই কসতলার মোড়ে মাটির বাড়িটা তোরা ভেঙে ফেলিস না।

অর্ক বিরক্ত গলায় বলে— কেন? ওটা কী এমন জিনিস? একটা ফাটল ধরা মাটির বাড়ি।

ক্ষমা আসল কথাটা স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারে না। বলে— খুব ছোটবেলায় তোকে নিয়ে আমরা একবার উঠেছিলাম ওই বাড়িতে— তোর মনে নেই। ওটা তোর সেই শৈশবের স্মৃতি।

অর্ক বিরক্ত গলায় বলে— স্মৃতি ধুয়ে জল খাব নাকি? এখানে জমি কেনার পাগলামিটা ছাড়ো। কোম্পানি যদি মনে করে এই প্রোজেক্টটা হাতে নিয়ে তারা লাভবান হবে। তাদের আটকাতে পারবে তুমি? মনে রেখো ওটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। সমস্ত পৃথিবীটাকেই তারা কিনে নিতে পারে— বেশ গর্বের সঙ্গে বলে অর্ক— আটকাতে তো পারবেই না। মাঝখান থেকে হবে কী লীনার কাছে আমি ছোট হয়ে যাব। লীনা ভাববে বাবা ওর কেরিয়ার নষ্ট করতে চেয়েছিল। কেরিয়ারে হাত পড়লে লীনা কাউকে খাতির করবে না। লীনার কাছে আমাকে ছোটো কোরো না। লীনা নিজে আসতে চেয়েছিল কথা বলার জন্য। আমিই আসতে দিইনি। ও এলে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হত। তোমার জমানো পেনশনের টাকা দিয়ে তুমি অন্য কিছু করো বাবা। আমি তো বললামই ওই বাড়ি যদি ছেড়ে দিতেই হয় তোমাদের তাহলে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে থাকো।

অর্ক চলে গেলে পর চুপ করে বসে থাকে ওরা দু'জনে বেশ কিছুটা সময়। ক্ষমা জিজ্ঞাসা করে— কাল তাহলে কসতলা যাবে আর? সবার সঙ্গে লড়াই চলে— তা বলে নিজের ছেলের সঙ্গে তো আর নয়।

মণীশ যেন নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করেন, সত্যি কি নিজেদের দেশ বলতে আর কিছু রইল না আমাদের? ক্ষমার দিকে তাকিয়ে বলে— বুলাকে কথা যখন দিয়েছি তখন একবার অন্তত যাব সেখানে।

(১২)

যেন এক যুগ পর জেটিঘাটে নামতেই তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে সেই হাওয়া... হাওয়া... হাওয়া। হাওয়ায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাদের। হাওয়ায় গায়ের শাড়ি ঠিকমতো রাখতে না পারায় হো হো করে হেসে উঠছিল ক্ষমা। ভাবছিল এরকম এক হাওয়ার রাতেই তো অর্ক এসেছিল তার গর্ভে।

কসতলায় রথের চাকার কাছে— গ্রামের লোকেরা বসেছিল সঙ্গে বুলা। ওদের দেখে একটু বিষণ্ণ মুখে বলে— এলেন তাহলি স্যর। চল্লিশ বছর আগেকার মাটির বাড়িটা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। গাবগাছটা তেমনি শব্দ করছে— চল্লিশ বছর

আগেকার শব্দ। ক্ষমা আকুলভাবে সেদিকে তাকিয়ে বলে— বুলা, তোমাদের বাড়ির ভিতরে আর একবার ঢোকা যায় না?

—আসুন বউদি।

বুলা মাটির সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিয়ে যায় ক্ষমাকে। সেই মাটি সেই ছ্যাঁচা বাঁশ, খড়ের গন্ধ। ক্ষমা প্রাণভরে নিশ্বাস নেয়। দোতলার ঘরে জানালা দিয়ে দেখে সেই খালের বাঁক, সেই চাকুন্দা কাঠের খাটটা এখনও আছে জানালার পাশে... যেখানে সে আর মণীশ একদিন...

চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ষমা নেমে আসে নিচে। মণীশ বলেন বুলাকে— এই মাটির বাড়িতেই যদি ভাড়ায় থেকে যাই আমরা বুলা।

বুলা বলে— তা আর হবে নি স্যর। এ-বাড়িও বিক্রি হয়ি গিইঠে। আর একটা কোম্পানি এসব জমি জায়গা সব কিনি নিইঠে

মণীশ বলেন— সে কি বুলা? তোমরা বিক্রি করলে কেন?

— আমি চাই নাই স্যর। আমার দাদারও ভাগ আছে এ জমি বাড়িতে। দাদা বুইলল— না, না এসব কিছুই থাকবে নি শেষ অবধি। বিক্রি করি দাও— টাকা নিয়ি বরং অন্য জায়গায় চলি যাবু। সবারই তাই মত স্যর, আমার কথা কেউ শুইনল নি। পরশু দিন থেকতি মাটির বাড়িটা ভাঙা শুরু হবে স্যর।

বুলার কণ্ঠস্বরে আন্তরিক ব্যথা ফুটে ওঠে। রথের চাকার পাশে বসে থাকা একটা বুড়ো মতো লোক চোখ যার আশফলের মতো ঝাপসা বলে— আমাদের সবাকেই বোধহয় এ গ্রাম থেকতি চলি যেতি হবে। কোম্পানি এ সব জায়গা কিনি লিবে।

ক্ষমা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কোনও কথা বলছিল না। মণীশ বলেন— চলো বুলা একটু বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটি। কতদিন পর এলাম এখানে।

বুলা সামনে হাঁটতে হাঁটতে বলে— স্যর কউঠি থাকবেন তাহলি এখন? কলিকাতার বাড়ি তো ছেড়ি দিতে হবে— এঠিও কোনও জমি জ্যায়গা নাই—

ক্ষমা মজা করে হেসে বলে— চলো, আমরা এবার নিশ্চিন্দিপুরের খোঁজেই বেরোই— দেখি কোথায় আছে সে গ্রাম। সেখানে নিশ্চয়ই জায়গা জুটে যাবে।

এগোতে থাকে তিনজনে। হাওয়া বইছে। চুল সমানে উড়তে থাকে ক্ষমার। এডওয়ার্ড খাঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখে নৌকো তৈরি হচ্ছে বাঁধের পাশে। ধনুকের মতো বাঁকানো লম্বা নৌকোর কাঠ— গুন দিয়ে বাঁধা খুঁটির সঙ্গে। একটা বিরাট নৌকোর প্রায় সবটাই তৈরি হয়ে গেছে। তক্তার গায়ে লোহার জলুই মারছে মিস্ত্রিরা। মণীশ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন— এই তোমাদের কারখানা? এখানেই নৌকো বানাও তুমি?

— হ্যাঁ স্যর, আসুন না।

বাঁধ থেকে নেমে ওরা তিনজন গিয়ে দাঁড়ায় পরিষ্কার চাতালটার ভিতরে। কাঁচা কাঠের কেমন একটা সুঘ্রাণ। দূরে ঝাউবনের নীল সীমানা দেখায় যেন পাহাড়ের মতো। টি-রি-রি-ক টি-রি-রি-ক শব্দে একটা পাখি ডাকছে। প্রায়-সমস্ত নৌকোটার এরাপের উপর বসে একটা মাছরাঙা পাখি।

ক্ষমা বলে— নৌকোটা কবে শেষ হবে তোমার?

বুলা বলে— তা আরও সপ্তাহখানেক লাগবে বউদি। গাওনা করা হয়নি। গাওনা করি আলকাতরা দিতি হবে— তারপর গঙ্গাপূজা দিয়ি ভাসাব জলে।

ক্ষমা এক লহমা তাকিয়ে থাকে হাউস বোটটার দিকে যেরকম হাউস-বোটে মণীশের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়েছে ক্ষমা। মাঝে মাঝে যে ভাল লাগেনি এমন নয় কিন্তু প্রাণ বরাবর কেঁদে উঠেছে ডাঙামাটির জন্য যেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়াতে পারবে। ভয় পেয়েছে এই ভেবে যে মণীশ চিরজীবন এরকম ভাসমান অবস্থায় থাকবে নাকি। নৌকোয় কি সংসার পাতা যায়? একান্ত সংসার আর তাহলে হবে না দু'জনের?

ক্ষমা বলে— কামরাটাকে আর একটু বড় করে বানানো যায় না বুলা।

বুলা বলে— তা যাবেনি কেন বউদি। বানানো যায়ই তো।

মণীশ বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে বলেন— কেন বলো তো ক্ষমা?

একটু থেমে খুব আস্তে আস্তে ক্ষমা বলে— আমরা যদি এরকম একটা নৌকোই কিনে নিই? যেটা হবে আমাদের থাকার জায়গা।

মণীশ বলেন— তার মানে? নৌকোয় নৌকোয় বাকি জীবন কাটাবে নাকি? নৌকো নিয়ে তো তোমার কত নালিশ ছিল।

সংসার পাতার জন্য স্থায়ী স্থির ডাঙা চাই। নৌকোয় তো আর সংসার পাতা যায় না—

ক্ষমা বলে— কিন্তু মানুষ যদি জেনে ফেলে তার স্থির ডাঙা বলে সত্যি কোথাও কিছু নেই। তার নিজস্ব পৃথিবীর কোনও অস্তিত্বই নেই— তাহলে এরকম ভেসে ভেসে বেড়ানোটাই মন্দ কী? অন্তত একটা জিনিস তো করতে পারব আমরা—

কী? মণীশ জিজ্ঞাসা করেন—

ক্ষমা বলে— ভাসতে ভাসতে তোমার সেই নিশ্চিন্দিপুর খুঁজে বেড়াতে পারি তো অন্তত যেখানে আমরা নোঙর ফেলব— যতদিন না জেনে যাচ্ছি সে নিশ্চিন্দিপুর নামে কোথাও আসলে কোনও গ্রাম আজ আর নেই। সভ্যতা সমস্তটাই কিনে নিয়েছে।

বুলা উৎসাহের সুরে বলে— নিশ্চিন্তিপুর যাবেন বউদি? সত্যি তো আছে এখানে সেরকম একটা গ্রাম করঞ্জলির পরে। দু'জোয়ারের রাস্তা এখান থেকতি।

হাসেন মণীশ। বলেন— না, না, সে নিশ্চিন্দিপুর নয় বুলা। বুঝতে পারে না ঠিক বুলা। কটা নিশ্চিন্দিপুর থাকবে আবার এখানে? তবুও বলে— সি আপনারা যেঠিই যান আমরা কামরা বড় করি দিবু আপনারা দু'জনে আরামে থাকতি পারবেন। আমিও বেশ আপনাদের নৌকোর মাঝি হবু। এ-গ্রাম বিক্রি হয়ি গেলি আমিই বা আর কউঠি যাবু? দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুলা।

মণীশ রহস্যময় গলায় বলেন— সত্যি তুমি আমাদের মাঝি হবে তো? ভেবে দেখো।

বুলা মাথা নাড়ায়— হবু স্যর।

মণীশ আর ক্ষমা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। যে-হাসির অর্থ তারা নিজেরাই জানে না। দু'জনেই তাকিয়ে থাকে সেই প্রায়-সমাপ্ত নৌকোটার দিকে। নৌকোটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে দু'জনকে আর দু'জনে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন এক অবাস্তব অলীক জীবনের সম্ভাবনার সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা। এখন তাদেরই শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সে-জীবনটা অলীক না সত্য তা স্থির করার।

ঝোড়ো হাওয়া ঝাউবনের মধ্য দিয়ে বয়েই যেতে থাকে অস্ফুট অব্যক্ত শব্দ করে।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

বড় গল্প

বারাণসী মেঘ

গৌর মিত্র

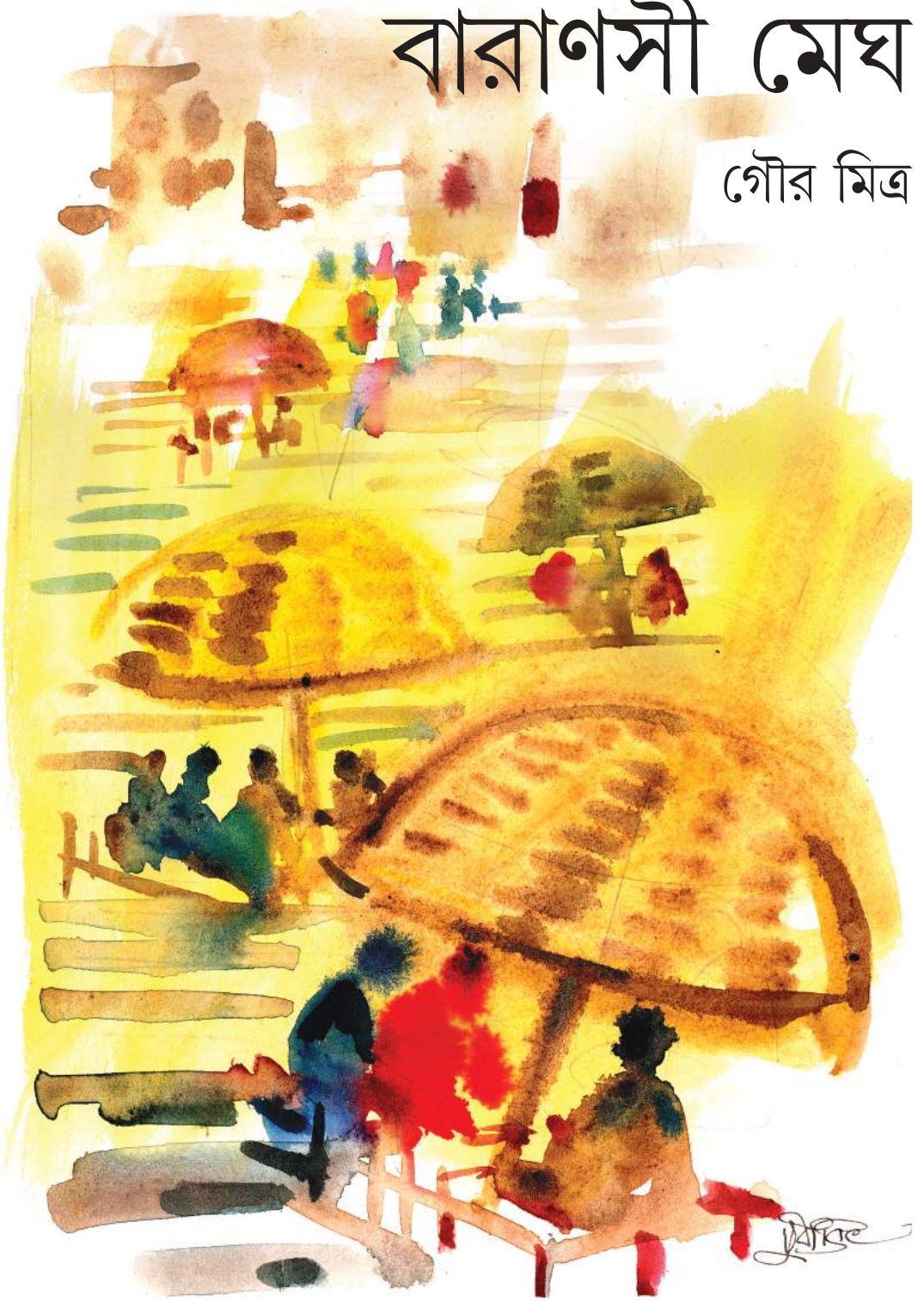

গড়িয়াহাট ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আছি বাস ধরার জন্য। হঠাৎ চোখে পড়ল উল্টোদিকের বাসস্টপে সৌপর্ণ। রাস্তা পেরিয়ে তার কাছে যাওয়ার আগেই একটা বাস এসে থামল। যখন সেখানে পৌঁছলাম—বাস চলতে আরম্ভ করেছে। দেখলাম সে ফুটবোর্ডে ঝুলছে। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম আগের জায়গায়। আমাকেও তো বাস ধরতে হবে।

আজ অনেকদিন পর গড়িয়াহাটে দূর থেকে সৌপর্ণকে দেখার পর থেকে বারবার পুরনো কথাগুলি মনে পড়ছে। নাহ্, আজই বাসায় ফিরে ওকে একটা ফোন লাগাব। ফোনের ব্যাপারটা মাথায় আসতেই মাস কয়েক আগে একটা ফোনের কথা মনে এল। হঠাৎই ফোন করে সৌপর্ণ জানতে চেয়েছিল, বেনারসে যাওয়া-আসা, দিন চার-পাঁচ থাকা-খাওয়ার আনুমানিক বাজেট কত!

প্রশ্ন শোনার পর অবাক হয়ে জবাব দিয়েছিলাম—কতই বা! তোদের দু'জনার জন্য হাজার আট-দশেক। বাজেটের অঙ্ক শুনে ফোন রেখেছিল সৌপর্ণ! আজ সে কথা মনে পড়তেই বাসায় ফিরে ফোন করলাম। কয়েকবার ডায়াল করেইও নো রিপ্লাই। ভাবলাম—হয়তো বাসায় ফেরেনি। কিন্তু সুপর্ণা? সেও কি বাসায় নেই? ফোন রেখে বারান্দায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবছি—সৌপর্ণ গড়িয়াহাট থেকে বাসে ওঠার সময় ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ঝুলছিল। কোনও বিপদ হয়নি তো? আধপোড়া সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে গুঁজে আবার ফোনের কাছে এলাম। ভাবছি—কী হতে পারে সৌপর্ণর! আশঙ্কায় ছটফট করতে করতে আবার ফোন তুলে ডায়াল করতেই—ওপ্রান্তে সৌপর্ণর গলা—হ্যালো?

—কী রে, কখন থেকে ফোন করছি কোনও সাড়াশব্দ নেই! ব্যাপার কী? তোরা কি ঘরে ছিলি না?

—ছিলাম। আসলে ডাঃ নায়েকের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

—এ তো রাতে ডাঃ নায়েক? সুপর্ণা না তোর, সমস্যা কার?

সৌপর্ণ কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর চাপা গলায় বলল, এখন বলা যাবে না দেবায়ন। কাল বিকেলে যদি কফি হাউসে একবার আসতে পারিস, শোনাব। বড্ড টেনশনে আছি।

ফোনে তার গলার আওয়াজ শুনে মনে হল সত্যিই সে টেনশনে আছে। ওকে ভরসা দিয়ে বললাম—শোন, টেনশন করিস না। কাল বিকেলে কফি হাউসে তোর জন্য অপেক্ষা করব।

পরদিন একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা কফি হাউসে এলাম। দূর থেকে দেখলাম সে একা বসে আছে। মনে হয় সে আজ অফিস যায়নি। আমি তার সামনের চেয়ারে এসে বসসেই সৌপর্ণ নড়েচড়ে বসল। এখানকার কর্মীরা আমাদের আড্ডার সব বন্ধুকেই চেনে। ওদের মধ্যে একজন কাছে এসে বলল—কী ব্যাপার বাবু সৌপর্ণ? তোমাকে তো আজকাল দেখাই যায় না! আমাদের না হয় ভুলে মেরেছ, কফি হাউসকেও ভুলতে চলেছ?

অনুভব কলাম ওরাও আমাদের জন্য ভাবে। কফি হাউস, কফির উগ্র গন্ধ, সিগারেটের ধোঁয়া, কাস্টমারদের চিল-চিৎকার—এ সব কিছুর মিলিত রসায়ন—কফি হাউসের অনাবিল আনন্দ। সেই আনন্দ উসকে দেওয়ার জন্য ওদের পরিশ্রম, ভালবাসা, সেটা কি কম কথা? কত ভালবাসা, প্রাণ-মনের দেওয়া-নেওয়া, সম্পর্ক ভাঙা-গড়ার সাক্ষী এখানকার চেয়ার, টেবিল, কাপ-ডিশ। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ এক মহামিলন কেন্দ্র। হিন্দু-মুসলমান-জৈন-খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—সকলের তীর্থক্ষেত্র—কফি হাউস। চেয়ারে বসে সৌপর্ণকে দেখছি আর ভাবছি। হঠাৎ ওয়েটার রবি এসে বলল—দু'জনই চুপচাপ বসে? কোনও চাপে আছ বোধহয়? আমি বুঝলাম—আমাদের চোখে মুখের উদ্বেগ ধরা পড়ে গেছে রবির কাছে। তাকে হেসে বললাম—নো চাপ ব্রাদার। তুমি আমাদের জন্য আপাতত কফি দিয়ে যাও। রবি মুচকি হেসে চলে যেতেই সৌপর্ণকে বললাম—এবার বলতো সমস্যাটা কী?

সৌপর্ণ আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে বলল—সে অনেক কথা। বলতে গেলে প্রাচীন ইতিহাস। তার ভিতর যেটুকু বুঝেছি, মনে হয়েছে শুরুটা বেনারসে।

—বলিস কী সৌপর্ণ! বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে! খুলে বলতো সবটা!

—তার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই দেবায়ন। গলার ভেতর কিছু একটা দলা পাকিয়ে আছে।

মনে মনে ভাবলাম, থাকবেই তো! মনের অনেক কথা গলার ভিতর এসে দলা পাকিয়ে হামলে পড়ে। শুকিয়ে আসে খাদ্যনালীর নরম পর্দা। সৌপর্ণর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে কীভাবে! যা অনিবার্য তাকে রোখা কার সাধ্য? কফির কাপে চুমুক দিয়ে গলা ভেজাল সৌপর্ণ। হাতে ধরা সিগারেটটা ধরিয়ে কয়েক টান মারার পর অনেকটাই টেনশন-মুক্ত মনে হচ্ছে তাকে। চারপাশ দেখে নিয়ে শুরু করল সুপর্ণার জন্মস্থান বেনারসের বৃত্তান্ত। আমি মগ্ন হয়ে শুনে চললাম—সুপর্ণার বালিকাবেলার অজানা কাহিনি...

সুপর্ণার জন্ম বেনারসের সেনা নিবাসে। তার বাবা সেনাবিভাগের কর্মী ছিলেন। সেই সুবাদে আর্মি কোয়ার্টারে থাকতেন। জন্মের পর প্রায় নয় বছর বয়স পর্যন্ত সুপর্ণা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে সেখানে ছিল। এরপর তার বাবা বদলি হন তেজপুরে। অবসরের বছরখানেক আগে কলকাতায় বদলি হয়ে চলে আসেন।

কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে সুপর্ণার কাকা থাকতেন। ভদ্রলোক বস্ত্র ব্যবসায়ী। নাকতলায় তাঁর নিজস্ব দোকান। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সংসার। ওঁদের কোনও সন্তান ছিল না। সে কারণে তাঁরা সুপর্ণাকে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। তেজপুরে থাকাকালীন স্কুল ছুটিছাটার সময় সুপর্ণা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে কাকার বাড়িতে আসত। দুটি পরিবারের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কের অবনতি হয়নি কখনও। সুপর্ণার বাবার ইচ্ছে ছিল অবসরের কলকাতায় নয়—গুয়াহাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। সে কথা জানাতে ভাই বিপুলকে একদিন ডেকে বললেন—শোন বিপুল সারাজীবন বাইরে কাটালাম। আপনজন

বলতে তোরা আর আমার দীর্ঘদিনের আর্মি বন্ধুরা। সবাই মিলে ঠিক করেছি—বাকি জীবনটা সবাই মিলে গুয়াহাটিতে কাটিয়ে দেব। সেখানে সস্তায় জমিও কেনা আছে। ভাবছি আগামী বছর—

দাদাকে বাধা দিয়ে ভাই বিপুল বলল—বলো কী দাদা? আমরা থাকতে তোমরা অন্যত্র বাস করবে? সুপর্ণা কি আমাদের কেউ নয়? মিলিটারিতে চাকরি করে তোমার মনটা না হয় শক্তপোক্ত, কিন্তু আমরা?

—সে কথা আমি বলছি না বিপুল। এখান জমিজমার যা দাম! ওখানে বরং অনেক সস্তা। তাছাড়া সুপর্ণার পড়াশোনা, বিয়ের ব্যবস্থা—এ সব কি কম টাকায় হয়? তাই ভাবছিলাম—

—তোমার ভাবনা নিয়ে তুমি থাকো। এ বাড়িতে কী তোমাদের থাকার জায়গার অভাব হবে?

—না, না, তা বলছি না। আসলে গোটা জীবনটাই তো বাইরে কাটালাম। এখন কি কলকাতা মন বসবে? তাছাড়া ওখানে থাকলে কাজেরও একটা বন্দোবস্ত হবে।

—অসম্ভব! অবসরের পর চাকরি! তুমি কি অভাবী মানুষ?

ভাই-ভাই বউয়ের আন্তরিকতা আর জোরাজুরিতে শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে যান বিকাশ। অবসর নেওয়ার পর স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে বাঁশদ্রোণীর বাসভবনে। অন্যদিকে সুপর্ণা তেজপুর থাকাকালীন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। পাস করার পর কাকার বাড়িতে থেকে কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শুরু করল।

এদিকে কলকাতায় ভাইয়ের বাড়িতে থিতু হওয়ার পর বিকাশবাবু একদিন ভাইকে পাশে বসিয়ে বললেন—শোন বিপুল, সুপর্ণা কলেজে পড়ছে। যদ্দুর ইচ্ছে পড়ুক, তবে বুঝিস তো—মেয়ে সন্তান। সময়মতো বিয়ে থা দিতে হবে তো? তুই ভাল পাত্র খোঁজা শুরু কর। মানুষের জীবন, এই আছে এই নেই...।

দাদার কথায় মনমরা হয়ে বিপুল বলল—তোমার এমন হতাশা মানায় না। তুমি না মিলিটারিম্যান?

—ওরে পাগল, মিলিটারিরা কী অমরত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আসে? যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মৃত্যু হলে মানুষের মনে অর হওয়া যায়! আমি এখন আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ। সাদামাটা জীবন। এ জীবনের কী আর মূল্য ভাই?

—সব মানুষের জীবনই অমূল্য। পরিবারের কাছে, আপনজনের কাছে সেই অমূল্য জীবনের অবসান ঘটলে সংসারে হাহাকার ওঠে। তাছাড়া এমন কী-ই বা বয়েস তোমার?

—বয়েস কি মৃত্যুর ধার ধারে? সময় হলেই তাকে চলে যেতে হয়। তাই বলছিলাম—মেয়েটাকে পাত্রস্থ না করে যদি মারা যাই, সে কথা বেদনার!

—সুপর্ণা তো আমাদেরও সন্তান! তাকে সুপাত্রে বিয়ে দেওয়ার দায় আমাদেরও। তুমি চিন্তা কোরো না। মাথা ঘামিও না।

—বেশ, যা ভাল বোঝো কোরো। আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না।

নাহ্... মাথা ঘামানোর দরকার হয়নি। সুস্থ শরীরে, হাসতে হাসতে চলে গেলেন বিকাশবাবু। জীবন যে 'পদ্মপাতায় জল' সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এক বৃষ্টি বাদল রাতে টুক করে চলে গেলেন ইহলোকের মায়া কাটিয়ে। সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় বসে, স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ ভয়ানক হার্ট অ্যাটাকে তার হৃদপিণ্ডের ওঠানামা থেমে যায়।

মায়ের আর্তচিৎকারে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে সুপর্ণা। বাকিরা সবাই তার কান্নার আওয়াজে। বিপুল তার দাদার নিষ্প্রাণ শরীরে চোখ বুলিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিজের বুক চাপড়ে বলতে—তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে দাদা?

বিকাশবাবুর আকস্মিক মৃত্যু শোকাচ্ছন্ন করল গোটা পরিবারকে। তাঁর শেষ কাজ—শ্রাদ্ধশান্তি মিটতেই কিছুদিন পর বিপুল তার বউদিকে আলাদা করে ডেকে বলল—তুমি চিন্তা কোরো না বউদি। কাল অশৌচের বছর কাটলেই—সুপর্ণার পাত্র দেখা শুরু করব। ভেবো না, তোমরা অসহায়। আমরা চিরকাল তোমার পাশে থাকব...।

কথা রেখেছিল বিপুল। বউদি আর ভাইঝিকে আগলে রেখেছিল বুক দিয়ে। তাদের স্নেহচ্ছায়ায় সুপর্ণা বেড়ে উঠতে লাগল।

কফি হাউসের চেয়ারগুলি ক্রমশ দখল হতে লাগল সন্ধের দিকে। এ সময়টা ভিড় বাড়ার। অফিস-ফেরতা বাবু, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আগমনে অল্প সময়ের মধ্যে 'হাউসফুল'। ধূমায়িত কফির সম্মোহনী সুবাস আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে নিয়ে আমাদের দু'বন্ধুর আলোচনা চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়ল—সৌপর্ণ বারবার ঘড়ি দেখছে। বাড়ি ফেরার জন্য তার ব্যগ্রতা আন্দাজ করে বললাম—হ্যাঁরে, তোর কি বাড়ি ফেরার খুব তাড়া আছে? আমতা আমতা করে সৌপর্ণ বলল—তা একটু আছে রে দেবা। এখান থেকে বেরিয়ে বাজার হয়ে ফিরতে হবে।

—বাজার! তার মানে সুপর্ণা রান্নাবান্না করতে পারছে?

—সে সব ঠিক আছে। ঘরকন্নায় কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা যে-টুকু তা রাতের বেলায়। রোজ নয়, মাঝে মাঝে। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে। ঘনঘন নিশ্বাস ফেলে। অস্ফুটে কী যে সব বলে—পরিষ্কার বোঝা যায় না।

—যেটুকু বোঝা যায় সেটুকুই বল!

—বেনারসের কথা, সৌরভী—আরও কী সব! মনে রাখতে পারি না।

—আচ্ছা, তোদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোনও সমস্যা!

—আগে তেমন কোনও সমস্যা হয়নি, ইদানীং অনুভব করছি।

—ডাক্তার কী বলছে?

—ডিপ্রেশন। অথচ—

—অথচ এসব কিছুই হয়তো না। এই তো? মানে তোর সেটাই মনে হয়?

—দেখ দেবা, বিষয়টা আমি মেলাতে পারছি না। তাই বলছিলাম—বেনারস বেনারস করে যখন অস্থির হয়ে পড়ছে, সেখানে একবার গেলে কেমন হয়?

—মন্দ হয় না। ঘোরাও হবে, ওর ডিপ্রেশন দূর করার কোন রাস্তাও হয়তো পাওয়া যাবে। আচ্ছা, বেনারসে ওদের কোনও আত্মীয় পরিজন থাকেন কি?

—যতটুকু জানা—তেমন কেউ নেই। তবে একটা বাড়ি, পাশে নদী, বিশাল চাতাল, মন্দির...আরও বিড়বিড় করে কী সব বলে যায়, বোঝা মুশকিল।

—আমার মনে হয়—কল্পনায় এসব ভাবনা এসে তাকে—

—জানি না ভাই। আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়।

—আচ্ছা, এর পরের কোনও ঘটনা শোনা, যদি কিছু আন্দাজ করা যায়।



—আজ থাকুক। মনটা উসখুস করছে। তোকে জানিয়ে হালকা হলাম। রাত হচ্ছে। বাড়িতে সুপর্ণা একা।

সুপর্ণার অবসাদ, সৌপর্ণর অসহায় মুখ কেন যে আমাকে বিচলিত করছে বারবার! সত্যিই কি বেনারসে কোনও রহস্যর পেছনে মন ছুটছে সৌপর্ণর? কেনই বা সেখানে যাওয়ার জন্য আকুতি? তবে কী ওদের দাম্পত্য জীবনে কোনও সমস্যা? কিন্তু তাই বা হয় কি করে। ওদের বিয়েটাতো দেখাশোনা করেই হয়েছিল?

সুপর্ণার বাবার মৃত্যুর পর ওর কাকা সুপর্ণার গ্র্যাজুয়েশন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন—সে কথা তার মুখেই শোনা। বিএ পাস করার পর সুপর্ণার মা তার দেবরকে ডেকে জানিয়েছিলেন তাঁর মনের ইচ্ছা। সুপর্ণার কাকা বলেছিলেন—ও এখনও ছেলেমানুষ। পড়ুক না যদ্দুর ইচ্ছে।

দেবরের কথায় বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—মেয়ে সন্তান, আজ হোক কাল হোক বিয়ে দিতে হবে। ভাল পাত্র দেখে তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিতে পারলে আমার বুকের বোঝা হালকা হয়।

শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হয়ে পাত্র দেখা শুরু করেন বিপুল। দু-একটা পাত্র দেখার পর আচমকাই একদিন বিপুলবাবুর শ্যালক তরুণ এসে বলল—জামাইবাবু, আমার অফিসে দারুণ একটা পাত্র আছে। খুব ভাল ছেলে। বিকম অনার্স আমাদের অফিসে অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মাইনেও মন্দ নয়। বাবা, মা কেউ নেই। শুনেছি আত্মীয়দের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। শক্তিগড়ে ওদের শরিকি বাড়ি। সেসব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় মেসে থাকে।

—বেশ তো বলছ যখন, একদিন নিয়ে এসো সঙ্গে করে।

সৌপর্ণ তরুণের প্রস্তাবের বিষয়টা টেলিফোনে আমাকে জানালে, আমিও এক কথায় রাজি হয়ে যাই তার সঙ্গে যেতে। এক রোববার বিকেলে দু-বন্ধু হাজির হলাম— সুপর্ণাদের বাঁশদ্রোণীর বাড়ি।

গল্প কথায়, চা-জলখাবারে কিছুটা সময় কাটানোর পর অন্দরমহলের দরজার পর্দা সরিয়ে হাজির হল সুপর্ণা। ঘরের আলোয় উজ্জ্বল লাগছিল তার মুখখানা। পরনে জাফরান রঙের ঢাকাই জামদানি। ঠিক এমনই একটা শাড়ি আমার মায়েরও ছিল। সুপর্ণার গায়ে গাঢ় সবুজ ব্লাউজ। প্রশস্ত ললাটের মধ্যিখানে মেরুন টিপ। ঘন কালো চুলের মোটা বিনুনি কাঁধের পাশ দিয়ে বুকের ওপর এসে থমকে দাঁড়িয়ে। চমৎকার গায়ের রং। আমার চোঁখে সে বেশ সুন্দরী-বলাই বাহুল্য।

আমি তাকে সামনের সোফায় বসার অনুরোধ করতেই সে বসল। সৌপর্ণকে কানে কানে বললাম—কী রে, পছন্দ? সৌপর্ণ মুখ টিপে হাসতেই বললাম—কিছু জিজ্ঞাসা করবি? সে ঘাড় নেড়ে জানাল—না। অগ্যতা আমি দু-চার কথা বলার পর আসল কথায় এলাম। বললাম— তুমিই বলি, কী বলো সুপর্ণা! সে লাজুক হেসে বলল—তা-ই বলবেন। আমি তো বয়সে ছোট, তাই—

— ঠিক, ছোট বোনের মতো। একটাই কথা বলার আছে তোমাকে। সৌপর্ণ খুব বড় বংশের ছেলে। এখন বংশ গিয়ে শুধু পদবিটাই আছে। একা হলেও নির্বান্ধব নয়। আপাতত একটা মেসে আছে। ভবিষ্যতে কলকাতায় পাকাপাকি থিতু হওয়ার অপেক্ষায়। তোমার আর কিছু জানার আছে?

—না।

—আর একটা কথা। সৌপর্ণ একটু অন্য প্রকৃতির। অর্থবল না থাকলেও মনোবল অটুট। পিতৃ-মাতৃহীন সংসারে একটু ভালবাসা ছাড়া ওর চাইবার কিছু নেই। তোমাকে এটুকুই জানানোর।

—আমি তা হলে উঠব দাদা?

সুপর্ণার গলায় মায়াময় 'দাদা' ডাক শুনে সত্যিই আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবলাম—ও মেয়েটিই পারবে সৌপর্ণকে ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে। আমি হেসে জবাব দিলাম—

—এসো বোনটি। আশা করি আমাদের দেখা হবে।

বছরখানেক অপেক্ষার পর আবার দেখা হয়েছিল। বাঁশদ্রোণীর বাসভবনের ছাঁদনাতলায়। বিয়ের পরদিন বেহালার শীলপাড়ার বাসাবাড়িতে দেড় কামরার ঘরে বউকে নিয়ে উঠেছিল সৌপর্ণ। ওদের বিয়েটা খুব ধুমধাম করে হয়েছিল তবে বধূবরণ অনুষ্ঠান সাদামাঠা করতে হয়েছিল সুপর্ণার অনুরোধে। প্রথম রাত্তিরে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখে আমাদের দু'জনকে বলেছিল—দেবায়নদা। বোনের একটা আর্জি আছে।

—বেশ তো, শোনাও তোমার আর্জি!

—বধূবরণ অনুষ্ঠানটা ঘটা করে না করলেই নয়?

—বেশ তো, বলো, কী করতে চাও?

—শুধু জনাকয় আত্মীয়, বন্ধুদের নিয়ে করা যায় না? বাসাবাড়িতে বাস করে গাদাগুচ্ছের অর্থব্যয় কি খুবই প্রয়োজন দাদা?

—গুড। আমি খুশি হলাম। ভরসা হচ্ছে যে, তুমিই পারবে—আমার বন্ধুকে সুন্দর একটা সংসার উপহার দিতে।

বিয়ের এক বছর পর বেহালাতেই দু-কামরার একটা বাসা ভাড়া নিয়ে চৌরাস্তার কাছেই বসবাস শুরু করল ওরা দু'জন। বছর দুয়েক ওরা দুটিতে সেখানে বেশ ভালই ছিল, তা হলে হঠাৎ কোন কারণে সুপর্ণার মতো বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী মেয়ে ডিপ্রেশনে ভুগবে...! হঠাৎ একটা বিষয় আমার মাথায় এসে ভর করল—ভাবলাম, তাই তো?

তিন বছর ওদের বিয়ে হয়েছে। সৌপর্ণর মাইনেও কিছুটা বেড়েছে। বাসা বাড়িরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে কিন্তু যা ঘটেনি? তিন বছর বিবাহিত জীবনে ওদের মধ্যে তৃতীয় কারও আগমন ঘটেনি। আমরা একদিন সৌপর্ণর বাসায় আড্ডা দিতে দিতে ইয়ার্কি করে বলেওছিলাম। আমি তো দু'কদম আগ বাড়িয়ে সুপর্ণাকে বলেছিলাম—কী গো, আমাকে 'কামা' হওয়ার সুযোগ দিতে এত অনাগ্রহ কেন?

আমার কথা শুনে চোখ প্রায় কপালে তুলে সুপর্ণা বলল, কামা? এমন বাক্য তো কখনও শুনিনি দেবায়নদা?

বুঝলাম—ইয়ার্কিটা ধরতে পারেনি। শেষপর্যন্ত বোঝাতে হল 'কামা' শব্দর চলতি অর্থ—

—বুঝলে সুপর্ণা, 'কা' হল, কাকার প্রথম শব্দ। আর 'মা' মামার প্রথম শব্দ। দুটো এক করে তবেই না কামা! এবার বুঝলে?

—বিলক্ষণ। একই দেহে দুই রূপ। সত্যি! এজন্যই তুমি দেবায়ন। তবে জানোতো দাদা, যা বাস্তব, তাকে না মেনে উপায় কী?

—কোনটা বাস্তব! সন্তান হওয়া, নাকি না হওয়া?

একদলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুপর্ণা। মনে হল তার চোখের কোণায় জল চিকচিক করছে। মুখ সরিয়ে হাতের চেটোয় আড়াল করল জল।

—আসলে তোমার বন্ধুর যা বেতন তাতে আমাদের হয়তো চলে যায়, কিন্তু একটা সন্তান মানুষ করা কি সহজ সাধ্য? ওর প্রোমোশন হলে ভাবব। তুমি বরং 'কামা' ডাকের জন্য আর কিছুদিন ওয়েট করো।

কফি হাউস থেকে ফিরে, আমার ঘরের ভেতর মৃদু আলোয় বসে ভাবনার অতলে চলে গিয়ে কী নিয়ে ফিরলাম? শুধু হতাশা, দুঃখ আর যন্ত্রণার নুড়ি পাথর? একটা মুক্তোদানাও কি পেতে পারতাম না?

সামনের সেন্টার টেবিলে রাখা ল্যান্ডফোনের আওয়াজে ফোন তুলে নিয়ে বললাম—হ্যালো।

—সৌপর্ণ বলছি। ঠিকমতো পৌঁছেছিস!

—হ্যাঁ। একদম ঠিক।

—শোন, বেনারসের ব্যাপারটা মাথায় রাখিস। তাড়াতাড়ি একবার...আর কিছু শোনা গেল না—শুধু যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া...।

ফোন নামিয়ে রেখে ভাবছি—সুপর্ণা খুবই বিচক্ষণা। স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত যে মেয়েটি মা হতেও পাঁচবার ভাবে—সে হঠাৎ কেন বেনারস যাওয়ার জন্য পীড়াপিড়ি করছে? শুধুই কি জন্মস্থান দেখার আগ্রহ? এমনও তো হতে পারে—তার বয়েস বাড়ছে অথচ এখনও সন্তানধারণের ঝুঁকি নিতে অনাগ্রহী। তার জন্যই কি হতাশা? অবসাদ? সে কারণেই কি একবার বেনারস দর্শনের আবদার?

ব্যাপারটা দোনামনা করে একবার বলেওছিলাম—সে বলেছিল—না রে, ওসব নয়! যেটুকু তোকে বলেছি—ওটুকু ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করা যায়নি।

আবার টেলিফোনে ঝন্‌ঝনানি। ফোন তুলতেই ও প্রান্তে সৌপর্ণ—

—কী রে, শুয়ে পড়েছিস?

—না, তোদের বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম। বল, আবার ফোন কেন?

—বলছিলাম, যত তাড়াতাড়ি পারিস ব্যবস্থা কর। আরও একটা রিকোয়েস্ট আছে।

—চিন্তা করিস না। টিকিট, হোটেল বুকিং, যাওয়া-আসা, থাকার যাবতীয় খরচা তোর অ্যাকাউন্টে ভরে দেব।

—না, না, ওসব নয়। তোকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। বিদেশ বিভুঁই, যাইনি কখনও। তুই না গেলে অসহায় বোধ করব।

অগত্যা ওকে সান্ত্বনা জানিয়ে বললাম—

—তোর বয়েসটাই পেকেছে, বুদ্ধি পাকেনি। ঠিক আছে যাব। চেষ্টা করছি সামনের সপ্তাহে বেরনোর।

—তুই বাঁচালি দেবা। না হলে আমি পাগল হয়ে যেতাম।

[দুই]

মে মাসের শেষ শনিবার। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। কেমন যেন নেশাগ্রস্তের মতো ঝিম মেরে আছে। এমন মেঘলা দিনে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবি—কখন ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি-বাদল দিন আমার একান্তই প্রিয়। বাবা-মা যখন বেঁচে ছিলেন, বৃষ্টি-বাদল দিনে আবদার করতাম—খিচুড়ি, ডিম ভাজা খাওয়ার। বাবা আরও এক কদম এগিয়ে মাকে বলতেন—শোনো, আজ ভুনা খিচুড়ি, সঙ্গে ইয়া লম্বা বেগুন ভাজা, আর ইলিশের পেটি ভাজা।

আসলে বাবা খুব খাদ্যরসিক ছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার—বাবা যেদিন মারা যান—সেদিনও ছিল বৃষ্টির। মনে আছে, বাবা সকালে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন—শোন, আজ তোর রেজাল্ট বেরবে। এমএসসি পাস করার খবরটা ফোনে জানাবি। বিকেলে তুই ফেরার আগেই সব ব্যবস্থা করে রাখব।

রেখেছিলেন সব। দুপুরের পর ফল বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে খবরটা জানিয়ে বলেছিলাম—বাবা, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি।

বাবা শোনার পর চিৎকার করে ফোনে বলেছিলেন—তা হলে আজ রাতে ফার্স্ট ক্লাস খিচুড়ি আর ফার্স্ট ক্লাস ইলিশ।

শেষ বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি বাবা ঘরের বারান্দায় পায়চারি করছেন। মা ব্যস্ত চায়ের আয়োজনে। বৃষ্টি জাঁকিয়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আর মেঘগর্জন, বাবা আপনমনে পায়চারি করছেন আর গাইছেন—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারেবার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার... ।'

বাবা রবি ঠাকুরের খুব ভক্ত ছিলেন। গানের গলাও ছিল দারুণ। মাঝে মাঝে একার মনে গান গাইতেন। মা, আমি পাশে বসে শুনতাম। সেদিনও শুনেছি। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে ভিজে জামা প্যান্টে বাবাকে প্রণাম করতেই—বাবা বুকে টেনে নিয়ে বললেন—

—আমি পারিনি। তুই পেরেছিস। তুই আমার গর্ব, অহংকার। আজ রাতে খিচুড়ি দিয়েই হোক তোর পাস করার উৎসব।

সত্যিই! উৎসবের মতোই হয়েছিল। পাশেই আমার কাকার বাড়ি। আলাদা হাঁড়ি হলেও—মনপ্রাণ আলাদা হয়নি। দুই ভাইয়ের যৌথ ব্যবসা। কাকার একমাত্র মেয়ে—সুনীতা। আমরা পিঠোপিঠি ভাই-বোন। সে আমার তিন বছরের ছোট।

আমরা দুই পরিবার সেদিন রাতে বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খিঁচুড়ি খেয়েছি। অনেক রাত অবধি হইচই করেছি। একবারও বুঝতে পারিনি—ভোররাতে বাবা নীরবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

আজও ঠিক তেমনই এক বৃষ্টি ভেজা সকাল। অথচ আমার মনে আজ আর বৃষ্টিমুখর বাদল দিনের কোনও আনন্দই নেই। জমাট বাধা মেঘ চিরে বৃষ্টির দাপাদাপি, কনকন ভিজে হাওয়া, কড়াৎ কড়াৎ শব্দে দশদিক বিদ্যুৎ বিস্ফোরণ—অথচ একটুও রোমাঞ্চ আমাকে স্পর্শ করছে না। আসলে মনের ভিতর জমাট দুঃখের মেঘ আমার বুকের ভেতর শুধু হাহাকার ছড়িয়ে দিচ্ছে। জানালার কপাটগুলো প্রবল হাওয়ার দাপটে খুলে খুলে বন্ধ হচ্ছে। অদ্ভুত এক শব্দ তরঙ্গ আমার মনের গভীরে এসে হামা দিচ্ছে, অথচ আমি— একা বসে নিভৃতে স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছি... ।

জানলার ফাঁক গলে বৃষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার শরীর। জানলার কপাট বন্ধ করে খাটের উপর এসে বসতেই হঠাৎ টেলিফোনের করুণ আর্তনাদ। খাট থেকে নেমে ফোন তুলে বললাম—হ্যালো?

ও প্রান্তে সৌপর্ণর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর—কী রে, মনে আছে তো!

—কী যে বলিস মাইরি। মনে থাকবে না মানে? আমি তো তোর মতো সংসার জালে বন্দি কোনও ইতর জন নই। আমি স্বাধীন এবং সার্বভৌম।

—যা বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে! তুই বেরোবি কখন?

—বৃষ্টিতে কলকাতা ডুবলেও তোর শুভযাত্রা ডুববে না, এটুকু বলতে পারি।

—আর একটা কথা। জানিস তো—

—বলতে হবে না। সব ব্যবস্থা পকেটে নিয়েই বেরচ্ছি। তুই এ ব্যাপারটা আগ বাড়িয়ে সুপর্ণাকে বলিস না। পেট পাতলা মানুষ তুই।

—ওকে বলার মতো কিচ্ছু নেই। তাছাড়া কাল রাত থেকে সে বেশ মস্তিতে আছে। মাঝে মাঝে গুনগুনিয়ে গান গাইছে।

—বুঝলাম। আসল রোগটা ওই বেনারসে। যদ্দুর মনে হয়, ওষুধটাও সেখানে মিলবে।

—তাহলে তো বাঁচি বন্ধু। তুই না থাকলে কী যে হত?

—কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণবিহীন অর্জুনের যা হত—

— সত্যি! তুই আমার জীবনে কৃষ্ণের মতোই

— বউটাকে সাবধানে রাখিস!

ও প্রান্তে সৌপর্ণ আমাকে জব্বর একটা গালাগাল দিয়ে ফোন রাখল, ব্যাগপত্তর গোছাতে গোছাতে হঠাৎ মনে পড়ল আজ তো শনিবার। মা বেঁচে থাকলে নির্ঘাত বাধা দিয়ে বলত—শোন দেবা, শনিবার কোথাও যাওয়া হবে না।

আজ বড্ড মায়ের কথা মনে পড়ছে। বাবা মারা যাওয়ার পরের বছর আমার চাকরি। প্রায় বছরখানেক আমার কোয়াটার্সে মা ছিলেন। আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দিতেন। আমি হাসতাম আর বলতাম— তোমার জেরক্স কপি যদি কাউকে পাই বিয়ে করবো।

না, অদ্যাবধি পাইনি। আমার কোয়াটার্সে থাকার তেরো মাসের মাথার পর—একদিন শনিবার বিকেলে মা হাসতে হাসতে চলে গেলেন। আর আমি—কাঁদতে কাঁদতে তাকে বিদায় দিলাম।

ট্রেন ছাড়ার প্রায় আধ ঘন্টা আগে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতেই এদিকে-ওদিকে খানিকক্ষণ চোখ বোলানোর পর আবিষ্কার করলাম—বড় ঘড়ির নিচে দাঁড়িয়ে কত্তা-গিন্নি চিপস্ জাতীয় কিছু চিবোচ্ছে। ওরা আমার উপস্থিতি টের পায় নি। দূর থেকে মনে হল, সুপর্ণা বেশ সুখে আছে। থাকারই কথা। বেনারস তার স্মৃতির শহর। ধাত্রীভূমি! সৌপর্ণর একটু টেনশন হবে। প্রথম সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে।

বেনারস আমি অনেকবার গিয়েছি। তবে এবারের যাওয়াটা অবশ্য অন্যরকম।

ওদের কাছাকাছি আসতেই সুপর্ণা দৌড়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল—এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম।

—কেন? তোমার বর থাকতে আমার প্রতি তোমার এমন আস্থা প্রকাশ মহাভারতীয় যুগের কোন মহীয়সী—

—সত্যি, তুমি পারো দেবাদা। তুমিই তো বলো—আমি তোমার ছোট বোন?

—তা ঠিক। তবে বুঝলে সুপর্ণা—আজ তোমার সাজগোজ, চনমনে ভাব দেখে মনে হচ্ছে—

—থাক। তুমি স্বার্থপর পুরুষ, তাই জীবনে কোনও নারীকে জায়গা দিলে না, পাছে সে তোমার স্বার্থে ভাগ বসায়!

—গালাগাল দিচ্ছ দাও। সব জবাব এক সঙ্গে দেব- বারাণসীর মহান তীর্থক্ষেত্রে। মনে থাকে যেন...

রাত আটটায় হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়ল আমাদের নির্দিষ্ট ট্রেন। রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টের যাত্রী আমরা। ট্রেনে উঠে আগেই আসন মিলিয়ে, মালপত্তর বাঙ্কে রেখে—আরামসে বসেছি। সুপর্ণাকে দেখেই মনেই হচ্ছে না, সে ডিপ্রেশনে ভুগছে। আমার উল্টোদিকে জানলার পাশে সুপর্ণা, তার পাশে সৌপর্ণ। বৃষ্টি থেমে গেলেও ঠান্ডা হাওয়া এসে জানলা গলে কম্পার্টমেন্টের অন্দরে। সুপর্ণা দু-পা তুলে বসে আছে জানলার পাশে। আমাকে আবদারের ঢঙে বলল—দেবাদা, আমি কিন্তু ঘুমোব না।

আমি বললাম—সারারাত জেগে বসে কাটাবে?

সুপর্ণা জানলার বাইরে চোখ রেখে বলল—দেবায়নদা, বাড়িতে রোজই ঘুমোই, বিশ্রাম নিই! একটা রাত না হয় জেগেই

কাটাব?

—সারারাত ঠায় বসে কাটাবে? আমি কিন্তু ঘুমোব!

—তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোও। আমি জানলার পাশে বসে, দু'চোখ ভরে দেখব—রাতের আকাশ। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ।

—বুঝলে সুপর্ণা—এমএ-টা পড়লে পারতে?

—তা হলে হয়তো—তোমার এমন সরল সোজা বন্ধুকে পেতাম না।

সুপর্ণা-সৌপর্ণর মৃদু দৃষ্টি বিনিময়, আমি হেসে বললাম,

—যাক নিশ্চিন্ত হলাম।

ট্রেন যাত্রীদের কোলাহল, চিৎকার-চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভাঙতেই দেখলাম—চারদিকে ভোরের আলো ফুটছে। সুপর্ণা একই রকমভাবে জানলার পাশে বসে আছে। উপরের বাঙ্কে সৌপর্ণ দিব্যি ঘুমোচ্ছে। সুপর্ণা জানলার বাইরে চোখ রেখে গায়ে ভোরের আলো মাখছে। হাওয়ায় উড়ছে তার এলো চুল। মাঝে মাঝে আঙুল ডগায় শাসন করছে এলোমেলো চুলের পাগলামি।

কাশী স্টেশনে ট্রেন থামতেই সৌপর্ণকে জাগিয়ে বললাম, ওঠ, লাগেজ গোছানো শুরু কর। পরের স্টেশন বেনারস। নামতে হবে। বেনারস স্টেশনে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছুঁতেই কামরার ভিতর তুলকালাম। যাত্রীদের মধ্যে প্রবল হুড়োহুড়ি। কুলিদের চিৎকার। ট্রেনের কামরা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা হতেই—আমরাও লাগেজ হাতে জনস্রোতে মিশে গেলাম। ধাক্কাধাক্কি সামলে বাইরে বেরতেই অটো রিকশা আর প্রাইভেট কারের ড্রাইভারদের প্রতিযোগিতা। এসব ব্যাপার সামলানোর অভিজ্ঞতা এর আগে বহুবার আমার হয়েছে। আমি সৌপর্ণ আর সুপর্ণাকে আড়ালে নিয়ে সোজা অটোস্ট্যান্ডে গিয়ে বললাম—গোধুলিয়া মোড়। আকাশডাঙায় যাব।

দরদাম করে চেপে বসলাম অটোতে। অটো চলতে শুরু করল শহরের প্রাণকেন্দ্র ছাড়িয়ে গোধুলিয়া মোড়ের দিকে। সৌপর্ণ আর সুপর্ণা পিছনের সিটে, আমি ড্রাইভারের পাশে। হঠাৎ চারপাশ দেখতে দেখতে সৌপর্ণ বলল, হ্যাঁ রে, এ তো দেখছি কলকাতার জ্যামজটকেও হার মানায়! এত ঘিঞ্জি শহর। আমি হেসে বললাম—ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনপদ। কাশীরাজের রাজধানী শহর। ঘিঞ্জি তো হবেই! স্বয়ং কাশীশ্বর বিশ্বনাথ এখানে বাস করেন!

স্টেশন থেকে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছনোর রাস্তাটা গোধুলিয়া মোড়ে এসে লম্বালম্বি আরও একটা রাস্তা চলে গেছে বাজারের দিকে। আমাদের অটো রিকশা গোধুলিয়া মোড়ের কিছুটা আগে আকাশগঙ্গার সামনে নামিয়ে দিল।

এই হোটেলটা আমার খুব প্রিয়। যতবার এসেছি এখানেই উঠেছি। পুরনো আমলের শৈল্পিক ছোঁয়া এ বাড়ির সর্বত্র। সাজানো, গোছানো, পরিপাটি হোটেল। এক সময় এ বাড়িটা রাজ পরিবারের কারও ছিল। পরে হয়তো হাতবদল হয়ে অনিমেষ যাদবদের পরিবারের কারও হাতে আসে। একদা বাসস্থান—বর্তমানে হোটেল। তবে প্রাচীন সৌন্দর্য একই রকম আছে।

দুটোর পর লাঞ্চ এল। সবটাই নিরামিষ পদ। সুগন্ধ চালের ভাত। মুগ ডাল, সবজি তিন রকম, চাটনি, পাঁপড় আর টক দই। দই তো নয়, যেন পয়োধী। তরিজুত করে খাওয়ার পর ঘণ্টা তিনেক নিপাট ঘুম। পাঁচটা নাগাদ আমার ঘুম ভাঙতেই বিছানা ছেড়ে বারান্দায়।

সৌপর্ণদের ঘর বন্ধ। ভাবলাম, ওদের জাগানো উচিত। দরজায় কড়া নাড়তেই সুপর্ণা দরজা খুলল। আমি তো অবাক! ওরা সাজুগুজু করে রেডি! সুপর্ণা হেসে বলল—আমরা তোমার প্রতীক্ষায়। তুমি রেডি হয়ে নাও। বেরোতে হবে না?

সুপর্ণাকে দেখে মনেই হল না, কাল রাতে ট্রেন জার্নি করে সে ক্লান্ত। চোখে-মুখে রাত জাগার চিহ্নই উধাও! মিনিট পনেরো লাগল আমার রেডি হয়ে বেরোতে। সুপর্ণাকে দারুণ তরতাজা লাগছে। চমৎকার সেজেছে। পরনে পান্না রঙের শাড়ি। গায়ে চেরি রঙের ব্লাউজ। কপালে আকাশনীল টিপ। হেসে বললাম,

—দেখে মনে হচ্ছে বাপের বাড়ি এসেছ! সুপর্ণা হেসে জবাব দিল—

—ঠিকই তো। বেনারস আমার বাবার বাড়ি। আমার দেশ।

মনে মনে ভাবলাম—এটা তার মনের বিশ্বাস। তার জন্মস্থান। দাবি করতেই পারে নিজের দেশ বলে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। মিনিট দশ-পনেরো সময় লাগে। ঘাটের কিছুটা আগে বাবা বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণার মন্দির। সুপর্ণাকে জায়গাটা দেখিয়ে বললাম—ওই যে রাস্তার উপর বিশাল গেটটা দেখছ—ওটা মন্দিরের প্রবেশপথের তোরণ। ওই তোরণের নিচে গলিপথ ধরে কিছুটা এগোলেই মন্দির। কাল খুব সকালে বেরিয়ে মন্দির দর্শন করে আমরা নগর পরিক্রমায় বেরব।

সৌপর্ণ সায় দিয়ে বলল—সেটাই ভাল। আজ বরং তোর ওই অশ্বমেধ ঘাট—

সৌপর্ণকে থামিয়ে বললাম, অশ্বমেধ নয়, দশাশ্বমেধ ঘাট। ওই ঘাট প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। শোনাব পরে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা মাইয়ার সন্ধ্যারতি আর গঙ্গার জলে দিয়া ভাসানোর গল্প ট্রেনে আসার সময় বলেছি। সুপর্ণা বলেছিল—তাহলে, প্রথমদিন আমরা আরতি দেখার পর—বেনারস শহর ঘুরে দেখব। আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম—বেনারস শহর সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে? বিশ্বের প্রাচীনতম লিভিং সিটি।

কথা শুনে সুপর্ণা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল—যেন সে সব জানে। তার জন্মস্থান বলে কথা!

আমরা কথায় কথায় এসে পৌঁছলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে। ঘাটের লম্বা সিঁড়িয়ে বসা অসংখ্য মানুষ। তারা সবাই উৎসুক হয়ে বসে আছে—সন্ধ্যারতি দেখার জন্য।

বারাণসীতে পুণ্যতোয়া গঙ্গার আকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি। পশ্চিমতীরে বরুণা, আর অসি নদীর সঙ্গমে বারাণসী। আমরা বসে দেখছি সূর্যাস্ত। গঙ্গার বুকে গেরুয়া রঙের ছড়াছড়ি। ওপারে কাশীরাজের প্রাসাদ। রামনগর। গঙ্গার গভীর থেকে উঁচু প্রাচীর। তার আড়ালে দুর্গ। চোখধাঁধানো প্রাসাদের মিনার আর গম্বুজ। চোখ জুড়ানো জৌলুস। সন্ধে সাতটা নাগাদ সূর্যাস্ত হল। মাইকে বেজে চলেছে—গঙ্গার স্তোত্র। ভজন গান। সাতজন ব্রাহ্মণ কুমার, অপূর্ব সৌম্য চেহারা। পরনে ধুতি, গায়ে উত্তরীয়। এক সঙ্গে বিশালাকায় শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে আরতির সূচনা। প্রজ্জ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ, তাদের আকারও বেশ বড়। সেগুলি হাতে নিয়ে শুরু হল সন্ধ্যারতি, গঙ্গা বন্দনা।

আমরা মগ্ন হয়ে দেখছি সেই অপূর্ব সন্ধ্যারতি। প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পর আরতি শেষ হল। রেশ রয়ে গেল মনের গভীরে। নদীবক্ষে বহু নৌকায় চড়ে দর্শনার্থীরা আরতি দেখছিল আর মাঝে মাঝে তাদের হাতের ক্যামেরা ঝলসে উঠছিল। আমরা তন্ময় হয়ে দেখছিলাম আরতি। শেষ হওয়ার পর হঠাৎ সুপর্ণা এগিয়ে এসে বলল—কত মানুষ দিয়া ভাসাচ্ছে, আমিও ভাসাব।

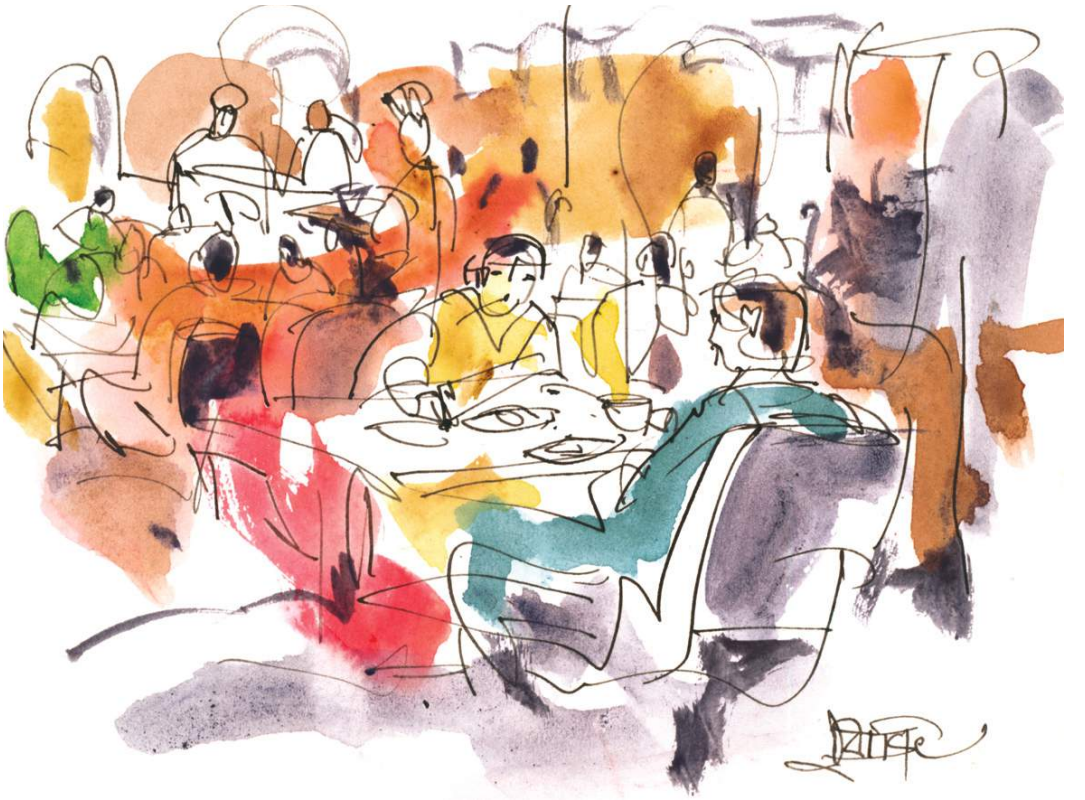

আমি হেসে বললাম—জানো তো, মানুষ তাদের মনের ইচ্ছাপূরণের জন্য এখানে দিয়া ভাসায়। তোমার যদি কামনা-বাসনা কিছু থাকে, দিয়া ভাসিয়ে গঙ্গামাইয়াকে তোমার ইচ্ছে জানাতে পারো।

সুপর্ণা দ্রুত সিঁড়ি টপকে ঘাটের পাশে একটি ছেলের কাছ থেকে ফুল আর শালপাতার ডিঙিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে গঙ্গার জলের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, জানো দেবায়নদা, আমার মনে হচ্ছে, ওই আরতি আমি কতবার দেখেছি। গঙ্গায় দিয়া ভাসিয়েছি কতবার! সব কিছু যেন আমার মনের গভীরে স্মৃতিবন্দি হয়ে আছে।

অসংখ্য আলোকমালায় উজ্জ্বল দশাশ্বমেধ ঘাটের চাতালে দাঁড়িয়ে সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে মনে হল—কলকাতায় ডাঃ নায়েক যা অনুমান করেছিলেন, সুপর্ণা কি সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে? অতীতের কোনও স্মৃতি কি তার মনের গভীরে আলোড়িত হচ্ছে?

—কী রে, ফিরবি না? রাত কিন্তু সাড়ে ন'টা!

সৌপর্ণর ডাকে আমি চমকে উঠতেই সম্বিত ফিরে এল। বললাম—হ্যাঁ, চল ফিরি। কাল সকালে আবার বেরোতে হবে।

সৌপর্ণ-আমি পাশাপাশি হাঁটছি, আমাদের সামনে সুপর্ণা। ফেরার পথে ডানদিকে বিশ্বনাথ মন্দির পেরিয়ে গোধুলিয়া মোড়ে এসে বললাম—জানিস সৌপর্ণ, এখানে একটা দোকান আছে। দেখবি নাকি পরখ করে?

প্রস্তাব শুনে সৌপর্ণ বলল, গিরিশ পার্কের কাছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ আর বিবেকানন্দ রোড ক্রসিংয়ে লালজির দোকানের চাইতে ভাল?

হেসে বললাম, ব্যাটা, পরখ করে দেখ না!

লস্যি খাওয়ার পর ওরা দু'জনেই বলল—সত্যিই অসাধারণ। তুলনা হয় না। মনে মনে ভাবলাম—ব্যাটা, তোর বউয়েরও তুলনা হয় না! কী ভূত যে তার মাথায় চেপেছে, বাবা বিশ্বনাথই জানেন।

[তিন]

পরপর পাঁচদিন গোটা শহর ঘুরিয়েছি সুপর্ণাকে। সৌপর্ণ এই প্রাচীন শহরের বিশাল সব অট্টালিকা, স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন সমৃদ্ধ মন্দির, রামনগরের কাশীরাজের প্রাসাদ, দরবার, অস্ত্রাগার দেখার পর মুগ্ধ হয়ে জানতে চেয়েছিল বারাণসীর প্রাচীন ইতিহাস। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র—তাও আবার রসায়ন শাস্ত্র। ইতিহাসের রসায়ন আমার জানা থাকার কথা নয়। তবু—বারবার এই শহরে আমার সুবাদে, যেটুকু জেনেছি—তার সবটাই উজাড় করে দিয়েছি।

প্রাচীন বারাণসী শহর বারবার বহিঃশত্রুর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরায় নতুন করে গড়ে তোলার জন্য একদা পুণের পেশোয়া, ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, এমনকী, বাংলার পাল রাজাদের সাহায্যের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মন্দির তথা নগরী নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। সহস্রাধিক মন্দিরবেষ্টিত এই শহরে—পবিত্র



গঙ্গাকে ঘিরে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক ঘাট। দশাশ্বমেধঘাট, প্রয়াগঘাট, শীতলাঘাট, মুন্সিঘাট, রাজমহলঘাট, পাঁড়েঘাট যেমন গঙ্গার দক্ষিণে, তেমনই উত্তরে হল মানমন্দিরঘাট, মীরাঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, পঞ্চগঙ্গাঘাট, রামঘাট—ইত্যাদি ঘাটগুলি আজও বারাণসীর প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। প্রাচীন ইতিহাস, শোকগাথা, আর বৈদান্তিক ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ বারাণসী আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। মুগ্ধ শ্রোতার মতো মগ্ন হয়ে শোনার পর সুপর্ণা কখনও উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়েছে কখনও বিমর্ষ। মাঝে মাঝে প্রাচীন কোনও অট্টালিকার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে বিস্ময়! সে কি আপনমনে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে? কল্পনার ক্যানভাসে আবিষ্কারের কৌতূহল নাকি অতীত স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে...

মণিকর্ণিকা ঘাটের অদূরে একটা পাঁচিল ঘেরা বিশাল বাড়ির লোহার গেটের পাশে দাঁড়িয়ে সুপর্ণা হঠাৎ বিড়বিড় করে বলছে—সেই যে বাড়িটা...বিশাল পাঁচিলঘেরা, পাশ দিয়ে নদী, বাড়ির ভেতরে চাতাল—মন্দির...!

সুপর্ণার ভাবান্তর লক্ষ করে তার কাঁধে হাত রাখতেই—আমার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে বলল—জানো দেবায়নদা, মাথার ভিতর অনেক কথা, অনেক ঘটনা এসে জড়ো হয়। অথচ মনে করতে পারিনে। কলকাতার বাসায় এরকম মাঝে মাঝেই হত। ছোটবেলা থেকেই কী যেন হারিয়েছি—এই ভাবনা আমাকে বারবার কুরে কুরে খায়।

আমি বললাম—সেজন্যই তো এখানে এলাম। এখানে তোমার জন্ম। ছোটবেলার অনেকটা সময় তোমার এখানে কেটেছে। সে সময় অনেক বাড়িঘর, নদী, মন্দির, বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে দেখেছ। সেগুলিই তোমার অবচেতন মনে হয়তো নাড়া দেয়।

—কিন্তু অনেক বড়বেলার কথাও তো মনে আসে!

—ধ্যাৎ। তুমি তো বড় হয়েছ বেনারসের বাইরে। পাঞ্জাব, অসম, জামশেদপুর তারপর কলকাতা।

—তা ঠিক, তবু কেন যে আমার মাথার ভিতরটা মাঝে মাঝে...

—বেশ, কাল সকালে আমরা বরং তোমার জন্মস্থানে একবার ঢুঁ মেরে আসব।

—সেটাই ভাল হবে। জানো তো—আর্মি কোয়ার্টারে সিং আঙ্কল, সৌরভি, বিশাল আমগাছ, তার ডালে দোলনা—এসব কিন্তু বেশ মনে আছে।

সৌপর্ণ আমাদের দু'জনের কথা বলার মধ্যে নির্বাক শ্রোতার মতো সব শুনছিল! আমাদের সিদ্ধান্ত শোনার পর একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর বলল,

—ভালই হবে। বেনারস থেকে চলে যাওয়ার আগে আর্মি কোয়াটার্সে গিয়ে ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখালে ওর ভাল লাগবে।

পরদিন সকালে আলমগীর এসে হাজির হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। জাতীয় সড়ক বরাবর কিছুটা পথ অতিক্রম করে—অটো অন্য একটা রাস্তা ধরে হাজির হল সেনানিবাসে।

বিশাল এলাকা নিয়ে সেনানিবাস। প্রবেশ দরজার সামনে প্রহরারত এক জওয়ানকে জানালাম আমাদের আর্জি। জওয়ানটি কিছুক্ষণ ভাবনার পর টেলিফোনে কারও সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলল। তারপর ফোন রেখে আমাদের ইশারায় গেট পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। আমরা তিনজন ভেতরে ঢোকার পর সে শুধু আমার আর সৌপর্ণর তালাশি নেওয়ার পর দূরে একটা ঘর দেখিয়ে বলল,

অফিসে মেজর সাব হ্যায়। আপলোক উনকো পাশ যাইয়ে।

আর্মি ক্যান্টনমেন্ট বলে কথা! এখানে সবার প্রবেশাধিকার থাকে না। অনেক হ্যাপা কাটিয়ে তবে প্রবেশাধিকার। জওয়ান লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেজর সাহেবের অফিস ঘরে এলাম। মিনিট দুয়েক অপেক্ষার পর একজন মহিলা অফিসার এসে সুপর্ণাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। সৌপর্ণ আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল—কী রে? আমি গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললাম—কী আর, হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ।

আমার ভাবছি—এরপর কী হতে পারে? সেই মুহূর্তে মহিলা অফিসারটি সুপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন, আইয়ে। আমরা তাঁর পিছনে হাঁটতে শুরু করলাম।

সুপর্ণার বয়স এখন তিরিশ। তার মানে প্রায় একুশ বছর আগে ওর বাবা এখানে ছিলেন, সেটা বোঝাতে পেরেছে। তা না হলে মেজর সাহেব তাকে বা আমাদের ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতেন না। আমরা অফিস লাগোয়া বিশাল লন পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এলাম। মহিলা অফিসারটি

সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়ে মোকান আর্মি জওয়ান লোগোকা কোয়ার্টার্স। বহুৎ পুরানা। নয়া বিল্ডিং হোনে কো বাদ সব লোক উহাঁপে রহতি হ্যায়। ইয়ে বিল্ডিংমে কই নেহি রহতা।

পাঁচিলঘেরা বাড়িটার অন্দরে প্রবেশ করতেই সুপর্ণা থমকে দাঁড়াল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, মনে পড়ছে। এই বাড়িটার দোতলায় আমরা থাকতাম। মহিলা অফিসারটি সুপর্ণার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, ইতনা পুরানা ঘটনা আভি ভি ইয়াদ হ্যায়?

সুপর্ণা যেন তার পরিচিত বাড়িটার ভেতরে একটু একটু করে এগিয়ে বোঝাতে চাইছে—সবটাই তার চেনা। বাড়ির লাগোয়া বিশাল একটা আমগাছের নিচে এসে থমকে দাঁড়াল। খুশিতে ডগমগ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কিশোরী বালিকার মতো হঠাৎ আমার একখানা হাত ধরে টানতে টানতে কিছুটা এগিয়ে এসে বলল, দেবায়নদা, মনে পড়ছে। সব কিছু মনে পড়ছে। এই আমগাছের নিচে আমি আর সৌরভি খেলতাম।

কে সৌরভি?

আমাদের পাশের ঘরে সিং আঙ্কেলের মেয়ে। সেই তো আমার ছোটবেলায় খেলার সাথী ছিল। ওই যে মোটা ডালটা—ওটাতে একটা দোলনা ঝুলানো ছিল। আমাকে আর সৌরভিকে দোলনায় চাপিয়ে সিং আঙ্কল দোল খাওয়াতেন।

সুপর্ণা আমগাছের মোটা শরীরে হাত বোলাতে লাগল। এমন মায়াময় আচরণ দেখে মনে হল—সে যেন কোনও আপনজনের শরীরে তার পেলব হাতের ছোঁয়া দিচ্ছে। লক্ষ করলাম—সুপর্ণার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, চলো দেবায়নদা, বড্ড কষ্ট হচ্ছে। বাবা-মা আর সেই ছোট্টবেলার খেলার সাথী সৌরভির কথা মনে পড়ছে।

সৌপর্ণ এগিয়ে এসে সুপর্ণার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, চলো। আমরা ফিরে এলাম মেজর সাহেবের অফিসে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওঠার মুহূর্তে অফিসার ভদ্রলোক আমাদের বসালেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুপর্ণার পাশে এলেন। মহিলা অফিসারটিকে ইশারায় কিছু বলতেই তিনি পাশের ঘরে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন। তার হাতে একটা মিষ্টির বাক্স আর ওই বাড়িটার একটা স্টিল ফটো। সে দু'টি সুপর্ণার হাতে তুলে দিলেন মেজর। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

—বিটিয়া, মেরা তরফসে ইয়ে গিফট। ফির কভি বেনারস আনে সে জরুর ইধা আইয়েগা। অউর দো-তিন সাল ম্যায় ইধার রহুঙ্গি।

সুপর্ণা মাথা নিচু করে তাকে প্রণাম করতেই মেজর সাহেবের চোখ দুটো যেন চিকচিক করে উঠল। আমরা নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে চললাম ব্যারাকের বাইরের রাস্তায়। মেজর সাহেব আর সেই মহিলা অফিসারটি গেট অবধি এগিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, টেক কেয়ার, গুড বাই...।

সারাদিন ঘোরাঘুরি পর আলমগীর আমাদের হোটেলের সামনে নামিয়ে বলল, কাল সকালে কী বেরোবেন?

সৌপর্ণ আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই সুপর্ণাকে বললাম, তুমি বলো কাল কখন বেরোবে?

সুপর্ণা বলল, সে তুমি ঠিক করো দেবায়নদা।

তোমার কি আরও কিছু দেখার বাকি আছে?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সুপর্ণা। কিছুক্ষণ ভাবার পর বলল, হ্যাঁ, এখনও সেই বাড়িটা—সেই...

বুঝলাম—বারাণসীর কাছে আরও কিছু পাওয়ার, জানার কিংবা খোঁজার বাকি আছে সুপর্ণার। আলমগীরকে বললাম, তুমি বরং কাল সকালেই এসো। আলমগীর ঘাড় নেড়ে তার সম্মতি প্রকাশ করে চলে গেল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর হোটেলের ব্যালকনিতে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি আমরা তিনজন। সুপর্ণা আকাশের দিকে চোখ তুলে বলল, দেখ দেবায়নদা, কী দারুণ চাঁদ। ঠিক যেন রুপোর থালা। আমি হেসে বললাম, তা হবে! জানো তো, পাঁজির সঙ্গে ইহকালের কোনও যোগাযোগ নেই!

—তা না থাকতে পারে, কিন্তু চাঁদের শরীর দেখে মনে হয় না—কবে পূর্ণিমা?

সৌপর্ণ হঠাৎ বিজ্ঞের মতো বলল, কথাটা হয়তো ঠিক তবে সব সময় কি বোঝা যায়? এই যে তুমি, হঠাৎ হঠাৎ বদলে যাও—কী করে বুঝব তোমার মুখে পূর্ণিমা না অমাবস্যার ছায়া?

সুপর্ণা গম্ভীর গলায় বলল, শোনো আমাকে রাগানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আজ সত্যিই পূর্ণিমা।

আমি হেসে বললাম—পূর্ণিমার চাঁদ কলকাতায় তো কতবার দেখেছ, বেনারসের সঙ্গে ফারাক কিছু চোখে পড়ছে?

আমার কথায় হঠাৎ সে চুপ করে গেল। লক্ষ করলাম তার চোখে মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বলল—সেদিনও এমন পূর্ণিমার রাত ছিল। মন্দিরে পুজো হচ্ছিল। শঙ্খ-ঘন্টার আওয়াজ শুনে আমি ছুটতে ছুটতে মন্দিরের চাতালে এলাম... আমার পেছন পেছন আরও একজন....মুখটা মনে করতে পারছি না।

বিষয়টা জানার আগ্রহে পুনরায় প্রশ্ন করলাম—

— তারপর? তার পর কী হল সুপর্ণা!

— নাহ্, আর তো কিছু মনে পড়ছে না...! এটুকু বলার পর সে থপ করে বসে পড়ল মেঝের ওপর। দেখলাম রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কপালে হাত দিয়ে অনুভব করলাম—মৃদু উত্তাপ। সৌপর্ণকে বললাম—এক গ্লাস জল আনতে। সে দ্রুত ঘরের ভেতর থেকে জল এনে। সুপর্ণার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই তার সম্বিত ফিরে এল। শাড়ির আঁচলে তার মুখ মুছিয়ে সৌপর্ণ বলল—

—শরীর খারাপ লাগছে সুপর্ণা!

—হ্যাঁ। একটু জল দাও। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। আমার ঘুম আসছে... চোখ দুটো বুজে আসছে...।

আমার মনে হল সুপর্ণার বিশ্রাম দরকার। সৌপর্ণকে ইশারায় জানালাম সুপর্ণাকে নিয়ে রুমে গিয়ে শুইয়ে দিতে। সেটাই করল সৌপর্ণ। রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেই আমি ব্যালকনিতে বসে রইলাম।

পূর্ণিমায় রাত দেখতে দেখতে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সুপর্ণার ডাকে চোখ খুললাম। সকালের মিষ্টি রোদের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। দু-হাতের চেটোয় চোখ রগড়ে সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল সুপর্ণাকে। দারুণ সেজেছে। ময়ূরকণ্ঠী রঙে শাড়ির সঙ্গে হালকা তুঁতে ব্লাউজ। জোড়া ভুরুর মাঝখানে নীল টিপ। ঠোঁটে গোলাপি ওষ্ঠ রঞ্জনী। তার শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে চমৎকার সুবাস। অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে ভাবছি—আমার সামনে দাঁড়িয়ে কে এই নারী! সুপর্ণা না তুলুদি...!

—কী দেখছ দেবায়নদা! তোমার চোখে এমন বিস্ময় আগে কোনওদিন দেখিনি! অবাক হওয়ার মতো সেজেছি নাকি?

—বটেই তো! এমন চমৎকার সাজ তোমাকেই মানায়। বেশ রোমান্টিক লাগছে তোমাকে!

—এই জন্যেই বলি দাদা, একটা বিয়ে করো। কেন যে সারাজীবন এমন বৈরাগ্য সাধনার কঠিন ব্রত নিলে—,

—বৈরাগী হওয়ার লোকও তো সংসারে দরকার।

—সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এমন চেহারা হল কী করে? উদাস চাউনি। চোখ দুটো লাল। সারারাত কি জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিতালি করেছ?

—তা বলতে পারো। মনে হয় খুব ভোরের দিকে চোখ বুজে এসেছিল। সরি! তোমরা তো বেরনোর জন্য পা বাড়িয়ে আছ। সৌপর্ণকে বলো আমি এবেলা বেরুব না। বিকেলে বেরুব। তোমরা দু'জন ঘুরে-ফিরে এসো। ভাল লাগবে।

—ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ, ঘুরেই আসি। তুমি বরং চানটান করে একটু ঘুমিয়ে নাও।

সুপর্ণা ওদের রুমে চলে যেতেই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। কাল রাতে যে ব্যালকনিতে জেগে কাটিয়েছি—সেটা ও জেনে গেছে। নাহ্—কেন যে উটকো স্মৃতি বাতাসের মতো ভাসতে ভাসতে আমাকে এসে জড়িয়ে ধরে!

ঘরের বাইরে এসে ব্যালকনিতে আমাকে দেখে সৌপর্ণ ছোট্ট একটা গালাগালি দিয়ে বলল—তুই শালা দিব্যি আছিস। নিজের মতো করে নিজের মনেই বিন্দাস আছিস। আর আমি?

—সে তোর কপাল। সংসারের পাঁকে রসে বশে আছিস।

—আমাকে পাঁকে ঠেলে ফেলে তুই ডাঙায় দাঁড়িয়ে মজা মজা দেখছিস?

—ভুল। আমি তোদের নিয়ে মজে আছি।

—তাই থাক। যাক গে, বেরোবি তো। কাল তো ফিরতে হবে?

—তোরা দু'জনে বরং ঘুরে আয়। টুকটাক কেনাকাটা কর। বেনারসের কিছু স্মৃতি নিয়ে যাবি? আবার কবে আসবি—

—আবার? না বন্ধু, আর নয়। কলকাতা আমাকে টানছে।

—তোদের দু'জনের টানাটানিতে আমার অবস্থাটা ভাব। তোর টান কলকাতা—সুপর্ণার বারাণসী। আমাকে যে কে টানবে...!

—সে তোর কপালে নেই রে দেবা। থাকলে তুই ভেসে যেতিস।

—ঠিক তোর মতো...তাই তো?

আমাদের টানাপোড়েনের মাঝখানে, সুপর্ণা এসে দাঁড়াল। হাতে চামড়ার ছোট একটা পার্স। আমি হেসে বললাম—তোমাকে কিন্তু রোমান্টিক লাগছে সুপর্ণা। সে একগাল হেসে বলল—তুমিও কম রোমান্টিক নও।

—তাই? ধন্যবাদ। অন্তত কেউ একজন দরাজ সার্টিফিকেট দিল। যাক গে, তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা কোরো। বিকেলে বেরতে হবে। কাল তো চলে যাব, তাই—

সুপর্ণা হঠাৎ উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, জানো দেবায়নদা, আমার না ফিরতে ইচ্ছে করছে না। এখানে অদ্ভুত এক মায়া যেন আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

—বেশ তো! থেকে যাও। এখানে না হয় আর একটা শ্বশুরালয় বানিয়ে নাও।

—সেটাও পারি মশাই!

—তা পারো। তোমাকে দেখলে এখনও একুশের—

—হিংসে হচ্ছে নাকি?

—না। প্রতিহিংসা।

—কার উপর?

—বেনারসের উপর। তোমাকে কিনা মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে?

সুপর্ণা হেসে সৌপর্ণকে বলল, চলো, দেবাদা এখন মুডে আছে। ওরা দু'জন হাসতে হাসতে নিচে চলে গেল। আলমগীর ওদের অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ নিচে দাঁড়িয়ে। বার দুয়েক তাগাদাও দিয়ে গেছে সে। আমি ব্যালকনির শেষ মাথায় গিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখলাম—ওরা দু'জন অটোয় উঠছে। আমি ফিরে এসে রুমে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিলাম। রাত জেগে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। দুপুরে ওরা ফেরার পর এক সঙ্গে লাঞ্চ করলাম। সুপর্ণা খাওয়া শেষে বলল, জানো দেবায়নদা, এত ঘুরলাম অথচ মনটা এখনও বশে আনতে পারিনি। মনে হচ্ছে এখনও বোধহয় দেখা বাকি আছে।

আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ভারী মনে হল। তবে কী সুপর্ণা এখনও তার স্বপ্নে দেখা সেই বাড়িটার কথা ভাবছে? যদি তাই হয় তা হলে কলকাতায় ফিরে সে আবার এমন অদ্ভুত ভাবনায় আকুল হয়ে সৌপর্ণকে বিড়ম্বনায় ফেলবে। তার ভাবনায় এখনও সেই অদ্ভুত বাড়ির ছবিখানা বারবার তাকে টানছে। অনুমানে গা ভাসিয়ে কোথায় তাকে নিয়ে যাব? সে তো তেমন কোনও সূত্র আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারছে না। অবচেতনে দেখা সেই বাড়ি, নদী, বিশাল চাতাল, মন্দির আর অস্পষ্ট এক মুখ। তার উপর আবার পূর্ণিমার চাঁদের আলো। নাহ্,—বিষয়টা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। জানি না, এ রহস্যের শেষ কোথায়...?

শেষ বিকেলে ঘুম ভাঙতেই সুপর্ণা আমার রুমে এসে বলল, দেবায়নদা। বেরোবে তো? আলমগীর কিন্তু হাজিরা দিয়ে গেছে।

আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম—ছ'টা। তাড়াতাড়ি টয়লেটে যাওয়ার সময় সুপর্ণাকে বললাম—তোমরা রেডি হয়ে নিচে যাও—দশ মিনিটের মধ্যে আমি নিচে নামছি...।

[চার]

বারাণসীর রাস্তায় সন্ধেবেলা গাড়ি চলাচল কলকাতাকেও হার মানায়। এখানকার পুরনো শহরে রাস্তাঘাট ঘিঞ্জি। জ্যামজটে কাহিল রাস্তায় গাড়ি চলাচল তো দূরের কথা—পায়ে হাঁটাও অসাধ্য। তার মধ্যে সাবধানে অটো চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছলাম—মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে। ঘাটের অদূরে বিশাল বাড়িটা সেদিন বাইরে থেকে দেখে চলে এসেছিলাম। আজ সন্ধ্যায় ভিতরটা দেখার জন্য আবার আসতে হল। গতকাল রাতের কথা ঘুরে ফিরে আমার মাথার ভেতর কিলবিল করছে। বেনারসে আসা ইস্তক সুপর্ণাকে নিয়ে দর্শনীয় স্থানগুলি সবই মোটামুটি ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। অথচ এখনও তার মনের গভীরে লালন করা সেই স্মৃতি মাঝে মাঝেই তাকে বিচলিত করছে। কী সেই রহস্য!

পায়ে পায়ে ইতিমধ্যেই বড় বাড়িটার প্রবেশ দরজায় এসে দাঁড়ালাম। বাড়িটার পাস দিয়ে বহমান গঙ্গা ছুঁয়ে গেছে বাড়ির প্রাচীন। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করার ইচ্ছায় সেখানে দাঁড়াতেই—পায়ে পায়ে এগিয়ে এল এক সৌম্যকান্তি যুব। হাসিমুখে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

—বলিয়ে বাবুজি, আপ কো লিয়ে কেয়া কর সক্‌তা?

আমি তার দিকে তাকিয়ে ভাবছি—এই সৌম্য চেহারার সুদর্শন যুবাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি! আমাকে নির্বাক দেখে সে হেসে বলল—বুঝতে পারছি হিন্দিতে ঠিক—আমি তো অবাক! পরিষ্কার বাংলায় বলছে! তবে কি

বাঙালি? পুরনো শহর। লাখো লাখো বঙ্গভাষীরা এখানে বাস করেন। কেউ জন্মসূত্রে বাঙালি। কেউবা ভাষাটা শিখেছে রুজি-রুটির কারণে। সারাবছর যে হারে বাঙালিরা এখানে আসেন—তাদের জন্যই হয়তো ভাষাটা আয়ত্ত করেছে। আমরা যেমন প্রয়োজনে ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলি। তবে এ ছেলেটি অন্যরকম। ওর উচ্চারণে নির্ভুল বাংলা। হেসে হাত বাড়িয়ে দিতেই সেও হাত বাড়াল।

—আপনারা কলকাতার মানুষ নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ। অবশ্যই। কিন্তু আপনি?

—আমার মা বাঙালি ছিলেন। বাবা বেনারসের। খুব ছোটবেলায় বলতে পারেন শিশু অবস্থায় মা মারা যান। রক্তে বাঙালিয়ানা মিশে থাকায়—ভাষাটা মন দিয়েই শিখেছি।

—আপনাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে।

—দশাশ্বমেধ ঘাটে যাঁরা আসেন, তাঁরা আমাকে চিনবেন।

—মানেটা পরিষ্কার হল না।

—আমরা বেনারসের ব্রাহ্মণ। বংশ পরম্পরায় গঙ্গা মাইয়ার সেবায়েত। সন্ধ্যায় গঙ্গা মাইয়ার আরতিতে মাঝে মাঝেই অংশ নিতে হয়। তাই হয়তো—

এতক্ষণে আমার সংশয় কাটল। সেদিন আরতির সময় এই ছেলেটিকেই দেখেছিলাম। আহা! কী অপূর্ব সেই আরতির ভঙ্গিমা। নয়ন ভরে দেখার ভাগ্য ক'জনের হয়।

আমি একাই কথা বলে চলেছি অথচ ওরা দুটি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। সুপর্ণা চারপাশ দেখছে আর হাতের অদ্ভুত মুদ্রায় সৌপর্ণকে বোঝাচ্ছে। আমি চোখ ঘুরিয়ে আবার ছেলেটির দিকে তাকাতেই সে বলল—

—তিনশো বছরের প্রাচীন অট্টালিকা। বংশ পরম্পরায় আমাদের বাস। আমার বাবাও এখানে আছেন।

—আপনার বাবার নাম?

—অলোকনাথ শাস্ত্রী। মায়ের নাম ছিল সুমিত্রা।

—আর আপনার নাম?

—সুধাকর শাস্ত্রী।

কথায় কথায় সময় কাটছে। ক্রমশ ভিড়ও বাড়ছে। এ বাড়ির প্রাচীন সৌন্দর্যে বিচিত্র সব শৈল্পিক নিদর্শন—এক কথায় চোখের আরাম। খণ্ড খণ্ড সিমেন্ট মিশিয়ে শক্তপোক্ত পায়ে চলার পথ। দু-পাশে সবুজ জমিতে নানারকম ফুলের গাছ। সুন্দর পায়ে চলার পথটি মিশেছে উঁচু একটা বেদির মতো স্থানে। লম্বায় দীর্ঘ, প্রস্থেও দীর্ঘ। বলা যায় বিশাল উঁচু চাতাল। তার পুবদিকে চোখ ধাঁধানো মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ শিব-দুর্গা।

মন্দিরের দক্ষিণ কোলে। পরিবারের সদস্যদের বাসগৃহ। দোতলা বাড়ির সর্বত্রই পবিত্র রুচির অপূর্ব নিদর্শন। আমি সুধাকরের সঙ্গে ঘুরছি। অন্যদিকে সুপর্ণা-সৌপর্ণ। মন্দিরের দিকে না গিয়ে পাশে পারিবারিক বাসগৃহের দিকে হনহন করে এগোচ্ছিল। হঠাৎ আমার পাশ থেকে সুধাকর চিৎকার করে বলল—

—উধার মাত যাইয়ে। প্লিজ, ওদিকে যাবেন না।

আমি অবাক হলাম ছেলেটির আচমকা এমন আচরণে। হঠাৎ ছেলেটি এমনভাবে রি-অ্যাক্ট করল কেন? আমার কপালে ভাঁজ দেখে সে পাশে এসে বলল—

—আসলে ওই ঘরটায় আমার বাবা থাকেন। লোকজন পছন্দ করেন না। আপনমনে কখনও ভজন গান। কখনও বা ঘরের ভিতর পায়চারি করেন। পরিবারের বাইরে কাউকে কাছে পিঠে দেখলে ভীষণ রেগে যান।

—কোনও অসুখ-বিসুখে ভুগছেন কি?

—শুনেছি—মায়ের অকালমৃত্যু বাবা মেনে নিতে পারেনি, তাই—

—ডিপ্রেশন। অবসাদ। বয়সের ভারে ক্লান্তি। অতীত স্মৃতির কোনও বিশেষ এপিসোড—এসবের কারণেই হয়তো—

—হ্যাঁ। হয়তো তাই। তবে এসব নিয়ে বাড়িতে তেমন কোনও আলোচনা শুনিনি। ছোট থেকেই এভাবে দেখতে অভ্যস্ত বাবাকে।

—শুধু পুজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞ ছাড়া আপনাদের অন্য কোনও পেশা?

—না না। যজমানি, পূজা, যজ্ঞ এসব আমাদের ধর্মীয় কাজ। পেশা বললে ভুল হবে। আমাদের পরিবারের অনেকেই নানা পেশায় যুক্ত।

—বাহ্। দারুণ তো! আপনি কী করেন?

—আমি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস। এমএসসি করে গবেষণা করার ইচ্ছে আছে। আমার বাবা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত। বয়েস হয়েছে। স্যানসক্রিট চর্চা—ঘরে বসেই করতেন। অনেক বছর ধরে তিনি বাড়ির বাইরে বেরন না। সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি।

—ধর্মীয় কাজ, পূজার্চনা, হোমযজ্ঞ—এসব কিছুই না?

—না। শুধু বছরের একটা দিন তিনি বাড়ির বাইরে বেরোন। সেদিনটা আমার মায়ের মৃত্যুদিন। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি—বাড়ির ভিতরে ওই যে মন্দিরটা দেখছেন—ওখানে সন্ধ্যারতির পর মা হঠাৎ জ্ঞান হারান। তারপর—

ছেলেটির বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আমার কাছে দীর্ঘশ্বাস নয়—করুণ আর্তনাদের মতো শোনাল। আমি তার পিঠে হাত রাখতেই সে ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

—মায়ের মুখখানা আমার মনে নেই। এখানে বাঙালি কোনও নারীকে দেখলে কেন যেন—তাদের মধ্যে আমার মাকে খোঁজার চেষ্টা করি।

কথা বলতে বলতে সামনের চাতাল পেরিয়ে বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করছি। চারপাশে পাঁচিল। পাঁচিলের ভিতর বেশ কয়েকটা আমগাছ। একটা অচেনা গাছের দিকে চোখ পড়তেই—ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল—চিনবেন না। ওটা রুদ্রাক্ষ গাছ। আমার প্রপিতামহ হরিদ্বার থেকে চারা এনে এখানে বসিয়েছিলেন।

—ভাই, তুমি বয়সে ছোট, তাই তুমি বলছি।

—নিশ্চয়ই বলবেন। মায়ের দেশের মানুষ। বাবার মুখে শুনেছি—আমার মায়ের দেশও নাকি কলকাতার কোনও পাড়ায়। নামটা আর মনে করতে পারি না।

—না থাকাটাই স্বাভাবিক। কমদিনের কথা তো নয়! কী বলো সুধাকর?

—ঠিক তাই। মানুষ বর্তমানকেই ভুলে যায়—অতীত ক'জন মনে রাখে!

—একটা আর্জি আছে দাদা!

—বেশ তো বলো!

—এসেছেন যখন—সন্ধ্যারতি দর্শন করে প্রসাদ নিয়ে যাবেন। খুশি হব। আপনারা আমাদের আপনজন। অতিথি।

—বেশ, তাই হবে ভাই। আজ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে তোমার আরতি দর্শন করব।

—আপনারা সানন্দে আমাদের মন্দির, নাটমন্দির, সব কিছু ঘুরে দেখুন। দেখবেন—ভুল করে যেন বাবুজির ঘরের কাছে

যাবেন না। সন্ধে হচ্ছে। পুজোর আয়োজন আজ আমার দেখার কথা। আমি চললাম।

সুধাকর শাস্ত্রী চলে যেতেই মনে হল—এই বিশাল অট্টালিকা, অন্দরে মন্দির, ইষ্টদেবদেবী—এসবই আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বহমান গঙ্গার মতোই পবিত্র এই স্থান।

[পাঁচ]

গতকাল জ্যোৎস্না গায়ে মেখে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার অবসরে ভুলেই মেরেছিলাম সুপর্ণার বেনারস ভ্রমণের কথা। আসলে চাঁদ, চাঁদের ফাঁদে পড়ে সুপর্ণাকে—নাহ্, এবার বেশ মনে পড়ছে। গতকাল রাতে আমার মাথার ভিতর কিলবিল করছিল সুপর্ণার বিচিত্র খেয়ালি ইচ্ছের কথা।

সুপর্ণার জন্ম বেনারসে, একথা দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ। প্রমাণ মিলেছে টাটকা। সেনানিবাসের অন্দরে তার বাল্যবেলার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে আনাচে-কানাচে। গোটা শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি তাকে ঘোরানো হয়েছে। আজও হচ্ছে। অথচ কোন এক দুর্বোধ্য স্মৃতির টানে সে কেন বেনারস ছাড়ার কথা ভাবতে গিয়ে মনোকষ্টে ভুগছে? বেনারস আসার পর মনে হয়নি সে ডিপ্রেশনে ভুগছে। অথচ গতকাল রাতে—হঠাৎ সে ঘোরের মধ্যে উচ্চারণ করেছিল—পুরনো সেই স্মৃতি কথা—তারপর হঠাৎ সে কিছুক্ষণের জন্য অচেতন হয়।

নাহ্, ভাবনার ভারে কেন এত বিড়ম্বনা! এসেছি যখন, শেষ দেখে যাব। তা না হলে, কলকাতায় ফিরে এই একই চিন্তা তাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করবে। সৌপর্ণ বিভ্রাটে পড়ে আবার আমার কাছে ছুটবে। তার পরিত্রাণের পথ কোথায়? একটা কাজ করা যেতে পারে। সুপর্ণা স্বপ্নের ঘোরে যা বলে—সেই ডেস্ক্রিপশন অনুযায়ী এই বাড়ি, তার লাগোয়া পরিবেশ, মন্দির—অনেকটাই মেলে। অমিল বলতে পূর্ণিমার রাত। আজ পূর্ণিমা না হলেও চাঁদ তার জ্যোৎস্নার চাঁদোয়ার নিচে সবাইকে ডাকবে। আজকের রাতেও তো আকাশ ঝলমল করবে চাঁদের আলোয়। রাতের সেই জ্যোৎস্নায় ডুবিয়ে সুপর্ণার মন যদি আলোড়িত হয় মন্দ কী?

শঙ্খনাদ আর উলুধ্বনি কানে ভেসে আসতেই দেখলাম—শুভ্র বসন, শ্বেত উত্তরীয় পরিধান করে সুধাকর আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল অদ্ভুত এক জ্যোতি ছড়িয়ে আছে তার মুখমণ্ডলে। শান্ত, সৌম্য, সুদর্শন এই যুবা সুধাকরকে দেখে যে কেউ মনে ভাবতে পারে—কোনও ঋষিকুমার গ্রহান্তর থেকে মাটির পৃথিবীতে এসে যেন পৃথিবীর মালিন্য ঢেকে দিতে চাইছে তার শুভ্র উত্তরীয়র আড়ালে। আমি বিস্ময়ে বাক্যহারা। ইচ্ছে করছে অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাকে প্রণাম নিবেদন করে ধন্য হই। দু-পা সামনে এগোতেই সে বলল, আসুন। আপনার সঙ্গীদের নিয়ে মন্দিরে আসুন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যারতি শুরু হবে। আমি চললাম।

আমিও মন্ত্রমুগ্ধর মতো তার পিছু নিলাম। শিববন্দনা ও গঙ্গাস্তুতি দিয়ে শুরু হল সন্ধ্যারতি। প্রজ্জ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ হাতে আরতি শুরু করল সুধাকর। মহিলাদের শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, চলছে সমবেতভাবে। ধূপ-ধুনোর পবিত্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে মন্দির থেকে নাটমন্দির—বাড়ির সর্বত্র। দর্শনার্থীরা তন্ময় হয়ে প্রত্যক্ষ করছে সেই অপূর্ব আরতির দৃশ্য। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেদিনের দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতির দৃশ্য।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে করজোড়ে আরতি দেখছে সুপর্ণা আর সৌপর্ণ। আকাশের চাঁদ যেন মাটির বুকে নেমে আসার আগ্রহে উন্মুখ। মন্দির চূড়ার একপাশে হেলে আছে চাঁদ। শঙ্খ, ঘণ্টার সমবেত ধ্বনি বাতাসে ভাসতে ভাসতে পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে বিলীন হচ্ছে।

মাঝে মাঝে দর্শনার্থীরা চিৎকার করে ধ্বনি তুলছে—'হরহর মহাদেব'/'গঙ্গা মাইয়া কী জয়।' আমি রোমাঞ্চিত। মাঝে মাঝে দুলে উঠছে আমার শরীর। আমি মগ্ন হয়ে প্রত্যক্ষ করছি সুধাকরের অপূর্ব আরতির দৃশ্য।

প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে আরতির পর সুধাকর থামল। প্রজ্জ্বলিত পঞ্চপ্রদীপের পবিত্র শিখা স্পর্শ করার জন্য নাটমন্দিরের মেঝেয় প্রদীপখানা রেখে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মন্দিরের গর্ভগৃহে। আমরা প্রদীপ শিখার পবিত্র স্পর্শ মাথায় ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ দর্শনার্থীদের ভিড় এড়িয়ে সুপর্ণা ছুটতে শুরু করল মন্দিরের চাতাল পেরিয়ে উঁচু পাঁচিলের দিকে। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে সৌপর্ণ তার পিছু নিল। আমি স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে। দর্শনার্থীদের মধ্যে গুঞ্জন—আলোড়ন, বিস্ময়। আমি দিশাহারা। ভাবছি—হঠাৎ ওভাবে চলে গেল কেন সুপর্ণা?

আমার বিবশ পা দুটো বশে আসতেই আমি এগিয়ে গেলাম অকুস্থলে। ভিড়ে ঠাসা দীর্ঘ চাতাল। কোনওক্রমে ভিড় ঠেলে সেখানে গিয়েই দেখলাম—সুপর্ণা শুয়ে আছে চাতালে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামার ছন্দে বুকটাও ওঠানামা করছে। চাঁদের আলো এসে তার শরীরে জ্যোৎস্না বিছিয়ে দিয়েছে। আমি ঝুঁকে বসে হাতখানা টেনে নিয়ে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করলাম। পাশে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে সৌপর্ণ।

ভিড়ের মধ্যে কিছু মহিলা—যারা ওই পরিবারের কর্ত্রী বলে মনে হয়, তাঁদের মধ্যে দেশওয়ালি ভাষায় কিছু গম্ভীর আলোচনা চলছে। এক বৃদ্ধা মহিলা সবাইকে ঠেলে সরিয়ে সুপর্ণার মুখের দিকে ভাল করে দেখার পর চেঁচিয়ে ডাকলেন—সুধাকর, ইধার আও বেটা। জলদি পানি লে কে আও।

তার আদেশ মতো সুধাকর একটা বড় লোটা ভর্তি জল এনে সুপর্ণার চোখেমুখে ঝাপটা দিতেই সুপর্ণা আপনমনে বিড়বিড় করে বলছে—মুঝে যানে দো। আমাকে বাধা দিও না...যেতে দাও...।

সুধাকর গভীর দৃষ্টিতে সুপর্ণার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে পাশে বসা সেই বৃদ্ধাকে চাপাস্বরে বলল—

—বড়ি দাদিমা, কুছ সমঝা?

—সমঝানেকো কৌশিক করা রহা লেকিন—ইতনা লম্বে—

—ঠিক হ্যায়। ম্যায় ইনকো লেকর বাবুজিকা ঘরকো বাহার—

আচমকা উঠে বসল সুপর্ণা! চারপাশে উদ্‌ভ্রান্তের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে শাড়ির আঁচল পিঠের উপর চাপিয়ে সৌপর্ণকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়তেই সৌপর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াল। আমার দিকে অসহায় মুখে তাকিয়ে বলল—দেবা। আমার ভয় করছে। কী করব বল!

আমি ইশারায় তাকে আশ্বস্ত করে সুপর্ণার কাঁধে হাত রাখতেই হঠাৎ সে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক পা এগিয়ে চারপাশে ভাল করে তাকিয়ে সৌপর্ণর দু-কাঁধে হাত রেখে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—

—আমাকে নিয়ে চলো। এক মুহূর্ত এখানে থাকব না। প্লিজ, আজই আমাকে কলকাতা নিয়ে চলো। এখানে আমার একদম ভাল লাগছে না...।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

উইম্বলডন আকাশের তিন তারা

সুমন মজুমদার





অসাধারণ প্রতিভা, অভাবনীয় চেষ্টা, অকুতোভয় মানসিকতা, অনন্য কৃতিত্ব। এক কথায় বলতে গেলে এরকম হাজারো বিশেষণ যোগ করতে পারেন তাঁর নামের সঙ্গে। তার পরও কী কম পড়বে না! ওপেন টেনিস-যুগে তিনি সব থেকে সফল ভারতীয়? এখনও সন্দেহ করবেন, এমন কাউকে পাওয়া মুশকিল।

আর কীভাবে প্রমাণ করা যায় নিজেকে! জানা নেই। রমানাথ কৃষ্ণন, বিজয় অমৃতরাজদের ছোট করার জায়গা নেই। তবে এই দেশের টেনিস ইতিহাসের কথা উঠলেই প্রথম যাঁকে দিয়ে লেখা শুরু হতে পারে, তিনি লিয়েন্ডার পেজ।

আইপিএল, আইএসএলের যুগে তিনি এখনও ভারতীয় টেনিসে অক্সিজেন জুগিয়ে চলেছেন। না হলে এই খেটে খাওয়া দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে আদৌ কী টেনিস নামক খেলাটি নিয়ে তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে? তার উপর কোথাকার উইম্বলডন, ইউএস, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন! কে বা খোঁজ রাখে! আসলে খোঁজ-খবরের পুরোটাই তাঁকে কেন্দ্র করে এমনটা বলা যাবে না। সানিয়া রয়েছেন। নিদেনপক্ষে সোমদেব, ইউকি, রোহন বোপন্নার মতোও কেউ কেউ রয়েছেন। তবে ভারতবাসীর কাছে আজও তিনিই আসল উদ্দীপনা, উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু। লিয়েন্ডার পেজের জন্যই এখনও ভারতবাসীর ড্রইংরুমে উইম্বলডন, ইউএসওপেনের লাইভ ম্যাচ ধরা পড়ে। ঠিক আইএসএল, আইপিএলের পাশে থেকেই। এর পর তিনি সরে গেলে কী হবে? একটা সময় নোভাক জকোভিচের বর্তমান কোচ বলেছিলেন, "জকো, ফেডেরার, নাদালের মতো টেনিস তারকারা খেলা ছেড়ে দিলে মানুষ টেনিস দেখাই প্রায় ছেড়ে দেবে। ওরা না থাকলে টেনিসের গ্ল্যামার চলে যাবে।" বিতর্কিত কথা। কারণ, একটি জেনারেশনের দাপট, কতৃত্ব শেষ হলে সময়ের নিয়মেই পরের প্রজন্ম তা অধিকার করতে চলে আসে। আসলে যুগ যুগ ধরে এমনটাই হয়ে এসেছে। তবুও ফেডেরার, নাদলরা চলে গেলে এক বিশাল শূন্যতা ঘিরে আসবে টেনিসকে ঘিরে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা একদিন না একদিন মুছবেই। তেমনভাবেই, লিয়েন্ডার অবসর নিলে এই দেশের মানুষ সমানভাবে টেনিসে উৎসাহ পাবেন? হয়তো পরের প্রজন্ম হাল ধরতে এগিয়ে আসবে। তবুও, তিনি লিয়েন্ডার। গত কুড়ি বছরে তিনি ভারতীয় টেনিসের প্রাণশক্তি। মাঠ ও মাঠের বাইরে তিনিই অনুপ্রেরণা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। যাই হোক, অবসরের কথা লিয়েন্ডারের মতো ক্রীড়াব্যক্তিত্বদের নিয়ে বলা বারণ! যেখানে বয়স তাঁদের কাছে সংখ্যামাত্র সেখানে আমার বা আপনার মুখ থেকে অন্তত লিয়েন্ডারের অবসর নিয়ে কথা বলা শোভা পায় না। লিয়েন্ডারদের অবসর নেই, বিশ্রাম নেই। শুধুই দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ রয়েছে। আর রয়েছে হার না মানা জেদ, কঠোর নিষ্ঠা।

কলকাতা ময়দানের অদ্ভুত এক শক্তি রয়েছে। ক্রিকেট, ফুটবল মিলিয়ে এই ময়দানে এত রাজনীতি, কুটনীতি। খেলার মাঠকে রাজনীতির মারপ্যাঁচ থেকে সরিয়ে রাখার কত না কথা আমরা নিত্যদিন শুনে থাকি। কিন্তু এই ময়দানের সঙ্গে দিন-রাত জড়িত থাকা কোনও মালিও হয়তো বলতে পারবেন না, এখানে রাজনীতির প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ছায়া পড়ে না। যতই মন্দ বলুন না কেন, ময়দানের এই রাজনীতির মহড়ায় যাঁদের বড় হওয়া তাঁদের মধ্যেও কিন্তু একটি দারুণ শক্তি কাজ করে। এই ময়দানে বছরের পর বছর লড়াইয়ের মন্ত্র পড়ানো হয়। সকলের অলক্ষ্যে, সকলের অজ্ঞাতে এখানে খেলতে আসা ক্রীড়াবিদরা লড়াই করার মানসিকতা পুরস্কার হিসাবে পান। লিয়েন্ডার পেজও এই ময়দান থেকেই বড় হওয়া একজন। গোটা কেরিয়ারে নিজেকে বিশ্বের দরবারে বারবার মেলে ধরেছেন এই টেনিস তারকা। তবে তাঁর প্রাথমিক পাঠ কিন্তু এই ময়দানেই। ছোটবেলায় বাবা ভেস পেজের হাত ধরে ময়দানে পা রাখা। ভেজ পেজ নিজে হকি খেলতেন। পরবর্তীকালে ফুটবল দলের ডাক্তার হিসাবেও নিযুক্ত হয়েছে। একটা সময় ভেস ভেবেছিলেন, লিয়েন্ডারকে হকিতে আনবেন। কিন্তু লি-র প্রথম প্রেম টেনিস, সেটা বোঝার পর ভেস পেজও তাঁকে আর আটকাননি।

মার্টিনা হিঙ্গিসকে নিয়ে কেরিয়ারের ১৫তম গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়। উইম্বলডনের এই অভাবনীয় সাফল্য। তাও ৪২ বছর বয়সে। বিশ্বের প্রতিটি টেনিস তারকার কাছে তিনি প্রেরণা। তা না হলে অল ইংল্যান্ড ক্লাবের লনে লি'র সঙ্গে যেচে এসে দেখা করে জকোভিচ বলে যেতেন না, "আপনাকে দেখে অবাক হই। উৎসাহ পাই। জয়ের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। আপনার কাছে বয়স শুধু একটা সংখ্যা।" লিয়েন্ডার হাসিমুখে অভিবাদন কুড়োন। এত বড় সাফল্যের রসায়ণ কী? ভাল সঙ্গ পাওয়া নাকি ফিটনেস? লিয়েন্ডার বিনয়ের সঙ্গে বারবার প্রথমটাকেই বেছেছেন। মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, মার্টিনা হিঙ্গিস। বরাবর নিজের পার্টনারদের কৃতিত্ব দিয়ে এসেছেন তিনি। উল্টোদিকে তাঁর সঙ্গীরা লি'র প্রশংসা করেছেন অবলীলায়। এবারই উম্বিলডনে মিক্সড ডাবলসের ফাইনাল ম্যাচে নামার আগে মার্টিনা বলেছিলেন, "ও থাকলে আমার কাজ অর্ধেক হয়ে যায়। লি'র ভলি দেখলে অবাক হই। আর সারা কোর্টে ও সমানভাবে খেলতে পারে। নেতৃত্ব দিতে পারে। সঙ্গী হিসাবে ওকে পেলে যে কোনও টুর্নামেন্টে জতা যায়।"

ফিটনেস। এটা ঠিক থাকলেই যে কোনও বয়সে যে কোনও কঠিন কাজ হেসে-খেলে করে ফেলা যায়! অন্তত লি'র উইম্বলডন খেতাব জয়ের পর এই শিক্ষাই নিতে হয়। কিন্তু কীভাবে এই বয়সেও নিজের ফিটনেস ধরে রাখেন লিয়েন্ডার? আসলে নিজের ক্ষমতা বুঝে ট্রেনিং। এটাই লিয়েন্ডারকে এখনও তরতাজা করে রেখেছে। শুধু কী তাই? নাকি আরও কোনও কঠিন ট্রেনিং রয়েছে? লি'র ফিটনেস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন কোচরা। আখতার আলি। যাঁর কাছে লি খেলা শিখতে এসেছিলেন মাত্র দশ বছর বয়সে। সেই আখতার বলছিলেন, "শৃঙ্খলাপরাণ হলে, নিজেকে ধরে রাখা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আমি লি'কে চিনি। ও সব সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ। খাবার থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবন, প্রতিটা ব্যাপারেই ও খুব নিয়মানুবর্তি। আসলে এটা না থাকলে একজন খেলোয়াড়ের মানসিক ও শারীরিক কোনও দিকই ভাল থাকে না। তা ছাড়া নিজের বয়স ও ক্ষমতা বুঝে ট্রেনিং করতে হয়। এক্ষেত্রে আমি লি'র ফিটনেস ট্রেনিং গ্রুপকেও কৃতিত্ব দেব। চোট-আঘাত যে কোনও খেলোয়াড়ের কেরিয়ার নষ্ট করে দিতে পারে। লম্বা দৌড়তে হলে আগে চোটের কবলে পড়ার সম্ভাবনা কমাতে হয়। লি'ও কেরিয়ারে অনেকবার বড়রকমের চোট পেয়েছে। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে সঠিকভাবে রিহ্যাব করেছে। ঠিকঠাক ওয়েট ট্রেনিং করেছে। ও সব থেকে সাহায্য পায় ওর বাবার কাছ থেকে। ভেস নিজে একজন ডাক্তার হওয়ায় সব সময় স্পোর্টস রিহ্যাবে লি'কে সাহায্য করতে পারেন।"

টেনিস-বিশ্বে নিজের কেরিয়ার গড়তে হলে শুধু পরিশ্রম ও প্রতিভা দিয়ে হয়? এমন একটা প্রশ্ন যদি সানিয়া মির্জাকে নিয়ে করেন তা হলে বলতে হয়, ওই দু'টো ব্যাপার ছাড়াও আরও অনেক কিছুরল সঙ্গে লড়ে নিজের জায়গা তৈরি করতে হয়। বিশেষ করে, ভারতের মতো দেশ থেকে, যেখানে একজন মহিলা টেনিস খেলোয়াড়কে লড়তে হয় তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গেও। উইম্বলডনে মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের পর সানিয়ার জয়জয়কার চারিদিকে। দেখতে ও শুনতে ভাল লাগে, তাই না! কিন্তু এতটা পথ পেরিয়ে সাফল্য ও নিজের



পরিচয় তৈরি করতে সানিয়াকে কম লড়তে হয়নি! ছোট পোশাক, ব্যক্তিগত জীবন, সব সময় সানিয়ার কোর্টের লড়াইকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালিয়েছে। বলতে পারেন, রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে মেয়ে বলে তাঁকে প্রতিটা পদক্ষেপেই অনেক জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই চালাতে হয়েছে। কখনও কোর্টে সানিয়া স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে সরব হয়েছেন সমালোচকরা। কখনও ইরানের শাহর পিরের সঙ্গে জুটি বাঁধতেও বিক্ষোভের মুখে পড়ত হয়েছে তাঁকে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। ২০০৫ এ একবার 'সেফ সেক্স' নিয়ে সচেতনতাবৃদ্ধির এক প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। তাতেও প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এক শ্রেণীর সমালোচকরা বলেছিলেন, 'সানিয়া যুবসমাজকে ভুল বার্তা দিচ্ছেন।' তবে এই ব্যাপারটা সানিয়াকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। পরে সানিয়া বলেছিলেন, "কখনও কোনও ভুলল উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কিছু করি না। তার পরও কেন সব সময় আমাকে এসব শুনতে হবে? কেন কোথাও খেলতে গেলে আমাকে হোটেলের রুমে বসে কাটাতে হবে? কেন এতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে? আমি দেশকে গর্বিত করেছি। আমার সঙ্গে এরকম অবিচার কেন?"

সত্যিই, বিশ্ব টেনিসে ভারতীয় টেনিসকে আলাদা জায়গা করে দেওয়া একজনকে কেন বারবার সমালোচনার মুখে পড়তে হবে? সাফল্য এলে সব কিছু আড়ালে চলে যায়। ঠিক কথা। উইম্বলডন জয়ের পর সাইনার সমালোচকদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন ভারতীয় টেনিস সমর্থকদের মুখে এমন একটা ভাব, সানিয়া ছাড়া ভারতীয় টেনিস অন্ধকারে চলে যেত। ঠিক তাই। কিন্তু এই সাফল্য যদি আবার বেশ কিছুদিন পর আসে? তা হলে মাঝখানের এই সময়ে আবার সানিয়ার সমালোচকরা নতুন কোনও ইস্যু খুঁজে বের করবেন না তো? আবার তাকে 'পাকিস্তানের বধূ' বলে কটাক্ষ করা হবে না তো? উত্তর হয়তো জানা নেই কারও।

২০০৭-২০১১, চোট থেকে শুরু করে ফর্ম, সব দিক থেকে প্রচণ্ড ভুগতে হয়েছিল সানিয়াকে। সেখান থেকে ফিরে কী করে বিশ্ব টেনিসে এক নম্বর জায়গাটা অর্জন করলেন সানিয়া? আসলে ঠিক সময় ঠিক স্ট্র্যাটেজি ও পার্টনার বাছাই তাঁকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। বলছিলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা আখতার আলি। তিনি বলছিলেন, "সানিয়া আমার তত্ত্বাবধানে কখনও প্র্যাকটিস করেনি। কিন্তু ওকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমাদের কথাও হয়। উইম্বলডনে হিঙ্গিসকে সঙ্গী করে খেলার সিদ্ধান্তটা ও ঠিক নিয়েছিল। সানিয়ার ফোরহ্যান্ড দারুণ। কোর্টের পিছন থেকে খেলতে পারে। সেখানে হিঙ্গিস সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারে। ফলে ওদের জুটিটা বিপক্ষকে চাপে ফেলেছিল। ঠিকঠাক সঙ্গী বাছাই একটা বড় কাজ।"

বড়দের মাঝখানে আরও একজনের কথা অবশ্য বলতে হয়। লিয়েন্ডার, সানিয়ার মতো তিনিও উইম্বলডনের আকাশে ভারতের নতুন তারকা। ঝাঝরের আঠারো বছরের এই ছেলেটির উইম্বলডনে যাওয়ার গল্পটিও অনেককে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যেতে পারে। প্রথমে দিল্লির নানগোই এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন সুমিত। তবে সেটা দশ বছর বয়স পর্যন্ত। সুমিতের মা বলছিলেন, "এক-এক সময় এমন গিয়েছে, টানা এক বছরও সুমিত বাড়িতে ফেরেনি। উইম্বলডনের আগে প্র্যাকটিসের জন্য বেঙ্গালুরুতে ছিল। তখনও দিনের পর দিন ওকে দেখতে পাইনি।"

সুমিমের এত বড় সাফল্যের পিছনে সব থেকে বড় হাত ছিল মহেশ ভূপতির। তিনিই প্রথম নিজের অ্যাকডেমিতে তুলে আনেন সুমিতকে। তার পর সুমিতকে টরন্টোয় পাঠানোর ব্যবস্থাও করে দেন মহেশ।

গল্প

এই আমি মল্লিকা

জগন্নাথ প্রামাণিক



দিনান্তের শেষ রশ্মিটুকু কৃষ্ণচূড়ার মগডালে পড়ে ধীরে ধীরে যখন মিলিয়ে যায়, তখনই মল্লিকার বুকের ভিতর সৃষ্টি হয় এক অব্যক্ত বেদনা। যে বেদনা প্রতিদিন আসে আবার এক সময় চলেও যায়। সেই বেদনার শরীরে থাকে অনেক কিছু লুকনো অভিব্যক্তি, যে অভিব্যক্তিগুলি এক এক করে সাজালে তৈরি হবে একটি শুকনো ফুলের মালা, যা বড়ই দুঃখের।

দুঃখগুলি কাগজকুচির মতো টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেও কোনও সান্ত্বনা সে পাবে না, তবু, এই রকম দুঃখপূর্ণ অভিব্যক্তিগুলি প্রতিনিয়ত কেন যে আসে আবার চলেও যায়, তা মল্লিকা বুঝে উঠতে পারে না।

সব চেয়ে বড় কথা, যেমন, কোনও খোয়া যাওয়া জিনিস, যা শত চেষ্টা করেও আর কখনও খুঁজে পাওয়া বা ফিরে পাওয়া যাবে না, তবুও জিনিসটির মায়া-মমতা হৃদয় থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলা যায় না, তেমনই দুঃখপূর্ণ অভিব্যক্তিগুলি দিন দিন মল্লিকার বুকের ভিতরটাকে ঝাঁঝরা করে দিতে থাকে। টুকরো টুকরো ঘটনা বা স্মৃতি, সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার বুকেরকোমল উদ্যানটিকে অন্ধকারে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে। আর করবে নাই বা কেন, অতনু তার জীবনে উষ্ণ বাতাসে ভেসে আসা সুগন্ধি ফুলের ঘ্রাণের মতোই আনন্দের জাল বিস্তার করে এসেছিল। যদিও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়ে ওঠেনি। অবশ্য স্থায়ী হয়ে না ওঠার জন্য পুরোপুরি অতনুকে দোষী করা যায় না। তারও হয়তো কিছু দোষ ছিল। যে দোষগুলি তখন সে দোষ বলেই ভাবেনি। এখন ভাবলে বা মনে পড়লে গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা কষ্টদায়ক হিমেল স্রোত প্রবাহিত হয়।

—তোমার তো স্কুলের চাকরি, স্কুল কি রাত ন'টায় ছুটি হয়?

—মোটেও না। স্কুল যথা সময়েই ছুটি হয়েছে।

—তাহলে ফিরতে এত রাত হল কেন?

—স্কুলে মিটিং ছিল। ম্যানেজিং কমিটির।

—মাসে ক'বার তোমাদের স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির মিটিং হয়?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মল্লিকা কটমট করে তাকায় অতনুর দিকে। অতনুর প্রশ্নগুলি মুহূর্তে বেলুনে পিন ফোটালে যেমন চুপসে যায়, সে রকম চুপসে গিয়ে নরম হয়ে ওঠে। অতনু বলে, না মানে, কেয়া সন্ধে থেকে তোমার জন্যে যা কান্না আরম্ভ করেছিল, তাই...

অহ্।

তারপর সব চুপচাপ। সে মুখ হাত ধুয়ে মেয়ের ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের কাছে বসার সঙ্গে সঙ্গেই চা এনে হাজির করে অতনু। চায়ে চুমুক দিয়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করে, কখন ঘুমোল?

—এই একটু আগে।

—খুব জ্বালিয়েছে?

আমতা আমতা করে অতনু বলে, না মানে, তা একটু তো বটেই।

তখনও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারে না মল্লিকা। অতনুর সরলতার সুযোগ নিয়ে নরম গরম সুরে বলে, এটুকু যদি সহ্য করতে না পার, আমার আর কিছু করার নেই। সারাদিন তো তোমার তেমন কিছু কাজ থাকে না।

মল্লিকার কথায় অতনুর ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে। স্তম্ভিত হয়ে সে মল্লিকার মুখের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর বলে, না মানে...।

—মানেটা খুবই সোজা। শোন, দেড় ঘণ্টা ধরে বাস জার্নি। তার উপর অতগুলো ক্লাস। আমাকে কী ভাব বলত? গরু না গাধা?

—আমি কি তাই বললাম?

—তোমার প্রশ্নটা কেমন বাঁক বাঁকা দেরি করে ফেলার জন্যে। নয় কি?

—যা ভাবার ভাবতে পার।

—ভাববটা আর কী।

অতনুকে এভাবে এড়িয়ে গেলেও নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ভাবতে পারে না মল্লিকা। অবিশ্যি সেদিন সত্যিই ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ছিল। কিন্তু অন্যান্য দিন, যা সে নানান অজুহাতে এড়িয়ে যায়, তা আর কিছুই নয়, স্কুল ছুটির পর দুটো টিউশনি করে বাড়িতে ফেরে মল্লিকা। সে কথা মল্লিকা আদৌ বলে না অতনুকে। কারণ পাছে অতনু বাধা দেয়। তাকে টিউশনি দুটো করতে হয় মানবিকতার জন্যে। যা তার জীবনে এখন শাঁখের করাতের মতো। টিউশনির প্রাপ্য টাকা এবং বেতনের সামান্য কিছু নিয়ে সে প্রতি মাসে হাজার দেড়েক টাকার মতো পাঠায় স্কুল হস্টেলে শঙ্খকে। রঞ্জনের সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পরেও সে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি শঙ্খকে। হাজার হলেও সে যে মা। স্নেহ যে অতি কঠিন বস্তু। স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন, এখনও, অতনুর সঙ্গে বিয়ের প্রায় পাঁচ বছর পরও তাকে অক্টোপাসের বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে।

॥২॥

নামী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে অতনুর বাবাই প্রথম যোগাযোগ করে পাত্রীর বাড়িতে। বিজ্ঞাপনটা ছিল, "পাত্রী এমএ, এইচএস স্কুল শিক্ষিকা। বয়স ২৮, ৫'-২", নামমাত্র বিবাহে মিউচুয়্যাল ডিভোর্সি। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ফোন নম্বর-৯৮৩০১১৬২১৫, রাত আটটার পর, সকাল ন'টার মধ্যে।

অতনুর তখন পঁয়ত্রিশ। স্নাতোকোত্তর পাস করে বেকার। প্রথম হার্ট অ্যাটাকের পর, এক ছেলে ও এক মেয়ের ব্যবসায়ী বাবার অবস্থা তথৈবচ। জীবনে যা সঞ্চয় করেছিলেন, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর তেমন কিছু আর ছিল না। মৃত্যুভয় সব সময় তাড়িয়ে বেড়াত। তাই তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যুর আগে ছেলেটাকে অন্তত খাওয়া-পরার ভাবনা থেকে মুক্ত করতে। ছেলের ইনকাম না থাকলেও মেয়ের তো আছে। তাছাড়া একবার পোড় খাওয়া মেয়ে তেমন ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারবে না, পাত্রী সম্বন্ধে এই ছিল অতনুর বাবার ধারণা।

ছেলেবেলা থেকেই অতনুর স্বভাব চরিত্র এত শান্ত এবং ধীর স্থির যে, যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ভেবেছিলেন সূর্যনারায়ণ।

॥৩॥

বিএ অনার্স ও এমএ-তে, স্কুল-কলেজের রেজাল্ট, খুব একটা খারাপ ছিল না অতনুর। চাকরি পায়নি নেহাতই ভাগ্যদোষে। এসএসসি পরপর দু'বার দিয়ে কিছু না হলেও, হঠাৎ যখন সাঁইত্রিশে পা দেবে দেবে করছে চাকরি পেয়ে যায় অতনু। তবে দক্ষিণবঙ্গে নয়, দূরে, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে। জয়েন করার সময় মল্লিকাও বাধা না দিয়ে তীব্র উচ্ছ্বাসে এবং আনন্দে সেলিব্রেট করেছিল।

অতনুও এতদিন ধরে, 'স্ত্রীর রোজগারে বসে বসে খাচ্ছি'—এই হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি পেয়ে মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল।

মানুষের জীবনে কখনও সখনও এমন কিছু ঘটে যায় যা জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তেমনই কিছু ঘটে গেল এক সময় অতনু-মল্লিকার জীবনে। এরকম যে ঘটবে তা অতনু বা মল্লিকা কেউই ভাবতে পারেনি। অতনু কখনও মাসান্তে, কখনও পনেরো দিন পর চলে আসে বাড়িতে। দু-একদিন কাটিয়ে আবার চলে যায়। এবার হঠাৎই তিনদিন পর ধুম জ্বর নিয়ে

বাড়িতে এসে শঙ্খকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

মল্লিকার ইস্যুর কথা গোপন রেখে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কাগজে। বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় মল্লিকার বাবা বলেছিলেন, তুই ভিন্ন আমাদের তো কোনও সন্তান নেই, শঙ্খর ভার আমরাই নেব। তোর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু বিয়ের এক বছর পর বাবার মৃত্যুর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মা মারা যাওয়ার পর শঙ্খ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। মিউচুয়াল ডিভোর্সের সময় রঞ্জন শঙ্খর ভার নিতে চাইলেও মল্লিকার বাবা-মা দেননি। তাই, মল্লিকার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর রঞ্জনকে মল্লিকা শঙ্খর ভার নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লেখে। রঞ্জন আমল দেয়নি। দেয়নি এই কারণে যে তার তখন ভরা সংসার। সেও পুনরায় বিয়ে করেছে এবং একটি সন্তানের জনক। চিঠির উত্তরে রঞ্জন লেখে, শঙ্খর ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। কারণ, অনিতা শঙ্খকে মোটেও মেনে নিচ্ছে না। অনিতার সাফ কথা, বিয়ের সময় তো তুমি বলেছিলে, আমার প্রথম পক্ষের সন্তানের ভার স্ব-ইচ্ছায় প্রথমা স্ত্রীর বাবা-মা নিয়েছেন। অতএব সেদিক দিয়ে কোনও চিন্তা নেই। ডিডে যে এসব উল্লেখ আছে তা আমি বিয়ের আগে অনিতাকে দেখিয়েছিলাম।

মল্লিকা আর অনুরোধ করেনি রঞ্জনকে। তাছাড়া শঙ্খর প্রতি অন্তরের একটা গভীর টানও সব সময় অনুভব করে মল্লিকা। যা কাউকে বলার নয়। তাই, শিলিগুড়ি থেকে ফিরে শঙ্খর পরিচয় জানতে চাইলে, বিনা দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে সব কিছু অতনুকে বলেছিল মল্লিকা। কিন্তু অতনু তা সহজভাবে নেয়নি। সে মুখে কিছু না বললেও হাবে-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল, মল্লিকা সম্পূর্ণ প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে।

ঘুম আসছিল না বিছানায় শুয়ে। রাতচরা পাখির কোঁকিয়ে ওঠা একটা করুণ আর্তনাদ শোনা গেল দূরে কোথাও। বিছানায় উঠে বসল মল্লিকা। কিছুক্ষণ পর বিছানা থেকে নেমে জগ থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল। তার পর ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশে অসংখ্য তারা। কোনওটা ছোট, কোনওটা বড়। কোনওটা জ্বলজ্বল করছে, আবার কোনওটা স্থির হয়ে আছে। করুণ বিষণ্ণতায় আকাশের এধার থেকে ওধার ভেসে বেড়াতে লাগল মল্লিকার মন। প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল অতনু বাড়ি আসেনি। একটা চিঠিও দেয়নি। সে একটা চিঠি দিয়েছিল। কোনও উত্তর আসেনি। এ সবের কী পরিণতি তা সহজেই অনুমান করতে পারে সে।

শঙ্খ স্কুল হস্টেলে চলে গিয়েছে। মেয়ে কেয়া পাশের ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মল্লিকা ভাবে, মানুষের জীবনের এই যে তুচ্ছতা, যা সব অহঙ্কারের ঊর্ধ্বে, সেখানে এমন কিছু আছে, যার কাছে জীবন-যৌবন-টাকা-পয়সা-গয়না-গাঁটি কিছুই মূল্যবান নয়। তা কী? তা কি তার মাতৃত্ব? হৃদয়বৃত্তি? স্নেহ-ভালবাসা? নাকি লোভ-লালসা, ভোগবিলাসের চাওয়া-পাওয়া? হো হো করে হাসি পায় মল্লিকার। চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ে। কাল বাদে পরশু অমাবস্যা। নিশুতি রাতের অন্ধকারের বুক চিরে উল্কাপিণ্ড পতনের মতো জীবনটার যে ছন্দপতন ঘটতে চলেছে সেখানে তার মাতৃত্বের কি কোনও দাম নেই? এইরকম হাজারো প্রশ্ন মনকে বিদ্ধ করতে থাকে মল্লিকার।

মল্লিকা কান পেতে শোনে কখনও রাত্রির নীরবতা, কখনও টুকরো টুকরো অতনুর কণ্ঠস্বর। এমনকী, এই যে রাত্রি, জীবনের মধুরতম একটি রাত্রি, যেমনভাবে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে শাশ্বতের বুকে, সেভাবেই সে একদিন হারিয়ে যাবে এই পৃথিবী থেকে। কিন্তু মাতৃত্ব, যা অতি আদিযুগ থেকে এখনও পৃথিবীর বুকে নিকৃষ্টতম প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ জীব মানবের মধ্যে বর্তমান, তা যে বড়ই মধুর। যেখানে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিমেষে অতি তুচ্ছ হয়ে যায়, তাকে সে কেমন করে উপেক্ষা করবে? বা করতে পারে? রাত ফুরিয়ে আবার একটা সকাল আসছে। প্রত্যেকদিনের মতো শুরু হবে জীবনের ব্যস্ততা। মেয়ের স্কুল, তার পর নিজের। ধীরে ধীরে নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করে মল্লিকা।

॥৪॥

রীতিমতো সুন্দরীই বলা যেতে পারে মল্লিকাকে। ঈশ্বর তাঁর অকৃপণ হাতেই গড়েছেন তাকে। সেটা তো তোর দোষ নয়। রূপ-যৌবনই একের পর এক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় মল্লিকার জীবনে।

একদিনের ঘটনা, রঞ্জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্যামলের সঙ্গে মল্লিকা চা খেতে খেতে গল্প করছিল। গল্প করতে করতে একসময় কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে ভীষণ হাসি পায় দু'জনের। তারা যখন হেসে লুটোপাটি খাচ্ছে, অফিস থেকে বাড়িতে ঢোকে রঞ্জন। তখন সন্ধে হয় হয়। এ-সময় তার বাড়িতে তার স্ত্রীর সঙ্গে একলা বসে বন্ধুকে এভাবে হাসাহাসি করতে দেখে রঞ্জন অবাক হয়। শুধু অবাক হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বিরক্তিও প্রকাশ করেছিল শ্যামল চলে যাওয়ার পর। কিন্তু মল্লিকা তেমন গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটাকে নেয়নি। তার অপরাধ, এ সময় আসবে কেন শ্যামল? সে তো কাজ থাকলে অফিসে যেতে পারত কিংবা ফোন করে বলতে পারত কখন আসবে?

মল্লিকা বলেছিল, আমি কী করে জানব তোমার বন্ধু কখন আসবে আর কখন আসবে না?

প্রত্যুত্তরে রঞ্জন গভীর সন্দেহের ভাবপ্রকাশ করে মুখ দিয়ে শুধু শব্দ করেছিল, উফ্।

ব্যাপারটা যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত তাহলে কী হত কে জানে। কিন্তু শ্যামল, তারমনে যে সত্যিই পাপ ঢুকেছিল, তা মল্লিকা জানবে কী করে? তখনও স্কুলের চাকরিটা পায়নি মল্লিকা, শ্যামলের তাদের বাড়িতে আসাটা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। শেষ হল শ্যামলের একদিনের একটা বিশ্রী ব্যবহারে। সেদিন, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে, মল্লিকা তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শ্যামল বারবার ডোর বেল বাজাতেই মল্লিকা অগোছালো বেশে দরজা খুলে, আসছি, বলে বেরিয়ে এসে অবাক। সে ভেবেছিল কাজের মেয়ে মায়া হয়তো বেল বাজিয়েছে।

—আপনি হঠাৎ?

কোনও উত্তর না দিয়েই মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বেডে ফেলে চেপে ধরে শ্যামল। কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করে ভয়ে ছুটে গিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নেয় মল্লিকা। কতক্ষণ বাথরুমে বসেছিল সে জানে না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে কাজের মেয়ে মায়ার ডাকাডাকিতে।

—কী ব্যাপার দিদি, ঘর খোলা, তুমি বাথরুমে ছিটকিনি দিয়ে ওভাবে বসেছিলে?

কী বলবে মল্লিকা? বলেছিল, ও কিছু না, একটা জিনিস কিনতে বাইরে যাব বলে দরজা খুলেছিলাম, হঠাৎ বাথরুম পেয়ে যাওয়ায় ঢুকে পড়ি। দরজা খোলা ছিল বলে খেয়াল করিনি। মায়ার মনে অন্যরকম সন্দেহ হয়েছিল মল্লিকার বেশবাস ও চোখমুখের অবস্থা দেখে। মায়া আর কিছু প্রশ্ন না করলেও গভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে।

যেহেতু মল্লিকার মনে কোনও পাপ ছিল না, সে সরল মনে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছিল রঞ্জনকে। কিন্তু রঞ্জন ব্যাপারটাকে



সহজভাবে নেয়নি। সেদিনের পর থেকে রঞ্জনের আচার-আচরণ, কদর্য ব্যবহার, অতিষ্ঠ করে তুলেছিল মল্লিকাকে। হঠাৎ একদিন গায়ে হাত তুলতেই মল্লিকা বলেছিল, আর নয় ঢের হয়েছে, আমি মুক্তি চাই, দয়া করে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। শঙ্খ তখন তিন মাসের পেটে।

রঞ্জন রূঢ় স্বরে চেঁচিয়ে বলেছিল, আমিও তোমার মতো নষ্ট মেয়ের হাত থেকে রেহাই চাই। তার পর কথা কাটাকাটি, মল্লিকার কান্না, রাগ-অভিমান। কিছুদিন পর উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে মিউচুয়াল ডিভোর্স।

সেদিন কেয়ার জন্মদিন। দুই পেরিয়ে তিনে পড়ল কেয়া। তাই স্কুলে যায়নি মল্লিকা। সেদিনই একটা চিঠি আসে শিলিগুড়ি থেকে। চিঠিটা খুলে পড়ে আর রাগ-অভিমান-দুঃখ কিছুই হল না মল্লিকার। কারণ পুড়তে পুড়তে সে এখন অঙ্গার। তাই ঠোঁটের কোণে শুধু এক চিলতে বাঁকা হাসি ঝুলিয়েই মনকে সংযত করে।

তার বড় ঘেন্না লাগে। বিবাহ, শাঁখা-সিঁদুর, অবাধ যৌনতা ভিন্ন আর কী! বিচিত্র সমাজ মানুষের। এই সব কারণেই বোধহয় লিভ টুগেদারের চাহিদা বাড়ছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

চিঠিতে কেয়ার খবর, তার খবর, প্রভৃতি ইনিয়ে-বিনিয়ে আধপৃষ্ঠা লেখার পর, আসল কথাটি লিখেছে অতনু। লিখেছে, স্কুলেরই একজন শিক্ষিকা তাকে ভালবাসে। সব কিছু জেনেও বিয়ে করতে ইচ্ছুক। এখন প্রয়োজন শুধু তার সম্মতি অর্থাৎ ডিভোর্স।

মেয়ের জন্মদিনে মেয়ের স্কুলের দু-একজন মা ভিন্ন কেউ নিমন্ত্রিত ছিল না। অতএব হই-হুল্লোড় ব্যতিরেকেই কেটেছে দিনটা।

রাতের দিকে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে মল্লিকা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার বয়স সবে মাত্র তিনের কোঠায়। এই বয়সে অনেক মেয়ের বিয়েই হয়নি। অথচ ইতিমধ্যেই তার মুখে স্পষ্ট একজন বয়স্কা মহিলার ছাপ। কিছুক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিকা। তার পর ধীরে ধীরে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। টেবিলে গিয়ে বসে। টেবিলে সে ও অতনুর বিয়ের বাঁধানো ছবিটা ভীষণ জীবন্ত মনে হয়। ছবিটা দেখতে দেখতে নিঃশব্দে কলমটা ও প্যাডটা হাতে তুলে নেয়। সাদা পৃষ্ঠায় সে কী লিখবে তা ঠিক করতে এক সেকেন্ডও সময় লাগে না।

মল্লিকা চিঠিটা লিখে খামের মুখটা আঠা দিয়ে বন্ধ করে মেয়ের কাছে উঠে গিয়ে মেয়ের মুখটা ভাল করে দেখে। চিঠিটা লিখতে লিখতে তার মনে যে রাগ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল, মেয়ের শরীরে অতনুর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে বলে, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে তার মনে হয় মেয়ের নিষ্পাপ মুখে যেন ঝরে পড়ছে হিরন্ময় দ্যুতি। একটু আগের প্রতিহিংসা ও প্রতিক্রিয়াটা বালির বাঁধের মতোই চুরচুর করে ভেঙে পড়তে থাকে। কোনও মতেও নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। তার মনে হয় সব কিছু এখনও তার জীবন থেকে শেষ হয়ে যায়নি। শঙ্খ ও কেয়া যেন তার জীবনের দুটো সাদা পাথরের টুকরো।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু

গল্প

রঙিন গোধূলি

কোয়েল মুখোপাধ্যায়



“বিকেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিস কিন্তু বাবিন! মনে আছে তো?” দরজার দিকে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল শ্রেয়সী। স্লিং ব্যাগের হাতলটাকে এক ঝটকায় পাশে ফেলে মার দিকে ফিরে তাকাল সে। মেয়ের বরফশীতল চাহনি দেখে মনে মনে প্রমাদ গুনলেন সবিতাদেবী।

"আর কতবার বলবে?"
"না, মানে!" তোতলাচ্ছেন সবিতাদেবী। "ওরা এসে কতক্ষণ বসে থাকবে বল! তুই না ফিরলে তো কথাই শুরু হবে না। তাই বলছিলাম যে তাড়াতাড়ি ফিরলে তো সাজগোজটাও একটু..."
"আমি আসছি মা।" আর দাঁড়াল না শ্রেয়সী।
দরজা বন্ধ করে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সবিতাদেবী। না! এ যাত্রাতেও বাবিনের কোনও হিল্লে হবে বলে মনে হয় না। দেখতে দেখতে ২৫ এ বালিগঞ্জ কোর্ট রোডের আশালতা সদনের সবকটা আইবুড়ো মেয়েরই গতি হয়ে গেল একে একে। আর ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছে সকলের। কারণ, এখনও পর্যন্ত কারও সম্বন্ধে খারাপ কোনও রিপোর্ট তো পরমাদি দেয়নি। পরমাদি মানে ব্যারিস্টার শৈবাল ঘোষের স্ত্রী পরমা ঘোষ। আশালতা সদনের ননস্টপ নিউজ চ্যানেল।
কিন্তু সমস্যা যে ওই বাবিনকে ঘিরেই। বিয়ের নাম শুনলেই যে মেয়ের গায়ে জ্বর আসে। সে এই যুগের মেয়ে। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে না কি তার বিশেষ বিশ্বাস নেই। পরমাদিও তাকে বুঝিয়ে পারেনি। তার একটাই কথা। পাত্র দেখতে তার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে তার পছন্দই হল শেষ কথা।
ড্রইংরুমের সোফা ঝাড়তে শুরু করলেন সবিতাদেবী। বিকেলে শ্রেয়সীকে দেখতে আসবে। সম্বন্ধটা অবশ্য পরমাদিরই দেওয়া। পাত্র নাকি মুম্বইয়ের। চাকরিসূত্রে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে। ছেলেটা নাকি দারুণ হ্যান্ডসাম আর বুদ্ধিমান। বাবিনের নাকি এবার পছন্দ হবেই।
তাই যেন হয়, ঠাকুর! কপালে হাত ঠেকালেন সবিতাদেবী। এবার যেন মেয়েটা রাজি হয়ে যায়। আর হ্যাঁ, দেখো মা, আচমকা যেন আবার রেগে না যায়। রেগে গেলে বাবিনকে সামলানো.....জয় মা, জয় মা!!

২

"ইচ্ছে ছিল না জানিস। তাও মর্নিং শিফটটা নিতে হল।" সায়নের দিকে চেয়ে কাতরভাবে কথাটা বলল শ্রেয়সী।
"ও! আজ বুঝি আবার? তা এই নিয়ে কত নম্বর যেন?"
"চার।"
"বা! বা! ভাল। ভাল। তা ইস বার তো ডাল গল ভি সকতা হ্যায়...কী বলিস?" মুচকি হেসে বলল সায়ন।
"দ্যাখ, সকাল সকাল মাথাটা গরম করিস না, বুঝলি? মা একটা খেলা পেয়ে গিয়েছে যেন। দু'তিন মাস অন্তরই কাউকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে।"
"আর তুই তাদের দফা-রফা করিস"!
"করব না? কত প্রশ্ন তাদের! কী পড়েছেন, কোথায় পড়েছেন? অমুক বিষয় কেন? তমুক বিষয় নয় কেন? রান্না করতে পারেন? কী কী বানাতে পারেন...আরে বাবা! সব কৈফিয়ত কি তোমায় দিতে হবে না কি?"
"ধুর! ওটা তো সকলেই করে। তুই-ই খালি রেগে যাস। আমার কথা শোন। আগে নিজের রাগটা কমা। ওটাই তোর সব সুযোগ কেঁচে দিচ্ছে।"
"অ্যাই, একদম মার সুরে কথা বলবি না। বোকা-বোকা প্রশ্ন করলে কী করব?"
"তা-চালাক চালাক প্রশ্ন কেমন হয়?"
"কেন? আন্ডার দ্য সান, কোনও বিষয় নিয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক আলোচনা চালানো যায় না? এতেই তো পরস্পরের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। না?"
"হুমম..পয়েন্ট।"
"আমি পয়েন্টেই কথা বলি, সায়ন।"
"আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে। মাথা ঠান্ডা কর। বেশি ভাবিস না এ নিয়ে। ওই দেখ! বস এদিকেই আসছে। আমি চললুম। একটু অ্যাকাউন্টসে যেতে হবে। আর, হ্যাঁ....পরে জানাস, পরে কী হল। মানে জিনিসটা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেলে তো আবার .."
"শায়ন...ভাল হচ্ছে না কিন্তু!" ফাইলে ফের চোখ রাখল শ্রেয়সী।

৩

গড়িয়া মোড়ে পৌঁছতেই সাড়ে তিনটে বেজে গেল। এখান থেকে বাড়ি ফিরতে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো লাগবেই। আবার ভিড়-টিড় যেন না থাকে বাসে... স্বগতোক্তি করতে করতেই বাসটা পেয়ে গেল শ্রেয়সী। উঠেও পড়ল। যা ভেবেছিল.. তাই! তিলধারণের জায়গা নেই গোটা বাসে কোথাও। অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে লেডিজ সিটের দিকে এগিয়ে গেল শ্রেয়সী। কাছাকাছি পৌঁছে দেখল মেয়েদের সিটে অম্লানবদনে বসে ফর্সা, লম্বা একটা ছেলে। কানে হেডফোন। দৃষ্টি বাইরে।
দ্রুত চারপাশে একবার চোখজোড়া বুলিয়ে নিল শ্রেয়সী। না রংচটা দেওয়াল হলেও একপাশে 'মহিলা' কথাটা অক্লেশেই পড়া যাচ্ছে। সুতরাং এবার অ্যাটাক!
"দাদা.. শুনছেন? ও দাদা!"
"ইয়েস..ইউ আর টকিং টু মি? মানে...আমাকে বলছেন?"
আচ্ছা। ইংলিশ ভিংলিশ! বিরক্তি চেপে উত্তর দিল শ্রেয়সী।
"ইয়েস! আই অ্যাম টকিং টু ইউ....ডু ইউ মাইন্ড লিভিং দ্য সিট?"
"বাট হোয়াই? কেন..মানে?"
কী স্পর্ধা! আবার বলে হোয়াই? মেজাজ চড়ল শ্রেয়সীর।
"ক্যান্ট ইউ সি হোয়াট'স রিটন ওভার হিয়ার? আর ইউ ব্লাইন্ড অর নিড স্পেকট্যাকলস টু রিড দ্যাট" ইংরেজিতেই বলে চলেছে শ্রেয়সী।
"ওয়েল..মানে আমি এখানে নতুন। বাংলাটা বুঝি কিন্তু ঠিক পড়তে পারি না..."
"ঠিক আছে। ঠিক আছে..এটা লেডিস সিট। উঠুন এবার" গজ গজ করতে করতে সিট দখল করল শ্রেয়সী। অত ফিরিস্তি কে শুনতে চেয়েছে? ঠোঁটের কোণে যুদ্ধজয়ের হালকা একটা হাসি। বিরক্তিটা যদিও যায়নি।
"দিদি, ভাড়াটা?"
"দিচ্ছি, দিচ্ছি...এই তো উঠলাম।"
কন্ডাকটরকে থামিয়ে ব্যাগের ভিতর হাত চালান করল শ্রেয়সী। আরে! টাকার ব্যাগটা গেল কই? সকালে তো এই চেনেই রেখেছিলাম। দুপুরে লাঞ্চের সময় একবার বার করেছিলাম বটে। কিন্তু তার পর? ব্যাগে রাখতে ভুলে যাইনি তো?
শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শ্রেয়সীর। কী হবে এবার? এইমাত্র মেজাজ দেখিয়ে সিটটা দখল করলাম। বাসভর্তি লোকজন সাক্ষী। এবার ভাড়া দিতে না পারলে তো প্রেস্টিজ একেবারে....! তাছাড়া এতদূর চলে এসেছি। এখন আর নেমে পড়াও যাবে না। আর ওই লোকটা দেখতে পেলে তো আর...
ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং!!
ফোনটা বাজছে। ধুর! মা আর যেন ফোন করার সময় পায় না!
"হ্যালো...কী হয়েছে?"
'হ্যাঁরে..কোথায় তুই বাবিন? পাঁচটা তো বাজতে চলল। এখনও এলি না?"
"ওরা কি এসে গিয়েছে?"
"আবার ওরা কেন? শুধু তো ছেলে তোকে বললাম না? কাল

ওর বাবা-মা মুম্বই থেকে আসবে?"
"আচ্ছা আচ্ছা। আমার এত শোনার সময় নেই। মহা সমস্যায় পড়েছি!"
"কেন রে? কি হল আবার?"
"আরে...টাকার ব্যাগটা অফিসে ফেলে এসেছি। এখন বাসে ভাড়া দেব কীভাবে?"
"মানে? তুই কী রে? এই জন্যই বলি বেশি রাগ করিস না"
ধ্যাত! ফোনটা কেটে দিল শ্রেয়সী। একে বিপদ, তার উপর মার বকা। কি যে করি! দেখতে দেখতে নামার সময়ও এগিয়ে এল। ভাবতে ভাবতে আশপাশে তাকাল শ্রেয়সী। আরে! ওই ছেলেটা ওকেই দেখছে। বিরক্তিতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল শ্রেয়সী। ওর জন্যই হল এ সব। নিশ্চই মনে মনে অভিশাপ দিয়েছে। কি করি...কি করি..।
না! আর বসে থাকা যায় না। আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল শ্রেয়সী। কন্ডাকটর চেচাচ্ছে..নামুন দিদি। কি হল..আরে নামুন!
"ইয়ে,,আমার ভাড়াটা তো...
"কেন? দেওয়া হয়ে গিয়েছে তো! ওই তো ওই দাদা দিয়ে দিলেন। আপনার আগেই তো নামলেন। কেন..দেখেননি?"
"দাদা? কোন দাদা" বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি শ্রেয়সীর।
"আরে যাকে সিট থেকে ওঠালেন।" নামুন, এবার।
মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে শ্রেয়সীর। কি হল কেসটা? ভারি অদ্ভুত তো ছেলেটা! ভাড়া দিয়ে দিল? জানল কি করে, আমার কাছে পয়সা নেই। আর হেল্পই যখন করল, তখন কথা বলল না কেন?
ভাবতে ভাবতেই বাড়ি পৌছল শ্রেয়সী। দরজা খুলেই মুখে আঙুল দিয়ে শ্রেয়সীকে কথা বলতে বারণ করল মা। "এসে গিয়েছে। ড্রইংরুমে বসে আছে। তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়। আর শরবতের ট্রেটা নিয়ে ঢুকিস, কিন্তু!"
মাথা নেড়ে নিজের ঘরে চলে গেল শ্রেয়সী। ফ্রেশ হয়ে নিল চট পট। ট্রেটা নিয়ে ঢুকল ড্রইংরুমে। তখনও বাসের ঘটনাটার কথাই ভেবে চলেছে সে।

৪

ঘরে ঢুকেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল শ্রেয়সী।
"এ কি আপনি? এখানে?"
"হাই! আমি অনিকেত। অনিকেত চৌধুরি। একগাল হেসে শ্রেয়সীর দিকে যে হাত বাড়িয়ে দিল, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই বাসে দেখা হয়েছে তার।
"মানে... আপনি তো বাসে, এখানে কী করে?" করমর্দনের পর বলল শ্রেয়সী। "কেন আমারই তো আসার কথা ছিল এখানে। আন্টিকে জিজ্ঞেস করুন"। অনিকেত তখনও হাসছে।
"কিন্তু.."
"আরে! বাসে দেখা হল তো আমাদের। আপনি তো আমাকে চিনতে পারেননি, সেটা বুঝেছি। বাট..আমি তো চিনেছি। বিকজ..আই স ইউর পিকচার্স। পরমা আন্টি নেট এ পাঠিয়েছিল। তো তাই দেখা করতে চলে এলাম। আসলে তখন বলছিলাম না..বাংলাটা বলতে পারি, বুঝতেও পারি। কিন্তু পড়তে প্রবলেম হয়। তাই সিট এর ব্যাপারটা বুঝিনি। বাট...আপনি দারুণ ঝগড়া করেন তো?"
মুখবন্ধ শ্রেয়সীর। কি বলবে? শুনছে শুধু।
"নো..নো..রিয়েলি। ইউ আরগিউ সো ওয়েল। মানে আমি কিন্তু দারুণ এনজয় করছিলাম। আচ্ছা..আন্টি আপনার মেয়ে এভাবেই রেগে যায় আর ঝগড়া করে?"
"অ্যাঁ..না। না। একটু-আধটু রেগে যায় মাঝে-মাঝে।" ঢোঁক



গিলে বললেন সবিতাদেবী।
"কিন্তু একটা ব্যাপার। রাগের মাথায় এত ঝগড়া করল বাসে আর মানি ব্যাগ না আনার ব্যাপারটা চুপি চুপি.. ফিস ফাস করে! আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম বলেই না কুড সেভ ইউ দিস টাইম। নইলে কি হত বলুন তো?"
"তাহলে হুট করে নেমে গেলেন কেন বাস থেকে" এতক্ষণে জোর পেয়েছে শ্রেয়সী।
"কি করব বলুন। কন্ডাকটর বলল, বালিগঞ্জ এসে গিয়েছে। একরকম জোর করেই নামিয়ে দিল। আমি তো বাড়িটা চিনতাম না। শুধু ঠিকানাটা জানতাম। তাই একটা রিকশা নিয়ে এলাম। বাট ভালোই হয়েছে। ভালো একটা সারপ্রাইজ পেলেন বলুন?
"মোটেও না। প্রতিবাদ করে উঠল শ্রেয়সী।
"নো ম্যাম। স্বীকার করুন। আপনি বেশ অবাক হয়েছেন। বাট এই সারপ্রাইজটা আপনার ভালোই লেগেছে। বলুন? "
আর পারল না শ্রেয়সী। এবার হেসেই ফেলল। শরবতের গ্লাসটা অনিকেতের দিকে এদিয়ে দিল। "নিন..ধরুন।"

অলঙ্করণ : শান্তনু দে

আলোকচিত্র



সিকিমের ছাংগু লেক-এর ছবিটি তুলেছেন আলোকচিত্রী অতনু ভট্টাচার্য





ছবিটি তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়